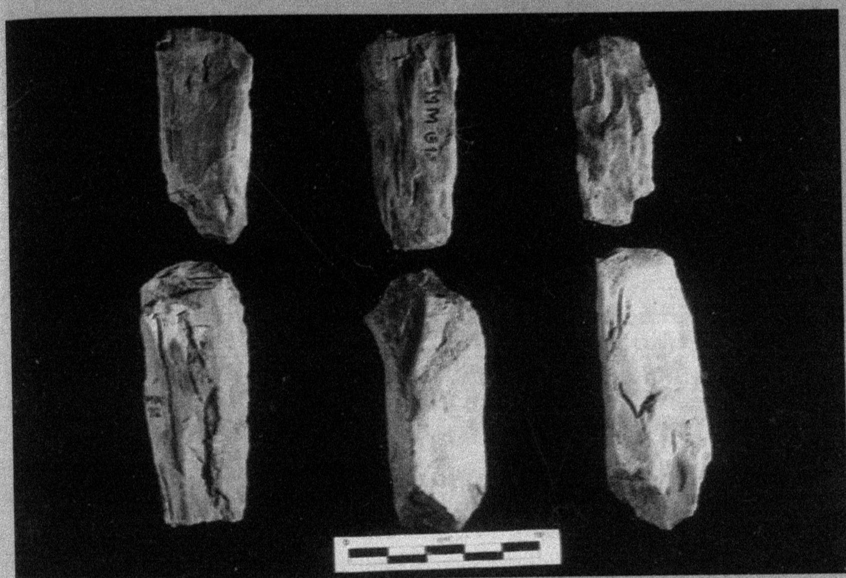
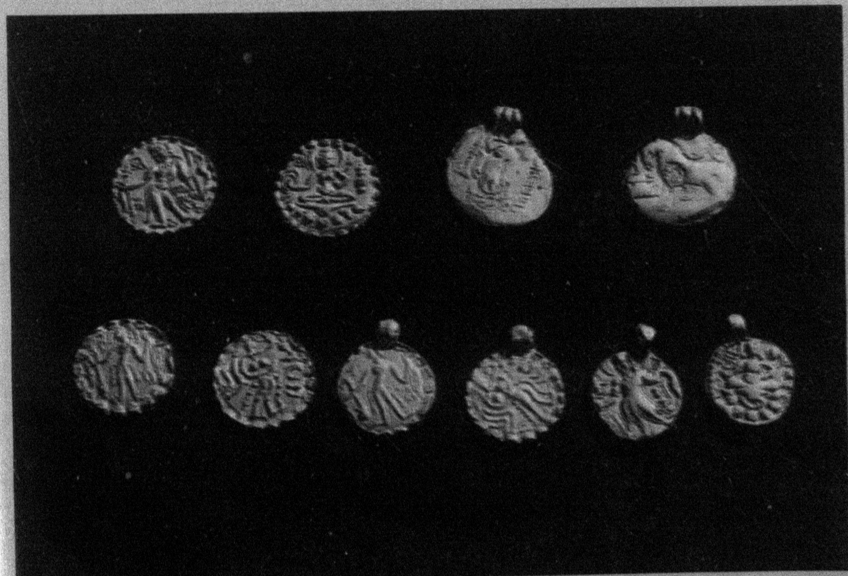


▲ স্টোন টুলস্, ময়নামতি

▼ স্বর্ণ মুদ্রা, ময়নামতি



বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ

জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী
১১ জগন্নাথবাড়ি রোড
আগরতলা - ৭৯৯০০১



▲ গোবিন্দ ভিটা, মহাস্থানগড়, বগুড়া

▼ গোকুল মেড়, বগুড়া



প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

প্রচ্ছদ বিন্যাস
ক্যাপস মাইক্রোগ্রাফিকস

প্রকাশক
দেবানন্দ দাম
জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী
১১ জগন্নাথবাড়ি রোড
আগরতলা - ৭৯৯০০১

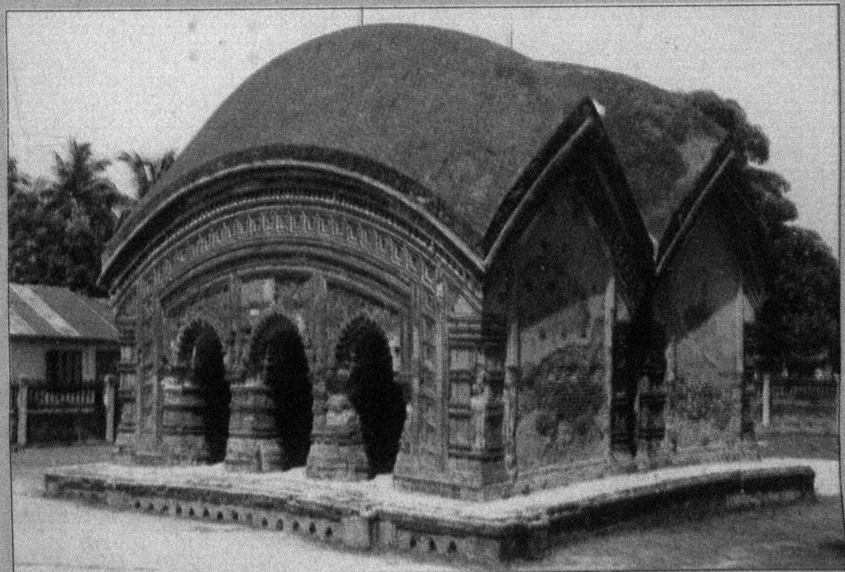
মুদ্রণ
জ্ঞান বিচিত্রা প্রেস
১১ জগন্নাথবাড়ি রোড
আগরতলা - ৭৯৯০০১, ত্রিপুরা

কলকাতা অফিস ও বিক্রয়কেন্দ্র
জ্ঞান বিচিত্রা
১৬ ডঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০০০৯
ফোন : (০৩৩) ২৩৬০৪৯৮১



▲ ষাট গম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট

▼ জোড় বাংলা মন্দির, পাবনা



সূচিপত্র



▲ রণ বিজয়পুর মসজিদ, বাগেরহাট

▼ কুসুম্বা মসজিদ, নওগাঁ

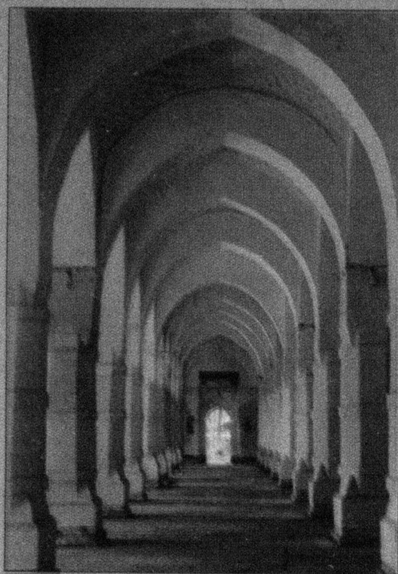




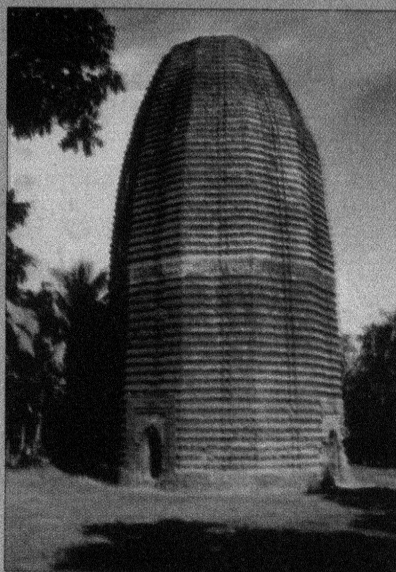
▲ খানজাহান সমাধি সৌধ, বাগেরহাট

▼ সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ-র মাজার, নারায়ণগঞ্জ



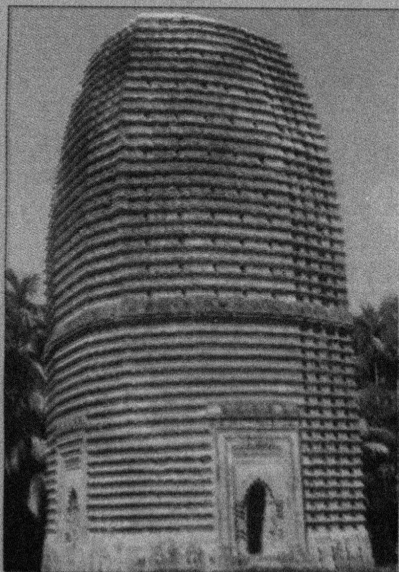


▲ ষাট গম্বুজ মসজিদের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য, বাগেরহাট



▲ মথুরাপুর দেউল, ফরিদপুর

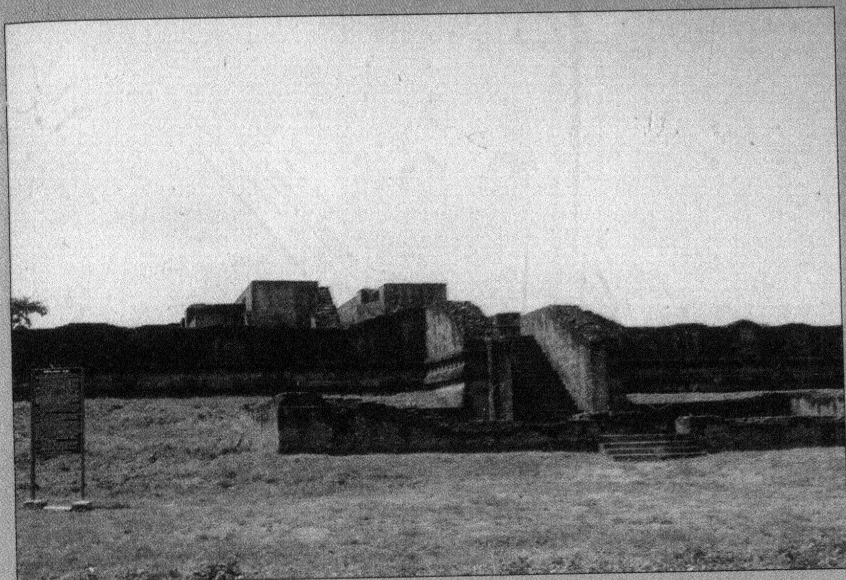
▼ কোদলা মঠ, বাগেরহাট



▼ যাত্রামনির মঠ, চাঁদপুর



তৃতীয় পরিচ্ছেদ



▲ ইটাখোলা মুড়া

▼ শালবন বিহার, ময়নামতি, কুমিল্লা

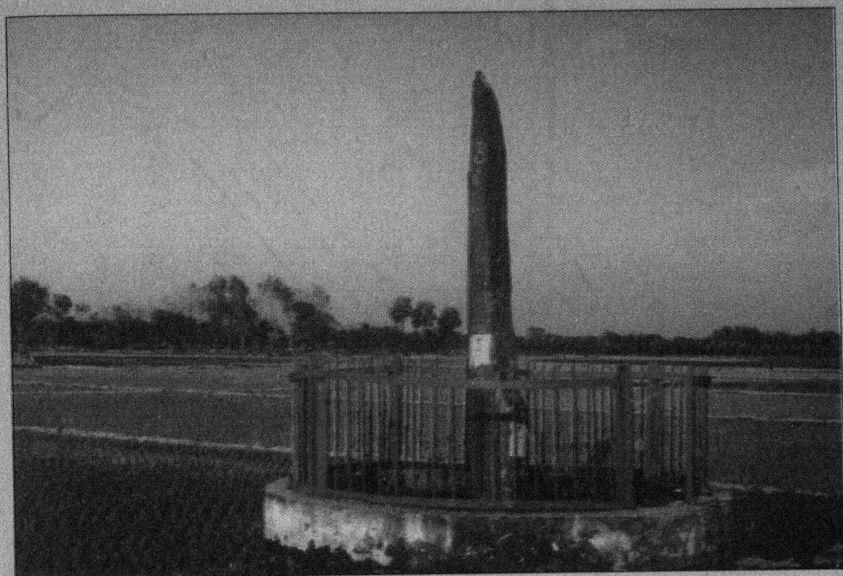




▲ রূপবান মুড়া, ময়নামতি। সংস্কারের পরে

▼ হরিশচন্দ্র রাজার বিহার, সাভার, ঢাকা





▲ গরুড় স্তম্ভ, মঙ্গলবাড়ি, নওঁগা

▼ মূর্তির মাথা, বগুড়া





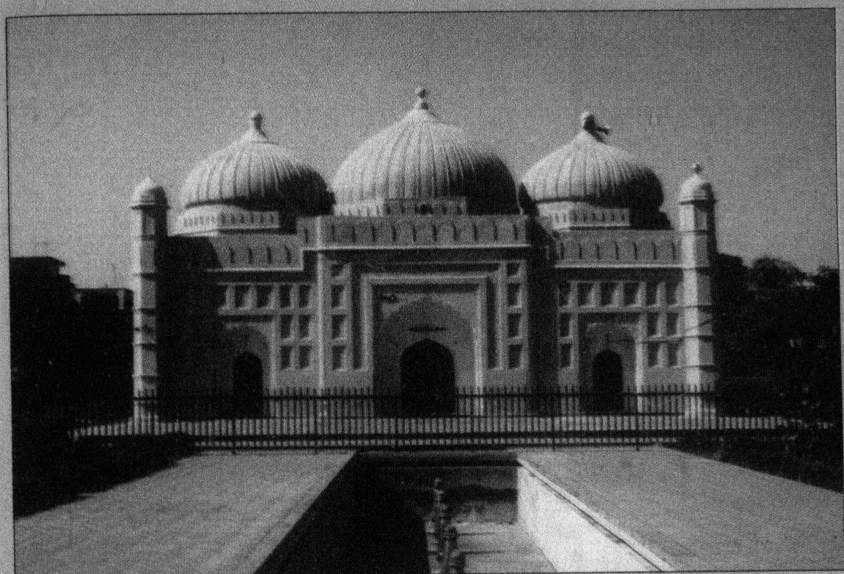
▲ বজ্রসত্ত্ব ভোজবিহার খননে প্রাপ্ত



▲ প্রস্তর মূর্তি পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, নওগাঁ

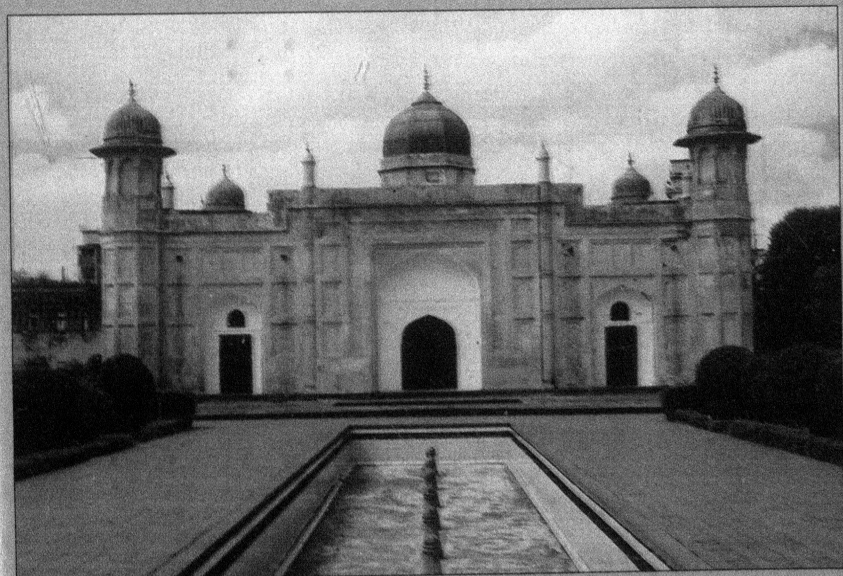
▼ ব্রাহ্মী লিপি, মহাস্থানগড়

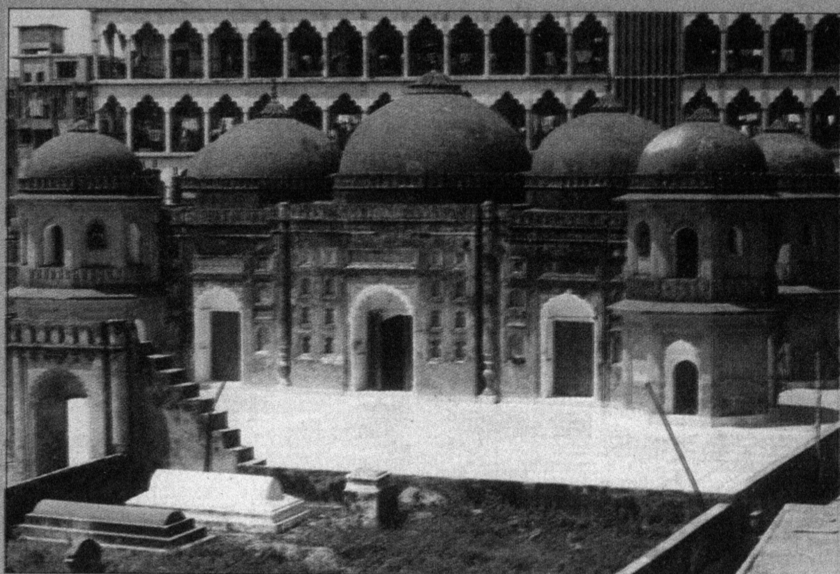




▲ লালবাগ দুর্গ মসজিদ, ঢাকা

▼ পরিবিবির মাজার, ঢাকা

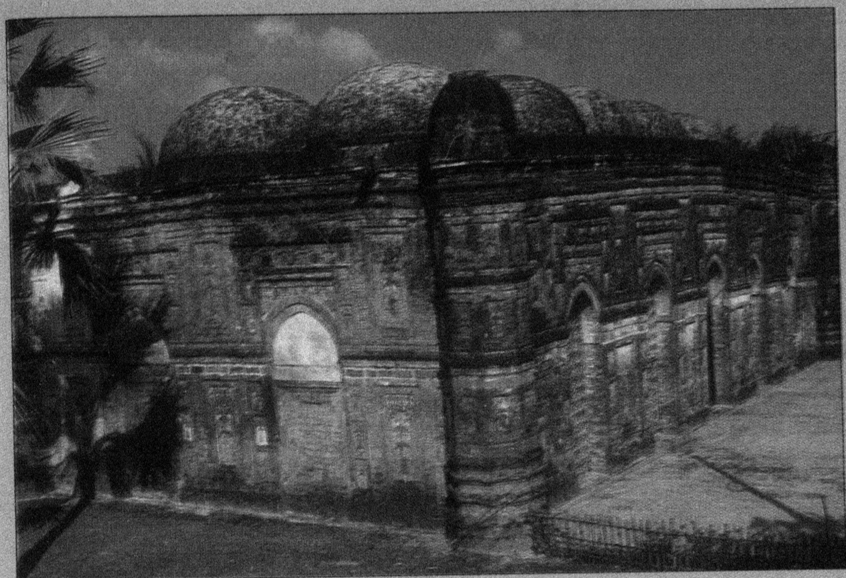




▲ সাত গম্বুজ মসজিদ, ঢাকা

▼ আতিয়া মসজিদ, টাঙ্গাইল





▲ বাঘা মসজিদ, রাজশাহী

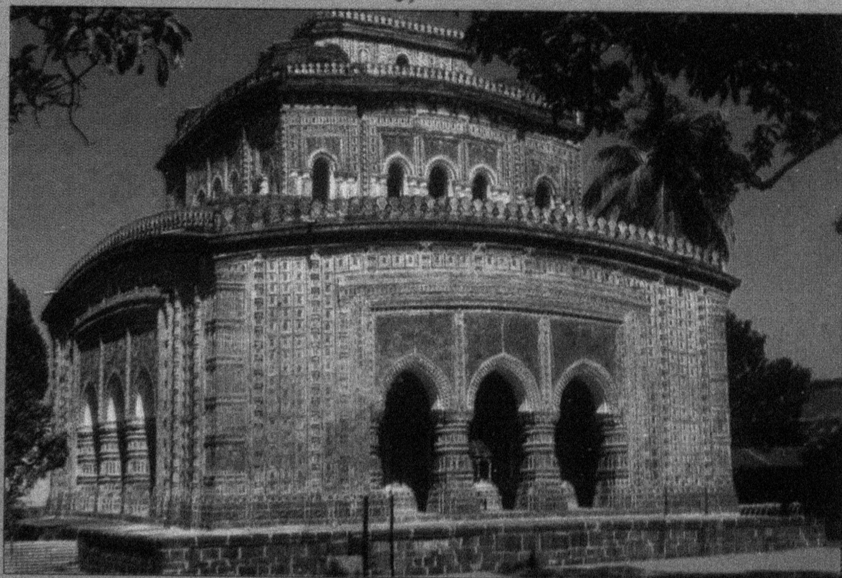
▼ ছোট সোনা মসজিদ, গৌড়, চাপাই নবাবগঞ্জ





▲ সোনাকান্দা দুর্গ, নারায়ণগঞ্জ

▼ কান্তনগর মন্দির, দিনাজপুর





▲ কোটিলামুড়া, ময়নামতি, কুমিল্লা

▼ কেন্দ্রীয় মন্দির, পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার, নওগাঁ



আলোকচিত্র ও নকশা



▲ ভরত ভায়না, যশোর

▼ ব্রোঞ্জ স্তুপা, ময়নামতি



প্রথম পরিচ্ছেদ
উপক্রমণিকা

ভূমি বিন্যাস

পদ্মা-যমুনা-করতোয়া-মেঘনা বিধৌত, সাগর-পর্বত পরিবৃত ও পুণ্ড্র-বঙ্গ-সমতট-হরিকেল এ চার প্রাচীন জনপদ নিয়ে গঠিত বর্তমান বাংলাদেশ উপমহাদেশের পূর্ব প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত। সুউচ্চ পর্বত দেশ থেকে অসংখ্য জলধারা হাজার হাজার বছর ধরে পলিমাটি বহন করে এদেশের পলিমাটির অঞ্চল গড়ে তুলেছে। ভূতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করতে গেলে বাংলাদেশের এই পলিমাটির অঞ্চলকে অপেক্ষাকৃত নবীন বলা চলে। কিন্তু তাই বলে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা নদীচরের মতো এর উৎপত্তি নয়। এই অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমি গড়ে উঠতেও সময় লেগেছে হাজার হাজার বছর তো বটেই, কোথাও কোথাও তা লক্ষ লক্ষ বছরও লেগেছে।

'বেঙ্গল ডেল্টা' (The Bengal Delta) নামে পরিচিত ভূ-ভাগের যে অংশ নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত, ডক্টর আহমদ হাসান দানীর মতে সেই অংশকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়।[১] যথা :

১. উত্তর-পশ্চিম বঙ্গ (North-West Bengal) অর্থাৎ উত্তর বঙ্গ,
২. উত্তর-পূর্ব বঙ্গ (North-East Bengal) অর্থাৎ ফরিদপুর জেলা ছাড়া ঢাকা বিভাগ, সিলেট বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগ এবং
৩. দক্ষিণ বঙ্গ (South Bengal) অর্থাৎ বৃহত্তর ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, পটুয়াখালী, খুলনা, যশোর ও কুষ্টিয়া জেলাসমূহ।

এই ভৌগোলিক বিভাগের কথা বাদ দিয়ে বাংলাদেশকে ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় এবং সেগুলি হচ্ছে, (ক) লাল মাটিতে গঠিত প্রাচীন ভূমি, (খ) পলিমাটিতে গঠিত মোটামুটি প্রাচীন ভূমি ও (গ) পলিমাটিতে গঠিত নিম্নভূমি।

ক. লাল মাটিতে গঠিত প্রাচীন ভূমি

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ স্থানে এবং বৃহত্তর ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় লাল মাটির অস্তিত্ব দেখা যায়। রাজশাহী জেলার পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চল, ঠাকুরগাঁও জেলায় বেশ কিছু অংশ ছাড়া বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার প্রায় সমগ্র অঞ্চল, রংপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরবর্তী বগুড়া জেলার প্রায় সমগ্র অঞ্চল ও

১. Prehistory and Protohistory of Eastern India, P. 5—Dr. A. H. Dani.

পাবনা জেলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল লালমাটিতে গঠিত। করতোয়া ও যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী দৃশ্যমান পলিমাটির অঞ্চল অতিক্রম করে ময়মনিসংহ ও টাঙ্গাইল জেলাদ্বয়ের মধুপুর অঞ্চলে আবার লালমাটির অস্তিত্ব দেখা যায়। সেই লালমাটি মধুপুর থেকে শুরু করে ভাওয়াল অঞ্চল অতিক্রম করে পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে বৃহত্তর ঢাকা জেলার বেলাবো থানায় অবস্থিত উয়ারী-বটেশ্বর নামক স্থান পর্যন্ত চলে গেছে। আবার তার আর একটি ধারা মধুপুর-ভাওয়াল থেকে দক্ষিণ মুখী হয়ে কালিয়াকৈর-সাভার অতিক্রম করে বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত ঢাকা নগরী পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে।

উয়ারী-বটেশ্বরের পরে পূর্ব বা দক্ষিণ দিকে অবস্থিত মোটামুটি নিম্নভূমিতে অনেক দূর পর্যন্ত লাল মাটির অস্তিত্ব আর চোখে পড়ে না। পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড় শ্রেণীর কথা বাদ দিলে লাল মাটির অস্তিত্ব দেখা যায় অনেক দক্ষিণে কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতি পাহাড় শ্রেণীতে এবং অনেক পূর্ব দিকে শ্রীহট্টের পাহাড়ী এলাকায়। লালমাই-ময়নামতির দক্ষিণে আবারও অনেক বিরতির পরে লাল মাটি দেখা যায় চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলে। ভূতাত্ত্বিকদের মতে লালমাটিতে গঠিত বাংলাদেশের এসব অঞ্চল অত্যন্ত প্রাচীন। প্রাচীন পলি মাটিতে গঠিত এই অঞ্চলের সঙ্গে মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে বলে তাঁদের অভিমত।[১]

ভারতের ছোটনাগপুর অঞ্চলে যে অতি প্রাচীন পার্বত্য মালভূমি আছে ভূতাত্ত্বিকদের মতে তা পশ্চিম বঙ্গের (ভারত) রাঢ় অঞ্চলের মধ্যে মূলত ও বাহ্যত প্রসারিত হয়েছে। তাঁদের মতে আবার তা-ই পুরাতন পলিমাটির আবরণের নিচে প্রসারিত হয়েছে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের লালমাটিতে গঠিত এলাকায়।[২]

---

১. Ibid, p. 51-এ সম্পর্কে মিঃ আর. ডি. ওলডহ্যাম (R.D. Oldham) বলেন,
"The older alluvium *(bhangar)* is usually composed of massive clay beds of rather pale, reddish brown colour, very often yellowish when recently exposed to the air, more or less *kankar* disseminated throughout. In places, and especially in Bengal and Bihar, pisolitic concretions of hydrated iron paroxide, from the size of a mustard seed to that of pea, are disseminated through the clay; occasionally these nodules attain larger dimensions some being found near Dinajpur of the size of pigeons' egg. In places *kankar* forms compact beds of earthy limestone. Sand, gravels and conglomerates occur, but are, as a rule, subordinate, except on the edges of the valley, the quantity of the sand in the clay decreasing gradually as the distance from the hills increases. Pebbles are scarce at a greater distance than from 20 to 30 miles from the hills bordering the plain. Beds of sandstone, sufficiently compact for building, have occasionally been found, but of rare occurrence. On the whole there is no great difference between the alluvial formation of the Indo-Gangetic plain and those of the Narmada and Tapti, except that the latter are rather darker in colour and perhaps less sandy."

২. Ibid map no. 7 (India and Pakistan, Structural Backgroud Showing Neoliths).

এতদিন পর্যন্ত এ সমস্ত প্রাচীন ভূমি, এমনকি গোটা বাংলাদেশের ভূতত্ত্ব নিয়ে তেমন কোনো ব্যাপক, গভীর ও ঐকান্তিক গবেষণা বা জরিপ কাজ করা হয়নি। ফলে এদেশের মাটির প্রাচীনতা সম্পর্কে কোনো সঠিক ধারণা করা সম্ভব হয়নি। ইদানীং কিছু কিছু জরিপ ও গবেষণার কাজ করার ফলে এ দেশের পূর্বাঞ্চলে প্রচুর গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং যাচ্ছে। উত্তরাঞ্চলের মাটির নিচে পাওয়া গেছে কয়লা ও নানা ধরনের পাথরের সন্ধান। ভবিষ্যতে এ দেশের মাটির নিচে আরও অনেক কিছু পাওয়া যাবে বলে ভূতাত্ত্বিকেরা আশাবাদী। এ সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের অস্তিত্ব বাংলাদেশের মাটির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সকল সন্দেহের অবসান ঘটিয়েছে।

খ. পলিমাটিতে গঠিত মোটামুটি প্রাচীন ভূমি

দোআঁশ মাটিতে গড়া মোটামুটি উঁচু এই পলিমাটির অঞ্চল বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। বৃহত্তর রাজশাহী জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, বৃহত্তর ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়ের অধিকাংশ অঞ্চল, বৃহত্তর রংপুর জেলার উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও মধ্যাঞ্চল, বগুড়া জেলার করতোয়া নদীর পূর্বতীরবর্তী কিছু অঞ্চল, বৃহত্তর পাবনা জেলার পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণ বঙ্গের বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও বৃহত্তর যশোর জেলাদ্বয়, বৃহত্তর খুলনা জেলার উত্তরাঞ্চল, বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বৃহত্তর বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলাদ্বয়ের বেশ কিছু অঞ্চল, বৃহত্তর ঢাকা জেলার কিছু কিছু অঞ্চল, টাঙ্গাইল জেলার কিছু অঞ্চল, জামালপুর জেলার অধিকাংশ অঞ্চল, ময়মনসিংহ জেলার অধিকাংশ অঞ্চল, বৃহত্তর শ্রীহট্ট জেলার বেশ কিছু অঞ্চল, কুমিল্লা জেলার পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চল, নোয়াখালী জেলার উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাদ্বয়ের বিভিন্ন পাহাড় শ্রেণীর মধ্যবর্তী অঞ্চল এই বিভাগের আওতাভুক্ত বলা যেতে পারে।

লাল মাটিতে গঠিত প্রাচীন ভূমির তুলনায় অপেক্ষাকৃত নবীন হলেও এসব অঞ্চল সাধারণত পানিতে ডুবে যায় না। বর্ষাকালে ভূমির চারদিকে আল বেঁধে এসব অঞ্চলের জমিতে চাষাবাদ করতে হয়

গ. পলিমাটিতে গঠিত নিম্নভূমি প্লাবন

বৃহত্তর রাজশাহী জেলার কিছু অংশ, বৃহত্তর রংপুর জেলার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, বগুড়া জেলার পূর্বাঞ্চলের সামান্য কিছু অংশ, পাবনা জেলার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, বৃহত্তর খুলনা জেলার দক্ষিণাঞ্চল, পটুয়াখালী ও বৃহত্তর বাখরগঞ্জ জেলার নিম্নাঞ্চল, বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ছাড়া প্রায় সমগ্র জেলা, বৃহত্তর ঢাকা জেলার পশ্চিম-দক্ষিণ, দক্ষিণ ও পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চল ছাড়া প্রায় সমগ্র জেলা, টাঙ্গাইল জেলার যমুনা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল, জামালপুর জেলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার পূর্বাঞ্চল, বৃহত্তর শ্রীহট্ট জেলার পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার উত্তর, দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিমাঞ্চল, বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার দক্ষিণ ও উত্তর-

পশ্চিমাঞ্চল এবং বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলার সমুদ্র তীরবর্তী সামান্য অংশ নিয়ে এ বিভাগ গঠিত। সাধারণ ভাষায় পূর্ব বঙ্গ বলতে বাংলাদেশের এই নিম্ন ভূমিকেই বোঝায়।

এই ভূমি অপেক্ষাকৃত নিম্ন। বর্ষাকালে এই নিম্ন ভূমি পানির নিচে চলে যায়। কোনো কোনো স্থানে দশ থেকে পনের ফুট এমন কি তার চেয়েও বেশি পানি হয়। এই নিম্নভূমিতেই সুবিধামত স্থানে মাটি ফেলে জমি উঁচু করে বসবাসের জন্য বাড়িঘর তৈরি করা হয়। বর্ষাকালে যখন মাঠ-ঘাট সব পানিতে ডুবে যায় অসংখ্য বৃক্ষরাজি পরিবৃত গ্রামগুলিকে দ্বীপের মত দেখায়। তখন একগ্রাম থেকে অন্য গ্রামে এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যেতে হলেও নৌকার প্রয়োজন হয়। বর্ষার পানিতে ভরা মাঠে থাকে সবুজ আমন ধান বা পাটের ক্ষেত। হেমন্তে পানি শুকিয়ে গেলে চাষীরা ধান কেটে ঘরে আনেন। তারপর সারা অঞ্চল শুকিয়ে খন্‌খনে হয়ে যায়। পানি থাকে শুধু নদী-নালা ও পুকুর-ডোবাতে। প্রতি বছর পলি মাটি পড়ে এই জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় এবং প্রচুর ফসল জন্মে এই নিম্ন ভূমিতে। ফলে শত অসুবিধা সত্ত্বেও এখানে অসংখ্য লোক বাস করেন এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে ঘন বসতি অঞ্চল এই নিম্নভূমি বা প্লাবন ভূমি।

উপসংহার

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, বাংলাদেশের লালমাটির অঞ্চল বহু কাল আগে থেকেই অস্তিত্ববান ছিল। জঙ্গলঘেরা এই লালমাটি অঞ্চলের চারদিকে ছিল জলাভূমি। নানা শ্রেণীর জীবজন্তুর নিবাস ছিল এই অরণ্যময় ভূমিতে, আর নিকটবর্তী জলা ভূমিতে বাস করত অসংখ্য জলজ প্রাণী। কালক্রমে পর্বতদেশ হতে আগত পলিমাটি পড়ে পড়ে চারদিকের নিম্নভূমি জেগে ওঠে। সেই সব জেগে ওঠা ভূমিও স্থলচর জীবজন্তুর বাসস্থানে পরিণত হয়। এরি মধ্যে উঁচুভূমিতে মানুষের অধিবাসও গড়ে ওঠে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বন্য জীব-জন্তুর সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই করে মানুষ বসতি বিস্তার করতে থাকেন। লালমাটির অপেক্ষাকৃত উঁচু ভূমির ধারে-পাশে গড়ে ওঠা নিম্নভূমির আয়তন ক্রমেই বাড়তে থাকে এবং মানুষও সেই সব ক্রমবর্ধমান অঞ্চলে বসতি বিস্তারে তৎপর হয়ে উঠেন। এই নিম্নভূমি গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া আজও চলে আসছে। বড় বড় নদীর বুকে ও উপকূলবর্তী সমুদ্র এলাকায় আজও গড়ে উঠছে নতুন নতুন চর।

জনবসতি

প্রাগৈতিহাসিক কাল

বাংলাদেশের আদিম অধিবাসী কারা ছিলেন সে সম্পর্কে পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। 'দীর্ঘশীর' (dolichocephalic), 'মধ্যম শীর' (mesocephalic) ও 'প্রশস্তশীর' (brachycephalic)-এর বিভিন্ন ধরনের মস্তক; উঁচু ও তীক্ষ্ণ এবং চ্যাপ্টা ও বিস্তৃত (platyrrhine) ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের নাসিকা; গৌর, উজ্জ্বল শ্যাম, পীত, বাদামী ও কাল গাত্রবর্ণবিশিষ্ট যে বিভিন্ন ও মিশ্র ধরনের মানুষের অস্তিত্ব বাংলাদেশের

প্রায় সর্বস্তরে দেখা যায়, তাদের উৎপত্তি সম্পর্কে পণ্ডিত মহলের অভিমত ছিল যে, আদি অস্ট্রেলীয় (proto-Austroloid) রক্তধারার সঙ্গে প্রথমে আলপাইন (Homo Alpinas) রক্তধারা ও পরে অন্যান্য রক্তধারার সংমিশ্রণ ঘটার ফলে এই মিশ্রিত বাঙালি জাতির সৃষ্টি হয়েছিল। ইদানীং পণ্ডিত মহলে এ ধারণার বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। বর্তমান কালে অধিক প্রচলিত মতবাদ হচ্ছে এই যে, বাঙলার আদিম অধিবাসীরা ছিলেন 'ভেড্ডিড্' বা 'ভেড্ডাপ্রতিম' নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এদের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল একটু বেশি রকমের লম্বা মাথার গড়ন, চওড়া নাক, মিশমিশে কাল গায়ের রঙ এবং বেঁটে খাট বা মধ্যম আকৃতি।

শুধু বাঙলায়ই নয়, উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে এই ভেড্ডিড্ নরগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল। ভারতের বাইরে আরব, আফগানিস্তান, মালয়েশিয়া, সুমাত্রা, জাভা, ইন্দোচীন, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশেও এ নরগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল বলে পণ্ডিতদের অভিমত। দক্ষিণ ভারতে ও উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে যাদেরকে তথাকথিক দ্রাবিড় বলে আখ্যায়িত করা হয় তারাও নাকি ছিলেন এই ভেড্ডিড্দেরই রক্তসম্ভূত। এ প্রসঙ্গে পণ্ডিতেরা আরও বলেন যে, দ্রাবিড় কোনো নরগোষ্ঠীর নাম নয়, এটি একটি ভাষা গোষ্ঠীর নাম।

বাঙালি জাতির সর্বস্তরে যে কমবেশি ভেড্ডিড্ রক্তধারার অস্তিত্ব আছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, মালপাহাড়ী, ভূমিজ প্রভৃতি আদিবাসীদের মধ্যে এ রক্তধারা (কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রায় অবিমিশ্রভাবে) আজও বয়ে চলেছে। বাঙালি নিম্নবর্ণের হিন্দু বিশেষ করে পোদ, বাগ্দী, বাউরী, চণ্ডাল, নমঃশূদ্র কৈবর্ত প্রভৃতি প্রজাতির মধ্যে এ রক্তধারার প্রচুর অবদান এখনও টিকে আছে। এমনকি বাঙালি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উঁচু বর্ণের হিন্দুদের মধ্যেও কমবেশি এ রক্তধারার উপাদান পরিলক্ষিত হয় বলে পণ্ডিতদের অভিমত।[১]

বাঙালি মুসলমানের দেহেও এ রক্তধারার যথেষ্ট উপাদান আছে। এ প্রসঙ্গ বাংলাদেশে মুসলমানের আগমন ও বসতি সম্পর্কে আলোচনাকালে কিঞ্চিৎ পরে আলোচিত হয়েছে।

এই ভেড্ডিড্ নরগোষ্ঠী কতকাল আগে থেকে এদেশে বসবাস করে আসছে সে সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এদের বা অন্য কারোর কোনো অশ্মীভূত নরকঙ্কালও এদেশে আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। তবে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, অন্তত শেষ হিমযুগের পর থেকেই এরা এদেশে বসবাসরত ছিলেন এবং এর পরে এদেশ আর জনশূন্য থাকেনি।

এই ভেড্ডিড্দের সঙ্গে প্রাগ-ঐতিহাসিক কালে আরও কোনো রক্তধারার সংমিশ্রণ ঘটেছিল কিনা এবং ঘটে থাকলে সেটি কোন রক্তধারা ছিল সে সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। একমতে আর্য অর্থাৎ আদি নর্ডিকদের (proto-Nordic) আগমনের পূর্বে আলপাইন (Homo Alpinas) নামক এক গোলমুণ্ড নরগোষ্ঠী ভারতের

১. বাঙালির ইতিহাস, ৪১ পৃ., ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় এবং ঐ, সম্পাদক সুভাস মুখোপাধ্যায় ২ পৃ.।

পূর্বাঞ্চলে আসে এবং ভেড্ডিড্ রক্তধারার সঙ্গে মিশে যায়। গোলমুণ্ড তীক্ষ্ণ নাসিকা ও মধ্যম আকৃতি বিশিষ্ট ছিল এ নরগোষ্ঠী।

ইদানীং এ মতও সকলের কাছে গৃহীত হয়নি। কেউ কেউ বলেন যে, শকপামিরীয় জাতির আগমনের ফলে ভেড্ডিড্ রক্তধারার সঙ্গে তাদের রক্তধারা মিশে গিয়ে এক সংকর জাতির সৃষ্টি হয়। এই শকজাতির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল দেহের মাঝারি গড়ন, চওড়া গোল মাথা, মাথার পিছন দিকে চ্যাপ্টা খাড়াই, লম্বা নাক ও ঈষৎ পীতাভ চোখ। এ মত ও অনেকের কাছে গ্রহণীয় নয়। তাঁদের মতে এ রক্তধারার আগমন ঘটেছিল আর্য বা আদি নর্ডিকদের আগমনের পরে। এরা যে উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল এ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে বিশেষ মতভেদ নেই। তঁদের মতে উঁচু বর্ণের হিন্দুদের দেহ গঠনে এদের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

ঐতিহাসিক যুগ

আর্য বা আদি নার্ডিক জাতি

আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন কি চার হাজার বছর আগে পূর্ব ইউরোপ থেকে একটি নরগোষ্ঠীর এক বৃহৎ দলের আগমন ঘটে এই উপমহাদেশে। বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৃষ্টিকর্তা এই নর গোষ্ঠীকে আর্য বা আদি নর্ডিক (Proto-Nordic) বলা হয়ে থাকে। দীর্ঘ, সুদৃঢ় ও সুগঠিত মুখাবয়ব, সংকীর্ণ ও সুউন্নত নাসিকা, দীর্ঘ ও ঈষৎ গোলাকার মুণ্ড, দৃঢ় চোয়াল, বাদামী অথবা ঘনকৃষ্ণ কেশদাম, দেহের গৌর বর্ণ, উন্নত ললাট, কটা চক্ষু ও দীর্ঘদেহ বিশিষ্ট এ নর গোষ্ঠীর রক্ত ধারার প্রভাব উত্তর ভারত ও পাকিস্তানের কোনো কোনো অঞ্চলে যতটা পড়েছিল সে তুলনায় বাংলাদেশে তাদের প্রভাব ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। বিভিন্ন রক্তধারার সংমিশ্রণে যে-বাঙালি জাতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে আদি নর্ডিক জাতির প্রভাব ছিল সামান্য একটি প্রলেপ মাত্র। এ সম্পর্কে ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় বলেন, "পরবর্তীকালে আগত আর্য ভাষাভাষী আদি নর্ডিক নরগোষ্ঠীর রক্তপ্রবাহ ও সংস্কৃতি তাহার উপরের স্তরে একটি ক্ষীণ প্রবাহ মাত্র এবং এই প্রবাহ বাঙালির জীবন ও সমাজের গভীর মূলে বিস্তৃত হইতে পারে নাই।"[১]

শক জাতি

পণ্ডিতদের মতে আদি নার্ডিকদের আগমনের পরে পরেই খুব সম্ভব পূর্ব বর্ণিত শক জাতির আগমন ঘটে। তারা যে পূর্ব ভারত তথা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল সেকথা আগেই বলা হয়েছে। নৃতাত্ত্বিকদের মতে উঁচু বর্ণের হিন্দুদের দেহাবয়ব গঠনের পিছনে আছে এই শক জাতির রক্তধারার অবদান। সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী

কোনো কোনো পণ্ডিতের ধারণা, মোঙ্গোলীয় রক্ত ধারার যে সমস্ত উপাদান বাঙালির দেহে পরিলক্ষিত হয় সেগুলির সংযোজন ঘটেছিল বহু প্রাচীন কালে, শক রক্তধারারও

১. প্রাগুক্ত, ৪৩ পৃ.। ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়।

আগে। চ্যাপ্টা নাক, বঙ্কিম চক্ষু, উদ্দণ্ড কেশ, উন্নত গণ্ডাস্থি, কেশবিহীন দেহ, কেশ বিরল মুখ-মণ্ডল, চ্যাপ্টা মস্তক, পীতাভ গায়ের বর্ণ ও বেঁটেখাট দেহের অধিকারী এ নরগোষ্ঠীর রক্তধারার বেশ কিছু প্রভাব যে বাঙালির মধ্যে আছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু সেই প্রভাব খুব প্রাচীন নয়। অবশ্য বাংলাদেশের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রায় অবিমিশ্র রক্তধারা বহনকারী বিভিন্ন মোঙ্গোলীয় কৌমের অস্তিত্ব দেখা যায়। এদেশের জলবায়ুর প্রভাবে তাদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন দেখা দিলেও মোঙ্গোলীয় রক্তধারাটি যে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান তা অতি সহজেই ধরা পড়ে। বৃহত্তর দিনাজপুর-রংপুর অঞ্চলের কোচ-মেচ-পলিয়া-রাজবংশী-বর্মণ প্রভৃতি, ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল অঞ্চলের গারো-হাজং প্রভৃতি, শ্রীহট্ট অঞ্চলের মণিপুরী, বরিশাল-পটুয়াখালির দক্ষিণাঞ্চলের মগ এবং চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের চাকমা, মঙ, বোমঙ, মোরঙ, মগ, ত্রিপুরা প্রভৃতি বিভিন্ন কৌমের উল্লেখ করা যেতে পারে।

মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার প্রভাব এ সমস্ত বিভিন্ন কৌমের মধ্যে দেখা যায়। এরা আবহমান কাল থেকে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য প্রায় অক্ষুণ্ন রেখে সাধারণ বাঙালি সমাজ থেকে সংস্কৃতি ও সমাজগতভাবে কিছুটা ভিন্নভাবেই জীবনযাপন করে আসছেন। নৃতত্ত্বের দিক থেকে এরা এক স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। কিন্তু এই স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন কৌমগুলির কথা বাদ দিলেও সাধারণ বাঙালি বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসী হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে বেশ কিছু মোঙ্গোলীয় প্রভাব দেখা যায়।

এই মোঙ্গোলীয় রক্তধারার প্রভাব খুব প্রাচীন ঘটনা বলে ধরা যেতে পারে না। উত্তর ও পূর্ব প্রত্যন্ত অঞ্চলের পাহাড়ী এলাকায় এদের বসবাস বহু প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে, একথা স্বীকার করে নিলেও, বাঙলার সমতল ভূমিতে এদের আবির্ভাব খুব প্রাচীন ঘটনা নয়। তদুপরি বাংলাদেশের সমতল ভূমিতে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর আগে এদের কোনো রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতাধিপতি স্রং-সান গ্যাম্পো (Srong-Tsan Gampo) স্বল্প সময়ের জন্য বাঙলার উত্তরাঞ্চল অধিকার করে ছিলেন বলে জানা যায়। এর পরেই খুব সম্ভব উত্তর বঙ্গের জনবিরল ও জংগলাকীর্ণ সমতলভূমিতে মোঙ্গোলীয়দের বসতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু তাদের অবস্থান মোটামুটিভাবে সীমান্তবর্তী অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে, তারা দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেননি। এবং সেই অবস্থা বর্তমান কালেও দেখা যায়। গারো-হাজং, চাকমা-মঙ-বোমঙ, মগ প্রভৃতিরাও এখন পর্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলেরই অধিবাসী। বাঙলায় মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর আগমন সম্পর্কে ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় বলেন, "আর্যদের ভারতাগমনের পূর্বে, আর্যভাষা বিস্তৃতি লাভের আগে, বাংলা, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর পর্যন্ত মোঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর লোকেরা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, ইতিহাসে এমন কোনও প্রমাণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।"[১]

বাংলাদেশের মাটিতে মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর আবির্ভাব অংশত পরবর্তীকালে ঘটে থাকলেও সাধারণ বাঙালির দেহে যে মোঙ্গোলীয় রক্তধারার বেশ কিছু উপাদান আছে সে

১. প্রাগুক্ত, ৩৯ পৃ.। ডঃ নীহার রঞ্জন রায়

কথা আগেই বলা হয়েছে। এর পিছনে একটি অতি সঙ্গত কারণ আছে। বাঙলার সীমানার বেশ কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত মোঙ্গোলীয় অধ্যুষিত অঞ্চলে অতি প্রাচীন কাল থেকেই বহু সামরিক অভিযান এদেশ থেকে চলেছিল বলে জানা যায়। প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ করে ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিক পর্যন্ত বারবার এ সমস্ত অভিযান চলেছে। সে সব অভিযান ও অধিকারের সময় বৈবাহিক ও অন্যান্য সূত্রে বিভিন্ন রক্তধারার সংমিশ্রণ অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। তার উপর ছিল ক্রীতদাস ও দাসীর ক্রয়-বিক্রয়ের প্রথা। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ইংরেজ আমলের প্রথম দিকেও এ প্রথা চালু ছিল এবং বাংলাদেশে বহু মোঙ্গোলীয় ক্রীতদাস ও দাসী আমদানি হত। এদের রক্তধারা ক্রমে ক্রমে বাঙালির রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে, এ ধারণা অত্যন্ত যুক্তিসহ।

গ্রীক, হূন প্রভৃতি

ইতিহাস যুগের গোড়ার দিকে উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল মহাবীর আলেকজাণ্ডার কর্তৃক অধিকৃত হলে গ্রীক রক্তধারার বেশ কিছু প্রভাব সেই অঞ্চলে পড়ে। তবে সেই প্রভাব বাঙলার সীমানার বাইরেই থেকে যায়। পরবর্তীকালে হূন, চের, খস প্রভৃতিদের রক্তধারার যে প্রভাব উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল সহ অন্যান্য অঞ্চলে পড়ে, তাও বাঙলার অভ্যন্তরে খুব সক্রিয়ভাবে প্রবেশ করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তুর্কী অধিকার ও মুসলমান

ত্রয়োদশ শতাব্দীর একদম প্রথম দিকে (১২০৫ খ্রীঃ) তুর্কী সমরনায়ক ইখতিয়ার উদ্-দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী কর্তৃক লখনৌতি (গৌড়) রাজ্য তথা বাঙলায় সর্বপ্রথম মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা করার পর ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত এদেশে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সুদীর্ঘ প্রায় সাড়ে পাঁচশ' বছরের সময়ের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র ও বিশেষ সত্তার অধিকারী হিসাবে এদেশের মুসলমানের অস্তিত্ব চোখে পড়ে। রাজশক্তির প্রভাব ও অন্যান্য কারণে এদের সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পেতে থাকে। তুর্কি, ইরানি, আফগান, আরব, মোঘল, পাঠান, হাবসী প্রভৃতি বিভিন্ন রক্তের অধিকারী বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান প্রথম থেকেই এদেশে বসতি স্থাপন করেন এবং পরবর্তীকালেও এ ধারা চলতে থাকে; রাজা, রাজকর্মচারী, আমির-ওমারা, ধনিক, বণিক, সৈনিক, ধর্ম-প্রচারক, আলেম-ওলেমা প্রভৃতি নানা ধরনের লোক ছিলেন এই বসতি স্থাপন কারীদের মধ্যে। বৈবাহিক সূত্রে এদের অনেকের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং তার ফলে বিভিন্ন রক্তধারার সংমিশ্রণ ঘটে। এই সঙ্গে ধর্মান্তরিত স্থানীয় অধিবাসীদের প্রশ্নও এখানে আছে। মুসলিম অধিকারের প্রথম দিকেই নানাবিধ সামাজিক ও মানবিক সমস্যা জর্জরিত স্থানীয় অধিবাসীদের এক বিপুল অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল বলে জানা যায়। এদের মধ্যে ছিল নাথ ও অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। কালক্রমে এই নবদীক্ষিত মুসলমানের সঙ্গেও বহিরাগত মুসলমানের সম্পর্ক স্থাপিত হয় বৈবাহিক সূত্রে। এ সমস্তের ফলে বিভিন্ন রক্ত ধারায় গঠিত মুসলিম জাতিও এক সংকর জাতিতে পরিণত হয়।

উপসংহার

উপরের আলোচনা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, অসংখ্য রক্তধারার সংমিশ্রণে বাঙালি জাতি গড়ে উঠেছে। আদিতে ভেড্ডিড নরগোষ্ঠীর অধিবাস ছিল এই দেশের মাটিতে। তারপর আলপাইন, আর্য, শক, মোঙ্গোলীয়, আরব, তুরকি, মোঘল, পাঠান, হাবসি ও কিছু কিছু ইউরোপীয় রক্তধারার আগমন ও সংমিশ্রণ ঘটে। বহু রক্তধারার সংমিশ্রণের ফলে বাঙালি এক অভিনব সংকর জাতিতে পরিণত হয়।

ইতিহাস

প্রাচীন যুগ

বাঙলার প্রাচীন যুগের ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। বেদাদি গ্রন্থে বাঙলা সম্পর্কে কোনো উল্লেখ দেখা যায় না। ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থের 'বয়াংসিবঙ্গাবগধাশ্চের পাদাঃ'[১] উক্তি খুব সম্ভব বাঙলা সম্পর্কে প্রাচীনতম উল্লেখ। এতে দেখা যায় যে, ভারতীয় আর্যগণ বঙ্গ, বগধ (মগধ?) ও চের দেশের অধিবাসীদেরকে পক্ষীবৎ জ্ঞান করতেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বঙ্গের উল্লেখ না থাকলেও সেখানে বাঙলারই এক অংশ পুণ্ড্রের উল্লেখ দেখা যায়। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে আরট্ট, সৌবীর, কলিঙ্গ প্রভৃতি জনপদের সঙ্গে পুণ্ড্র ও বঙ্গের উল্লেখ দেখা যায় অত্যন্ত তুচ্ছার্থে। এ গ্রন্থের রচনা কাল নিয়ে মতভেদ আছে।

প্রাচীন জৈন গ্রন্থ আচারঙ্গ সূত্রে মহাবীর জৈনের (আনুমানিক খ্রি. পূ. ষষ্ঠ শতাব্দী) রাঢ় দেশে ভ্রমণ সম্পর্কে যে গল্পটি পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে, সে দেশে তিনি ধর্ম প্রচার করতে এলে ঐদেশের অধিবাসীরা তাঁর প্রতি কুকুর লেলিয়ে দেন এবং তাঁর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেন। এতে তিনি তাদেরকে নাকি রূঢ় বলে আখ্যায়িত করেন এবং একথা থেকে নাকি এ অঞ্চলের নাম হয় রাঢ় দেশ। আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প গ্রন্থে গৌড়, পুন্ড্র, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি জনপদের উল্লেখ আছে। এ গ্রন্থ অবশ্য অনেক পরবর্তী কালের রচনা।

বিভিন্ন পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে বঙ্গ জনপদের উল্লেখ দেখা যায়। মহাভারত, মৎস্য ও বায়ুপুরাণে বর্ণিত একটি গল্পে দেখা যায় যে, দীর্ঘতমা নামক একজন আর্য ঋষি অন্ধ ও বৃদ্ধ হয়ে পড়লে আর্য রমণীগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। এক ভেলায় করে তাঁকে ভাসিয়ে দেওয়া হলে গঙ্গার ভাটি স্রোত ধরে তিনি অসুর বলি রাজার রাজ্যে উপস্থিত হলে বলি রাজার পুত্রহীনা স্ত্রী সুদেষ্ণা তাঁকে পুত্র উৎপাদনের জন্য নিয়োগ করেন। তাঁর ঔরসে ও সুদেষ্ণার গর্ভে বলি রাজার অংগ, কলিংগ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও বংগ নামক পাঁচজন পুত্র সন্তান হন। কালক্রমে তাঁদের নামানুসারে গঠিত তাঁদের পাঁচটি রাজ্যের অধিপতি করা হয়। এই পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে অংগ বিহার, কলিংগ উড়িষ্যা ও সুহ্ম পশ্চিম বংগের (ভারত) অংশ বলে পরিচিত। বংগ ও পুণ্ড্রকে বাংলাদেশের অংশ

১. "ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায় মায়ং স্তানী মানী বয়াংসি বঙ্গা বগধাশ্চের পাদান্যন্যা অকার্মভিতো বিমিশ্র ইতি।'—ঐতরেয় আরণ্যক ২/১/১/"—বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ১৩ পৃ. ১৪ পাদটীকা। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশেষ বলে চিহ্নিত করা হয়। এই গল্প এবং মহাভারত ও পুরাণে বংগ ও পুণ্ড্র সম্পর্কে অন্যান্য উক্তিতে এ দুটি জনপদ সম্পর্কে অবজ্ঞার ভাব পরিলক্ষিত হয়।

জরাসন্ধের মৃত্যুর পর মহাবীর কর্ণ এ পাঁচটি জনপদ অধিকার করে একটি যুক্তরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে মহাভারতে বর্ণিত আছে। মহাভারতে আরও বর্ণিত আছে যে, পুন্ড্ররাজ বাসুদেব ছিলেন এক পরাক্রান্ত নৃপতি। শ্রীকৃষ্ণ ও দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন তাঁকে পরাজিত ও নিহত করেন। পুন্ড্ররাজকে পরাজিত করার পর ভীম তাম্রলিপ্ত, সুহ্মদেশ ও বংগ দেশের রাজাদেরকে পরাজিত করেন বলেও মহাভারতে উল্লেখ আছে।

রামায়ণে বঙ্গ রাজ্য সম্পর্কে যে উল্লেখ আছে তাতে একটু শ্রদ্ধার ভাব পরিলক্ষিত হয়। অযোধ্যাপতি অঙ্গ, মগধ, কাশী, মৎস্য, কোশল ও বঙ্গরাজ্য জয় করেছিলেন এবং বঙ্গ সমেত এ সমস্ত জনপদে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন বলে রামায়ণে উল্লেখ আছে।

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের এ সমস্ত কাহিনীর মধ্যে সত্য কতটুকু আছে তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। এ সমস্ত কাহিনীতে সত্যের চেয়ে গল্পই বেশি অথবা এ গুলি পুরাপুরিই গল্প এমন একটা ধারণা খুব অযৌক্তিক বলে মনে হয় না। এ সমস্ত কাহিনীকে ভিত্তি করে কোনো প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করা যায় না।

বাঙলার প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে সামান্য হলেও কিছু কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় গ্রিক ও ল্যাটিন ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে। প্রাচীন গ্রিক ও ল্যাটিন ঐতিহাসিকগণ মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান (খ্রি. পূ. ৩২৭) সম্পর্কে যে বিস্তৃত বর্ণনা রেখে গেছেন, তাতে বাঙলা সম্পর্কেও কিছু কিছু উক্তি আছে। তাঁদের বিবরণ থেকে উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত 'গণ্ডরিডই' বা 'গঙ্গরিডই' (Gandaridai or Gangaridai) ও 'প্রাসিওই (Prasioi) নামক দুটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। পেরিপ্লাস গ্রন্থ ও টলেমির বিবরণ থেকে জানা যায় যে, 'গঙ্গে' (Gange) নগরী ছিল গঙ্গরিডই রাজ্যের প্রধান নগর ও সমুদ্র বন্দর এবং 'পালিবথরা' (palibothra) ছিল প্রাসিই বা প্রাচ্য রাজ্যের রাজধানী।

পালিবথরা যে পাটলিপুত্র (বর্তমান পাটনা) তা পণ্ডিতমহলে স্বীকৃত। গঙ্গে নগরীর সন্ধানও পাওয়া গেছে এবং তা হচ্ছে পশ্চিম বঙ্গের (ভারত) চব্বিশপরগনা জেলায়। কিছুকাল আগে দেগঙ্গা বা দ্বিগঙ্গার নিকটবর্তী চন্দ্রকেতু গড়ে (বেড়াচাম্পা) উৎখনন কার্য চালিয়ে প্রায় ২ বর্গ মাইল স্থান জুড়ে যে প্রাচীর বেষ্টিত প্রাচীন নগরী আবিষ্কার করা হয়েছে তাকেই পণ্ডিত মহল প্রাচীন গঙ্গে নগরী বলে চিহ্নিত করেছে।[১]

গঙ্গরিডই রাষ্ট্র সম্পর্কে একজন গ্রিক ঐতিহাসিক লিখে গেছেন, "ভারতবর্ষে বহু জাতির বাস। তন্মধ্যে গংগরিডই জাতিই সর্বশ্রেষ্ঠ (অথবা সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী)। ইহাদের চারি সহস্র বৃহৎকায় সুসজ্জিত রণহস্তী আছে; এই জন্যই অপর কোন রাজা এই দেশ জয় করিতে পারেন নাই। স্বয়ং আলেকজাণ্ডারও এই সমুদয় হস্তীব বিবরণ শুনিয়া এই জাতিকে পরাস্ত করার দুরাশা ত্যাগ করেন।"[২]

১. যশোহর খুলনার ইতিহাস, পরিশিষ্ট গ, ৪৬৭ পৃ.—সতীশ চন্দ্র মিত্র।
বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৯ পৃ.—ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার।

এই গঙ্গরিডই রাজ্যের সীমানা নির্দেশ করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন যে, পশ্চিম দিকে ভাগীরথী ও পূর্বদিকে পদ্মা (গঙ্গা) এই দুই নদীর সীমানার মধ্যে অবস্থিত ছিল এ রাজ্য। এই সংকীর্ণ ভৌগোলিক পরিধির মধ্যে এত বড় পরাক্রান্ত রাষ্ট্রকে সীমাবদ্ধ রাখা খুব সঙ্গত ধারণা বলে মনে হয় না। খুব সম্ভব সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গ, রাঢ় অঞ্চল ও পুন্ড্র রাজ্যের অধিকাংশ ভূভাগ নিয়ে গঠিত ছিল এই শক্তিশালী রাজ্য।

ঔগ্রসৈন্য বা উগ্রসেনের (Agrammes or Xandrammes) পুত্র বলে বর্ণিত গঙ্গরিডই-এর এই পরাক্রমশালী নৃপতি জাতিতে শূদ্র ছিলেন বলে জানা যায়। ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার ও ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় মনে করেন যে, শূদ্র বংশজাত মৌর্যরাজ মহাপদ্ম নন্দ বা তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত কেউ ছিলেন এই নৃপতি। প্রমাণের অভাবে এ সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছু বলা কঠিন। তবে মগধে অবস্থিত পাটলিপুত্র নগরে প্রাচ্য রাজ্যের রাজধানী থাকার বর্ণনা দেখে ধারণা করা যেতে পারে যে, গঙ্গরিডই রাজ্যের এ রাজা ছিলেন একজন ভিন্ন নৃপতি এবং তিনি ছিলেন খুব সম্ভব একজন বাঙালি।

আর্যদের আগমন এ উপমহাদেশে কখন ঘটেছিল সে সম্পর্কে কোনো নির্ভর যোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেউ কেউ অনুমান করেন যে, আজ থেকে সাড়ে তিন কি চার হাজার বছর আগে এ ঘটনা ঘটেছিল। দুর্ধর্ষ আর্যরা আর্যাবর্ত অর্থাৎ উত্তর ভারতে প্রথম দিকেই তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়েছিলেন বলে ধারণা করা যায়। কিন্তু বাঙলার দ্বারে এসে তাঁদের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়। অসংখ্য নদনদী, খাল-বিল পরিবৃত এই দেশটা তারা সহজে জয় করতে পারেননি। এদেশ অধিকার করতে না পেরে খুব সম্ভব 'আঙ্গুর ফল টক' এ নীতি অনুসরণ করে আর্যরা এদেশ সম্পর্কে যথেষ্ট অপ্রীতিকর মন্তব্য ও বেশ ঠাট্টা-মশকরা করে গেছেন। তবে এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, এদেশ সম্পর্কে তারা যা কিছুই বলে থাকুন না কেন, এ দেশে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা খুব সহজে হয়নি। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত সম্রাটগণ কর্তৃক বাঙলায় অধিকার প্রতিষ্ঠার আগে কোনো আর্য শক্তি এদেশ অধিকার করেছিল এমন কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। অবশ্য সম্রাট অশোক (খ্রি. পূ. তৃতীয় শতাব্দী) যে এদেশে তাঁর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে শূদ্র রক্ত সম্ভূত ও মৌর্য বংশজাত সম্রাট অশোক আদৌ আর্য ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে পণ্ডিত মহলে বহু প্রশ্ন আছে।

মৌর্য অধিকার

বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাসের সর্বপ্রাচীন প্রত্ন প্রমাণ পাওয়া গেছে বগুড়া জেলার মহাস্থান গড়ে। সেখানে প্রাপ্ত এবং ব্রাহ্মী অক্ষরে লিপিবদ্ধ একটি শিলাখণ্ড লিপিতে আছে যে, "কোন এক অত্যায়িক কালে রাজা পুন্দনগলের (পুণ্ড্রনগর-মহাস্থানগড়) মহামাত্রকে নির্দেশ দিতেছেন, প্রজাদের ধান্য এবং গণ্ডক ও কাকনিক মুদ্রা দিয়া সাহায্য করিবার জন্য, কিন্তু সুদিন ফিরিয়া আসিলে ধান্য ও মুদ্রা উভয়ই রাজভাণ্ডারে প্রত্যার্পণ করিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিতেছেন।"[১] এ শিলাখণ্ড লিপি মৌর্য সম্রাট আশোকের আমলের বলে পণ্ডিত মহলের অভিমত। এতে প্রমাণিত হয় যে, বাঙলার অন্তত এই

১. ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় : বাঙালির ইতিহাস, ৪৪১ পৃ.।

অঞ্চলে অশোকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মহাস্থানগড়ে উৎখনন কার্যের ফলে এবং বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলে যে সমস্ত প্রত্ন প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাতে ধারণা করা যায় যে, এদেশে মৌর্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এদেশে শুঙ্গ ও কুষাণ অধিকারের কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি, যদিও শুঙ্গ শিল্পশৈলী ও সংস্কৃতির কিছু কিছু নিদর্শন এবং কুষাণ আমলের কিছু সুবর্ণ ও অন্যান্য ধাতব মুদ্রা বাঙলায় আবিষ্কৃত হয়েছে।

মহাস্থানগড়ের মৌর্য আমলের এ শিলাখণ্ডলিপির পরে চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত অধিকারের সময় পর্যন্ত এ দেশের ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। গুপ্ত অধিকারের পর থেকে অবশ্য এদেশের ইতিহাস সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা করতে খুব কষ্ট হয় না।

গুপ্ত অধিকার

খুব সম্ভব চতুর্থ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে গুপ্ত সম্রাট সমুদ্র গুপ্ত এদেশ অধিকার করেন। গুপ্ত অধিকারের সময়ে এদেশ গুটি কয়েক স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল বলে ধারণা করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের (ভারত) বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পর্বতগাত্রে খোদিত লিপিতে পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্মা ও তাঁর পিতা সিংহবর্মার কথা জানা যায়। গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়াতে প্রাপ্ত ষষ্ঠ শতাব্দীর রাজা গোপচন্দ্রের তাম্রলিপিতে উল্লিখিত 'চন্দ্রবর্মা কোট' নামক যে দুর্গনগরীর সন্ধান কোটালিপাড়াতে পাওয়া গেছে তা খুব সম্ভব উপরোক্ত পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্মার সঙ্গে সম্পৃক্ত। সমুদ্র গুপ্ত কর্তৃক পরাজিত নৃপতিগণের তালিকার মধ্যে যে চন্দ্রবর্মার নাম পাওয়া যায়, তিনিই খুব সম্ভব উপরোক্ত চন্দ্রবর্মা।

দিল্লির কুতুব মিনার প্রাঙ্গনে রক্ষিত লৌহস্তম্ভে যে লিপিটি খোদিত আছে তা থেকে জানা যায় যে, চন্দ্র নামে এক নৃপতি বাঙলার সম্মিলিত রাজশক্তিকে পরাজিত করেছিলেন। তিনি কি গুপ্তবংশীয় প্রথম বা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্মা, না চন্দ্র নামধারী অন্য কোনো নৃপতি, সে সম্পর্কে কোনো ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে এ স্তম্ভলিপি থেকে ধারণা করা যায় যে, খুব সম্ভব গুপ্ত অধিকারের প্রাক্কালে বাঙলায় একাধিক স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল এবং প্রয়োজন বোধে দেশের-স্বাধীনতা রক্ষার্থে তাঁরা একত্র হতে পারতেন।

সমুদ্রগুপ্তের পরে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ও তাঁরপরে তাঁর পুত্র কুমারগুপ্ত রাজা হয়েছিলেন। কুমারগুপ্তের মৃত্যুর (৪৫০-৫৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে) পরে গুপ্ত সাম্রাজ্যের গৌরব স্তিমিত হয়ে পড়ে। তাঁর পরে গুপ্ত উপাধিধারী যে সমস্ত নৃপতি ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন বলে জানা যায়, তাঁদের সঙ্গে কুমারগুপ্তের কী সম্পর্ক ছিল তা নির্ণয় করা যায়নি। শেষ দিকের গুপ্ত নৃপতিদেরকে পরবর্তী গুপ্ত রাজা বলে আখ্যায়িত করা হয়। এঁদের মধ্যে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য নৃপতি ছিলেন মহাসেন গুপ্ত। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দশকে অথবা সপ্তম শতাব্দীর একদম প্রথম দিকে খুব সম্ভব তিনি রাজ্যহারা বা মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সমতট অঞ্চল প্রথমে গুপ্ত সাম্রাজ্যের করদ রাজ্য এবং পরে সরাসরি গুপ্ত সাম্রাজ্যের অংশ হয় বলে জানা যায়। কুমিল্লা জেলার গুনাইঘর তাম্রলিপিতে (৫০৭ খ্রিঃ) মহারাজ বৈন্যগুপ্ত নামক এক স্বাধীন নৃপতির সন্ধান পাওয়া যায়। গুপ্ত সম্রাটদের সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে ৫০৭ খ্রিস্টাব্দের পরে তাঁর রাজ্য বেশি দিন স্থায়ী হয়নি বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

গোপচন্দ্রদের রাজ্য

গুপ্ত সাম্রাজ্যের শক্তিহীনতার সুযোগ নিয়ে সমতটে অর্থাৎ বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। কুমিল্লা থেকে আরম্ভ করে বাংলাদেশের সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গের (ভারত) রাঢ় অঞ্চল এবং উড়িষ্যার কিছু অংশও এ রাজ্যের অধীনে ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়াতে প্রাপ্ত পাঁচখানা, বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ, ভারত) জেলার মল্লসারুলে প্রাপ্ত একখানা ও বালেশ্বর জেলার (উড়িষ্যা, ভারত) জয়রামপুরে প্রাপ্ত একখানা, এই মোট ৭ খানা তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব নামক ৩ জন রাজা এ রাজ্যে রাজত্ব করেন। মুদ্রা প্রমাণে পৃথুবীর ও শ্রী সুধন্যাদিত্য নামক আরও ২ জন নৃপতির সন্ধান পাওয়া যায়। এঁরা আনুমানিক ৫২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়।

মহারাজা শশাঙ্ক

এঁদের এবং পরবর্তী গুপ্তদের পরে সামন্তরাজ শশাঙ্ক এক বিরাট স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন এবং বাঙলার সীমানার অনেক বাইরেও তাঁর রাজ্যসীমা প্রসারিত হয়। তিনি খুব সম্ভব ৬০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর মৃত্যুকালে (৬৩৭ খ্রিঃ) গৌড় ও মগধ তাঁর অধীনে ছিল বলে জানা যায়। সমতটে তাঁর অধিকার ছিল কিনা সে সম্পর্কে অনুমান ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

মাৎস্যন্যায়

মহারাজ শশাঙ্কেরমৃত্যুর পরে সম্রাট হর্ষবর্ধন ও তাঁর মিত্র কামরূপরাজ ভাস্কর বর্মার অধীনে চলে যায় গৌড় রাজ্য। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর (৬৪৭ খ্রিঃ) পরে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহিঃশত্রুর বারবার আক্রমণের ফলে গৌড় দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে শতবর্ষব্যাপী এক বিভীষিকাময় অন্ধকার যুগের সুচনা হয় এবং তাকে বলা হয় 'মাৎস্যন্যায়' যুগ। সেই মাৎস্যন্যায় যুগের কোনো এক সময়ে তিব্বতরাজ স্রংসান গ্যাম্পো (Srong-Tsan Gampo) বাঙলার উত্তরাঞ্চলে অভিযান চালিয়ে সেখানে কিছুকালের জন্য আধিপত্য বিস্তার করেন বলে তিব্বতী সূত্রে জানা যায়।

সমতটের ইতিহাস

গৌড় অর্থাৎ বাঙলার উত্তরাঞ্চল ও পার্শ্ববর্তী এলাকা এই মাৎস্যন্যায় রাহুর কবলগ্রস্ত হলেও সমতটে অর্থাৎ বাঙলার পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে যে প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা ছিল তার

প্রমাণ পাওয়া যায় সেই অঞ্চলে পর পর কয়েকটি রাজবংশের রাজত্ব করার ইতিহাস থেকে। ভদ্রবংশ, খড়্গ বংশ, রাত বংশ, লোকনাথের বংশ ও দেব বংশ সমতট অঞ্চলে সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে রাজত্ব করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। দেব বংশ খুব সম্ভব নবম শতাব্দীরও কিছুকাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল। দেব বংশের পরে নবম শতাব্দীর আর কোনো রাজবংশের ইতিহাস পাওয়া যায় না। এর পরে দশম শতাব্দীর একদম শুরু থেকে চন্দ্র নামক এক নতুন রাজ বংশের রাজত্বের ইতিহাস পাওয়া যায়। ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ বংশের পাঁচজন নৃপতিকে সমতটে রাজত্ব করতে দেখা যায়। এঁরা ছিলেন ত্রৈলোক্যচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র. কল্যাণচন্দ্র, লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র। ত্রৈলোক্য চন্দ্রের পিতা পূর্ণচন্দ্র ও পিতামহ সুবর্ণ চন্দ্র ছিলেন খুব সম্ভব সামন্ত নৃপতি। এ বংশের শেষ নৃপতি গোবিন্দ চন্দ্রের পরে সমতট রাজ্য বর্মণদের এবং বর্মণদের পরে সেনদের অধিকারে আসে।

পাল বংশ

সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে প্রায় অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত গৌড় রাজ্যে মাৎস্যায় যুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক অনিশ্চয়তার অবসান ঘটে প্রথম পাল নৃপতি গোপালের রাজ্য লাভের পরে এবং তা ঘটে খুব সম্ভব অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে।

গোপালের রাজ্য লাভের কাহিনী বেশ চমকপ্রদ। দয়িতবিষ্ণুর পুত্র গোপালের পিতা বপ্যটকে তাঁর পৌত্র ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রলিপিতে 'অরাতি নিধনকারী' অর্থাৎ শত্রু হত্যাকারী অর্থাৎ একজন সমরনায়ক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তিনি রাজা ছিলেন না এবং তাঁর পুত্র গোপালও খুব সম্ভব প্রথম দিকে একজন সমরনায়কই ছিলেন। মাৎস্যন্যায় যুগে দেশে অসংখ্য ছোট ছোট নৃপতি ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ লেগেই ছিল বলে জানা যায়। সেই সুযোগে খুব সম্ভব সমরনায়ক গোপাল বাহুবলে একটি ছোট খাট রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। এবং কালক্রমে খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। আত্মকলহে নিমগ্ন ও অতিষ্ঠ দেশের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরপতি তাঁর শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সমর্থ না হয়ে খুব সম্ভব তাঁকে দেশের রাজা বলে মেনে নিতে বাধ্য হন।

খালিমপুর লিপির 'প্রকৃতিপুঞ্জ' শব্দদ্বয়ের দোহাই দিয়ে কেউ কেউ বেশ জোর গলায় বলতে চেয়েছেন যে, এটি ছিল প্রজাগণ কর্তৃক গোপালকে রাজা হিসাবে নির্বাচন। সেই অন্ধকার যুগে বিশেষ করে মাৎস্যন্যায় যুগের সেই বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে জনসাধারণ কর্তৃক সমগ্র দেশের জন্য একজন রাজা নির্বাচনের কথা শুনলেও হাসি পাবার কথা। খুব সম্ভব এটি ছিল আত্মকলহে নিমগ্ন ও দ্বিধাবিভক্ত রাজ্যসমূহে রাজা নামধারী অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও দুর্বল শক্তির প্রবলতর সামরিক শক্তির কাছে বাধ্য হয়ে মাথ নত করা এবং সেই প্রবলতর শক্তিকে দেশের রাজা বলে মেনে নেওয়া, প্রজা সাধারণ কর্তৃক কোনো নির্বাচন নয়। আর সেই অন্ধকার যুগে সমগ্র

দেশের প্রজা সাধারণ কর্তৃক কোন নির্বাচনের প্রশ্নই ওঠেনা। তাম্রলিপিতেও নির্বাচনের কথা উল্লেখ নেই।'[১]—যাক সেকথা।

অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে খুব সম্ভব তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি সমগ্র দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর বংশ এদেশে প্রায় ৪০০ বছর ধরে রাজত্ব করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। কোনো কোনো পাল নৃপতির রাজ্যসীমা বাঙলার অনেক বাইরেও প্রসারিত হয়। ধর্মপাল, দেবপাল, মহীপাল ও রামপাল এ বংশের কয়েকজন প্রখ্যাত নৃপতি।

দশম শতাব্দীর দিকে 'কম্বুজান্বয়জ' পরিচয় বহনকারী এক রাজবংশ গোপালের বংশধরদেরকে বাঙলা থেকে বিতাড়িত করে। প্রথম মহীপাল (৯৮৮-১০৩৮ খ্রিঃ) পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। একাদশ শতাব্দীতে দিব্যক নামক কৈবর্তবংশীয় একজন সামন্ত রাজা পালদেরকে বিতাড়িত করে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁর ভ্রাতা রোদক ও রোদকের পুত্র ভীম পরে রাজা হন। রামপাল (১০৭৭-১১২০ খ্রিঃ) ভীমকে পরাজিত ও নিহত করে পিতৃরাজ্য পুনরধিকার করেন। রামপালের পরেই পালরাজশক্তি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং গৌড়ের শেষ পাল নৃপতি মদন পালের সময়ে (১১৪০-৫৫ খ্রিঃ) সেনেরা গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। পালবংশের শেষ নৃপতি ছিলেন খুব সম্ভব গোবিন্দপাল দেব। তিনি বিহারের একটি অতি ক্ষুদ্র রাজ্যে খুব সম্ভব নামে মাত্র রাজা ছিলেন।

বর্মণ ও সেন বংশ

পাল রাজত্বের শেষের দিকে সমতট অঞ্চলে বর্মণ নামক এক নতুন রাজ বংশের আবির্ভাব ঘটে। বর্মণদের পরে এদেশে সেন বংশের রাজত্ব। কর্নাট দেশ থেকে আগত ও রাঢ় অঞ্চলে বসবাসকারী সামন্ত সেনের পৌত্র ও হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন ছিলেন সেন বংশের প্রথম নৃপতি। তাঁর পুত্র ছিলেন মহারাজা বল্লালসেন (১১৫৮-৭৯ খ্রিঃ) বল্লালসেনের পুত্র ছিলেন মহারাজা লক্ষ্মন সেন (১১৭৯-১২০৬ খ্রিঃ)। তাঁর সময়েই বাঙলায় মুসলমানের আগমন ঘটে।

মুসলিম অধিকার ও সুলতানী আমল

ইখতিয়ার-উদ্-দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী নামক একজন অসমসাহসী তুর্কি সমর-নায়ক ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে লখনৌতি (গৌড়) রাজ্য অধিকার করেন। সে সময়ে বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন 'নওদিহ্' নামক স্থান থেকে 'বঙ্গ্ ও সনকনত-এ পালিয়ে এসে খুব সম্ভব

১. গৌড় লেখমালা, ১৯ পৃ.—শ্রী অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়। সেখানে আছে, ... [দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার মূলক] 'মাৎসন্যায়' [অরাজকতা] দূর করিবার অভিপ্রায়ে, প্রকৃতিপুঞ্জ যাঁহাকে রাজলক্ষ্মীর কর গ্রহণ করাইয়া [রাজা নির্বাচন করিয়া] দিয়াছিল, পূর্ণিমা রজনীর [দিঙ্মণ্ডল-প্রধাবিত] জ্যোৎস্নারাশির অতিমাত্র ধবলতাই যাঁহার স্থায়ী যশোরাশির অনুকরণ করিতে পারিত, নরপাল-কুল চূড়ামণি গোপাল নামক সেই প্রসিদ্ধ রাজা বপ্যট হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

বিক্রমপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি ১২০৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে পরলোক গমন করলে তাঁর পুত্রদ্বয় বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন অন্তত ১২২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিক্রমপুরে রাজত্ব করেন বলে প্রত্ন প্রমাণে জানা যায়। অতঃপর ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সেন বংশীয় কোনো নৃপতি বা অন্য কোনো হিন্দু নৃপতি বিক্রমপুরে রাজত্ব করেন বলে জানা যায়। এর পরে এই অঞ্চল মুসলমানের অধিকারে আসে।

ইখতিয়ারের পরে তাঁর পরবর্তীরা লখনৌতি রাজ্য অর্থাৎ উত্তর বঙ্গে তাঁদের অধিকার বজায় রাখেন। এ সময়ে তাঁরা বারবার কামরূপ, বঙ্গ ও উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে অভিযান চালান। ১২৬৫ খ্রিস্টাব্দের পরে ১২৮০ খ্রিস্টাব্দের আগে কোনো এক সময়ে গৌড়ের তদানীন্তন শাসনকর্তা মুঘীস-উদ্ দীন তোঘরীল সোনার গাঁয়ে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন ও তাঁর রাজ্যসীমা কুমিল্লা ও ফরিদপুর অঞ্চলেও প্রসারিত হয়। তিনি প্রথমে ছিলেন দিল্লীর সুলতান গিয়াস-উদ্দীন বলবনের প্রতিনিধি। পরে বিদ্রোহী হলে বলবন তাকে পরাজিত ও নিহত করে নিজ পুত্র নাসির-উদ্-দীন বোগরা খানকে বাঙলার শাসন কর্তা নিযুক্ত করেন। তখন পর্যন্ত 'দিয়ার-ই-বাঙলা' অর্থাৎ দক্ষিণ বঙ্গ মুসলমানের অধিকারে আসেনি। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে (১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে) বাঙলার সুলতান শাম্স-উদ্-দীন ফিরোজ শাহ্‌র রাজত্বকালে শ্রীহট্ট অঞ্চলে সর্ব প্রথম মুসলমানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। পীর শাহ্ জালাল এ অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে (১৩৩৮ খ্রিঃ) সোনার গাঁয়ের সুলতান ফখর-উদ্-দীন মোবারক শাহ্ দিল্লীর অধীনতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে স্বাধীন সুলতান হিসাবে রাজত্ব করতে থাকেন। চট্টগ্রাম পর্যন্ত তার রাজ্যসীমা প্রসারিত ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তার পরে ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দু'শ বছর ধরে বাঙলার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকে।

সুলতান ফখর-উদ্-দীনের পরে সুলতান শামস্-উদ্-দীন ইলিয়াস শাহ্, তাঁর পুত্র সেকান্দর শাহ্ ও তাঁর পুত্র গিয়াস-উদ্-দীন আযম শাহ্ এদেশে রাজত্ব করেন। আযম শাহ্‌র কিছু পরে রাজা গণেশ নামক একজন হিন্দু সামন্ত রাজা দনুজমর্দনদেব নাম ধারণপূর্বক প্রায় ৩ বছর রাজত্ব করেন। গণেশের পরে তাঁর পুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালাল-উদ্-দীন মোহাম্মদ শাহ্ নাম ধারণ করে গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। তাঁর প্রায় ১৩ বছরের রাজত্বকালে রাজ্যসীমা বর্ধিত হয় এবং খুব সম্ভব তাঁর সময়েই দক্ষিণ বঙ্গ অর্থাৎ খুলনা-যশোহর অঞ্চলে মুসলিম অধিকার বিস্তৃত হয়। বাগেরহাটের বিখ্যাত পীর খান-ই-জাহান খুব সম্ভব তাঁরই সময়ে সে অঞ্চল অধিকার করেন।

পরবর্তী সুলতান জালাল-উদ্-দীনের পরে তাঁর পুত্র শামস-উদ্-দীন আহ্মদ শাহ মাত্র কয়েক বছর রাজত্ব করেন। তিনি আততায়ীর হস্তে নিহত হলে পরবর্তীতে ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান নাসির-উদ্-দীন মাহমুদ শাহকে সিংহাসনে বসান হয় ১৪৩৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে। তাঁর পুত্র সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ, বারবক শাহ্‌র পুত্র সুলতান শামস্-উদ্-দীন ইউসুফ শাহ্ এবং এ বংশের আরও কয়েকজন নৃপতির রাজত্ব ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টিকে থাকে। এ বংশের রাজত্বের শেষদিকে প্রশাসনিক বিশৃংখলা দেখা দেয় এবং পর পর কয়েকজন হাবসী সুলতান সামান্য কয়েক বছরের জন্য রাজত্ব করেন।

কয়েক বছরের রাজনৈতিক অস্থিরতার পর ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আলা-উদ্-দীন হোসেন শাহ্ সিংহাসন অধিকার করেন এবং অশেষ দক্ষতার সাথে ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর পুত্র নাসির-উদ্-দীন নুসরত শাহ্ ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিয়াস-উদ্-দীন মাহমুদ শাহ্‌র রাজত্বকালে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে শের শাহ্ তাঁর রাজ্য অধিকার করেন।

পাঠান ও মোগল আমল

শেরশাহ্‌র সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালের পর মোঘল শক্তি ও শেরশাহ্‌র স্বগোত্রীয় পাঠান আমিরদের মধ্যে বাঙলার অধিকার নিয়ে শক্তির লড়াই চলে দীর্ঘদিন ধরে। এ সময়ে সম্রাট আকবরের আমলে (১৫৫৬-১৬০৫) পাঠান বংশীয় সুলতান সোলায়মান কররানী ও তাঁর পুত্র দাউদ কররানী স্বাধীনভাবে বাঙলায় রাজত্ব করেন। ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে দাউদ মোঘলদের হাতে পরাজিত এবং নিহত হলেও মোঘল শক্তি সমগ্র বাঙলায় অধিকার বিস্তারে সমর্থ হয়নি। সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে বাঙলায় মোগল শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঢাকাতে বাঙলার রাজধানী স্থাপিত হয় ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে।

দিল্লী-আগ্রাতে অবস্থানরত বিভিন্ন মোঘল সম্রাটের রাজত্বকালে তাঁদের নিযুক্ত সুবাদারগণ বাঙলা শাসন করতে থাকেন। ইসলাম খান, ইব্রাহিম খান, রাজা মানসিংহ, শাহজাহান (পরে সম্রাট), সুলতান শাহ্ শুজা, মীর জুমলা, শায়েস্তা খান, মুর্শিদকুলী খান উল্লেখযোগ্য মোঘল সুবাদারদের মধ্যে কয়েকজন।

নবাবী আমল, ইংরেজ অধিকার ও স্বাধীন বাংলাদেশ

সম্রাট অওরঙযেবের মৃত্যুর পর কেন্দ্রীয় মোঘল শক্তি হীনবল হয়ে পড়ে এবং বাঙলার সুবাদরগণ নামে মাত্র মোগল আধিপত্য মেনে নিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করতে থাকেন। এ সময়ে নবাব আলীবর্দী খান নবাব সরফরাজ খানবে ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর দৌহিত্র নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা নবাব হন। মাত্র দেড় বছর রাজত্বের পর প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও আত্ম কলহের সুযেগে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সিরাজকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে বাঙলা অধিকার করে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এদেশে তথা সমগ্র উপমহাদেশে ইংরেজ অধিকার বজায় থাকে। এর পরে দেশ বিভাগের কালে বর্তমান বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান নাম ধারণ করে পাকিস্তানের সংগে সংযুক্ত থাকে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের সংগে যুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

এই হল সংক্ষেপে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস। এতে দেখা যাচ্ছে যে, যুগ যুগ ধরে অসংখ্য রাজশক্তি ও বিভিন্ন রক্তধারার মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে বাংলা দেশের মাটিতে। কালের অমোঘ বিধানে সে সব রাজশক্তি বিলীন হয়ে গেছে কিন্তু তাদের

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব থেকে গেছে বাঙালির সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে। আর সেই সংগে থেকে গেছে বিভিন্ন রক্তধারা ও সে সব রক্তধারার প্রভাব।

প্রত্নতত্ত্ব

সূচনা

উপরের আলোচনা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আরম্ভ করে বর্তমান কাল পর্যন্ত হাজার হাজার বছর ধরে বাঙলায় মানব বসতি ছিল। প্রথম দিকের অর্থাৎ প্রত্নপ্রস্তর যুগের কথা সঠিকভাবে বলা কঠিন। কিন্তু শেষের দিকে, খুব সম্ভব নব্যপ্রস্তর যুগের পরে পরেই, এদেশের অধিবাসীরা এক সুসভ্য জাতিতে পরিণত হন। বর্তমান কালের অনেক সুসভ্য জাতি যখন যাযাবরের মত বাস করতেন তখন বাঙলার অধিবাসীরা সভ্য ও সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করতেন। তারা চাষ করতে জানতেন। জমি চাষ করে ধান উৎপাদন করে সেই ধান থেকে চাল তৈরি করে সেই চাল রান্না করে তারা ভাত খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। তারা মাছ ধরতে ও সেই মাছ রান্না করে ভাতের সংগে খেতে জানতেন। তারা কার্পাস নামক তূলা উৎপাদন করে সেই তূলা থেকে নিত্য ব্যবহার্য বস্ত্রাদি প্রস্তুত করতে জানতেন। এক কথায় গ্রাম-বাঙলায় যে সমস্ত রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, ক্রিয়াকর্ম, জীবন ধারণের পদ্ধতি ইত্যাদি আজও প্রচলিত আছে, সেগুলির প্রায় সব ক'টাই আবহমান কাল থেকে প্রচলিত অবস্থারই উন্নত সংস্করণ মাত্র। প্রভেদ যেটুকু আছে তা মোটামুটিভাবে গুণের উৎকর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলা যেতে পারে, প্রকার ভেদের মধ্যে নয়।

বাঙালি জাতির সামরিক শক্তিও ছিল অতি উঁচু মানের। আর্যরা বাঙালি জাতির প্রতি যত ঠাট্টা-মশকরাই করে থাকুন না কেন, তার মূলে ছিল খুব সম্ভব এ দেশ অধিকারে আর্যদের ব্যর্থতার অভিব্যক্তি। কারণ, গ্রীক ও ল্যাটিন ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় খ্রিস্টপূর্ব প্রায় চারশ বছর আগেকার বাঙলার যে চিত্রটি পাওয়া যয়, তাতে দেখা যায় যে, বাঙালির সামরিক শক্তি ও সভ্যতা ছিল অতি উন্নত ধরনের। আর্য সভ্যতার প্রভাবমুক্ত এবং তার চেয়েও উন্নতমানের সে সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠতে যে বহু কাল লেগেছিল তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। সংক্ষেপে বলতে গেলে এ সভ্যতা গড়ে উঠতে হাজার হাজার বছর লেগেছিল।

কিন্তু এসব মানুষের কাহিনী, প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাদের ক্রমাগত সংগ্রাম, সেই সংগ্রামে বিজয় লাভে ক্রমাগত অগ্রগতি, সেই অগ্রগতির ধারাকে বিভিন্ন যুগে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে এক সুসভ্য ও সুবিন্যস্ত জাতিতে পরিণত হওয়ার পিছনে যে বিরাট ইতিহাস লুক্কায়িত আছে, তা বর্তমান পৃথিবীর কাছে প্রায় অজানা।

বাঙালির এই গৌরবময় ঐতিহ্যকে জানার জন্য আজ পর্যন্ত তেমন কোনো সার্থক প্রচেষ্টা হয়নি। তাই বাঙলা ও বাঙালির প্রাচীন ইতিহাস লুক্কায়িতই রয়ে গেছে। লুক্কায়িত রয়ে গেছে গভীর পলিমাটি, নতুন গড়ে ওঠা বসতি এবং পরিত্যক্ত ও জঙ্গলময় ভূমির নিচে বহু প্রাচীন জনপদের চিহ্ন, সে যুগের মানুষের ব্যবহৃত উপকরণসমূহ। সেগুলির সব কিছু উদ্ধার করা আজও সম্ভব হয়নি।

এ সমস্ত উপকরণ ও প্রাচীন জনপদের চিহ্ন সহজে উদ্ধার না হবার পিছনে যথেষ্ট কারণও আছে। জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য হেতু এদেশে সাধারণত: কোনো বস্তুই খুব বেশি দিন টিকে থাকেনা। তদুপরি এ দেশে পাথরের একান্ত অভাব। পাথরের অভাবে এ দেশের মানুষ বহু প্রাচীন কাল থেকেই বেত, বাঁশ, কাঠ, খড় ইত্যাদি দিয়ে বাড়ি-ঘর তৈরি করে আসছেন। এ দেশের আবহাওয়ায় এ সমস্ত ঘরবাড়ি যে খুব বেশি দিন টিকে থাকেনি, তা বলাই বাহুল্য।

অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারেও একই রকমের অসুবিধা বিদ্যমান ছিল। উপযুক্ত পাথরের অভাবে তারা বিকল্প বস্তু দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতেন। ধাতুর যুগেও তাদের এ অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয়েছিল বলে মনে হয় না। কারণ, এদেশে খনিজ পদার্থেরও প্রাচুর্য ছিল না। আজ থেকে সত্তর-আশি বছর আগেও দেখা গেছে যে, অনেক কৃষক কাস্তের অভাবে শামুক-ঝিনুক ইত্যাদির ধারাল অগ্র-ভাগের সাহায্যে ধানের ছড়া কেটে আনতেন। সংগতিপন্ন পরিবারেও লৌহনির্মিত নিত্য ব্যবহার্য উপকরণের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত সীমিত। এ সমস্ত কারণে আদি যুগে এদেশে প্রস্তর বা ধাতু নির্মিত অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার খুব ব্যাপক ছিল বলে ধারণা করা যায় না।

এর উপর ছিল এদেশের নদ-নদী গুলির বেপরোয়া গতি পরিবর্তনশীলতা। বিগত কয়েকশ' বছরের মধ্যে এ দেশের প্রায় প্রত্যেকটি নদী যে কতবার গতি পরিবর্তন করেছে এবং তার ফলে যে কত জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং এখনও যাচ্ছে তা সকলেরই জানা আছে। এর আগেও যে এ সমস্ত নদনদী বহুবার গতি পরিবর্তন করেছে, দেশ ব্যাপী বিদ্যমান প্রাচীন খাতগুলির দিকে তাকালেই তা চোখে পড়ে। নদ-নদীর ক্রমাগত গতি পরিবর্তনের ফলে প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শন হয় নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে, না হয় নদী বাহিত পলি মাটির নিচে চাপা পড়ে গেছে। ফলে এ সকল বস্তু লোক চক্ষুর অন্তরালে পড়ে গেছে এবং তাতে এসমস্ত বস্তু আদৌ অস্তিত্বশীল ছিল কিনা সে সম্পর্কেও অনেকের মনে সন্দেহ জেগেছে। ছিল যে তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। যে দেশের গৌরব কাহিনী নেহায়েত অযাচিতভাবে বিদেশী ঐতিহাসিকেরা প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে লিপিবদ্ধ করে গেছেন, সে দেশের অতীত যে অত্যন্ত গৌরবময় ছিল সে সম্পর্কে বিশেষ বাক্য ব্যয়ের প্রয়োজন পড়ে না।

এই ইতিহাস শুধু প্রত্ন প্রমাণের উপরই নির্ভরশীল নয়। প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে ধারা আজও উপমহাদেশে প্রচলিত, সেগুলিও এর পিছনে জোরালো সমর্থন যোগায়। বর্তমান হিন্দু ধর্মের কয়েকটি বিশেষ অংগ যেমন, কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস, শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান, হোম ও যজ্ঞের পরিবর্তে পূজা, ভোগ ইত্যাদির ব্যবস্থা, শিব, চণ্ডী, ভৈরবী, মনসা, শীতলা প্রভৃতি দেবদেবী, নানা রকম ব্রত ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি ইত্যাদি বিবিধ বিষয় বৈদিক ধর্মে ছিল না। এগুলি এবং এ ধরনের অনেক উপকরণ হিন্দুধর্মে গৃহীত হয়েছে এদেশের আদিম অধিবাসীদের ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে। এর পিছনে লুকিয়ে আছে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের এক বিরাট ইতিহাস। সেই বিরাট ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষেপে এটুকু বলা যেতে পারে যে, যে-সভ্যতা থেকে আর্যরা এগুলি গ্রহণ করেছিলেন সেই সভ্যতা ছিল বহুকালের এবং অনেক উন্নত মানের।

প্রত্নপ্রস্তর যুগ

প্রত্ন প্রস্তর যুগের খুব বেশি অস্ত্র বা যন্ত্রপাতি এ দেশে পাওয়া যায়নি। বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার ছাগলনাইয়া থানার সীমানায় অবস্থিত পাহাড়ী অঞ্চলে এ যুগের একখানি হস্ত-কুঠার (hand-axe) পাওয়া গেছে কয়েক বছর আগে। পণ্ডিতেরা এটিকে প্রত্নপ্রস্তর যুগের বলে চিহ্নিত করেছেন। এই কুঠারখানি বর্তমানে ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। বছর কয়েক আগে একজন মার্কিন নাগরিক পার্বত্য চট্টগ্রামের রাংগামাটি অঞ্চল থেকে ঘটনাক্রমে একটি কুঠার (celt) আবিষ্কার করেন। এ বস্তুটিও প্রত্ন প্রস্তর যুগের বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। এটি চট্টগ্রামের জাতিতাত্ত্বিক যাদুঘরে রক্ষিত আছে বলে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জানা গেছে।

নব্য প্রস্তর যুগ

নব্য প্রস্তর যুগের বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে বাঙলার মাটিতে। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ঘটনাক্রমে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পাহাড়ে অশ্মীভূত (fossilised or petrified wood) কাষ্ঠ নির্মিত একখানি তরবারি আবিষ্কৃত হয়েছিল।[১] সেটি খুব সম্ভব কলকাতা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ে অবস্থিত শালবন বিহার ও আনন্দ বিহার খননের পর মোট ৯টি অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে। এ গুলি বেশির ভাগ অশ্মীভূত কাষ্ঠ নির্মিত। মাত্র কয়েকটি প্রস্তর (quartzite) নির্মিত। সেই সংগে বেশ বড় এক খণ্ড পাথরও (quartzite) পাওয়া গেছে। এ ধরনের পাথর বাংলাদেশে নেই। এতে মনে হয় পাথরগুলি বাঙলার বাইরের। কুমিল্লাতে প্রাপ্ত অস্ত্রগুলির সঠিক বয়স নির্ধারণ করা হয়নি। তবে অভিজ্ঞ মহলের অনুমান এ গুলি খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছর কি তারও আগেকার। ময়নামতি-লালমাই পাহাড়ি অঞ্চলে প্রচুর অশ্মীভূত কাঠও পাওয়া যায়।

পাহাড়ি অঞ্চল বা পাহাড়ের নিকবর্তী স্থানে প্রাপ্ত এ সমস্ত প্রত্ন বস্তু আসাম অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রত্ন বস্তুর সমগোত্রীয় বলে বিবেচিত হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে এর অর্থ দাঁড়ায় যে আসাম ও এ অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষেরা সমগোত্রীয় ছিলেন। এ সম্পর্কে অবশ্য নিশ্চয় করে কিছু বলা কঠিন।

বাঙলার সমতল ভুমি বিশেষ করে উত্তর বংগের বিস্তীর্ণ লাল মাটির প্রাচীন ভূমি অথবা মধুপুর-ভাওয়াল অঞ্চলের লাল মাটির অঞ্চল থেকে প্রস্তর যুগের কোনো প্রত্ন নিদর্শন আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। অথচ সীমান্তের ওপারে ভারতের পশ্চিম বংগ ও আসামে প্রত্ন ও নব্য প্রস্তর যুগের বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। রাঢ় ও আসামের পাহাড়ি অঞ্চলের কথা বাদ দিলেও পশ্চিম বংগের সমতল ভূমিতে প্রাপ্ত নিদর্শনাদিও কম উল্লেখযোগ্য নয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ পশ্চিম দিনাজপুর (ভারত) জেলার বাণগড় ও চব্বিশ-পরগনা (ভারত) জেলার প্রস্তর যুগের নিদর্শন গুলির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। দিনাজপুর শহর থেকে মাত্র ১৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বাণগড়ে খনন কার্যের ফলে একটি

১. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৭ পৃ.

কুঠার (celt) পাওয়া গেছে। শুংগ যুগের প্রত্নবস্তুসমূহের একস্তর নিচে পাওয়া গেছে বলে এই প্রত্ন বস্তুটির অত্যধিক প্রাচীনতা সম্পর্কে কোনো কোনো পণ্ডিত একটু সন্দিহান। এ সন্দেহ খুব যুক্তিসংগত বলে মনে হয় না। অনেক ক্ষেত্রে প্রস্তর যুগের অনেক উপকরণ পরবর্তী ধাতু যুগে ব্যবহৃত হয়েছে এমন দৃষ্টান্তও দেখা যায়।

চব্বিশ পরগনা জেলার নিদর্শনগুলি ১ থেকে ৩ লক্ষ বছরের প্রাচীন বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। সুন্দরবনের নিকটবর্তী এ স্থান খুলনা জেলার সীমান্তের কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। সেখানে এবং বাণগড়ে যদি প্রস্তর যুগের নিদর্শন মাটির নিচে পাওয়া যায়, তবে সে সমস্ত স্থানের কাছাকাছি এবং একই মাটিতে গড়া বাংলাদেশের মাটিতে এ জাতীয় প্রত্ন বস্তু পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

বাংলাদেশের সমতল ভূমিতে প্রস্তর যুগের কোন নিদর্শন না পাওয়ার প্রধান কারণ খুব সম্ভব বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে উৎখনন কার্য ও অনুসন্ধানের অভাব। প্রস্তর যুগের কথা দূরে থাক, ঐতিহাসিক যুগের প্রত্ন নিদর্শনাদি উদঘাটনের ব্যাপারেও তেমন কোনো কাজ এখানে হয়নি। আজও বাংলাদেশের মাটিতে অসংখ্য প্রত্নকীর্তির ধ্বংস স্তূপ নিতান্ত অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে সারাদেশের আনাচে-কানাচে। ইটের দুর্মূল্যতাহেতু বহু ধ্বংসাবশেষের ইট সরিয়ে নিয়ে কীর্তিগুলির শেষ চিহ্ন অপসারিত করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এখনও যেগুলি কোনো রকমে টিকে আছে সেগুলি আরও কতকাল টিকে থাকবে তা বলা দুষ্কর। আশঙ্কা হচ্ছে, এগুলির আয়ুও বোধ হয় শেষ হয়ে আসছে।

প্রাচীন ইতিহাস যুগ

গ্রীক ও ল্যাটিন ঐতিহাসিকগণ খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৩০০ বছর আগের বাঙলার যে গৌরবময় অস্তিত্বের কথা বলে গেছেন ঠিক সে সময়ের কোনো প্রত্নবস্তু এদেশের মাটিতে আজও পাওয়া যায়নি। তবে সামান্য কিছু পরবর্তী সময়ের একটি অতি মূল্যবান নিদর্শন পাওয়া গেছে মহাস্থান গড়ে। এই শিলাখণ্ড লিপি যে সম্রাট অশোকের আমলের সে কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

শুধু এই শিলালিপিই নয়, মৌর্য যুগের আরও অনেক প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে। মহাস্থানগড়ে খনন কার্যের ফলে পাওয়া গেছে মৌর্য যুগের ছাপযুক্ত ও ছাঁচে ঢালা মুদ্রা (Punch marked and cast coin), উত্তর ভারতের এন বি. পি. (Northern Block Polished Pottery) পাত্রের ভগ্নাংশ ও মূল্যবান পাথরের গুটিকা (beads of semi-precious stones)। এ সমস্ত বস্তু খ্রি. পূ. ৪০০ থেকে ২০০ সাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এর পরে আর এগুলি প্রচলিত ছিল না। মহাস্থান গড়ে যে আংশিক খনন কার্য করা হয়েছে তাতে দেখা গেছে যে, মৌর্য আমলে সেখানে একটি প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল।

ছাপযুক্ত মুদ্রা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে এবং এখনও যাচ্ছে নরসিংদী জেলার বেলাব থানার উয়ারী-বটেশ্বর নামক একটি অতি প্রাচীন স্থানে। এখানে প্রাপ্ত এ ধরনের বহু মুদ্রা ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এখানে মূল্যবান পাথরের গুটিকাও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে এবং যাচ্ছে। এ স্থানে আরও একটি অতি মূল্যবান প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে

এবং তা হচ্ছে লৌহ নির্মিত হস্ত-কুঠার (hand-axe)। লৌহ নির্মিত হলেও এগুলি প্রস্তর নির্মিত কুঠারের মতো এবং এগুলি যে অত্যন্ত প্রাচীন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ ধরনের বহু কুঠার সেখানে পাওয়া যায়। সেখান থেকে সংগৃহীত সর্বমোট ২৭টি হস্ত কুঠার এখন ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

প্রত্নকীর্তি

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে অসংখ্য ইমরতাদি নির্মিত হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এদেশের জলবায়ুর কারণে কোনো কীর্তিই যে অধিক কাল টিকে থাকে না, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। এ কারণে বৌদ্ধ-হিন্দু যুগের কোনো কীর্তিই আজ অক্ষত নেই। বহু কীর্তি একদম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আবার বহু সংখ্যক কীর্তি ধ্বংশ প্রাপ্ত হতে হতে মাটির নিচে চাপা পড়ে গিয়ে ঢিবিতে পরিণত হয়েছে। এ রকম বহু ঢিবি বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে এ ধরনের ঢিবি সংখ্যা খুব বেশি ছিল। ইট হরণকারীদের দৌরাত্ম্যে ও ক্রম বর্ধমান মানুষের চাপে অসংখ্য ঢিবি একদম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এখনও কিন্তু বহুসংখ্যক ঢিবি টিকে আছে।

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে নানা ধরনের কীর্তি স্থাপিত হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে ছিল দুর্গনগরী, দুর্গ, বৌদ্ধ বিহার, বৌদ্ধস্তূপ ও মন্দির, হিন্দু মন্দির, আবাসগৃহ, সেতু, স্তম্ভ ইত্যাদি ইত্যাদি। সে যুগে অসংখ্য জলাশয়ও খনন করা হয়েছিল। বস্তুত পক্ষে এ জলাশয়গুলি সে যুগের কীর্তির বিশেষ অঙ্গ। সে যুগের ভাস্কর্য শিল্পের বহু উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া গেছে। এদেশে পাথর বা ধাতুর অস্তিত্ব ছিল না। অন্যদেশ থেকে এ সমস্ত দ্রব্য আনয়ন করে ভাস্কর্যশিল্পকে গড়ে তোলা হয়েছিল। সে যুগে পোড়ামাটির ফলক চিত্র (terra cotta plaque) বাংলাদেশের শিল্প কলার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছিল। এ সমস্ত শিল্পের বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রত্নকীর্তির মধ্যে মুদ্রাও একটি উল্লেখযোগ্য বস্তু। সে যুগের বহু মুদ্রারও সন্ধান পাওয়া গেছে।

দুর্গনগরী

আগেকার দিনের রাজরাজড়াদের কাহিনীর সঙ্গে দুর্গনগরীর অস্তিত্ব ছিল অত্যন্ত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু বাংলাদেশে অসংখ্য প্রাচীন নগরীর সন্ধান পাওয়া গেলেও প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংবলিত দুর্গনগরীর অস্তিত্ব খুব বেশি পাওয়া যায়নি। নগরীর চারদিক ঘিরে মাটি বা ইষ্টকনির্মিত প্রাচীর ও প্রাচীর সংলগ্ন পরিখা ছিল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রায় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এ ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পন্ন মাত্র কয়েকটি দুর্গনগরীর সন্ধান পাওয়া গেছে এদেশে। এগুলির মধ্যে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া, বগুড়া জেলার মহাস্থান গড়, পঞ্চগড় জেলার ভিতরগড়, দিনাজপুর জেলার কান্তনগর ও ঘোড়াঘাট, রংপুর জেলার ধর্মপাল গড় ও কাটা দুয়ার (দরিয়াও)

এবং মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরের গড় ও ঢাকা জেলার সাভার দুর্গনগরী বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এগুলির মধ্যে মহাস্থান গড় দুর্গনগরী প্রাচীনতম বলে বিবেচিত হয়। আয়তনের দিক থেকে ভিতর গড় দুর্গনগরী ছিল সর্ববৃহৎ। প্রায় ১২ বর্গমাইল স্থান জুড়ে এই বিশাল নগরীর অস্তিত্ব ছিল। এর পরেই কোটালিপাড়া দুর্গনগরীর স্থান। প্রায় ৯ বর্গমাইল স্থান জুড়ে ছিল এই বিরাট নগরী। এর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত শক্ত।

দুর্গ

এ যুগের অসংখ্য দুর্গের চিহ্ন সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। দুর্গগুলি সাধারণত এক বা একাধিক প্রাচীর বেষ্টিত থাকত। প্রাচীরগুলি সাধারণত মাটির তৈরি হত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইটের তৈরি প্রাচীরও থাকত। কিন্তু সে রকম দৃষ্টান্ত এদেশে খুব বিরল। প্রাচীরের বাইরের দিকে থাকত প্রশস্ত ও গভীর পরিখা। সাধারণত গড় নামে পরিচিত এ সমস্ত দুর্গের অস্তিত্ব সবচেয়ে বেশি দেখা যায় বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে। সংখ্যার হিসাবে বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা সবচেয়ে বেশি সংখ্যক দুর্গের অধিকারী। এখানে বর্তমান কালেও প্রায় ২৫টি দুর্গের অস্তিত্ব দেখা যায়। এর পরেই রংপুর জেলার স্থান। এ জেলায় প্রায় ১৫টি গড় আছে। বগুড়া ও রাজশাহী জেলায় অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ থাকলেও দুর্গের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম।

এ সমস্ত দুর্গকে দুর্গনগরী বলা যায় কিনা তা চিন্তার বিষয়। এগুলির চারদিকে প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অভাব নেই। কিন্তু এগুলির মধ্যে আবাস গৃহাদির ধ্বংসাবশেষের একান্ত অভাব দেখে মনে হয় যে এসব স্থানে কোন স্থায়ী নগরী নির্মিত হয়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এগুলি সেনানিবাস হিসাবে নির্মিত হয়েছিল। সে জন্য এগুলিতে ইমারতাদির তেমন উল্লেখযোগ্য কোন ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় না। কিন্তু মনুষ্য বসবাসের চিহ্ন হিসাবে মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশের অস্তিত্ব দেখা যায়। কোনো কোনো দুর্গ সাময়িক সামরিক অভিযানের উদ্দেশ্যেও নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয়। রংপুর জেলার ময়নামতির গড় (পরে দ্রষ্টব্য) ও দিনাজপুর জেলার কোয়েলী রাজার গড় (পরে দ্রষ্টব্য) এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীরবিহীন নগরী

বেষ্টনী প্রাচীর বিহীন নগরী যে এদেশে কত ছিল তার সংখ্যা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। নিম্নাঞ্চলে প্রাচীন নগরীর অস্তিত্ব অত্যন্ত সীমিত হলেও লালমাটি ও পাহাড়ী অঞ্চলে অসংখ্য প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। সাধারণত বাংলাদেশকে গ্রামীণ সভ্যতার কেন্দ্রভূমি বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এ দেশের লালমাটির অঞ্চলে অসংখ্য প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখে এ ধারণার পিছনে কতখানি সত্য আছে তা যাচাই করার প্রশ্ন অত্যন্ত সতেজ হয়ে ওঠে।

এ সমস্ত প্রাচীন নগরীর চারদিকে প্রতিরক্ষামূলক কোনো বেষ্টনী প্রাচীর ছিল কিনা তা বলা কঠিন। কারণ, কোন ক্ষেত্রেই বেষ্টনী প্রাচীরের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য পরিখার চিহ্ন পাওয়া গেছে।

বৌদ্ধ বিহার

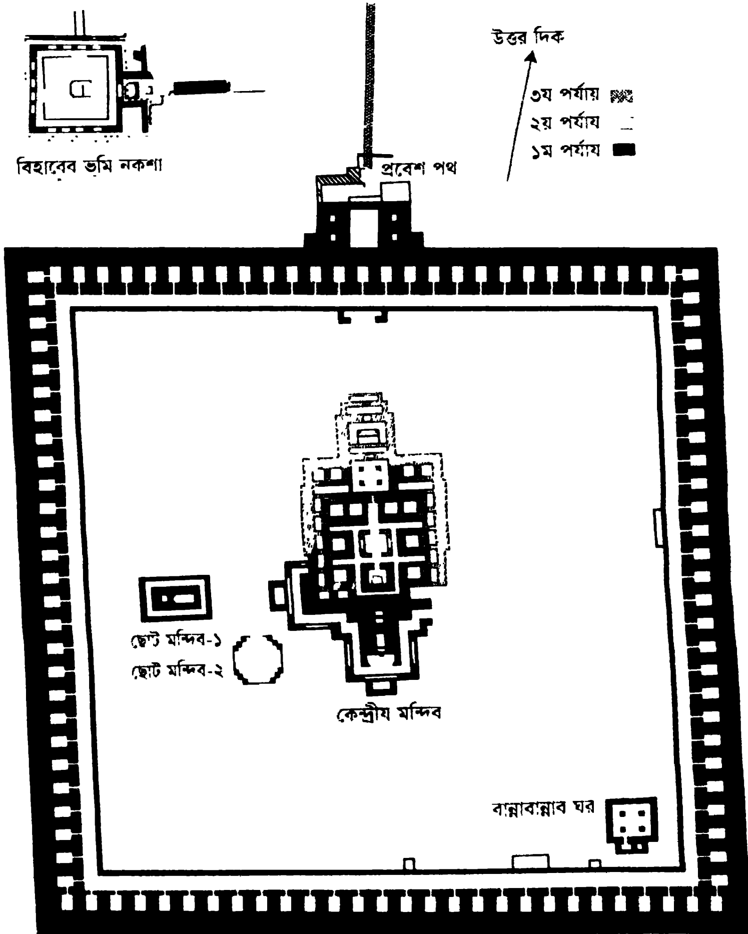
হিন্দু-বৌদ্ধ বিশেষ করে বর্মন-সেনযুগের পূর্বে অসংখ্য বৌদ্ধবিহারের অস্তিত্ব ছিল বাংলাদেশে। য়ুয়ান-চোয়াঙ (হিউয়েন সাঙ) যখন সপ্তম খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে এদেশে আসেন তখন তিনি অসংখ্য সংঘারাম (অর্থাৎ বৌদ্ধ বিহার) দেখেছিলেন বলে তাঁর বর্ণনায়, পাওয়া যায়। এর পরেও অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার নির্মিত হয়েছিল বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান কালে এসব বৌদ্ধ বিহারের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক বৌদ্ধবিহার একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অনেক ছোট খাট বিহারের ধ্বংসাবশেষ বিভিন্ন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আত্মগোপন করে আছে।

এ পর্যন্ত ১৩টি বৌদ্ধবিহারের অস্তিত্ব খননকার্যের পর আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি হচ্ছে (১) রাজশাহী জেলার বিহারৈল বিহার, (২) নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর (সোমপুর) বিহার, (৩) নওগা জেলার জগদ্দল বিহার, (৪) দিনাজপুর জেলার সীতাকোট বিহার, (৫) বগুড়া জেলার ভাসুবিহার ও একই জেলার (৬) বিহার গ্রামের বিহার (৭) ঢাকা জেলার সাভার বিহার (৮) কুমিল্লা জেলার শালবন বিহার, (৯) একই জেলার আনন্দ বিহার (১০) ভোজবিহার, (১১) বড় ইটাখোলার বিহার, (১২) রূপবান বিহার এবং গাইবান্ধা জেলার (১৩) বোগদহ বিহার। এগুলির মধ্যে প্রাচীনতম বিহার হচ্ছে খুব সম্ভব বিহারৈল বিহার এবং এটি পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। এর পরেই খুব সম্ভব সীতাকোট বিহারের স্থান। এ বিহার ষষ্ঠ-সপ্তম খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতদের ধারণা। ভাসুবিহারের কথা য়ুয়ান-চোয়ান উল্লেখ করে গেছেন। কিন্তু খননকার্যের পরে এখানে দশম শতাব্দীর আগের কোনো ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়নি। আরও গভীর উৎখননের পরে হয়ত প্রাচীন বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হতে পারে। সাভার বিহার খুব সম্ভব সপ্তম খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত। কুমিল্লার আনন্দবিহার ও শালবন বিহার অষ্টম খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। পাহাড়পুর বিহার মহারাজ ধর্মপালেব সময়ে, (৭৭০-৮১০ খ্রিঃ) নির্মিত হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম একক বিহার।

উপরে উল্লিখিত ১৩টি বৌদ্ধবিহার ছাড়াও আরও কয়েকটি বৌদ্ধ-বিহারের ধ্বংসাবশেষ এদেশে আবিষ্কৃত হয়েছে। উৎখননের পরে এগুলিও উপরের তালিকার মধ্যে স্থান পেতে পারে। এগুলি হচ্ছে (১) নওগাঁ জেলার হলুদ বিহার (২) দিনাজপুর জেলার দেউলবিহার (পরে দেউল দ্র.) (৩)' রংপুর জেলার লোহানিপাড়া বা চাপড়া কোটবিহার (৪) কুমিল্লা জেলার রূপবান কন্যার বিহার, একই জেলার (৫) সমর বিভাগের বাংলার বিহার, (৬) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নিহত সৈনিকদের সমাধিস্থলের বিহার ও (৭) কোটবাড়ি বিহার।

বিহার নির্মাণের আদি যুগে এগুলি ছিল ছোট ছোট গৃহের সমষ্টি। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এ সমস্ত গৃহে বসবাস করতেন এবং পঠন, পাঠন, ও ধ্যান-ধারণায় নিযুক্ত থাকতেন। সংঘবদ্ধভাবে আরাধনা বা পূজা-অর্চনার জন্য থাকত আলাদা উপাসনালয়। প্রথমে এগুলি ছিল খুব সম্ভব এদেশে সহজপ্রাপ্য মাল-মসলা দিয়ে তৈরি পর্ণকুটির জাতীয় গৃহাদি। কালক্রমে ইষ্টকনির্মিত গৃহাদি নির্মিত হয়। ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপকভাবে

প্রচারিত ও প্রচলিত হতে শুরু করলে খুব সম্ভব বৃহত্তর প্রয়োজনে ও ভিক্ষুদের নিরাপত্তার খাতিরে দুর্গাকারে নির্মিত বিহারগুলির প্রচলন হয়। এ ধরনের নির্মাণকার্য ঠিক কবে আরম্ভ হয়েছিল সে সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছু বলা কঠিন। এদেশে যে ক'টি বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের সবগুলিই দুর্গাকারে নির্মিত। অন্য ধরনের অর্থাৎ ছোট ছোট ও আলাদাভাবে নির্মিত গৃহাদি নিয়ে গঠিত কোনো বিহার বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। ভাসুবিহারে খননকার্য চালিয়ে অতি ক্ষুদ্র দুটি বিহার-ভবন আবিষ্কার করা হয়েছে। প্রায় লাগালাগি অবস্থায় নির্মিত বড় ভবনটির আয়তন '১৮৪ × ১৬২ ফুট'। দুটি ভবন পরস্পর প্রায় সংলগ্ন অবস্থায় থাকলেও ভবন দুটি দুর্গাকারে নির্মিত, আদি বিহার নির্মাণ যুগের মত আলাদা আলাদাভাবে নির্মিত ছোট ছোট ঘরের সমষ্টি নয়। তাই ভাসুবিহারকেও আদি নির্মাণযুগের বিহার বলা চলে না।



দুর্গাকারে নির্মিত বিহারগুলিকে দুর্গ বললেও অত্যুক্তি হয় না। এ গুলির চারদিকে থাকত অতি প্রশস্ত বেষ্টনী প্রাচীর। সেই বেষ্টনী প্রাচীরকে পিছনের দেয়াল হিসাবে ব্যবহার করে বিহারের কক্ষগুলি নির্মিত হত। এই কক্ষগুলির প্রায় সব ক'টাই ভিক্ষুদের বসবাস, পঠন, পাঠন ও ব্যক্তিগত আরাধনার জন্য ব্যবহৃত হত। এ কক্ষগুলির সামনে থাকত টানা বারান্দা। বারান্দার বাইরে থাকত প্রশস্ত উন্মুক্ত চত্বর। চত্বরের মাঝখানে থাকত বিহারের কেন্দ্রীয় মন্দির। আর চত্বরের এখানে-ওখানে থাকত ভোজনশালা, রন্ধনশালা ইত্যাদি জাতীয় ছোটখাট ইমারত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিহারগুলি একাধিক তলবিশিষ্ট হত। বিহারে সাধারণত একটি মাত্র প্রবেশ পথ থাকত।

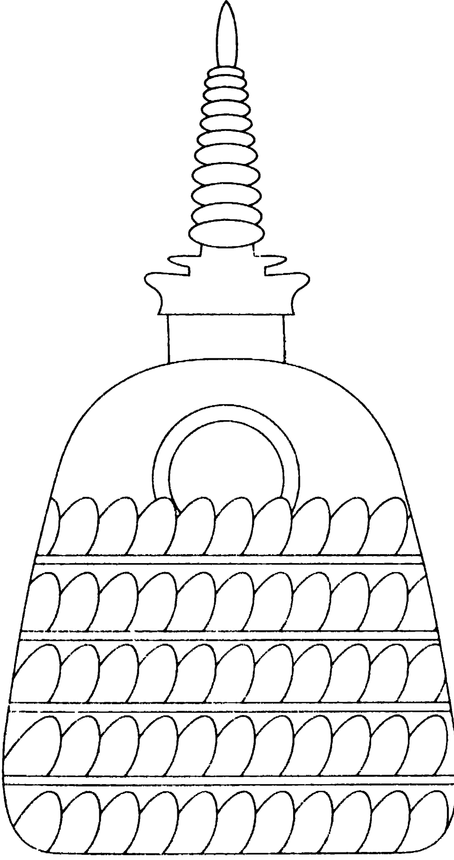
স্তূপ

বৌদ্ধযুগের আগে থেকেই স্তূপ নির্মিত হয়েছিল বলে বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ দেখা গেলেও সে যুগের কোনো স্তূপের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। বৌদ্ধযুগেই যে এগুলি বিশেষভাবে নির্মিত হয়েছিল সে প্রমাণ পাওয়া যায়। স্তূপগুলি নির্মিত হয়েছিল বুদ্ধ বা তাঁর প্রধান শিষ্যদের দেহাবশেষের (ধাতুর) পাত্র রক্ষা করার জন্য। এই নীতির ভিত্তিতে স্তূপগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায় এবং মোটামুটিভাবে সেগুলি হচ্ছে (১) রেলিকস্তূপ (বুদ্ধ বা তাঁর প্রধান শিষ্যদের দেহ বা দেহের অংশ বিশেষের উপর নির্মিত স্তূপ (২) স্মারক স্তূপ (বুদ্ধ বা তাঁর প্রধান শিষ্যদের স্মৃতিরক্ষার্থে নির্মিত স্তূপ (৩) ভোটিভ স্তূপ (কোনো বিশেষ বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানে মানসসিদ্ধিমূলক স্তূপ)। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর স্তূপ এদেশে ছিল বলে জানা যায় না। কারণ বুদ্ধ নিজে বা তাঁর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে কেউ আদৌ এদেশে এসেছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে তৃতীয় শ্রেণীর অসংখ্য স্তূপ যে এদেশের বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলিতে বা ধারে কাছে নির্মিত হয়েছিল সে প্রমাণের অভাব নেই।

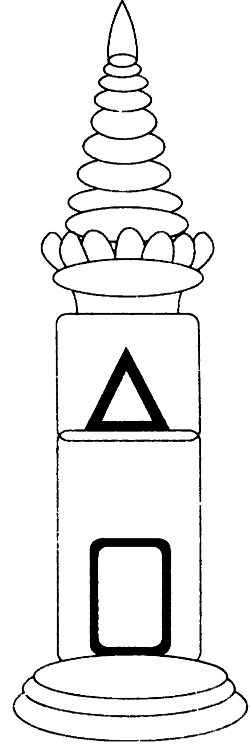
গোলাকার ভিত্তির উপরে সাদাসিধাভাবে নির্মিত গম্বুজাকৃতির চূড়াজাতীয় নির্মাণকার্যেই আদিতে স্তূপ স্থাপত্যের নিদর্শন ছিল বলে দেখা যায়। অনুচ্চ ভিত্তির উপরে চূড়াজাতীয় সুকঠিন (solid) নির্মাণ কার্যটি ছিল এ জাতীয় স্তূপের প্রধান বৈশিষ্ট্য। গম্বুজের উপরে হার্মিকা নামক একটি বস্তু নির্মিত হত। হার্মিকা ছিল বাক্স আকৃতির বর্গাকৃতির চতুষ্কোণ একটি বস্তু। বিশ্বজনীন শ্রদ্ধার প্রতীক একটি ছত্র নির্মিত হত হার্মিকার উপরে এবং তা একটি গোলাকার চাকতির আকারে নির্মিত হত।

ধীরে ধীরে স্তূপের আকৃতির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। লম্বীকরণ ও উচ্চতাবৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে বৃত্তাকারে নির্মিত ভিত্তিকে সিলিণ্ডারের আকারে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা চলে। শেষ পর্যন্ত সমগ্র ভবনের তলদেশ বর্গাকারের চতুষ্কোণ ভিত্তির উপর নির্মিত হতে থাকে। উপরের ছত্রটি আদিতে একটিমাত্র চাকতি দ্বারা নির্মিত হত। কিন্তু কালক্রমে এর সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে এবং ক্রমাগত ক্ষুদ্র হয়ে যাওয়া (tapering) ছত্রাবলী এর স্থান দখল করে শেষ চাকতিটি সূচালো অংশে পরিণত হয়। অনেক ক্ষেত্রে আদি গম্বুজাকারের চূড়াটি তার প্রাধান্য হারিয়ে উঁচু ভিত্তি ও ছত্রাবলীর মধ্যবর্তী স্থানে

অকিঞ্চিৎকর আস্তিত্বের অধিকারী হতে বাধ্য হয় এবং সমগ্র ভবনটির আকৃতি উঁচু ও চোঙাকারে রূপান্তরিত হয়।[১]



স্তূপের স্কেচ



২

স্তূপের স্কেচ

কোনো বৌদ্ধ স্তূপ-ভবন এদেশে সম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায়নি। তবে নরসিংদী জেলার শিবপুর থানার আশরাফপুর নামক গ্রামে খুব সম্ভব সপ্তম শতাব্দীর খড়্গ বংশীয় নৃপতি দেবখড়্গের দুটি তাম্রলিপির সঙ্গে ব্রোঞ্জনির্মিত একটি ভোটিভ স্তূপের নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে সে যুগে নির্মিত স্তূপ সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে পারে। এ স্তূপের সিলিণ্ডার আকৃতির একটি ড্রাম ছিল এবং এর উপর ছিল অর্ধ বৃত্তাকার গম্বুজাকৃতির চূড়া। চূড়াটি একটি পদ্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং পদ্মটি ছিল উঁচু ও কিঞ্চিৎ

১. H.B. Vol. 1, pp. 483-84 and plate XXVIII, 68—Dhaka University

ক্রমাবনত ভিত্তির (basement) উপরে। এই বেইসমেন্টটি ছিল বর্গাকৃতির এবং এর প্রত্যেক দিকে অফসেট প্রক্ষেপন (off-set projection) ছিল। উপরের দিকে চূড়াটি একটু স্ফীতকায় ছিল এবং এই ভোটিভ স্তূপের এটিই ছিল বিচিত্র বৈশিষ্ট্য। খুব সম্ভবত এটিই এদেশের ব্রোঞ্জনির্মিত ভোটিভ স্তূপের এখনও টিকে থাকা একমাত্র নিদর্শন।

প্রস্তর নির্মিত ভোটিভ স্তূপের একমাত্র নিদর্শন দেখা যায় নওগাঁ জেলার যোগির গোফা (পরে যোগীর গোফা দ্র:) নামক স্থানে। এর অস্বাভাবিক উচ্চতার জন্য প্রথম দৃষ্টিতে এটিকে ভোটিভ স্তূপ বলে মনে না হলেও ভাল করে দেখলে এটিকে স্তূপ বলেই ধরা যায় এ সম্বন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিস্ট্রি অব বেঙ্গল গ্রন্থে বলা হয়েছে :

A closer look shows that it was a stupa and "was probably an ultimate transformation of a hemispherical structure due to an excessive tendency towards elevation and elongation. Along with the multiplication of the different elements there was also a corresponding elevatiron of each component part, and here, even without the basement that is lost, we find that the drum and the dome each represents a high cylinder, their total height being more than three times the diameter of the bottom. The drum, as usual, is ornamented with four figures in the niches, while the plaim dome is surmounted by the *harmika*, not square but circular and ribbed on edge, just like the *amalaka-sila a* of a temple. This is a peculiarity which is noticed here for the first time in case of a stupa monument. Next we have the *chhatra* discs, gradually diminishing in size as they go up. The sense of accentuated height on strongly manifast in the whole composition, which gives to this pabticular specimen almost the appearance of a miniature obelisk, though with a round contour."[১]

পাহাড়পুরে বিশেষ করে সত্যপীরের ভিটায় অসংখ্য ভোটিভ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। কিন্তু এসব ভবনের ভিত্তিদেশ মাত্র পাওয়া গেছে, এগুলির উপরের অংশ বহু পূর্বেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। ভিত্তিগুলির পরিকল্পনাতে বর্গাকৃতি, ক্রুশাকার, বৃত্তাকার ইত্যাদি বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। কোনো কোনো ভিত্তিতে অফসেট প্রক্ষেপণ ছিল। স্তূপগুলির উপরিভাগের অভাবে এগুলির সঠিক স্বরূপ নির্ধারণ করা সম্ভব না হলেও আশরাফপুরে প্রাপ্ত স্তূপ প্রতিকৃতিটি এ ব্যাপারে আমাদের সহায়ক হতে পারে। উপরে আশরাফপুর স্তূপ প্রতিকৃতি দ্র.।

পাহাড়পুর ছাড়াও এদেশের আরও অনেক প্রাচীন স্থানে স্তূপের অস্তিত্ব ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ-তর্পণঘাট, চরকাই-বিরামপুর, চণ্ডিপুর-গড়পিঙলাই, চকজুনিদ-দারিয়া প্রভৃতি স্থান ছাড়াও বগুড়া জেলার মহাস্থান গড়ের চারদিকের অসংখ্য ধ্বংসস্তূপসহ এদেশের আরও অনেক প্রাচীন স্থানে বৌদ্ধ স্তূপের

১. Ibid, pp. 484-85.

অস্তিত্ব যে ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নবাবগঞ্জ-তর্পণঘাট, চকজুনিদ-দারিয়া টুঙ্গিশহর প্রভৃতি স্থানে স্তূপের ধ্বংসাবশেষে আমরা নিজের চোখেই দেখতে পেয়েছি যে, ইটহরণকারীরা সেসব স্তূপ থেকে ইট সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

মন্দির স্থাপত্য (হিন্দু ও বৌদ্ধ)

প্রাচীনতর যুগের কথা সঠিকভাবে কিছু বলা না গেলেও এই উপমহাদেশে অন্তত গুপ্ত যুগে যে অসংখ্য মন্দিরাদি নির্মিত হয়েছিল সে সম্পর্কে প্রমাণের অভাব নেই। কিন্তু এদেশে (বাংলাদেশে) কোনো প্রাচীন মন্দিরের অস্তিত্ব আটুট অবস্থায় টিকে নেই। তবে বিভিন্ন বর্ণনা, প্রাচীন প্রস্তর নির্মিত নিদর্শন (replica), প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে উল্লিখিত নিদর্শন ইত্যাদি দেখে প্রাক-মুসলিম মন্দিরাদি সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যায়। সে সময়ে এদেশে নির্মিত মন্দিরগুলি ছিল মোটামুটি উত্তর ভারতীয় পদ্ধতিতে নির্মিত।

সে যুগে নির্মিত মন্দিরগুলি ছিল মোটামুটি চার রকমের এবং সেগুলি ছিল (১) ভদ্র, পিড়া-বা একাধিক তাক বিশিষ্ট (tiered) পদ্ধতির, (২) রেখা বা শিখর পদ্ধতির, (৩) উপরে স্তূপসংবলিত ভদ্র পদ্ধতির এবং (৪) শিখর বিশিষ্ট ভদ্র মন্দির পদ্ধতির।

১. ভদ্র, পিড়া বা টায়ার্ড (tiered) পদ্ধতির মন্দিরে প্রধান কক্ষের (sanctum) উপরে ক্রমশ সরু হয়ে যাওয়া একাধিক তাক থাকত এবং সর্বোচ্চ অংশে থাকত আমলক শিলা। আশরাফপুরে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জ নির্মিত স্তূপ নিদর্শনে (উপরে উল্লিখিত) এ জাতীয় মন্দিরের কিছু নমুনা পাওয়া যায়। অবশ্য শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় 'দিনাজপুর মিউজিয়াম' গ্রন্থের প্রচ্ছদে।[১]

এখানে প্রদত্ত নকশাটিতে ক্রমশ সরু হয়ে যাওয়া তিনটি তাক দেখা যায় এবং সেগুলি একটার ওপর অন্যটা স্থাপিত এবং সর্বোচ্চ অংশে যেখানে আমলকশিলা অবস্থিত সেখানে স্কন্ধদেশ (neck) আপেক্ষাকৃত সরু। এই ক্ষুদ্র অনুকৃতি (miniature) খুব প্রাচীন নয়—নবম বা অষ্টম শতাব্দীর পূর্বের নয়। এ ধরনের রুদ্ধ বিকাশছাদ থেকেই দীর্ঘকরণ ও সমুন্নত (elongation and elevation) প্রক্রিয়াদির সৃষ্টি হয়েছিল।

২. রেখা বা শিখর পদ্ধতির মন্দিরের ক্রমশ সরু হয়ে যাওয়া উঁচু চূড়াতে (tower) সর্বোচ্চ অংশে থাকত আমলক শিলা। এ ধরনের মন্দির গর্ভগৃহের (sanctum) উপরে নির্মিত হত। ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে নগর পদ্ধতির মন্দির নামে পরিচিত এ মন্দিরে ক্রুশাকারে পরিকল্পনা এবং প্রত্যেক দিকেই অফসেট প্রক্ষেপণ থাকত এবং উঁচু শিখ্য (high curvilinear tower) ছিল এসব মন্দিরের বৈশিষ্ট্য। উড়িষ্যা ও দক্ষিণ ভারতে এ ধরনের অসংখ্য মন্দির নির্মিত হয়েছিল। বাংলাদেশে এধরনের কোনো মন্দিরের অস্তিত্ব দেখা যায় না যদিও ভারতের পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলায় এধরনের একটি[২] এবং বাঁকুড়া জেলায় দুটি মন্দির দেখা যায়। বৃহত্তর রাজশাহী জেলার নিমদিঘি নামক স্থানে একটি[৩] ও বৃহত্তর দিনাজপুর জেলায় আর একটি পাথরের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি আবিষ্কৃত

১. আ. কা. মোঃ যাকারিয়া : দিনাজপুর মিউজিয়াম, প্রচ্ছদ ও ১৪ পৃষ্ঠা : ২৭ ক্রমিক।
২. History of Bengal, Vol 1, P XLIII, 104,
৩. প্রাগুক্ত P-XXDIV, 84

হয়েছিল।[১] চট্টগ্রামের ঝিয়ারিতে এ ধরনের একটি ব্রোঞ্জের চৈত্য[২] আবিষ্কৃত হয়েছিল। এগুলিতে শিখরের সর্বোচ্চ অংশে ছিল আমলক শিলা। বর্ধমান জেলার বরাকর মন্দিরের সর্বোচ্চ অংশে আমলক শিলা আছে। বাগেরহাট জেলার কোদলা মঠ[৩] (পরে দ্র.) ও ফরিদপুর জেলার মথুরাপুর দেউল,[৪] (পরে দ্র.) রেখা বা শিখর ধরনের, মন্দির, যদিও এ দুটির সর্বোচ্চ অংশে আমলক শিলার অস্তিত্ব নেই। এ দুটি খুব সম্ভব সতের শতকে নির্মিত।

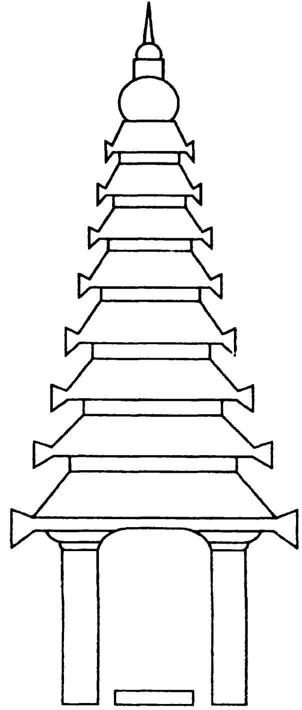
৩. তৃতীয় ধরনের মন্দিরগুলি তাক বিশিষ্ট (tiered) হলেও মন্দিরের সর্বোচ্চ দেশে থাকত একটি স্তূপের অস্তিত্ব। এ ধরনের কোনো মন্দিরের অস্তিত্ব এদেশে টিকে না থাকলেও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে কিছু কিছু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ-পরগনা জেলার সুন্দরবনে অবস্থিত জটার দেউলের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। মন্দিরটি খুবই ধ্বংসপ্রাপ্ত ছিল। কিন্তু বর্তমান কালে মেরামত করে এটিকে নতুন রূপ দান করা হয়েছে। ফলে পুরাতন মন্দিরের অনেক চিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের এ মন্দির এবং আরও গোটা কয়েক ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ প্রমাণ করে যে, এ ধরনের বহু মন্দির প্রাচীন কালে বাঙলায় ছিল।

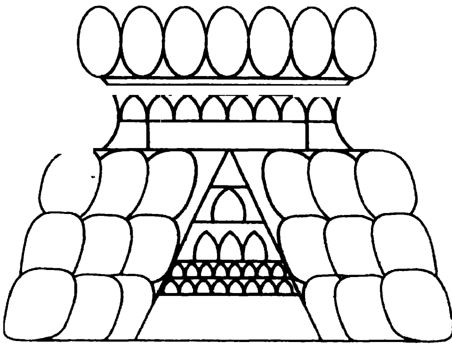
৪. চতুর্থ ধরনের মন্দিরগুলি তাকবিশিষ্ট (tiered) হলেও মন্দিরের সর্বোচ্চ অংশে ছিল একটি শিখর। ঢাকা জেলার মহাকালীতে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি ও পুণ্ড্রবর্ধনে প্রাপ্ত বুদ্ধ মন্দিরের দৃষ্টান্তে এ ধরনের মন্দিরের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। উভয় ক্ষেত্রেই কার্ভিলাইনয়ার (Curvilinear) শিখর দেখা যায়। এ ধরনের মন্দিরের দৃষ্টান্ত বাগেরহাটের ঠাকুরদিঘিতে খননকালে প্রাপ্ত, সেখানকার শিববাটি গ্রামে ও বর্তমানে ঢাকার কমলাপুর বৌদ্ধবিহারে রক্ষিত বুদ্ধ মূর্তিতে দেখা যায়।

উপরে উল্লিখিত চার শ্রেণীর মন্দির ছাড়াও এদেশে কিছু কিছু অদ্ভুত ধরনের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বগুড়া জেলার মহাস্থানে আবিষ্কৃত গোকুল মেঢ় মন্দিরের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে (পরে দ্র.)। উৎখননের পরে এখানে যে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, ছোট বড় ১৭২ টি প্রকোষ্ঠ বিভিন্ন ক্রম হ্রস্বায়মান তাকে নির্মান করে সেগুলি মাটিদ্বারা ভরতি করে এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল যে, এগুলি ছিল বিরাট আকারের মন্দিরের ভিত্তিদেশ এবং বিরাট আকারের সর্বোচ্চ অংশে ছিল একটি মাত্র কক্ষ (পরে গোকুল মেঢ় দ্র.)। হাল আমলে যশোহর জেলার ভরত ভায়না ঢিবিতে আংশিক খননের পরে প্রায় অনুরূপ একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। দিনাজপুর জেলার চকজুনিদ-দারিয়ার অরুণধাপ-(পরে দ্র.) নামক ঢিবিতে আংশিক খননের ফলে প্রায় অনুরূপ একটি ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ থানার অরুণধাপে যে আংশিক খনন কার্য করা হয়েছে তাতেও দেখা যায় যে, খুব সম্ভব প্রায় গোকুল মেঢ়ের আকৃতির একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখানে ছিল। বাংলাদেশে উৎখনন করলে এ ধরনের আরও কিছু কিছু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হয়ত পাওয়া যেতে পারে।

---

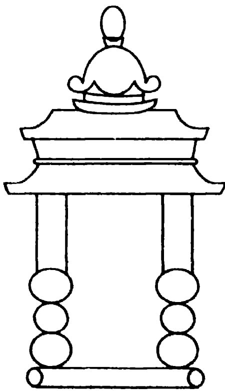
১. History of Bangal, vol. I. "p. 501, pl XXXVI, 87
২. প্রাগুক্ত pl XXXIV, 84
৩. কোদলা মঠ প্ল্যাট নং ... পৃ ৪১৭ :
৪. মথুরাপুর দেউল প্ল্যাট নং ... পৃ ৪৬৪।



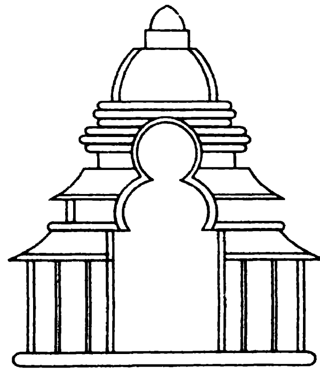


১
মন্দিরের স্কেচ

রের স্কেচ



৩
মন্দিরের স্কেচ



৪
মন্দিরের স্কেচ

আবাসগৃহ

সে যুগে নির্মিত আবাসগৃহের বিশেষ কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। চতুর্থ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই আটশ বছরের ইতিহাসে জানা যায় যে, অসংখ্য নৃপতি এদেশে রাজত্ব করে গেছেন। তাঁদের রাজত্ব কালে নির্মিত অসংখ্য বিহার, স্তূপ, মন্দির প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া গেছে এবং যাচ্ছে। কিন্তু কোনো রাজ প্রাসাদের নিদর্শন পুরাপুরি আবিষ্কৃত হয়নি। এতে ধারণা হয় যে, তখনকার দিনের রাজারা খুব সম্ভব নিজেদের ব্যবহারিক ইমারতাদি নির্মাণের ব্যাপারে খুব তৎপর ছিলেন না। সেকালে ইমারতাদি নির্মাণ খুব সহজও ছিল না। এদেশের সহজলভ্য উপকরণাদি দিয়ে তাঁরা সম্ভবত বাসগৃহাদি নির্মাণ করতেন। এদেশে ঢেউটিনের ব্যাপক আমদানির আগে সঙ্গতিপন্ন লোকের বাড়িতে থাকত বড় বড় দোচালা ছনের ঘর। ১০ থেকে ২৫ হাত লম্বা সে সব ঘরের চারটি কোণ হাত দিয়ে ছোঁয়া যেত। ধনুকাকৃতির চালের উপরিভাগ হত বেশ উঁচু, প্রায় ১৫/২০ ফুট উঁচু। চালগুলি প্রায় এক ফুট পুরু করে ছন দিয়ে ছাওয়া হত।

আরও উঁচু স্তরের লোকেরা ছনের চার'চালা, আটচালা ঘর তৈরি করতেন। বর্তমান কালে এদেশে ঢেউ টিনের তৈরি যে সমস্ত আটচালা ঘর দেখা যায় প্রায় সে রকমই ছিল আগেকার দিনের ছনের আটচালা ঘর। শুধু ঢেউ টিনের বদলে প্রায় দেড় ফুট পুরু ছনের ছাউনি থাকত চালের উপরে। সাধারণত ২০ ফুট × ৩০ ফুট আয়তন বিশিষ্ট হত এ সমস্ত ঘর। সাধারণত ২৮টি খুঁটির উপরে ঘরের চাল নির্মিত হত। লম্বা দু'দিকে ৬টি করে ১২টি, পাশের দু'দিকে ৪টি করে ৮টি, এই মোট ২৮টি খুঁটি মোটা মোটা গাছ দিয়ে তৈরি করা হত। অনেক রাজা-বাদশাও এ ধরনের ঘরে বাস করতেন বলে জানা যায়। ব্রিটিশ আমলের মাঝামাঝি সময়ে দালান-কোঠা নির্মাণের হিড়িক পড়ার আগে বড় বড় জমিদারদের বাড়িতে এ ধরনের বহু আটচালা ঘরের অস্তিত্ব দেখা যেত।

আগেকার দিনে বসবাসের জন্য দালান-কোঠা নির্মিত যে হতনা, তা নয়। তবে সেগুলি ছিল অত্যন্ত সীমিত সংখ্যার। একমাত্র মহাস্থানগড় ছাড়া আর কোথাও সে কালের রাজারাজড়াদের জন্য তৈরি আবাস গৃহের তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়নি। ভিতরগড়ের মত বিরাট দুর্গনগরীতে রাজবাড়ি বলে যে স্থানটিকে চিহ্নিত করা হয় এবং যেখানে অতি ক্ষুদ্র দু'একটি ইমারতের যে-ভগ্নাবশেষ দেখা যায়, তা এই বিরাট দুর্গনগরীর তুলনায় এতই ক্ষুদ্র যে তাকে রাজবাড়ি বলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। কাটাদুয়ারের মতো বিরাট দুর্গনগরীতে রাজবাড়ি বলে কথিত যে সমস্ত-ইমারতাদির চিহ্ন পাওয়া গেছে, তাও ছিল অতি ক্ষুদ্র। অন্যান্য দুর্গনগরীর ক্ষেত্রে একই বক্তব্য প্রযোজ্য। যদি সেকালে বাসগৃহের জন্য বিরাট আকারের ইমারতাদি নির্মিত হত তবে নিশ্চয়ই এগুলির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যেত। বিহার, মন্দির, স্তূপ ইত্যাদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যাচ্ছে, আবাসগৃহাদি নির্মিত হয়ে থাকলে সেগুলির ধ্বংসাবশেষ না পাওয়ার কোন যুক্তিই থাকতে পারে না। অত্যন্ত কাছাকাছি স্থানের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। বিক্রমপুর ছিল বহু রাজবংশের রাজধানী। অন্যদের কথা বাদ দিলেও চন্দ্র ও সেন বংশীয় রাজারা যে এখানে বংশানুক্রমে বহুকাল ধরে

রাজত্ব করে গেছেন অসংখ্য তাম্রলিপিতে সে প্রমাণ পাওয়া যায়। অথচ চন্দ্রদের আবাস বাটীর কোনো চিহ্ন এখানে পাওয়া যায়নি। বল্লালবাড়ি বলে পরিচিত সেনদের পরিখাবেষ্টিত আবাসবাটীটি অবশ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু প্রবল প্রতাপান্বিত সেনদের পাঁচপুরুষের রাজধানীর এই আবাস বাটীটির যে নমুনা পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে তা পরবর্তী কালের যে কোন সঙ্গতিপন্ন জমিদার বাড়ির চেয়ে বড় ছিল না। আর সেখানে পাকা ইমারতাদির অবস্থানও খুব উল্লেখযোগ্য ছিল না।

এতে ধারণা হয় যে, সেকালের রাজা-বাদশারা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদি নির্মাণে যতটা তৎপর ছিলেন নিজেদের বাসগৃহ ইত্যাদি নির্মাণের ব্যাপারে ততটা ছিলেন না। ঐহিক সুখলাভের চেয়ে পারলৌকিক মংগলের জন্যই তাঁরা অধিক আগ্রহী ছিলেন বলে মনে হয়।

সেতু ও পাকা রাস্তা

পাকারাস্তা : সে যুগে রাস্তা-ঘাট যে ছিল নানা সূত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে পাকা রাস্তার অস্তিত্ব বোধ হয় খুব বেশি ছিল না। বর্তমান কালের রাজপথ (highway) নামটি তখনকার দিনের রাস্তা থেকেই এসেছে। রাজরাজড়াদের গমনাগমন, সৈন্য বাহিনী নিয়ে অভিযান চালান, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি নানা প্রকার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাজপথগুলি নির্মিত হত। রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হলেও এ সমস্ত পথের সবটাই পাকা ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কোনো কোনো প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এবং ধারে কাছে পাকা রাস্তার চিহ্ন অবশ্য পাওয়া গেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দিনাজপুর জেলার পুকুরী (পুকুরী দ্র.), পাবনা জেলার নিমগাছি (নিমগাছি-বিরাট শহর দ্র.), রাজশাহী জেলার আমাইর (আমাইর দ্র.), যশোর জেলার বারবাজার (বারবাজার দ্র.) প্রভৃতি অসংখ্য স্থানের উল্লেখ করা যেতে পারে। এ সমস্ত প্রাচীন স্থানের সীমাবদ্ধ এলাকায় প্রাচীন কালে নির্মিত পাকা সড়কের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু নগরীর বাইরে এসব পাকা রাস্তা খুব বেশি দূর প্রসারিত ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তখনকার দিনের দীর্ঘতম যে-পাকা সড়কের সন্ধান পাওয়া গেছে তা হচ্ছে পাহাড়পুর বিহার ও হলুদ বিহারের সংযোগ কারী প্রায় ৯ মাইল দীর্ঘ পাকা সড়ক। এর পরেই দিনাজপুর জেলার চরকাই-তর্পণঘাট (চোর চক্রবর্তী ও সীতাকোট বিহার দ্র.) পাকা সড়ক। এটির দৈর্ঘ ছিল প্রায় ৪ মাইল। বাকি যে সমস্ত পাকা সড়কের চিহ্ন পাওয়া গেছে সেগুলি আকারে বেশ ছোট।

সেতু : তখনকার দিনে খুব বেশি সেতু নির্মিত হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। সেকালে নদীগুলি ছিল প্রায়ই বিরাট আকারের। আর অসংখ্য নদী-নালার অস্তিত্ব ছিল এ দেশে। এ গুলির উপর সেতু নির্মাণ খুব সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। তাই নদীগুলিকে অতিক্রম করার জন্য খেয়ার ব্যবস্থা থাকত। খেয়াগুলি পরবর্তীকালে 'গুদারা' নামে পরিচিত হয়েছিল। তবে সেতু যে একদম ছিল না, তা নয়। বহুকাল পরে, বিশেষত নদীর গতি পরিবর্তন ও ভাঙনের ফলে, সেতু গুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বগুড়া

জেলার পাথরঘাটায় (পাথরঘাটা দ্র.) যে প্রস্তর নির্মিত সেতুটির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, তাতে মনে হয় যে, সে কালে পাকা সেতু নির্মাণ করার প্রথা ছিল।

স্তম্ভ

সম্রাট অশোকের যুগে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য স্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল। সে সময়ের কোনো স্তম্ভ এদেশে আবিষ্কৃত হয়নি। অশোকের পরেও অনেক স্তম্ভ উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে নির্মিত হয়েছিল। বাংলাদেশে সে সব স্তম্ভেরও কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। পাল ও সেন নৃপতিদের সময়ে এদেশে কিছু কিছু স্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। সেকালে নির্মিত সব ক'টা স্তম্ভ টিকে নেই। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে দুটি স্তম্ভের অস্তিত্ব দেখা যায়। এ দুটির মধ্যে মংগলবাড়ির গরুড়স্তম্ভ (মংগল বাড়ি গরুড় স্তম্ভ দ্র.) বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। নারায়ণ পালের রাজত্বকালে নির্মিত এ স্তম্ভে উৎকীর্ণ একটি লিপি আছে। অপর স্তম্ভটিও বৃহত্তর রাজশাহী জেলায়ই অবস্থিত। ধীবর বা দীবর দিঘির মধ্যস্থলে প্রায় ৩০ ফুট উঁচু এ স্তম্ভ কৈবর্ত রাজ ভীম কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল বলে (ধীবর দিঘি দ্র.) জনপ্রবাদ আছে। বিক্রমপুরে একটি স্তম্ভ পাওয়া গেছে। ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত এই বিরাট স্তম্ভ খুব সম্ভব সেনদের রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল। শেষোক্ত দুটি স্তম্ভে কোন উৎকীর্ণ লিপি নেই। এদেশে আরও অনেক স্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়।

ভাস্কর্য

ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্থান অতুলনীয়। শুঙ্গযুগ থেকে আরম্ভ করে সেন যুগ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ে অসংখ্য প্রস্তর ও ধাতব মূর্তি নির্মিত হয়েছিল। আদিতে গান্ধারা ও মথুরার শিল্পশৈলী দ্বারা প্রভাবান্বিত হলেও কালক্রমে বাংলাদেশে একটি স্বতন্ত্র ধারা গড়ে ওঠে পাল যুগে। এ তিনটি ধারার প্রভাবই এদেশের পরবর্তী ভাস্কর্য-শিল্পে পরিলক্ষিত হয় এবং অসংখ্য মূর্তি নির্মিত হয়। বাংলাদেশে যে কত মূর্তি নির্মিত হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। হিন্দু-বৌদ্ধ রাজত্বের অবসানে এ দেশে মুসলমানের রাজত্ব চলে বহু কাল ধরে। মুসলিম অধিকাবের প্রথম দিকে বেশ কিছু মূর্তি নষ্ট হয়েছিল বলে নানা সূত্রে বলা হয়ে থাকে। এর মধ্যে যে সত্যতা নেই তা হলফ করে বলা যায় না। যে কারণেই হোক অসংখ্য মূর্তির ভগ্নাবশেষ আজও এখানে-ওখানে পাওয়া যায়। মূর্তি ধ্বংসের কথা বাদ দিলেও বাংলাদেশে যে সব মূর্তি পাওয়া গেছে সংখ্যায় সেগুলিও অনেক। এদেশ সহ উপমহাদেশের বিভিন্ন যাদুঘরে বাংলাদেশের অসংখ্য মূর্তি রক্ষিত আছে। তাছাড়া ইউরোপ ও আমেরিকাতেও এদেশের বহু মূর্তি আছে।

মূর্তি গুলির মধ্যে আছে প্রধানত (ক) বৌদ্ধমূর্তি, (খ) হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি ও (গ) অন্যান্য মূর্তি। বৌদ্ধ মূর্তি গুলির মধ্যে আছে, বুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর, লোকনাথ, মঞ্জুশ্রী, জম্ভল, হেরুকা, পিণ্ডোলা, প্রজ্ঞাপারমিতা, মারিচী, বজ্রতারা, শিতাতপত্র, ভ্রূকুটি তারা, শ্যাম তারা, পর্ণশবরী, মহাপ্রতিশরা, হারিতী প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি। হিন্দু

দেবদেবীর মূর্তিগুলির মধ্যে আছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার, গরুড়, শিবলিঙ্গ, অর্ধনারীশ্বর, সদ্যোজাত, গণেশ, সূর্য, রেবন্ত, লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, গৌরী, পার্বতী, মহামায়া, সর্বাণী, চামুণ্ডা, মনসা প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি।

সংখ্যার দিক থেকে বৌদ্ধ মূর্তির চেয়ে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি অনেক বেশি। এ দেশের রাজরাজড়াদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাই ছিল বেশি। তাঁদের রাজত্বকালও ছিল অনেক বেশি। এতে স্বভাবতই ধারণা হয় যে, বৌদ্ধ মূর্তির সংখ্যা বেশি ছিল। কিন্তু সমগ্র দেশে অতি অল্প সংখ্যক বৌদ্ধ মূর্তিই পাওয়া গেছে। এ সম্পর্কে নানারকম বক্তব্য শোনা যায় কিন্তু এর সঠিক কারণ নির্ণিত হয়নি। বৌদ্ধ মূর্তির তুলনায় হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি অনেক অনেক গুণে বেশি। এবং সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে বিষ্ণুমূর্তি। কিছু কিছু জৈন মূর্তিও আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলি সংখ্যায় অত্যন্ত কম।

সে যুগের বেশির ভাগ মূর্তি ছিল প্রস্তর নির্মিত। বেলে পাথর (sand stone) ও কাল পাথরের (black basalt) তৈরি মূর্তিই সবচেয়ে বেশি। কিছু কিছু গ্রানাইট (granite) পাথরের মূর্তিও পাওয়া গেছে। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন মূর্তিগুলির বেশির ভাগ বেলে পাথরে তৈরি। পাল-সেন যুগে মূর্তি নির্মাণে রাজমহলের কাল পাথর অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। ধাতব পদার্থেরও অনেক মূর্তি পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তির সংখ্যাই অধিক। অন্যান্য ধাতু যথা, সোনা-রূপার তৈরি অতি অল্প সংখ্যক মূর্তিও পাওয়া গেছে।

বিক্রমপুর অঞ্চলে কাঠের তৈরি কিছু কিছু মূর্তি পাওয়া গেছে। সংখ্যায় এগুলি বেশি না হলেও মূর্তিগুলির কারুকার্য অত্যন্ত উন্নতমানের।

পোড়ামাটির চিত্রফলক

বাংলাদেশের শিল্পকলার ক্ষেত্রে পোড়ামাটির চিত্রফলক এক অনন্য অবদান। বিভিন্ন আকারের মাটির ফলক তৈরি করে সেগুলিতে বিভিন্ন চিত্র অঙ্কিত করে ইটের মত আগুনে পুড়িয়ে চিত্রফলকগুলি তৈরি করা হত। তার পর বিভিন্ন ইমারতের বিশেষ করে মন্দিরগাত্রে সেগুলি সন্নিবেশিত করা হত ইমারতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও দেয়ালের একঘেঁয়েমি দূর করার জন্য।

পোড়ামাটির ফলকচিত্রের সৃষ্টি প্রথমে কবে হয়েছে সে সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা কঠিন। সম্রাট আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের (খ্রি. পূ. ৩২৭) পরে উপমহাদেশে ভাস্কর্য শিল্পের প্রবর্তন হয়েছে বলে পণ্ডিতদের অভিমত। এবং এর পরে বাংলাদেশে এর প্রচলন হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। পোড়ামাটির চিত্রফলক এর সঙ্গে সম্পৃক্ত কিনা, তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে গুপ্ত যুগে পোড়ামাটির চিত্র ফলক শিল্পকলার ক্ষেত্রে অতি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। গুপ্ত যুগের, বিশেষ করে পরবর্তী গুপ্ত যুগের, পোড়ামাটির চিত্র ফলকগুলিতে অতি উন্নতমানের শৈল্পিক সৌকর্য দেখা যায়। তার পরে এ শিল্পের নৈপুণ্যে কিছু অবনতি দেখা যায়। কিন্তু শিল্প শৈলীর অভাব ঘটলেও প্রাণবন্ততার দিক থেকে এগুলি ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শালবন, পাহাড়পুর প্রভৃতি বিহারগুলিতে যে অজস্র পোড়ামাটির

চিত্র ফলক দেখা যায়, সেগুলি সম্পর্কে এ মন্তব্য প্রযোজ্য (পাহাড়পুর ও শালবন বিহার দ্র.)। পাল-সেন যুগে পোড়ামাটির চিত্রফলকের মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলেও পূর্ববর্তী গুপ্ত যুগের পর্যায়ে উঠতে পারেনি।

হিন্দ-বৌদ্ধ যুগের অসংখ্য পোড়ামাটির চিত্রফলক পাওয়া গেছে। বুদ্ধসহ বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এবং পশু, পক্ষী, ফুল, ফল, লতাপাতা ইত্যাদির চিত্রও এগুলিতে আছে। এ শিল্পে বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য ভাল রকমেই ফুটে উঠেছে।

জলাশয়

এ যুগে অসংখ্য ছোট বড় জলাশয় খনন করা হয়েছিল। অনেক জলাশয় মজে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও অসংখ্য জলাশয় এখনও টিকে আছে। বড় বড় জলাশয়গুলির বেশিরভাগ বর্তমানে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে পড়লেও বেশ কয়েকটি জলাশয়ের অস্তিত্ব এখানে আছে। এগুলির মধ্যে বৃহত্তর রংপুর জেলার বিন্নার দিঘি ও নীল দিঘি; বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার ভিতরগড়ের দিঘি, রামরাই দিঘি, ছয়ঘটির দিঘি, বামন দিঘি, সসরা-পেয়ালা দিঘি, বেলোয়া দিঘি, নয়ান দিঘি ও ভাঙ্গা দিঘি; বৃহত্তর বগুড়া জেলার শশাঙ্ক দিঘি ও শব্দল দিঘি; সিরাজগঞ্জ জেলার জয় সাগর, উদয় দিঘি ও শৈল দিঘি; বৃহত্তর রাজশাহী জেলার প্রদ্যুম্নেশ্বরের দিঘি, (পদমশার দিঘি), ধীবর বা দীবর দিঘি; কালীসাগর, আলতা দিঘি ও ছয় ঘটির দিঘি; বৃহত্তর ঢাকা জেলার রামপাল দিঘি, ধামারন দিঘি, নই দিঘি, মামাসার দিঘি ও ধামদহ দিঘি ও টাঙ্গাইল জেলার সাগর দিঘি; বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার জীবদহ দিঘি; কুমিল্লা জেলার ধর্মসাগর দিঘি ও কমলা সাগির দিঘি; শ্রীহট্ট জেলার রাজার মায়ের দিঘি; চট্টগ্রাম জেলার ঠাকুর দিঘি ও যশোর জেলার সদাগরের দিঘি, রাজমাতার দিঘি এবং ফরিদপুর জেলার পাতরাইলের দিঘি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এ সমস্ত বড় বড় জলাশয় ছাড়া আরও অসংখ্য জলাশয় সে যুগে খনিত হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে অনেক জলাশয় এখনও টিকে আছে।

মুদ্রা

মৌর্য যুগের ছাঁচে ঢালা ও ছাপযুক্ত মুদ্রা যে এদেশে অনেক পাওয়া গেছে সে কথা আগেই বলা হয়েছে। শুঙ্গ ও কুষাণ যুগের অতি সীমিত সংখ্যক মুদ্রাও পাওয়া গেছে। গুপ্ত সম্রাটদের ও পরবর্তী গুপ্ত নৃপতিদের বহু সংখ্যক স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা বাঙলার মাটিতে আবিষ্কৃত হয়েছে। গুপ্তদের মুদ্রার অনুকরণে নির্মিত (Gupta imitation coin) অনেক মুদ্রাও পাওয়া গেছে। খুব সম্ভব গুপ্তদের পর পরেই যাঁরা এদেশে রাজত্ব করেছিলেন তাঁদের কেউ কেউ এ ধরনের মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। পাল ও সেন নৃপতিদের রাজত্বকালের কোনো উল্লেখযোগ্য মুদ্রা আজও আবিষ্কৃত হয়নি। না হবার কারণ সম্পর্কে পণ্ডিতেরা নানা কথা বলে থাকেন। তবে যত দূর মনে হয় তাঁদের রাজত্বকালে মুদ্রার ব্যাপক প্রচলন খুব সম্ভবত ছিল না। সে সময়ে কড়ি ছিল বিনিময়ের

প্রধান বাহন। এ যুগে কয়েকটি আরব দেশীয় মুদ্রা এদেশে পাওয়া গেছে। খুব সম্ভব বাণিজ্য উপলক্ষে এ ধরনের মুদ্রার আমদানি হয়েছিল।

লিপি

হিন্দুবৌদ্ধ যুগের অসংখ্য লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির প্রায় সবই তাম্রলিপি।

মুসলিম আমল

সূচনা : মুসলিম রাজশক্তি এদেশে প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছর ধরে রাজত্ব করেছিল। কিন্তু সে তুলনায় তাদের কীর্তি সংখ্যা বাংলাদেশের মাটিতে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বলা যেতে পারে। এর পিছনে প্রধান কারণ হল এই যে, বেশির ভাগ মুসলিম নৃপতির রাজধানী ছিল গৌড় ও পাণ্ডুয়াতে। সে দুটি স্থানে বিভিন্ন মুসলিম নৃপতি যে কত ইমরাত নির্মাণ করেছিলেন, তার ইয়ত্তা নেই। পাণ্ডুয়াতে নির্মিত হয়েছিল উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ মসজিদ। আদিনা মসজিদ নামে অভিহিত এ মসজিদের আয়তন ছিল '৫০৭ ফুট × ২৮৫ ফুট'। গৌড়ে নির্মিত হয়েছিল বড় সোনা মসজিদ। হুগলী জেলার ছোট পাণ্ডুয়াতে নির্মিত হয়েছিল বিরাট মসজিদ। এরকম আরও অসংখ্য ছোট-বড় কীর্তি এসব স্থানে নির্মিত হয়েছিল। এসব স্থান বর্তমানে বাংলাদেশের সীমানার বাইরে পশ্চিমবঙ্গে (ভারতে) অবস্থিত।

সুলতানী আমলে সামান্য কয়েক বছরের জন্য ঢাকা জেলার সোনারগাঁয়ে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের রাজধানী ছিল। সে সময়ে এবং তার পরেও এখানে কয়েকটি কীর্তি স্থাপিত হয়। মোঘল আমলে সুবাদার ইসলাম খানের সময় (১৬০৮ খ্রিঃ) থেকে শুরু করে প্রায় শতবর্ষ ধরে সমগ্র বাঙলার রাজধানী ঢাকাতে ছিল। সে সময়ে ঢাকাতে অনেক ইমারত গড়ে উঠেছিল। কিন্তু দিল্লী-আগ্রায় বসবাসকারী মোঘল সম্রাটেরা রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ইমারত নির্মাণের চেয়ে রাজধানী দিল্লী-আগ্রা ও নিকটবর্তী স্থানে ইমারতাদি নির্মাণে অধিক আগ্রহী ছিলেন। বাঙলায় অবস্থানরত সুবদারগণ নিজেদের খেয়াল-খুশিমত যে সমস্ত ইমারতাদি নির্মাণ করে গেছেন সেগুলিই এদেশে মোঘল আমলের একমাত্র কীর্তি।

মুসলিম আমলে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির একক প্রচেষ্টায় অসংখ্য প্রাচীন কীর্তি নির্মিত হয়। তিনি ছিলেন উলুঘ খান-ই-জাহান। তাঁর একক প্রচেষ্টায় বৃহত্তর খুলনা জেলার বাগেরহাটে এবং এ জেলা ও যশোহর জেলার বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মসজিদ ও পাকা সড়ক নির্মিত এবং অসংখ্য দিঘি-পুষ্করিণী খনিত হয়। তিনি ছিলেন খুব সম্ভব সে অঞ্চলের শাসনকর্তা। কিন্তু সামান্য একজন শাসনকর্তা বাগেরহাট ও যশোহর অঞ্চল যে-সমস্ত কীর্তি রেখে গেছেন, তা একজন সম্রাটের পক্ষেও গর্বের বস্তু। সম্রাট শাহ্জাহানের কীর্তির সঙ্গে তাঁর কীর্তির তুলনা দিতে চাইনা। কিন্তু সামান্য একজন স্থানীয় শাসন কর্তা হয়ে তিনি যা করে গেছেন, তা সম্রাট শাহ্জাহানের কীর্তির সঙ্গে তুলনার যোগ্য।

মুসলিম আমলের কীর্তিগুলির মধ্যে আছে, মসজিদ, মাদ্রাসা, মাযার, দুর্গ, আবাসিক গৃহ, সেতু, পাকা সড়ক, জলাশয়, হাম্মামখানা ইত্যাদি। এ যুগের মুদ্রাও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। মুসলিম আমলে অনেক মন্দির ও মঠ নির্মিত হয়েছিল। এগুলিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ যুগেও পোড়ামাটির ফলকচিত্রের অস্তিত্ব দেখা যায়। সুলতানী আমলের বহু ইমারতে বিশেষ করে মসজিদের বহির্দেয়ালে ও মিহরাবে অতি সুন্দর পোড়ামাটির ফলকচিত্রের অলঙ্করণ ছিল। কিন্তু হিন্দু যুগের চিত্রগুলি থেকে বিষয়-বস্তুর ব্যাপারে এগুলি ছিল সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। মানুষ ও প্রাণী জগতকে একদম বাদ দিয়ে চিত্রগুলিতে ফুল, লতাপাতা, ঝুলন্ত শিকল ও ঘন্টা ইত্যাদির প্রতিকৃতি অঙ্কিত করা হত। এবং চিত্রায়নের কাজ ছিল অতি উন্নতমানের। কিন্তু হিন্দু মন্দির ও অন্যান্য ইমারতে ব্যবহৃত চিত্র ফলকগুলিতে মানুষ ও প্রাণী জগতের চিত্র আগের মতোই অস্তিত্ববান ছিল। মোঘলদের সময়ে মসজিদ, মাযার ইত্যাদি ইমারতে পোড়ামাটির চিত্র ফলক ব্যবহৃত হবার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। কিন্তু সে যুগের হিন্দু মন্দিরগুলিতে অতি উৎকৃষ্টমানের পোড়ামাটির ফলকচিত্রের ব্যবহার দেখা যায়।

মসজিদ

সঠিক তারিখ সংবলিত ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর কোনো মসজিদের অস্তিত্ব বাংলাদেশে বর্তমানে পাওয়া যায় না। এসময়ে নির্মিত কোনো কোনো মসজিদের শিলালিপি অবশ্য পাওয়া গেছে কিন্তু মসজিদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের শেষের দিকে ও তৃতীয় পাদে নির্মিত অনেক মসজিদের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে যদিও এ সময়ে নির্মিত আরও অনেক মসজিদের অবস্থান বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যায় না। বাগেরহাটে খান-ই-জাহান কর্তৃক নির্মিত মসজিদগুলি পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের শেষের দিকে স্থাপিত হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। সেগুলি এবং ঢাকার বিনত বিবির মসজিদ খুব সম্ভব বাংলাদেশের প্রাচীনতম মসজিদের নিদর্শন। এর চেয়েও প্রাচীনতর ছিল বোধ হয় ঢাকার মোয়ায্যমপুর মসজিদ (মোয়ায্যমপুর দ্র.)। শিলালিপির পাঠ যদি ঠিক হয় তবে এটি ১৪৩২-৩৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল।

খানজাহানের মসজিদগুলির গঠন-পদ্ধতি ও স্থাপত্যকৌশলে একটু বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এক বা একাধিক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদগুলির চারদিকের প্রাচীর অত্যন্ত প্রশস্ত। উপরের গম্বুজ ছিল উল্টানো পেয়ালাকৃতির। এগুলিতে দিল্লীর তোঘলকী স্থাপত্যের প্রভাব ছিল বলে পণ্ডিতেরা ধারণা করেন। পোড়া মাটির ফলকচিত্রের কিছু কিছু ব্যবহারও মসজিদগুলিতে ছিল।

বারবকশাহ্ ও তাঁর পরবর্তীদের সময়ে নির্মিত মসজিদগুলির দেয়াল একটু কম প্রশস্ত ছিল। এবং গম্বুজের আকারেও সামান্য পার্থক্য ছিল। সে সময়ে এক গম্বুজ থেকে একাধিক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। গৌড়ের দরসবাড়ি মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, খনিয়াদীঘি মসজিদ, ধুনিচক মসজিদ, পটুয়াখালির মসজিদবাড়ি মসজিদ, বরিশালের কসবা মসজিদ, বৃহত্তর যশোরের বারবাজারের মসজিদ,

বিক্রমপুরের বাবা আদম মসজিদ, নারায়ণগঞ্জের বিবি মরিয়ম মসজিদ, দিনাজপুরের চিহিলগাজী মসজিদ, পাবনার শাহ্জাদপুর মসজিদ, চট্টগ্রামের ফকীরা মসজিদ এবং ফরিদপুরের সাতৈর ও পাতরাইল মসজিদ এ সময়ের কীর্তি। এ সময়ে চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় আরও মসজিদ নির্মিত হয়েছিল বলে লিপি প্রমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু সে সমস্ত মসজিদ বর্তমানে টিকে নেই।

সুলতান আলা-উদ্-দীন হোসেন শাহ্ ও তাঁর পুত্রদের আমলে অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এসব মসজিদের দেয়াল ছিল ৫ থেকে ৬ ফুট প্রশস্ত। উপরের গম্বুজ ছিল ভারী সুন্দর। মসজিদের গায়ে ও মিহরাবে ছিল অতি উন্নত মানের পোড়ামাটির চিত্রফলক। প্রধানত ইষ্টকনির্মিত হলেও অনেক মসজিদে ইটের সংগে পাথরের ব্যবহারও ছিল। হোসেন শাহী ধরনের (style) মসজিদ নামে পরিচিত এ মসজিদগুলির স্থাপত্য কৌশল ও শিল্পকলা ছিল অতি উন্নতমানের। গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ, বাঘা মসজিদ, দিনাজপুর জেলার সুরা মসজিদ, পাবনা জেলার নবগ্রাম মসজিদ, যশোর জেলার শৈলকূপা মসজিদ, বাগের হাটের হোসেন শাহী মসজিদ, বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার পাতরাইল মসজিদ, সোনারগাঁয়ের গোয়ালদিহি মসজিদ ও মোগরাপাড়া মসজিদ, ময়মনসিংহ জেলার জাওয়ার মসজিদ, কুমিল্লা জেলার বড় গোহালী মসজিদ এবং শ্রীহট্ট জেলার শঙ্কর পাশা মসজিদ এই আমলে নির্মিত হয়েছিল। এ সময়ে শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, টাংগাইল, ঢাকা, রংপুর ও দিনাজপুরে আরও অনেক মসজিদ নির্মিত হয়েছিল বলে লিপিপ্রমাণ পাওয়া যায়।

হোসেন শাহী আমলের পরে এবং মোঘল আমলের পূর্বে পাঠান সুলতান ও শাসন কর্তাদের আমলে কিছু সংখ্যক মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এ সমস্ত মসজিদে সুলতানী আমলের গঠন পদ্ধতিই পরিলক্ষিত হয়। রাজশাহী জেলার কুসুম্বা ও বগুড়া জেলার খেরুয়া মসজিদ এ তালিকার মধ্যে পড়ে। আতিয়া মসজিদ অনেক পরবর্তী কালের হলেও সুলতানী আমলের স্থাপত্য-প্রভাব এর মধ্যে আছে।

মোঘল আমলে এদেশে বিশেষ করে ঢাকা শহরে অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়। মোঘল আমলে নির্মিত মসজিদগুলির দেয়াল সুলতানী আমলের মসজিদের চেয়ে অনেক কম প্রশস্ত। অলঙ্করণের ব্যাপারেও বেশ পার্থক্য দেখা যায়। পোড়ামাটির চিত্র ফলকের পরিবর্তে দেয়ালগুলি প্যানেল দ্বারা অলঙ্কৃত করা হত। ঢাকার লালবাগ দুর্গের মসজিদ, ফররুখ সিয়রের মসজিদ, খান মোহাম্মদ মিরধা মসজিদ, আলাকুরীর মসজিদ, সাত গম্বুজ মসজিদ, খোওয়াজা আম্বর মসজিদ, খোওয়াজা শাহবাজ মসজিদ, মুসা খান মসজিদ, মরিয়ম সালেহা মসজিদ, চক বাজার মসজিদ, চুড়িহাট্টা মসজিদ, বেগম বাজার মসজিদ, মিটফোর্ড মসজিদ, ইসলাম খানের মসজিদ ও নারিন্দা হায়াত ব্যাপারী মসজিদ প্রভৃতি মোঘল আমলে তৈরি। চট্টগ্রামের আন্দর কিল্লা মসজিদ, কদম মোবারক মসজিদ, ওয়ালী খান মসজিদ, কুমিল্লার শাহ্ শুজা মসজিদ, শ্রীহট্টের নবাব মসজিদ, শাহজালালের দরগার মসজিদ, শাহ পরানের দরগার মসজিদ, ময়মনসিংহের এগার সিন্দুরে অবস্থিত মসজিদ তিনটি, বরিশাল জেলার বিবিচিনি মসজিদ, কুষ্টিয়া জেলার ঝাউদিয়া ও সাত বাড়িয়া মসজিদ, নোয়াখালী জেলার বজরা মসজিদ, বগুড়া জেলার

মহাস্থান মসজিদ ও খোন্দকার টোলার মসজিদ এবং রাজশাহী জেলার নিয়ামত উল্লা ওলীর মসজিদ এই আমলে নির্মিত মসজিদ গুলির তালিকার মধ্যে পড়ে।

মাদ্রাসা

মুসলিম আমলে খুব বেশি না হলেও বেশ কিছু মাদ্রাসা নির্মিত হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ্‌র আমলে গৌড়ের দরসবাড়ি মসজিদের নিকট একটি বিরাট আকারের মাদ্রাসা নির্মিত হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

মাযার

এই আমলে অসংখ্য মাযার নির্মিত হয়েছিল। কোনো কোনো মাযারে উন্মুক্ত স্থানে প্রাচীর বেষ্টিত পাকা কবর দেখা যায়। আবার কতকগুলি মাযারে পাকা সৌধ নির্মিত হয়েছে এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। সৌধগুলি প্রায়ই মসজিদের আকারে নির্মিত, উপরে গম্বুজ অথবা চৌচালা ঘরের আকারে নির্মিত প্রায় সমতল ছাদ। মসজিদ আকারে নির্মিত মাযারগুলির মধ্যে বাগেরহাটের খানজাহানের মাযার, যশোরের গরীব শাহ্‌র মাযার, রাজশাহীর নিয়ামতউল্লা ওলীর মাযার, নওদার মাযার, মখদুম শাহ্‌র মাযার, বৃহত্তর বগুড়ার নিমাইপীরের মাযার, শির মোকাম ও ধড় মোকামেব মাযার, বন্দেগী শাহ্‌র মাযার, রংপুরের শাহ্ ইসমাইল গাযীর মাযার, টাঙ্গাইল জেলার শাহ্ বাবা কাশ্মীরর মাযার, ঢাকা জেলার পরীবিবির মাযার, দারা বেগমের মাযার, সাত গম্বুজ মসজিদের নিকটবর্তী মাযার, বিবি চম্পার মাযার, খোওয়াজা শাহ্‌বাজের মাযার, হাইকোর্টের মাযার, বিবি মরিয়মের মাযার, হাজী বাবা সালেহ্‌র মাযার, সোনার গাঁয়ের ইব্রাহীম দানেশমন্দ প্রমুখদের মাযার এবং চট্টগ্রামের মোহ্‌সীন আউলিয়ার মাযার উল্লেখযোগ্য। উন্মুক্ত মাযারের মধ্যে বাগেরহাটের আলী মোহাম্মদ তাহেরের মাযার, যশোর জেলার শৈলকুপার মাযার ও বাহ্‌রাম শাহ্‌র মাযার, দিনাজপুর জেলার চিহিলগাযীর চারটি মাযার, মুল্লুক দেওয়ানের মাযার, বগুড়া জেলার মাহী সওয়ারের মাযার, পাবনা জেলার শাহ্‌জাদপুরের মাযার, ঢাকা জেলার গিয়াস উদ-দীন আযম শাহ্‌র মাযার, বাবা আদমের মাযার, বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার খড়মপুরের মাযার, শ্রীহট্টের শাহজালাল, শাহ্‌পরান, সৈয়দ নাসির-উদ্-দীন, শেখ বোরহান-উদ্-দীন, সেকেন্দার খান গাযী প্রমুখদের মাযার এবং চট্টগ্রামের বার আউলিয়ার মাযার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দুর্গ

মুসলিম আমলে বেশ কয়েকটি দুর্গ নির্মিত হয়েছিল। সুলতানী আমলে নির্মিত দুর্গের সংখ্যা কত ছিল তা বলা কঠিন। কারণ, সে আমলে বেশির ভাগ দুর্গ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যে দু'একটি দুর্গ আছে, সেগুলি দেখে ধারণা হয় যে, সে আমলের দুর্গগুলি হিন্দু-বৌদ্ধযুগের দুর্গের মতো মাটির প্রাকারবিশিষ্ট ছিল। প্রাকারের বাইরে ছিল প্রশস্ত ও

গভীর পরিখা। সুলতানী আমলের দুর্গের মধ্যে বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার হোসেনগড়, মীরগড়, কোরম খানের গড় ও ঢাকা জেলার একডালা দুর্গের উল্লেখ করা যেতে পারে। হোসেন শাহ্র আমলে কুমিল্লা জেলায় নির্মিত কৈলার গড় (বর্তমানে নিশ্চিহ্ন) ছিল খুব সম্ভব সীমান্তবর্তী অঞ্চলে। সুলতানী আমলের সবচেয়ে বিখ্যাত দুর্গ ছিল একডালা। বর্তমানে এটি পশ্চিম বঙ্গের (ভারত) পশ্চিম দিনাজপুরের সীমানার মধ্যে।

মোঘল আমলে বহু সংখ্যক দুর্গ নির্মিত হয়েছিল। এ যুগের বেশিরভাগ দুর্গের প্রাচীর ছিল ইষ্টক নির্মিত এবং দুর্গের উপরে কামান বসাবার জন্য বুরুজ থাকত। ঢাকার লালবাগ দুর্গ, নারায়নগঞ্জের হাজীপুর দুর্গ, সোনাকান্দা দুর্গ, মুন্সীগঞ্জের ইদ্রাকপুর দুর্গ ও বরিশালের শুজাবাদ দুর্গ মোঘল আমলে নির্মিত দুর্গগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ঘোড়াঘাট দুর্গ মোঘল আমলে নির্মিত নয়। এটি অনেক আগে নির্মিত হয়েছিল। তবে মোঘলদের সময়ে এ দুর্গ ব্যবহৃত হয়েছিল। বগুড়ার সেলিম নগর দুর্গ এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

আবাসগৃহ ও কাটরা

মুসলিম আমলে নির্মিত আবাসগৃহের সংখ্যা খুব বেশি নয়। এতদিন পরে তাঁদের সময়ে নির্মিত আবাস গৃহগুলি টিকে থাকারও কথা নয়, কিন্তু সেগুলির ধ্বংসাবশেষ থাকার কথা। মুসলিম আমলের বিশেষ করে সুলতানী আমলের কোনো রাজপ্রাসাদের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। সোনারগাঁয়ে বেশ কয়েকজন সুলতান রাজত্ব করেছিলেন। তাঁদের প্রাসাদের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি। অথচ সেখানে অনেক মসজিদ ও মাযারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এতে ধারণা হয় যে, সে আমলে খুব সম্ভব তেমন শক্তভাবে রাজপ্রাসাদ নির্মিত হত না। হয় তখনকার দিনের নৃপতিরা তাঁবুতে বাস করতেন, না হয় হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের নৃপতিদের মতো আটচালা জাতীয় ঘরে বসবাস করতেন। মোঘল আমলে নির্মিত প্রাসাদের চিহ্নও খুব প্রচুর নয়। শায়েস্তাখানের সময় নির্মিত লালবাগ দুর্গের ভিতরে অবস্থিত দরবার গৃহটি একজন নবাবের বাসগৃহের জন্য অত্যন্ত ছোট। সুলতান শাহ্ শুজা কর্তৃক নির্মিত গৌড়ের তাহ্খানা সম্পর্কে একই মন্তব্য প্রযোজ্য।

কাটরা : মোঘলদের সময়ে নির্মিত দুটি কাটরা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে (বড় কাটরা ও ছোট কাটরা দ্র.)। এ দুটি ইমারত ঢাকাতে মোঘল স্থাপত্যের বিশেষ নিদর্শন হিসাবে গণ্য হতে পারে।

সেতু ও পাকা সড়ক

মুসলিম আমলে কিছু কিছু পাকা সড়ক নির্মিত হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে যশোর-খুলনায় খান জাহান কর্তৃক নির্মিত পাকা সড়কগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলি ছাড়া পাকা রাজপথের চিহ্ন অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন শহরে এ আমলে পাকা সড়ক নির্মিত হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ আমলে অসংখ্য কাঁচা সড়ক নির্মিত হয়েছিল।

সুলতানী আমলে নির্মিত সেতু গুলির কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। মোঘল আমলে নির্মিত অনেক সেতুর ধ্বংসাবশেষ এখনও টিকে আছে। এ গুলির মধ্যে ঢাকা

জেলার হায়াত ব্যাপারী পুল (নারিন্দা), খোওয়াজা আম্বরের পুল (কারোয়ান বাজার), পানাম পুল, টঙ্গী পুল (এখন বিলুপ্ত), পাগলার পুল, পানাম পুল, মীর কাদিম পুল, শ্রীহট্ট শহরের পুল এবং চট্টগ্রামের বিবির পুল উল্লেখযোগ্য।

জলাশয়

মুসলিম আমলে অসংখ্য জলাশয় খনন করা হয়েছিল। এ সময়ের অনেক দিঘি-পুষ্করিণী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যে গুলি টিকে আছে সেগুলির মধ্যে বাগেরহাটের ঠাকুর দিঘি, ঘোড়া দিঘি ও পচা দিঘি, বরিশালের কমলা দিঘি, বৃহত্তর যশোরের রামসাগর, সুখ-সাগর ও কৃষ্ণ সাগর, রাজশাহীর তাহ্খানার দিঘি, ছোট সোনা মসজিদের দিঘি, দিনাজপুরের রামসাগর, শুক সাগর ও মাতা সাগর, কুমিল্লা জেলার কল্যাণ সাগর, গঙ্গা সাগর, কমলা সাগর, শমশের গাযীর দিঘি ও জগন্নাথ দিঘি এবং চট্টগ্রাম জেলার ছোটখাঁর দিঘি, মুসাখান দিঘি, ভেলুয়া দিঘি, আশকর দিঘি ও নুসরত-শাহ্র দিঘি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হাম্মামখানা

মুসলিম আমলের বেশ কয়েকটি হাম্মাম খানা বা স্নানাগারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। পাকা ইমারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত এ সমস্ত হাম্মামখানায় পাকা কূপ ও চৌবাচ্চা থাকত। চৌবাচ্চার পানি গরম করার জন্য যান্ত্রিক ব্যবস্থা সংবলিত হাম্মামখানাগুলি মোঘল আমলের কীর্তি। এদেশে মোট ৭টি হাম্মাম খানার সন্ধান এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। সেগুলি হলো, (১) গৌড়ের ফিরোজপুরের তাহখানার হাম্মামখানা (২) সাতক্ষীরার ঈশ্বরীপুরে হাম্মামখানা (৩) জাহাজঘাটার হাম্মামখানা (৪) যশোরের মীর্যানগর হাম্মামখানা (৫) ঢাকার লালবাগ দুর্গের হাম্মামখানা (৬) ঢাকার জিঞ্জিরা দুর্গের হাম্মামখানা ও (৭) ব্রাহ্মণ বাড়িয়া জেলার হরষপুরের হাম্মামখানা।

মন্দির মঠ ইত্যাদি

মুসলিম আমলে হিন্দু জমিদার ও অন্যান্য ধনাঢ্য ব্যক্তি কর্তৃক অনেক মন্দির, মঠ প্রভৃতি নির্মিত হয়েছিল। সুলতানী আমলে নির্মিত বহু সংখ্যক মন্দির নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মোঘল আমলে নির্মিত অনেক মন্দির এখনও টিকে আছে। মুসলিম আমলে নির্মিত অনেক মন্দিরে মুসলিম স্থাপত্যের বেশ প্রভাব দেখা যায়। অবশ্য এগুলিতে হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগের স্থাপত্যেরও যথেষ্ট প্রভাব আছে। অনেক ক্ষেত্রে গম্বুজ ও শিখর এ দুই-এর সমন্বয় করে মন্দির গুলি নির্মিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঢাকা শহরের ঢাকেশ্বরী মন্দির দিনাজপুর জেলার ঠাকুর গাঁয়ের গোবিন্দজীর মন্দির, খুলনা জেলার শেখের টেকের মন্দির ও ডামরেলীর নবরত্ন মন্দির প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। এ যুগে নির্মিত কতগুলি মন্দিরে বাংলাদেশের অতি প্রচলিত দোচালা ঘরের মত পাকা ছাদ দেখা যায়। এটি বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদ। পাবনা জেলার জোড়বাংলা মন্দির ও হাণ্ডিয়ালের

দোচালা মন্দির, যশোরের চাঁচড়ার দোচালা মন্দির ও রায়গ্রাম মন্দিরের উল্লেখ করা যেতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক দোচালা চালের সংযোগে মন্দিরের ছাদ নির্মিত হত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার খালিয়া মন্দির, পাবনা শহরের জোড় বাংলা মন্দিরের উল্লেখ করা যেতে পারে। এক বা একাধিক রত্ন অর্থাৎ চূড়া বিশিষ্ট মন্দিরই অধিক সংখ্যায় এদেশে নির্মিত হয়েছিল। প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ স্থাপত্যের শিখর ও গথিক স্থাপত্যের আকাশচুম্বী চূড়ার সমন্বয়ে এ ধরনের মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতদের ধারণা। পঞ্চরত্ন, সপ্তরত্ন, নবরত্ন, এমনকি সতের রত্ন বিশিষ্ট মন্দিরও এ যুগে নির্মিত হয়েছিল। দিনাজপুর জেলার কান্তনগর মন্দির ছিল নবরত্ন মন্দির। এ জেলার গোপালগঞ্জের মন্দির দুটি ছিল পঞ্চরত্ন মন্দির। কুমিল্লা শহরের দক্ষিণে অবস্থিত সতেররত্ন মন্দিরের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসলিম আমলে অসংখ্য মঠ নির্মিত হয়েছিল। সুলতানী আমলে নির্মিত কোনো মঠের অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না। মোঘল আমলের প্রথম দিকে নির্মিত মঠগুলির বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মতো। প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের শেষ আশ্রয়স্থল ছিল উড়িষ্যাতে। সে দেশ বহুকাল ধরে মুসলিম অধিকারের বাইরে থাকার ফলে এটি সম্ভব হয়েছিল। রেখা ও ভদ্র এই উভয়বিধ মন্দিরেরই অস্তিত্ব ছিল সেখানে। আর উড়িষ্যার স্থাপত্যের প্রভাবে বর্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে রেখা স্থাপত্যের আদলে বেশ কয়েকটি মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এই প্রভাব বাংলাদেশেও এসেছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাগের হাটের নিকটবর্তী কোদলা মঠ, ফরিদপুর জেলার মধুখালীর নিকটবর্তী মথুরাপুর মঠ ও বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার মাহিলারা সরকারের মঠের উল্লেখ করা যেতে পারে। হিন্দু স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন এই মঠগুলি। পরবর্তী কালে নির্মিত কুমিল্লা জেলার নেওড়া মাঠ, যাত্রামনি মঠ ইত্যাদিরও উল্লেখ করা যেতে পারে। এ মঠগুলি গথিক স্থাপত্যের অনুকরণে সোজা উপরে উঠে গেছে।

এ যুগের মঠ-মন্দিরে অতি সুন্দর পোড়ামাটির চিত্রফলক দেখা যায়। কোনো কোনো মন্দিরের দেয়ালগুলি পোড়ামাটির চিত্রফলক দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে আবৃত এবং অতি উঁচু মানের শিল্পশৈলী সেগুলিতে দেখা যায়। রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে চিত্র গুলির মাধ্যমে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দিনাজপুরের কান্তনগরের মন্দির, রাজশাহীর পুঠিয়ার মন্দিরগুলির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অন্যান্য মন্দিরেও পোড়ামাটির ফলক চিত্রের ব্যবহার দেখা যায়। তবে সংখ্যায় এত ব্যাপক নয়।

দোলমঞ্চগুলি এ যুগে হিন্দু স্থাপত্যের এক বিশিস্ট নিদর্শন। বর্গাকারে নির্মিত সর্বনিম্ন বেদীর উপরে থাকত বর্গাকারের পর পর আরও দুটি বেদী। তৃতীয় বেদীর উপর থাকত দোলমঞ্চের চূড়া। সেখানে হোলী উৎসবের সময় রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপন করা হত। রাজশাহীর পুঠিয়ার দোলমঞ্চ, যশোর জেলার মোহাম্মদপুরের দোলমঞ্চ, খুলনা জেলার ধুমঘাট অঞ্চলের দোলমঞ্চ ও সিরাজগঞ্জ জেলার হাটি কুমরুলের দোলমঞ্চ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

মুদ্রা ও লিপি

মুদ্রা : মুসলিম আমলে বিভিন্ন নৃপতির সময়ে মুদ্রা প্রচলিত হয়েছিল। সে সব মুদ্রার অনেকগুলি বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। ত্রয়োদশ শতাব্দ থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন সুলতানের মুদ্রা পাওয়া গেছে। মুদ্রা ও ধাতু মূল্য ছাড়াও এগুলির শিল্প-মূল্যও যথেষ্ট আছে। অনেকগুলি মুদ্রাতে অতি উন্নত মানের লিপি কৌশল (Calligraphy) দেখা যায়।

লিপি : মুসলিম আমলের অসংখ্য লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির মধ্যে আছে শিলা, তাম্র ও ইষ্টক লিপি। শিলা লিপিগুলির লিপি কৌশল (Calligraphy) অনেক ক্ষেত্রে অতি উঁচু মানের।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পঞ্চগড় জেলা

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ

শালবাহন

তেঁতুলিয়া থানার অধীনে এবং বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত শালবাহন নামক প্রাচীন স্থান পঞ্চগড়-তেঁতুলিয়া পাকা সড়কের উপর অবস্থিত ভজনপুর নাম স্থান থেকে প্রায় সাড়ে ৪ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে একটি মরা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে একটি প্রাচীন টিবি আছে। প্রায় ৯০ মিটার × ৬০ মিটার আয়তনের এ টিবিটির উচ্চতা প্রায় ৬ মিটার এবং সারা টিবি প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ।

এ টিবি থেকে কিছু পূর্বদিকে নদীর উত্তর পাড়ে একটি অপেক্ষাকৃত উঁচু ও জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে একটি ছোট ইমারতের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন দেখা যায়। এখানে বেশ কয়েকটি প্রাচীন মূর্তি পড়ে ছিল বলে বিশস্তসূত্রে জানা গেছে। এখন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ছাড়া আর কিছুই নেই। প্রতি বছর চৈত্র-বৈশাখে শালবাহনে একটি মেলা বসে। স্থানীয় নিম্নবর্ণের হিন্দু ও পলিয়া অধিবাসীরা বহু দূর থেকে মেলায় আসেন এবং পূজা করেন।

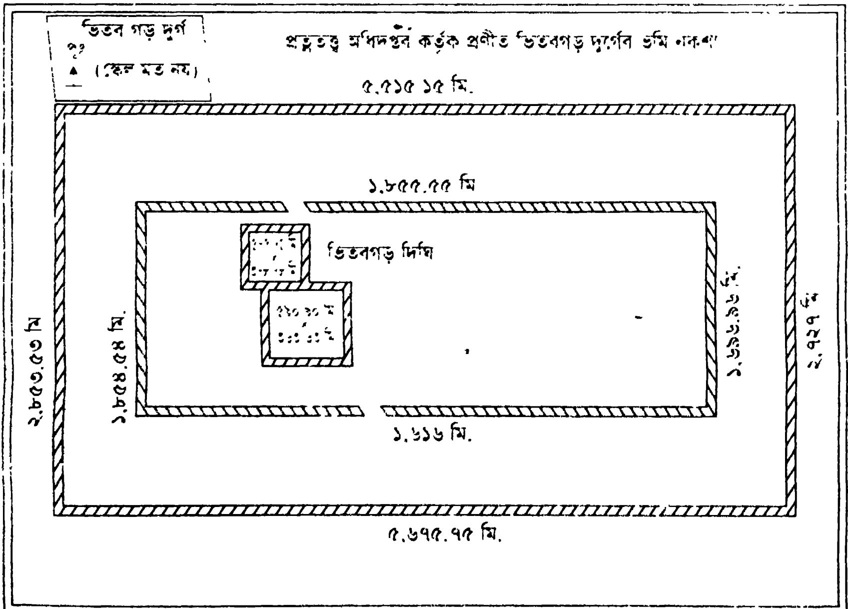
স্থানীয় প্রবল জনপ্রবাদ মতে জানা যায় যে, এখানে ছিল শালবাহন নামক এক রাজার বাড়ি। নানা সূত্রে এক শালবাহন রাজার কথা শোনা যায়। কিন্তু তাঁর কোনো সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। এ স্থান অত্যন্ত প্রাচীন এবং প্রাচীন কালে এখানে যে একটি সমৃদ্ধ জনপদ ও বহু ইমারতাদির অবস্থান ছিল তাতে সন্দেহ নেই। খুব সম্ভব টিবিটির অভ্যন্তরে কোনো প্রাচীন মন্দির বা স্তূপের ধ্বংসাবশেষ লুক্কায়িত আছে।

ভিতরগড় দুর্গনগরী

ভিতরগড় দুর্গনগরী পঞ্চগড় জেলার সদর থানার অধীনে, থানা সদর থেকে ১৬ কিলোমিটার উত্তরে ও বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত। এটি প্রাক মুসলিম যুগের একটি বিরাট প্রাচীনকীর্তি। প্রাচীন যুগে এ স্থান কামরূপ রাজ্যের ও ব্রিটিশ আমলে জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত ছিল। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাগের সময় জলপাইগুড়ি জেলার বোদা, তেঁতুলিয়া ও দেবীগঞ্জসহ পঞ্চগড় থানা দিনাজপুর জেলার সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এ থানায় পাঁচটি দুর্গ বা গড় থাকার কারণে এর নাম হয় পঞ্চগড়। ভিতরগড় ছাড়া বাকি চারটি গড় হল, (১) বোদেশ্বরী গড়, (২) হোসেন গড়, (৩) মীরগড় ও বর্তমানে বিলুপ্ত আরও একটি (৪) মীর গড়।

জনপ্রবাদ মতে এ গড়ের দৈর্ঘ্যছিল উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৬.৪ কিলোমিটার (প্রায় ৪ মাইল) এবং পূর্ব-পশ্চিমে এর প্রস্থ ছিল প্রায় ৪.৮ কিলোমিটার (প্রায় ৩ মাইল)। কালক্রমে এর আয়তন বিশেষ করে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে অনেক সংকীর্ণ হয়ে গেছে বলে দেখা যায়। পশ্চিম দিকেও এর আয়তন কিছুটা কমে গেছে বলে মনে হয়।

১৯৮৬ সালে প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর কর্তৃক প্রস্তুত মানচিত্রে দেখা যায় যে, প্রাচীর বেষ্টিত এ দুর্গের ভিতরে প্রাচীর বেষ্টিত আরও একটি (দ্বিতীয়) দুর্গ ছিল এবং এই দ্বিতীয় দুর্গের ভিতরে প্রাচীর বেষ্টিত একটি অভ্যন্তরীন দুর্গও ছিল। বাইরের দুর্গের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ বাহুর দৈর্ঘ্য ছিল যথাক্রমে ৫,৫১৫.১৫ মিটার (২৮,৫০০ ফুট), ৫৬৭৫.৪৫ মিটার (২৮,৭৩০ ফুট), ২, ৮০৩.০৩ মিটার (৯,২৫০ ফুট) ও ২,৭২৭ মিটার (৯০০০ ফুট)। দ্বিতীয় দুর্গের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ বাহুগুলির দৈর্ঘ্য ছিল যথাক্রমে ১,৮৫৪.৫৪ মিটার (৬,১২০ ফুট), ১,৬৯৬.৯৬ মিটার (৫,৬০০ ফুট), ১২২৫.৪৫ মিটার (৪,০৪৪ ফুট) ও ১,২১২.১২ মিটার (৪০০০ ফুট)। দ্বিতীয় দুর্গের ভিতরে যে অভ্যন্তরীণ দুর্গটি আছে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ সেই দুর্গের আয়তন ছিল ৫৭৫.৭৫ মিটার (১৯০০ ফুট) × ৩৭৮.৭৫ মিটার (১২৫৩ ফুট)। এই অভ্যন্তরীণ দুর্গের লাগোয়া পূর্বদিকে যে দিঘিটি আছে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ সেই দিঘির আয়তন ছিল ৫৯০.৯০ মিটার (১৯৫০ ফুট) × ৩৬০.৬৩ মিটার (১২০০ ফুট) দিঘিসহ অভ্যন্তরীণ দুর্গ বিরাট ভিতর গড় দুর্গের উত্তরাংশে অবস্থিত।



১৯৫৮ ও ১৯৬৮ সালে ভিতরগড় দুর্গের যে রূপটি আমরা সরেযমিনে দেখেছিলাম সে তুলনায় বর্তমান দুর্গের আয়তন একটু পরিবর্তিত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। ভিতরের অভ্যন্তরীণ দুর্গের পূর্বদিকের প্রাচীর ছাড়াও পূর্বদিকে ৩টি প্রাচীর ছিল এবং পশ্চিম দিকেও অনুরূপ ৩টি প্রাচীর ছিল। অভ্যন্তরীণ দুর্গের দক্ষিণ প্রাচীরে সর্ব দক্ষিণ দিকে ছিল মোট ৭টি প্রাচীর। পূর্বদিকের তৃতীয় প্রাচীরটি এখন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত যদিও এর কিছু কিছু চিহ্ন এখনও (১৯৮৪ খ্রিঃ) বিদ্যমান এবং ব্রিটিশ আমলের শেষ নকশায় এটি দেখান হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব দফতর কর্তৃক প্রস্তুত নকশায় এর কোনো চিহ্নও নেই।

স্থানীয়ভাবে নামাঙ্কিত তালমা নামক ছোট নদী (ব্রিটিশ আমলের শেষ মানচিত্রে খুব সম্ভব চাও নদী নামে অভিহিত) ভারতের জলপাইগুড়ি জেলা থেকে উৎপন্ন হয়ে দুর্গনগরীর বর্তমান উত্তর দিকের প্রাচীরের প্রায় মাঝামাঝি 'বীরবাঁধ' নামক স্থানে দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করেছে এবং বর্তমান কালের দ্বিতীয় প্রাচীর ঘেঁষে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ দিকের শেষ প্রাচীর ভেদ করে দক্ষিণ দিক গিয়ে পঞ্চগড় জেলা শহরের পুবে করতোয়া নদীতে গিয়ে পড়েছে। ভিতরগড় দুর্গের পূর্বাঞ্চাল দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত আরও একটি ছোট নদী ছিল। ব্রিটিশ আমলের নকশায় তা দেখা যায়। সেই নদী বর্তমানে (১৯৮৮ খ্রিঃ) অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। তালমা ও সেই ক্ষুদ্র নদী ভিতরতার দুর্গের পরিখাগুলিতে জল সরবরাহ করত। পূব দিকের দ্বিতীয় প্রাচীরের পূব পাশে যে গভীর ও বারমাস জলভরা ত্রিমোহিনী নামক পরিখা আজও (১৯৮৮ খ্রিঃ) দেখা যায় তা উপরে উল্লিখিত পূব দিকের সেই নদীটির অংশ বিশেষ ছিল বলে ধারণা হয়।

বর্তমানে (১৯৮৮ খ্রিঃ) দক্ষিণ দিকে যে মাত্র ৩টি প্রাচীর আছে আমরা সেখানে ১৯৫৮ ও ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে যে পর পর ৭টি প্রাচীর দেখেছিলাম সে কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ৭টি প্রাচীরের মধ্যে ৩টি ছিল বেশ প্রশস্ত (নিম্ন দেশে প্রায় ১৫মিটার) এবং বেশ উঁচু (প্রায় ৫মিটার) এবং এগুলির সংলগ্ন দক্ষিণে ছিল প্রশস্ত ও গভীর পরিখা, যাতে প্রায় বারমাস জল থাকত। প্রাচীর গুলিতে ফটক ছিল বলে মনে হয় এবং ফটকের স্থানগুলি ছিল খোলা। একটি তোরণ (খুব সম্ভব উত্তর দিক থেকে দ্বিতীয়) 'যমদুয়ার' এবং আর একটিকে (খুব সম্ভব উত্তর দিক থেকে চতুর্থ) কালদুয়ার বলা হত।

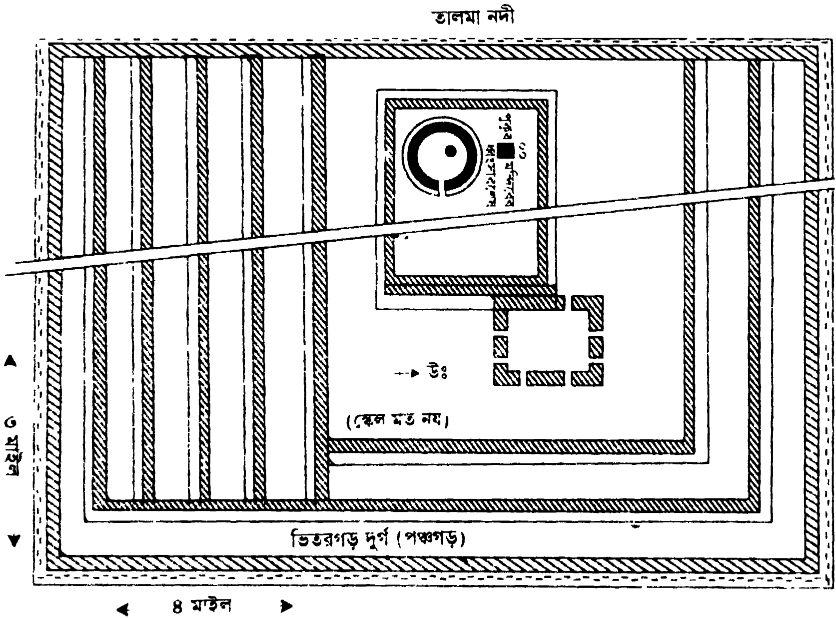
অন্য প্রাচীর গুলি খুব প্রশস্ত ও উঁচু ছিল না এবং সংলগ্ন পরিখাগুলিও খুব প্রশস্ত ও গভীর ছিল না। এগুলি সার্বিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য না হয়ে অভ্যন্তরীণ এলাকা বিভাগের জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে হয়।

অভ্যন্তরীণ দুর্গ ও রাজবাড়ি

অভ্যন্তরীণ দুর্গের পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমের প্রাচীরগুলি আদিতে ইষ্টক নির্মিত ছিল বলে দেখা যায়। কিন্তু বহু যুগের সঞ্চিত ধুলার ফলে এগুলি মাটি দ্বারা আবৃত হয়ে পড়েছিল। দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকের প্রাচীরগুলির বাইরে সংলগ্ন পরিখা ছিল। পূর্বদিকের প্রাচীরের কাছাকাছি ছিল ভিতরগড় দিঘি। এই আয়তাকার অংশকেই খুব সম্ভব লোকমুখে ভিতরগড় বলা হত, আদি নামটি বোধ হয় হারিয়ে গিয়েছিল।

এই আয়তাকার ভূমির দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে একটি বৃত্তাকার ভূমি ছিল। এর ব্যাস হবে প্রায় ২০০ মিটার। একটি প্রায় বিলুপ্ত মাটির প্রাচীরের চারদিকে একটি বিলুপ্তপ্রায় পরিখার চিহ্নও ১৯৫৮ সালে আমাদের নযরে পড়েছিল এবং ১৯৬৮ সালেও এর চিহ্ন আমাদের চোখে পড়েছিল। কিন্তু সেগুলির কোনো চিহ্নও বর্তমানে (১৯৮৮ খ্রিঃ) নেই।

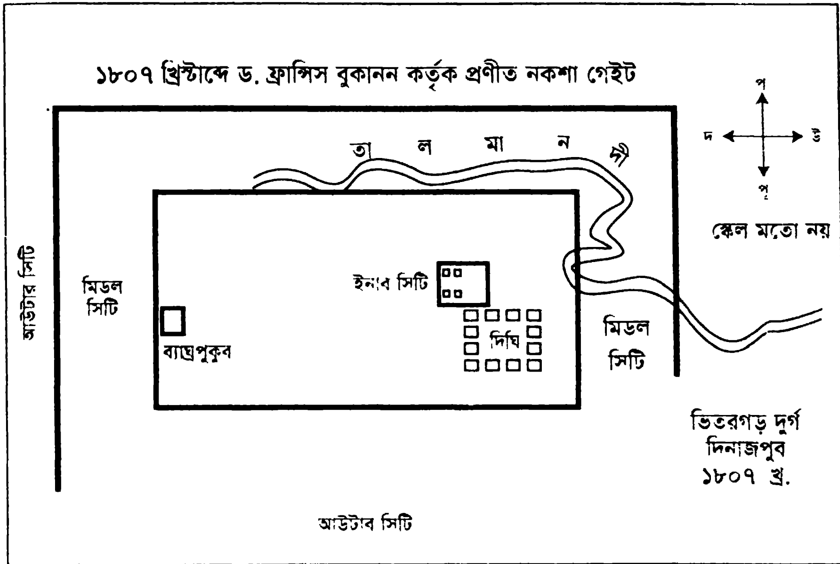
এই গোলাকার ভূমির প্রায় কেন্দ্রস্থলে প্রায় এক একর পরিমিত একটি অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থান ছিল। ১৯৫৮ সালে আমরা যখন এস্থান প্রথমে দেখি তখন সেই উঁচু ভূমিতে ইষ্টকনির্মিত দালান-কোঠার ধ্বংসাবশেষ মাটির স্তর পর্যন্ত দেখতে পেয়েছিলাম। একটি সুবৃহৎ পাকা কুয়ার ধ্বংসাবশেষও নিকটবর্তী স্থানে দেখা গিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক এস্থানের সমুদয় ইট মাটির নিচ থেকে তুলে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং সমগ্র স্থানটিকে চাষের ভূমিতে রূপান্তরিত করা হয়। এ স্থানটিকে তখন পর্যন্ত রাজবাড়ি বলা হত। এই কথিত রাজবাড়ির
মজে যাওয়া পরিখা ছিল।



রাজবাড়ির উত্তরদিকে ও পরিখা বেষ্টিত স্থানের কিছু উত্তরে মাঝারি আকারের একটি পরিত্যক্ত পুকুর ছিল। প্রায় মজে যাওয়া পুকুরের উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ে পাকা ইমারতাদির কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও দেখা গেছে। এগুলিকে স্থানীয় লোকেরা রাজার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বলে অভিহিত করত। কিন্তু কোনো মূর্তির অস্তিত্ব সেখানে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বিংশ শতাব্দীর নব্বই-এর দশকের প্রথম দিকে ঢাকার বেশ কয়েকটি দৈনিক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয় যে, উপরে উল্লিখিত এই মজে যাওয়া পুকুরে একটি পাত্রে রক্ষিত বেশ কিছু প্রাচীন মুদ্রা দৈবাৎ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় লোকদের নিকট অনেক অনুসন্ধান করেও কোনো মুদ্রা পাওয়া যায়নি।

ডক্টর ফ্রান্সিস বুকানন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে (খুব সম্ভব ১৮০৭-০৮ খ্রিঃ) এ স্থান পরিদর্শন করেন এবং এ স্থানের মানচিত্র সহ একটি প্রতিবেদন রেখে যান। সেই মানচিত্র এবং প্রতিবেদনের বাংলা অনুবাদ নিম্নে তুলে ধরা হল।[১]



"রাজবাড়ি ও বিরাট দিঘিকে পরিবেষ্টেন করে যে অভ্যন্তরীণ নগর ছিল তা পূর্ব-পশ্চিমে ১৯৩০ গজ দীর্ঘ ও উত্তর-দক্ষিণে ৩৪৫ গজ প্রশস্ত ছিল। ১৯৫৮ সালে উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম দিক অতিক্রম করার সময়ে আমরা ইষ্টক নির্মিত প্রাচীর ও সংলগ্ন অন্যান্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াও সংকীর্ণ পরিখাও দেখেছিলাম। ইটের প্রাচীর ধ্বংসপ্রাপ্ত থাকলেও স্থানে স্থানে ইটগুলি যথাস্থানে টিকে ছিল। দক্ষিণ দিক অতিক্রম করার সময় আমরা প্রশস্ত পরিখা ও সংলগ্ন শক্ত মাটিদ্বারা নির্মিত প্রাচীর দেখেছিলাম। এস্থান (citadel) অভ্যন্তরীণ দুর্গের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল না, উত্তর ও পশ্চিম দিক ঘেঁষে ছিল।

"মধ্যবর্তী নগরী (middle city) পূর্ব-পশ্চিমে ৩৫৩০ গজ প্রশস্ত ও উত্তর-দক্ষিণে ৬৩৫০ গজ দীর্ঘ এবং মাটির প্রাচীর ও [সংলগ্ন] পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। কিন্তু এর উত্তর দিকের সম্মুখ ভাগে যেখানে-তালমা নদী পরিখাতে প্রবেশ করেছে সেখানে আমি যতটুকু

১. Montogomury Martin : Eastern India, Vol. V pp 444—45.

দেখেছি, আরও অতিরিক্ত শক্তিশালী করার জন্য একটি অতিরিক্ত প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল। এর (মধ্যবর্তী নগরী) পশ্চিমাঞ্চল ছিল পূর্ববর্তী অঞ্চলের চেয়ে প্রশস্ততর এবং এর দক্ষিণাঞ্চল উত্তরাঞ্চলের মত প্রশস্ত ছিল না। এর দক্ষিণাঞ্চলের প্রান্তদেশে বাঘপুখুরি (Vagpukhuri) নামক একটি পুকুর ছিল এবং সেখানে রাজা বাঘ রাখতেন। উত্তর দিকে দুটি ক্ষুদ্র ইষ্টক স্তূপ দেখান হয় এবং সেগুলিকে রাজার মন্ত্রীর নিবাসস্থল বলা হয়। কিন্তু ইষ্টক স্তূপগুলির আয়তন দেখে মনে হয় যে এগুলি সে রকম কোনো রাজপুরুষের (personage) ব্যক্তিগত উপাসনালয় ছিল। অভ্যন্তরীণ ও মধ্যবর্তী নগরীর উভয়ের (In both the inner and middle cities) ভিতরে প্রাচীর ও [সংলগ্ন] পরিখা দ্বারা সৃষ্ট বিভাগ (subdivisions) ছিল এবং সেগুলি প্রধান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সমান্তরালে অবস্থিত থেকে সেগুলিকে সমকোণে কর্তন করেছিল এবং খুব সম্ভব নগরীকে অনেক অংশে বিভক্ত করেছিল।

"বাইরের নগরী (the outer city) অনুচ্চ প্রাচীর ও পরিখা বেষ্টিত ছিল এবং সে স্থানে অতি সাধারণ লোকের বসতি ছিল বলে সেটিকে হাড়ির গড় (Harirgar) বলা হত। এটি মধ্যবর্তী নগরীর পশ্চিম প্রাচীর থেকে ৩০০ গজ পশ্চিমে এবং দক্ষিণ প্রাচীর থেকে ৫৭০ গজ দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। পূর্বদিকে এর অবস্থান আমার দৃষ্টির বাইরে পড়ে গিয়েছিল। কারণ, সেদিকে কোনো ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব আমি আশা করিনি। কিন্তু সেদিকে আমি যখন উপস্থিত হলাম এবং মধ্যবর্তী নগরীর প্রাচীর দেখতে পেলাম তখন আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। কিন্তু রাত্রি এত দ্রুতগতিতে আসতে লাগল যে, সেখানে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব হল না। উত্তর দিকের বাইরের নগরীর অবস্থানের সীমাও আমি নির্ণয় করতে পারিনি। মধ্যবর্তী নগরীর প্রাচীর থেকে এর স্থান দেখতে পাইনি। এটি এত দূরবর্তী ছিল যে,-দেখতে গেলে আমার অর্ধ দিবসের (halfday) প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেখানে [আরও] একদিনের অবস্থান আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। কারণ আমার তাঁবু অনেক দূরে সেদিন সকাল বেলাতেই প্রেরিত হয়েছিল। আমার পথপ্রদর্শকেরা বলেছিলেন যে, বাইরের দুর্গের দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে ছিল ছয় মাইল এবং তা বাস্তবতই ছিল বলে আমার ধারণা।"

ভিতরগড় দিঘি

অভ্যন্তরীণ দুর্গের ভিতরে একটি সুবৃহৎ দিঘি আছে (ভিতরগড় দুর্গের মানচিত্র দ্র.) উত্তর-দক্ষিণ দীর্ঘ এ জলাশয়ের আয়তন ৫৯০ মিটার × ৩৬৩.৬৩ মিটার (১৯০০ফুট × ১২০০ ফুট[১]। ডক্টর বুকানন কর্তৃক প্রদত্ত এ দিঘির আয়তন হল উত্তর-দক্ষিণে এর দৈর্ঘ ৮০০ গজ এবং পূর্ব-পশ্চিমে এর প্রস্থ ৭০০ গজ।[২] দিঘির পশ্চিম পাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি সুবৃহৎ পাকা ঘাট ছিল। বুকাননের মতে পশ্চিম পাড়া তিনটি পাকা ঘাট ছিল। কিন্তু সেখানে তিনটি ঘাটের চিহ্ন নেই। উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ে দুটি করে এবং পূর্ব পাড়ে তিনটি পাকা ঘাট ছিল। দক্ষিণ পাড়ের একটি ঘাটে গ্রন্থকার কর্তৃক ১৯৮৮ সালে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি প্রস্তর মূর্তি পরিদৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু মূর্তিটি এত ভগ্ন ছিল যে, এটিকে সনক্তি করা যায়নি। এটিকে সে সময়ে কাপড় ধোওয়ার কাজে ব্যবহার করা হত বলে

১. এই পরিমিতি প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর কর্তৃক ১৯৮৫ সালে গৃহীত।
২. Montgomery Martin: Easter India, Vol V, pp. 445-46.

দেখা গিয়েছিল। মূর্তিটি প্রাক মুসলিম আমলের বলে মনে হয় এবং অতিশয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও এটি একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী অথবা সমসাময়িক কালের বলে মনে হয়।

এই অতিশয় গভীর দিঘির পাড়গুলি পাহাড়ের মত উঁচু এবং পাড়ের মাটির মধ্যে অসংখ্য সাদা পাথরের ছোট ছোট টুকরা (shingles) দেখা যায়। দিঘির পানি অতিশদ স্বচ্ছ এবং দিঘির ভিতরে কোন জলজ উদ্ভিদ নেই।

মন্তব্য

এই অসাধারণ ও সুবৃহৎ দুর্গনগরীর কোনো সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। এর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ডক্টর বুকানন পরস্পর বিরোধী মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, "প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও দিঘিটি ছাড়া সমগ্র নগরীতে ধর্মীয় ও জনগন সম্পর্কিত এমন কোনো পাবলিক ইমারত ছিল না যা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে অথবা যা ছিল বিশেষ আকারের। তাতে মনে হয় সে সময়ে জনগণ অতিশয় অমার্জিত (rude) স্তরে ছিল অথবা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের সমুদয় সম্পদ প্রতিরক্ষার জন্য ব্যয় করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। সমগ্র ব্যাপারটা দেখে মনে হয় যে, যুদ্ধের কলাকৌশলের ব্যাপারে কোন উন্নতি লাভের পূর্বে এবং বেশ আগে এ দুর্গ নির্মিত হয়েছিল। কারণ এর কোনো অংশে কোন স্তম্ভ (tower) বা বুরুজ (bastion) জাতীয় কোন কিছু অথবা দুর্গের একাংশ আক্রান্ত হলে অন্য অংশ তাকে রক্ষা করতে পারে, এমন কিছু ছিল না। কিন্তু তা কোনো প্রাচীনত্বের নিদর্শন বহন করে না। কারণ, পঞ্চদশ শতাব্দীতে অথবা ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ধ্বংসপ্রাপ্ত কামতাপুর দুর্গের অবস্থা অনুরূপ ছিল।"[১]

খান চৌধুরী আমানত উল্লাহ আহমদ তাঁর রচিত কোচবিহারের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন, "খ্রিষ্টিয় প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে শূদ্রবংশীয় দেবেশ্বর কামরূপের রাজা ছিলেন। কথিত আছে যে, দেবেশ্বর কামাখ্যাদেবীর ভক্ত ছিলেন। অনেকের অনুমান এই যে, দেবেশ্বরের বংশজাত পৃথু নামক এক রাজা ছিলেন এবং তিনি পশ্চিম কামরূপে রাজত্ব করতেন। জলপাইগুড়ির দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত 'ভিতরগড়' এই রাজার রাজধানী ছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।"[২]

এ দুজনের অভিমতই কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। মনে হয় যে, তাঁরা উভয়েই স্থানীয় জনশ্রুতিকে নির্ভর করে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। জনশ্রুতি সে অঞ্চলে এখনও বিদ্যমান এবং সে মতে প্রায় খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতাব্দীতে পৃথু নামক এক নৃপতি এই দুর্গনগরী নির্মাণ ও এ দিঘি খনন করেছিলেন। এই জনশ্রুতিমতে সেই নৃপতি অতিশয় নীচু জাতীয় কোনো অসভ্য শত্রুদ্বারা পরাজিত হয়েছিলেন এবং নিজের সম্মান রক্ষার জন্য রাজা তাঁর পরিবারের সমুদয় সদস্য ও সমগ্র ধনসম্পত্তি নিয়ে দিঘির জলে আত্মহত্যা করেছিলেন।

এই অসাধারণ কীর্তির সঠিক পরিচয়ের ব্যাপারে কোনো লিপি, মুদ্রা বা অন্য কোনো সাক্ষ্য আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। প্রায় '৮" × ৮" × ২"' বা ৮" × ৮" × ২½"' আয়তনের ইট এখানে সাধারণত ব্যবহৃত হয়েছিল বলে দেখা যায়। ইটগুলির বয়স সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলা না গেলেও এগুলি বেশ প্রাচীন ছিল বলে মনে হয়।

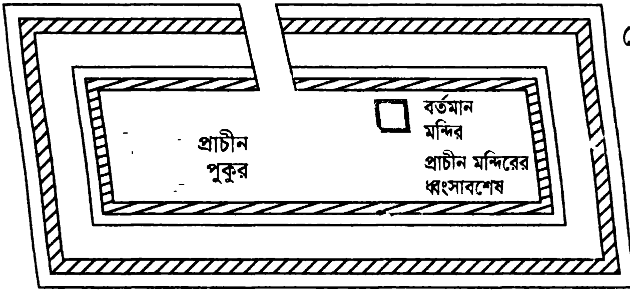
১. প্রাগুক্ত।
২. খান চৌধুরী আমানত উল্লাহ আহমদ : কোচবিহারের ইতিহাস, পৃ. ১০।

দিঘির দক্ষিণঘাটে যে প্রস্তর মূর্তিটি ভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গেছে তা পাল যুগের প্রথম দিকের বলে মনে হয়, অথবা এর আগেরও হতে পারে।

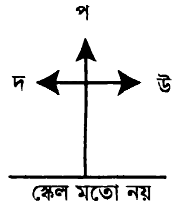
ঠাকুরানি বা বোদেশ্বরী দুর্গ ও মন্দির

ভিতরগড় দুর্গনগরী থেকে প্রায় ২২ কিলোমিটার (প্রায় ১৪ মাইল) দক্ষিণ-পূর্বে এবং পঞ্চগড় জেলা সদর থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার (প্রায় ৯ মাইল) পূর্ব-পূর্ব-দক্ষিণে মৃতপ্রায় ঘোড়ামারা নদীর পূর্বে এ স্থান অবস্থিত। এ স্থান বোদেশ্বরী দুর্গ নামে অধিক পরিচিত। তবে এর সরকারি নাম ঠাকুরানি।

পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ এ দুর্গের বাইরের প্রাচীরের আয়তন ২.৪ কিলোমিটার × ১.৬ কিলোমিটার (১.৫ মাইল × ১ মাইল)। মাটির তৈরি দেয়ালগুলি প্রায় ৩.৬৩ মিটার উঁচু এবং বাইরের দিকে সংলগ্ন পরিখা ছিগ বেশ প্রশস্ত ও গভীর। কিন্তু এখন (১৯৬৮ খ্রিঃ) পরিখাগুলি ভরাট হয়ে গেছে। বাইরের প্রাচীরের ভিতরে প্রায় ২০০ মিটার দূরে দূরে আছে অভ্যন্তরীণ প্রাচীর। সেই সব প্রাচীর ও ভরাট হয়ে যাওয়া সংলগ্ন পরিখা বাইরের প্রাচীর ও পরিখার মতোই।



বোদেশ্বরী দুর্গ ও মন্দির



ডক্টর ফ্রান্সিস বুকানন ১৮০৭-০৮ সালের দিকে এ স্থান পরিদর্শন করেছিলেন এবং তিনি বলেন[১] "It is a square of about 2 miles round, and is surrounded by a wide ditch and high earthen rampart, without towers or any other improvments in military architecture."

বাইরের প্রাচীরে ভিতর যে অভ্যন্তরীণ প্রাচীর আছে সে সম্বন্ধে ডক্টর বুকানন কিছুই বলেননি। অথচ তা আজও (১৯৬৮ খ্রিঃ) টিকে আছে।

অভ্যন্তরীণ দুর্গের মাঝামাঝি স্থানে আছে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি মাঝারি আকারের জলাশয়। পুকুরের উত্তর পাড়ের প্রশস্ত স্থানে কোচবিহারের মহারাজা কর্তৃক নির্মিত কোম্পানীর আমলের একটি মন্দির আছে। এই একতলা মন্দির পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ৭ মিটার দীর্ঘ ও উত্তর-দিক্ষণে দক্ষিণ দিকের বারান্দা সহ প্রায় ৬ মিটার প্রশস্ত।

এই মন্দিরের প্রায় ১৬ মিটার পূর্ব-দক্ষিণে একটি অতি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। সেই মন্দির বর্তমানে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। দু'চার খানা আস্ত ইচ যা দেখা যায়, তাতে মনে হয় এ মন্দির ছিল অতি প্রাচীন।

১. Montgomary Martin : Eastern India, Vol V, pp 447-48.

বর্তমান মন্দিরের ভিতরে অনেকগুলি মূর্তি জড়ো করা আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু গণেশ, শিবলিঙ্গ প্রভৃতি অনেক দেবদেবীর মূর্তি। মূর্তিগুলি যে অন্য কোনো স্থান থেকে এখানে এনে জড়ো হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

একান্ন বা বাহান্ন পীঠের এক পীঠ বলে বোদেশ্বরী মন্দিরকে পরিচিত করা হয়। বিষ্ণু চক্রে কর্তিত শিবের স্ত্রী সতীর দেহ একান্ন অংশে বিভক্ত হয়ে উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ার সময় দেবীর কর্তিত গোড়ালি নাকি এখানে পড়ে এবং বোদেশ্বরী নাম ধারণ করে এ স্থান নাকি পবিত্র পীঠস্থানে পরিণত হয়।

দেবীর পীঠকে কেন্দ্র করে এখানে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই মন্দির রক্ষার্থে দুর্গ নির্মিত হয় বলে প্রবল জনপ্রবাদ আছে। বিপদ কালে কামরূপ-কামতা রাজের পরিবার-পরিজন ও ধনরত্ন নাকি এই জঙ্গলময় দুর্গে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য প্রেরণ করা হত।

তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থে মীনহাজ-ই-সিরাজের বর্ণনা মতে ধারণা হয় যে, তিব্বতের ব্যর্থ অভিযানের পরে মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী খুব সম্ভবত করতোয়া (মিনহাজ বর্ণিত বাগমতী) নদীর উত্তরে অবস্থিত এ দুর্গের সাময়িকভাবে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।[১]

কাজল দিঘি ও ইটের ঢিবি

পঞ্চগড় জেলা সদর থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার পূর্বে ও তালমা নদীর পূর্বতীরবর্তী অঞ্চলে কাজল দিঘি নামক একটি প্রাচীন ও বিরাট আকারের দিঘি আছে। দিঘির পাড়গুলি অতিশয় প্রশস্ত ও প্রায় পাহাড়ের মতো উঁচু। দিঘির নামানুসারে সংলগ্ন গ্রামটিরও নামকরণ হয়েছে কাজল দিঘি গ্রাম।

দিঘির পশ্চিম তীরে একটি বেশ বড় ঢিপি আছে এবং তা প্রাচীন কালের ইটে পরিপূর্ণ। এই ইষ্টক স্তূপ দেখে স্থানীয় লোকেরা এটিকে ইটের ভাঁটা বলে অভিহিত করতেন। কিন্তু মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করার পর ১৯৬৮ সালে আমাদের ধারণা হয়েছিল যে, এটি একটি বৌদ্ধ স্তূপ বা হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। অবশ্য বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে উৎখনন না করে এ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছুই বলা সম্ভব নয়।

মুসলিম আমল

হোসেন গড়

পঞ্চগড়-তেতুলিয়া রাজপথ থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে (করতোয়া নদী যেখানে রাজপথকে অতিক্রম করেছে) হোসেন গড় নামক একটি দুর্গের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু দুর্গের মাটির প্রাচীরগুলি এখন (১৯৬৮ খ্রিঃ) সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়েছে এবং প্রশস্ত ও গভীর পরিখাগুলি নিচু ধানক্ষেতে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্গাকারে নির্মিত দুর্গের প্রত্যেক বাহু ছিল প্রায় ১.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ। কিন্তু বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে দুর্গের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়।

১. তবকাত-ই-নাসিরী, ৩০৪ পৃ:, সম্পাদনা ও অনুবাদ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া।

মাটির তৈরি এ দুর্গের নাম ছিল হোসেন গড়। খুব সম্ভব কামরূপ অভিযানের পূর্বে বাঙলার সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) এ দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। আমানত উল্লাহ আহমদ কর্তৃক রচিত কোচবিহারের ইতিহাস নামক গ্রন্থে এই দুর্গের উল্লেখ আছে কিন্তু কোনো বর্ণনা নেই।

মিরগড়

পঞ্চগড় জেলা শহর থেকে প্রায় ২.৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ও করতোয়া নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী মিরগড় অঞ্চলে একটি উঁচু ও প্রশস্ত মাটির প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ আছে এবং এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০ মিটার। এ দেয়াল প্রায় ৩ মিটার উঁচু এবং উপরের দিকে এর প্রশস্ততাও প্রায় ৩ মিটার। এ দেয়ালের নিকটেই বর্তমানে (১৯৬৮ খ্রিঃ) বি, ডি, আর-এর একটি ক্যাম্প আছে।

জনশ্রুতিমূলে জানা যায় যে, এখানে একটি বড় ধরনের দুর্গ ছিল এবং এর দেয়াল গুলি ছিল মাটির তৈরি। করতোয়ার ভাঙ্গনে বর্তমানে সামান্য অংশ ছাড়া দুর্গের বাকি অংশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

দেবীগঞ্জের চিহিলগাজীর মাযার

দিনাজপুর শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত চিহিলগাযী মাযার ছাড়াও (দিনাজপুর জেলা শহরের চিহিলগাযীর মাযার দ্র.) প্রায় সমদৈর্ঘ্যের একটি পাকা মাযারের অস্তিত্ব দেবীগঞ্জ থানা সদর থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার-পশ্চিমে ও করতোয়া নদীর পশ্চিমতীরবর্তী অঞ্চলে দেখা যায় একটি অখ্যাত গ্রামে। এ স্থানের নামও দেবীগঞ্জ। দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলার অধীনে দুহুসুহু নামক একটি প্রাচীন গ্রামে প্রায় অনুরূপ ধরনের আরো একটি পাকা কবর আছে। সে স্থান থেকে দেবীগঞ্জের এ স্থান প্রায় ৩৫ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। (পরে দুহুসুহু দ্র.)। প্রাচীন করতোয়া নদী বর্তমান (১৯৬৮ খ্রিঃ) গতি ধারায় বইতনা।

এই অসাধারণ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট পাকা কবরটি প্রাক মোঘল আমলের ইটদ্বারা নির্মিত। এখানকার ইট সুলতানী আমলের অথবা প্রাক মুসলিম আমলেরও হতে পারে।

স্থানীয় প্রবল জনশ্রুতি অনুসারে, একবর প্রথম মুসলিম বঙ্গবিজয়ী ইখতিয়ার-উদ-দীন বখতিয়ার খলজীর তিব্বত অভিযানে নিহত মুসলিম সৈনিকদের কবরের উপর নির্মিত। কিছু দূরেই ঘোড়ামারা নামক একটি মৃতপ্রায় নদী আছে। এ নদীতেই নাকি মোহাম্মদ বখতিয়ারের সৈন্যদের ঘোড়াগুলি ডুবে মরেছিল।

কিন্তু এ জনশ্রুতি নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় না এবং কবরটি মোহাম্মদ বখতিয়ারের সৈন্যদের কবর বলে মনে হয় না। কারণ, তিব্বত থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় মোহাম্মদ বখতিয়ারের পক্ষে তাঁর সৈন্যদের মৃতদেহ দাফন করা কিছুতেই সম্ভবপর ছিল বলে মনে হয় না।

ঠাকুরগাঁও জেলা

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ

বাঙলাগড়

নামটা একটু বিচিত্র ধরনের। রানীশংকইল থানায় অবস্থিত এ দুর্গ নেকমরদ থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। এককালে গড়ের কিছু পশ্চিম দিক দিয়ে যে একটি প্রকাণ্ড নদী প্রবাহিত ছিল, তার চিহ্ন বহনকারী একটি খাত এখনও বিদ্যমান। গড়ের কাছেই একটি ছোট হাট বসে। লোকে বলে 'বেউলার হাট'। পাশের গ্রাম উজানীনগর।

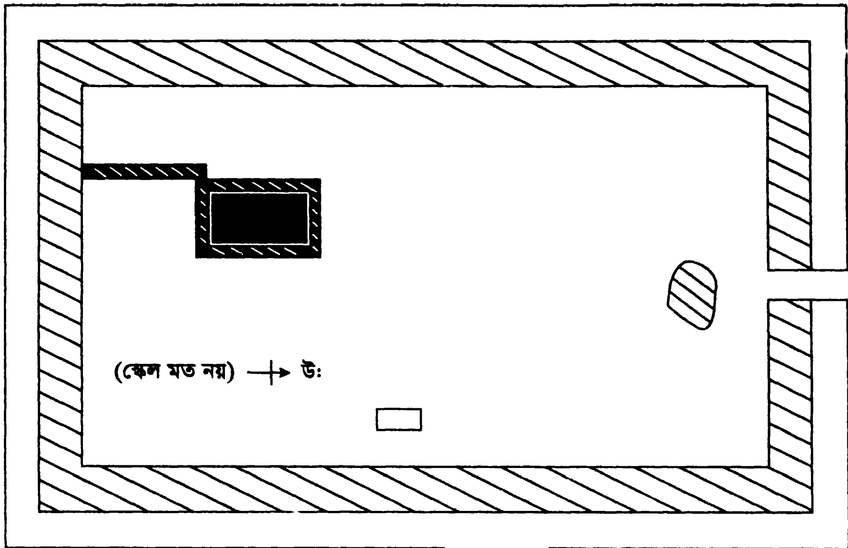
উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ গড়ের দৈর্ঘ্য দেড় কিলোমিটারের কিছু বেশি এবং প্রস্থ এক কিলোমিটারের চেয়ে কিছু বেশি। মাটির তৈরি প্রাচীরগুলি উপরিভাগে এখনও প্রায় ৩ মিটার চওড়া এবং প্রায় ৪.৫ মিটার উঁচু। প্রাচীর সংলগ্ন গভীর পরিখাগুলির প্রায় ১২ মিটার চওড়া। উত্তর দেয়ালের কেন্দ্রস্থলে ছিল দুর্গের তোরণ। সেখান থেকে একটি রাস্তা উত্তরে গ্রামের দিকে চলে গেছে। রাস্তার উভয় পাশের ভূমি উঁচু ও জঙ্গলাকীর্ণ। অজস্র ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ এখানে-ওখানে দেখে মনে হয়, সেখানে এক কালে একটি জনপদ ছিল।

সদর দরজার সামনে দুর্গের ভিতরে আছে প্রায় ৬ মিটার উঁচু একটি ঢিবি। প্রায় দেড় বিঘা ভূমি জুড়ে এ ঢিবির অবস্থান। ঢিবির ভিতরে ও বাইরে যেসব ইট দেখা যায় সেগুলি একটু অদ্ভুত ধরনের, ঝামা ইটের মত কালো ও ছিদ্রযুক্ত। ওজনে পাথরের মত ভারী এই পদার্থগুলিকে ইট বলেই মনে হয় না।

গড়ের ভিতরে পূর্ব দেয়ালের দক্ষিণ দিক ঘেঁষে আছে একটি ছোট পুকুর এবং পশ্চিম-দক্ষিণ আছে কোণে একটি বড় পুকুর। দক্ষিণ দেয়াল থেকে একটি উঁচু রাস্তা (জাঙ্গাল) এই শেষোক্ত পুকুরের পাড়ে এসে মিশেছে। উত্তর দিকের ঢিবি ও পার্শ্ববর্তী স্থান ছাড়া গড়ের অন্যত্র ইট-পাথর দেখা যায় না। গড়ের অধিকাংশ স্থান চাষের জমিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু পশ্চিম ভাগ শালবনে ঘেরা এবং এই শালবন পশ্চিম দেয়াল অতিক্রম করে পশ্চিম ও পশ্চিম-উত্তর দিকে অনেক দূর চলে গেছে।

স্থানীয় জনপ্রবাদ মতে এখানে নাকি ছিল চাঁদ সদাগরের বাড়ি। ফটকের কাছে যে ঢিবিটি আছে, সেটি নাকি ছিল লক্ষ্মীন্দরের বাসরঘর এবং সেখানেই নাকি মনসা কর্তৃক প্রেরিত কাল নাগিনী বাসররাতে লক্ষ্মীন্দরকে দংশন করেছিল। বেউলার হাট ও উজানী নগরের কথা আগেই বলা হয়েছে।

ঠাকুর গাঁও (বাঙ্গালা গড়)



এ গড় অত্যন্ত প্রাচীন। কত প্রাচীন, তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। বঙ্গ শব্দ অনেক প্রাচীন হলেও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ক্ষেত্রে বঙ্গ শব্দের প্রয়োগ অনেক পরবর্তী কালের ঘটনা। আর বাঙলা শব্দের সৃষ্টি তো মোঘল আমলের ঘটনা বলেই মনে হয়। গড়ের নির্মাণ কৌশল ও এখানে প্রাপ্ত ইষ্টকাদি দেখে কিছুতেই ধারণা করা যায় না যে, এ গড় মুসলিম আমলের।

খুব সম্ভব মুসলিম আমলের বহু আগে পার্শ্ববর্তী নেকমরদ নামক স্থানে যাঁরা রাজত্ব করতেন, তাঁরা এই জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে এই দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন বিপদকালে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। খুব সম্ভব এ প্রাচীন দুর্গ মুসলিম আমলের বহু আগেই পরিত্যক্ত ও জনশূন্য হয়ে শালবনে ঢেকে গিয়েছিল। অনেক পরবর্তী কালে ধারে কাছে বসতি স্থাপিত হলে খুব সম্ভব এ দুর্গের বর্তমান নামকরণ হয় এবং বাংলাদেশের আর দশটা প্রাচীন স্থানের মত এ স্থানেও চাঁদ সদাগরের কল্পিত ট্র্যাডিশন গড়ে ওঠে।

নেকমরদ ও গড়গ্রাম

রানীশংকইল থানার অধীনে ও থানা থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার উত্তরে জেলা পরিষদের রাস্তার উপরে অবস্থিত নেকমরদ নামক স্থান বর্তমানে একটি মাযার ও মেলার জন্য প্রসিদ্ধ। মাযারে যিনি শায়িত আছেন, তাঁর নাম শেখ নাসির-উদ্-দীন নেকমরদ বলে জনশ্রুতিমূলে জানা যায়। নেকমরদ বলে কোন মৌজার নাম নেই। এ স্থানের প্রাচীন

নাম কী ছিল তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। ব্রিটিশ আমলের কাগজপত্র মতে এ স্থানের নাম মৌজা ভবানন্দপুর এবং কাগজপত্রে এই নামই চলে আসছে।

ব্রিটিশ আমলের বহু আগে থেকেই এখানে একটি বিরাট মেলা বসত। এই নেকমরদের মেলা ছিল উপমহাদেশের অতি বিখ্যাত কুম্ভ ও হরিহরছত্রের মেলার সঙ্গে তুলনীয়। এ মেলা সম্পর্কে মেজর শেরউইল ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মানচিত্রের উপক্রমণিকায় যা বলে গেছেন, তার বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ :[১]

"পূর্ণিয়া ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহ থেকে গরু আসত এবং ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট ও অন্যান্য স্থানের দালালেরা সেগুলি কিনে নিয়ে যেতেন। ভূটান থেকে ঘোড়া নিয়ে আসতেন ভূটানীরা। আরাহ্ ও বিহারের অন্যান্য জেলা থেকেও ঘোড়া আসত। আসাম ও দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চল থেকে হাতি আসত এবং ধনী জমিদারেরা সেগুলি কিনে নিতেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে মাল বোঝাই কিছু সংখ্যক উটও আসত। মাল বিক্রি হবার পরে ধনী মুসলমানেরা উটগুলি কিনে নিতেন এবং কোরবানীর সময় জবেহ্ করে খেয়ে ফেলতেন। উত্তর ভারতের প্রায় সর্বস্থান থেকে এ মেলায় লোকেরা আসতেন। মোঘল ও আফগানেরা শুকনা ফল, কারুকার্যখচিত ঘোড়ার জিন (sadlery), ছোরা, তরবারি, আয়না ইত্যাদি নিয়ে আসতেন। শিখেরা আনতেন হাতির দাঁত ও চন্দন কাঠের চিরুণি। পাহাড়ীরা আনতেন কম্বল, গরম কাপড়, বাদাম, মৃগনাভি, ঘোড়া (ponny) ও চমরী গাভীর লেজ। নেপালীরা আনতেন কুক্‌রী ও চিরতা পাতা। দিনাজপুরের বণিকেরা খাঁটি ও কৃত্রিম মুক্তার মালা (Coral beads) বিক্রি করতেন। এগুলি ছাড়া আরও আসত বিলেতি কাপড়-চোপড় (piece-goods), কাঁসা-পিতলের বাসন-কোসন ও হুক্কা।"

এ মেলা সম্পর্কে মিঃ হান্টার (W. W. Hunter) বলেন যে, প্রতি বছর পহেলা বৈশাখে এ মেলা বসত এবং প্রায় এক সপ্তাহ ধরে তা চলত। প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হত এ মেলায়। আমবাগানের ভিতরে একটি বেড়ার ঘরে ছিল নেকমরদের কাঁচা মাযার। মুসলমানেরা দলে দলে সে মাযার যিয়ারত করতেন। প্রায় ১০ বর্গমাইল স্থান জুড়ে এ মেলা বসত এবং সমগ্র স্থানে প্রায় ৫০০ পাকা কুয়া ছিল যাত্রীদের সুবিধার জন্য।

এ স্থান অত্যন্ত প্রাচীন। কত প্রাচীন, তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। মাযারকে কেন্দ্র করে প্রায় ১২ বর্গ মাইল স্থান জুড়ে যে অসংখ্য পুরাকীর্তির চিহ্ন পাওয়া যায়, তাতে এ স্থানের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সব সন্দেহ দূরীভূত হয়।

মাযারের লাগোয়া উত্তরে আনুমানিক ১৮০ মিটার × ৯০ মিটার আয়তন বিশিষ্ট উত্তর-দক্ষিণে লম্বা যে প্রাচীন জলাশয়টি আছে, অনেক বছর আগে জল নিষ্কাশনের পরে সেখানে প্রস্তর নির্মিত অনেক মূর্তি পাওয়া যায়। সেই মূর্তিগুলি কে কোথায় নিয়ে গেছে, তার হদিস পাওয়া যায়নি। তবে জলাশয়ের পূর্ব পাড়ের ঢালুতে এখনও একখণ্ড বেলে পাথর পড়ে আছে। তাতে নৃত্যরতা একটি নারী মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। পাথরের তৈরি

১. R.S Map of Dingepore made by Major Sherwill in English and preserved in Dinajpur Record Room.

একটি ষাঁড় বা ভেড়ার ভগ্ন মাথাও সেখানে পড়েছিল। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থকার কর্তৃক তা স্থানীয় তহশীল অফিসে রক্ষিত হয়েছিল।

জলাশয়ের পূর্ব দিকে প্রায় দেড় একর পরিমিত যে উঁচু ভূমি আছে, তা বর্তমানে চাষের জমিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু চাষ করতে গেলেই সেখানে ইট, পাথর ও প্রাচীন ইমারতের ভিত্তি বের হয়ে পড়ে। পাড়ের কাছাকাছি স্থানে আনুমানিক ৮ ফুট × ৩ ফুট × ৫ ফুট আয়তনের এক খণ্ড গ্রানাইট (granite) পাথর মাটির মধ্যে পড়ে আছে। লোকে বলে ঢেঁকি এবং তা নাকি পাতাল পর্যন্ত চলে গেছে। প্রাণের ভয়ে এ পাথর কেউ স্পর্শ করতো না। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রচুর বখশিসের লোভে কয়েকজন লোক পাথরটির তলদেশ খনন করলে দেখা যায় যে, পাতাল পর্যন্ত না গিয়ে মাত্র ১ মিটার মাটির নিচে পাথরটি তার সীমা রেখা টেনেছে। প্রকৃতপক্ষে এ পাথরটি ছিল একটি ইমারতের অংশ বিশেষ।

এ ধরনের বহু গ্রানাইট পাথর নেকমরদ এলাকায় আছে। মাযার থেকে প্রায় ৪৫০ মিটার পশ্চিমে রাস্তার লাগোয়া দক্ষিণে যে বড় দিঘিটি আছে তার ঢালু-দেশে বেশ কয়েকটি গ্রানাইট পাথরের স্তম্ভ পড়ে আছে। জেলা পরিষদের ডাক বাংলার লাগোয়া উত্তরে একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্থান ছিল (বর্তমানে সেখানে ইমারত গড়ে উঠেছে)। ১৯৫৮-৬০ খ্রিস্টাব্দে সেখানে অনেকগুলি গ্রানাইট পাথরের টুকরা (এক একটা প্রায় ৩ মিটার লম্বা) বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। মাযার সংলগ্ন দিঘির পূর্ব ও দক্ষিণ পাড়ের প্রশস্ত ভূমিতে অনেক প্রাচীন ইমারতের ভিত্তি পাওয়া যায়। দক্ষিণ পাড়ে অনেক বসতি হয়েছে। সেগুলি প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত। বর্তমান নেকমরদ গঞ্জ এলাকায় মাটি খুঁড়লে যেখানে-সেখানে প্রাচীন ইমারতের ভিত্তি বের হয়ে পড়ে।

দিঘির পশ্চিম দিকে অবস্থিত নেকমরদ হাই স্কুলের ইমারত নির্মাণকালে মাটি খুঁড়তে গিয়ে প্রায় ১ মিটার মাটির নীচে একটি মৃৎপাত্রে রক্ষিত ১০টি ব্রোঞ্জমূর্তি পাওয়া যায় ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে।[১] এগুলির মধ্যে ছিল বিষ্ণুমূর্তি, হরগৌরীর আলিঙ্গন-মূর্তি, সপরিবারে দেবীমূর্তি প্রভৃতি। বাকি মূর্তিগুলির পরিচয় উদ্ধার করা যায়নি। মাটির নিচে বর্তমান কালেও মাঝে মাঝে মূর্তি পাওয়া যায় বলে জানা গেছে।

গড়গ্রাম

নেকমরদ মাযার থেকে প্রায় ১.৫ কিলোমিটার উত্তরে যে প্রাচীন গ্রামটি আছে তার নাম গড়গ্রাম। আনুমানিক ৪৫০ মিটার × ৩৭০ মিটার আয়তনের একটি প্রাচীন গড় বা দুর্গ সেখানে আছে। বাইরের প্রাচীরের ভিতরে এবং প্রায় ৪৫ মিটার দূরে দূরে অভ্যন্তরীণ গড়ের মাটির প্রাচীরগুলি অবস্থিত। পশ্চিম দেয়ালের মাঝামাঝি স্থানে একটি উদগত অংশ আছে। প্রাচীরগুলি মাটির তৈরি এবং বর্তমানে ২ মিটারের বেশি উঁচু নয়। দেয়ালের বাইরের দিকে ছিল গভীর পরিখা। একটি ছোট আকারের জলাশয় ছিল গড়ের ভিতরে। গড়ের ভিতরে সর্বত্র প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশের ছড়াছড়ি।

১. মূর্তিগুলি নেকমরদ স্কুলের হেডমাস্টার সাহেব গ্রন্থকারকে দিয়েছিলেন। গ্রন্থকার সেগুলি দিনাজপুর যাদুঘরে রেখে আসে। ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মূর্তিগুলি পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী নিয়ে যায়।

গড়ের ঠিক বাইরে উত্তর-পশ্চিম কোণে, বাঁশ ঝাড়ের ভিতরে একটি প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। স্থানীয় রিফিউজী ইট হরণকারীরা ইমারতের প্রায় সব ইট সরিয়ে ফেলেছেন। এদের একজন সেখানে নাকি প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছেন। অনেক চেষ্টা করেও কোনো মুদ্রা উদ্ধার করা যায়নি। তবে মুদ্রা যে পাওয়া গেছে, সে ঘটনা সত্য বলেই মনে হয়। এই ইমারতের কাছেই নিম্নভূমিতে একটি কাল পাথরের টুকরা পাওয়া গেছে। তাতে সর্পের পূর্ণফণার মত পদ্ম পাপড়ি অতি সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ আছে।

গড়গ্রাম থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণে বেশ বড় বড় কয়েকটি প্রাচীন জলাশয় আছে। সবচেয়ে বড় দিঘির নাম চামার দিঘি। অনুমানিক ৪৫০ মিটার × ১৮০ মিটার আয়তনের এ জলাশয় পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা। দিঘির পাড়ে অসংখ্য প্রাচীন ইটের ছড়াছড়ি দেখে ধারণা হয় যে, এককালে দিঘির চার পাড়েই বাঁধান ঘাট ছিল। চামার দিঘির লাগোয়া দক্ষিণে পর পর ৩টি বড় বড় প্রাচীন দিঘি। আশে পাশে আছে আরও কয়েকটি প্রাচীন জলাশয়। এগুলির দক্ষিণে বাঙলাগড়-নেকমরদ রাস্তার লাগোয়া উত্তরে 'গোপনীহার' নামক একটি প্রাচীন দিঘি আছে। উত্তর দক্ষিণ কিঞ্চিৎ লম্বা এ দিঘির আয়তন ৩০৫ মিটার × ২৭০ মিটার। পশ্চিম পাড়ে প্রায় ২ একর পরিমিত উঁচু ভূমি। সেখানে অনেক প্রাচীন ইমারতের ভিত্তি পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ একটি ছোট ঢিবি এখনও দেখা যায়। এ দিঘি সম্পর্কে নানারকম মুখরোচক কাহিনী আছে।

গোরকুই কূপ, মন্দির ও শিলালিপি

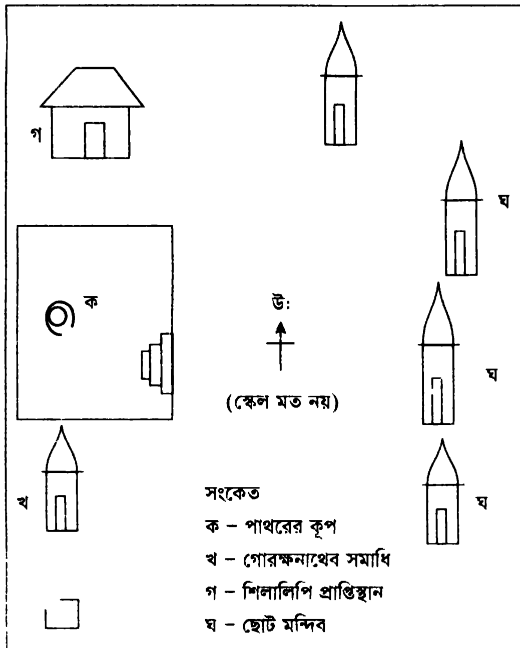
নেকমরদ থেকে প্রায় ৮কিলোমিটার পশ্চিমে গোরকুই নামক প্রাচীন স্থানে একটি প্রস্তর নির্মিত কূপ ও ৫টি ছোট ছোট মন্দির আছে। চারদিকে প্রাচীর ঘেরা প্রায় দেড় বিঘা পরিমিত অপেক্ষাকৃত উঁচু ভূমিতে এগুলি অবস্থিত। চার পাশে বিশেষ করে পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে অপেক্ষকৃত নিচু জমি, মৃত নোনা নদীর বালুচর।

গোরকুই

পূর্ব দেয়াল ঘেঁষে পর পর ৩টি ছোট মন্দির। মাঝখানের মন্দিরের প্রত্যেক বাহু ভিতরের দিকে ৬ফুট লম্বা। দেয়াল পুরু নয়। উপরে গম্বুজ এবং গম্বুজের চূড়ায় ত্রিশূল। পশ্চিম দেয়ালে একটি মাত্র অতি ছোট দরজা। এক ঘনফুট কাল পাথরের মধ্যে 'সেট' করা নরমুণ্ডবেষ্টিত একটি অতি ছোট কালী মূর্তি পূর্ব দেয়ালে লাগান আছে।

এই মন্দিরের লাগোয়া দক্ষিণের মন্দিরটি আরও ছোট। এটি মৎসেন্দ্রনাথের সমাধি বলে কথিত। কিন্তু সেখানে সমাধির কোনো চিহ্ন নেই। উত্তর পাশের মন্দিরও প্রায় একই আয়তনের। সেখানে একটি শিবলিঙ্গ আছে। উত্তর দিকের দেয়ালের পাশে যে মন্দিরটি আছে, তা পূর্ব দেয়ালের পাশে অবস্থিত কেন্দ্রীয় মন্দিরের সমান। দক্ষিণ মুখী এ মন্দিরের ভিতরে আধুনিককালে শ্বেত পাথরে তৈরি একটি শিবলিঙ্গ আছে।

গোরকুই



পশ্চিম দেয়ালের মাঝামাঝি স্থানে যে মন্দিরটি আছে তা আকারে কিছুটা বড়। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ মন্দিরের বাইরের দিকের আয়তন ১০ ফুট × ৮ ফুট। দক্ষিণ দেয়ালে একটি মাত্র দরজা। এবং ভিতরের অংশ উত্তর ও দক্ষিণ এই দু'ভাগে বিভক্ত। উত্তর দিকের অপেক্ষাকৃত ছোট অংশটি জুড়ে তিন দিকের দেয়াল ঘেঁষে আছে একটি অনুচ্চ বেদী। বেদীর কেন্দ্র স্থলে খানিকটা শিবলিঙ্গের মত দেখতে প্লাস্টার নির্মিত একটি অনুচ্চ ও ক্ষুদ্র ঢিবি। অনেকে এটিকে শিবলিঙ্গ বলে ভুল করে থাকেন। কিন্তু আদতে এটি নাথগুরুদের সমাধির প্রতীক চিহ্ন।

এখানেই নাকি নাথগুরু গোরক্ষনাথ সমাহিত আছেন। এটি গোরক্ষনাথের সমাধি কিনা, তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও বেদীর উপরে স্থাপিত ঢিবিটি যে নাথগুরুদের সমাধির প্রতীক চিহ্ন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ মন্দির থেকে প্রায় ৬ মিটার দক্ষিণে একটি পাকা সমাধি আছে। ধীরচাই নাথ মহন্তের সমাধি বলে পরিচিত এই সমাধির উপরেও অনুরূপ একটি প্রতীক চিহ্ন আছে।

এ মন্দিরের পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দেয়ালের বাইরের দিকে পলেস্তারার উপরে নানা ধরনের পৌরাণিক ছবি উৎকীর্ণ আছে। অতি নিকৃষ্ট ধরনের এসব ছবিতে শিল্পকলার মান বলতে কিছু নেই।

মন্দিরগুলির বয়স দেড়শ থেকে দু'শ বছরের বেশি হতে পারেনা। গোরক্ষনাথের সমাধি এত আধুনিক কালের হতে পারে না। গোরক্ষনাথ একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাঁর আবির্ভাব কাল সম্পর্কে কোনো সঠিক তথ্য না পাওয়া গেলেও তিনি খুব সম্ভব

দ্বাদশ শতাব্দী বা তার আগের লোক। সেক্ষেত্রে এখানে যদি তাঁর সমাধি থেকে থাকে, তবে এ মন্দির নির্মাণের আগে সমাধির উপর কোনো মন্দির ছিল না অথবা কোন পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরের উত্তর দেয়ালের লাগোয়া উত্তর দিকে যে পাথরের কূপটি আছে তা এ ধারণার পিছনে সমর্থন যোগায়।

কূপ

এ স্থানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তর নির্মিত ও অক্ষত অবস্থায় রক্ষিত একটি অতি প্রাচীন কূপ। সমাধি মন্দিরের লাগোয়া উত্তরে এবং পাশের উঁচু ভূমি থেকে সাড়ে চারফুট নিচে প্রায় ১৮ ফুট × ১০ ফুট (প্রায় ৫.৫ মিটার × ৩.২ মিটার) আয়তনের এক খণ্ড নিম্নভূমির মাঝামাঝি স্থানে কূপটি অবস্থিত। সমগ্র মেঝে সাইজ করে কাটা বেলে পাথরে তৈরি। মেঝে থেকে চার পাশের দেয়াল প্রায় ১০ ফুট (প্রায় ৩ মিটার) উঁচু। দেয়ালগুলি ইটের তৈরি। দেয়ালের নিম্নভাগ প্রাচীন কালের কিন্তু উপরের অংশ উনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত। পূর্বদিকে প্রধান সিঁড়ি এবং তা পাথরের তৈরি। পশ্চিম দিকেও একটি সিঁড়ি আছে। কূপের ব্যবহৃত পানি পশ্চিম দিকের নিম্নভূমিতে নিস্কাষনের জন্য পশ্চিম দেয়ালের নিচ দিয়ে নির্মিত একটি প্রাচীন নালা আছে। দক্ষিণ দেয়ালের মাঝামাঝি স্থানে প্রায় ৩ ফুট (প্রায় ১মিটার) উপরে মসৃণ কাল পাথরে (black basalt) সর্পের পূর্ণ ফণার মতো করে তৈরি এক সারি পদ্মফুল অতি সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ আছে।

কূপের ব্যাস (অভ্যন্তরে) ২ ফুট ৭$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি (অর্থাৎ এক মিটারের চেয়ে কম)। গভীরতা প্রায় '৭$\frac{১}{২}$ ফুট'। মেঝে থেকে কূপের দেয়ালের উচ্চতা ১$\frac{১}{২}$ ফুট(অর্ধ মিটারের চেয়ে কম)। অমসৃণ বেলে পাথরের (sand stone) কিছু বাঁকানভাবে (curved) 'সাইজ' করে কাটা টুকরা মিলিয়ে কূপটি তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেক স্তরে ৫টি করে পাথরের টুকরা ব্যবহার করা হয়েছে। পাথরগুলি এক মাপের নয়। এগুলি ৬ থেকে ৯ ইঞ্চি পুরু। একটার পর একটা পাথর বসিয়ে অতি নিখুঁতভাবে কূপটি তৈরি করা হয়েছে। জোড়া লাগাবার জন্য কোন মসলা (adhesive material) বা অন্য কোনো সংযোজক বস্তু ব্যবহার করা হয়েছে কিনা বলা কঠিন। খুব সম্ভব, না। উপর থেকে সর্ব নিম্ন অংশ পর্যন্ত সমুদয় কূপ বেলে পাথরে তৈরি। এ ধরনের সম্পূর্ণ পাথরের তৈরি কূপ বাংলাদেশে আর কোথাও আছে বলে সন্ধান পাওয়া যায়নি।

কূপের পানি নাকি অফুরন্ত। অফুরন্ত কিনা বলা না গেলেও শীত ও বর্ষাকালে কূপের পানির উচ্চতা (level) যে একই রকম থাকে আমরা তা নিজের চোখেই দেখেছি। কূপ সংলগ্ন পশ্চিম দিকের নিম্নভূমি একটি মরা নদীর পরিত্যক্ত খাত। সেখানে মাটি খুঁড়লে কয়েক ফুট নিচেই পানি পাওয়া যায়।

স্থানীয় নিম্নবর্ণের হিন্দু ও পলিয়াদের কাছে কূপের পানি অত্যন্ত পবিত্র। প্রতি বছর এখানে একটি মেলা বসে এবং হাজার হাজার লোক এখানে সমবেত হন কূপের এক পাত্র পানির জন্য। এদের দৃঢ় বিশ্বাস, মেলার তিথিতে কূপের পানি দ্বারা শরীর ধৌত করলে সর্ব ব্যাধি নিরাময় হয়।

এই গোরকুই (<গোরকুই <গোরকূপ <গোরখকূপ <গোরক্ষকূপ) স্পষ্টতই গোরক্ষনাথের নামের সঙ্গে জড়িত। নাথ সম্প্রদায়ের মতে তিনি শিব দেহসম্ভূত। তিনি (এক বা একাধিক গোরক্ষনাথ) যে রক্ত মাংসের মানুষ ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। গোরক্ষনাথ সম্পর্কে নানা রকম কাহিনী প্রচলিত আছে। নেকমরদ-গোরকুই অঞ্চলে প্রচলিত কাহিনীটি বড়ই চিত্তাকর্ষক। এতে বলা হয় যে, ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি আসছিলেন পশ্চিম দিক থেকে। পথে পড়ল বিরাটকায়া 'নোনা নদী'। তাতে ভ্রূক্ষেপও না করে যোগসিদ্ধ গোরক্ষনাথ খড়ম পায়ে দিয়ে পানির উপর দিয়ে হেঁটে চললেন। নদী প্রায় অতিক্রম করে এসেছেন, এমন সময় ঘটল আর এক চমকপ্রদ ঘটনা।

মাইল পাঁচেক পূর্বদিকে 'কাইচা' নদীর তীরে নেকমরদ নামক একজন মুসলিম দরবেশ আস্তানা গেড়েছিলেন ধর্ম প্রচারের জন্য (নেকমরদ দ্র.)। তিনি দিব্যচক্ষে গোরক্ষনাথের বুজুরগি দেখতে পেয়ে উপরের দিকে মুখ তুলে একটু হাসলেন মাত্র। আর সঙ্গে সঙ্গেই গোরক্ষনাথ নিচের দিকে তলিয়ে যেতে লাগলেন। নাথের গামছা পর্যন্ত পানিতে ভিজে গেলে লজ্জিত গোরক্ষনাথ ধ্যানে সমুদয় বিষয় অবগত হয়ে আর অধিক অগ্রসর হওয়া অনুচিত বিবেচনা করে যোগবলে সেখানেই এক বালুচর সৃষ্টি করে অবস্থান করতে লাগলেন। কিংবদন্তী অনুসারে, গোরক্ষনাথ কর্তৃক সৃষ্ট সেই বালুচরই বর্তমান গোরকুই।

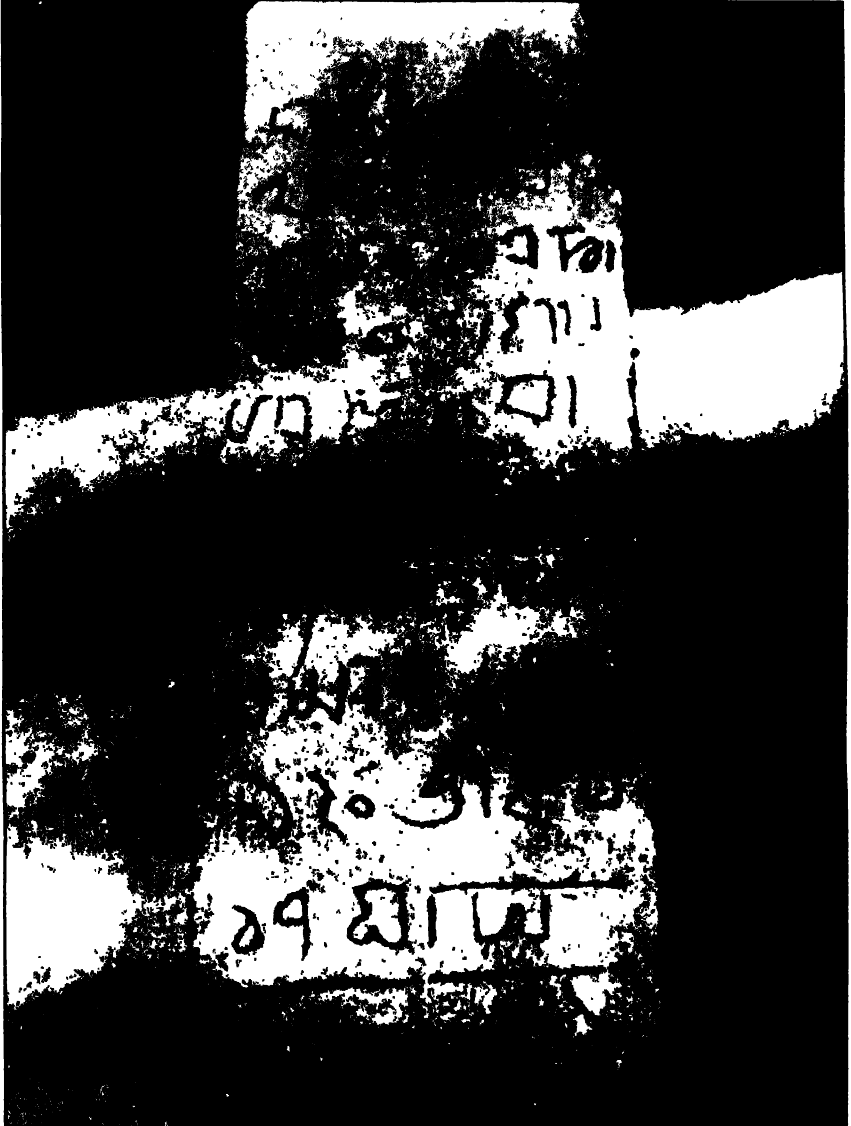
শিলালিপি

কূপের উত্তর দেয়ালে প্রায় ৫ মিটার উত্তরে একটি টিনের চৌচালা ঘর। দেয়ালগুলি পাকা। পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে একটি করে দরজা। দরজার নিচের চৌকাঠ বেলে পাথরে তৈরি। দক্ষিণ দ্বারের নিচের চৌকাঠ হিসাবে একই সাইজের দু'খানা বেলে পাথর ব্যবহৃত ছিল। একটি পাথরে একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে।[১] প্রথম পাথরে খোদিত লিপিতে দশ পঙ্ক্তি পাঠ আছে। দশম পঙ্ক্তির নিচে একটি রেখা টানা। রেখার নিচে একটি অশ্বের মূর্তি ও একটি বরাহের মস্তকদেশ। দ্বিতীয় পাথরে বরাহের দেহের বাকি অংশ ও একটি বৃষমূর্তি। লিপির দ্বিতীয় পঙ্ক্তির 'খরগাম,' নবম পঙ্ক্তির 'রমবসক' ও দশম পঙ্ক্তির '৯২০ তরিখ ১৭ মাঘ' এই ক'টি শব্দ ছাড়া এ দুর্বোধ্য ও ক্ষয়প্রাপ্ত লিপির আর কোনো পাঠ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, হবে বলেও মনে হয় না।

শিলালিপির পাঠ : সাধারণ অর্থে ৯২০ শকের ১৭ ই মাঘ তারিখে লিপিটি খোদিত হয়েছিল বলে ধরলে লিপিকাল দাঁড়ায় ৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে পাল নৃপতি প্রথম মহীপালের রাজত্বকালে (৯৮৮-১০৩৮ খ্রিঃ)। সে সময় অর্থাৎ দশম খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষায় আরবি 'তারিখ' শব্দের ব্যবহার কল্পনারও অতীত। অনেক বিবেচনার পর আমরা এটিকে বঙ্গাব্দ

১. ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুরে প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত থাকা কালীন এ শিলালিপিখানা হঠাৎ আমাদের চোখে পড়ে। এটি সেখান থেকে এনে নবপ্রতিষ্ঠিত দিনাজপুর যাদুঘরে রাখি। 'ইতিহাস' পত্রিকায় (বৈশাখ-চৈত্র ১৩৭৮) 'গোরকুই শিলালিপি' শীর্ষক প্রবন্ধে এ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক আবু তালিবও এ শিলালিপি সম্পর্কে একাধিক প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন।

বা মল্লাব্দ বলে ধরেছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গে এটিকে হিজরী সমন বলে ধরার কথা শোনা গেছে। সেই মতে ৯২০ হিজরী হবে ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দ। কিন্তু কোনো অমুসলিমের লিপিতে হিজরী সনের ব্যবহার বাঙলায় দেখা যায় না। আর যদি হিজরী সনের কথাই বলা হয়ে থাকে তবে সেখানে হিজরী না বলে শক শব্দের ব্যবহারই বা হবে কেন?



শিলালিপি

বঙ্গাব্দ কবে প্রচলিত হয়েছিল তাও সঠিকভাবে জানা যায় না। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, সুলতান হোসেন শাহ্‌র আমলে বঙ্গাব্দ প্রচলিত হয়েছিল। আবার কারো কারো মতে সম্রাট আকবরের সময়ে (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রিঃ) বঙ্গাব্দ প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু কোনোটি সম্পর্কেই কোন সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। মল্লাব্দ কবে প্রচলিত হয়েছিল তাও সঠিকভাবে জানা যায় না।

অক্ষর দৃষ্টে মনে হয় যে, এলিপি বেশ পরবর্তীকালের—ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়, এর পরেরও হতে পারে। এ স্থানের ধ্বংসাবশেষ বিশেষ করে পাথরের তৈরি কূপ ও এ স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকা অসংখ্য বেলে পাথরের টুকরা দেখে খুব সহজেই ধারণা করা যায় যে, এ স্থান বেশ প্রাচীন, পাল যুগের তো বটেই, এর আগের হওয়াও বিচিত্র নয়।

খুব সম্ভব এ স্থানে একটি বৌদ্ধ ধর্ম ও সাংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল এবং সেই কেন্দ্র গোরক্ষনাথের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। প্রথমে গোরক্ষনাথ ছিলেন বৌদ্ধধর্মের একজন শ্রদ্ধেয় গুরু। পরে তিনি প্রধান চারজন নাথধর্মের গুরুদের মধ্যে অন্যতম বলে বিবেচিত হন। তাঁর সমাধি বলে চিহ্নিত স্থানটি সত্যিই তাঁর সমাধি কিনা তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও এস্থান যে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল তাতে বোধ হয় কোনো সন্দেহ নেই। পণ্ডিতদের মতে নাথগুরু গোরক্ষনাথের আবির্ভাব কাল নবম-দশক-একাদশ শতাব্দীর কোনো এক সময়ে। খুব সম্ভব তাঁর সময়েই এ কূপটি নির্মিত হয়েছিল। কূপের লাগোয়া উত্তরে এখন যেখানে পাকা দেয়াল বিশিষ্ট টিনের ঘরটি আছে সেখানে একটি মন্দির গোরক্ষনাথের সমনয়ে ও কূপের সমসাময়িক কালে নির্মিত হয়েছিল বলে ধারণা হয়। সেই মন্দিরে একটি শিলালিপিও খুব সম্ভব ছিল এবং এর লিপিকাল ছিল ৯২০ শক।

পুরাতন মন্দির এবং লিপিটিও কালক্রমে (খুব সম্ভব সুলতানি আমলে) ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেলে খুব সম্ভব একটি নতুন মন্দির নির্মাণ করা হয় এবং তাতে পুরাতন সনটিই রাখা হয়েছিল। তখন তারিখ শব্দ বাংলা ভাষায় ভালভাবেই স্থান করে নিয়েছে। তাই তারিখ শব্দটি সেখানে যোগ করে দেওয়া হয়েছিল। এ লিপিটি বেশ আনাড়িহাতের ছিল বলে দেখা যায় এবং নিকৃষ্ট বেলে পাথরে খোদিত হয়েছিল বলে তা এমনভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে যে, এর অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয় বারে যে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল তা-ও কালক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং অপেক্ষাকৃত বর্তমানের টিনের ঘরটি নির্মিত হয়। সে সময়ে আলোচ্য শিলালিপিটির অস্তিত্ব থাকলেও কেউ এর অর্থ বা মূল্য সম্বন্ধে অবহিত না থাকার কারণে শিলালিপির পাথর দুটিকে দ্বারের নিচের চৌকাঠ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

জগদল ও ধর্মগড়

গোরকুই থেকে মাইল তিনেক পশ্চিমে বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় নাগর নদীর তীরে হরিপুর থানায় অবস্থিত জগদল নামক একটি প্রাচীন স্থান আছে। কিন্তু এখানে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য প্রাচীন কীর্তির চিহ্ন চোখে পড়েনা। তবে জগদলের কাছাকাছি স্থানে ধর্মগড় নামক একটি প্রাচীন দুর্গ আছে। আনুমানিক ৫০০ মিটার ×

৪০০ মিটার আয়তনের এ দুর্গটির মাটির প্রাচীরগুলি ছিল প্রায় ৩ মিটার উঁচু। বর্তমানে প্রাচীরগুলি প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে, পরিখার চিহ্ন আজও বিদ্যমান। গড়ের ভিতরে ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ যথেষ্ট পাওয়া যায়।

জগদ্দল নামের জের টেনে কেউ কেউ বলতে চান যে, রামপালের সময়ে নির্মিত 'জগদ্দল মহাবিহার' ছিল এই জগদলে। এই অনুমান যে অহেতুক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সমগ্র এলাকা জুড়ে প্রাচীন কীর্তির যে ধ্বংসাবশেষ আছে, তা এত অকিঞ্চিৎকর যে সেখানে 'জগদ্দল মহাবিহারের' অস্তিত্বের কথা কল্পনাও করা যায় না। খুব সম্ভব ধর্মপাল দেবের সময়ে এখানে একটি ছোট সেনানিবাস বা প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল।

রানীসংকইল-মালদুয়ার

প্রাচীন 'কাইচা' নদীর (বর্তমানে শুধু প্রাচীন খাতের চিহ্ন বিদ্যমান) পশ্চিমে এবং কাইচা ও কুলীক নদীর মিলন স্থলের পশ্চিমে প্রায় ১৫ বর্গ কিলোমিটার স্থান জুড়ে একটি প্রাচীন জনপদের চিহ্ন পাওয়া যায় রানীসংকইল নামক বিচিত্র নামধারী এইস্থানে। প্রাচীন কীর্তিগুলির সর্বশেষ চিহ্ন হিসাবে আজও যা টিকে আছে, তা হচ্ছে একটি বিরাট দুর্গ, অসংখ্য প্রাচীন জলাশয় এবং এই বিরাট এলাকার প্রায় সর্বত্র মাটির নিচে ইট-পাথরের অবস্থান।

বর্তমানে যেখানে থানা তার কিছু উত্তরেই উত্তর-দক্ষিণে লম্বা প্রায় ৩৫০ মিটার × ১৫০ মিটার আয়তনের এক বিরাট দিঘির পাড়ে রানীসংকইল উপজেলা কমপ্লেক্স অবস্থিত। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রায় মজে যাওয়া এ প্রাচীন জলাশয়টি সংস্কার করতে গিয়ে দেখা যায় যে, দিঘির ঠিক মাঝখানে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ইট বাঁধান একটি প্রশস্ত রাস্তা আছে দিঘির তলদেশে।

দিঘির পূর্ব-দক্ষিণ কোণে মোঘল আমলে তৈরি একটি মন্দির ছিল। তাতে চার-কোণে ও দরজা-জানালায় প্রচুর পাথর লাগান ছিল। উপরে ছিল চৌচালা ঘরের মতো ছাদ। আনুমানিক ১৪ মিটার × ১০ মিটার আয়তন এবং বহু কক্ষ বিশিষ্ট এ শিব মন্দির ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পরিত্যক্ত অবস্থায় টিকে ছিল। বর্তমানে ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে। এ মন্দির থেকে প্রায় ১.৫ কিলোমিটার উত্তরে দুটি প্রাচীন জলাশয় আছে। বড়টির আয়তন ৫৪০ মিটার × ২৭৫ মিটার। নাম বড় রানীর দিঘি। তার লাগোয়া উত্তরেই আছে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের ছোট রানীর দিঘি। এ জলাশয় দুটির ধারে-কাছে বিশেষ করে উত্তর দিকে অসংখ্য প্রাচীন জলাশয় আছে। সমগ্র অঞ্চলে মাটির নিচে ইট, পাথর ও প্রাচীন কালের মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ পাওয়া যায়।

রানীসংকইল গড়

থানা থেকে প্রায় আধ মাইল দক্ষিণে গড়ের শুরু। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ গড়ের আয়তন প্রায় ২.৫০ কিলোমিটার × ১.৫০ কিলোমিটার। মাটির তৈরি প্রশস্ত দেয়ালগুলি এখনও প্রায় ৩ মিটার উঁচু। বাইরের দিকে প্রশস্ত পরিখার চিহ্ন বিদ্যমান। বর্তমান কালে

রানীসংকইল গ্রাম ও গঞ্জ গড়ের ভিতরে উত্তরাংশে অবস্থিত। গড়ের দক্ষিণ ভাগে চাষের কাজ চলে। এককালে এখানে যে একটি দুর্গনগরী ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

মালদুয়ার

গড়ের পূর্ব দিকে অবস্থিত কুলীক নদীর তীরে যে পাকা ব্রীজ আছে, তা পার হয়ে কিছুদূর গেলেই মালদুয়ারের প্রাক্তন জমিদার রাজা টঙ্কানাথের মন্দির ও রাজবাড়ি চোখে পড়ে। মৈথিলী ব্রাহ্মণ রাজা টঙ্কানাথের পূর্ব পুরুষ নাকি ছিলেন গোয়ালা বংশীয় আদি জমিদারের পুরোহিত। নিঃসন্তান বৃদ্ধ ভূস্বামী সস্ত্রীক কাশীবাসে যাবার সময় পুরোহিতের হেফাজতে জমিদারি রেখে গিয়ে আর ফিরে আসেননি। ফলে পুরোহিত জমিদার হয়ে বসেন।

গোয়ালা বা ঘোষ বংশীয় জমিদারের ইতিহাসটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। মালদুয়ার এস্টেটে প্রাপ্ত একটি প্রাচীন তাম্রলিপিতে ধবল ঘোষ তনয় মহামান্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ নামক একজন সামন্ত নৃপতির সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি আনুমানিক দশম-একাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। ঈশ্বর ঘোষের প্রপিতামহ ধূর্তঘোষ রাঢ় অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন। তাঁর পুত্র বালঘোষ। তাঁর পুত্র ধবল ঘোষ। তাম্রলিপি থেকে আরও জানা যায় যে, "ঈশ্বর ঘোষ 'জটোদা' নদীতে স্নান করিয়া 'ঢেক্করী' হইতে 'পিপোল্ল মণ্ডলান্তঃপাতী গাল্লিটিপ্যক বিষয়ে দিগ্‌ঘাসোদিকা গ্রাম' নিব্বোক শর্মাকে দান করিয়াছিলেন। উক্ত লিপির শেষভাগে 'ইতি সম্বৎ ৩৫ মার্গ দিনে ১' ক্ষোদিত রহিয়াছে।"[১]

'জটোদা'কে কামরূপের একটি প্রাচীন নদী বলে ধরে কোচবিহারের ইতিহাস প্রণেতা ঈশ্বর ঘোষকে দশম-একাদশ শতাব্দীর কোনো এক সময়ে কামরূপ বিজেতা বলে মনে করেছেন। তাঁর প্রপিতামহ ধূর্ত ঘোষকে রাঢ় অঞ্চলের অধিপতি দেখে ধারণা হয় যে, রাঢ় থেকে কামরূপ পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে কোনো এক সময়ে তাঁদের কিছু না কিছু আধিপত্য ছিল। আলোচ্য তাম্রশাসন থেকে এ ধারণাও করা যায় যে, খুব সম্ভব রানীসংকইল-মালদুয়ার অঞ্চলেও তাঁদের আধিপত্য ছিল এবং পরবর্তী কালের গোয়ালা বা ঘোষ বংশীয় জমিদারগণও খুব সম্ভব প্রাচীন কালের মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের বংশোদ্ভূত ছিলেন।

ইতিহাস

নেকমরদ ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় অসংখ্য প্রাচীন দিঘি-পুষ্করিণী, একটি প্রাচীন দুর্গ, অসংখ্য ছোট-বড় পাথর, পাথর ও ব্রোঞ্জের মূর্তি, মাটির নিচে অসংখ্য ইট ও প্রাচীন ইমারতের ভিত্তি দেখে অতি সহজেই ধারণা করা যায় যে, এক কালে এখানে ছিল একটি সমৃদ্ধ জনপদ। স্থানীয় জনপ্রবাদ মতে ভীম ও পৃথু নামক দুই ভাই নাকি এখানে রাজত্ব করতেন।

১. কোচবিহারের ইতিহাস, ১৯.২০ পৃ.—খান চৌধুরী আমানত উল্লা আহমদ।

বাংলাদেশের ইতিহাসে পৃথু নামক এক নৃপতির সন্ধান পাওয়া যায় ষষ্ঠ শতাব্দীর সমতটের নৃপতি গোপচন্দ্রের আগে বা পরে। তাঁর রাজ্যসীমা উত্তরাঞ্চলের নেকমরদ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল বলে ধারণা করা যায় না। পৃথুরাজ নামক আর একজন নৃপতি সম্পর্কে জোর জনপ্রবাদ শোনা যায় কামরূপ-কামাতা রাজ্যে। তিনি নাকি খ্রিস্টিয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে ভিতরগড় দুর্গনগরী নির্মাণ করেছিলেন (ভিতরগড় দ্র.)। তিনি যদি আদৌ ঐতিহাসিক ব্যক্তি হন তবে নেকমরদ অঞ্চল তাঁর অধিকারে থাকা বিচিত্র নয়। একাদশ শতাব্দীর কৈবর্তরাজ ভীম নেকমরদ অঞ্চলের ভীম কিনা, তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন।

মাটির নিচে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জ মূর্তিগুলি পালযুগের শেষের দিকের অথবা সেনযুগের প্রথম দিকের বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। মীনহাজের বর্ণনায় দেখা যায় যে, মোহাম্মদ বখতিয়ারের লখনৌতি অধিকারের সময় (১২০৫ খ্রিঃ) ভীত প্রজারা লখনৌতি ছেড়ে পূর্বদিকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। খুব সম্ভব সে সময়েই নেকমরদ অঞ্চলে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হিন্দুরা পালিয়ে যাবার সময় ব্রোঞ্জ মূর্তিগুলি মাটির নিচে ও পাথরের মূর্তিগুলি পুকুরে ফেলে যান। এর পরে হয়ত সেস্থান পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং অনেক পরবর্তী কালে নেকমরদের নামানুসারে এ স্থানের নতুন নামকরণ হয়।

নেকমরদের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। বালিয়া দিঘির (পশ্চিম দিনাজপুর, ভারত) ফকীরদের কাছে নাকি নেকমরদ মাযার সংক্রান্ত কিছু প্রাচীন দলীল-পত্র আছে। কিন্তু সেগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে মাযারে শায়িত ব্যক্তির নাম যে শেখ নাসির-উদ্-দীন নেকমরদ, তা বহুকাল থেকে লোক মুখে শ্রুত হয়ে আসছে। এ মাযারের জন্য প্রচুর লাখেরাজ জমি বরাদ্দ ছিল বলে জানা যায়। তিনি খুব সম্ভব মোঘল আমলের লোক ছিলেন। সুলতান হোসেন শাহ্‌র আমলে নেকমরদ যে খুব উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল না, মহলবাড়ি মসজিদের শিলালিপিতে এ স্থানের কোনো উল্লেখ না দেখে তা অনুমান করা যায়।

মুসলিম আমল

গোবিন্দনগর দুর্গ ও মন্দির

ঠাকুরগাঁও শহরের উত্তর-পশ্চিম দিকে টাঙ্গন নদীর অপর তীরে একটি দুর্গ বা গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। টাঙ্গন নদীর উপরে অবস্থিত পাকা পুলের উত্তর মাথা থেকে উত্তর দিকে কৃষি খামারের দিকে যে রাস্তাটি চলে গেছে, তা দুর্গের উত্তর দেয়ালকে ভেদ করে গেছে। উত্তর দেয়াল এই রাস্তার আরও সামান্য পূর্ব দিক পর্যন্ত প্রসারিত আছে। এই দেয়াল বর্তমান ঠাকুরগাঁও কলেজের উত্তর দিক দিয়ে সোজা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ দিকে মোড় নিয়ে টাঙ্গন নদী পর্যন্ত গিয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। দক্ষিণ ও পূর্ব দেয়াল টাঙ্গন নদীর ভাঙ্গনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। উত্তর দেয়ালের বর্তমান দৈর্ঘ্য প্রায় ১ কিলোমিটার এবং পশ্চিম দেয়ালের বর্তমান দৈর্ঘ্য আধ কিলোমিটার চেয়েও কম। দেয়াল-গুলির উচ্চতা বর্তমানে ২ মিটারের বেশি নয়। দেয়ালের বাইরে যে পরিখা ছিল, সেগুলির চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। দেয়ালগুলি সবই মাটির তৈরি।

এই দুর্গের প্রায় মাঝামাঝি এলাকায় টাঙ্গন নদীর কাছাকাছি স্থানে বর্তমান গোবিন্দনগর মন্দির অবস্থিত। রাজা রামনাথ কর্তৃক নির্মিত বলে কথিত এ মন্দিরের তেমন কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নেই। খুব সম্ভব অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের শুরুতে রাজা রামনাথ এখানে নতুন করে একটি মন্দির তৈরি করেছিলেন। পরে এই মন্দিরের আমূল সংস্কার বেশ কয়েক বার করা হয়েছে এবং বর্তমান মন্দিরটিকে হাল আমলের বলা যেতে পারে। কাল পাথরের তৈরি গোবিন্দজী বলে অভিহিত শ্রীকৃষ্ণের একটি ক্ষুদ্রমূর্তির পূজা এখানে করা হয়ে থাকে।

এই মূর্তি সম্বন্ধে 'দিনাজপুর রাজবংশের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে সৈয়দ মোশারফ হোসেন একটি চিত্তাকর্ষক গল্পের অবতারণা করেছেন। তিনি বলেন, "কথিত আছে যে, এই শালবাড়ি পরগণার ভূস্বামীর রক্ষাকর্ত্রী স্বরূপ কালিকা ও চামুণ্ডা বিগ্রহ জমিদারের বাটিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বিগ্রহদ্বয় তাঁহার বাটিতে অবস্থান কালে কেহ ভূস্বামীর অনিষ্ট সাধনে সক্ষম হইতনা। রাজা রামনাথ এই বিগ্রহদ্বয় স্বগৃহে আনয়নার্থে একটি চতুর ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিলেন। ব্রাহ্মণ চৌর্যবৃত্তিতে সফলকাম হওয়ায় রামনাথের সঙ্গে ভূস্বামীর ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ইহাতে শালবাড়ির ভূস্বামীর পরাজয় হয়। ভূস্বামী তাঁহার হৃতগৌরব উদ্ধার মানসে দ্বিতীয়বার রাজা রামনাথকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধেও ভূস্বামী পরাজিত হওয়াতে উক্ত পরগণা রামনাথের রাজ্যান্তর্গত হয়।"

এ ধরনের একটি উক্তি মিঃ স্ট্রং (Mr. F. W. Strong) রচিত দিনাজপুর জেলা গেজিটিয়ারেও দেখা দেখা যায়।[১]

ইদানীং গোবিন্দনগর মন্দিরের একটি শিলালিপি দিনাজপুর যাদুঘরের প্রাক্তন কিউরেটর জনাব মেহরাব আলী কর্তৃক দিনাজপুর শহর থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। তাঁর সৌজন্যে প্রাপ্ত শিলালিপির পাঠ নিম্নরূপ :

"শাকে হগ্নি পক্ষষ্ঠ চন্দ্র
গণিতে প্রীতয়ে হরেঃ।
শ্রী মদ্গোবিন্দ রায়স্য মা
ত্রাছ দাদ্বিবিষ্ণু মন্দিরং ॥১৬২৩।"

অনুবাদ : ১৬২৩ শকাব্দে (১৭০১ খ্রিঃ) শ্রীমান গোবিন্দ রায়ের মাতা কর্তৃক হরির প্রীতার্থে বিষ্ণু মন্দিরের আচ্ছদনাদি (নির্মিত হয়)।[২]

১. "Ramnath conquered and dispossessed the zamindar of Gobindanagar, near the present village of Thakurgaon, employing a Brahmin to steal his protecting deity or family idol Gobinda, and thus causing his downfall. The conqueror subesequently constructed a canal conneting Gobindanagar on the Tangan with Prannagar near the Punarbhaba for the purpose of taking the idol backwards and forwards between the two places."

২. শিলালিপির আংশিক পাঠ ও অনুবাদ ঢাকা যাদুঘরের প্রাক্তন সহকারী রক্ষক শ্রী রনজিৎ কুমার শর্মার সাহায্যে প্রাপ্ত।

রাজা গোবিন্দ রায়ের মাতা কর্তৃক যে মন্দিরের আচ্ছাদন নির্মাণ করা হয়েছিল, সে মন্দিরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। খুব সম্ভব বর্তমান মন্দিরের স্থানেই ছিল সেই মন্দিরটি। সেখানে বর্তমান মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল বলে ধারণা হয়। বর্তমান মন্দিরের পশ্চিমে দিকে এখন যেখানে অনেক বসতি গড়ে উঠেছে, সেখানে ছিল গভীর জঙ্গল। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের দিকেও সেখানে কোন বসতি ছিল না। এর বছর দশেক পরে জঙ্গল পরিষ্কার করে সেখানে যখন বসতি স্থাপনের প্রচেষ্টা চলে, তখন আনুমানিক ২ মিটার × ২ মিটার আয়তনের একটি ছোট মন্দিরের অস্তিত্ব বের হয়ে পড়ে। জীর্ণ মন্দিরের উপরে তখন কোনো ছাদ ছিল না। ইট ও মন্দির নির্মাণের গঠনকৌশল দেখে মনে হয় যে, এটি মোঘল আমলের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে গোবিন্দনগর মন্দিরের প্রায় ২০০ মিটার পশ্চিম দিকে অবস্থিত সেই মন্দির ছিল খুব সম্ভব রাজা গোবিন্দ রায়, কি তাঁর কোনো পূর্বপুরুষের কীর্তি। এই মন্দিরের ধারে কাছে অসংখ্য প্রাচীন ইট পড়েছিল এবং আরও ছিল ইমারতের ভিত্তি দেয়ালের চিহ্ন। খুব সম্ভব এখানেই ছিল গোবিন্দরায়ের রাজবাড়ি। সেই ভগ্ন মন্দিরসহ কোনো কীর্তির চিহ্ন আর সেখানে টিকে নেই। গোবিন্দনগর গড়টি বহু প্রাচীন বলে ধারণা হয়।

রামদাঁড়া

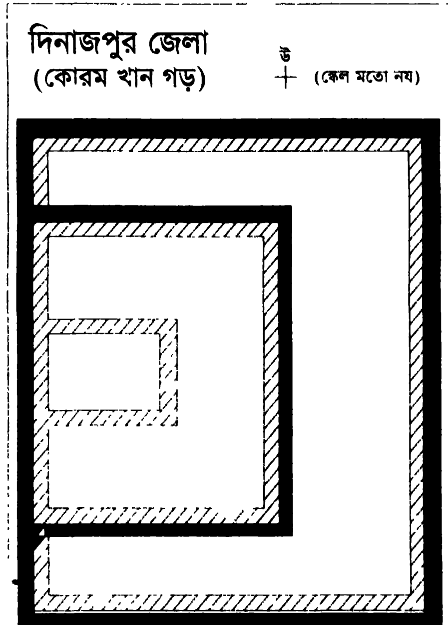
গোবিন্দনগর মন্দিরের দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত টাঙ্গন নদী থেকে আরম্ভ হয়ে দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁও পাকা সড়ক ঘেঁষে এবং সড়কের পূর্ব পার্শ্ব দিয়ে যে কৃত্রিম খালটি দক্ষিণে প্রাণনগর (বীরগঞ্জের উত্তরে অবস্থিত) পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে পূণর্ভবা নদীর সঙ্গে মিশে গেছে, সেটিকে রামদাঁড়া বলা হয়ে থাকে। এই খালের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮ কিলোমিটার। খালটি এখন প্রায় মরে গেছে কিন্তু এর পশ্চিমপাড়ের উঁচু বাঁধটি এখনও টিকে আছে। এই খাল নিয়ে যে একটি চিত্তাকর্ষক গল্প আছে তা নিম্নরূপ :

গোবিন্দনগরের বিগ্রহ গোবিন্দজী নাকি এক রাতে রাজা রামনাথকে স্বপ্নাদেশ দিলেন, তিনি জলপথে কান্তনগরে গিয়ে সেখানকার বিগ্রহ কান্তজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। রাজা মহাভাবনায় পড়ে গেলেন। জলপথে টাঙ্গনের স্রোত ধরে যেতে গেলে মহানন্দা-পদ্মা হয়ে পুনর্ভবা দিয়ে কান্তনগরে আসতে হবে। তাতে অন্যের রাজ্যের ভিতর দিয়ে ঠাকুরকে নিয়ে যেতে হবে এবং তা মোটেই নিরাপদ নয়। তিনি মহা ফাঁপড়ে পড়ে গেলেন। অবশেষে মন্ত্রীর পরামর্শে তিনি রাতারাতি প্রায় ১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এক খাল কেটে জলপথের সৃষ্টি করে ঠাকুরকে কান্তনগরে নিয়ে এলেন। নাম হল রামদাঁড়া।

এ কাহিনীর পিছনে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। কিছুকাল আগে পর্যন্ত গোবিন্দজীর বিগ্রহকে বছরে একবার কান্তনগরে আনা হত কিন্তু তা জলপথে নয়, স্থলপথে মোটরগাড়ি যোগে। অবশ্য রামদাঁড়া যখন নৌ-চলাচলের যোগ্য ছিল এবং স্থলপথে গমনাগমন সুবিধাজনক ছিল না, তখন গোবিন্দজীকে জলপথেই আনা হত। খুব সম্ভব পুনর্ভবা নদী উপর দিকে মজে যাওয়ার কালে ঠাকুরগাঁয়ের সঙ্গে দিনাজপুরের যোগাযোগের সুবিধার জন্য রাজা রামনাথ এ খালটি কাটিয়েছিলেন।

কোরমখান গড়

ঠাকুরগাঁও শহর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার উত্তরে এবং ঠাকুরগাঁও-পঞ্চগড় পাকা সড়ক থেকে প্রায় ৭ কিলোমিটার পশ্চিমে রানীগঞ্জ তহসীল কাচারীর কাছাকাছি স্থানে একটি বিচিত্র ধরনের দুর্গ আছে।



বর্গাকারে নির্মিত দুর্গের প্রত্যেক বাহু প্রায় আধ মাইল দীর্ঘ। প্রায় ১½ মিটার উঁচু মাটির প্রাচীরের বাইরের দিকে প্রায় ১৫ মিটার প্রশস্ত গভীর পরিখা। পরিখাগুলিতে বিশেষ করে পূর্ব দিকের পরিখাতে এখনও বারমাস পানি থাকে। বাইরের প্রাচীর থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে দূরে উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে আরও ১টি করে দেয়াল ভিতরের দিকে আছে। এই ৩টি দেয়াল ও পশ্চিম দিকের দেয়াল মিলে একটি অভ্যন্তরীণ দুর্গ এলাকা সৃষ্টি করেছে। এ ৩টি দেয়াল ও সংলগ্ন পরিখাগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারের।

এই অভ্যন্তরীণ দুর্গ এলাকার পশ্চিম দিকে পশ্চিম দেয়াল ঘেঁষে একটি বিরাট জলাশয় আছে। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা এ দীঘির আয়তন প্রায় ৩০০ মিটার × ২০০ মিটার। দিঘিটি বেশ গভীর। দিঘির পূর্ব পাড়ের মাঝামাঝি স্থানে বাঁধান ঘাট ছিল। এখনও সে ঘাটের চিহ্ন আছে। ঘাটের পূর্ব দিকের ভূমি বেশ উঁচু। সেখানে প্রাচীন ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষের প্রচুর নিদর্শন বিদ্যমান। এখানেই ছিল খুব সম্ভব দুর্গাধিপতির বাসস্থান বা সে জাতীয় কোনো ইমারত।

এ দুর্গের কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না। জনপ্রবাদ ও ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তুত রেভিনিউ সার্ভে ম্যাপ মতে এ দুর্গের নাম কোরম খানের গড়। কোরম খান নামে কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। খুব সম্ভব কামরূপ-কামতা রাজ্য অধিকার করার পরে এখানে কোনো মুসলিম প্রশাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ দুর্গ খুব সম্ভব সুলতানী আমলে নির্মিত হয়েছিল।

কোয়েলী রাজার গড়

কোরমখান গড় থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে একটি সাদাসিধা ধরনের অসমাপ্ত গড় আছে। বর্গাকারে নির্মিত এ গড়ের প্রত্যেক বাহু এক কিলোমিটারের চেয়ে

কিছু বেশি দীর্ঘ। অনেক স্থানে প্রাচীর নেই অথবা আদৌ প্রাচীর নির্মাণ করা হয়নি। দেয়ালের বাইরে অপ্রশস্ত পরিখার চিহ্ন আছে। কিন্তু যেখানে প্রাচীর নেই, সেখানে পরিখার চিহ্নও নেই। গড়ের ভিতরে কোনো ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন নেই, নেই কোনো ইট-পাটকেল বা মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ। এতে মনে হয়, এখানে কোনো স্থায়ী বসবাস গড়ে ওঠেনি এবং সাময়িক উদ্দেশ্য সামনের জন্য এ দুর্গ নির্মিত হয়েছিল।

এ দুর্গের কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের রেভিনিউ সার্ভে ম্যাপের মতে এর নাম কোয়েলী রাজার গড়। নানা প্রকার অর্থহীন কিংবদন্তী অবশ্য প্রচলিত আছে। এক ফকীর বা সন্ন্যাসীর অভিশাপে নাকি রাজা এ গড় সমাপ্ত করতে পারেন নি এবং এর ফলে নাকি তিনি মুসলমানের নিকট পরাজয় বরণ করেন। সুরক্ষিত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্মিত কোরমখান দুর্গের কাছাকাছি অতি খেলো ধরনের এ দুর্গের অবস্থানের তাৎপর্য বোঝা খুবই কঠিন ব্যাপার। খুব সম্ভব কোরম খান দুর্গ অবরোধ করার উদ্দেশ্যে এই গড়টি সাময়িক ও সামরিক উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত নির্মিত হয়ে থাকবে।

নেকমরদ

রানীশংকইল থানার অধীনে ও থানা থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার উত্তরে জেলা পরিষদের রাস্তার উপরে অবস্থিত নেকমরদ নামক স্থান বর্তমানে একটি মাযার ও মেলার জন্য প্রসিদ্ধ। মাযারে যিনি শায়িত আছেন, তাঁর নাম শেখ নাসির-উদ্-দীন নেকমরদ বলে জনশ্রুতিমূলে জানা যায়। নেকমরদ বলে কোনো মৌজার নাম নেই। এ স্থানের প্রাচীন নাম কী ছিল তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। ব্রিটিশ আমলের কাগজপত্র মতে এ স্থানের নাম মৌজা ভবানন্দপুর এবং কাগজপত্রে এই নামই চলে আসছে।

ব্রিটিশ আমলের বহু আগে থেকেই এখানে একটি বিরাট মেলা বসত। এই নেকমরদের মেলা ছিল উপমহাদেশের অতি বিখ্যাত কুম্ভ ও হরিহরছত্রের মেলার সঙ্গে তুলনীয়। এ মেলা সম্পর্কে মেজর শেরউইল ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মানচিত্রের উপক্রমণিকায় যা বলে গেছেন, তার বাংলা অনুবাদ পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছে।

মহলবাড়ি মসজিদ ও অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ

মৌজার নাম মহেশপুর। লোক মুখে প্রচলিত নাম বিশ-বাইশের মহল বা মহল বাড়ি। নেকমরদ থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার দক্ষিণে কুলীক নদীর ডান (পশ্চিম) তীরে এবং নদী থেকে প্রায় ২০০ মিটার পশ্চিমে একটি মসজিদ ছিল। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে যখন আমরা মসজিদটি প্রথম দেখি, তখন তার গম্বুজ ধসে পড়েছিল, চারদিকের দেয়াল দাঁড়িয়ে ছিল। আর মসজিদের ভিতরে বাইরে অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড স্তূপীকৃত হয়ে পড়েছিল। এর পরে স্থানীয় লোকেরা পুরাতন মসজিদের ধ্বংসাবশেষের উপর একটি টালির ছাদওয়ালা মসজিদ নির্মাণ করেছেন।

খুব সম্ভব প্রাচীন মসজিদের আয়তন ছিল ১০ মিটার × ৫ মিটার অথবা এধরনের কোনো আয়তন। উপরে ছিল ৩টি গম্বুজ। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ মসজিদের দেয়ালগুলি ছিল প্রায় ১.৫১ মিটার প্রশস্ত। পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে

প্রবেশপথ ছিল। পশ্চিম দেয়ালে ছিল ৩টি মিহরাব। দেয়ালের বাইরের দিকে পোড়ামাটির ফলকচিত্র ছিল না। ছিল পলেস্তারা। খুব সম্ভব মোঘল আমলে ও পরে এ মসজিদটি নতুন করে নির্মিত হয়েছিল এবং বারান্দাহীন ৩ গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছিল এবং তারই ফলে মসজিদে পলেস্তারার কাজ ছিল।

মসজিদে অসংখ্য পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল। মসজিদের ভিতরে, দেয়ালে ও কোণে অসংখ্য পাথরের স্তম্ভ ছিল। মেহরাবগুলিও প্রস্তরনির্মিত ছিল। চারকোণে বাইরের দিকে কোনো মিনার (turret) ছিল কিনা, তা বলা যায় না। ইটের অনুপাতে মসজিদে ব্যবহৃত পাথরের পরিমাণ ছিল প্রায় এক চতুর্থাংশ।

মসজিদের পূর্বদিকের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উপরে একটি শিলালিপি ছিল। বর্তমানে দিনাজপুর যাদুঘরে রক্ষিত এ শিলালিপির পাঠ থেকে জানা যায় যে, সুলতান আলা-উদ্-দীন হোসেন শাহ্র রাজত্বকালে, রহীম-উদ্-দীনের পুত্র জনৈক মিয়া মালিক ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে এ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।

মসজিদের ১৫ মিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রায় ৫১.৫ মিটার × ৩৫ মিটার আয়তনের উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি ছোট প্রাচীন পুকুর আছে। পুকুরের উত্তর পাড়ের পাথর বাঁধান ঘাট পাড়ের অর্ধাংশ জুড়ে আছে এবং তা পুকুরের তলদেশে চলে গেছে। বাঁধান ঘাট থেকে মসজিদ পর্যন্ত প্রশস্ত পথও পাথর দিয়ে বাঁধান।

পুকুর থেকে প্রায় ১০০ মিটার পূর্ব দিকে জঙ্গলের মধ্যে একটি বিরাট পাকা কবর আছে। প্রায় ৪ মিটার × ৩ মিটার আয়তনের এ কবর প্রায় ১.৫ মিটার উঁচু এবং এতে প্রচুর পরিমাণে পাথর ব্যবহার করা হয়েছে।

মসজিদ থেকে প্রায় ৫০ মিটার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আনুমানিক ৬ মিটার × ৩ মিটার আয়তনের একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আছে। চারকোণে ৪টি পাথরের সরু স্তম্ভ এবং উত্তর দেয়ালের মাঝামাঝি স্থানে একটি নিচু (প্রায় ১.২ মিটার উঁচু) ও সরু প্রবেশপথ এখনও দণ্ডায়মান, ধারে কাছে অজস্র ইট-পাথর পড়ে আছে। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা এই ইমারত ছিল খুব সম্ভব একটি হুযরাখানা।

এই ইমারত থেকে প্রায় ২০০ মিটার পশ্চিমে প্রায় ৩ একর ভূমি জুড়ে একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্থান আছে। সেখানে অসংখ্য প্রাচীন ইটের ভগ্নাংশ চারদিকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। আর আছে মাটির নিচে অসংখ্য প্রাচীন ইমারতের প্রশস্ত ভিত্তি। লোকে বলে, রাজার ইটখোলা। কিন্তু মাটির নিচে অসংখ্য দেয়ালের ভিত্তি চিহ্ন দেখে সহজেই ধারণা হয় যে, এখানে এক কালে অসংখ্য ইমারত ছিল।

এখানে যে সমস্ত পাথর বর্তমানে দেখা যায়, তা সবই বেলে পাথর। এবং সেগুলি সংখ্যায় খুব বেশি। এখানে প্রাচীন কালে বিরাট একটি মন্দির বা একাধিক মন্দির ছিল বলে ধারণা করা যায়। মসজিদে যে কাল পাথরের শিলালিপিটি ছিল, তার পিছনে ৩টি মূর্তি উৎকীর্ণ ছিল। মূর্তিগুলিকে এমনভাবে বিনষ্ট করা হয়েছে যে সেগুলির পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এখানে যে একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ হিন্দু-বৌদ্ধ আমলে ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। খুব সম্ভব সেই জনপদ ধ্বংস হয়ে গেলে হোসেন শাহ্র আমল এখানে নতুন করে একটি শহর গড়ে উঠেছিল।

তিন পঙ্‌ক্তির ও তালিক অক্ষরে লিপিবদ্ধ ঐ শিলালিপির অনুবাদ নিম্নরূপ : "রাসুল—তাঁর উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক!—বলেছিলেন, 'যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে একটি মসজিদ নির্মাণ করবেন আল্লাহ তাঁর জন্য বেহেশ্‌তে একটি প্রাসাদ তৈরি করিয়া দিবেন।' জল ও স্থলের প্রভু এবং অসংখ্য বিজয়ের অধিকারী আলা-উদ্‌-দুনিয়া ওয়াদ-দীন আবুল মোযাফর হোসেন শাহ্‌র রাজত্বকালে—আল্লাহ্‌ তাঁর রাজ্য ও রাজত্বকে চিরস্থায়ী করুন—রহীম-উদ্‌-দীনের পুত্র মিয়া মালিক ৯০৫ হিজরী সনের জমাদি অস্‌-সানি মাসে (১৫০০ খ্রিঃ) এ মসজিদ নির্মাণ করেন।"[১]

গড় ভবানীপুর খোর্দ ও ভাতুরিয়া

গড় ভবানীপুর খোর্দ অর্থাৎ ছোট ভবানীপুর দুর্গ। রানীসংকইল থানার দক্ষিণ প্রান্তে ভারতের সীমানার কাছে অবস্থিত উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ মাটির দুর্গের আয়তন প্রায় ১৬০০ মিটার × ৮০০ মিটার। এর পূর্বদিক ঘেঁষে প্রবাহিত ছিল গণ্ডোরা বিল নামে পরিচিত কূলীক নদীর একটি শাখা। দক্ষিণ দিক দিয়েও এ নদী প্রবাহিত হত। পশ্চিম দিকও সুরক্ষিত ছিল আর একটি জলধারার সাহায্যে। উত্তর দিকের কথা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে মনে হয় চারদিক দিয়ে স্বাভাবিক জলধারা দিয়ে দুর্গটি পরিবেষ্টিত ছিল। বর্তমান কালে (১৯৬৮ খ্রিঃ) বিল বা নদীর কোনো অস্তিত্ব নেই। চারদিকেই আছে এখন কৃষিভূমি।

গড়ের মাটির দেয়াল এখনও অটুট আছে। দেয়ালগুলির উচ্চতা এখন দুই মিটারের বেশি নয়। দেয়ালের বাইরেই ছিল মোটামুটি প্রশস্ত পরিখা। এখন সেগুলি মজে গেছে। গড়ের মাঝামাঝি স্থানে আছে বড় ধরনের একটি পুকুর। পুকুরের উত্তর-পূর্ব কোণে আছে একটি প্রাচীন মাযার। বর্তমানে ভেঙ্গে গিয়ে জঙ্গলাবৃত হয়ে আছে। পাশেই আছে জঙ্গলাকীর্ণ গোরস্থান। পুকুর ও মাযারের পূর্ব পাশ দিয়ে একটি রাস্তা উত্তর-দক্ষিণে চলে গেছে গড়কে ভেদ করে। গড়ের ভিতর এলাকা এখন কৃষি ভূমি। ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ এখানে ওখানে নজরে পড়ে, তবে খুব বেশি নয়। কোনো প্রাচীন ইমারতের ভিত্তি বা ধ্বংসাবশেষ কোথাও দেখা যায় না।

গড়ের দক্ষিণে যে গ্রামটি আছে তার নাম ভাতুরিয়া। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তুত শেরউলের মানচিত্রে লেখা হয়েছে 'ভাউরিয়া' (ভাতুরিয়া নয়)। খুব সম্ভব ভুল করে লেখা হয়েছে এ নাম। স্থানীয় বৃদ্ধ লোকেরা বলেন বহু প্রাচীন কাল থেকেই এ গ্রামের নাম ভাতুরিয়া। তাদের মতে গৌড়ের রাজা গণেশ (১৪১৪-১৭ খ্রিঃ) এ গড় নির্মাণ

---

১. ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুরে প্রশাসনিক কার্যে নিযুক্ত থাকাকালে আমরা এ মসজিদের সন্ধান পাই দিনাজপুর উম্মে কুলসুম লাইব্রেরীর মালিক জনাব সোলায়মানের কাছে। আমরা ধ্বংসাবশেষের কাছে গিয়ে দেখি যে, শিলালিপিটি সেখানে নেই। জনাব আব্বাস নামক একজন স্থানীয় ভদ্রলোক তাঁর নবনির্মিত মসজিদে এটি লাগাবার জন্য নিয়ে গেছেন। জনাব সোলায়মান তাঁর নিকট গেলে জনাব আব্বাস নিজে ওয়াপদা রেস্ট হাউসে এসে শিলালিপিটি আমার কাছে দিয়ে যান। এটি এখন দিনাজপুর যাদুঘরে আছে। এ লিপির আংশিক পাঠোদ্ধারের জন্য আমি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সাবেক সুপারিনটেনডেন্ট ও বর্তমান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল গফুরের কাছে কৃতজ্ঞ।

করেছিলেন এবং এটিই ছিল তাঁর জন্মস্থান। গৌড়ের সিংহাসন লাভের আগে নাকি তিনি এখানকার সামন্ত নৃপতি ছিলেন।



রাজা গণেশের নামের সঙ্গে জড়িত দিনাজপুর জেলায় অনেক স্থান আছে। ভাদুরিয়া-হরিনাথপুর (ভাদুরিয়া-হরিনাথপুর দ্র.), বোচাগঞ্জ থানার পরমেশ্বরপুরের ধ্বংসাবশেষ ও নিকটবর্তী ভাদুরী বা ভাদুরিয়া হাট রাজা গণেশের নামের সঙ্গে জড়িত। মহানন্দা ও আত্রাই নদীর মধ্যবর্তী সমগ্র অঞ্চল এককালে ভাতুরিয়া নামে পরিচিত ছিল বলে রাজশাহী জেলা গেজেটিয়ারে উল্লেখ আছে, কিন্তু রাজা গণেশের নিবাসস্থল কোথায় ছিল, তা সঠিকভাবে কোথাও পাওয়া যায় না।

গড় ভবানীপুর খোর্দ রাজা গণেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল কিনা তা সঠিকভাবে বলার কোনো উপায় নেই।

দিনাজপুর জেলা

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ

বাতাসন-সতিমন ডাঙ্গি

সেতাবগঞ্জ (বোচাগঞ্জ থানা) বাজার থেকে বের হয়ে যে রাস্তাটা প্রায় ৬ কিলোমিটার উত্তরে বীরগঞ্জ-পীরগঞ্জ সড়কে মিশেছে সেই রাস্তার প্রায় শেষ প্রান্তে বাতাসন মৌজা। ছোট একটি গ্রাম্য হাট বসে সেখানে। হাটের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রাস্তার পশ্চিম পাশেই একটি বেশ বড় আকারের ঢিবি আছে। লোকে বলে সতিমনডাঙ্গি। ঢিবির সামান্য দক্ষিণে একটি মজে যাওয়া বড় জলাশয় এবং ধারে-কাছে আরও কয়েকটি প্রাচীন জলাশয়ের চিহ্ন আছে।

প্রায় এক একরেরও অধিক ভূমি জুড়ে অবস্থিত সতিমন ডাঙ্গি ঢিবি প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ। ঢিবি মাঝখানে উঁচু, বর্তমানে ২ মিটারের বেশি উঁচু নয়। এই উঁচু অংশের চারপার্শ্বে অপেক্ষাকৃত নিচু স্থান (depression)। এই নিচু স্থানগুলির চার পাশে আবার উঁচু ভূমি। সেই উঁচু ভূমিতে প্রাচীন ইমারতের ভিত্তি দেখা যায়। সারা ঢিবি জুড়ে আছে শুধু ইট আর ইট। ইটের জন্য ঢিবিতে লাঙল দেওয়া যায় না। কোনো রকমে কোদাল দিয়ে ইট সরিয়ে সেখানে তিলের চাষ করা হয়। ইটগুলি অত্যন্ত প্রাচীন।

স্থানীয় লোকেরা এ স্থানকে সতিমন ঠাকুরের টিলা বা ডাঙ্গি বলে থাকেন। প্রকাণ্ড একটি বটগাছ ছিল সমগ্র ঢিবি জুড়ে। সেটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরে ঢিবিও ধ্বংস হয়ে বর্তমান অবস্থায় এসেছে।

বাতাসন থেকে প্রায় ৯ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সতিমন ডাঙ্গি নামক আর একটি প্রাচীন স্থান আছে। সেখানে সিংহমূর্তির উপরে উপবিষ্ট কাল পাথরে নির্মিত একটি অতিকায় বুদ্ধমূর্তি আছে। স্থানীয় পলিয়ারা এটিকে সতিমন ঠাকুর নাম দিয়ে পূজা করেন একজন হিন্দু দেবতা রূপে। স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে জানা গেছে যে, এই অতিকায় বুদ্ধ মূর্তি বাতাসনে পড়ে ছিল এবং সেখান থেকে মূর্তিটিকে সতিমন ডাঙ্গিতে আনা হয়েছে অনেক কাল আগে।

সতিমন শব্দের সঙ্গে বুদ্ধদেবের নামের কোন যুক্তিসঙ্গত সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে বুদ্ধদেবের এক নাম শাক্য সিংহ বা শাক্যমুনি (>সত্যমুনি>সতিমন) থেকে সতিমন ঠাকুর নামের সৃষ্টি হতে পারে।

পূর্বে উল্লিখিত বাতাসনের ঢিবিতে খুব সম্ভব একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার বা বিরাট একটি বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লুক্কায়িত আছে। এ ঢিবির ধারে কাছের গ্রামগুলিতে অনেক মূর্তি পাওয়া গেছে বলে জানা গেছে।

ভেলুয়ার জৈন মূর্তি ও মন্দির

বীরগঞ্জ-পীরগঞ্জ সড়ক যেখানে পুনর্ভবা নদী অতিক্রম করেছে, সেখানকার পাকা ব্রীজের পশ্চিম পাশেই আছে একটি ছোট হাট। হাট থেকে প্রায় ৩ মাইল দক্ষিণে কাহারোল থানার অধীনস্থ প্রাচীন ভেলুয়া গ্রাম। ভেলুয়া গ্রামে সরকারের একটি তহসীল কাচারী আছে। কাচারী থেকে প্রায় ৪০০ মিটার পূর্ব দিকে 'ভেলুয়া দিঘি' নামে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ও প্রায় ৪০০ মিটার × ৩৫০ মিটার আয়তনের একটি প্রকাণ্ড জলাশয় আছে। দিঘির পশ্চিম ও উত্তর পাড় অত্যন্ত প্রশস্ত এবং সেখানে অসংখ্য প্রাচীন ইমারতাদি ছিল। এই জলাশয় অত্যন্ত প্রাচীন। সমগ্র জলাশয় এমনভাবে দামদলে ঢেকে গেছে যে সেখানে এখন গরু চরে। কিন্তু দামদলের নিচেই গভীর পানি। ভেলুয়া দিঘির ধারে কাছে আরো কয়েকটি প্রাচীন জলাশয় আছে।

ভেলুয়া দিঘি থেকে প্রায় ৮০০ মিটার পশ্চিমে একটি প্রায় মজে যাওয়া পাড়হীন প্রাচীন জলাশয় আছে। পুকুরের পূর্ব পাড়ের সমতল ভূমিতে পলিয়া সম্প্রদায়ের এক ভদ্রলোকের বাড়ি। বাড়ির লাগোয়া পূর্বে প্রায় ২ বিঘা ভূমি জুড়ে একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্থান। সেখানে দুটি ঢিবি বিদ্যমান আছে। ঢিবিগুলি আয়তনে খুব বড় নয়। দুটি ঢিবিই পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে প্রায় ৪ মিটার উঁচু। ঢিবি দুটি প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ এবং পার্শ্ববর্তী জঙ্গল ঘেরা স্থানেও প্রচুর প্রাচীন ইট এবং প্রাচীন মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ দেখা যায়।

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে উত্তর দিকের ঢিবি থেকে একটি অতিসুন্দর জৈন মূর্তি গ্রন্থকার কর্তৃক উদ্ধার করা হয়েছে। প্রায়-'২½ ফুট × ১ ফুট' আয়তনের দণ্ডায়মান এ নগ্ন মূর্তির মাথার উপরে আছে ছত্র। প্রধান মূর্তির দু'পাশে আছে ১২টি করে ২৪ টি ছোট ছোট মূর্তি। এটি বর্তমানে দিনাজপুর মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

উত্তর ঢিবির কিছুদূরে রাস্তার পাশে অবস্থিত একটি বাঁশঝাড়ের তলদেশ খুঁড়তে গিয়ে আরও কয়েকটি মূর্তি পাওয়া যায়। সেগুলি ছিল (১) ব্রহ্মা মূর্তি, (২) বিষ্ণু মূর্তি (৩) একটি ছোট বুদ্ধ মূর্তি। আরও কিছু মূর্তি সেখানে পাওয়া যায়। বিষ্ণু মূর্তি ছাড়া অন্যান্য মূর্তিগুলি দিনাজপুর যাদুঘরে রক্ষিত ছিল। একই স্থানে জৈন, বুদ্ধ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতির মূর্তি পাওয়া খুব কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা বলে মনে হয়।-

জৈন মূর্তিটি যে ঢিবিতে পাওয়া গেছে সেটি বহুকাল ধরে সেখানে পড়েছিল বলে স্থানীয় লোকদের কাছে জানা যায়। জঙ্গলাকীর্ণ ঢিবির উপরে শায়িত অবস্থায় পড়েছিল এ মূর্তি। খুব সম্ভব মন্দির ধ্বংস হয়ে যাবার পর মূর্তিটিকে সেখানে ফেলে রাখা হয় এবং নগ্ন মূর্তি বলে কেউ এর ধারে কাছেও যায়নি।

যে ঢিবিতে এ মূর্তি পাওয়া গেছে, সেখানে ছিল খুব সম্ভব একটি জৈন মন্দির। পণ্ডিতেরা এ মূর্তিকে দশম-একাদশ শতাব্দীর বলে মনে করেন। সে সময়ে অর্থাৎ পাল আমলে একটি জৈন মন্দির ও জৈন মূর্তির অস্তিত্ব তদানীন্তন বাঙালি জীবনের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক কৌতূহলোদ্দীপক অবস্থার আভাস দেয়।

কাঠগড় ও ঢাকেশ্বরী বা ডাকেশ্বরী মন্দির

বীরগঞ্জ থানা থেকে প্রায় ৪.৫ কিলোমিটার উত্তরে উত্তর-পশ্চিম প্রায় ১$\frac{১}{২}$ বিঘা ভূমির উপরে একটি বিরাট ঢিবি ছিল। প্রায় ৬০ মিটার × ৩০ মিটার আয়তনের এ ঢিবির উচ্চতা প্রায় ৮ মিটার এবং তা পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা। ঢিবিতে প্রচুর প্রাচীন ইট ছিল। লোকে বলে ঢাকেশ্বরী বা ডাকেশ্বরী মন্দির।

এস্থান থেকে প্রায় ১মাইল উত্তরে বেশ কয়েকটি প্রাচীন জলাশয় আছে। এগুলির মধ্যে আনুমানিক ৩০০ মিটার × ২০০ মিটার আয়তন বিশিষ্ট সবচেয়ে বড় জলাশয়টির নাম রাজার পুকুর। পাড়গুলি বেশ চওড়া। পুকুর সংলগ্ন একখণ্ড উঁচু ভূমিকে বলা হয় রাজবাড়ি। রাজার পুকুরের কাছেই পর পর কয়েকটি ঢিবি। বর্তমান সংখ্যা পাঁচ। আগে আরও কয়েকটি ঢিবি ছিল। সেগুলি এখন নেই। ঢিবিগুলি খুব বেশি বড় নয়। কোনোটাই এক বিঘার বেশি আয়তনও ৮ মিটারের বেশি উচ্চতা বিশিষ্ট নয়। লোকে বলে বুরুজ (tower)। প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ এ সমস্ত ঢিবিতে নাকি বৃষ্টির পরে মাঝে মাঝে প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া যায়।

মাটির প্রাচীর ও সংলগ্ন পরিখা বেষ্টিত একটি বিশাল দুর্গ বা গড়ের চিহ্ন আজও স্থানে স্থানে দেখা যায়। তবে চারদিকে ঘন বসতি গড়ে ওঠার ফলে গড়ের সীমানা নির্দেশ করা সম্ভব নয়। স্থানীয় লোকেরা বলে কাঠগড়। ইট হকারীদের দৌরাত্মের ফলে ঢিবিটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। সেখানে গুপ্ত যুগের একটি প্রস্তর মূর্তি (বর্তমানে মহাস্থান যাদুঘরে রক্ষিত) পাওয়া গেছে বলে প্রত্নতত্ত্ব দফতরের উপপরিচালক মোশারফ হোসেন জানিয়েছেন।

ঝলঝলির স্তূপ

বীরগঞ্জ-ঠাকুর গাঁও পাকা সড়কের উপর অবস্থিত বটতলা নামক ছোট হাট থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দক্ষিণে কাঁচা রাস্তার উপর ঝলঝলির হাট। হাটের পূর্ব পাশেই আছে প্রায় ২০০ মিটার × ১৫০মিটার আয়তনের উত্তর দক্ষিণে লম্বা একটি অতি প্রাচীন পুকুর। নাম ঝলঝলির পুকুর। পাড়গুলি পাহাড়ের মত উঁচু এবং বেশ চওড়া।

পুকুরের পশ্চিম পাড়ে মাটির নিচে একটি বিচিত্র ধরনের ইমারত পাওয়া গেছে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে। কোনো কারণে পাড়ের মাটি সরাতে গিয়ে ইমারতটি বের হয়ে পড়ে। স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলের একজন শিক্ষক (তাঁর নাম মনে নেই) এ ব্যাপারে বেশ আগ্রহী হয়ে পড়েন এবং চারিদিকের মাটি খুঁড়ে প্রায় ৩ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট ও অষ্টকোণাকারে নির্মিত একটি বিচিত্র ইমারত প্রায় অক্ষত অবস্থায় আবিষ্কার করেন। ইমারতে কোনো প্রবেশ পথ নেই এবং ফ্ল্যাট ছাদ প্রায় অক্ষত অবস্থায় আছে। ইটগুলি বেশ প্রাচীন। পাল আমলের পরের যে নয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সম্পূর্ণ ইমারতটি পুকুরের পাড়ের নিচে লুক্কায়িত ছিল। এতে ধারণা হয় যে, পুকুর খননের আগেই এটি বিদ্যমান ছিল এবং পুকুর খননের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে এটিকে মাটি চাপা দেওয়া হয়। অথবা এমনও হতে পারে, এই প্রাচীন পুকুরের পাড়ে ইমারতটি আগে

থেকেই বিদ্যমান ছিল এবং পরবর্তীকালে পুকুর সংস্কার করার সময় এটিকে মাটি চাপা দেওয়া হয়।

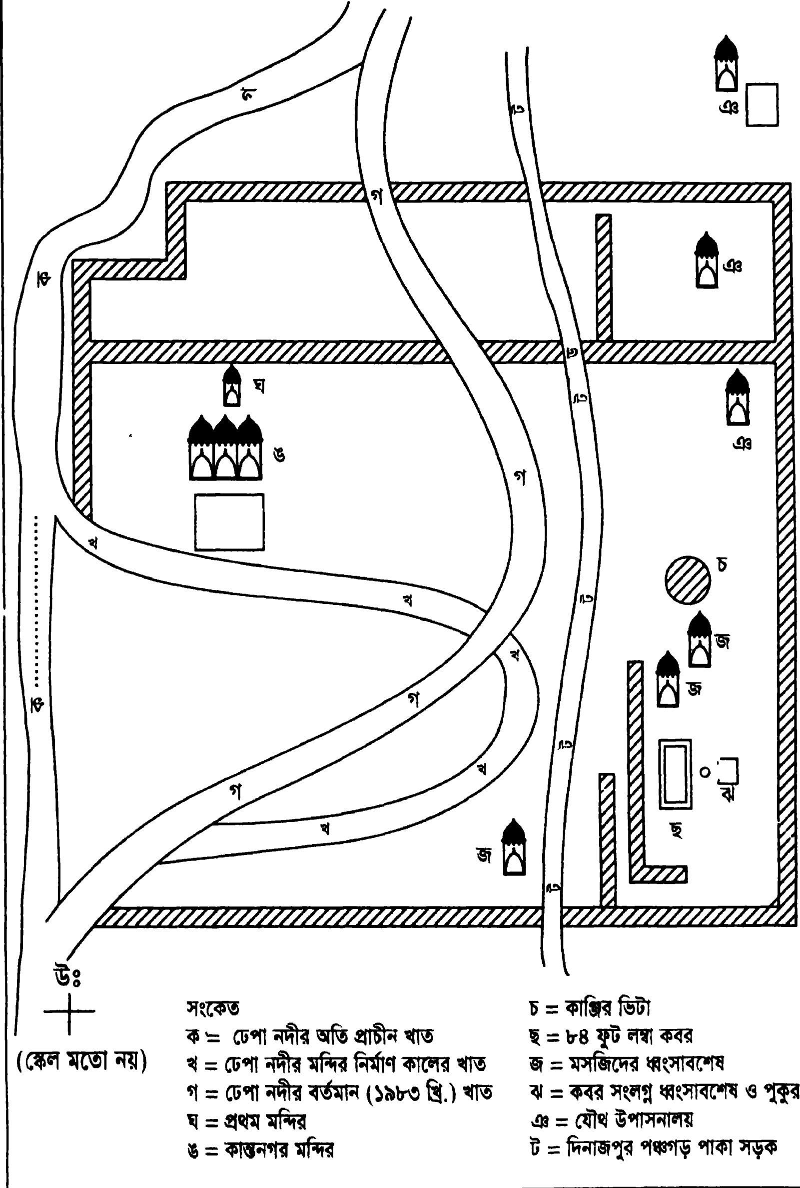
পুকুরের উত্তর পাড় অত্যন্ত প্রশস্ত এবং সেখানে প্রায় এক একর ভূমি আছে। মোঘল আমলের একটি বিরাট কবরসহ সেখানে বেশ কয়েকটি পাকা কবর ছিল।

আলোচ্য ইমারতটি যে একটি বৌদ্ধস্তূপ তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেখানে এ ধরনের আরও স্তূপ থাকার কথা। খুব সম্ভব ছিল। সেগুলি হয়ত ধ্বংস হয়ে গেছে অথবা মাটি চাপা পড়ে গেছে। এ স্থানের সামান্য কিছু উত্তরে অনেকগুলি অতি প্রাচীন জলাশয় ও প্রাচীন ইমারতের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। খুব সম্ভব সেখানে ছিল একটি বৌদ্ধ বিহার। প্রাচীন পুনর্ভবা নদীর বামতীরে লালমাটিতে গঠিত এ অঞ্চল খুব সম্ভব এক কালে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির একটি বিশেষ কেন্দ্র ছিল।

কান্তনগর দুর্গনগরী

দিনাজপুর-ঠাকুর গাঁও পাকা সড়কের দ্বাদশ মাইলের কাছাকাছি স্থানে পূর্ব-পশ্চিম লম্বা একটি বিরাট মাটির প্রাচীর আছে। উপরিভাগে প্রায় ৩ মিটার প্রশস্ত ও প্রাচীরের উচ্চতা প্রায় ৪ মিটার। প্রাচীরের লাগোয়া দক্ষিণেই প্রায় ১৫ মিটার ফুট প্রশস্ত গভীর পরিখা। প্রায় ১মাইল দীর্ঘ প্রাচীরের পশ্চিম প্রান্ত ঢেপা নদীতে ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে নিশ্চয় করে বলা কঠিন, প্রাচীরটি পশ্চিম দিকে আরও কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্বদিকের শেষ প্রান্ত উত্তর দিকে মোড় নিয়ে সামান্য কিছু দূর অগ্রসর হবার পরেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বর্তমানে মৃত প্রাচীন ঢেপা ও গর্ভেশ্বরী নদী যে এই বিলুপ্তির কারণ, নদীর খাত দেখেই তা বোঝা যায়। ঢেপা ও গর্ভেশবরী নদীদ্বয়ের মাঝখানে ছিল প্রাচীন কান্তনগর দুর্গনগরী।

পূর্বোক্ত মাটির প্রাচীর ও পরিখা ভেদ করে বর্তমান পাকা সড়ক উত্তর দিকে চলে গেছে। সড়ক ধরে কিছুদূর উত্তরে গেলেই সড়কের দু'ধারে দুটি প্রাচীরের চিহ্ন চোখে পড়ে। রাস্তার পূর্ব পার্শ্বের মাটির প্রাচীর বিগত কয়েক বছরের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সেখানে এখন কান্তনগর ইক্ষু ফার্ম নামে পরিচিত আখ চাষের জমি। রাস্তার পশ্চিমপার্শ্বে কয়েকটি খণ্ড খণ্ড ঢিবি এখনও প্রাচীন দেয়ালের চিহ্ন বহন করছে। মাইল খানেক উত্তরে পশ্চিম দিকের প্রাচীরের চিহ্ন আরও স্পষ্ট। সেটি রাস্তা অতিক্রম করে পূর্ব-উত্তর দিকে খানিকদূর গিয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সেখান থেকে প্রায় ২০০ মিটার উত্তর-পূর্ব দিকে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি মাটির প্রাচীরের অংশ এখনও টিকে আছে। এটি প্রায় ৩০০ মিটার দীর্ঘ। প্রাচীরের পাশে যে-নিম্ন ভূমি আছে, তা এককালে পরিখা ছিল বলে বোঝা যায়। এ দেয়ালের পূর্ব দিকে বেশ উঁচু ভূমি। এই উঁচু ভূমিতে অসংখ্য প্রাচীন ইট, ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ দেখা যায়। পূর্বদিকের শেষ প্রান্তে কোনো প্রাচীরের চিহ্ন নেই কিন্তু প্রশস্ত পরিখার চিহ্ন আছে। মধ্যবর্তী উঁচু ভূমিতে একটি বিচিত্র ধরনের উপাসনালয়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের আগমন ঘটত (মুসলিম আমলের কান্তনগর দ্র.)।


কান্তনগর দিনাজপুর
ক
গ
খ
ঙ
ট
ঘ
ঞ
চ
জ
ঝ
ছ
উঃ
(স্কেল মতো নয়)
সংকেত
ক = ঢেপা নদীর অতি প্রাচীন খাত
খ = ঢেপা নদীর মন্দির নির্মাণ কালের খাত
গ = ঢেপা নদীর বর্তমান (১৯৮৩ খ্রি.) খাত
ঘ = প্রথম মন্দির
ঙ = কান্তনগর মন্দির
চ = কাঞ্জির ভিটা
ছ = ৮৪ ফুট লম্বা কবর
জ = মসজিদের ধ্বংসাবশেষ
ঝ = কবর সংলগ্ন ধ্বংসাবশেষ ও পুকুর
ঞ = যৌথ উপাসনালয়
ট = দিনাজপুর পঞ্চগড় পাকা সড়ক

পাকা সড়ক থেকে বর্তমান কান্তনগর মন্দির ঢেপা নদীর পশ্চিম তীরে প্রায় ৮০০ মিটার দূরে অবস্থিত (কান্তনগর মন্দির, মুসলিম আমল দ্র.)। মন্দিরের পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত ছিল ঢেপা নদীর প্রাচীন খাত। মরা খাতের পূর্ব তীরেই উত্তর-দক্ষিণে লম্বা প্রায় ২০০ মিটার দীর্ঘ মাটির প্রাচীর। এ প্রাচীরের উত্তর মাথা থেকে আর একটি প্রাচীর পূর্ব দিক চলে গেছে। ঢেপা নদীর বর্তমান ধারা পর্যন্ত এ প্রাচীর অস্তিত্বশীল আছে। এ প্রাচীর নদীর পূর্ব তীরেও অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত আছে। প্রাচীরের উত্তর দিকে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা আরও একটি প্রাচীরের কিছু অংশ কান্তনগর মন্দিরের উত্তর দিকে দেখা যায়। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের আর, এস, ম্যাপে জটিল নকসার প্রাচীর বেষ্টিত এ স্থানকে শ্যামগড় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

দক্ষিণ দেয়ালের পশ্চিম প্রান্ত থেকে দুর্গ নগরীর প্রাচীর সোজা উত্তর দিকে শ্যামগড়ের পশ্চিম দেয়ালে মিশে ছিল বলে ধারণা হয়। আর দক্ষিণ দেয়ালের পূর্ব প্রান্ত থেকে দুর্গনগরীর পূর্ব দেয়াল সোজা উত্তরে গিয়ে যৌথ উপাসনালয়ের উত্তর-পূর্ব কোণে উত্তর দেয়ালের সঙ্গে মিশে ছিল। ঢেপা নদী তখন এ দুর্গনগরীর পশ্চিম দেয়াল ঘেঁষে এবং গর্ভেশ্বরী নদী পূর্ব দেয়ালের কিছু অংশ ঘেঁষে প্রবাহিত ছিল। ঢেপা নদী যে মন্দির ও শ্যামগড়ের পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত ছিল, ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে আর, এস, ম্যাপেও তা দেখা যায়। গর্ভেশ্বরী নদী বহু আগেই মরে গেছে আর ঢেপা নদী গতি পরিবর্তন করে বর্তমানে মন্দিরের পূর্ব দিক দিয়ে পাকা সড়ক ঘেঁষে প্রবাহিত হচ্ছে।

সমগ্র দুর্গনগরীর আয়তন ছিল প্রায় ১৫ বর্গ কিলোমিটার। এই দুর্গনগরীর দক্ষিণ দিকেও আর একটি দুর্গ বা জনপদ ছিল। দক্ষিণ দেয়ালের প্রায় পূর্ব প্রান্ত থেকে একটি মাটির প্রাচীর যে দক্ষিণ দিকে অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল, তার সুস্পষ্ট চিহ্ন আজও বিদ্যমান। প্রাচীরের লাগোয়া পূর্ব দিকেই ছিল প্রশস্ত পরিখা। পরিখার চিহ্ন আজও সুস্পষ্ট। এ প্রাচীর খুব সম্ভব দিনাজপুর-রংপুর পাকা সড়ক অতিক্রম করে গর্ভেশ্বরী নদীর পশ্চিম তীর বেয়ে বর্তমান নশীপুর ফার্ম পার হয়ে আরও দক্ষিণে চলে গিয়েছিল। নশীপুর ফার্মের লাগোয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় ৫০ একর ভূমি জুড়ে চারদিকে প্রায় ৬০ মিটার প্রশস্ত পরিখা বেষ্টিত একটি দুর্গ বা আবাসবাটীর চিহ্ন পাওয়া যায়। এখন সেখানে দুটি আমবাগান আছে। মাটি খুঁড়লে সেখানে প্রাচীন কালের ইট ও পাথরের টুকরা পাওয়া যায়। এ বাগানের পূর্বে ও পূর্ব-দক্ষিণে আরও দুটি আমবাগান আছে। এ দুটি আমবাগানে অসংখ্য প্রস্তর খণ্ড পড়ে আছে। আর মাটির নিচে আছে প্রচুর প্রাচীন যুগের ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ। কয়েক বছর আগে দক্ষিণ দিকের আম বাগানের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে খোলামাঠের মধ্যে এক ভদ্রলোক বাড়ি করতে গিয়ে একটি প্রাচীন ইমারতের ভগ্নাবশেষের সন্ধান পান। সেখানে তিনি প্রাচীন মুদ্রা পেয়ে ছিলেন, এমন প্রবল জনপ্রবাদ শোনা গেছে। বহু চেষ্টা করেও কোন মুদ্রা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

আমবাগানগুলির পশ্চিম দিকে খোলা মাঠে প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ বহনকারী কয়েকটি অনুচ্চ ঢিবি এখনও বিদ্যমান। এখানে আরও অনেক ঢিবি ছিল। চাষবাসের ফলে ঢিবিগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সারা এলাকা জুড়ে মাটির নিচে প্রচুর ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ পাওয়া যায়।

এ স্থানের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত চিহিলগাযী। সে স্থান যে অত্যন্ত প্রাচীন, সে কথা অন্যত্র বলা হয়েছে। (কান্তনগর মুসলিম আমল দ্র.)। কান্তনগর দুর্গ নগরী থেকে চিহিলগাযী পর্যন্ত সমগ্র স্থানে এককালে একটি সমৃদ্ধশালী জনপদ ছিল বলে ধারণা করা যায়। এ অঞ্চল থেকে বহু প্রস্তর মূর্তি, প্রস্তর নির্মিত স্তম্ভ আবিষ্কার করা হয়েছে। ভাল করে অনুসন্ধান করলে এখানে অসংখ্য মূল্যবান প্রত্নবস্তু পাওয়ার সম্ভবনা আছে।

কান্তনগর দুর্গনগরীর বর্ণনায় ফিরে আসা যাক। গড়ের ভিতরে, কান্তনগর ইক্ষু ফার্মের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি বিরাট ঢিবি আছে। প্রায় ১ একর ভূমির উপর অবস্থিত এ ঢিবি প্রায় ১০ মিটার উঁচু। সমুদয় ঢিবি প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ। প্রায় গোলাকার এ ঢিবির উপরে বর্তমানে একটি বটগাছ দাঁড়িয়ে আছে। বটগাছটি খুব প্রাচীন নয়। বট গাছের চারদিকে ঢিবির উপরেও ইট দেখা যায়। ঢিবির উত্তর ভাগে মাঝামাঝি স্থানে একটি গর্তের (depression) মত নিচু অংশ ক্রমশ ঢালু হয়ে একদম নিচে চলে গেছে। এবং উত্তর দিকে অবস্থিত পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ বাঁশবাড়িয়া খালের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। খালের পাড়ে ইটের দেয়ালের ভিত্তি চিহ্ন দেখে মনে হয়, সেখানে বাঁধান ঘাট ছিল। এই বাঁশবাড়িয়া খাল ছিল সম্ভবত গর্ভেশ্বরী ও ঢেপা নদীদ্বয়ের সংযোগকারী একটি ছোট শাখা নদী বা খাল। এতে বারমাস পানি থাকত বলে ধারণা হয়। গর্ভেশ্বরী নদী মরে যাওয়ার পরে এ খালটিতে বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে পানির সমাগম হয় না।

ঢিবির কিছু দক্ষিণে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি পুকুর ছিল। এখন সেটিকে ভরাট করা হয়েছে চাষের সুবিধার জন্য। পুকুরের কিছু দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটি মসজিদ ও মাযার বা হুজরা খানার ধ্বংসাবশেষ আছে। এর প্রায় ৬০ মিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অনুরূপ ধরণের আর একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আছে।

এই ধ্বংসাবশেষের সামান্য দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটি বিরাট আকারের পাকা কবর আছে। ২৫.৪ মিটার × ২.৪ মিটার আয়তনের পাকা কবরকে চিহিল গাযীর মাযার বলা হয়ে থাকে (কান্তনগর মুসলিম আমল দ্র.)

ঢিবির দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম দিকে অবস্থিত কান্তনগর ইক্ষু ফার্মে অসংখ্য প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ছিল। ফার্মের বুলডোজার সমগ্র এলাকাকে প্রায় সমতল ভূমিতে পরিণত করেছে। এতে অসংখ্য প্রাচীন ইমারতের ভিত্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং সমগ্র স্থানে ছড়িয়ে আছে লক্ষ লক্ষ মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ও এবং পাথরও ইটের টুকরা।

এ স্থান অত্যন্ত প্রাচীন, কত প্রাচীন তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। জন-প্রবাদ মতে এস্থানে ছিল বিরাট রাজার উত্তর গো-গৃহ। অন্য আর এক প্রবাদ মতে এটি ছিল চাঁদ সদাগরের আবাসবাটী। এগুলি যে নিছক গালগল্প তাতে সন্দেহ নেই। প্রায় ১৫ বর্গ কিলোমিটার স্থান জুড়ে এই অতি প্রাচীন দুর্গ নগরীর অবস্থান ছিল। এবং এর বাইরেও ছিল একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদের অবস্থান।

এখানে অবস্থিত ঢিবিকে স্থানীয় মতে কাঞ্জীরভিটা বলা হয়ে থাকে। এতে খনন কার্য করলে এ স্থানের তথা বাংলাদেশের কিছু ইতিহাস পাওয়া যেতে পারে।

শ্রীচন্দ্রপুর (খানপুর)

দিনাজপুর শহর থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দক্ষিণে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে অবস্থিত এ স্থানের প্রচলিত নাম খানপুর কিন্তু পোশাকী নাম শ্রীচন্দ্রপুর। এখানে প্রাচীন কালের অনেক দিঘি-পুষ্করিণী ও প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জলাশয়ের নাম চন্দ্রহার।

উত্তর-দক্ষিণে লম্বা আনুমানিক ২০০ মিটার × ১৫০মিটার আয়তনবিশিষ্ট চন্দ্রহারের পাড়গুলি বেশ উঁচু। দিঘিটি বেশ গভীর এবং এর পানি বেশ স্বচ্ছ। দিঘির উত্তর-পূর্বকোণে রাস্তার ধারে সুলতানী আমলের একটি পাকা কবর আছে। মাটি থেকে প্রায় ১.৫ উঁচু এ কবরে কে শায়িত আছেন, তা জানা যায়নি। রাস্তার অপর দিকে অর্থাৎ পূর্ব পার্শ্বে ঢেল ফকীরের দরগা। স্থানীয় প্রথামতে এ পথ দিয়ে যাতায়াতকারীদের প্রত্যেককেই দরগাতে একটি মাটির ঢেলা ফেলতে হয়। ফলে দরগা বলে কথিত স্থানটি প্রায় ৫ মিটার উঁচু একটি ঢিবিতে পরিণত হয়েছে।

ঢেল ফকীরের দরগাহ্ থেকে প্রায় ২০০ মিটার দক্ষিণে একটি অতি প্রাচীন পাড়হীন প্রায় মজে যাওয়া জলাশয় আছে। জলাশয়ের পশ্চিম তীরে প্রায় ২ একর পরিমিত একটি অনুচ্চ সমতল ভূমি আছে। এ ভূমির নিচে সর্বত্র প্রাচীন ইট ও প্রাচীন ইমারতের ভিত্তি বিদ্যমান। বছর কয়েক আগে খেলার মাঠের জন্য মাটি কেটে এই স্থানকে সমতল করার চেষ্টা করা হলে প্রায় ৩ মিটার প্রশস্ত একটি বিরাট দেয়ালের ভিত্তি বের হয়ে পড়ে। দিঘির পশ্চিম পাড় পর্যন্ত প্রসারিত ইষ্টক নির্মিত এ লম্বা লেয়ালের ভিত্তির মধ্যে প্রচুর পাথরও ব্যবহৃত ছিল। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে পুকুরের পশ্চিম পাড় থেকে গ্রানাইট পাথরের একটি স্তম্ভ উদ্ধার করা হয়। প্রায় ২.৫ মিটার দীর্ঘ এ স্তম্ভের ব্যাস প্রায় ০.৫ মিটার। এটি বর্তমানে দিনাজপুরের বি.ডি. আর. হেড কোয়াটারে আছে। এর বেশ কয়েক বছর আগে দিঘিটি সংস্কার করার ফলে সেখানে বেশ কয়েকটি মূর্তি পাওয়া যায়। কিন্তু মূর্তিগুলি কে কোথায় নিয়ে গেছে, তার সন্ধান পাওয়া যায়নি।

এস্থানের নাম দেউলবাড়ি এবং সংলগ্ন জলাশয়ের নাম দেউল পুকুর। দেউল শব্দের অর্থ দেবালয় বা মন্দির। খুব সম্ভব এ স্থানে বেশ কয়েকটি অথবা অতি বিরাট আকারের একটি দেবালয় ছিল। ইট-পাথরের নমুনা দেখে ধারণা হয় যে, এ-স্থান অত্যন্ত প্রাচীন। কত প্রাচীন তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও নাম সাদৃশ্যে ও ধ্বংসাবশেষ দেখে এ স্থান গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময়ের বলে ধারণা হয়।

দেউলবাড়ির সংলগ্ন উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকের ভূমিতে বর্তমান খানপুর বাজার অবস্থিত। বাজারের অনেক উত্তর ও উত্তর-পূর্বদিকে মাঠের মধ্যে যে বিরাট প্রাচীন পরিখার চিহ্ন পাওয়া যায় তা দেউলবাড়ি চন্দ্রহার প্রভৃতি স্থানকে প্রায় বৃত্তাকারে বেষ্টন করে প্রায় ২ বর্গ কিলোমিটার স্থান জুড়ে অবস্থিত ছিল। খুব সম্ভব পরিখার সঙ্গে বেষ্টনী প্রাচীরও ছিল। প্রাচীরের কোনো চিহ্ন বর্তমান নেই। স্থানে স্থানে শুধু পরিখার চিহ্ন বিদ্যমান।

প্রাচীন কোটিবর্ষ বিষয় (বাণগড়) ছিল শ্রীচন্দ্রপুর থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে। খনন কার্যের ফলে বাণগড়ে তাম্রশাসনসহ পাল, গুপ্ত ও শুঙ্গ যুগের অসংখ্য প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে। শুঙ্গ যুগের প্রত্ন নিদর্শনের ঠিক নিচের স্তরে প্রস্তর যুগের কিছু প্রত্ন নিদর্শন পাওয়া গেছে। খুব সম্ভব শ্রীচন্দ্রপুরও ছিল বাণগড়ের সমসাময়িক একটি সমৃদ্ধ জনপদ। খনন কার্য চালালে শ্রীচন্দ্রপুরে প্রস্তর যুগের নিদর্শন পাওয়া যাবার সম্ভাবনা আছে বলে ধারণা হয়।

বিচিত্র উপাসনালয়

শ্রীচন্দ্রপুর থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার পূর্ব দিকে ২.৫ মিটার × ২.৫ মিটার আয়তনের একটি বিচিত্র ধরণের উপাসনালয় দেখা যায়। কান্তনগর দুর্গে অবস্থিত যৌথ উপাসনালয়ের মতোই (কান্তনগর দ্র.) এটিও ছিল হিন্দু ও মুসলমানের যৌথ উপাসনালয়। স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে জানা যায় যে, এ অঞ্চলে এ ধরনের ইমারত আরও অনেক ছিল।

গোয়ালডিহি

দিনাজপুর-রংপুর মহাসড়কের উপর অবস্থিত ভূষিরবন্দর পাকা সেতু পার হয়ে মাইল দেড়েক পূর্ব দিকে গেলে, সেখান থেকে পাকেরহাট পর্যন্ত জেলা পরিষদের যে কাঁচা রাস্তা চলে গেছে, তা ধরে মাইল চারেক উত্তর দিকে গেলেই খানসামা থানার অধীনে গোয়াল ডিহি নামক একটি প্রাচীন স্থান দেখা যায়। সে গ্রামে, রাস্তা থেকে প্রায় আধ মাইল পূর্ব দিকে একটি অনুচ্চ সমতল ঢিবি দেখা যায়। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ও আনুমানিক ১০০ মিটার × ৭৫ মিটার আয়তন বিশিষ্ট এই ঢিবির উচ্চতা বর্তমানে (১৯৬৮ খ্রিঃ) ১.৫ মিটারের বেশি নয়। সমগ্র ঢিবি প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ। চারদিকে বিশেষ করে দক্ষিণ দিকে পাকা প্রাচীরের অস্তিত্ব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। পশ্চিম দেয়ালে একটি প্রবেশ পথের চিহ্ন সহজেই ধরা পড়ে। এই পথের দু'পাশে ২টি স্তম্ভ ছিল।

ঢিবির চারদিকে এখন যে ইষ্টক নির্মিত প্রাচীরের অংশবিশেষ দেখা যায়, তা ছাড়া আর কোনো প্রাচীর ছিল কিনা এবং সেই বেষ্টনী প্রাচীরের বাইরের দিকে কোনো পরিখা (moat) ছিল কিনা, তা খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, এই ঢিবির চারদিকে ঘনবসতি গড়ে উঠেছে এবং এ স্থানে আর কোনো প্রাচীন কীর্তি থাকলেও বহু পূর্বেই তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

স্থানীয় জনপ্রবাদ মতে এখানে নাকি ছিল মহাভারতে উল্লিখিত বিরাট রাজার গো-গৃহ। এটি যে নিছক গল্প তাতে সন্দেহ নেই (এ প্রসঙ্গে রংপুর জেলার বিরাট নগর দ্র.)। চারদিকে পাকা প্রাচীর দেখে মনে হয় যে, এস্থানে একটি ছোট বৌদ্ধ বিহার বা বৌদ্ধ মন্দিরাদি ছিল। ধারে-কাছে বেশ কয়েকটি প্রাচীন জলাশয় আছে। প্রাচীন ইছামতী নদী (এখন মৃত) এ স্থান থেকে দূরে ছিল না। বেশ কিছু কাল আগে এ স্থানে বেশ কয়েকটি প্রস্তরমূর্তি পাওয়া গিয়েছিল বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। কিন্তু মূর্তিগুলির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

বেলাইচণ্ডী

পার্বতীপুর রেলজংশন থেকে উত্তর দিকে বেলাইচণ্ডী রেলস্টেশনের পশ্চিম দিকে অবস্থিত বেলাইচণ্ডী গ্রামের চারদিকে আছে অসংখ্য প্রাচীন জলাশয়। এগুলির কোনো কোনোটার আয়তন প্রায় ১০০ বিঘা। স্টেশনের পশ্চিম দিকেই আছে কয়েকটি প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ।

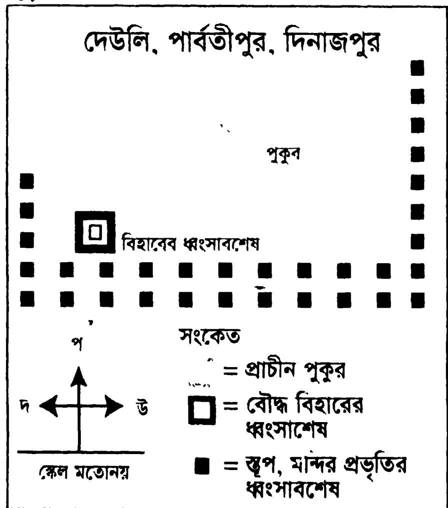
এগুলির মধ্যে একটিকে বলা হয় বিরাট রাজার দুর্গ। প্রায় বর্গাকারে নির্মিত দুর্গটির প্রত্যেক বাহু ছিল প্রায় ২০০মিটার লম্বা। দুর্গের ভিতরে কয়েকটি অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ ছিল। ইট হরণকারীদের দৌরাত্মে দুর্গ ও সেই সব অট্টালিকা এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

জনপ্রবাদ মতে জানা যায় যে, এখানে ছিল বিরাট রাজার অস্থায়ী আস্তানা এবং তিনি এখানে এসে মাঝে মাঝে বসবাস করতেন। এ স্থানের নাম ছিল বিরাটপাটক। বর্তমানে এস্থানকে বীরপাটক বলা হয়ে থাকে।

দেউলি

উপরোক্ত বীরপটক থেকে কয়েক বেশ কয়েক কিলোমিটার পশ্চিম দিকে ছিল প্রায় সম আয়তনের আর একটি দুর্গ। সেখানে নাকি বিরাট রাজার সেনাপতি মদনের নিবাসস্থল ছিল।

দেউলিতে একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। দুর্গের দেয়ালগুলি মাটির তৈরি। দুর্গের ভিতরে কোনো ইমারতাদি ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু অসংখ্য ইমারত ছিল দুর্গের পশ্চিম দিকে এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। সেই এলাকার মাঝখানে ছিল অপেক্ষাকৃত একটি নিচু ভূমি, দেখতে অনেকটা ভরে যাওয়া বিলের মতো। সেই বিলের মাঝখানে আছে একটি প্রাচীন জলাশয়। এই নিম্নভূমির চারদিকে বিশেষ করে উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব দিকে ছিল অসংখ্য ইমারত। সেই সব ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ঢিবি রূপে, বহুকাল বিদ্যমান ছিল। হাল আমলে সেই সব ঢিবি থেকে ইট সরিয়ে ঢিবিগুলিকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে।



এখনও (১৯৮৩ খ্রিঃ) উত্তর দিকে ১০/১২ টি ঢিবির কিছু কিছু অংশ কোনো রকমে টিকে আছে। তবে যে হারে ইট হরণ করা হচ্ছে, তাতে ঢিবিগুলি আর বেশি দিন টিকে থাকবে বলে মনে হয় না। এখানকার একটি ঢিবিতে (নিম্নভূমির উত্তর-পূর্ব কোণে

অবস্থিত) যে একটি ছোট বৌদ্ধবিহার ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। চকমিলান এই ইমারতের আয়তন ছিল প্রায় ৬০ মিটার × ৬০ মিটার। এর পশ্চিম ও পূর্ব দেয়ালের বেশ কিছু অংশ ঢিবি রূপে এখনও টিকে আছে। দুর্গাকারে নির্মিত ইমারতটির মাঝখানে আছে শূন্য অঙ্গন, প্রায় ২০ × ২০ মিটার।

এখানকার কীর্তিগুলি থেকে যে কত ইট সরান হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে অসংখ্য ঘরবাড়ি তৈরি করা হয়েছে এখানকার ইট দিয়ে। এখানে '১৬" × ১৪" × ৩", ৮" × ৭" × ২½", ৬" × ৪" × ২½"' ইত্যাদি বিভিন্ন মাপের ইট পাওয়া গেছে। অন্যান্য মাপের ইটও পাওয়া যায়। এখানকার একটি ঢিবি থেকে বেলে পাথরের তৈরি একটি ছোট বৃষমূর্তি পাওয়া গেছে।

আমরা ১৯৮৩ সনের মার্চ মাসে এস্থান পরিদর্শন করে দেখতে পাই যে, এখানে বেশ কয়েকটি বৌদ্ধ স্তূপ ছিল। ইট সরিয়ে ফেলার পর ভিত্তির যে নমুনা দেখা গেল তাতে এগুলিকে স্তূপ বলে নিঃসন্দেহে চেনা গেল।

এখানকার ঢিবিগুলির চারদিকে দূরে দূরে ৭২ টি প্রাচীন জলাশয় আছে। এখানে যে এককালে একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ ও বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্র ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

খোলাহাটির কীর্তিসমূহ

পার্বতীপুর রেল জংশন থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার পূর্ব দিকে খোলাহাটি নামক একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। এই গ্রামে বেশ কয়েকটি প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আছে। এগুলির মধ্যে হীরা বেশ্যার ভিটা ও কীচক রাজার গড় উল্লেখযোগ্য।

হীরা বেশ্যার ভিটা

দিনাজপুর-রংপুর রেল লাইনের উত্তরে করতোয়া নদীর মরা খাতের পশ্চিম দিকে এবং নদীর পশ্চিম পাড় থেকে শুরু করে পশ্চিম দিকে প্রায় ২ বর্গ মাইল স্থান জুড়ে একটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। সমগ্র এলাকা এখন চাষের জমিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সে সব জমিতে প্রচুর প্রাচীন ইট, পাথর ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ দেখা যায়। এ স্থানের পশ্চিম দিকে আছে একটি ছোট বিলের মতো নিম্নভূমি। এককালে করতোয়ার একটি প্রবাহ এখানে ছিল বলে মনে হয়।

এই বিল থেকে প্রায় ২০০ মিটার পূর্ব দিকে একটি উঁচু ভিটা আছে। এখানে এত ইট আছে যে, এখানে ভাল রকমে চাষবাস করা যায় না। এটিকে হীরা বেশ্যার ভিটা বলা হয়ে থাকে। মিঃ মার্টিন (Mr. M. Martin) তাঁর রচিত ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া (Eastern India) গ্রন্থে এই ভিটাতে একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ছিল বলে ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে সরে জমিনে তদন্ত করে উল্লেখ করে গেছেন। ডক্টর বুকানন ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে যে জরিপ কাজ করেছিলেন তার উপর ভিত্তি এবং বুকাননের নাম গোপন করে এম. মাটিন গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন।

আমরা ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দেও এখানে সেই ভিটার অস্তিত্ব দেখতে পেয়েছি। এই ভিটার কিছু পূর্ব দিকেই উঁচু ভূমিতে আছে একটি কবরস্থান। কবর খুঁড়তে গিয়ে মাটির নিচে

প্রচুর ইট, পাথর ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ পাওয়া যায় বলে স্থানীয় লোকের কাছ থেকে জানা গেছে।

সে সময়ে এই কবরস্থান থেকে প্রায় ১৫০ মিটার উত্তর-পূর্ব দিকে মৃত করতোয়া নদীর খাতের উপরে একটি পাকা সেতু তৈরি হচ্ছিল। সেতুর ভিত্তির জন্য মাটি খুঁড়তে গিয়ে শুস্ক নদীতে প্রায় ৪ মিটার মাটির নিচে অসংখ্য প্রাচীন ইট পাওয়া গেছে। আর পাওয়া গেছে ধাতব তৈজস পত্র, মাটির তৈরি হাঁড়ি-পাতিল, কাঠের কিছু দরজা ইত্যাদি আসবাবপত্রের ধ্বংসাবশেষ, বেশ কয়েকটি (৬টি) মাথার খুলি, মানুষের হাড়, প্রায় ছয় আনা সোনা দিয়ে তৈরি একটি ছোট বালা (শিশুর জন্য নির্মিত) ইত্যাদি এবং কিছু মুদ্রা। ভাঙ্গা ইটগুলি, মাথা ইত্যাদি ছাড়া আর সব জিনিস কে কোথায় নিয়ে গেছে তার হদিস পাওয়া যায়নি।

এসব থেকে ধারণা হয় যে, হঠাৎ সংঘটিত কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে করতোয়ার তীরবর্তী কোনো অট্টালিকা নদীতে ধসে পড়েছিল এবং গৃহবাসীরা সেই দুর্যোগে প্রাণ হারিয়েছিলেন। সেই ইমারতটি করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত ছিল বলে মনে হয় এবং এখানে যে নগরীটি ছিল এই ইমারত সেই নগরীর মধ্যেই ছিল।

এখানকার ইটগুলি খুবই প্রাচীন বলে মনে হয়। তবে এখানে সুলতানী আমলের চাকচিক্যময় পাত্রের (glazed potteries) অংশ বিশেষও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এতে মনে হয় যে সুলতানী আমলেও এ স্থানে বসতি ছিল।

কীচক রাজার গড়

হীরা বেশ্যার ভিটা থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দক্ষিণে রেল লাইনের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। লোকে বলে কীচক রাজার গড় এবং তিনি এখানে বাস করতেন।

প্রায় বর্গাকারে নির্মিত এই গড়ের প্রত্যেক বাহু প্রায় ৫০০ মিটার লম্বা। চারদিকের প্রাচীর মাটির তৈরি। লাল মাটিতে গড়া দেয়ালগুলি বেশ চওড়া এবং এখনও প্রায় ৪ মিটার উঁচু। গড়ের ভিতরে কোনো প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় না। তবে সামান্য কিছু প্রাচীন ইটের ভগ্নাংশ এখানে-সেখানে দেখা যায়। এতে মনে হয় যে, এখানে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো ইমারতাদি ছিল না।

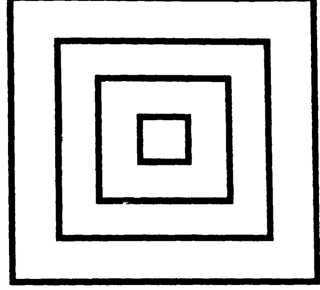
গড়ের পশ্চিম দিকে প্রায় ২০০ মিটার দূরে কাটাহার নামক একটি প্রাচীন জলাশয় আছে। দিঘির আয়তন প্রায় ৫০০ মিটার × ৩০০ মিটার। দিঘিটি এখন মজে গেছে। এই দিঘি থেকে প্রায় আধ মাইল উত্তর দিকে রেল লাইনের উত্তরে প্রায় সম আয়তনের আর একটি প্রাচীন জলাশয় আছে।

পাঁচ পুকুরিয়া রাজবাড়ি

ফুলবাড়ি রেল স্টেশন থেকে জেলা পরিষদের রাস্তা ধরে প্রায় ১১ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে গেলে মধ্যপাড়া (বর্তমানে শিলা প্রকল্পের জন্য উল্লেখযোগ্য) নামক স্থান পাওয়া

যায়। সেখান থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে পাঁচ পুকুরিয়া নামক একটি প্রাচীন স্থান আছে। প্রাচীন করতোয়া নদী এককালে এ স্থানের পূর্ব দিক দিয়ে বয়ে যেত। সে নদী এখন মরে গেছে। সে নদী থেকে একটি ক্ষীণ ধারা বের হয়ে ঘিরনাই নাম ধারণ করে দিনাজপুর জেলার পুর্ব সীমানা নির্দেশ করে এখনও কোনো রকমে অস্তিত্বশীল আছে। এ নদীর অপর তীর থেকেই বৃহত্তর রংপুর জেলার শুরু। সে জেলার বদরগঞ্জ থানায় এবং থানা থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত প্রাচীন লোহানী পাড়া বা চাপড়াকোট বৌদ্ধবিহার (লোহানীপাড়া বিহার দ্র.) পাঁচ পুকুরিয়া থেকে মাত্র ৪ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত।

পাঁচপুকুরিয়া রাজবাড়ি



পাঁচ পুকুরিয়াতে বেশ কয়েকটি প্রাচীন জলাশয় আছে। এগুলির মধ্যে কাছাকাছি অবস্থিত ৫টি পুকুর সমধিক উল্লেখযোগ্য। এগুলিতে প্রাচীন কালের বাঁধান ঘাট আছে। এই ৫টি পুকুরের অবস্থান থেকেই পরবর্তী কালে এ গ্রামের নাম হয়েছে পাঁচ পুকুরিয়া।

এই গ্রামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ ছিল এবং এখানে এককালে যে একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ইট হরণকারীদের দৌরাত্ম্যে এখানকার কীর্তিগুলি প্রায় সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এখন মাত্র সামান্য কয়েকটি প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ কোনও রকমে টিকে আছে।

এগুলির মধ্যে রাজবাড়ি নামক কীর্তিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় ৪০ মিটার × ৪০ মিটার আয়তনের একটি অট্টালিকা এখানে ছিল। বর্গাকৃতির এই ইমারত থেকে অজস্র ইট সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং এখনও (১৯৭৯ খ্রিঃ) হচ্ছে। তবে ধ্বংসাবশেষটি দেখে এর সামগ্রিক রূপরেখা বের করতে খুব অসুবিধা হয়নি। এর কেন্দ্রস্থলে ছিল চারদিকে প্রশস্ত প্রাচীর বেষ্টিত একটি প্রকোষ্ঠ। এই প্রকোষ্ঠটি এখনও (১৯৭৯ খ্রিঃ) বেশ উঁচু এবং খুব বিপর্যস্ত হয়নি। এর চারদিক ঘিরে ছিল আর একটি প্রাচীর। এর পরে ছিল আরও একটি প্রাচীর। সর্ব শেষ অর্থাৎ চতুর্থ প্রাচীরটি ছিল এরপরে। এতে ধারণা হয় যে বাইরের প্রাচীর বেষ্টিত বিরাট কক্ষটির ভিতরে কেন্দ্রীয় কক্ষসহ আরও ৩টি কক্ষ ছিল। কেন্দ্রীয় কক্ষটির সঠিক অবস্থা, খনন না করে জানা সম্ভব নয়। তবে এর বাইরের দিকে পর পর যে তিনটি কক্ষ ছিল সেগুলিতে চারিদিকে টানা দেয়াল ছাড়া কোনো বিভাজক প্রাচীর অর্থাৎ পার্টিশন দেয়াল খুঁজে পাওয়া যায়নি। ছিল কিনা, তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও কেন্দ্রীয় কক্ষটিকে কেন্দ্র করেই যে এই সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্মিত হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কেন্দ্রীয় কক্ষটিকে এই অট্টালিকার গর্ভগৃহ বলা যেতে পারে। এই গর্ভগৃহ থেকে ধারণা করা হয় যে, এটি ছিল একটি বিরাট বৌদ্ধ মন্দির বা স্থূপ। কোনো সুবৃহৎ হিন্দু মন্দিরও এটি হতে পারে। তবে নিকবর্তী লোহানীপাড়া বিহারের সঙ্গে এর সম্পর্কের

কথা চিন্তা করে এটিকে বৌদ্ধ স্তূপ বা মন্দির বলে ধরে নেওয়াই অধিক সঙ্গত বলে মনে হয়। (পরে রংপুর জেলার লোহানিপাড়া দ্র.)

এই বিরাট ইমারতের সামান্য পূর্বদিকে আছে ২টি ছোট ঢিবি এবং এ দুটি ঢিবির সামান্য দক্ষিণে আছে আর একটি ছোট ঢিবি। প্রত্যেকটি ঢিবিতেই প্রচুর প্রাচীন ইট দেখা যায়। এ স্থানে আরও কয়েকটি ঢিবি ছিল বলে জানা গেছে। এখন সেগুলি আর টিকে নেই। এ সব ঢিবিতে খুব সম্ভব বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ লুক্কায়িত আছে।

স্থানীয় জনশ্রুতি মূলে জানা যায় যে, এখানে এক রাজার নিবাসস্থল ছিল এবং বড় ঢিবিতে ছিল রাজবাড়ি। এখানে রাজবাড়ি থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বড় ঢিবিতে যে একটি সুবৃহৎ বৌদ্ধ স্তূপ, মন্দির বা হিন্দু মন্দির ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পার্শ্ববর্তী ছোট ঢিবিগুলিতে ছিল খুব সম্ভব স্তূপ বা মন্দির। ঘাট বাঁধান পুকুর গুলির ধারে কাছে খুব সম্ভব লোক বসতি ছিল একটি বিরাট এলাকা জুড়ে। এখন সে সবের কোনও চিহ্ন নেই। এখানে সময়-নির্ধারক কোন প্রত্নবস্তু পাওয়া না গেলেও ইট দেখে মনে হয় যে, এস্থানে প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে একটি সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল এবং লোহানীপাড়া বিহারের সমসাময়িক ছিল তা। খুব সম্ভব বর্তমান ঘিরনাই নদীর অস্তিত্ব তখন ছিল না।

ফুলবাড়ি দুর্গনগরী ও আশেপাশের কীর্তি

ফুলবাড়ি নামে কোন মৌজা নেই। এখন যেখানে (দুর্গের ভিতরে) ফুলবাড়ি হাট ও ব্যবসা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে, মেজর শেরউইলের ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে মানচিত্রে সেস্থানকে কাঁটাবাড়ির হাট বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এখানে প্রাচীনকালে একটি প্রকাণ্ড দুর্গনগরী ছিল। বর্তমান কালে দুর্গের অতি সামান্য অংশই টিকে আছে। মৃতপ্রায় যমুনা (প্রাচীন জম্বু?) নদীর উপর স্থাপিত পাকা ব্রীজের সামান্য পূর্ব থেকেই গড়ের পশ্চিম দেয়ালের অস্তিত্ব দেখা যায়। এ দেয়াল উত্তর দিকে প্রায় ২০০ মিটার চলে গিয়ে সমকোণে বাঁক নিয়ে প্রায় ৮০০ মিটার পূর্ব দিকে চলে গেছে। সেখান থেকে সমকোণে বাঁক নিয়ে দক্ষিণ মুখে প্রায় ২০০ মিটার চলে গেছে। এর পরেই দিনাজপুর-ফুলবাড়ি পাকা সড়ক। পাকা সড়কের দক্ষিণে প্রাচীরের কোনো চিহ্নই নেই এবং দুর্গ দক্ষিণ দিকে আরও কতদূর প্রসারিত ছিল, তা সেখানে অবস্থিত ঘনবসতি এলাকায় খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব। তবে পূর্ব দেয়ালের কিছু কিছু অংশ পাকা সড়কের কিছু দক্ষিণেও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় নযরে পড়ে। পাকা সড়কের উত্তরে অবস্থিত পশ্চিম ও উত্তর দেয়াল প্রায় অটুট অবস্থায় আছে। পূর্ব দেয়াল স্থানে স্থানে বিলুপ্ত হয়ে গেলেও পরিখাটি এখনও টিকে আছে। পূর্ব দেয়াল থেকে প্রায় ১০০ মিটার পশ্চিমে পরিখাবেষ্টিত যে অভ্যন্তরীণ দেয়াল ছিল, তা উত্তর দেয়ালের প্রায় ১০০ মিটার দক্ষিণে সমকোণে বাঁক নিয়ে প্রায় ১০০ গজ পশ্চিমে ক্রমবর্ধমান জনবসতির চাপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

লালমাটিতে গড়া এ দুর্গের দেয়ালগুলি ছিল উপরের দিকে প্রায় ২.৫ মিটার চওড়া ও প্রায় ৪ মিটার উঁচু। দেয়ালের বাইরের পরিখাগুলি এখনও প্রায় ১০ মিটার প্রশস্ত এবং এককালে যে খুব গভীর ছিল তার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। মেজর শেরউইলের মানচিত্রে

এ দুর্গকে গড়গোবিন্দ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। স্থানীয় লোকেরা গড় গোবিন্দ বা কানারাজার গড় এই দুই নামেই এই প্রাচীন দুর্গকে পরিচিত করে থাকে।

এ গড়ের প্রায় আধ মাইল পূর্ব দিকে একটি প্রাচীন জলাশয় আছে। আনুমানিক ৪০০ মিটার × ১৫০ মিটার আয়তনের উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ও এ দিঘি অত্যন্ত প্রাচীন। এর নাম কানাহার বা কানারাজার দিঘি। খুব সম্ভব এটি দুর্গ-নির্মাতা কানা রাজা বা রাজা গোবিন্দের কীর্তি।

উত্তর দামোদরপুর

এই গড়ের কয়েক কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত উত্তর দামোদরপুর গ্রাম। সে গ্রামে হরিপুকুর ও খোলাকুটি নামক পাশাপাশি অবস্থানরত দুটি অতি প্রাচীন জলাশয় আছে। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে সমীর উদ্-দীন মণ্ডল নামক এক ভদ্রলোক পুকুর দুটির মাঝখান দিয়ে একটি রাস্তা কাটাবার সময় মাটির নিচে ৫ খানা তাম্রলিপি আবিষ্কার করেন। এগুলির মধ্যে ২ খানা তাম্রলিপি ছিল সম্রাট প্রথম কুমার গুপ্তের, ২ খানা মহারাজ বুধ গুপ্তের ও ১ খানা ছিল মহারাজ ভানুগুপ্তের আমলের। এই ৫ খানা তাম্রলিপির মধ্যে যে-সমস্ত স্থানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে বায়িগ্রাম (বর্তমান উত্তর বৈগ্রাম), পলাশবৃন্দক, বৃন্দকহরি, প্রভৃতি গ্রাম এবং জম্বু নদী (বর্তমানে মৃতপ্রায় যমুনা নদী?) ফুলবাড়ি থানা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে চিহ্নিত করা যায়। দামোদরপুরে অসংখ্য ও বিচিত্র ধরনের প্রাচীন জলাশয় আছে।

উত্তর বৈগ্রাম

গ্রামগুলির মধ্যে বায়িগ্রাম অর্থাৎ বর্তমান বৈগ্রাম বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। কানাহার থেকে প্রায় দেড় মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে, রেল লাইনের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত বৈগ্রাম একটি অতি প্রাচীন স্থান। এখানে বেশ-কয়েকটি অতি প্রাচীন জলাশয় আছে. এখানে যে প্রাচীন কালে একটি উল্লেখযোগ্য জনপদ ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় মাটির নিচে প্রাপ্ত অসংখ্য ইট, পাথর ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ থেকে।

ফুলবাড়ি দুর্গ, কানারাজা প্রভৃতিদের সম্পর্কে কোনো ইতিহাস পাওয়া না গেলেও কিংবদন্তী আছে প্রচুর। একটি কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায় যে. ফুলবাড়ি থেকে ৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে যে বিরাট দুর্গ আছে তা নাকি সুলতান শাহ শুজা কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল এবং তিনি নাকি সে দুর্গ থেকে অভিযান চালনা করে কানারাজাকে পরাজিত ও নিহত করে এ দুর্গ অধিকার করেছিলেন। এই রাজা গোবিন্দ নাকি একবার ফুলবাড়ি থেকে প্রায় ১১ কিলোমিটার পূর্ব দিকে নওয়াবগঞ্জ থানার বামনগড় নামক স্থানের অধিপতি ব্রাহ্মণ রাজাকে অপমান করেছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ নৃপতির অভিশাপে নাকি তিনি কানা (অন্ধ) ও রাজ্যহারা হয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন।

এগুলি যে নিছক গালগল্প তাতে সন্দেহ নেই। শাহ শুজার সময়ে দিনাজপুর অঞ্চলে এমন কোনো হিন্দু সামন্ত রাজা ছিলেন না, যিনি মোঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে

পারতেন। তা ছাড়া, তখন এই অঞ্চলের জমিদার ছিলেন মোঘলদের একান্ত অনুগত দিনাজপুরের মহারাজা।

এই প্রাচীন স্থানে গুপ্তদের একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল বলে ধারণা করা যেতে পারে।

বামন গড়

ফুলবাড়ি থেকে পূর্ব-উত্তর দিকে জেলা পরিষদের রাস্তা ধরে আফতাবগঞ্জ হাটের দূরত্ব প্রায় ৭.৫ মিটার। সেখান থেকে আরও প্রায় ৪ কিলোমিটার পূর্ব-উত্তরে একটি জঙ্গলঘেরা স্থান পাওয়া যায়। প্রাচীন করতোয়া নদীর একটি মৃতপ্রায় খাত এ স্থানের পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত।

জঙ্গলের পাশে প্রায় ২বিঘা জমির উপরে আছে একটি উঁচু ঢিবি। ঢিবিটি প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ। এ ঢিবি থেকে প্রায় ২০০ মিটার দূরে অনুরূপ আয়তন ও আকারের আরও একটি ঢিবি আছে। ঢিবিগুলির উচ্চতা বর্তমানে ৬ মিটারের বেশি নয়। স্থানীয় লোকদের মতে এখানে আরও অনেক ঢিবি ও একটি দুর্গ ছিল। সেগুলি নাকি নষ্ট হয়ে গেছে। লোকে বলে যে বর্তমান ঢিবিগুলিতে নাকি সোনা-রূপার মুদ্রা পাওয়া যায়। ঢিবিগুলিতে প্রাচীন আমলের কাপড়ও পাওয়া গেছে বলে স্থানীয় লোকেরা বলে থাকেন।

জনপ্রবাদ মতে এ স্থানের নাম বামন গড়। এককালে নাকি এক ব্রাহ্মণ রাজার রাজধানী ছিল এখানে। ফুলবাড়ির রাজা গোবিন্দ (ফুলবাড়ি দূর্গ দ্র.) নাকি তাঁকে অপমান করেছিলেন এবং তাঁর অভিশাপে নাকি ফুলবাড়ির রাজা কানা হয়ে যান এবং পরে রাজ্য ও প্রাণ হারান।

এ সব জনপ্রবাদের কোনো ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলে মনে হয় না। তবে প্রাচীন করতোয়া নদীর তীরবর্তী এ অঞ্চলে যে এককালে একটি সমৃদ্ধ জনপদের অস্তিত্ব ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বর্তমান ঢিবি দুটি ও আশেপাশের অঞ্চলে মাটির নিচে প্রাপ্ত অসংখ্য প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশের অস্তিত্ব দেখে। ঢিবি দুটি খুব সম্ভব কোনো হিন্দু মন্দির বা বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ।

আফতাবগঞ্জ হাট থেকে শালবনের ভিতর দিয়ে যে রাস্তাটি নওয়াবগঞ্জ চলে গেছে, তার মাঝামাঝি স্থানে রাস্তার পাশেই একটি উঁচু ঢিবি আছে। প্রায় ২ বিঘা জমির উপর অবস্থিত এ ঢিবির উচ্চতা প্রায় ৬ মিটার। ঢিবির ভিতরে প্রচুর প্রাচীন ইট আছে। এটিকেও বামনগড় বলা হয়ে থাকে এবং পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণ রাজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হয়। একটি মরা নদীর খাত (খুব সম্ভব প্রাচীন করতোয়ার একটি পরিত্যক্ত খাত) এর পাশেই দেখা যায়। খুব সম্ভব এ ঢিবি কোন মন্দির বা বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ।

এ স্থানে একটি বৌদ্ধ বিহার বা বিরাট আকারের একটি বৌদ্ধ মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল বলে ধারণা হয়।

পুকুরি

ফুলবাড়ি থেকে প্রায় ৭.৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে জেলা পরিষদের দুটি রাস্তার মিলন স্থলে চিন্তামন নামক একটি প্রাচীন স্থান আছে। চিন্তামন থেকে প্রায় ৪

কিলোমিটার পশ্চিমে পুকুরি নামক একটি অতি প্রাচীন গ্রাম আছে। স্থানীয় লোকদের মতে এস্থানে ছোট বড় মিলিয়ে সর্বমোট ৩৬০ টি পুকুর আছে। ৩৬০ টি পুকুর বর্তমানে পাওয়া যায় না। তবে এ গ্রামে এক শতেরও অধিক প্রাচীন পুকুর খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। অবশ্য আশে পাশের গ্রামগুলির পুকুর এগুলির সঙ্গে যোগ করলে পুকুরের সংখ্যা ৩৬০ এর কাছাকাছি হবে। রামসাগর বা ভিতরগড়ের দিঘির (ভিতরগড় দ্র.) মতো বড় জলাশয় এখানে অবশ্য নেই। তবে বড় কালীডুবা, ছোট কালীডুবা, পদ্মপুকুর, রাজার মায়ের পুকুর, দুয়ো রানীর দিঘি, সুয়োরানীর দিঘি প্রভৃতি জলাশয়গুলির এক একটার আয়তন বিশ থেকে পঁচিশ বিঘার কম হবে না। প্রত্যেকটি জলাশয়ই অত্যন্ত প্রাচীন।

এই অসংখ্য প্রাচীন জলাশয় ছাড়াও এ স্থানের আরও অনেক বিশেষত্ব আছে। প্রায় ৮ বর্গ কিলোমিটার স্থান জুড়ে এখানে অসংখ্য প্রত্নকীর্তির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন বিদ্যমান। এ সমগ্র এলাকা জুড়ে আছে পাথর, প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশের ছড়াছড়ি। মাটি খুঁড়লে যেখানে-সেখানে প্রাচীন ইট ও ইমারতের ভিত্তি-দেয়াল বের হয়ে পড়ে। প্রায় ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি প্রাচীন পাকা সড়কের অস্তিত্বও এখানে স্পষ্টভাবে বিদ্যমান।

সমগ্র এলাকার প্রায় কেন্দ্রস্থলে রাজবাড়ি বলে কথিত প্রায় ১০ একর পরিমিত একটি উঁচু ভূমি আছে। এই উঁচু ভূমির মাঝামাঝি স্থানে আছে প্রায় ১ বিঘা আয়তনের একটি প্রাচীন জলাশয়। পুকুরের পাড়গুলি যে এককালে বাঁধান ছিল তার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। এই পুকুরের চার পাড়ে ৪ টি ঢিবি ও পশ্চিম পাড়ের ঢিবির লাগোয়া দক্ষিণে আরও ৩টি ঢিবি আছে। ঢিবিগুলি আয়তনে খুব বড় নয় এবং উচ্চতাও বর্তমানে ২মিটারের বেশি নয়। কিন্তু প্রত্যেকটি ঢিবি প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ এবং অজস্র মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ছড়িয়ে রয়েছে ঢিবিগুলির চারদিকে। লোকে বলে এটিই নাকি ছিল রাজবাড়ির অন্দর মহলের পুকুর। রাজবাড়ির ৫০০ মিটারের মধ্যে আর কোনো জলাশয় নেই।

রাজবাড়ির পুকুর থেকে প্রায় ১৫০ মিটার উত্তর দিক দিয়ে যে প্রাচীন পাকা সড়কটি পূর্ব-পশ্চিমে চলে গেছে, সেই পাকা সড়ক থেকে প্রায় ১০০ মিটার উত্তরে পাশাপাশি অবস্থানরত কয়েকটি প্রাচীন ঢিবি ছিল। ৩টি ঢিবির চিহ্ন এখনও বেশ স্পষ্ট। সব ক'টা ঢিবি থেকেই ইট সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। একটি ঢিবির পাশেই কাল পাথরে তৈরি একটি গৌরীপট্ট পড়ে আছে। এ ঢিবিগুলিতে খুব সম্ভব প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ পুরায়িত আছে।

কাল পাথরে তৈরি একটি ব্রহ্মার মূর্তি, একটি ছোট গণেশ মূর্তি ও একটি ছোট ব্রোঞ্জ মূর্তি এখানে পাওয়া গেছে। একটি পুরুষ দেবতার মাথায় ৭টি সাপের ফণা সুশোভিত এ মূর্তি ছিল খুব সম্ভব বিষ্ণুর। মূর্তিগুলি দিনাজপুর যাদুঘরে রক্ষিত ছিল। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে অন্যান্য ব্রোঞ্জ মূর্তির সঙ্গে এই মূল্যবান ব্রোঞ্জ মূর্তিটিও হারিয়ে গেছে। মাটির তৈরি একটি বিরাট জালা (সঞ্চয়-পাত্র) এখানে থেকে পাওয়া গেছে। এটি বর্তমানে দৌলতপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব শামস-উদ-দীনের এর নিকট রক্ষিত আছে।

দেশ বিভাগের কিছুকাল পরেই স্থানীয় এক সাঁওতাল রাজবাড়ির দক্ষিণের ভূমিতে মাটি খুঁড়তে গিয়ে এক হাঁড়ি স্বর্ণ মুদ্রা পান এবং সেইগুলি নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করেন

যায় বলে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে। রাজবাড়ির পুকুরে অনেক প্রত্নসম্পদ লুকিয়ে আছে বলে স্থানীয় জনসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থকার কর্তৃক পাওয়ার পাম্প লাগিয়ে পুকুরের জল নিষ্কাসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু পুকুরের মধ্যে এত কাদা যে, এ ব্যাপারে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ফলে কোনো কিছুই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

কিন্তু এর কয়েক মাস পরেই ঢাকা যাদুঘরের এক সংগ্রাহক এ স্থান থেকে কিছু মুদ্রা সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। রাজবাড়ির ঢিবির পাশের জমির এক আইল কাটতে গিয়ে এক কৃষক এ মুদ্রাগুলি পান। গুপ্ত যুগের এ সব মুদ্রা বর্তমানে ঢাকা যাদুঘরে আছে বলে জানা গেছে।

এ স্থান থেকে গুপ্ত আমলের মুদ্রা-প্রাপ্তি, এ স্থানের প্রাচীনতার এক বিরাট সাক্ষ্য বহন করছে। তবে কোনো লিপি বা সময় নির্দেশক অন্য কোনো প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এ স্থানের ইতিহাস সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়।

পুকুরি নাম নিয়ে একটি বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে। মেজর শের উইলের মানচিত্রেও এ স্থানের নাম পুকুরি। এটি প্রকৃত নাম বলে মনে হয় না। এককালে যে এখানে একটি বিরাট জনপদ ও প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই জনপদের নাম পুকুরি হওয়া অবিশ্বাস্য ব্যাপার। খুব সম্ভব গুপ্ত বা পাল যুগে এখানে কোন প্রশাসনিক কেন্দ্র অথবা কোনো রাজার রাজধানী ছিল। এ স্থান হয়ত আজ থেকে বহুকাল আগে পরিত্যক্ত হয়েছিল। এ পরিত্যক্ত স্থানে হয়ত বহুকাল ধরে কোনো বসতি ছিল না (এখনও এখানে, বিশেষ করে রাজবাড়ি ও আশে পাশের এলাকায়, কোনো বসতি নেই)। এই বসতিহীনতার সঙ্গে এ স্থানের প্রকৃত নামটিও হয়ত হারিয়ে যায়। অনেক পরবর্তীকালে ধারে কাছে বসতি স্থাপিত হলে খুব সম্ভব অসংখ্য পুকুরের অবস্থানের জন্য স্থানীয় লোকেরা এর নাম রাখেন পুকুরি।

ভাঙ্গাদিঘি, সাগরদিঘি, নলদিঘি, মোহনপুর-চাপড়া প্রভৃতি

ফুলবাড়ি থানার দক্ষিণ প্রান্তে বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্তবর্তী খিয়ার মামুদপুর মৌজার অন্তর্গত ভাঙ্গা দিঘি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮০০ মিটার ও প্রস্থে প্রায় ৫০০ মিটার। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ দিঘির উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে কালিকার বিল। পশ্চিম পাড় সংলগ্ন বিস্তীর্ণ ভূমি বেশ উঁচু ও লাল মাটিতে গঠিত। দিঘির দক্ষিণ ও পূর্ব পাড় অটুট আছে। উত্তর পাড়ের পূর্বাংশ ভেঙ্গে গেছে। সেজন্য বোধ হয় লোকে বলে ভাঙ্গা দিঘি। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের শের উইলের মানচিত্রেও এর নাম ভাঙ্গা দিঘি। বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার বৃহত্তম জলাশয়গুলির মধ্যে অন্যতম এই ভাঙ্গাদিঘি।

দিঘির উত্তর-পূর্ব কোণে বিলের মধ্যে আছে একটি ছোট পুকুর। এই পুকুরের প্রায় ১০০ মিটার উত্তরে কালিকা বিলের ভিতরে প্রায় এক বিঘা আয়তনের একখণ্ড উঁচু ভূমির চারদিকে গভীর পানি। শীতকালেও নৌকা ছাড়া সেখানে যাওয়া যায় না। এই উঁচু ভূমির সর্বত্র প্রাচীন ইটের ছড়াছড়ি। আর আছে পাথরের টুকরা ও অসংখ্য হিন্দু দেবদেবীর মূর্তির ভগ্নাংশ। মসৃণ কাল পাথরে তৈরি এ মূর্তিগুলি ছিল খুব সম্ভব সেন

যুগের বা পাল যুগের শেষ দিকে তৈরি। খুব সম্ভব এখানে একটি হিন্দু মন্দির ছিল। ভগ্ন মূর্তিগুলির মধ্যে একটি গণেশ মূর্তির ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে।

ভাঙ্গা দিঘির পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অসংখ্য প্রাচীন জলাশয়ের অস্তিত্ব বিদ্যমান। প্রায় ১.৫ কিলোমিটার উত্তরে কিসমত সাগরপুর মৌজায় যে বিরাট জলাশয় আছে তার নাম সাগর দিঘি। পূর্বোক্ত কালিকা বিলের পশ্চিম-উত্তর প্রান্তে অবস্থিত এ দিঘি আয়তনে ভাঙ্গা দিঘির চেয়ে কিছু ছোট। পাড়গুলি পাহাড়ের মতো উঁচু।

ভাঙ্গা দিঘি থেকে প্রায় আধ মাইল দক্ষিণে নলদিঘি। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ দিঘির আয়তন প্রায় ৩০০ মিটার × ৫০ মিটার। এ দিঘির জলভাগ বহুশতাব্দী ধরে নল খাগড়ায় ভরা অথবা দিঘিটি নলের মত লম্বা বলে হয়ত এর নাম নলদিঘি। নল দিঘি থেকে কয়েকশ মিটার দক্ষিণে বল দিঘি। আয়তনে প্রায় নল দিঘির সমান এবং অবস্থা প্রায় একই রকম।

বল দিঘির দক্ষিণে ভারতে অবস্থিত গোচেনার বিল। এই ছোট বিল পার হলেই তাল দিঘি এবং তাল দিঘির দক্ষিণে মেল দিঘি। মেল দিঘির এক কিলোমিটার পূর্ব দিকে ভারতে অবস্থিত একটি ছোট আকারের প্রাচীন দুর্গ। এ দুর্গ থেকে প্রায় ১.৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে আর একটি অনুরূপ আকারের দুর্গ।

ভাঙ্গা দিঘির পশ্চিম তীরবর্তী প্রায় ১০ একর পরিমিত যে উঁচু ভূমি আছে তা বর্তমানে চাষের জমিতে পরিণত হয়েছে। এখানে যে এককালে বহু ইমারতাদি ছিল, তার নিদর্শন বহন করে এখানে মাটির নিচে অবস্থিত অসংখ্য প্রাচীন ইট, পাথর ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ। দেশ বিভাগের কিছু কাল পরে ভাঙ্গা দিঘিতে একটি বিরাট বিষ্ণু মূর্তি পাওয়া যায়। তা বর্তমানে ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। মসৃণ কাল পাথরে তৈরি এ মূর্তি খুব সম্ভব সেন যুগের বা পাল যুগের শেষ ভাগের।

ভাঙ্গা দিঘির পশ্চিম পাড় থেকে আরম্ভ করে কয়েক বর্গ মাইল স্থান জুড়ে অসংখ্য প্রত্নকীর্তির ভগ্নাবশেষের চিহ্ন দেখা যায়। ঘন বসতির চাপে পড়ে কোনো কীর্তি টিকে না থাকলেও মাটির নিচে অসংখ্য প্রাচীন ইট, প্রাচীন মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ এবং কোনো কোনো স্থানে প্রাচীন ইমারতের ভিত্তিও পাওয়া যায়। সাগর দিঘির পশ্চিম পাড়ে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। উত্তর-পশ্চিম দিকে রানীনগর বলে যে প্রাচীন স্থান আছে সেখানে বহু প্রাচীন জলাশয় ও মাটির নিচে অনেক প্রাচীরের ভিত্তি পাওয়া যায়। উত্তর দিকে অবস্থিত ইকর-মঙ্গলপুর সম্পর্কে একই মন্তব্য প্রযোজ্য।

কালিকা বিলের পূর্বদিকে মোহনপুর, কেওড়া, চাকোল ও চাপড়া গ্রাম। এ সমস্ত স্থানে অসংখ্য প্রাচীন ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। সর্বদক্ষিণে ও ভারত সীমান্তে অবস্থিত চাপড়া গ্রাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে অসংখ্য প্রাচীন মন্দিরাদি ছিল। সেগুলি মাটির সঙ্গে মিশে গেছে এবং তাতে বাঁশঝাড় ও জঙ্গল গজিয়ে উঠেছে। ধারে কাছে বহু প্রাচীন মূর্তির ভগ্নাংশেষ এখানে-ওখানে পড়ে আছে। বেলে পাথরে তৈরী একটি অতি প্রাচীন মনসা মূর্তি (বর্তমানে দিনাজপুর যাদুঘরে রক্ষিত) এখানে পাওয়া গেছে।

ভাঙ্গাদিঘি-সাগর দিঘিকে কেন্দ্র করে ভারতে অবস্থিত কিছু স্থানসহ চার দিকে যে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির চিহ্ন দেখা যায়, তাতে ধারণা হয় যে, প্রায় ৩০ বর্গ কিলোমিটার স্থান জুড়ে এককালে একটি বিশাল জনপদের অস্তিত্ব ছিল। আবার এমন হতে পারে যে, উপরোক্ত স্থান গুলিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনপদ গড়ে উঠেছিল এবং কালক্রমে সেগুলি ধ্বংস হয়ে একাকার হয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন দেখে সমগ্র স্থানকে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের চিহ্ন বলে মনে হয়। যেটিই সত্য হোক না কেন, এ স্থান যে অত্যন্ত প্রাচীন তাতে সন্দেহ নেই।

চণ্ডীপুর-গড়পিঙলাই

বিরামপুর থেকে জেলা পরিষদের পুরাতন রাস্তা ধরে ফুলবাড়ি যাওয়ার পথে যমুনা নদীর একটি প্রাচীন খাতের উপর যে ছোট পাকা ব্রীজটি পড়ে, তা পার হয়ে রাস্তা ধরে উত্তর দিকে যেতে রাস্তার পশ্চিম দিকে পড়ে যমুনা নদীর প্রাচীন ধারার উপর অবস্থিত একটি বড় বিল। রাস্তার পূর্ব পার্শ্বের অধিকাংশ স্থান শালবনে ঢাকা। মাঝে মাঝে সাঁওতাল ও কিছু কিছু বহিরাগত মুসলমানের বসতি। বিরামপুরের উত্তরে প্রায় ৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এ প্রাচীন স্থান চণ্ডীপুর-গড়পিঙলাই নামে পরিচিত। এ অঞ্চলের দক্ষিণ ভাগে পুরাকীর্তির চিহ্ন খুব বেশি নেই। নেই যে তা নয়, তবে সংখ্যায় কম। তদুপরি বসতির চাপে ও শালবনে অনেক কীর্তিই বোধ হয় চাপা পড়ে গেছে।

কিন্তু তার পরেই অসংখ্য প্রত্ন কীর্তির চিহ্ন দেখা যায়। পশ্চিমে বিলের পাড় থেকে শুরু করে পূর্ব দিকে রেল লাইন এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৪ কিলোমিটার দীর্ঘ স্থান জুড়ে কত প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ যে ছিল, তার ইয়ত্তা নেই। ১৯৫৮-৬০ খ্রিস্টাব্দের দিকে এ অঞ্চলে প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ প্রায় ১৫০টি ডিবি ছিল। ক্রমবর্ধমান জনবসতির চাপে ১৯৬৭-৬৯ খ্রিস্টাব্দের দিকে ঢিবির সংখ্যা ছিল মাত্র ৫০ টি। বর্তমানে আরও কমে গেছে। এখন সেখানে ২৫টি ঢিবিও অক্ষত অবস্থায় টিকে আছে কিনা সন্দেহ। শুধু ঢিবি নয়, ঢিবির পাশাপাশি অবস্থিত সমতল ভূমিতেও অনেক প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ ছিল। এক কথায় প্রায় ১৫ বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে ছিল একটি অতি সমৃদ্ধিশালী জনপদের অস্তিত্ব।

এ স্থানের একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করার মতো। পশ্চিম দিকে ৰিলের (তখন বোধ হয় নদী ছিল) কাছাকাছি স্থানে ছিল ঢিবিগুলির অবস্থান। ধারে কাছে কোনো দিঘি-পুষ্করিণী ছিল না। জলাশয়গুলি ছিল দূরে, পূর্বদিকে রেল লাইনের কাছাকাছি স্থানে। গড় পিঙলাই-চণ্ডীপুরের অনেক উত্তর থেকে আরম্ভ করে ৬ কিলোমিটারের অধিক দীর্ঘ স্থান জুড়ে জলাশয়গুলি একের পর এক চলে গেছে বিরামপুর পর্যন্ত। নামগুলিও বিচিত্র—শুঁড়ি পুকুর, পীর পুকুর, খুন সাগরী, হুনচিল, নলপুকুর, হাঁড়ি পুকুর, গোয়ালপুকুর, মহিষ বাথান, কামার পুকুর, ঘোলামাটি, দামোয়া পুকুর, দেবীডুবা ইত্যাদি ইত্যাদি নামধারী জলাশয়গুলি অসংখ্য প্রাচীন পুকুরের মধ্যে মাত্র কয়েকটি। সব ক'টা জলাশয়ই অত্যন্ত প্রাচীন—মুসলিম আমলের অনেক আগের। কিন্তু অনেকগুলি জলাশয়ের বর্তমান নামকরণ পরবর্তী কালে করা হয়েছে বলে ধারণা হয়।

চণ্ডীপুরে একটি রাজবাড়ি বা প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল বলে ধারণা করা যায়। বিলের ধারে, জেলা পরিষদের পুরাতন রাস্তার পশ্চিম পাশে পরিখা বেষ্টিত একটি স্থানের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রশস্ত পরিখা বেষ্টিত এ স্থানের আয়তন প্রায় ৫০ একর। নোয়াখালী জেলা থেকে আগত একটি মুসলিম পরিবার এই পরিখা বেষ্টিত স্থানের দক্ষিণাংশে বাড়িঘর করে বসবাসরত। বাড়িটাকে বেষ্টন করে সেই পরিখা উত্তর ও দক্ষিণ দিকে গোলাকার হয়ে পশ্চিম দিকের বিলে গিয়ে শেষ হয়েছে। কোনো বেষ্টনী প্রাচীরের চিহ্ন বর্তমানে নেই। খুব সম্ভব বেষ্টনী প্রাচীর ছিল এবং তা বোঝা যায় পশ্চিম দিকে বিলের পাড়ে ইষ্টক নির্মিত তোরণের ধ্বংসাবশেষ দেখে।

উপরে উল্লিখিত বাড়ির পূর্বদিকে রাস্তার পাশে ছিল আর একটি তোরণ। এ তোরণের সঙ্গে উত্তর দক্ষিণে লম্বালম্বি অনেক ক'টা অনুচ্চ ঢিবি আছে। ঢিবিগুলির মধ্যে ইমারতের ভিত্তি আছে। এই ভিত্তিগুলি একই ইমারতের অংশ হতে পারে। এ ঢিবিগুলির লাগোয়া উত্তরে একটি বিরাট আকারের পাকা কূপ ছিল। বর্তমানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

পূর্ব তোরণের কিছু দক্ষিণে গোলাকার পরিখার পশ্চিম দিক ঘেঁষে দুটি প্রশস্ত দেয়ালের ভিত্তি মাটির অনেক নিচে পর্যন্ত পাওয়া গেছে। প্রায় '১০″ × ১০″ × ২$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি' আয়তনের ইটগুলি অনেক প্রাচীন বলে মনে হয়। সব ইট এক মাপের নয়। এ প্রাচীর দুটির প্রায় ৫০ মিটার পশ্চিমে মাটি খুঁড়তে গিয়ে আর একটি প্রশস্ত দেয়ালের ভিত্তি বের হয়ে গেছে। এ দেয়ালগুলির লাগোয়া দক্ষিণে প্রায় ২ বিঘা ভূমি জুড়ে একটি অনুচ্চ ঢিবি আছে। সেখানে এত ইট আছে যে, তাতে এখনও চাষের কাজ করা সম্ভব হয়নি। এ অনুচ্চ ঢিবির পূর্ব, দক্ষিণ ও পূর্ব-দক্ষিণে আরও অনেক ঢিবি বিদ্যমান। এগুলির প্রত্যেকটি প্রাচীন কালের ইট-পাথরে পরিপূর্ণ।

পরিখাবেষ্টিত স্থানটিকে রাজবাড়ি বলা হয়ে থাকে। রাজবাড়ি ছিল কি অন্য কিছু ছিল তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। এখানে কোনো বৌদ্ধ বিহারের অবস্থানও অসম্ভব বলে মনে হয় না।

এখান থেকে বিশেষ কোনো প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়নি। তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো মূর্তি বা পোড়ামাটির চিত্রফলকও পাওয়া যায়নি। এখানে প্রাচীন কীর্তির এত ধ্বংসাবশেষ থাকা সত্ত্বেও কোনো প্রত্ন বস্তু না পাওয়ার ব্যাপারটা বড়ই বিস্ময়কর বলে মনে হয়। দেশ বিভাগের কিছু কাল পরে এক সাঁওতাল একটি ছোট ঢিবি খুঁড়তে গিয়ে একটি হাঁড়িতে রক্ষিত বলয় জাতীয় কিছু স্বর্ণালঙ্কার পান এবং সেগুলি নিয়ে তিনি সীমান্ত অতিক্রম করে চলে গিয়ে আর ফিরে আসেননি। তারই আত্মীয় এক বৃদ্ধ সাঁওতাল এ ঘটনা গ্রন্থকারকে বলেছিলেন ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে।

চরকাই-বিরামপুর

ফুলবাড়ি থানা থেকে ১৬ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত রেল স্টেশনের নাম চরকাই কিন্তু স্থানের নাম বিরামপুর (বর্তমানে উপজেলা)। ফুলবাড়ি, নওয়াবগঞ্জ ও হাকিমপুর উপজেলাগুলির প্রায় মিলন স্থলে অবস্থিত চরকাই-বিরামপুর বর্তমানে একটি বিশিষ্ট স্থান। অসংখ্য প্রত্নকীর্তির চিহ্ন এ স্থানের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

উত্তরে চণ্ডীপুর-গড়পিঙ্লাই থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে মীর্যাপুর পর্যন্ত ১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ও এক থেকে দুই কিলোমিটার প্রশস্ত স্থান জুড়ে দক্ষিণ প্রবাহী প্রাচীন যমুনা নদীর পূর্ব তীরে একটি বিশাল বা একাধিক জনপদ যে প্রাচীন কালে বিদ্যমান ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় সমগ্র এলাকা জুড়ে অবস্থিত অসংখ্য পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখে।

চরকাই-বিরামপুর স্কেচ ম্যাপ (স্কেল মতো নয়)

বিরামপুর পুরাতন ডাকবাংলার দক্ষিণে অবস্থিত রেল লাইনের লেভেল ক্রসিং থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে বিরামপুর কলেজ অতিক্রম করে মীর্যাপুর পর্যন্ত ৯ কিলোমিটার দীর্ঘ স্থানে অসংখ্য প্রত্ন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। লেভেল ক্রসিং থেকে কলেজ পর্যন্ত

স্থানে রেল লাইনের পাশে প্রায় ২৫ টি ছোট বড় ঢিবি আছে। ঢিবিগুলি প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ বহন করে। এগুলির পশ্চিমে ঘনবসতি। কিন্তু প্রায় বাড়ির নিচেই প্রাচীন ইমারতের ভিত্তি পাওয়া যায়। যে কোনো স্থানে মাটি খুঁড়লেই প্রাচীন ইট বের হয়ে পড়ে।

রেল লাইনের পূর্বদিকে অসংখ্য প্রাচীন জলাশয় ছিল। অনেকগুলি জলাশয় প্রায় মজে গেছে। এ সমস্ত প্রাচীন জলাশয় থেকে অনেক পাথরের মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল বলে জানা গেছে। এখনও মাঝে মাঝে মূর্তি পাওয়া যায়। এখানে প্রাপ্ত অনেক মূর্তি ভারতের বিভিন্ন যাদুঘর ও কিছু কিছু মূর্তি ঢাকা ও রাজশাহী যাদুঘরে আছে।

বিরামপুর কলেজ প্রায় ২৫ একর ভূমির উপর অবস্থিত। প্রায় সমগ্র স্থানের নিচেই প্রাচীন কালের প্রচুর ইট ও প্রাচীন মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ পাওয়া যায়। ১৯৬৮/৬৯ খ্রিস্টাব্দে কলেজের উত্তর ও পশ্চিম দালান নির্মাণ কালে, প্রায় ৩ একর পরিমিত একটি অনুচ্চ ঢিবি সমতল করতে গিয়ে দেখা যায় যে, সমগ্র ঢিবি জুড়ে একটি বিরাট অথবা একাধিক অট্টালিকা অবস্থিত ছিল। সেখানে লোহার তৈরি একটি প্রাচীন কোদাল ও একটি ছোট অস্ত্র পাওয়া যায়। সেগুলি বর্তমানে দিনাজপুর যাদুঘরে আছে। কলেজের খেলার মাঠ সমতল করতে গিয়ে দেখা যায় যে, সেখানে মাটির নিচে ও উপরে অসংখ্য প্রাচীন ইট, পাথর ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ আছে। কলেজের লাগোয়া উত্তরে প্রাচীন ইটে ভরা বেশ কয়েকটি ঢিবি মোটামুটি অক্ষত অবস্থায় ছিল। কলেজের দক্ষিণেও অনুরূপ ধরনের কয়েকটি ঢিবি আছে। কিন্তু সেগুলি খুব উঁচু নয়।

কলেজের প্রায় দেড় কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি প্রাচীন দুর্গ আছে। গড়ের কোনো নাম নেই। কিন্তু সংলগ্ন গ্রামের নাম গড়েরপাড়। প্রাচীন যমুনা নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত ও উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ গড়ের আয়তন প্রায় ৫০০ মিটার × ৩০০ মিটার। মাটির প্রাচীরগুলি প্রায় ২মিটার উঁচু এবং সংলগ্ন পরিখা প্রায় ৭মিটার প্রশস্ত। গড়ের অভ্যন্তরে, উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। কিছু কিছু প্রাচীন ইটের টুকরা ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ গড়ের ভিতরে পাওয়া গেলেও আর কোনো পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষ সেখানে নেই।

চরকাই-চোরকচক্রবর্তী

চরকাই নামটি একটু বিচিত্র ধরণের। নামের উৎপত্তি সম্পর্কে কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু একটি মুখরোচক গল্প শোনা যায়। চরকাই রেল স্টেশন থেকে প্রায় এক কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে একটি ঢিবি আছে। লোকে বলে চোর চক্রবর্তীর ধাপ। প্রাচীন কালে সেখানে নাকি এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর একমাত্র পুত্র বালকালেই নাকি চৌর্যবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী হয়ে ওঠে। বালকের পিতা পুত্রকে চৌর্যবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত করার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি একটি থালাতে কিছু টাকা রেখে টাকাগুলি ছাই দিয়ে ঢেকে দেন। তারপর তিনি বালককে আদেশ দেন, ছাইগুলি ফুঁ দিয়ে সরিয়ে টাকাগুলি নিয়ে যেতে। কিন্তু শর্ত থাকে যে, ফুঁ দিয়ে ছাই

সরাবার সময় যদি এক কণা ছাই মুখে লাগে তবে বালককে জীবনের জন্য চৌর্যবৃত্তি ছেড়ে দিতে হবে।

বালক হাসিমুখে শর্ত মেনে নিয়ে পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হয়। সে এক খণ্ড লম্বা বাঁশের চোঙ্গা জোগাড় করে, চোঙ্গার ভিতর দিয়ে ফুঁ দিয়ে ছাই সরিয়ে ফেলে এবং তাতে এক কণা ছাইও তার মুখে লাগেনি। অতঃপর মনের খুশিতে সে টাকাগুলি তুলে নেয়।

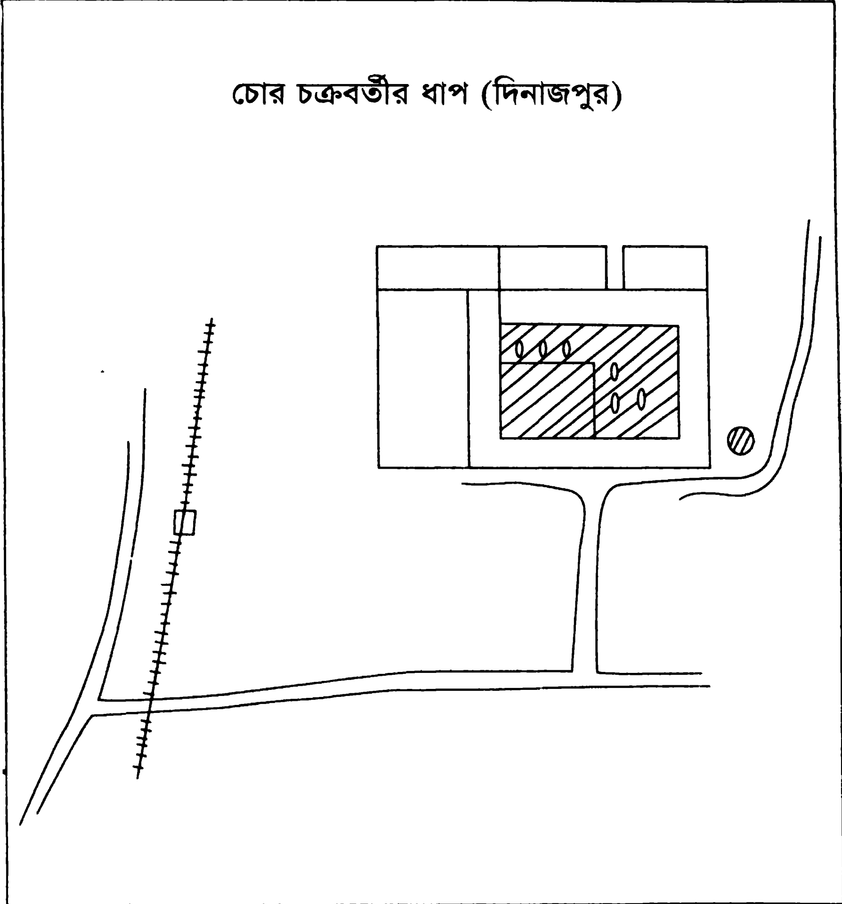
অতি অল্প বয়সে বালকের এহেন চতুরতা দেখে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেন। বালক চৌর্য বিদ্যায় হাত পাকাতে থাকে। বড় হয়ে সে নিজ দেশ ছাড়াও অঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, মিথিলা, ত্রিহুত, পাটলিপুত্র, অবন্তী, মৎস্য, কান্যকুব্জ প্রভৃতি দেশে অতি নিপুণতার সাধে চৌর্যবৃত্তি করতে থাকে এবং অশেষ ধনরত্নের অধিকারী হয়ে সে এখানে প্রাসাদসম এক বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করে। একবার মগধ দেশের পূর্ব প্রান্তে চুরি করতে গিয়ে সে প্রায় ধরা পড়ে যায়। প্রাণভয়ে অশ্বারোহণে অতি দ্রুতগতিতে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করতে থাকলে মগধরাজের সৈন্যরাও তার পিছে পিছে ধাওয়া করেন। ছুটতে ছুটতে সে তার প্রসাদে এসে প্রবেশ করলে পশ্চাদ্ধাবনকারীরা তার প্রাসাদের সামনে এসে তাজ্জব হয়ে বলেন, 'এটাতো রাজ প্রাসাদ, চোর কই?' এবং 'চোরকই' 'চোরকই' বলে তারা চেঁচাতে থাকেন। সেই থেকেই নাকি এ স্থানের নাম হয় চরকাই (<চরকই< চোরকই)।

চোর চক্রবর্তীর ধাপ নামে পরিচিত এ ঢিবি স্থানে স্থানে পাশের সমতল ভূমি থেকে প্রায় ৩ মিটার উঁচু। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ ঢিবির আয়তন প্রায় ১১৫ মিটার × ১০০ মিটার। ঢিবির দক্ষিণ দিক ঘেঁষে প্রায় ১৫০ মিটার দীর্ঘ ও ১২ মিটার প্রশস্ত পরিখা। পশ্চিম দিকের পরিখা প্রায় ১৬০ মিটার দীর্ঘ বর্তমানে প্রায় ২০ মিটার প্রশস্ত। মনে হয় ধানের জমি করতে গিয়ে ঢিবির কিছু অংশ কেটে পরিখার প্রশস্ততা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পূর্বদিকের পরিখা প্রায় ১৫ মিটার প্রশস্ত ও ১০০ মিটার দীর্ঘ। উত্তর দিকের পূর্বাংশে পরিখার পরিবর্তে প্রায় ১/২ একর পরিমিত স্থানে আছে একটি প্রাচীন জলাশয়। পুকুরের পশ্চিম দিকে পরিখা বলতে যা বোঝায়, তা হচ্ছে প্রায় ৩০ মিটার প্রশস্ত একখণ্ড নিচু জমি।

পুকুর ও পুকুরের পশ্চিম দিকের নিচু জমির লাগোয়া উত্তরে প্রায় ২ একর পরিমিত উঁচু ভূমি। এই উঁচু ভূমিতে ইট-পাটকেলের অস্তিত্ব যা আছে, তা অতি সামান্য। এই উঁচু ভূমির লাগোয়া উত্তরেই একটি প্রাচীন মরা নদীর খাত। পূর্ব ও পশ্চিম দিকে অনেক দূর পর্যন্ত সেই খাতের অবস্থান দেখে মনে হয় যে, প্রাচীন করতোয়া নদীর একটি প্রবাহ ছিল সেই খাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত এবং তা পশ্চিম দিকে বিরামপুরের উত্তরে যমুনা নদীতে গিয়ে পড়ত। এ প্রবাহ থেকে একটি খাল কেটে যে চোর চক্রবর্তীর ধাপের পরিখাগুলিতে জল সরবরাহ করা হত, তার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান।

ধাপের দক্ষিণাংশে, প্রায় ৮০ মিটার × ৭০ মিটার পরিমিত স্থানে এখনও কোনো বসতি গড়ে উঠেনি। উত্তর ও পূর্ব দিকের বাকি অংশে বেশ কয়েকটি বাড়িঘর আছে। দক্ষিণ ভাগের তুলনায় উত্তর ভাগ, বিশেষ করে বসতি অঞ্চল অপেক্ষাকৃত নিচু। পূর্ব দিকের বসতি অঞ্চলে ঢিবি কেটে সমতল করতে গেলে একটি বিরাট প্রাচীর বের হয়ে

পড়ে কয়েক বছর আগে। সেই প্রাচীর ৪ মিটার নিচেও শেষ হয়নি। ঢিবির উত্তর-পশ্চিমাংশে (উত্তর দিকের বসতির দক্ষিণ দিকে) কিছু কাল আগে খনিত একটি গর্তে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা পাশাপাশি দুটি প্রাচীর দেখা যায়। এ গর্তের কিছু দক্ষিণে একটি নূতন কূপ খনন করতে গিয়ে দেখা যায় যে, সেখানে ৫ মিটার মাটির নিচেও অব্যবহৃত মাটি (virgin soil) পাওয়া যায়নি।



ঢিবির সর্বত্র অসংখ্য প্রাচীরের ভিত্তি মাটির উপরেই দেখা যায়। এ সমস্ত প্রাচীরের ভিত্তি ঢিবির দক্ষিণ সীমান্ত থেকে উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত সর্বত্রই বিদ্যমান। যে সমস্ত বাড়িঘর ঢিবির উত্তর ও পূর্বাংশে আছে, সেগুলি প্রাচীন ইমারতাদির ভিত্তির উপরেই অবস্থিত।

প্রবল বৃষ্টিপাতের পরেই নাকি এখানে সোনারূপার নানা রকম মুদ্রা পাওয়া যায়। বহু চেষ্টা করেও এখানে প্রাপ্ত কোন মুদ্রার সন্ধান পাওয়া যায়নি। ১৯৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দে সীতাকোট বিহার খননের সময় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এখানে পরীক্ষামূলক কিছু উৎখনন কার্য

চালায়। সামান্য খননের পরে ইমারতের যে কাঠামো বের করা সম্ভব হয়েছে, তাতে ধারণা করা হয় যে, এখানে একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ছিল। পূর্ণ খনন না করে এর সঠিক আয়তন, বয়স ও পরিচয় সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা কঠিন।

এর চোর চক্রবর্তী নাম সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, ইমারতটি বহুকাল আগে পরিত্যক্ত হবার পরে কোনো এক সময়ে হয়ত এখানে চোর-ডাকাতের আড্ডা গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে কোনো একজন হয়ত নিজ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য 'চোর চক্রবর্তী' (অর্থাৎ চোরদের শিরোমণি) আখ্যা লাভ করে। সেই স্বনামধন্য 'চোর চক্রবর্তী' মশায়ের নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে এ স্থানের চোর চক্রবর্তী নামকরণ হয়ে থাকতে পারে এবং পরে এস্থান বোধ হয় এ নামেই পরিচিত হয়ে ওঠে।

বিবির ধাপ ও অন্যান্য কীর্তির ধ্বংসাবশেষ

চোরচক্রবর্তী ধাপের পূর্ব দিকের পরিখার লাগোয়া পূর্ব-দক্ষিণ কোণে ও রাস্তার পাশে প্রায় দেড় বিঘা ভূমির উপর একটি ঢিবি আছে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ ঢিবির উচ্চতা প্রায় ১০ মিটার। ঢিবির মধ্যে ও ঢিবি সংলগ্ন নিম্নভূমিতে অজস্র প্রাচীন ইটের ছড়াছড়ি। লোকে বলেন বিবির ধাপ। এটি ছিল খুব সম্ভব একটি বৌদ্ধ স্তূপ বা মন্দির।

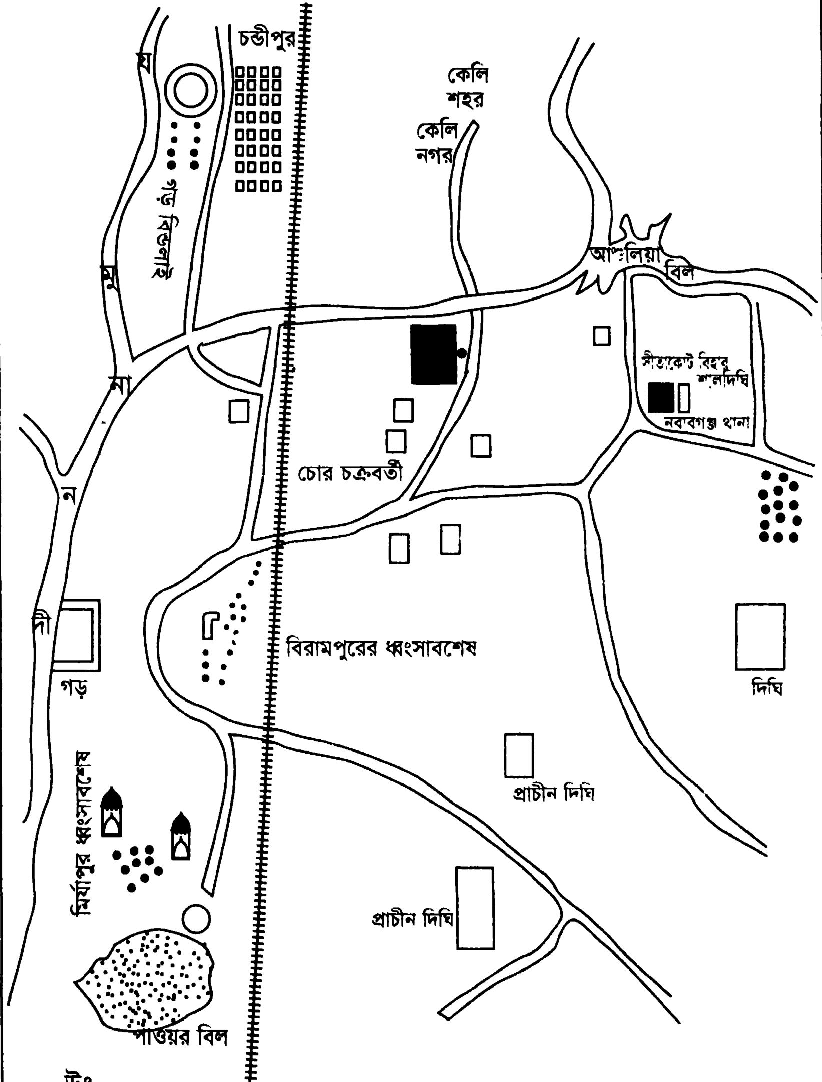
বিবির ধাপকে দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে বেষ্টন করে একটি কাঁচা রাস্তা উত্তরে কেলিশহর হয়ে ফুলবাড়ি পর্যন্ত চলে গেছে। বিবির ধাপের কিছু উত্তরে সে রাস্তা থেকে আর একটি রাস্তা বের হয়ে পূর্ব দিকে ৫ কিলোমিটার দূরে সীতাকোট হয়ে নওয়াবগঞ্জের তর্পণ ঘাট পর্যন্ত চলে গেছে। বিবির ধাপ থেকে উত্তর দিকে প্রায় ১ কিলোমিটার পর্যন্ত রাস্তাটি যে পাকা ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিবির ধাপ থেকে তর্পণঘাট পর্যন্ত সমুদয় রাস্তা পাকা ছিল বলে স্থানীয় বৃদ্ধলোকেরা বলে থাকেন এবং রাস্তার মাঝে মাঝে মাটির নিচে প্রাচীন ইটের অস্তিত্ব দেখে মনে হয় যে বক্তব্যটি সত্য।

বিবির ধাপের কাছাকাছি অঞ্চলে রাস্তার উভয় পার্শ্বে বেশ কয়েকটি প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন দেখা যায়। ক্রমবর্ধমান মানুষের চাপে কীর্তিগুলি প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। প্রায় ৩ বর্গ কিলোমিটার বেশি স্থান জুড়ে যে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তি ছিল, তা বোঝা যায় ধ্বংসস্তূপগুলির অস্তিত্ব দেখে।

বিরামপুর-জম্বুলেশ্বর-মির্যাপুর প্রভৃতি প্রাচীন কীর্তি

গড়ের পাড় থেকে দক্ষিণ দিকে প্রায় ২ কিলোমিটার এলাকায় কয়েকটি প্রাচীন জলাশয় ও সামান্য কিছু প্রত্নকীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। কিন্তু তার পরেই অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির চিহ্ন নজরে পড়ে। গড়ের পাড় থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দক্ষিণে পাওরার বিল। এ বিল এককালে প্রাচীন যমুনা নদীর প্রবাহ ছিল। বিলের উত্তর পাড় ঘেঁষে প্রায় ২ বিঘা জমি জুড়ে প্রায় ১০ মিটার উঁচু একটি ঢিবি আছে।

ঢিবির পূর্বভাগে কোচবিহারের মহারাজা কর্তৃক নির্মিত প্রায় দেড়শ বছর আগের একটি শিবমন্দির নড়বড়ে অবস্থায় এখনও টিকে আছে। মন্দিরে ব্যবহৃত ও আশেপাশে পড়ে থাকা পাথরের স্তম্ভগুলি (pillar), ঢিবিতে যে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে, তারই পরিত্যক্ত স্তম্ভ বলে ধারণা হয়।


চণ্ডীপুর-চরকাই-বিরামপুর-সীতাকোট প্রভৃতি (দিনাজপুর)
চণ্ডীপুর
কেলি শহর
কেলি নগর
বিল
য
মু
না
ন
দী
চোর চক্রবর্তী
নবাবগঞ্জ থানা
বিরামপুরের ধ্বংসাবশেষ
গড়
দিঘি
প্রাচীন দিঘি
প্রাচীন দিঘি
পাওয়র বিল
উঃ
(স্কেল মতো নয়)

ঢিবিটি অত্যন্ত প্রাচীন। ঢিবির সর্বত্র ৩ থেকে ৪ মিটার প্রশস্ত অনেক প্রাচীরের ভিত্তির অস্তিত্ব দেখা যায়। ইমারতের ভিত্তি অথবা সিঁড়ি পাওরার বিলের অনেক ভিতরে চলে গেছে। ঢিবির উত্তর-পূর্ব কোণে নিচের দিকে মোঘল আমলে নির্মিত একটি ছোট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। ঢিবি থেকে প্রায় ১০০ মিটার উত্তরে সমতল ভূমিতে বেশ কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। মন্দিরগুলি মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, কিন্তু ভিত্তির চিহ্ন আছে।

জামেশ্বর বা জম্বুলেশ্বর নামে পরিচিত এ ঢিবির উপরে কাল পাথরে তৈরি ও অপূর্ব শিল্প চাতুর্যবিশিষ্ট একটি হরগৌরীর বিরাট ভগ্নমূর্তি (বর্তমানে দিনাজপুর যাদুঘরে রক্ষিত) ছিল। বেলে পাথরে তৈরি ও অস্পষ্ট একটি দেবী মূর্তি এখনও ঢিবির উপরে থেকে স্থানীয় হিন্দুদের পূজা গ্রহণ করছে। আরও কয়েকটি মূর্তির ধ্বংসাবশেষও অনেক পাথর ঢিবির উপরে আছে।

মির্যাপুরের ধ্বংসাবশেষ

প্রাচীন জম্বুলেশ্বর ঢিবি থেকে প্রায় ৫০০ মিটার উত্তর-পশ্চিমে অসংখ্য প্রত্নকীর্তির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন বহনকারী একটি অতি প্রাচীন স্থান আছে। প্রায় ৩ বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে মাটির উপরে ও নিচে এত ইট-পাথর আছে যে, সেখানে লাঙল দেওয়া যায় না। ফলে সেখানকার বেশির ভাগ ভূমি 'ছনক্ষেত' হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ছনক্ষেত গুলির পূর্ব দিকে এক বিরাট এলাকা জুড়ে বাঁশ বাগান। বাঁশ বাগানের ভিতরে প্রাচীন কালের ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশের ছড়াছড়ি।

সমগ্র স্থান জুড়ে প্রচুর ইট, পাথর ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ থাকলেও এখানে ঢিবির সংখ্যা বেশি নেই। সমগ্র এলাকায় ঢিবির সংখ্যা মাত্র পাঁচটি। এ প্রাচীন স্থানের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত ঢিবিগুলির উচ্চতা পাঁচ থেকে সাত মিটারের বেশি নয়। প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ এ ঢিবিগুলির কোনোটারই আয়তন এক বিঘার বেশি নয়। ঢিবিগুলির উত্তরে আছে একটি বড় ছনক্ষেত। ছনক্ষেতের উত্তর পার্শ্বে প্রায় ১০ মিটার প্রশস্ত একটি বিরাট আকারের পরিখার চিহ্ন আছে। কিন্তু কোনো প্রাচীরের চিহ্ন নেই।

স্থানীয় জনপ্রবাদ মতে মধ্যযুগের সত্যপীরের কাহিনীতে বর্ণিত মহীদল রাজার কন্যা (সত্যপীরের কুমারী মাতা) সন্ধ্যাবতী পিতা কর্তৃক মালঞ্চ থেকে নির্বাসিতা হয়ে নাকি এখানকার কুলবনে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং পরবর্তী কালে সত্যপীর নাকি বিশ্বকর্মার সাহায্যে এখানে একটি নগরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সত্যপীরের গোটা কাহিনীটাই যে কাল্পনিক তাতে সন্দেহ নেই। তদুপরি সে কাহিনী হচ্ছে মুসলিম আমলের। মীর্যাপুরের ধ্বংসাবশেষগুলির মধ্যে সঠিক কাল নিরূপক কোনো প্রত্নবস্তু আজ পর্যন্ত না পাওয়া গেলেও এ স্থান যে মুসলিম আমলের অনেক অনেক আগেকার তাতে কোনো সন্দেহ নেই। খুব সম্ভব জম্বুলেশ্বরের প্রাচীন মন্দিরের সঙ্গে এ স্থান সম্পৃক্ত ছিল।

ইমাম বাড়া

এ ধ্বংসাবশেষের প্রায় ৩০০ মিটার উত্তর-পশ্চিমে যমুনা নদীর পূর্ব তীরে একটি বিচিত্র ধরনের ইমারত আছে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ৪ মিটার × ৩ মিটার আয়তনের এ ইমারতের

পাকা ছাদ বাংলাদেশের দোচালা ঘরের মতো। এতে একটি মাত্র দরজা আছে এবং তা হচ্ছে পূর্ব দিকে। দক্ষিণ দিকের দেয়াল ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে বোঝার উপায় নেই, সেদিকে কোনো দরজা ছিল কিনা। ভিতরে কোনো মিহরাব নেই। বাইরের দিকে দেয়ালের কার্নিশের উপর জোড়া টিয়া পাখীর মূর্তি পলেস্তারার উপর নির্মিত। ভাল করে না দেখলে মানুষের মূর্তি বলে ভ্রম হয়। মোঘল আমলে তৈরি এই ছেট ইমারতটি ছিল খুব সম্ভব শিয়াদের ইমাম বাড়া জাতীয় কোন ইমারত। সামনে প্রশস্ত মাঠ এবং মাঠের একাংশে গোরস্থান। এখানে আগে মহররমের উৎসব হত বলে জানা যায়। এই ইমারত মোখল আমলে নির্মিত।

চরকাই-বিরামপুর অঞ্চল ও পঞ্চনগরী

দামোদরপুরে প্রাপ্ত গুপ্ত আমলের পাঁচখানা তাম্রলিপি, বৈগ্রামে প্রাপ্ত কুমারগুপ্তের আমলের একখানা তাম্রলিপি ও বেলোয়াতে প্রাপ্ত প্রথম মহীপাল ও তৃতীয় বিগ্রহ পালের আমলে প্রদত্ত দু'খানা তাম্রলিপি পাঠে জানা যায়, গুপ্ত যুগ (৫ম শতাব্দী) থেকে আরম্ভ করে প্রথম মহীপালের রাজত্ব কাল (৯৮৮-১০৩৮ খ্রিঃ) পর্যন্ত পুন্ড্রবর্ধন (মহাস্থান গড়) ভুক্তির অধীনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কোটিবর্ষ ও পঞ্চনগরী নামক দুটি বিষয় ছিল। কোটিবর্ষ বিষয় ছিল ভারতের পশ্চিম দিনাজপুরের অন্তর্গত গঙ্গারামপুর থানার নিকটবর্তী বাণগড় বা কোটিবর্ষ নামক স্থানে।

পঞ্চনগরী বিষয় কোথায় ছিল, তা আজ পর্যন্ত নির্ধারিত হয়নি। গ্রীক ইতিহাসে বর্ণিত পেন্টাপলিস (P.entapolis) এবং গুপ্ত ও পালযুগের বিভিন্ন তাম্রলিপিতে উল্লিখিত পঞ্চনগরী যে অভিন্ন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেক্ষেত্রে পঞ্চনগরীর অস্তিত্ব যে কমপক্ষে এক হাজার বছর পর্যন্ত টিকে ছিল তা ধরে নেওয়া যেতে পারে। প্রথম মহীপালের রাজত্বের পর পরই যে পঞ্চনগরীর অবনতি ঘটে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রথম মহীপাল ও তৃতীয় বিগ্রহ পালের (১০৫৫-৭০ খ্রিঃ) বেলওয়া তাম্রলিপি থেকে (পরে বেলওয়া দ্র.)।

বাণগড় তাম্রলিপি ও দামোদরপুর তাম্রলিপিগুলি থেকে জানা যায় যে, কোটিবর্ষ বিষয়ের পূর্ব সীমানা ছিল খুব সম্ভব ফুলবাড়ি থানার পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত করতোয়া নদী এবং করতোয়ার যে প্রবাহটি বিরামপুরের উত্তরে যমুনা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল, তা বোধ হয় ফুলবাড়ি-বিরামপুর অঞ্চলে কোটিবর্ষ বিষয়ের দক্ষিণ সীমা নির্দেশ করত (চোর চক্রবর্তী দ্র.)। এর পরে যমুনা নদীই ছিল কোটিবর্ষ বিষয়ের পূর্ব সীমানা। দামোদরপুর তাম্রলিপির চণ্ডীগ্রাম খুব সম্ভব বর্তমান চণ্ডীপুর (চণ্ডীপুর-গড় পিঙলাই দ্র.)। আর বায়িগ্রাম যে ফুলবাড়ির ৩ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত বৈগ্রাম (বৈগ্রাম দ্র.) তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

বৈগ্রাম ও বেলওয়া তাম্রলিপিদ্বয় (বেলওয়া ও পরে বৈগ্রাম দ্র.) থেকে ধারণা করা যায় যে, পঞ্চনগরী বিষয়ের পশ্চিম সীমানা ছিল খুব সম্ভব প্রাচীন যমুনা নদী এবং উত্তর ও পূর্ব সীমানা ছিল খুব সম্ভব যথাক্রমে করতোয়া নদীর একটি প্রবাহ (চোরচক্রবর্তী দ্র.) ও করতোয়া নদী। দক্ষিণ দিকে এ বিষয়ের সীমানা কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল, তার

সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে পুণ্ড্রবর্ধনের নিকটবর্তী অঞ্চলে শিলবর্ষ নামক একটি বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। এ বিষয়ের উত্তরেই ছিল খুব সম্ভব পঞ্চনগরীর দক্ষিণ সীমানা।

উপরের আলোচনা থেকে ধারণা করা যায় যে, দিনাজপুর জেলার নওয়াবগঞ্জ থানার প্রায় সম্পূর্ণ এলাকা, ঘোড়াঘাট থানার সম্পূর্ণ অংশ, হাকিমপুর ও বিরামপুর থানার অধীনে যমুনা নদীর পূর্বতীরবর্তী এলাকা, রংপুর জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার অধীনে করতোয়ার পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চল, বগুড়া জেলার ক্ষেতলাল ও পাঁচবিবি থানা দ্বয়ের সমগ্র অঞ্চল এবং জয়পুর হাট থানার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল খুব সম্ভব পঞ্চনগরী বিষয়। এবং এইসীমারেখার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল এ বিষয়ের প্রশাসনিক কেন্দ্র পঞ্চনগরী।

এই সমগ্র এলাকায় অনেকগুলি প্রাচীন জনপদ আছে। সেগুলির মধ্যে সীতাকোট-নওয়াবগঞ্জ, চকজুনিদ-দারিয়া, ভাদুরিয়া-হরিনাথপুর, বেলওয়া-পল্লরাজ, ঘোড়াঘাট-বোগদহ-সাহেবগঞ্জ, বিরাটনগর, টুঙ্গিশহর, পাথরঘাটা (মাহীগঞ্জ) ও চরকাই-বিরামপুরের নাম বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এগুলির মধ্যে নানা কারণে পাথর ঘাটা ও চরকাই-বিরামপুরের মধ্যে একটিকে পঞ্চনগরী বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

বগুড়া জেলার পাঁচবিবি থানার অধীনে পাথরঘাটার (পরে পাথরঘাটা দ্র.) প্রায় ১০ বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে যে অসংখ্য প্রত্ন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, তাতে অতি সহজেই ধারণা করা যায় যে, এককালে এখানে একটি বিশাল জনপদের অস্তিত্ব ছিল। এ বিরাট নগরীকে কোনো বিষয়ের প্রশাসনিক কেন্দ্রস্থল হিসাবে ধরে নিতে কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু এ স্থানকে পঞ্চনগরী বলে ধরে নিতে যথেষ্ট অসুবিধা আছে বলে মনে হয়।

পঞ্চনগরী বা পেন্টাপলিস নাম থেকে অতি সহজেই ধারণা করা যায় যে, পঞ্চ অর্থাৎ পাঁচটি নগরী বা জনপদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল এ স্থান। সেক্ষেত্রে পাথর ঘাটার পক্ষে পঞ্চনগরী হতে বিরাট বাধা আছে। যত বৃহৎই হোক না কেন, পাথরঘাটা ছিল একক নগরী, ভিন্ন ভিন্ন ৫টি নগরের সমন্বয়ে গঠিত নয়।

এদিক থেকে বিচার করতে গেলে চরকাই-বিরামপুরকে পঞ্চনগরী বলে ধরে নেওয়া অধিক যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। চরকাই-বিরামপুর এলাকায় ৫টি ভিন্ন ভিন্ন অথচ একত্রে সংযোজিত নগরের ধ্বংসাবশেষ বেশ পরিষ্কারভাবে বিদ্যমান। চণ্ডীপুর-গড় পিঙলাইকে কোটিবর্ষ বিষয়ের অধীনে ধরে বাদ দিলেও আরও ৫টি স্বতন্ত্র নগরীর চিহ্ন সহজেই ধরা পড়ে। এগুলি ছিল নিম্নরূপ (১) চোর চক্রবর্তী ধাপের কিছু পশ্চিম থেকে আরম্ভ করে উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে অবস্থিত প্রায় ৪ বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে ছিল একটি জনপদ; (২) এই জনপদের পশ্চিম দিকে যমুনা নদীর পূর্ব তীর পর্যন্ত যে এলাকায় বর্তমান রেলস্টেশন, গঞ্জ ও শহর অবস্থিত সেখনে ছিল খুব সম্ভব দ্বিতীয় নগর; (৩) রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে বিরামপুর কলেজের দক্ষিণ পর্যন্ত রেল লাইনের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত প্রায় ৮বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে ছিল খুব সম্ভব তৃতীয় জনপদ; (৪) কলেজ এলাকার দক্ষিণে অবস্থিত গড়ের পাড়, বেগমপুর ইত্যাদি মৌজা নিয়ে গঠিত ছিল খুব সম্ভব চতুর্থ জনপদ; আর (৫) পঞ্চম জনপদটি ছিল খুব

সম্ভব জম্বুলেশ্বর ও মীর্যাপুর এলাকার (জম্বুলেশ্বর ও মীর্জাপুর দ্র.)। এ পঞ্চ জনপদের সমন্বয়ে গঠিত পঞ্চনগরী ছিল প্রায় ৪০ বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে এক বিশাল জনপদ। এর কেন্দ্র ছিল খুব সম্ভব তৃতীয় জনপদটিতে। প্রাচীন জম্বু নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত এ নগরের খ্যাতি সুদূর ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

সীতাকোট বিহার

চরকাই-বিরামপুর থেকে ৪.৫ কিলোমিটার পূর্বে ও নওয়াবগঞ্জ থেকে ১.৫ কিলোমিটার পশ্চিমে ফতেপুর-মাড়াশ মৌজায় অবস্থিত সীতাকোট বিহার এতকাল ধরে দ্বিতীয়বার বনবাস কালে বাল্মীকি মুনির আশ্রয়ে সীতার বাসস্থান হিসাবে পরিচিত ছিল। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও এস্থানকে উক্ত নামে পরিচিত করে গেছেন। মিঃ ওয়েস্টমেকট এ স্থানকে একটি মজে যাওয়া বাঁধান পুকুর বলে অভিহিত করে গেছেন।

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে এখানে উৎখনন কার্য করা হয়।[১] আংশিক খননের পরে দেখা যায়, সীতার আশ্রয়স্থল বলে কথিত এ স্থান একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ। গ্রন্থকারের বিশেষ অনুরোধে প্রত্ন বিভাগ ১৯৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দে এখানে পুনরায় উৎখনন কার্য করে এবং খনন কার্য সম্পূর্ণ না হলেও তা বিহার সম্পর্কে মোটামুটিভাবে একটি ধারণার সহায়ক হয়েছে।

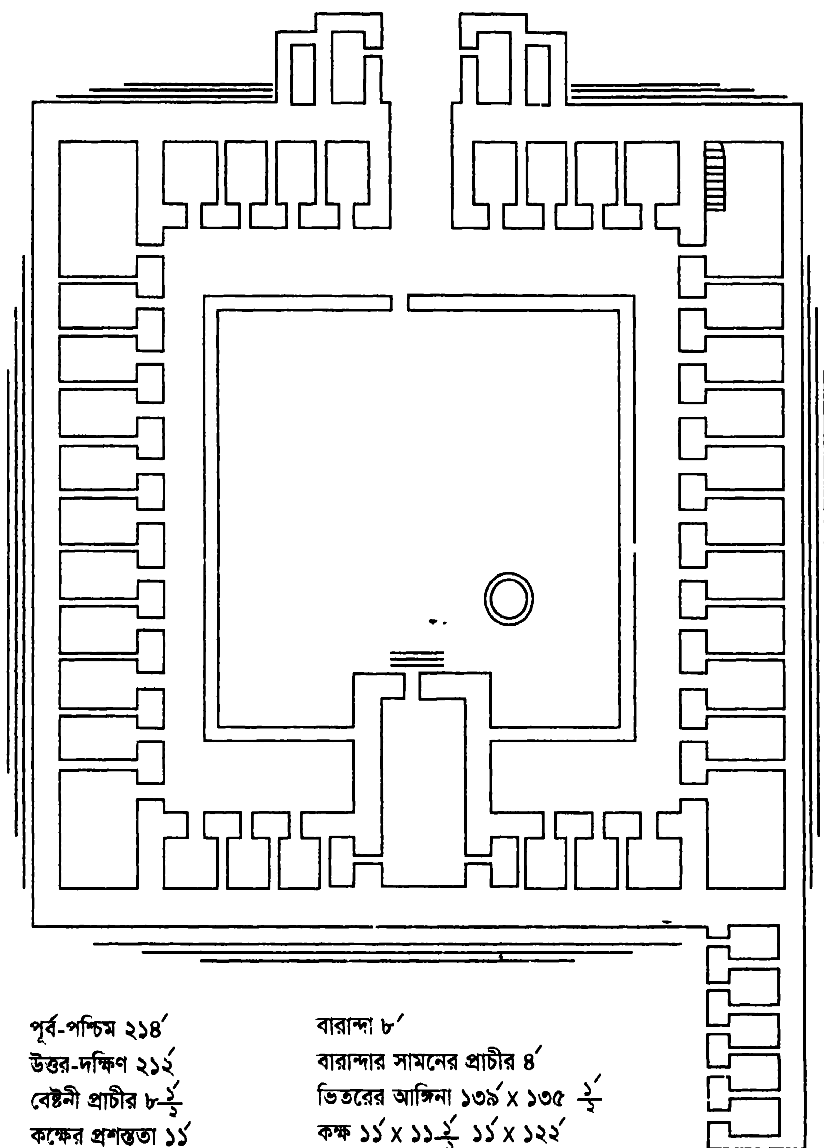
দুর্গাকারে নির্মিত প্রায় বর্গাকৃতির এ বিহার পূর্ব-পশ্চিমে '২১৪ ফুট ও উত্তর দক্ষিণে ২১২ ফুট লম্বা' ছবি। উত্তর বাহুর ঠিক মধ্য স্থলে বিহারের '৬ ফুট' প্রশস্ত প্রধান প্রবেশ পথ। প্রবেশপথের সম্মুখে একটি উদগত (Projected) অংশে '১৪½ × ১১½ ফুট' আয়তনের ২টি প্রবেশকক্ষ। এ দুটি কক্ষের সঙ্গে সংলগ্ন প্রায় অনুরূপ আয়তনের আরও ২টি কক্ষ আছে। দরজা-জানালাহীন এ দুটি কক্ষ কি উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল তা নির্ধারণ করা যায়নি।

সমগ্র বিহারে ছোট-বড় সর্বমোট ৪১টি কক্ষ আছে। কক্ষগুলি '২২ × ১১' ফুট থেকে '১১½ × ১১' ফুট আয়তনের। কক্ষগুলির পিছেন '৮½ ফুট' প্রশস্ত যে টানা প্রাচীর আছে, তাতে কোনো দরজা-জানালা নেই। এ দেয়ালের বাইরের দিকে মাঝে মাঝে '৫ ইঞ্চি' পরিমিত উদগত (offset) অংশ বেশ নিপুণভাবে করা আছে। এতে বিহারের বাইরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পিছনের দেয়ালের উচ্চতা '৪ ফুট থেকে ১২ ফুট' পর্যন্ত এখনও টিকে আছে। এ দেয়াল থেকে ভিন্ন ভিন্ন দেয়াল সৃষ্টি করে বিহারের কক্ষগুলি সারিবদ্ধ ও সুবিন্যস্তভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। এ দেয়ালগুলির কোনোটা '১৩ ফুট' আবার কোনোটা '৪ থেকে ৫ ফুট' প্রশস্ত। কক্ষগুলির সামনের দেয়াল '৫ ফুট' প্রশস্ত। প্রত্যেক কক্ষে একটি মাত্র প্রবেশপথ। এ প্রবেশপথগুলি '৩ থেকে ৫ ফুট' প্রশস্ত।

১. দিনাজপুর জেলা পরিষদের আর্থিক সহায়তায়, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহযোগিতায় এবং দিনাজপুরে প্রশাসন কার্যে নিয়োজিত গ্রন্থকারের সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে এই আধা-সরকারি উৎখনন কাজ করা হয়েছিল।—গ্রন্থকার।

সীতাকোট বিহার

(স্কেল মতো নয়)



প্রত্যেক কক্ষের মেঝে সুরকির মসলা দ্বারা শক্তভাবে পাকা করা ছিল। কক্ষগুলির সামনের দেয়াল ছাড়া বাকি ৩ দেয়ালে কুলঙ্গি (niche) ছিল। এগুলিতে খুব সম্ভব নিবেদিত মূর্তি, প্রদীপ, পুঁথি ইত্যাদি রাখা হত। সামনের দেয়ালের বাইরের দিকে যে কুলঙ্গি দেখা যায়, সেগুলি খুব সম্ভব প্রদীপ রাখার জন্য ব্যবহৃত হত। কক্ষগুলিতে কোনো জানালা ছিল না, কিন্তু বায়ু-পথ (ventilator) ছিল।

কক্ষগুলির সামনে যে '৮ ফুট' প্রশস্ত টানা বারান্দা আছে, তার মেঝে সুরকি-দ্বারা পাকা করা। বারান্দার শেষ প্রান্তে ছিল '৪ ফুট চওড়া ও ১ফুট উঁচু' একটি টানা দেয়াল। সেই দেয়ালের মাঝে মাঝে ছিল ভিতরের আঙ্গিনায় যাবার সিঁড়ি। বারান্দার উপরে কোনো ছাদ ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এই টানা বারান্দা দ্বারা পরিবেষ্টিত '১৩৯ ফুট × ১৩৫$\frac{১}{২}$ ফুট আয়তনের ভিতরের আঙ্গিনা। সমগ্র আঙ্গিনা সুরকি দ্বারা শক্তভাবে পাকা করা। দক্ষিণ-পূর্ব কোণের দিকে চাকের তৈরি একটি কূপ আছে। অনেক গভীরে খননের পরেও কূপের ভিতরে মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি। এতে ধারণা হয় যে, বিহারের শেষ জীবনে কূপটি পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং এর মধ্যে ভাঙ্গা হাঁড়ি-পাতিল ফেলে দেওয়া হত।

সামান্য একটু অংশ ছাড়া বিহারের ছাদ পাওয়া যায়নি। তবে সুরকির তৈরি ছাদের ধ্বসে পড়া মাল-মসলা পাওয়া গেছে প্রচুর। প্রত্যেক কক্ষে সুরকির তৈরি বড় বড় ঢেলা, লোহার পেরেক ও খিল পাওয়া গেছে প্রচুর পরিমাণে। এতে ধারণা হয় যে, পেরেক ও খিলের সাহায্যে সংযোজিত কাঠের কড়ি ও বর্গার উপর সুরকি দ্বারা নির্মিত সমতল ছাদ ছিল উপরিভাগে। এ বিহারের একাধিক তল ছিল কিনা বলা কঠিন। এখন পর্যন্ত যে সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গেছে, তাতে দেখা গেছে যে, ছাদে যাওয়ার এক মাত্র সিঁড়ি ছিল উত্তর-পূর্বে কোণের কক্ষটিতে। এতে ধারণা করা হয় যে, বিহারটি খুব সম্ভব একতল বিশিষ্ট ছিল।

শালবন বা পাহাড়পুর বিহারের মতো সীতাকোট বিহারে কোনো কেন্দ্রীয় উপাসনালয় (central shrine) নেই। পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম বাহুর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ৩টি কক্ষে বেদী ইত্যাদির অবস্থান দেখে ধারণা করা যায় যে, এ তিনটি কক্ষ উপাসনালয় রূপে ব্যবহৃত হত। পশ্চিম ও পূর্ব বাহুর উপাসনালয় দুটি ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের। দক্ষিণ বাহুর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত যে বড় কক্ষটি আছে, সেটিই ছিল খুব সম্ভব সমগ্র বিহারের প্রধান উপাসনালয়।

এ বিহারে দুই পর্যায়ে নির্মাণ এবং আর এক পর্যায়ে মেরামত কার্য হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথম পর্যায়ে নির্মিত দক্ষিণ বাহুর মন্দির কক্ষটি এমনভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল যে, তখনকার বেদী ইত্যাদির আয়তন বের করা কঠিন। দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন বিহারটি পুনর্নির্মিত হয়, তখন এ মন্দির কক্ষের সম্মুখভাবে '৪৯ ফুট × ২৭ ফুট' আয়তনের একটি মঞ্চ নির্মাণ করা হয়। ১২ টি স্তম্ভের উপরে মঞ্চের ছাদ নির্মিত ছিল। এতে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্মাণ কার্য ছিল বৃহদাকারের। সে সময়ে প্রথম পর্যায়ে নির্মিত মেঝে ব্যবহার না করে, তা ভরাট করে বেশ উঁচুতে দ্বিতীয় পর্যায়ের মেঝে নির্মিত হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে ছাদও খুব সম্ভব নতুন করে করা

হয়েছিল। তৃতীয় পর্যায়ে বিহারে যে প্রচুর মেরামত কাজ করা হয়েছিল, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এর পরে বিহারে আর কোনো নির্মাণ বা মেরামত কার্য করা হয়নি এবং বিহারটি পরিত্যক্ত হয়েছিল বলে ধারণা হয়।

স্বাভাবিক কারণে পরিত্যক্ত হবার দরুণ এ বিহারে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো প্রত্নবস্তু পাওয়া যায়নি। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের উৎখননের সময় ভিতর অঙ্গনের স্তূপীকৃত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দুটি ছোট ব্রোঞ্জ মূর্তি (একটি লোকেশ্বর পদ্মপাণি ও অপরটি মঞ্জুশ্রী) পাওয়া যায়। মূর্তি দুটি দিনাজপুর যাদুঘরে রক্ষিত থাকাকালীন ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানী বাহিনী কর্তৃক অপহৃত হয়।

১৯৬৮ সালের উৎখননের পর বিহারে প্রাপ্ত অসংখ্য মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশের মধ্যে কয়েকটি এন. বি. পি-র টুকরা ছিল বলে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্মকর্তারা বলেছিলেন। এগুলি সম্পর্কে পরে বিতর্কের সৃষ্টি হয়, কিন্তু মহাস্থান যাদুঘরে রক্ষিত এ প্রত্নবস্তুগুলি পরে হারিয়ে যাওয়ায় এ বিতর্কের কোনো নিষ্পত্তি হয়নি।

আরও যে সমস্ত প্রত্নবস্তু এখানে পাওয়া গেছে সেগুলি হচ্ছে নানা ধরন ও আকারের মৃৎপাত্র ও সেগুলির ভগ্নাংশ, লোহার পেরেক ও খিল, নানা ধরণের দোয়াত, নানা ধরনের মাটির পুতুল, মাটির তৈরি নকসা করা মাছ, নানা রকম নক্সা করা অসংখ্য ইট ইত্যাদি ইত্যাদি। কোনো তাম্রলিপি, শিলালিপি, প্রাচীন মুদ্রা বা কোনো পোড়ামাটির চিত্র ফলক সেখানে পাওয়া যায়নি।

বহু অর্থ ব্যয়ে ও বেশ শক্তভাবে নির্মিত হলেও এ বিহারের শিল্প চাতুর্য তেমন উৎকৃষ্ট ধরনের নয়। বিহারে পোড়ামাটির চিত্রফলক ও কেন্দ্রীয় উপাসনালয়ের অনুপস্থিতি বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। গঠনপ্রণালী, শিল্পচাতুর্যের নিকৃষ্ট মান ও অন্যান্য কারণে ধারণা করা যায় যে, এ বিহার খুব প্রাচীন। খুব সম্ভব পঞ্চম শতাব্দীতে কি তার কিছু পরে এ বিহার নির্মিত হয়েছিল।

নওয়াবগঞ্জ ও তর্পণঘাট

নওয়াবগঞ্জ নামকরণ মুসলিম আমলে হলেও এ স্থানের ঐতিহ্য যে অন্তত পক্ষে বৌদ্ধ-হিন্দু যুগের সঙ্গে জড়িত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মৃতপ্রায় করতোয়া নদীর দক্ষিণ তীরে ও জেলা পরিষদ ডাক বাংলার উত্তর অবস্থিত তপর্ণঘাট উত্তর বঙ্গের প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। এখানে নাকি বাল্মীকি মুনি তর্পণ করেছিলেন। জনপ্রবাদ ভিত্তিক এ কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসের কোনো সম্পর্ক না থাকলেও এ স্থানে যে বহু প্রাচীন কাল থেকে অনেক ইমারতাদির অস্তিত্ব ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রায় ৩ একর পরিমিত এ ভূমির নিচে অসংখ্য প্রাচীন ইট প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত থেকে। মেলাভূমির উত্তরাংশে করতোয়া নদীর তীরে মাটির নিচে এত ইট আছে যে, সেখানে মেলায় আগত তীর্থ যাত্রীরা চুলা পর্যন্ত খুঁড়তে পারেনা। তর্পণঘাটে একটি বাঁধান ঘাটের চিহ্ন পাওয়া যায়। এ ঘাট নদীর বেশ অভ্যন্তরে চলে গেছে। চোরচক্রবর্তী (চোর চক্রবর্তী দ্র.) থেকে সীতাকোট বিহার হয়ে যে প্রাচীন পাকা রাস্তাটি তর্পণঘাট পর্যন্ত চলে এসেছে, সে রাস্তা ধরে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বোধ

হয় তর্পণ ঘাটে দল বেঁধে আসতেন বিশেষ বিশেষ তিথিতে। তর্পণঘাট ছিল বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত, রামায়ণের বাল্মীকি মুনির সঙ্গে নয়। তিনি এদেশে এসেছিলেন, এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তর্পণঘাটের পূর্ব সীমানা থেকে আরম্ভ করে পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণ দিকে প্রায় তিন বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ অসংখ্য প্রাচীন ঢিবি দেখা যায়। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের দিকে এ সমস্ত ঢিবির সংখ্যা ছিল প্রায় একশ'র কাছাকাছি। কিন্তু ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ঢিবির সংখ্যা কমে গিয়ে একান্নতে দাঁড়ায়। বর্তমানে ঢিবির সংখ্যা দশও হবে কিনা সন্দেহ। রাস্তার উত্তর পার্শ্বে এবং নদীর তীরবর্তী স্থানের ঢিবিগুলি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বের ঢিবিগুলি থেকে ইট হরণকারীরা ইট সরিয়ে নিয়ে গেছে। বর্তমানে পড়ে আছে শুধু মাটির স্তূপ। রাস্তার উত্তর পাশে 'লব কুশের পাঠশালা' বলে পরিচিত প্রায় ২ বিঘা ভূমির উপর প্রায় ৮ মিটার উঁচু একটি ঢিবি ছিল। ইট সরিয়ে নিয়ে যাবার পর দেখা গেছে যে সেখানে একটি বিরাট বৌদ্ধ স্তূপ ছিল।

রাস্তার দক্ষিণ পাশে প্রায় ৪০ টি ঢিবির অবস্থান ছিল খুব কাছাকাছি। একটি বড় ঢিবিকে কেন্দ্র করে চার পাশে ৭টি ছোট বড় ঢিবি ছিল। বড় ঢিবিটি প্রায় ২ বিঘা জমির উপর অবস্থিত ছিল এবং উচ্চতা ছিল প্রায় ৮মিটার। এ ঢিবি থেকেও হালে ইট সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং এটি যে একটি বিরাট বৌদ্ধ স্তূপ ছিল, তা ধরা পড়েছে।

এ ঢিবির প্রায় ১০০ মিটার পূর্ব-দক্ষিণে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা প্রায় ১০ একর আয়তনের একটি মজে যাওয়া প্রাচীন জলাশয় আছে। জলাশয়ের উত্তর ও পশ্চিম পাড়ে আরও অনেক ঢিবি ছিল। এ জলাশয়ের প্রায় ২০০ মিটার পূর্ব দিকে উঁচু পাড় বিশিষ্ট একটি প্রাচীন জলাশয় আছে। এ জলাশয়ের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে অনেকগুলি ছোট বড় ঢিবি। জলাশয়ের উত্তর দিকে কয়েক ঘর সাঁওতালের নিবাস। এরা অনেক ঢিবি নষ্ট করে বসতি স্থাপন করেছেন। তাদের বসতির পূর্ব-দক্ষিণ দিকে একটি মরা নদীর খাতের দক্ষিণ পাড়ে অনেক ক'টা অনুচ্চ ঢিবি আছে এবং ঢিবিগুলি প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ। এ অঞ্চলের সবগুলি ঢিবিই প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ।

এ ঢিবিগুলিতে যে বৌদ্ধ স্তূপ ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাতে ধারণা করা যায় যে, এ স্থান ছিল বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র। সঠিক সময় নির্ধারক কোনো প্রত্ন প্রমাণের অভাবে এই স্তূপগুলির সঠিক বয়স নির্ণয় না করা গেলেও এগুলি যে সীতাকোট বিহারের সমসাময়িক ছিল, তা অনুমান করা যায়। পাল আমলেও খুব সম্ভব এ স্থানের প্রাধান্য ছিল।

হরিনাথপুর-ভাদুরিয়া

নওয়াবগঞ্জ থানা থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত ভাদুরিয়া নামক প্রাচীন স্থানকে জনপ্রবাদমতে ভাতুরিয়ার রাজা গণেশের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। এখানে কোনো প্রাচীন দুর্গ বা ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষ না থাকলেও এখানে অবস্থিত অসংখ্য প্রাচীন জলাশয় এ স্থানের প্রাচীনতার সাক্ষ্য বহন করে।

ভাদুরিয়া থেকে প্রায় ৩½ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে শালবনের মধ্যে অবস্থিত হরিনাথপুর নামক প্রাচীন স্থান জনপ্রবাদমতে রাজা গণেশের রাজধানী। ভাদুরিয়া ও হরিনাথপুর যে রাজা গণেশের বহু আগেকার, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

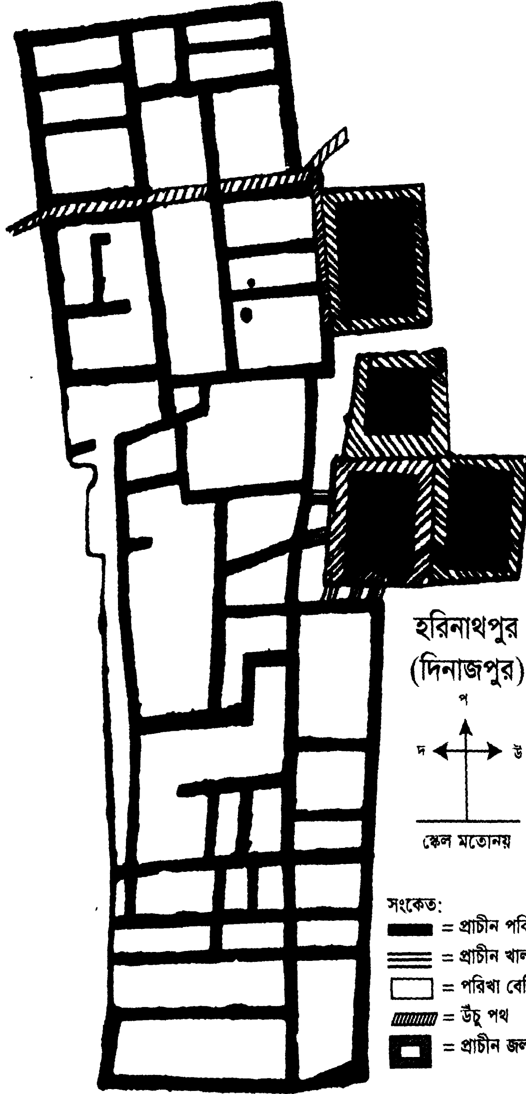
হরিনাথপুরের ধ্বংসাবশেষগুলি বড়ই বিচিত্র ধরনের। প্রায় ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ও প্রায় এক কিলোমিটার প্রশস্ত স্থানে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ৪টি পরিখা এবং পূর্ব-পশ্চিমে আড়াআড়ি ২২ টি পরিখা (moat) আছে। পরিখাগুলি ৮ থেকে ১৫ মিটার প্রশস্ত। বর্তমানে ধানের জমিতে রূপান্তরিত পরিখাগুলি কত গভীর ছিল, তা বলা কঠিন। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা পরিখাগুলি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা পরিখাগুলিকে আড়াআড়িভাবে পরস্পরকে অতি ক্রম করে ৮৪টি আয়তক্ষেত্রের সৃষ্টি করেছিল। আয়তক্ষেত্রগুলির আয়তন ছিল ৩ থেকে ১৫ একর।

অনেকগুলি আয়তক্ষেত্রে, বিশেষ করে সমগ্র এলাকার মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত আয়তক্ষেত্রগুলিতে অনেক প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ছিল। এখানে জনবসতি গড়ে ওঠায় মাটির উপরে প্রাচীন কীর্তির সব চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু মাটির নিচে অসংখ্য প্রাচীন ইট ও ইমারতের ভিত্তি পাওয়া যায়। ইটগুলি বিভিন্ন মাপের এবং অত্যন্ত প্রাচীন।

এই আয়তক্ষেত্রগুলির পূর্বদিকের মাঝামাঝি স্থানে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ৪টি প্রাচীন জলাশয় আছে। উত্তরের জলাশয়টি সবচেয়ে বড়। আয়তনে প্রায় ৫ একর। পশ্চিম পাড়ের মাঝামাঝি স্থানে বাঁধান ঘাট ছিল। ঘাটের বাইরে পশ্চিম দিকে একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ঘাট থেকে পশ্চিম দিকে আয়তক্ষেত্রগুলির দিকে যাবার জন্য একটি বাঁধান রাস্তা ছিল। তার কিছু কিছু চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। এ জলাশয়ের নাম রাজার পুকুর। রাজার পুকুরের দক্ষিণে যে দুটি পুকুর আছে, সেগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের।

পরিখা বেষ্টিত স্থানের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত জেলা পরিষদের রাস্তার লাগোয়া পশ্চিমে একটি প্রকাণ্ড সমতলভূমি আছে। লোকে বলে রাজার ঘোড় দৌড়ের মাঠ। সে মাঠে কোনো ইট-পাথরের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু মৃৎপাত্রের প্রচুর ভগ্নাংশ আছে। এ মাঠের কাছেই মাঝারি আকারের একটি প্রাচীন মজে যাওয়া জলাশয়।

এ মাঠের উত্তরে শালবনের ভিতরে ছোট ছোট ৩টি দুর্গ আছে। দুর্গগুলির এক একটার আয়তন প্রায় ২৫ একর। চারদিকে প্রায় ৩ মিটার উঁচু মাটির প্রাচীর। প্রাচীর সংলগ্ন পরিখা প্রায় ৬ মিটার প্রশস্ত। পরিখাগুলি একটি গভীর খালের সঙ্গে সংযুক্ত এবং সে খাল পূর্ব মুখে চলে গেছে এবং খুব সম্ভব কয়েক মাইল দূরে করতোয়ার একটি প্রাচীন খাতে গিয়ে শেষ হয়েছিল। গড়গুলির ভিতরে শালবন। কোনো ইমারতের চিহ্ন বা কোনো দীর্ঘস্থায়ী বসতির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। এগুলি খুব সম্ভব পরবর্তীকালের।


হরিনাথপুরের ধ্বংসাবশেষ
হরিনাথপুর
(দিনাজপুর)
প
দ
উ
স্কেল মতোনয়
সংকেত:
= প্রাচীন পরিখা
= প্রাচীন খাল
= পরিখা বেষ্টিত উঁচুভূমি
= উঁচু পথ
= প্রাচীন জলাশয়

হরিনাথপুরের ধ্বংসাবশেষ

হরিনাথপুরের ধ্বংসাবশেষগুলির মধ্যে যে অভিনবত্ব দেখা যায়, তার নযীর মেলে একমাত্র বেলওয়ার (পরে বেলওয়া দ্র.) ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। প্রাচীন ও মধ্য যুগে প্রতিরক্ষার জন্য দুর্গ নির্মাণ করা হত। দুর্গের চারদিকে থাকত মাটি বা ইটের তৈরি বেষ্টনী প্রাচীর। প্রাচীরের বাইরে থাকত গভীর ও জলপূর্ণ পরিখা। এখানে যে ৩টি দুর্গের কথা আগে বলা হয়েছে, সেগুলি ছিল এ ধরনের। কিন্তু এ দুর্গ তিনটির কোনটিতেই কোন ইমারত ছিল না। অথচ অসংখ্য ইমারতের ধ্বংসাবশেষ যেখানে পাওয়া গেছে, সেখানে অসংখ্য পরিখা আছে, কিন্তু কোনো প্রাচীরের চিহ্ন নেই, ছিল এমন কোনো প্রমাণও নেই।

৮৪টি আয়তক্ষেত্রকে পরিবেষ্টনকারী পরিখাগুলি যে মানুষের সৃষ্টি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একমাত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে এগুলি সৃষ্ট হয়েছিল বলে ধারণা করা কষ্টকর। এই অভিনব ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেখে মনে হয় যে, এগুলির যখন সৃষ্টি হয়েছিল, প্রচলিত অর্থাৎ দুর্গাকারের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কথা হয়ত তাদের জানা ছিল না। কিন্তু এখানে প্রাপ্ত বিভিন্ন মাপের ইটগুলি সীতাকোট বিহার ও নওয়াবগঞ্জের স্তূপগুলির ইটের মতোই। সে সময়, এমনকি তার আগের সময়েরও অনেক দুর্গ বাংলাদেশে দেখা যায়। হরিনাথপুর ও বেলওয়ার এই প্রাচীরহীন পরিখাগুলি কেন সৃষ্ট হয়েছিল, তা এক দুর্বোধ্য ব্যাপার।

বেলওয়া

প্রায় ৯ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অসংখ্য প্রাচীন ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ বেলওয়া গ্রামের প্রাচীনত্ব প্রশ্নাতীত। অসংখ্য প্রাচীন দিঘি-পুষ্করিণীর অবস্থান এখানে। প্রাচীন মজে যাওয়া জলাশয়গুলি বাদ দিলেও প্রায় ৪০টি দিঘি-পুষ্করিণী এখনও ভালভাবেই টিকে আছে। সবচেয়ে বড় দিঘির নাম নয়ান দিঘি। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ও প্রায় ৭০০ মিটার × ৪০০ মিটার আয়তনের এ জলাশয়ের প্রশস্ত পাড়গুলি পাহাড়ের মত উঁচু। নয়ান দিঘির লাগোয়া পূর্ব দিকে পর পর ৩টি দিঘি। আয়তনে মাঝারি আকারের এ তিনটি জলাশয়ের সম্মিলিত দৈর্ঘ্য নয়ান দিঘির দৈর্ঘ্যের চেয়েও বেশি। দেশ বিভাগের কিছু আগে নয়ান দিঘি থেকে একটি বিরাট প্রস্তরমূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। সেই মূর্তি কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং তা খুব সম্ভব ভারতের কোনো যাদুঘরে আছে।

নয়ান দিঘি থেকে প্রায় ১.৫ কিলোমিটার পূর্ব দিকে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা পর পর ৩টি বড় বড় জলাশয় আছে। সর্ব উত্তরে জেলা পরিষদ রাস্তার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত দিঘির নাম বামনদিঘি। প্রায় ৬০০ মিটার × ৩০০ মিটার আয়তনের এ দিঘির পাড়গুলি প্রায় ৫ মিটার উঁচু। বামন দিঘির প্রায় লাগোয়া পূর্ব-দক্ষিণ দিকে প্রায় ২৫০ মিটার × ১৫০ মিটার আয়তনের যে দিঘিটি আছে, তার নাম আন্ধেয়া দিঘি। আন্ধেয়া দিঘির দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে যে বিরাট জলাশয় আছে, তার নাম ছয়ঘাটির দিঘি। ছয়ঘাটি ও বামন দিঘির পূর্ব পাড় ও আনধেয়া দিঘির পশ্চিম পাড় প্রায়

এক রেখায় অবস্থিত। ছয়ঘাটি ও বামন দিঘির মাঝখানের দূরত্ব প্রায় ৫০০ মিটার। মধ্যবর্তী ভূমি অপেক্ষাকৃত নিম্ন এবং সেখানে ধানের চাষ হয়। এ নিম্নভূমিতে প্রায় ২ একর আয়তনের একটি পাড়হীন গোলাকার প্রাচীন জলাশয় আছে।

ছয়ঘাটির আয়তন প্রায় ৬৫০ মিটার × ১৫০ মিটার। প্রশস্ত পাড়গুলি প্রায় ৫ মিটার উঁচু। পশ্চিম ও পূর্ব পাড়ে ২টি করে এবং দক্ষিণ ও উত্তর পাড়ে ১টি করে সর্বমোট ৬টি বাঁধান ঘাট আছে বলে এই জলাশয়ের নাম ছয়ঘাটির দিঘি। ঘাটগুলি বিরাট আকারের। এ দিঘি সম্পর্কে প্রবল জনশ্রুতি আছে যে, চাঁদ সদাগরের পুত্র লক্ষ্মীন্দরের বধূ বেহুলা পালা করে এক একদিন এক এক ঘাটে স্নান করতেন বলে এ দিঘির নাম ছিল বেহুলার বা বেলওয়ার দিঘি। এই বেহুলা (বেহুলা > বেউলা > বেলুয়া > বেলওয়া) নাম থেকেই খুব সম্ভব জনপ্রবাদ মতে বেলওয়া নামের উৎপত্তি বলে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এ নামের প্রকৃত উৎপত্তি যে প্রাচীন 'বেল্লাবা' থেকে, তৃতীয় বিগ্রহ পালের তাম্রলিপিই তা প্রমাণ করে। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের রেভিনিউ সার্ভে ম্যাপে এ দিঘির নাম 'পানি পীর সাহেবকি পুকুর'। দেশ বিভাগের কিছু কাল আগে এখান থেকে একটি বিরাট পাষাণ-মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল। সেটি খুব সম্ভব ভারতের কোনো যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

ছয়ঘাটির উত্তর পাড়ের লাগোয়া উত্তর দিকে প্রায় ১একর পরিমিত জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি পার্শ্ববর্তী নিম্নভূমি থেকে প্রায়. ০.৬ মিটার উঁচু। এই উঁচু ভূমিতে একটি প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আছে। অনুমানিক ৭.২ মিটার × ৫.৪ মিটার আয়তনের এই ইমারতের দক্ষিণ দেয়াল এবং পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালের কিছু কিছু অংশ এখনও টিকে আছে। কেউ কেউ এটিকে প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বলে মনে করেন। খুব সম্ভব অনেক পরবর্তী কালের (কোম্পানীর আমলের) একটি মুসলিম কীর্তির ধ্বংসাবশেষ এটি। অবশ্য এ সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছুই বলা যায় না।

এখানে একটি পিতলের 'আসা' পাওয়া যায়।[১] প্রায় পৌনে ১ মিটার লম্বা এই আসার উপরের অংশ ৩ ভাগে বিভক্ত ছিল। মাঝের ভাগে বাঘের মাথা ও দুই বাহুতে মাছের ছবি খোদিত ছিল। আসার অন্যান্য অংশে প্রথম কলেমা (লা-ইলাহা ইল্লাল্-লাহ্ মোহাম্মাদুর রাসুল-উল্লাহ্) হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) ও হযরত আলীর (রাঃ) নাম ছাড়াও এতে বরহিনা সম্প্রদায়ের পাঁচজন পীরের নাম আরবী ভাষায় খোদিত ছিল। এঁদের প্রত্যেকের নামের আগে কাজী এবং নামের শেষে উদ্-দীন ও বরহিনা ছিল। প্রথম পীরের নাম ছিল খুব সম্ভব কাজী বদ্‌র-উদ্-দীন বা সদ্‌র-উদ্-দীন বরহিনা অথবা এ ধরনের একটি নাম।

জনপ্রবাদ মতে এ স্থানে নাকি ছিল পাঁচ পীরের আস্তানা। এখানে প্রাপ্ত আসাটি এ জনপ্রবাদকে সমর্থন করে। মেজর শেরউইলের মানচিত্রের 'পানি পীর সাহেবকি পুকুর' নামেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। 'পানি পীর' যে পাঁচ পীরের স্থলে ভুলক্রমে লিপিবদ্ধ

১. নিকটবর্তী ভাতসালা গ্রামের বসির সরকার এটি সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর ছোট ভাইয়ের নিকট থেকে গ্রন্থকার এটি দিনাজপুর যাদুঘরের জন্য সংগ্রহ করে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আসাটি যাদুঘর থেকে হারিয়ে গেছে।—গ্রন্থকার।

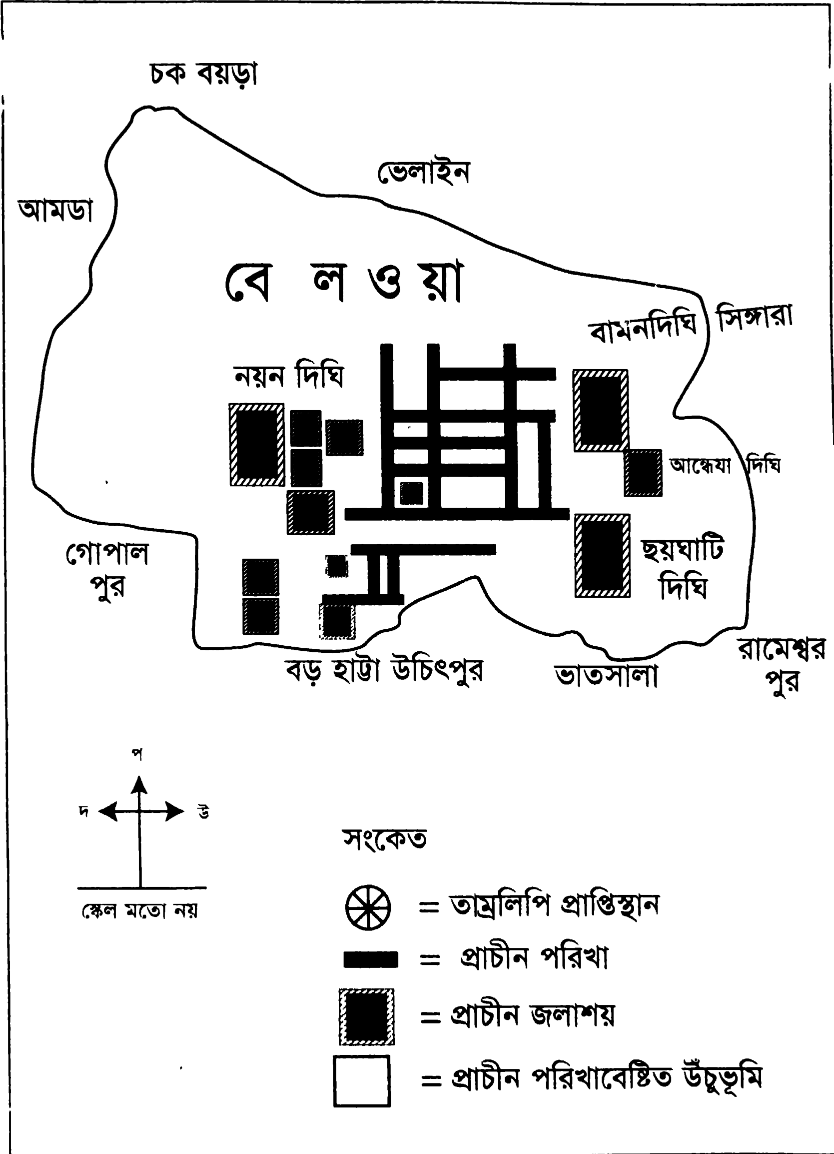
হয়েছে, ত কোনো সন্দেহ আছে বলে মনে হয় না। খুব সম্ভব ব্রিটিশ আমলের কিছু আগেই এখানে পাঁচ পীরের আস্তানা গড়ে উঠেছিল। নিকটস্থ ঘোড়াঘাট (ঘোড়াঘাট দ্র.) ছিল মোঘলদের সময়ে একটি উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক কেন্দ্র। সেখানেও পাঁচপীরের অবস্থান ন। সেখানকার প্রশাসক কাজী বদ্‌র-উদ্‌-দীন একজন বিখ্যাত পীর বলে পরিচিত বেলওয়ার পাঁচ পীর ও 'আসা' তাঁর সময়ের বা তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল কিনা, বলা কঠিন। আসাটির লিপি থেকে ধারণা হয় যে, এটি খুব সম্ভব মোঘল আমলের শেষ দিকের। আসাতে উল্লিখিত 'বরহিনা' শব্দটি বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। পশ্চিম দিনাজপুরের (ভারত) বালিয়াদিঘিতে বরহিনা নামে যে সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে জানা যায় যে, কৌপীনধারী প্রায় অর্ধনগ্ন এ ফকীর সম্প্রদায়ের প্রতীক ছিল মাছের ছবি বহনকারী আসা। খুব সম্ভব বেলওয়ার বরহিনা পাঁচপীরও ছিলেন বালিয়াদিঘির ফকীরদের তরিকাভুক্ত।

আলোচ্য ধ্বংসস্তূপটি ছিল খুব সম্ভব বরহিনা সম্প্রদায়ের পীরের আস্তানা বা ইবাদত খানা। এখানে একটি আরবী শিলালিপি ছিল বলে বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায়। দেশ বিভাগের কয়েক বছর আগে এখানে এক বৃদ্ধা পাগলিনী বাস করতেন। তিনি নাকি একদিন শিলালিপিটি এখানে অবস্থিত একটি কূপে ফেলে দেন। বর্তমানে কূপের কোনো চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না। এখানে মুসলমান ফকীরদের আগে খুব সম্ভব একটি হিন্দু মন্দির ছিল। জনমানবহীন এ পরিত্যক্ত স্থানে খুব সম্ভব একটি তান্ত্রিক মন্দির গড়ে উঠেছিল ছয়ঘাটি দিঘির জলপ্রাপ্তিকে কেন্দ্র করে। কালক্রমে সেটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে গেলে খুব সম্ভব এখানে মুসলমান ফকীরদের আস্তানা গড়ে ওঠে অনেক পরবর্তী কালে।

বেলওয়া গ্রামে বেশ কয়েকটি প্রাচীন পরিখা দেখা যায়। অনেক পরিখা বর্তমানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। প্রাচীনকালে পরিখার সংখ্যা যে অনেক ছিল, তা বোঝা যায় সমগ্র এলাকায় অসংখ্য মজে যাওয়া পরিখার চিহ্ন দেখে। বর্তমানকালে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা গোটা পাঁচেক পরিখার চিহ্ন বেশ স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এগুলির মধ্যে দীর্ঘতম পরিখাটি নয়ান দিঘির পূর্ব পাড়ের কাছ থেকে শুরু হয়ে ছয়ঘাটির পশ্চিম পাড়ের কাছে এসে শেষ হয়েছে। এটি প্রায় ১.৫ কিলোমিটার লম্বা। এর উত্তরে পরপর বেশ কয়েকটি পরিখা। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা পরিখাগুলিকে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা বেশ-কয়েকটি পরিখা আড়াআড়িভাবে কেটে হরিনাথপুরের মত (হরিনাথপুর দ্র.) কতগুলি আয়ত ক্ষেত্রের সৃষ্টি করেছিল। এই আয়তক্ষেত্রগুলির আয়তন ৫ থেকে ১৫ একর করে। অনেক কাল ধরে সাঁওতাল প্রভৃতিদের বসতির চাপে এবং কৃষিকার্যের জন্য মাটি কাটার দরুণ পরিখা ও আয়তক্ষেত্রগুলি অবিকৃত অবস্থায় নেই। ফলে মোট ক'টা পরিখা ও আয়তক্ষেত্র ছিল, তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বেশ কয়েকটা আয়তক্ষেত্রের মধ্যে প্রাচীন কালের ইট ও ইমারতের ভিত্তি পাওয়া গেছে। প্রাচীন ইটে পূর্ণ গোটা তিনেক ঢিবিও এখানে দেখা যায়।

নয়ান দিঘির প্রায় ৪০০ মিটার পূর্ব দিকে 'ঢোল চৌধুরীর পুকুর' নামে একটি ছোট জলাশয়ের উত্তরপাড়ে একটি ছোট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। মোঘল আমলের এ

মন্দির ছিল খুব সম্ভব তান্ত্রিকদের। এর কাছেই একটি ছোট ঢিবি আছে। খুব সম্ভব এটি কোনো ছোট প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।



বামন দিঘির দক্ষিণ ভাগের পশ্চিম দিকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে আনুমানিক ৫ একর পরিমিত ও প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ যে আয়তক্ষেত্রটি আছে তার পূর্বাংশে প্রায় বিঘা ২ ভূমির উপর খাড়ে নামক এক সাঁওতালের বসতবাটী ছিল। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে সেখানে

একটি চুলা নতুন করে খুঁড়তে গিয়ে প্রায় আধ মিটার মাটির নিচে খাড়ে সাঁওতাল দুটি তাম্রলিপি পান। একটি তাম্রলিপি ছিল প্রথম মহীপালের (৯৮৮-১০৩৮ খ্রিঃ) ও অপরটি ছিল তাঁর পৌত্র তৃতীয় বিগ্রহ পালের (১০৫৫-৭০ খ্রিঃ)। খাড়ের বাসস্থানের দক্ষিণ দিক দিয়ে যে পরিখাটি পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে চলে গেছে, তার উত্তর পাড়ে (খাড়ের বাড়ির দক্ষিণ সীমানায়) ইটের তৈরি একটি অতি প্রাচীন প্রাচীরের কিছু অংশ এখনও টিকে আছে। বস্তুত খাড়ে সাঁওতালের বাড়ি ও পার্শ্ববর্তী সমগ্র এলাকায় মাটির নিচে অসংখ্য ইট দেখা যায়। সাঁওতালেরা বলেন যে, ইটের জন্য তারা এসব জমি ভাল করে চাষ করতে পারে না।

প্রথম মহীপালের তাম্রলিপি দ্বারা তাঁর পঞ্চম রাজ্যাঙ্কে তাঁর অমাত্য লক্ষ্মীন্দর 'দূতক'-এর মাধ্যমে পুন্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতী 'পঞ্চনগরী' (পঞ্চনগরী দ্র.) বিষয়ের অন্তর্গত 'পুণ্ডরিকা' মণ্ডলস্থিত 'ফাণীত বীথি'-র অধীনে ৩ খানা গ্রাম দান করা হয়েছিল। দান গ্রহণকারী ছিলেন হস্তীদাস গোত্রের ব্রাহ্মণ জীবধর শর্মা এবং এ দানের কিছু অংশ ছিল 'গণেশ্বর সমেত গ্রাম পুষ্করিণীর' জন্য এবং এ প্রতিষ্ঠানের বিগ্রহের নাম ছিল 'গণেশ্বর'।

দ্বিতীয় তাম্রশাসন দ্বারা মহারাজা তৃতীয় বিগ্রহ পাল কর্তৃক শ্রীত্রিলোচন নামক 'দূতক'-এর মাধ্যমে 'পুণ্ড্রবর্ধন'-ভূক্তির অন্তঃপাতী 'ফাণীত বীথি' বিষয়ের অন্তর্গত 'পুণ্ডরিকা' মণ্ডলের অধীনে ('ফাণীত বীথি বিষয়ান্তঃপাতী পুণ্ডরিকা মণ্ডল') ' বেল্লাবা' (বর্তমান বেলওয়া) ও 'বাহাড়া' (বর্তমান চক বায়ড়া) গ্রামে ভরদ্বাজ গোত্রের ব্রাহ্মণ জয়ানন্দ দেবশর্মাকে ভূমি দান করা হয়েছিল।

বিগ্রহপালের তাম্রলিপির ' বেল্লাবা' যে বর্তমান বেলওয়া গ্রাম, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ তাম্রলিপি থেকে আরও জানা যায় যে, 'বেল্লাবা' ছিল সে সময়ে একটি গ্রাম মাত্র। কিছু হিন্দু মন্দিরের অবস্থান ও কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণের নিবাস ছিল সে গ্রামে। আরও অনেক মানুষের বসতি যে সেখানে ছিল, তাও অনুমান করা যায়। কিন্তু এত সবের পরেও সেখানে কোনো নগর ছিল বলে কোথাও কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। সমুদয় পাল আমলের প্রত্নপ্রমাণ থেকে সেখানে কোনো জয়স্কন্ধাবার, ভুক্তি, বিষয় বা মণ্ডলের অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অথচ প্রায় ৯ বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন, অসংখ্য বৃহৎ প্রাচীন জলাশয়ের অবস্থান এবং অতি প্রাচীন ও অভিনব ধরনের পরিখার অস্তিত্ব দেখে কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না যে, এ স্থান ছিল সাধারণ একটি গ্রাম। এখানে এককালে যে একটি বিরাট ও সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল, তাতে কোনো সন্দেহই থাকতে পারেনা।

এ-নগরী তবে তবে কবে অস্তিত্ববান ছিল? পাল আমলে এখানে কোন নগরী যে ছিল না, তা আগেই বলা হয়েছে। সেন আমলেও এখানে কোন সমৃদ্ধিশালী জনপদের অস্তিত্ব ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তা ছাড়া, কয়েকটি জলাশয় যে বিগ্রহ পালের সময়েই অস্তিত্ববান ছিল, তাঁদের তাম্রশাসনই তা প্রমাণ করে। সেক্ষেত্রে এ স্থানে পাল-

সেনদের আগেই একটি নগরী ছিল, তাঁদের তাম্রশাসনই তা প্রমাণ করে। সেক্ষেত্রে এ স্থানে পাল-সেনদের আগেই একটি নগরী ছিল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তবে কি গুপ্ত আমলে, কি তার আগে এখানে একটি নগরী ছিল? সে সম্পর্কে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। তবে এ ধরনের অনুমানের পিছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে।

এখানে অবস্থিত পরিখাগুলি এই অনুমানের পিছনে প্রবল সমর্থন যোগায়। এগুলি জলসিঞ্চন (irrigation), প্রমোদ-বিহার বা যাতায়াতের জন্য সৃষ্ট হয়েছিল বলে ধারণা করা যায় না। যতদূর মনে হয়, এগুলি সৃষ্টি হয়েছিল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে। অথচ শুধু পরিখা দ্বারা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার নযীর এদেশে সচরাচর দেখা যায় না। একমাত্র দিনাজপুর জেলার হরিনাথপুরে এ ধরনের ব্যবস্থা দেখা গেছে (হরিনাথপুর দ্র.)। সাধারণত পরিখার সঙ্গে প্রাচীর যোগ করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করা হয়। গুপ্ত যুগ এমন কি মৌর্য যুগেও এ ধরণের ব্যবস্থা দেখা গেছে।

খুব সম্ভব এখানকার এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল আরও অনেক প্রাচীন। পরবর্তীকালে অর্থাৎ গুপ্ত যুগে খুব সম্ভব একটি জনপদ গড়ে উঠেছিল এ প্রাচীন স্থানে। কালক্রমে সেটি ধ্বংস হয়ে 'বেল্লাবা' নামক একটি সাধারণ গ্রামে পরিণত হয়।

খুব সম্ভব পালদের রাজত্বকালে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত 'পল্লরাজ' বা 'পাল্লরাজ' (পল্লরাজ দ্র.) নামক প্রাচীন স্থানে তাঁদের একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। তাম্রলিপির পুণ্ডরিকা মণ্ডলের শাসনকেন্দ্র ছিল সেখানে। সে সূত্রে খুব সম্ভব বেলওয়াতে একটি হিন্দু গ্রাম গড়ে উঠেছিল, এখানে অবস্থিত অসংখ্য দিঘি-পুষ্করিণীর সহজলভ্য জলপ্রাপ্তিকে কেন্দ্র করে। সে গ্রামে অনেক ব্রাহ্মণের নিবাস ছিল এবং আর ছিল অনেক হিন্দু মন্দির।

সেন আমলের পরে খুব সম্ভব সে স্থান পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে। পরে এ জঙ্গলাকীর্ণ নির্জন স্থানে উপরে উল্লিখিত তান্ত্রিক মন্দির দুটি গড়ে ওঠে। কালক্রমে এগুলি ধ্বংস হয়ে গেলে মোঘলদের সময়ে ছয়ঘাটির মন্দিরের ধ্বংসাবশেষে বরহিনা ফকীরদের আগমন ঘটে। তখনও বেলওয়া গ্রাম ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। বেলওয়াতে লোক বসতি শুরু হয় এখানে সাঁওতালদের আগমনের পরে এবং তাদের আগমনের ইতিহাস একশ' দেড়শ' বছরের বেশি নয়।

পল্ল বা পাল্লরাজ

বেলওয়া থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার পূর্ব দিকে ও ঘোড়াঘাট থেকে প্রায় ৩ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় ৫ বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে একটি জঙ্গলাকীর্ণ প্রাচীন স্থান আছে। লোকে বলে পল্লরাজ বা পাল্লরাজ।

সমগ্র স্থান জুড়ে প্রাচীন ইট ও পাথরে ভরা অসংখ্য ঢিবি ছিল। সমতল ভূমিতে অবস্থিত ঢিবিগুলিকে দেখলে বন-জঙ্গলে ভরা এ স্থানকে পাহাড়ী অঞ্চল বলে ভ্রম হত। জঙ্গলের ধারে কাছে সাঁওতালরা বসবাস করতেন এবং জঙ্গল থেকে খাদ্য সংগ্রহ

খ্রিস্টান মিশনারীদের দৌলতে জঙ্গল সাফ হয়ে গেছে এবং সেই সঙ্গে প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষগুলিও সাফ হয়ে গেছে। রাজবাড়ি বলে কথিত স্থানটিতে ছিল অসংখ্য বড় বড় ঢিবি। সেগুলির ভিতরে ছিল প্রাচীন ইট আর পাথর। এখন সেখানে কিছু প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ছাড়া আর কিছুই অবস্থিত নেই।

হাল আমলে অর্থাৎ বর্তমান শতাব্দীতে রাজবাড়ি সীমানার মধ্যে মিশনারীদের গীর্জা ও অন্যান্য অনেক ইমারত নির্মিত হয়েছে। তারা এখানকার কত প্রাচীন ইট ব্যবহার করেছে, ইমারতগুলির পলেস্তারা না খুলে বলার উপায় নেই। তবে স্থানীয় লোকেরা বলেন যে, এখানকার ঢিবিগুলি ধূলিস্মাৎ করে এ সৌধগুলি নির্মিত হয়েছে। আর এখানে পড়ে আছে শুধু ব্যবহারের অযোগ্য ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ। এসব ভগ্নাংশ পল্লরাজের ৫বর্গকিলোমিটার স্থানের প্রায় সর্বত্রই আছে। আর আছে অসংখ্য প্রাচীন জলাশয়। অনেকগুলি মজে গেছে। বাকিগুলিও মজে যাবার পথে।

গীর্জা থেকে প্রায় ১.৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে জঙ্গলের ভিতরে এখনও ৩টি ঢিবি টিকে আছে। সবচেয়ে বড় ঢিবির আয়তন প্রায় ১ একর ও উচ্চতা ৩ মিটার। ঢিবিটি প্রাচীন ইটে ভরা কিন্তু এত প্রাচীন যে, স্বাভাবিক পাহাড়ী টিলার মত এর উপরিভাগ মসৃণ হয়ে ঘন দূর্বাদলে আবৃত হয়ে গেছে। ঢিবির উত্তর দিক ঘেঁষে একটি বৃত্তাকার পরিখার বেশ কিছু অংশ এখনও টিকে আছে। এ পরিখার যে-চিহ্ন চারদিকে পাওয়া যায় তাতে মনে হয় যে, প্রায় ১৫ একর ভূমি এ পরিখাদ্বারা বেষ্টিত ছিল। সমগ্র ভূমিতে প্রচুর ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ দেখা যায়। পরিখাটি এখনও প্রায় ৫ মিটার চওড়া।

এ ঢিবি থেকে প্রায় ২০০ মিটার পূর্ব দিকে আরও একটি ঢিবি আছে। প্রায় ১বিঘা জমির উপর অবস্থিত এ ঢিবির উচ্চতা প্রায় ৩ মিটার এবং এটিও প্রথমোক্ত ঢিবির মতই দূর্বাদলে আচ্ছাদিত। এ ঢিবির প্রায় ৯০ মিটার পূর্ব-দক্ষিণে অনুরূপ আরও একটি ছোট ঢিবি।

পল্লরাজ সম্পর্কে নানারকম জনপ্রবাদ আছে। এক মতে এখানে ছিল কামরূপের রাজা নীলাম্বর রায়ের রাজধানী বা বাসস্থান। কিন্তু তার চেয়েও প্রবল জনপ্রবাদ মতে এখানে ছিল পাল রাজাদের জয়স্কন্ধাবার বা বাসস্থান এবং এ সূত্র ধরেই এ স্থানকে পল্ল বা পাল্লরাজ বলা হয়ে থাকে।

পালবংশের প্রথম নৃপতি গোপাল গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করার পূর্বে কোথাকার সামন্ত নৃপতি ছিলেন, তা জানা যায়নি। পল্লরাজে তাঁর রাজ্য ছিল এবং এ স্থান থেকেই তিনি শক্তি সঞ্চয় করে গৌড়াধিপতি হয়েছিলেন বলে প্রবল জনশ্রুতি আছে। এ সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা না গেলেও এ স্থান যে পাল রাজাদের সঙ্গে জড়িত, সে সম্পর্কে ধারণা করা যায় বেলওয়া তাম্রলিপি দুটি থেকে (বেলওয়া দ্র.)। উক্ত তাম্রলিপিতে বর্ণিত পুণ্ডরিকা মণ্ডলের প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল খুব সম্ভব পল্লরাজে। পাল রাজত্বের পরেই খুব সম্ভব এ স্থান পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সাঁওতালদের আগমনের পূর্বে এখানে তেমন কোনো জনবসতি ছিল না।

বার পাইকের গড়

পল্লরাজের লাগোয়া পূর্ব দিকে ও ঘোড়াঘাট থেকে প্রায় ৪.৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম দিকে মহিলা বা মইলা নদীর পশ্চিম তীরে বিরাহিমপুর নামক জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে একটি সরকারি তহ্সীল কাচারি আছে। কাচারি থেকে প্রায় ৫০ মিটার উত্তর-পূর্ব দিকে নদী বা পরিখার তীরে একটি প্রাচীন বটগাছের তলে বেশ কতগুলি প্রাচীন ইট স্তূপীকৃত হয়ে আছে। ইটের নমুনা দেখে মনে হয়, এগুলি মুসলিম আমলের বহু আগের। অথচ স্থানীয় আধিবাসীদের মতে এটি নাকি দিওয়ান গাযী নামক একজন মুসলিম পীরের মাযার। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই নাকি এ মাযার একটি পূণ্যভূমি।

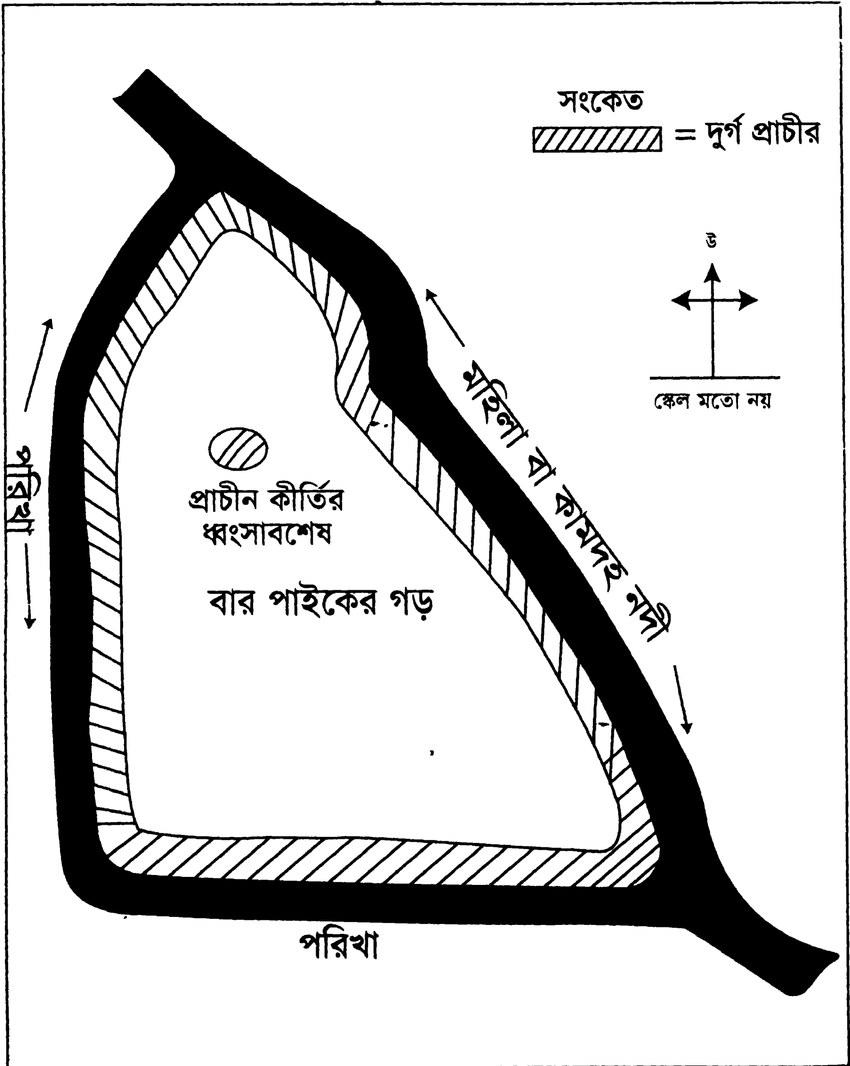
বিরাহিমপুর মাযার ও কাচারীর লাগোয়া পূর্ব দিকে একটি প্রাচীন দুর্গের অবস্থান দেখা যায়। নাম বার পাইকের গড়। প্রায় ত্রিভুজ আকারে নির্মিত এ গড়ের পূর্ব দিকের আঁকাবাঁকা মাটির প্রাচীরের সংলগ্ন যে নদীটি আছে, তার নাম মহিলা বা মইলা নদী। মেজর শেরউইলের মানচিত্রে এ নদীর নাম কামদহ। প্রকৃত পক্ষে নদীর আঁকাবাঁকা প্রবাহের সঙ্গে মিল রেখেই দুর্গের প্রাচীর নির্মিত। নদী সেখানে পরিখার কাজ করছে। নদীটি বর্তমানে ১৫ মিটারের বেশি চওড়া নয়। প্রাচীন করতোয়া নদীরই একটি শাখা ছিল এ নদী এবং পরে করতোয়াতেই তা মিশে গেছে।

গড়ের উত্তর দিকে ত্রিভুজাকারের বিন্দুতে অবস্থিত মহিলা নদী থেকে একটি প্রশস্ত খাল কেটে গড়ের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের পরিখা সৃষ্টি করা হয়েছে। এ-খাল বর্তমানে নদীর চেয়েও প্রশস্ত এবং তাতে বারমাস পানি থাকে। এ-খাল পূর্বদিকে মহিলা নদীর সঙ্গে মিশে গড়কে একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপে পরিণত করেছে। মহিলা নদী ও সংযুক্ত খালের স্রোতকে ঘেঁষে উঁচু মাটির প্রাচীর নির্মিত হয়েছে। প্রশস্ত প্রাচীরের উচ্চতা আজও ৪.৫ মিটার। পশ্চিম দিকের প্রাচীর প্রায় ১.৫ কিলোমিটার লম্বা, দক্ষিণ দিকের প্রাচীর প্রায় ৯০০ মিটার ও পূর্ব দিকের আঁকাবাঁকা প্রাচীর প্রায় ২.৪ কিলোমিটার লম্বা।

সমগ্র দুর্গ এলাকা এখন চাষের জমিতে পরিণত হয়েছে। প্রাক্তন সৈনিকদেরকে এখানে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। এখানে কোনো ইমারতের চিহ্ন বর্তমানে নেই, তবে ছিল বলে জানা যায়। তবে চাষ করার ফলে মাটির নিচ থেকে কিছু কিছু প্রাচীন ইট বের হয়ে পড়েছে। সংখ্যায় খুব কম নয়। গড়ের মধ্যে প্রাচীনকালের মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। গড়ের মধ্যে ছোট একটি ঢিবি আছে। ঢিবিতে কিছু কিছু ইট দেখা যায়।

এ দুর্গের কোনো সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। কোচবিহারের ইতিহাসে এ গড়কে পঞ্চদশ শতাব্দীর কামরূপের রাজা নীলাম্বরের দুর্গ বলে অভিহিত করা হয়েছে। ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে পীর মোহাম্মদ শাতারী কর্তৃক রচিত 'রিসালাৎ-উশ্-শুহাদা' নামক গ্রন্থ মতে সুলতান রুকন-উদ্-দীন বারবক শাহ্র আমলে (১৪৫৯-৭৬ খ্রিঃ) পীর ইসমাইল গাজী রাজা নীলাম্বরের কাটাদুয়ার দুর্গে অভিযান চালান বার পাইকের গড় থেকে। দুর্গের ভিতরে যে ইট পাওয়া গেছে, তাতে এ দুর্গকে এত অর্বাচীন বলে ধারণা করা যায় না। খুব সম্ভব পাল আমলে এ দুর্গ নির্মিত হয়েছিল কামরূপ রাজের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত

করার জন্য। এ দুর্গ থেকে মাত্র ৬.৪ কিলোমিটার পুর্বে রাজা নীলাম্বর রায়ের বাড়ি বলে কথিত বিশাল কাটাদুয়ার দুর্গ (দরিয়াও বা রাজা নীলাম্বর রায়ের দুর্গ দ্র.)। সেখানে এত বড় দুর্গ থাকা সত্ত্বেও এত কাছে রাজা নীলাম্বর আরও একটি অতি সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন বলে মনে হয় না। খুব সম্ভব এ দুর্গ সুলতানী আমল পর্যন্ত টিকে ছিল এবং মুসলিম শক্তি কামরূপের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য এ দুর্গ ব্যবহার করত। পরে মোঘলদের সময়ে ঘোড়াঘাট দুর্গ প্রাধান্য লাভ করলে বোধ হয় এ দুর্গ পরিত্যক্ত হয়েছিল।



চক জুনিদ-দারিয়া-অরুণধাপ

নওয়াবগঞ্জ থানা থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার ও দাউদপুর থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার পূর্ব দিকে করতোয়া নদীর একটি মৃতপ্রায় প্রবাহের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত এই অতি প্রাচীন স্থানের নাম চক জুনিদ-দারিয়া। প্রাচীন ইট ও পাথরে ভরা এখানে ছোট বড় ৫০ টি ঢিবি আছে। প্রায় ৬ বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে ঢিবিগুলির অবস্থান।

এখানকার সবচেয়ে বড় ঢিবির নাম অরুণধাপ বা কাঞ্জির হাঁড়ি। নদীর কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত এ ঢিবির তলদেশের আয়তন প্রায় ১ একর। পূর্ব পশ্চিমে লম্বা ও ৮০ মিটার × ৫০ মিটার আয়তনের এ ঢিবির সর্বোচ্চ অংশ প্রায় ৮মিটার উঁচু। ঢিবির পশ্চিম ভাগে অবস্থিত এ উঁচু অংশের মাঝখানে আছে একটি নিচু স্থান (depression)। এই দেবে যাওয়া স্থানের চারদিকে ইটের তৈরি প্রশস্ত দেওয়ালের চিহ্ন বিদ্যমান। এই উঁচু স্থান থেকে ক্রমশ ঢালু হয়ে ঢিবিটি কিছুটা সংকীর্ণ অবস্থায় পূর্ব দিকের সমতল ভূমিতে গিয়ে মিশেছে। এ ঢিবি এখন (১৯৬৭ খ্রিঃ) জঙ্গলাকীর্ণ। নানারকম কাঁটালতা এখানে গজিয়ে আছে। পাশের নিচু ভূমিতে কয়েক ঘর সাঁওতালের বসবাস। এরা মেটে আলু খুঁড়তে গিয়ে অনেক প্রাচীর নষ্ট করেছেন। ঢিবির মধ্যে প্রচুর ইট আছে। পাশের সমতল জমিতেও প্রচুর ইটের টুকরা ও প্রাচীন মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ বিদ্যমান।

অরুণধাপ থেকে প্রায় ২০০ গজ পশ্চিমে একই নদীর দক্ষিণ তীরে অনুরূপ আয়তন, আকৃতি, আকার ও উচ্চতার আর একটি ঢিবি আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, অরুণধাপকে এখানে তুলে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। লোকে বলে এ ঢিবিতে নাকি বেহুলার বাসর ঘর ছিল।

অরুণধাপের দক্ষিণ দিকে জেলা পরিষদের রাস্তার উভয় পার্শ্বে ছোট বড় অনেকগুলি ঢিবি আছে। রাস্তার দক্ষিণ পাশেই ঢিবির সংখ্যা বেশি। কোনোটার আয়তনই এক বিঘার বেশি নয়। প্রত্যেক ঢিবি ও চারপাশের সমতল ভূমিতে প্রচুর প্রাচীন ইট দেখা যায়।

বেহুলার বাসরঘর নামক ঢিবি বরাবর রাস্তা থেকে প্রায় ১০০ মিটার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পরিখা-বেষ্টিত প্রায় ৫ একর ভূমি আছে। সেখানে প্রায় ২ বিঘা ভূমির উপর একটি অনুচ্চ ঢিবি আছে। লোকে বলে টাঁকশাল। বছর কয়েক আগে এক সাঁওতাল এখানে মাটি খুঁড়তে গিয়ে কিছু স্বর্ণমুদ্রা পান এবং সেগুলি নিয়ে তিনি সীমান্তের ওপারে চলে গিয়েছিলেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। এ অঞ্চলের ছেলে-বুড়া সবাই এ ঘটনা জানেন।

এই তথাকথিত টাঁকশালের নিকবর্তী একটি ছোট ঢিবি এবং সেখান থেকে প্রায় ৪০০ মিটার পূর্ব দিকে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত একটি বড় ঢিবি থেকে ইট সরানোর ফলে সেখানে দুটি বৌদ্ধ স্তূপের সন্ধান পাওয়া গেছে। ইটগুলি অত্যন্ত প্রাচীন—পাল যুগের আগের বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

উপরে উল্লিখিত সব ক'টা ঢিবিই যে প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ, তা আগেই বলা হয়েছে। প্রায় ৫ বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে অবস্থিত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এ ঢিবিগুলি ছাড়াও সমগ্র এলাকা জুড়ে আছে প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশের ছড়াছড়ি। মাটির

নিচ থেকে এত ইট বের হয় যে, এখানকার জমি ভাল করে চাষ করা যায় না। শত শত বছর ধরে এ স্থান পরিত্যক্ত ও পতিত অবস্থায় পড়েছিল। সাঁওতালরা এসে এখানে চাষবাস শুরু করেন। দেখাদেখি স্থানীয় অধিবাসীরাও বর্তমানে এ সব জমি চাষ করতে শুরু করেছে।

দুটি বৌদ্ধ স্তূপের সন্ধান পাবার পরে এ স্থান যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, তা অনুমান করা যেতে পারে। অরুণধাপ ও বেহুলার বাসর ঘরে দুটি বৃহৎ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লুক্কায়িত আছে বলে ধারণা হয়। তা যদি না হয়, তবে সেখানে দুটি বিরাট বৌদ্ধ মন্দিরের অবস্থানের কথা ভাবা যায়। তথাকথিত টাঁকশালে ছিল খুব সম্ভব একটি বৌদ্ধ বিহার। বাকি ঢিবিগুলিতে ছিল খুব সম্ভব বৌদ্ধ স্তূপ। উৎখনন কার্য চালালে এখানে প্রাচীন বাংলাদেশের লুপ্ত ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায়ের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

অরুণধাপ

"১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে অরুণ ধাপে প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর কর্তৃক উৎখনন কাজ করা হয় এবং তাতে দেখা যায় যে, ঢিবিটি পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে ৩.৫৫ মিঃ উঁচু এবং পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ এ ঢিবির আয়তন ছিল ৭২ মিটার × ৬২ মিটার। উৎখননের পর এখানে পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ ৫১.৭২ মিটার × ৩২.৮০ মিটার আয়তনেরএকটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এর দেয়ালের বহিরাবরণে কয়েকটি উত্তল এবং অবতল প্রক্ষেপণ এবং অলংকৃত ইটের নকশা বিদ্যমান আছে। এর উত্তর বাহুতে তিনটি, পশ্চিম বাহুতে দুটি এবং পূর্ববাহুতে একটি দেয়ালের কাঠামো অনাবৃত হয়েছে। কক্ষগুলির পরিমাপ ৫.৭ × ২.৯ মি, ৩.৬৫ × ২.৮, এবং ৩.২ × ৩.৩ মিটার। কিন্তু এমনভাবে বিধ্বস্ত যে, এদের আর কোন বৈশিষ্ট্য পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। উপরের স্থাপতিকে ধ্বংসাবশেষ থেকে অনুমিত হয় যে, বিধ্বস্ত ইমারতটির মাঝখানে অতীতে একটি উন্মুক্ত চত্বর ছিল। এ চত্বরে আবার ৫.২০ মিঃ × ৫.২০ মিঃ পরিমাপের একটি হলঘর এবং একটি সিঁড়ি পথের অস্তিত্ব রয়েছে। অনুমিত হয়েছে যে, এসব স্থাপত্যকীর্তি মূল নির্মাণ সময়কালের পরবর্তীকালে নির্মিত হয়েছিল।

"অরুণ ধাপে সর্বমোট ৫.৭০ মিঃ গভীরতা পর্যন্ত খনন পরিচালনা করে তিনটি উপস্তরসহ মোট ছয়টি স্তর এবং একাধিক পাকা ইটের মেঝের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেছে। এর ফলে ধরে নেওয়া যায়, অরুণ ধাপে একাধিক নির্মাণ ও একটি পুনঃ নির্মাণ সময়কালের অস্তিত্ব বজায় ছিল। প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মৃৎপাত্র, অলংকৃত ইট, লোহার শলাকা, জালের কাঠি, পুঁতি, গুলতি, চাকতি ইত্যাদি। ... স্তর (৩) থেকে একটি কালো রঙের প্রলেপ যুক্ত গ্যাডরুভড (gadrooved) খোলামকুচি পাওয়া যায়। ... এছাড়া এর সংলগ্ন জমির ভূ-পৃষ্ঠ থেকে একটি কালো পাথরের সূর্যমূর্তির ভগ্নাবশেষ সংগৃহীত হয়েছে। ফলে অনুমিত হয় অরুণধাপের সর্বশেষ

সময়কালেই ইমারতাদি সম্ভবত কোনহিন্দু মন্দিরের অংশ বিশেষের চিহ্ন বহন করছে। শিল্প শৈলী অনুযায়ী মূর্তিটি খ্রিষ্টীয় দশ-এগার শতকের প্রচলিত বৈশিষ্ট্য বহন করছে।"[১]

বৈগ্রাম (দক্ষিণ)

পূর্বে উল্লিখিত উত্তর বৈগ্রাম এবং আলোচ্য বৈগ্রাম দুটি ভিন্ন স্থান। হিলি রেল স্টেশন থেকে অনুমানিক ২$\frac{১}{২}$ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে বৈগ্রাম নামে এই অতি প্রাচীন গ্রাম অবস্থিত। ১৯৩০ সালের দিকে এখানকার একটি প্রাচীন মজে যাওয়া পুকুর সংস্কার করতে গিয়ে পুকুরের উত্তর পাড়ের বাঁধান ঘাটে সম্রাট প্রথম কুমার গুপ্তের রাজত্বকালে (৪৪৮ খ্রিঃ) প্রদত্ত একটি তাম্রপট্ট পাওয়া যায়। 'পঞ্চনগরী বিষয়াধিকরণ কুমারামাত্য কুলবৃদ্ধি' এ তাম্রলিপির মাধ্যমে শিবনন্দিন নামক এক ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দস্বামীর মন্দির নামক একটি বিষ্ণু মন্দিরের 'গন্ধ-ধূপ-দীপ-পত্র-পুষ্প' ও মন্দিরের প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য 'ত্রিবৃত্ত' ও 'শ্রীগোহালী' নামক পাশাপাশি দুটি গ্রামে অবস্থিত ও 'বায়িগ্রামের' (বর্তমান বৈগ্রাম) সীমান্তবর্তী 'তিন কূলব্যাপ ...' সরকারের খাস খিলা, ক্ষেত্রে ও বাস্তুভূমি তাঁর দুই পুত্র 'ভয়িলা' ও 'ভাস্করের' নিকট বিক্রি করেন।

উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ও প্রাচীন জলাশয়ের আয়তন এক একরের কিছু কম। পুকুরের পশ্চিম পাড় থেকে প্রায় ৩০ মিটার পশ্চিমে একটি উঁচু ঢিবি ছিল। দেশ বিভাগের অনেক পূর্বে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এখানে উৎখনন কার্য চালিয়ে একটি শিব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করে। সেটি এখন মাটির নিচে আছে। মন্দিরে ব্যবহৃত ইট-পাথর ছাড়া সঠিক সময় নির্ধারক অন্য কোন উপকরণ পাওয়া যায়নি।

গ্রামটি অত্যন্ত প্রাচীন। তাম্রলিপি উদ্ধারের স্থান থেকে প্রায় ২০০ মিটার পূর্ব দিকে একটি মাঝারি আকারের প্রাচীন জলাশয় আছে। জলাশয়ের উত্তর পাড়ে প্রায় ৩০০ বছর আগের একটি ছোট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। এ মন্দিরের ১০০ মিটার পূর্ব দিকে এক জন সঙ্গতিপন্ন মুসলিম ভদ্রলোকের নিবাস। তিনি বলেন যে, বহু বছর আগে তিনি যখন তাঁর বর্তমান বাড়ি নির্মাণ করেন, তখন মাটির নিচে তিনি এক বিরাট ইমারতের ভিত্তি পেয়েছিলেন এবং সেই ভিত্তির উপরই তার বর্তমান বাড়ি অবস্থিত।

বৈগ্রামের চারদিকে, বিশেষ করে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অসংখ্য প্রাচীন জলাশয় আছে। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় জলাশয়ের নাম বলিধর রাজার দিঘি। গ্রামের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ প্রাচীন দিঘির আয়তন প্রায় ২৫ একর। জনপ্রবাদ মতে জানা যায় যে, বলিধর নামক এক রাজা এখানে রাজত্ব করতেন। এই বলিধর রাজার কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না।

তাম্রলিপিতে উল্লিখিত গোবিন্দস্বামীর মন্দিরের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাম্রলিপি যেখানে পাওয়া গেছে, সে স্থানের ধারে কাছে এ মন্দির ছিল বলে অনুমান করা যায়। সমগ্র গ্রাম জুড়ে অসংখ্য বসতি গড়ে উঠেছে। খুব সম্ভব সেই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পরবর্তী কালে গড়ে ওঠা জনবসতির নিচে পড়ে আছে। ত্রিবৃত্ত গ্রামের সন্ধান পাওয়া যায়নি। খুব সম্ভব এ গ্রামের নামটি হারিয়ে গেছে। কিন্তু শ্রীগোহালী

১. মোশাররফ হোসেন : প্রত্নতত্ত্ব উদ্ভব ও বিকাশ, ২২২-২০ পৃ.।

নামটি পরিবর্তিত অবস্থায় টিকে আছে। বৈগ্রামের প্রায় ৪.৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বদিকে জেলা পরিষদের রাস্তার দক্ষিণে গোহারা গ্রাম একটি অতি প্রাচীন স্থান। এখানে পুরাকীর্তির কোনো ধ্বংসাবশেষ না থাকলেও মাটির নিচে এখানে-ওখানে কিছু কিছু প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ পাওয়া যায়। সম্ভবত এই গোহারাই প্রাচীন শ্রীগোহালী।

এ প্রসঙ্গে পাহাড়পুর বিহারে প্রাপ্ত ৪৮৪ খ্রীস্টাব্দের একটি শিলালিপিতে উল্লিখিত বটগোহালী গ্রামের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বৈগ্রাম থেকে পাহাড়পুর-বটগোহালীর দূরত্ব মাত্র ৩০ কিলোমিটার। পাহাড়পুর শিলালিপির বটগোহালী খুব সম্ভব নিকটস্থ গোয়ালভিটা গ্রাম। বট গোহালী ও শ্রীগোহালীর মধ্যে সংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয়।

আলোচ্য তাম্রলিপিতে উল্লিখিত বায়িগ্রাম যে বর্তমান বৈগ্রাম, তা বলাই বাহুল্য। এ বৈগ্রাম ফুলবাড়ির উত্তরে অবস্থিত দামোদরপুর লিপির বৈগ্রাম নয় (ফুলবাড়ি গড় ও বৈগ্রাম দ্র.)।

টুঙ্গী শহর

বৈগ্রাম থেকে মাইল তিনেক পূর্ব-উত্তর দিকে ও বিরামপুর-ঘোড়াঘাট সড়ক থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দক্ষিণে টুঙ্গী শহর নামক একটি প্রাচীন স্থান আছে। এখানে প্রায় ৪ বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে অসংখ্য প্রত্নকীর্তির চিহ্ন দেখা যেত। বর্তমানে সে সব কীর্তি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সমগ্র এলাকায় মাটির নিচে ও উপরে প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের অজস্র ভগ্নাংশ দেখা যায়। ঐ গ্রামের কেন্দ্রস্থলে ৭টি ঢিবি ছিল। কেন্দ্রীয় ঢিবিটি ছিল প্রায় এক একর জমির উপরে। এর উচ্চতা ছিল প্রায় ৮ মিটার। এই ঢিবির চারদিকে আরও ৬টি ছোটবড় ঢিবি ছিল। কয়েক বছর আগে ঢিবিগুলির ইট সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ফলে সেখানে একটি বিরাট বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। বাকি ঢিবিগুলিতেও ছিল ছোট বড় বৌদ্ধ স্তূপ। এ স্তূপগুলির চারদিকে এক বিরাট এলাকা জুড়ে যে বিরাট ইমারতের চিহ্ন দেখা যায় সেটি একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল বলে ধারণা হয়।

এ সমস্ত ধ্বংসস্তূপের পশ্চিম দিকে একটি হাল আমলের ছোট পুকুর আছে। পুকুরের পাড়ে একটি বিষ্ণু মূর্তির অর্ধাংশ পড়ে আছে। এক হাত ও এক পা বিশিষ্ট এ মূর্তি প্রায় ২.১ মিটার উঁচু।

দামোদরপুর (দক্ষিণ)

ভাদুরিয়া (ভাদুরিয়া দ্র.) থেকে প্রায় ৪.৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত এই দামোদরপুরকে সাধারণত: দক্ষিণ দামোদরপুর বলা হয়ে থাকে। এটি একটি প্রাচীন স্থান। অসংখ্য প্রাচীন জলাশয় আছে এখানে। আর আছে ৫টি ঢিবি। ভাদুরিয়া থেকে বেলওয়া যাবার পথে রাস্তার দু'পাশে ঢিবিগুলি অবস্থিত। এক একটির আয়তন এক থেকে দেড় বিঘা। কোনোটির উচ্চতাই ৬ মিটারের বেশি নয়। ঢিবিগুলি প্রাচীন ইট

পরিপূর্ণ। জনবিরল এ স্থান বহু কাল ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল। হাল আমলে কিছু কিছু বসতি গড়ে উঠেছে। এস্থান বেলওয়া (বেলওয়া দ্র.) থেকে মাত্র ১.৫ কিলোমিটার পশ্চিম দিকে অবস্থিত। খুব সম্ভব এ স্থানের প্রাচীন কীর্তিগুলি বেলোয়ার সমসাময়িক এবং প্রাচীন বেলওয়া নগরীরই অংশবিশেষ ছিল এই প্রাচীন দামোদরপুর।

জিকা বা জিয়াগড় ও হাতিশাল

ভাদুরিয়া থেকে প্রায় ৪.৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত জিকা বা জিয়াগড় নামক প্রাচীন দুর্গের আয়তন প্রায় ১০০০ × ৫০০ মিটার। চারদিকের প্রাচীর এখনও প্রায় ১.৫ মিটার উঁচু। বাইরের পরিখা প্রায় ৯ মিটার প্রশস্ত। দুর্গ প্রাচীর ইটের তৈরি ছিল। প্রাচীরের বাইরের দিক ছিল মাটি দিয়ে ঢাকা। দুর্গ এলাকায় কোনো ইমারতের ধ্বংসাবশেষ টিকে নেই। কিন্তু অজস্র প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ আছে। মাটির নিচেও প্রচুর ইট আছে। সেগুলির জন্য এখানে ভাল করে চাষ করা যায় না।

দুর্গ থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার পশ্চিম আছে হাতিশাল নামক প্রাচীন স্থান। পথে পড়ে পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন নামক দুটি মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ। মন্দির দুটির ভিত্তি ভূমি ছাড়া বাকি অংশ বিলুপ্ত।

মন্দির দুটির কিছু দক্ষিণ-পশ্চিমে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি দিঘি। দিঘির পশ্চিম পাড়ে প্রায় ৫ একর স্থান জুড়ে একটি উঁচু ভূমি আছে। সেখানে অসংখ্য প্রাচীন ইমারত ছিল। সেগুলি বর্তমানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পড়ে আছে শুধু ইট ও মৃৎপাত্রের অজস্র ভগ্নাংশ। এখান থেকে ব্রোঞ্জ নির্মিত একটি ছোট ঘটি আবিষ্কৃত ও দিনাজপুর যাদুঘরে রক্ষিত হয়েছে। আর পাওয়া গেছে প্রায় এক ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট পোড়ামাটির তৈরি গুলতি। এগুলি প্রাচীন যু'গর যুদ্ধের সময় ধনুকে ব্যবহার করা হত।

মুসলিম আমল

কান্তনগর মন্দির

দিনাজপুর শহর থেকে প্রায় ২২ কিলোমিটার উত্তরে ঢেপানদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত কান্তনগর মন্দির (কান্তনগর দুর্গ দ্র.)। পোড়ামাটির চিত্রফলক শিল্পের (terra-cotta plaques) অতুলনীয় নিদর্শন বহন কারী এই নবরত্ন মন্দির উপমহাদেশের স্থাপত্য ও পোড়ামাটির চিত্র শিল্পে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এত উৎকৃষ্ট চিত্রফলকের অস্তিত্ব সে যুগে বাঙলার আর কোনো ইমারতে দেখা যায় না।

বর্গাকারে ও প্রস্তর নির্মিত ১ মিটার উঁচু একটি ভিত্তিবেদীর (stone-platform) উপর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। ভিত্তিবেদীর প্রত্যেক বাহু '৬০-৩'' লম্বা এবং বর্গাকারে নির্মিত মন্দিরের প্রত্যেক বাহু '৫১ ফুট' দীর্ঘ। মন্দিরের চারদিকে আছে ৮ফুট প্রশস্ত টানা বারান্দা। প্রত্যেক বারান্দায় ২টি করে বিরাট আকারের স্তম্ভ (pillar) আছে। স্তম্ভ ও পাশের দেয়ালের ফাঁকে ফাঁকে প্রত্যেক দিকে ৩টি করে বিরাট আকারের প্রবেশপথ (arches) আছে। পত্রাকারে নির্মিত খিলানের সাহায্যে এই উন্মুক্ত প্রবেশপথগুলি নির্মিত হয়েছে।

মন্দিরের মূল কক্ষ বা গর্ভগৃহ আয়তনে বেশ ছোট ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই কক্ষেই কান্তজীর বিগ্রহ স্থাপিত। এই কক্ষের চারদিকে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট কক্ষ আছে।

পশ্চিম দিকের বারান্দার উত্তরাংশ থেকে যে সংকীর্ণ সিঁড়িপথ উপরে উঠে গেছে, তা দিয়ে মন্দিরের দ্বিতলে উঠতে হয়। দ্বিতলে আছে ৪টি ক্ষুদ্র কক্ষ। দোল মঞ্চের আকারে তৈরি এ মন্দিরের দ্বিতল প্রথম তলের চেয়ে আয়তনে বেশ ছোট। এর পরে আছে মন্দিরের ত্রিতল। সেখানে কোন কক্ষ নেই। সে খানে কেন্দ্রস্থলে আছে '১৫ ফুট' উঁচু একটি চূড়া বা রত্ন। এই কেন্দ্রীয় চূড়া ছাড়াও মন্দিরের প্রথম তলের ছাদের চার কোণে ৪টি এবং দ্বিতলের ছাদের চার কোণে ৪টি এই মোট ৯টি চূড়া বা রত্ন মন্দিরের উপরদেশে ছিল। তাই এটিকে নবরত্ন মন্দির বলা হত। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে মন্দিরের চূড়াগুলি ভেঙ্গে পড়ে গেছে।

সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত (protected) এই মন্দিরের সংস্কার কার্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক করা হলেও মডেলের অভাবে চূড়াগুলি এ পর্যন্ত (১৯৮৩ খ্রিঃ) নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। মাটি থেকে মন্দিরের কেন্দ্রীয় চূড়াটি '৭০ ফুট' উঁচু ছিল বলে জানা যায়। মিঃ ফার্গুসন (Mr. Fergusson) এই মন্দিরের ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন এবং কারভিলিনিয়ার (curvilinear) স্টাইলের মন্দিরের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলে তিনি এটিকে অভিহিত করে গেছেন।[১]

এই মন্দিরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর পোড়ামাটির চিত্রফলক (terra-cotta plaques)। রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত উল্লেখযোগ্য কাহিনীগুলি পোড়ামাটির চিত্রফলকের সাহায্যে অতি সুন্দর ও ধারাবাহিকভাবে মন্দির গাত্রে তুলে ধরা হয়েছে। সেই সঙ্গে আছে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালির সমাজজীবনের ছবিও। কোনো চিত্রফলকে তুলে ধরা ছবি সাধারণত দ্বিতীয় বার ব্যবহার করা হয়নি। মন্দিরের একদম তলদেশ থেকে শুরু করা ছাদের কার্নিশ পর্যন্ত সর্বত্রই দেয়ালগুলি বিভিন্ন চিত্রফলক দ্বারা অলংকৃত করা হয়েছে।

চিত্র ফলকগুলি অতি উৎকৃষ্ট মানের। ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দের আগে নির্মিত এ সমস্ত চিত্র ফলক এখনও (১৯৮৩ খ্রিঃ) অটুট ও উজ্জ্বল আছে। ভূমিকম্প ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে মন্দিরের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু চিত্রফলকগুলি মাটির তৈরি হলেও বেশ ভাল অবস্থায়ই টিকে আছে।

---

১. মন্দির সম্পর্কে তিনি বলেন, "One of the best examples of a temple in this style (Curvilinear) is that at Kantanagar...it is a nine towered temple of considerable dimensions, and of pleasingly picturesque design. The central pavilion is square, and but for its pointed form shows clearly enough its descent from Orissan prtotypes, the other eight are octagonal, and their form suggests, as its origin, a number of bambus arranged in a circle or polygon, with their head bent together and cords binding them horizontally at equal intervals. The pointed arches that prevail throughout are certainly derived from Muhammadan origins, but the building being in brick their employment was inevitable"—Ancient Monuments of East Pakistan p. 144.—Dr. S.M. Hasan.

মিঃ ফার্গুসন চিত্র ফলকগুলির যথেষ্ট প্রশংসা করে গেছেন।[১]

এ মন্দিরের নির্মাণ কার্য আরম্ভ করেন দিনাজপুরের বিখ্যাত জমিদার মহারাজা প্রাণনাথ রায় (মৃত্যু : ১৭২২ খ্রিঃ) তাঁর মৃত্যুর পূর্বে এবং সমাপ্ত করেন তাঁর পুত্র (পোষ্য পুত্র) মহারাজা রামনাথ রায়। তাঁরা উভয়ে প্রতাপশালী সামন্ত নৃপতি ছিলেন। মন্দিরের উত্তর দিকের ভিত্তিবেদীতে যে শিলালিপি আছে, তার পাঠ নিম্নরূপ :

> "শ্রী শ্রীকান্ত :
> শাকে বেদাব্ধি কাল ক্ষিতি পরিগণিতে ভূমিপঃ প্রাণনাথ ঃ
> প্রাসাদাঞ্চ্যতিরম্য সুরচিত নবরত্ন্যাখ্য মস্মিন্ন কার্য্যাৎ।
> রুক্মিণ্যাঃ কান্ত তুষ্টৌ সমুদিত মনসা রামনাথেন রাজ্ঞা
> দত্তঃ কান্তায় কান্তস্য তু নিজ নগরে তাত সংকল্প সিদ্ধৌ।"

অনুবাদ : প্রাসাদতুল্য অতিরম্য সুরচিত নবরত্ন দেবালয়ের নির্মাণ কার্য নৃপতি প্রাণনাথ আরম্ভ করেন। রুক্মিণীকান্তের (শ্রীকৃষ্ণের) তুষ্টির জন্য [ও] পিতার সংকল্প সিদ্ধির নিমিত্ত ১৬৭৪ শাকে (১৭৫২ খ্রিঃ) নৃপতি রামনাথ কান্তের নিজনগরে (কান্তনগরে) কান্তের (শ্রীকৃষ্ণের) উদ্দেশ্যে এই মন্দির উৎসর্গ করেন।

বেদ, অব্ধি, কাল ও ক্ষিতি এই শব্দ চতুষ্টয়ের অর্থ যথাক্রমে ৪, ৭, ৩ ও ১ ধরে অঙ্কস্য বামাগতিতে এ মন্দির ১৩৭৪ শকে (১৪৫২ খ্রিঃ) নির্মিত হয়েছিল বলে অনেকে ধারণা করেন। কিন্তু এ পাঠ ও ধারণা ভুল। কালকে ৩ (ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) না ধরে ৬ (ছয় ঋতু) ধরলে লিপিতে পাঠ দাঁড়ায় ১৬৭৪ শকাব্দ (১৭৫২ খ্রিঃ)। এ পাঠই সঠিক।

রাজা প্রাণনাথ ১৭২২ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান। আলোচ্য শিলালিপি ও দিনাজপুর রাজবংশের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, তিনি এই মন্দিরের নির্মাণ কার্যআরম্ভ করেন এবং তাঁর পুত্র রাজা রামনাথ তা সমাপ্ত করেন। রাজা রামনাথ ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতএব এই মন্দির ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত হয়েছিল এই পাঠই গ্রহণযোগ্য। ১৪৫২ খ্রিষ্টাব্দে দিনাজপুর রাজবংশের কোন অস্তিত্বও ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় এবং রাজা প্রাণনাথ ছিলেন এই বংশের দ্বিতীয় নৃপতি।[২]

এই মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে একটি মুখরোচক কাহিনী আছে। কথিত আছে যে, বর্ধনকোটের জমিদারি জোর পূর্বক অধিকারের অভিযোগে অভিযুক্ত রাজা প্রাণনাথকে একবার সম্রাট অওরঙ্গযেবের দরবারে দিল্লী যেতে হয়েছিল। অভিযোগ খণ্ডন করে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি নাকি বৃন্দাবন তীর্থ দর্শনে গিয়েছিলেন। বৃন্দাবন ধামে একদা যমুনা জলে স্নান কালে তিনি কাল পাথরে তৈরি একটি কৃষ্ণমূর্তি নাকি আকস্মিকভাবে পেয়ে যান এবং কৃষ্ণভক্ত রাজা মূর্তিটিকে স্বীয় আবাসস্থলে যত্ন সহকারে নিয়ে আসেন।

১. তিনি এ সম্পর্কে আরও বলেন, "No stone is used in the building, and the whole surface is covered with designs in terra-cotta partly conventionnal and these are frequently repeated, as they may be without offence to taste, but the bulk of them are figure-subjects, which donot ever seem to be repeated, and form a perfect repository of manners, customs and costumes of the people of Bengal at the eighteenth century."—Ibid.

২. Eastern Bengal District Gazeteers—Dinajpur, pp. 22-24—F.W. Strong

সেদিন রাতেই নাকি তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হন যে, এ মূর্তি তাঁর নিজরাজ্যে ও জলপথে নিয়ে যাবার সময় নৌকা যেখানে নিজে থেকেই থেমে যাবে, সেখানেই মূর্তিটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। জলপথে দিনাজপুরে পৌছালেও নৌকা সেখানে না থেমে পুনর্ভবার উজান স্রোতে অগ্রসর হয়ে বর্তমান কান্তনগরে নাকি থেমে যায়। রাজা প্রাণনাথ সেখানেই মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথমে একটি ছোট মন্দিরে সাময়িকভাবে নাকি মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে বহু সময় ও অজস্র অর্থব্যয় করে আলোচ্য মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়।

জনপ্রবাদভিত্তিক এ কাহিনীর পিছনে কোনো সত্য আছে বলে মনে হয় না। সুদূর বৃন্দাবন থেকে মূর্তি বহনকারী নৌকাটি যে নিজের ইচ্ছায় দিনাজপুর পর্যন্ত আসেনি, আসতে পারেনা এ সম্পর্কে অধিক আলোচনা নিরর্থক। পথিমধ্যে যে নৌকাটিকে অনেকবার থামাতে হয়েছিল, সে ধারণা অতি সহজেই করা যায়। আর দিনাজপুর ঘাট থেকে নৌকাটি কান্তনগর পর্যন্ত নিজের ইচ্ছায় গিয়েছিল, সেটি রূপকথার কাহিনীর মতই অলীক।

খুব সম্ভব বর্তমানে কান্তনগর নামে পরিচিত এই অতি প্রাচীন ও পরিত্যক্ত স্থান রাজা প্রাননাথ নতুন করে আবাদ করতে চেয়েছিলেন। তাই ঢেপা নদীর তীরবর্তী এ স্থানে তিনি একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। অন্য কোনো কারণেও এখানে মন্দিরটি নির্মিত হয়ে থাকতে পারে। প্রকৃত কারণটি জানা যায়নি।

প্রথমে যে এখানে একটি ছোট মন্দির তৈরি করা হয়েছিল, সে ঘটনা সত্য। সে মন্দিরটি আজও আছে। বর্তমান কান্তনগর মন্দিরের বেষ্টনী প্রাচীরের বাইরে প্রায় ১০০ মিটার উত্তর দিকে শ্যামগড়ের কাছে এ মন্দির অবস্থিত। সেই মন্দির নির্মাণ করতেও বেশ দীর্ঘদিন লেগেছিল বলে মনে হয়। মন্দিরটি বেশ যত্ন সহকারে তৈরি করা হয়েছিল। এক কক্ষ বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র মন্দির এটি।

খুব সম্ভব প্রাণনাথের বৃন্দাবন থেকে একটি কৃষ্ণমূর্তি আনার কাহিনী সত্য। যে মূর্তিটি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এতকাল ধরে এখানে ছিল, তা মানুষের হাতে গড়া মূর্তি, কোন পাথরের নোড়া নয়। অতএব যমুনার জলে মূর্তি পাওয়ার কাহিনীকে অলীক বলা যেতে পারে। খুব সম্ভব কৃষ্ণভক্ত প্রাণনাথ বৃন্দাবন থেকে মূর্তিটি কিনে এনে এখানে মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই মূর্তি মোটেই প্রাচীন নয়। এ ধরনের মূর্তি এখনও মথুরা-বৃন্দবন অঞ্চলে গঠন ও বিক্রি করা হয়।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাক সেনারা মূর্তিটিকে নষ্ট করে ফেলে। স্বাধীনতার পরে কলকাতা থেকে অনুরূপ একটি মূর্তি আনিয়ে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখানে প্রতি বছর একটি বিরাট মেলা বসে। মেলাতে বহু লোকের ভীড় হয়।

যৌথ উপাসনালয়

কান্ত নগরের চিহিলগাযী মাযার থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার উত্তরে ১টি ও সেখান থেকে প্রায় ৭০০ মিটার উত্তরে আর ১টি বিচিত্র ধরনের ইমারত (মাযার বা উপাসনালয়) কান্তনগর দুর্গ এলাকার মধ্যে ছিল। প্রথমটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও দ্বিতীয় ইমারতটি এখনও টিকে আছে।

বর্গাকারে নির্মিত এই ইমারতের প্রত্যেক বাহু বাইরের দিকে প্রায় ৪ মিটার লম্বা। দেয়ালগুলি প্রায় ২½ ফুট চওড়া। উপরে আছে ১টি মাত্র গম্বুজ। ইমারতের পূর্ব দেয়ালে আছে ১টি প্রবেশপথ। এই প্রবেশপথ বরাবর ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ১টি মিহরাব। দক্ষিণ দেয়ালে আছে আর একটি দরজা এবং সেই দরজা বরাবর ভিতরে উত্তর দেয়ালের সামনে আছে একটি ছোট বেদী। মুসলিমরা পূর্ব দ্বার দিয়ে ঢুকে মিহরাবের সামনে টুক করে সেজদা দিয়ে চলে যেতেন আর হিন্দুরা দক্ষিণ দ্বার দিয়ে ঢুকে বেদীতে মানত দ্রব্য রেখে চলে যেতেন। মানত দ্রব্যের মধ্যে বেশির ভাগ ছিল মাটির তৈরি ছোট ছোট ঘোড়া। অনেক মুসলমানও এ ধরনের মানত দ্রব্য দিতেন।

এ ধরনের অসংখ্য যৌথ উপাসনালয় দিনাজপুর জেলায় এককালে ছিল। মাদার পীরের আস্তানা বলে কথিত এধরনের ইমারত মোঘল আমলের শেষ দিকে এবং কোম্পানী আমলের প্রথম দিকে নির্মিত হয়েছিল বলে প্রত্ন প্রমাণে জানা যায়।

সনকার যৌথ উপাসনালয়

এখান থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার উত্তর দিকে সনকা নামক স্থানে একটি প্রাচীন দিঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে জঙ্গলাবৃত অবস্থায় অনুরূপ একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আছে। তবে এটি আরও প্রাচীন, খুব সম্ভব মোঘল আমলের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত। এই ইমারতটি প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পথে।

কান্তনগর চিহিল গাযীর মাযার, মসজিদ ও অন্যান্য কীর্তি

কান্তনগর মন্দির থেকে প্রায় ১ দেড় কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বদিকে এবং দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁও পাকা সড়ক থেকে প্রায় ২০০ মিটার পূর্ব দিকে এই মাযার অবস্থিত। ২৭ মিটার দীর্ঘ এই মাযারকে 'গঞ্জে শহিদান' বা 'চিহিল গাযীর মাযার' (দিনাজপুর চিহিল গাযী দ্র.) বলা হয়ে থাকে। মাযারটি প্রায় ২ মিটার চওড়া এবং প্রায় ১ মিটার উঁচু। মাযারের চারদিকে প্রায় দেড় মিটার উঁচু পাকা দেয়াল ছিল। উত্তর দিকের দেয়াল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু বাকি তিন দিকের দেয়ালের কিছু কিছু অংশ এখনও টিকে আছে। উপরে কোনো ছাদ বা আচ্ছাদন ছিল না।

কবর ও দেয়ালে ব্যবহৃত ইটগুলি বিভিন্ন মাপের এবং এগুলি যে প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। এখানে একটি আরবি শিলা-লিপি ছিল বলে লোক মুখে শোনা যায়। কয়েক বছর আগে নাকি এক পাগলিনী মাযারের উত্তরদিকে অবস্থিত একটি কূপে তা নিক্ষেপ করে। সেই কূপের কোনো চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায়নি। আদতে এখানে কোনো কূপ ছিল কিনা তা বলাও দুঃসাধ্য।

মাযারের সামান্য উত্তর-পশ্চিম দিকে মুসলিম আমলের একটি ছোট ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আছে। এই ধ্বংসাবশেষের প্রায় ৫০ মিটার উত্তর-পূর্ব দিকে অনুরূপ আর একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আছে। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের আর. এস. মানচিত্রে উভয় ধ্বংসাবশেষকেই মসজিদ জাতীয় ইমারত বলে দেখান হয়েছে। এতে ধারণা হয় যে, মুসলিম আমলে এই মাযারে বহু লোকের সমাগম হত। মাযার থেকে প্রায় ২০০ মিটার

দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পাকা সড়কের প্রায় লাগোয়া পশ্চিম দিকে (দুর্গের দক্ষিণ ফটকের সামান্য উত্তর দিকে) আর একটি পাকা মসজিদ ও পাকা কূপ ছিল। এ দুটি কীর্তির কোনো চিহ্নও এখন আর টিকে নেই। পাকা কূপটির ধ্বংসাবশেষ আমরা নিজের চোখেই ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে দেখেছিলাম।

মাযারের পূর্ব পার্শ্বে একটি অনুচ্চ ঢিবি আছে এবং এতে একটি ছোট ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আছে। খুব সম্ভব এখানে ছিল খাদিমের বাসস্থান। এর লাগোয়া পূর্ব দিকে আছে মজে যাওয়া একটি ছোট পুকুর। তাতে বাঁধান ঘাট ছিল বলে মনে হয়।

মাযারটিকে স্থানীয় জনশ্রুতিমূলে 'গঞ্জেশহীদান' বলা হলেও সেটেলম্যান্ট রেকর্ডে এটিকে 'চিহিলগাজী' বলা হয়েছে। এর নামে বহু লাখেরাজ সম্পত্তি ছিল। পার্শ্ববর্তী গড় মল্লিকপুর গ্রামে বসবাসকারী খাদিমের বংশধরগণ এখনও এ সম্পত্তি ভোগ করেন।

দিনাজপুর চিহিল গাযীর মাযার, মসজিদ ও অন্যান্য কীর্তি

দিনাজপুর শহরের উপকণ্ঠে দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁও পাকা সড়কের পশ্চিম পার্শ্বে চিহিলগাযী নামক একটি প্রাচীন স্থান আছে। দুটি প্রাচীন জলাশয়, একটি প্রাচীন ঈদগাহ্ ও কবরস্থান, একটি বিচিত্র ধরনের মাযার ও একটি প্রাচীন মসজিদসহ সমুদয় এলাকার আয়তন আনুমানিক ১০ একর। পাকা সড়ক থেকে প্রায় ৭৫ মিটার পশ্চিমে মাযার। মাযারের দক্ষিণ দেয়ালের সামান্য পশ্চিমেই আছে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ। মাযারের দক্ষিণ, পূর্ব, পূর্ব-দক্ষিণ দিকের সমগ্র এলাকা জুড়ে কবরস্থান। অসংখ্য প্রাচীন কবর আছে সেখানে। নতুন কবরের সংখ্যাও অল্প নয়। মাযার ও মসজিদের দক্ষিণে প্রায় ৪ বিঘা আয়তনের কিঞ্চিৎ উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ একটি প্রাচীন জলাশয় আছে।

পুকুর, মসজিদ ও মাযারের পশ্চিমে প্রায় দেড় একর উঁচু ভূমি জুড়ে ছিল একটি শালবন। বনের ভিতরে মাটির নিচে প্রাচীন ইট পাওয়া যায়, তবে খুব বেশি নয়। শালবনের উত্তরে একটি প্রাচীন দিঘি আছে। আনুমানিক ১৫০ মিটার × ৫০ মিটার আয়তনের উঁচু পাড়বিশিষ্ট উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এ দিঘির চার পাড়ে ৪টি ইট বাঁধান ঘাট আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯৬৮ সালে জলাশয়টি নতুন করে খনন করার কালে। প্রশস্ত ঘাটগুলি দিঘির তলদেশে নেমে গেছে। ইটগুলি খুবই প্রাচীন। ঘাটগুলি এখনও অটুট আছে। দিঘির লাগোয়া পূর্বদিকে একটি বিরাট আয়তনের ঈদ্‌গাহ্ ছিল। ঈদ্‌গাহ্‌র পশ্চিম দেয়ালের প্রায় ৫ মিটার এখন টিকে আছে। দেয়ালটি এখনও ২.৪২ মিটার উঁচু। ঈদগাহ্‌টি খুব সম্ভব মোঘল আমলের।

মাযারের দক্ষিণ দিকের পুকুরের উত্তর পাড়ে বেলে পাথরে তৈরি একটি বিরাট গৌরীপট্ট ছিল। প্রায় ১.২ মিটার ব্যাসবিশিষ্ট গৌরীপট্টটি বর্তমানে দিনাজপুর যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এর উপরকার শিবলিঙ্গটি পাওয়া যায়নি। গৌরীপট্টের কাছাকাছি স্থানে অনেকগুলি বেলে পাথরের টুকরা পড়েছিল। প্রায় ১.২ মিটার দীর্ঘ টুকরাগুলি কোনো মন্দিরের স্তম্ভ বা খিলান ছিল বলে ধারণা হয়।

মসজিদ

চিহিলগাযী মসজিদ এখনও অতি জীর্ণ অবস্থায় কোনো রকমে টিকে আছে। সামনের বারান্দা ও উপরের গম্বুজ নেই। এই মসজিদের ভিতরের আয়তন ছিল ৪.৮৪ মিটার × ৪.৮৪ মিটার। দেয়ালগুলি ছিল বেশ পুরু। পূর্ব ও মাঝের দেয়ালে ৩টি করে প্রবেশপথ ছিল। বারান্দাসহ উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ছিল ২টি করে প্রবেশ পথ। পশ্চিম দেয়ালে ছিল ১টি মাত্র মিহরাব। প্রধান কক্ষের উপরে ছিল একটি মাত্র গম্বুজ এবং তা ছিল অর্ধগোলাকার। বারান্দায় কোনো গম্বুজ ছিল কিনা, তা সঠিকভাবে বলা যায় না। প্রবেশপথগুলি কালপাথরে তৈরি। দেয়ালের মাঝে স্থানে স্থানে ছিল বেলে পাথর বসান। মসজিদের গায়ে সুন্দর পোড়ামাটির চিত্রফলক ছিল। মিহরাবটিতেও ছিল অতি সুন্দর পোড়ামাটির চিত্র ফলকের কারুকার্য।

কেউ কেউ এই মসজিদকে বর্গাকারে নির্মিত একটি শিব মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছিল বলে থাকেন। এ রকম ধারণার পিছনে কোনো যুক্তিই যে নেই, তা বলাই বাহুল্য। মিহরাব, গম্বুজ, প্রবেশপথ, এবং সর্বোপরি এই ইমারতের স্থাপত্য কৌশল সম্পূর্ণরূপে একটি মসজিদের, মন্দিরের গঠন পদ্ধতির সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই। তবে এখানে যে একটি প্রাচীন শিবমন্দির ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের ইট-পাথর যে এই মসজিদে ব্যবহৃত হয়েছিল, সে প্রমাণেরও অভাব নেই।

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুরের তদানীন্তন জেলা প্রশাসক মিঃ ওয়েস্টমেকট এখান থেকে ৩টি শিলালিপি উদ্ধার করেছিলেন। ২টি শিলালিপি খুব সম্ভব কলকাতার কোনো যাদুঘরে আছে। তৃতীয় ও প্রধান শিলালিপিটি কিঞ্চিৎ ভগ্নাবস্থায় বর্তমানে দিনাজপুর যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এই লিপির পাঠ থেকে জানা যায় যে, সুলতান রুকন-উদ্-দীন বারবক শাহ্র রাজত্বকালে 'খান-ই-আযম ওয়া খাকান-ই-মোয়য্যাম সর-ই-লশ্কর ওয়া উযীর ইকরার খান'-এর নির্দেশে 'জোর ও বারোর মোয়ালেমাত' ও অন্যান্য মহলের 'জঙ্দার ওয়া শিক্দার' নুসরত খান ৮৬৫ হিজরী সনের ১৬ই সফর (১৪৬০ খ্রিস্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর) এই মসজিদ নির্মাণ ও 'রওযা' (মাযার) মেরামত করেছিলেন।

মাযার

শিলালিপিতে মাযার ('রওযা')-এর উল্লেখ থাকলেও মাযারের 'চিহিল গাযী' বা অন্য কোনো নাম নেই। অন্য কোনো শিলালিপি বা দলিলপত্রেও মাযারের কোনো নাম পাওয়া যায়নি। ডক্টর বুকানন হ্যামিলটন তাঁর প্রতিবেদনে (২৯ পৃ.) 'চিহিল গাযী' নামের প্রথম উল্লেখ করেন। সেই সূত্র ধরেই মিঃ ওয়েস্টমেকট এই মাযার সম্পর্কে কিছু বর্ণনা রেখে যান। তবে সেই বর্ণনায় বিশেষ কোনো তথ্য নেই।[১]

১. মিঃ ওয়েস্টমেকট (E. Vesey Westmacott) বলেন, "The grave surrounded by an iron railing is 54 feet long and is supposed to correspond to the stature of the saint. It is to the north side of the path into the mosque, some hundred

৩৬ হাত (১৬.৩৬ মিটার) লম্বা এই প্রাচীন সমাধি কিছুকাল আগে পর্যন্ত পূর্বের মতই জীর্ণ অবস্থায় ছিল। প্রাচীন কালের ইট দিয়ে নির্মিত মাযারের উপরে কোনো আচ্ছাদন ছিল না। লোকে বিদ্রূপ করে এটিকে চিহিলগাযীর স্থলে 'শিয়াল গাযীর মাযার' বলে আখ্যায়িত করত। হাল আমলে (১৯৬৮ খ্রিঃ) এই মাযারের অভাবিত উন্নতি সাধিত হয়েছে। প্রতিদিন রাস্তার পাশে রক্ষিত দানবাক্সে যা পড়ে, তাতে মাযারের সম্পূর্ণ রূপটি বদলে গেছে। উপরে ছাদ উঠেছে, চার পাশে দেয়াল উঠেছে, মাযারের উপরে অতিমূল্যবান রেশমি কাপড়ের গিলাপ পড়েছে আর বিচিত্র ধরনের একাধিক তোরণও নির্মিত হয়েছে।

শিলালিপির পাঠ থেকে জানা যায় যে, ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দেও মাযারটি বিদ্যমান ছিল এবং খুব সম্ভব মাযারের জীর্ণ অবস্থার কারণে মেরামতের ('মেরামত কারদা-ই-রওযা') প্রয়োজন হয়েছিল। রাস্তা থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে অবস্থিত মাযারের কাছে একটি মসজিদ নির্মাণের দৃষ্টান্ত থেকে ধারণা করা যায় যে, মাযারে তখন যথেষ্ট লোক সমাগম হত এবং খুব সম্ভব এটি স্থানীয় মুসলমানের নিকট একটি পবিত্র স্থান ছিল এবং তাদের নামাজ পড়ার সুবিধার জন্য মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। লিপিতে রওযা শব্দ দেখে মনে হয় যে, এটি কোনো সাধারণ কবর ছিল না। কিন্তু এটি কার, তা মেরামতকারীদের জানা ছিল না বলে মনে হয়। যদি জানা থাকত তবে শিলালিপিতে মাযারে সমাহিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নাম থাকার সম্ভাবনা ছিল।

আরও ছয়টি মাযার

চিহিলগাযী মসজিদ বরাবর দক্ষিণে যে পুকুরটি আছে তার পশ্চিম পাড় ও সংলগ্নভূমি এমন গভীর জঙ্গল আবৃত ছিল যে, সেখানে কোনো প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ কারোর নযরে পড়েনি। একারণে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত সেখানে অবস্থিত কোনো প্রাচীন কীর্তির কোনো চিহ্ন গ্রন্থকারের নযরেও পরেনি যদিও এ স্থানের সঙ্গে গ্রন্থকারের দীর্ঘ কালের পরিচয় ছিল।

১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের পরে গ্রন্থকারের চিহিলগাযী দর্শনকালে সেই পুকুরের পশ্চিম গাড় জঙ্গলমুক্ত অবস্থায় এবং সেখানে পুকুরের পশ্চিম পাড়ে উত্তর-দক্ষিণে এক সারিতে ৬টি পাকা সমাধি দেখতে পায়। একই ভাবে, একই আয়তন ও আকার বিশিষ্ট পাকা কবরগুলির মাটি থেকে উচ্চতা ছিল প্রায় ১.৫১ মিটার (প্রায় ৫ ফুট)। এগুলির উপরে বর্তমানে কোনো ছাদ নেই, কোনোকালে ছিল বলেও মনে হয় না। খোলা আকাশের নিচে বিচ্ছিন্নভাবে নির্মিত এবং একে অন্যের মধ্যে দূরত্ব প্রায় ৩ মিটার।

কবরগুলির গায়ে কোনো লিপি নেই এবং এগুলি সম্বন্ধে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্যও পাওয়া যায়নি। তবে যতটুকু মনে হয় এগুলি চিহিলগাযী মাযারের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল।

চিহিলগাযী : এ যৌথ কবরে মন্দিরের সামনে খুব সম্ভবত, সাধারণ সৈনিকদের খণ্ড-বিখণ্ডিত দেহ একত্র করে সমাহিত করা হয়েছিল। আর যে ক'জন সেনাপতি (ছয়

yards to the west . . . Darjeeling Road, four miles to the north of Dinajpur and not far from the Gopalganj temple...I have found out nothing of the *Peer* beyound his name."

জন) সেই যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন তাদেরকে রাজবাড়িতে সমাহিত করা হয়েছিল। বিজিত রাজবাড়িতে বিজয়ী পক্ষের নিহত সেনাপতিদের যুদ্ধ নিহত সেনাপতিদের দেহ সমাহিত করার অনুরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে।

ইতিহাস

এ মাযার সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্যই পাওয়া যায় না। স্থানীয় জনপ্রবাদ মতে জানা যায় যে, একদল মুসলিম ধর্মযোদ্ধা গোপাল নামক এক হিন্দু রাজার সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে যখন এস্থানে বিশ্রামরত ছিলেন, তখন সেই পরাজিত হিন্দু নরপতি অতর্কিতে আক্রমণ করে ৪০ জন 'গাযী' (ধর্মযোদ্ধা)-কে নিহত করেন। কিন্তু অবশেষে সেই হিন্দু রাজা পরাজিত হন এবং এ অঞ্চল মুসলমানের অধিকারে আসে। নিহত ৪০ জন গাযীকে একত্রে সমাহিত করা হয় বলে এ স্থানের নাম হয় 'চিহিল' (চল্লিশ) 'গাযীর' (ধর্মযোদ্ধার) মাযার। এ কাহিনীর পিছনে কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

এ মাযার কোনো ব্যক্তি বিশেষের সমাধি নয়, হতে পারেনা। কোনো একক ব্যক্তির সমাধি এত বড় লম্বা করে নির্মাণ করতে সচরাচর দেকা যায় না। যদি কোনো ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাবশত: এ ধরনের লম্বা করে নির্মাণ করা হত, তবে সমাধির উপর একটি সৌধ নির্মিত হবার সম্ভাবনা ছিল বেশি। সমাহিত ব্যক্তিটি যদি বিশেষ কোনো 'বুযুরগ্' বা সম্মানী ব্যক্তি হতেন, তবে খোলা মাঠে মাযারটি পড়ে থাকতনা। এতে ধারণা করা যায় যে, এটি কোনো একক ব্যক্তির কবর নয়। খুব সম্ভব এখানে একাধিক ব্যক্তিকে যৌথভাবে দাফন করা হয়েছিল এবং তা থেকেই খুব সম্ভব চিহিল অর্থাৎ চল্লিশ গাযীর মাযার নামটি চলে আসছে। সাধারণ অবস্থায় এ ধরনের যৌথ কবর হয় না। কোনো বিশেষ জরুরী অবস্থা যেমন যুদ্ধ, বড় রকমের কোনো মহামারী, রাজরোষে পতিত অসংখ্য ব্যক্তি বর্গের একত্রে নিধন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ ধরনের যৌথ কবর হওয়া সম্ভব। এ ক্ষেত্রে খুব সম্ভব যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের খণ্ডিত দেহের অবয়বগুলি একত্র করে যৌথভাবে দাফন করা হয়েছিল। এই যৌথ কবরের পিছনে দুটি সম্ভাবনা থাকতে পারে। হয় দেহগুলি এমনভাবে খণ্ডিত হয়েছিল যে, তাদেরকে ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করার উপায় ছিল না, অথবা সময়ের অল্পতার জন্য অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে যুদ্ধে নিহত লাশ গুলিকে একত্রে সমাহিত করা হয়েছিল।

এ যুদ্ধ যে এ স্থানে অথবা কাছাকাছি কোথাও ঘটেছিল, সে অনুমান যুক্তিসহ। এখানে প্রাপ্ত বিরাট গৌরীপট্ট, শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন, প্রাচীন আমলের পাথর ও ইট, প্রাক-মুসলিম আমলের বাঁধান ঘাটসহ দুটি জলাশয়, সেই আমলের অন্যান্য ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন ইত্যাদি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে এখানে হিন্দু মন্দিরসহ একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদের অস্তিত্ব ছিল এবং খুব বড় না হলেও অন্তত একজন সামন্ত শ্রেণীর নৃপতির আস্তানা খুব সম্ভব এখানে ছিল। কান্তনগর দুর্গের সঙ্গে এ স্থানের খুব সম্ভব সম্পর্ক ছিল। কান্তনগরে বসবাসকারী নৃপতির একটি ঘাঁটি বা প্রশাসন কেন্দ্র এখানে থাকা খুব বিচিত্র নয় (কান্তনগর দ্র.)।

খুব সম্ভব সেই নৃপতির সঙ্গে মুসলিম আমলে কোনো সুলতানের একটি বড় ধরনের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে নিহত মুসলিম সৈনিকদেরকে বোধ হয় এখানে যৌথভাবে সমাহিত করা হয়। কান্তনগরে আর একটি যুদ্ধ হয় এবং সেখানে নিহত সৈনিকদেরকেও অনুরূপভাবে এর চেয়েও বড় (২৫.৪৪ মিটার) একটি যৌথ কররে দাফন করা হয়। এর পরে চিহিলগাযী নামে পরিচিত আরও একটি যৌথ কবর দেখা যায় আত্রাই নদীর অপর তীরবর্তী এলাকা খানসামা থানার অন্তর্গত 'চিহিলগাযী' নামক একটি স্থানে। সে কবরটিও আলোচ্য চিহিল গাযীর মত লম্বা। দিনাজপুর শহর থেকে অনেক দূরে ও দুর্গম স্থানে অবস্থিত বলে অনেকে সেই কবরের খবর রাখেন না। এই ৩টি কবর একই ধরনের ইট দ্বারা, একইভাবে নির্মিত বলে ধারণা করা যায় যে, এগুলি একই সময়ে নির্মিত হয়েছিল।

খুব সম্ভব প্রথম যুদ্ধটি চিহিলগাযী বা তার অতি নিকবর্তী স্থানে সংঘটিত হয়। এতে অমুসলিম শক্তি পরাজিত হয়ে কান্তনগরে পালিয়ে যায়। সেখানে দ্বিতীয় যুদ্ধটি হয় এবং তাতেও মুসলিম শক্তির বিজয় লাভ ঘটে। যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদেরকে অনিবার্য কারণে যৌথভাবে কবর দেওয়া হয় এবং মন্দিরের সামনে সেই কবরটি করা হয় বিজেতাদের শ্লাঘা চরিতার্থ করার জন্য। কান্তনগরের কবরটিও একটি মন্দিরের কাছে হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। অতঃপর তৃতীয় যুদ্ধ দিনাজপুরের মাটিতে হয় আত্রাই নদীর অপর তীরে খানসামা থানায়, কামরূপের দিকে পলায়মান বিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে।

এখন প্রশ্ন জাগে, এ যুদ্ধ কখন ঘটেছিল? বখতিয়ার খলজীর সময়ে এ যুদ্ধ হয়েছিল বলে মনে হয় না। তিনি একরকম বিনা বাধায় সমগ্র উত্তর বঙ্গ অধিকার করেছিলেন এবং চিহিলগাযী থেকে মাত্র ৩২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত দেবকোটে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। উত্তরবঙ্গ ছিল সেনদের রাজ্য এবং সেখানে এমন কোনো শক্তিশালী নৃপতি ছিলেন না যিনি বখতিয়ারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতেন। তা যদি হত, তবে বখতিয়ার তিব্বত অভিযানে যেতে পারতেন না। বখতিয়ারের সময় থেকে আরম্ভ করে সুলতান শামস্-উদ্-দীন ফিরোজ শাহ্র রাজত্বকাল পর্যন্ত সমগ্র উত্তর বঙ্গে মুসলমানদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। মুসলিম সুলতানদের অনধিকৃত রাজ্য ছিল করতোয়া নদীর অপর তীরে অবস্থিত কামরূপ। বারবার অভিযান চালিয়েও এসময়ের ভিতরে সে রাজ্যে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি।

সোনার গাঁয়ের সুলতান ফখর-উদ্-দীন মোবারক শাহ্ ও গৌড়ের সুলতান আলা-উদ্-দীন আলী শাহ্র রাজত্বকালে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে গৌড়ের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে চিহিলগাযী-কান্তনগর এলাকার কোনো সামন্ত নৃপতি হয়ত মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেন এবং পার্শ্ববর্তী কামরূপরাজ খুব সম্ভব তাঁর সহায়ক হন। সুলতান শামস-উদ্-দীন ইলিয়াস শাহ্ যখন কামরূপে অভিযান চালান, তখন খুব সম্ভব কামরূপ রাজের সাহায্যপুষ্ট এই সামন্ত নৃপতির সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ ঘটে। চিহিল গাযী, কান্তনগর ও খানসামা থানার চিহিলগাযীতে খুব সম্ভব পরপর ৩টি যুদ্ধ ঘটে। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শত্রুসেনা কামরূপে চলে যায় এবং কামরূপও ইলিয়াস শাহ্ কর্তৃক অধিকৃত হয়। যুদ্ধের পরে খুব সম্ভব সমাধিগুলি পাকা করে দেওয়া হয়। এজন্যই খুব সম্ভব প্রায় ১০০ বছর পরে ১৪৬০

সালে যখন মাযারটি মেরামত করা, হয় তখন এখানে সমাহিত ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি।[১]

মুল্লুক দিওয়ানের মাযার ও দিঘি

বিরল থানা থেকে প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ একটি বিরাট দিঘি আছে। দিঘির প্রশস্ত পাড়গুলি বেশ উঁচু। পশ্চিম পাড়ের প্রশস্ততা প্রায় ৩২ মিটার। এখন সেখানে মুসলমানের কবরস্থান। দিঘির আয়তন প্রায় ১৫ একর। মুল্লুক দিওয়ানের দিঘি নামে পরিচিত এ দিঘি মুসলমান আমলের, না প্রাক মুসলিম যুগের, সে সম্পর্কে প্রশ্ন আছে।

দিঘির সামান্য উত্তর-পশ্চিমে রাস্তার লাগোয়া পূর্ব পার্শ্বে মুল্লুক দিওয়ানের মাযার একটি উঁচু ভূমিতে অবস্থিত। এ মাযারে এত সংস্কার ও চুনকাম করা হয়েছে যে, এটি সুলতানী আমলের, না মোঘল আমলের, তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন।

এ মাযার থেকে প্রায় ১৫ মিটার উত্তর-পশ্চিমে রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে আর একটি মাযার আছে। অপেক্ষাকৃত ছোট এ মাযারকে মুল্লুক দিওয়ানের বিবির মাযার বলে চিহ্নিত করা হয়।

সেনরার কীর্তিসমূহ

ফুলবাড়ি থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ও শুজাগড় থেকে প্রায় ১.৫ কিলোমিটার পশ্চিমে সেনরা নামক একটি গ্রাম আছে। সেখানে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা পাড়হীন একটি প্রাচীন দিঘি আছে। দিঘিটি আকারে ছোট। দিঘির পূর্ব পাড়ে একটি অতি কারুকার্যময় দোচালা ইমারত আছে। আনুমাকি ৫ মিটার × ৩ মিটার আয়তনের এই ইমারতের বাইরের পলেস্তারার উপরে যে কারুকার্য আছে, তার শিল্পচাতুর্য অতুলনীয়। নানা রঙ্-এর কাজ এতে আছে। লতাপাতা ফুল ইত্যাদি বিভিন্ন রঙ্-এর সাহায্যে করা হয়েছে এবং মোঘল আমলে নির্মিত এই ইমারতের রঙ-এর কাজ এতদিন পরেও অনেক স্থানে প্রায় অমলিন আছে।

এই ইমারতের লাগোয়া উত্তরে একটি ছোট মসজিদ আছে। মসজিদটি অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু পার্শ্বের দোচালা ইমারতের মতো এর বাইরের দেয়ালে পলেস্তারার উপরে নানা রঙ্-এর যে কারুকার্য আছে, তা এখনও ভালভাবে টিকে আছে।

মসজিদের উত্তর দেয়ালের সোজা পূর্ব দিকে আর একটি ইমারত ছিল। এটি এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। খুব সম্ভব এটি ছিল মসজিদের ইমাম বা সেজাতীয় কোনো ব্যক্তির বাসস্থান। আর পূর্বোক্ত দোচালা ঘরটি ছিল খুব সম্ভব একটি মাদ্রাসা।

---

১. দেবীগঞ্জ থানা থেকে প্রায় ৫ মাইল পশ্চিম দিকে আত্রাই নদীর পশ্চিমতীরবর্তী অঞ্চলে অনরূপ একটি চিহিলগাযীর মাযার আছে। সেই মাযারটিও খুব সম্ভব যুদ্ধে নিহত মুসলিম সৈনিকদের কবরের উপরে নির্মিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে গ্রন্থকার কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত তবকত-ই-নাসিরী গ্রন্থের ৩১৪ পৃ. দ্র.।

ইটের নমুনা ও ইমারতগুলির গঠন-প্রণালী দেখে ধারণা করা হয় যে, এগুলি মোঘল আমলে রাজানুগ্রহে বা কোনো ধনাঢ্য মুসলমান কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। এগুলির কোনো ইতিহাস পাওয়া যায়নি।

দারিয়া মসজিদ

নওয়াবগঞ্জ থানার অধীনে এবং থানা থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার পুব দিকে মৃতপ্রায় করতোয়া নদীর ডান (পশ্চিম) তীরে মোঘল আমলের শেষ দিকে নির্মিত একটি মসজিদ আছে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ মসজিদের আয়তন ৭ মিটার × ৪ মিটার। দেয়ালগুলি প্রশস্ত নয়। পূর্ব দেয়ালে ৩টি দরজা ও পশ্চিম দেয়ালে ৩টি মিহরাব আছে। উপরে ৩টি ছোট ছোট গম্বুজ।

মসজিদের গায়ে বিচিত্র ধরনের পোড়া মাটির চিত্রফলক আছে। হাতি, ঘোড়া, গরু, ইত্যাদি পশু এবং টিয়া ময়না ইত্যাদি পাখির চিত্রফলক মসজিদের গায়ে আছে। সাধারণত কোনো জীবজন্তুর প্রতিকৃতি মসজিদের গায়ে থাকেনা। খাকা, শাস্ত্রমতে সমস্ত কাজ নিষিদ্ধ। এক্ষত্রে তার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে।

এক সুদখোর ব্যক্তি এ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন বলে এতে কেউ নামাজ পড়তেন না। পাশেই তাঁর কবর আছে। সম্প্রতি মসজিদটিকে আবাদ করার প্রচেষ্টা চলছে। এই মসজিদ চক জুনিদের (চক জুনিদ-দারিয়া দ্র.) ধ্বংসাবশেষগুলি থেকে প্রায় ১ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

সুরা মসজিদ

ঘোড়াঘাট থেকে প্রায় ৮কিলোমিটার পশ্চিমে এবং হিলি থেকে প্রায় ১৯ কিলোমিটার পুবে হিলী-ঘোড়াঘাট সড়কের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত এ মৌজার নাম চোরগাছা। রাস্তার উত্তর পার্শ্বে আছে একটি প্রাচীন দিঘি। উত্তর-দক্ষিণ লম্বা এ দিঘির আয়তন প্রায় ৩৫০ মিটার × ২০০ মিটার। প্রশস্ত পাড়গুলি আজও প্রায় ৪.৫ মিটার উঁচু। দক্ষিণ পাড়ের মাঝামাঝি অংশে ছিল একটি বিরাট বাঁধান ঘাট। ঘাটটি দিঘির মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। পাড়ে ঘাটের ভিত্তি দেখে মনে হয়, ঘাটটি প্রায় ১৫ মিটার প্রশস্ত ছিল।

এ ঘাট থেকে প্রায় ৩০ মিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে দিঘির দক্ষিণ পাড়ের পশ্চিমাংশের দক্ষিণ দিকে এবং সদর সড়কের উত্তর পাশ্ব ঘেঁষে প্রায় ১.২ মিটার উঁচু একটি সমতল ঢিবি আছে। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা এ ঢিবির আয়তন প্রায় ৩০ মিটার × ১৫ মিটার। এ ঢিবির পশ্চিম ভাগে একটি সুরম্য মসজিদ আছে। কেউ বলেন শুজা মসজিদ আবার কেউ বলেন সুরা মসজিদ।

পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ এ মসজিদের আয়তন বাইরের দিকে ১২ মিটার × ৯ মিটার। মসজিদের ভিতরের অর্থাৎ প্রধান কক্ষের আয়তন ভিতরের দিকে ৭.৮৪ মিটার × ৭.৮৪ মিটার। পূর্ব দিকে যে-বারান্দা আছে, তার আয়তন ভিতরের দিকে ৪.৮৪ মিটার × ২.১২ মিটার। পশ্চিম ও পূর্ব দিকের দেয়ালের প্রশস্ততা ১.৮ মিটার এবং উত্তর, দক্ষিণ ও বারান্দার পূর্ব দেয়ালের প্রত্যেকটি ১.৫১ মিটার করে প্রশস্ত। মসজিদের প্রধান

কক্ষের চারকোণে ও বারান্দার দুই কোণে বাইরের দিকে একটি করে মোট ৬টি অষ্ট কোণাকৃতির প্রস্তরনির্মিত মিনার (turret) আছে। সাইজ করে কাটা পাথর দিয়ে মিনারগুলি নির্মিত হয়েছে এবং এগুলির সঙ্গে ইটের দেয়াল গেঁথে দেওয়া হয়েছে।



▲ সুরা মসজিদ, দিনাজপুর

মসজিদের পূর্ব দেয়ালে আছে ৩টি প্রবেশপথ। এগুলির বরাবর মাঝের দেয়ালে আছে ৩টি প্রবেশপথ। প্রধান কক্ষের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে এবং বারান্দার উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে মোট ৪টি প্রবেশপথ আছে। প্রধান কক্ষের উপরে আছে একটি মাত্র গম্বুজ। গম্বুজটি দেখতে বড়ই মনোরম। বারান্দার উপরে ৩টি ছোট ছোট গম্বুজ আছে। পশ্চিম দেয়ালে ৩টি সুন্দর মিহরাব আছে। প্রস্তর নির্মিত মিহরাবগুলির কারুকার্য অতি উন্নত মানের।

মসজিদের ভিতরে, প্রত্যেক কোণে এবং প্রত্যেক দেয়ালের মাঝামাঝি স্থানে ইটের সঙ্গে পাথরের মোটা গাঁথুনি ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে। প্রত্যেক দরজার নিচের চৌকাঠ পাথরের তৈরি। এ মসজিদে ব্যবহৃত পাথরের পরিমাণ এত বেশি যে, তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে মসজিদের প্রায় এক চতুর্থাংশ স্থান জুড়ে পাথরের অবস্থান বলা যেতে পারে।

যে ঢিবির উপর মসজিদটি অবস্থিত, তার চারদিকে ইষ্টক নির্মিত প্রশস্ত প্রাচীর ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এখনও ঢিবির নিম্নাংশের স্থানে স্থানে প্রাচীরের চিহ্ন বিদ্যমান। পূর্ব দিকের দেয়াল প্রায় অটুট আছে। সেদিকই মসজিদের প্রবেশ পথের সিঁড়ি। সিঁড়িতে ব্যবহৃত পাথরগুলিতে মূর্তি উৎকীর্ণ ছিল, এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

মসজিদের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে এবং দিঘির ঘাটে অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড পড়ে আছে। দুটি প্রস্তর খণ্ড বেশ বড়। প্রায় ১.৮ মিটার × ০.৯ মিটার × ০.৯ মিটার করে আয়তন বিশিষ্ট এ দুটি গ্রানাইট (granite) পাথর দিঘির ঘাটের সামনে পড়ে আছে। মসজিদের উত্তর দিকে যে অসংখ্য পাথর পড়ে আছে, সেগুলির মধ্যে একটি উন্নত মানের বেলে পাথরে একটি ছোট নারী মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। মূর্তিটির পরিচয় জানা যায়নি। তবে মূর্তি-সংবলিত পাথরটি যে কোনো মন্দির বা স্তূপের স্তম্ভ ছিল তাতে সন্দেহ নেই। স্তূপীকৃত পাথরের মধ্যে আরও কোনো মূর্তি উৎকীর্ণ আছে কিনা, তা দেখা সম্ভব হয়নি।

এ সমস্ত পাথর যে কোনো হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দিরের, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মসজিদটি যে টিবিতে অবস্থিত সেখানেই ছিল খুব সম্ভব এই মন্দির। এ মন্দির যে বিরাট আকারের ছিল, টিবির আয়তন দেখেই বোঝা যায়। কালক্রমে মন্দিরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলে, তার মালমসলা দিয়ে সুলতানি আমলে এ মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। মন্দিরে বেলে, কাল ও গ্রানাইট পাথর ব্যবহৃত ছিল। কাটার সুবিধার জন্য হয়ত বেলে ও কাল পাথরই সাইজ করে কেটে মসজিদে লাগান হয়েছে। গ্রানাইট পাথরগুলি অত্যন্ত শক্ত বলে সেগুলি সাইজ করে কাটা খুব সহজ ছিল না। তাই সেগুলি পরিত্যক্ত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

যদি মসজিদের জন্যই পাথরগুলি আনান হত তবে এত পাথর এমনভাবে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে থাকতনা এবং পাথরের গায়ে মূর্তিও থাকত না। কাজেই এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এখানে একটি মন্দির জাতীয় ইমারত-এখানে ছিল এবং মন্দিরে ব্যবহৃত পাথর ছিল এগুলি।

উত্তর-দক্ষিণে লম্বা দিঘিটিও যে প্রাচীন আমলের, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মুসলিম আমলে খনিত হলে এ দিঘির পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ হবার সম্ভাবনা ছিল বেশি।

এ মসজিদের কোনো শিলালিপি পাওয়া যায়নি। লোকপ্রবাদকে ভিত্তি করে এটিকে সুরা মসজিদ বলা হয়ে থাকে। গঠনপ্রণালী ও স্থাপত্যকৌশল দেখে এটিকে সুলতানী আমলের মসজিদ বলে ধরা যায়। এর দেয়ালে যে সুন্দর পোড়ামাটির ফলক চিত্র ছিল এবং মিহরাবের পাথরে যে সূক্ষ্ম কাজ করা আছে, তা দেখে অধ্যাপক দানী এটিকে হোসেন শাহ্র আমলের মসজিদ বলে অনুমান করেছেন। তাঁর এই ধারণার পিছনে যে যথেষ্ট যুক্তি আছে তাতে সন্দেহ নেই। গৌড়ের খনিয়া দিঘি মসজিদের সঙ্গে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে (পরে খনিয়াদিঘি মসজিদ দ্র.)।

এ মসজিদ ও সংলগ্ন দিঘিটি ছাড়া চোরগাছা মৌজায় বা আশে পাশের মৌজায় আর কোনো প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া যায়নি। খুব সম্ভব অতি প্রাচীন কালে এখানে একটি জনপদ ছিল। নানা কারণে সেই জনপদ বিলুপ্ত হয়ে গেলে পাথরের তৈরি মন্দিরটি থেকে যায়। মুসলিম আমলে ঘোড়াঘাটের নিকটবর্তী এ স্থানে হয়ত একটি মুসলিম জনপদ গড়ে ওঠে এবং সহজলভ্য মালমসলা দিয়ে এ মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। ব্রিটিশ আমলে এই স্থান পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে এবং মসজিদটিও পরিত্যক্ত হয়। পরে এ স্থানে লোক বসতি হলে মসজিদটিকে আবাদ করা হয় এবং

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে মসজিদটিকে সংরক্ষিত করা হয় এবং হাল আমলে এর সংস্কার করা হয়। এটি বাংলাদেশের একটি অতি মনোরম প্রাচীন মসজিদ।

ঘোড়াঘাট দুর্গ

বর্তমান ঘোড়াঘাট শহরের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার দক্ষিণে এ বিরাট দুর্গ অবস্থিত। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ দুর্গের পূর্ব দেয়ালের দৈর্ঘ্য ছিল ২ কিলোমিটার। পূর্ব দেয়ালের পাশেই করতোয়া নদী। পশ্চিম দেয়ালও অনুরূপ দৈর্ঘ্যের। উত্তর দেয়াল ১ কিলোমিটার লম্বা এবং দক্ষিণ দেয়াল প্রায় ১.৫ কিলোমিটার লম্বা। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দেয়ালের বাইরে যে গভীর পরিখা দেখা যায়, তা ছিল প্রায় ১৮ মিটার চওড়া। পশ্চিম দেয়ালের উত্তরাংশে উত্তর দেয়ালের কাছাকাছি স্থানে ছিল দুর্গের একটি প্রবেশ পথ। সেখান থেকে একটি পাকা রাস্তা পূর্ব-দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ দিকে গিয়ে দক্ষিণ দেয়ালের পশ্চিমাংশ ভেদ করে বাইরে চলে গেছে। সেখানেই ছিল খুব সম্ভব দুর্গের প্রধান তোরণ। দুর্গের ভিতরে পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বদিকে আনুমানিক ৩০০ মিটার দূরে ছিল দুর্গের দ্বিতীয় বা অভ্যন্তরীণ প্রাচীর। এই উত্তর প্রাচীর সোজাসুজি পূর্ব দিকে না গিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে গিয়ে পূর্ব দেয়ালে মিশেছে। এ দেয়ালের সব অংশ টিকে নেই। আশ্চর্যের বিষয় এ দেয়াল দুটির পরিখা ছিল দুর্গের ভিতরের দিকে, বাইরের দিকে নয়। খুব সম্ভব এই পরিখা বেষ্টিত স্থানে ছিল দুর্গাধিপতির বাসস্থান।

গড়ের ভিতরে মোঘল আমলের অনেক কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। গড়ের ভিতরের রাস্তার পূর্ব দিকে একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। মোঘল আমলে নির্মিত এ মসজিদে ৩টি গম্বুজ ছিল। ৩ দরজা ও ৩ মিহরাব বিশিষ্ট এ মসজিদ ছিল অত্যন্ত কারুকার্যময়। মসজিদের পাশেই ছিল একটি প্রকাণ্ড পাকা কূপ। কূপের ব্যাস ছিল প্রায় ৩.৫ মিটার। পাশেই অনেকগুলি পাকা কবর দেখা যায়।

মসজিদ থেকে কিছু দূরে রাস্তার পশ্চিম পাশে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারতের চিহ্ন দেখা যায়। ছোট বড় গোটা কয়েক জলাশয়ও আছে ধারে কাছে। লোকে বলে এখানেই নাকি ছিল দুর্গের অধিপতির নিবাস।

দক্ষিণ তোরণের পূর্ব পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত উঁচু অংশে একটি বাঁধান কবর আছে। এর নিচেই পশ্চিম দিকে ঠিক তোরণের পাশেই ছিল আরও একটি বাঁধান কবর। কিছুকাল আগে পর্যন্ত এ কবর পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল। ৮/১০ বছর আগে কবরটি নতুন করে বাঁধান হয়েছে এবং অর্থাগমের ফলে এর জৌলুসও বেড়ে গেছে। লোকে বলে শাহ্ ইসমাইল গাজীর মাযার (পরে কাটা দুয়ার দ্র.)।

দুর্গ এলাকার বেশির ভাগ, বিশেষ করে পূর্বাংশ বর্তমানে চাষের জমিতে পরিণত হয়েছে। সমগ্র দুর্গ এলাকায় প্রচুর ইট পাওয়া যায় মাটির নিচে। দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কয়েক বছর আগে সুলতানী আমলের একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ এবং সুলতান হোসেন শাহ্র একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। লিপিটি মহাস্থান যাদুঘরে আছে।

মোঘল আমলে এ স্থানে ছিল একটি বিখ্যাত সেনানিবাস ও প্রশাসনিক কেন্দ্র। এখান থেকে কামরূপ ও আসামে অনেক অভিযান চালান হয়েছে। রিসালতে যে বর্ণনা

আছে, তাতে দেখা যায় যে, সুলতান রুকন-উদ্-দীনের রাজত্ব কালে ভান্দুসী রায় ছিলেন এ দুর্গের শাসনকর্তা। এ সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা না গেলেও এ স্থানে প্রাচীন কাল থেকেই একটি দুর্গের অবস্থান ছিল বলে মনে হয়।

ঘোড়াঘাট

দিনাজপুর জেলার একদম দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে করতোয়া নদীর ডান (পশ্চিম) তীরে অবস্থিত ঘোড়াঘাট একটি প্রাচীন স্থান বলে পরিচিত। মহাভারতে উল্লিখিত মৎস্য দেশের রাজা বিরাটের অশ্বশালা নাকি ছিল এখানে (বিরাটনগর, রংপুর দ্র.)। স্নানের জন্য ঘোড়াগুলিকে যে-ঘাটে নামান হত, সে ঘাটকে বাজীঘট্ট বা অশ্বঘাট বলা হত এবং তা থেকেই নাকি ঘোড়াঘাট নামের উৎপত্তি।

রাজা বিরাট আদৌ ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন কিনা, হলেও উত্তর বঙ্গ মৎস্যদেশ ছিল কিনা, সে সম্পর্কে যে সমস্ত জিজ্ঞাসা আছে, তার উত্তর পাওয়া কঠিন। তবে মহাভারতের বিরাট রাজার না হয়ে, এদেশীয় কোনো বিরাট বা বড় রাজার অশ্বসমূহের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে, এ স্থানের নামকরণ হওয়া খুব অসম্ভব ঘটনা বলে মনে হয় না।

ঘোড়াঘাট খুব প্রাচীন স্থান হলেও প্রাচীন আমলের বিশেষ কোনো কীর্তির চিহ্ন এখানে পাওয়া যায় না। এমন কি দুই একটি ছাড়া এখানে সুলতানী আমলের কোনো প্রত্নকীর্তির নিদর্শনেরও একান্ত অভাব। এখানকার বেশির ভাগ কীর্তি ছিল মোঘল আমলের।

তবে মুসলিম আমলের বহু আগে থেকেই যে ঘোড়াঘাটে একটি বিশিষ্ট জনপদ ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্তমান ঘোড়াঘাট শহরের প্রায় দক্ষিণ দিক দিয়ে জেলা পরিষদের যে রাস্তাটি করতোয়া নদী পর্যন্ত গিয়েছে, তার উত্তর পাশেই আছে দরিয়া বোখারী নামক একজন প্রসিদ্ধ পীরের মাযার। মাযার ও সংলগ্ন ঈদগাহ্ হাল আমলে প্রাচীর বেষ্টিত করা হয়েছে। এখানে অসংখ্য পাথর পড়ে আছে। বেলে পাথরের সংখ্যা বেশি হলেও বেশ কয়েকখণ্ড গ্রানাইট এবং কাল পাথরও আছে। এগুলি বেশ বড়। এক একটার দৈর্ঘ্য ২.৮ থেকে ৩ মিটার। এ সমস্ত পাথরও যে, কোনো ধ্বংসপ্রাপ্ত বৌদ্ধ বা হিন্দু মন্দিরের, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঈদগাহ্‌র দক্ষিণ প্রাচীরের লাগোয়া দক্ষিণে যে সমস্ত পাথর পড়ে আছে, সেগুলির মধ্যে একখণ্ড লম্বা বেলে পাথরে একটি নারী মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। স্তূপীকৃত পাথরগুলি পরীক্ষা করলে এ ধরনের আরও মূর্তি পাওয়া যেতে পারে।

এই ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের কাছে খুব সম্ভব দরিয়া বোখারী আস্তানা গেড়েছিলেন। মৃত্যুর পরে বোধ হয়, তিনি এখানেই সমাহিত হয়েছিলেন। খুব সম্ভব পরে এ স্থানের ইট দিয়ে তাঁর মাযারটি বাঁধান হয়েছে। এবং সেই সঙ্গে ঈদগাহ্‌টিও গড়ে উঠেছে। এখানকার ইটগুলি খুবই প্রাচীন।

দরিয়া বোখারীর মাযারের একটু দূরে করতোয়া নদীর তীরে একখণ্ড উঁচু ভূমিতে আর একটি পাকা মাযার আছে। সেই মাযারের ইটগুলিও প্রাক্ মুসলিম আমলের এবং সেখানে ব্যবহৃত পাথরের সংখ্যা খুব বেশি। মাযারের ধারে আরও অনেক পাথর পড়ে

আছে। মাযারে কে শায়িত আছেন, তাঁর কোন পরিচয় নেই। খুব সম্ভব এখানেও একটি বৌদ্ধ বা হিন্দু মন্দির ছিল।

ঘোড়াঘাট বাজারে একজন পীরের পাকা মাযার আছে। তিনিই নাকি ঘোড়াঘাটের পাঁচ জন পীরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই পাঁচজন পীর সম্পর্কে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। আর একজন পীরের সমাধি ছিল ঘোড়াঘাট শহরের পশ্চিম দিকে মাঠের মধ্যে। এতদিন এ মাযার অনাদরে পড়েছিল। হাল আমলে এর জৌলুস বেড়ে গেছে।

ঘোড়াঘাট শহর থেকে প্রায় দেড় মাইল উত্তরে লালদহের কাছাকাছি স্থানে ছিল এখানকার অন্যতম বিখ্যাত পীর কাযী বদর-উদ্-দীন আলীর মাযার। তিনি নাকি ছিলেন মোঘল আমলে ঘোড়াঘাটের বিচারক। তাঁর বুজুরগি সম্পর্কে নানারকম গল্প শোনা যায়। মোঘল আমলের শেষ দিকে নির্মিত এক গম্বুজ বিশিষ্ট এ মাযারের তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই। মাযারের কাছেই একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। ১৪ মিটার × ৪ মিটার আয়তনের উত্তর-দক্ষিণ লম্বা এ মসজিদ ৩ টি গম্বুজ ছিল। দেয়াল গুলি ছিল প্রায় ১.২ মিটার পুরু। মসজিদ থেকে ২০০ মিটার দক্ষিণে ছিল কাযী সাহেবের আবাসস্থল। চকমিলান একতল বিশিষ্ট বাড়ির কিছুই আর টিকে নেই।

রামসাগর, দিনাজপুর

দিনাজপুর জেলা শহর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে রাম সাগর নামক একটি প্রকাণ্ড জলাশয় আছে। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এই বিরাট জলাশয়ের আয়তন হবে প্রায় ১০৫০ মিটার × ৩১০ মিটার। পাড়গুলি পাহাড়ের মতো উঁচু ও বিরাট আকারের।

জলাশয়ের পশ্চিমপাড়ের উত্তরভাগে পাথর দিয়ে বাঁধান একটি বিরাট পাকা ঘাট ছিল। বাণগড় থেকে আনা পাথর দিয়ে ঘাটটি নির্মাণ করা হয়েছিল। উত্তর পাড়ে একটি দেব মন্দিরও নির্মাণ করা হয়েছিল। পাকা ঘাটের ধ্বংসাবশেষ এখন (১৯৬৯ খ্রিঃ) পর্যন্ত টিকে থাকলেও মন্দিরটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

দিনাজপুরের প্রখ্যাত জমিদার ও কান্তনগর মন্দির নির্মাতা মহারাজা রামনাথ রায় (১৭২২-৬০ খ্রিঃ) এই বিশাল দিঘি খনন করিয়েছিলেন এবং বাণগড়ের প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ থেকে পাথর আনিয়ে ঘাটটি নির্মাণ করিয়েছিলেন।

নীলফামারী জেলা

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ

ধর্মপাল গড় ও অন্যান্য কীর্তি

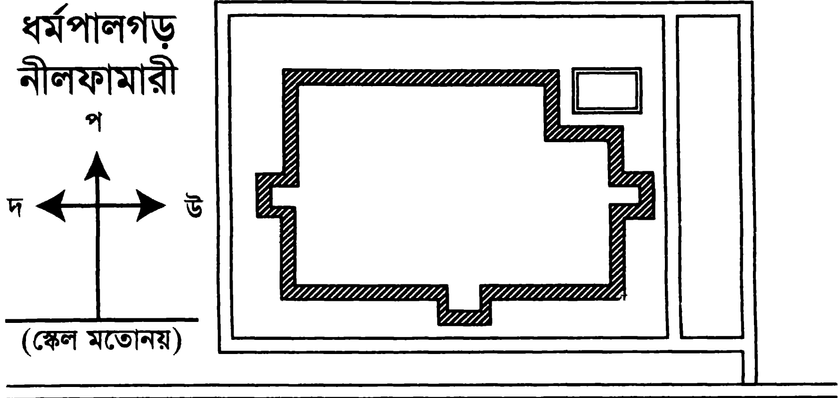
নীলফামারী জেলার ডোমার রেলস্টেশন থেকে আনুমানিক ৮ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণে ও ডিমলা থানা থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার দক্ষিণে মাঠের মধ্যে একটি প্রাচীন দুর্গ আছে। মৃতপ্রায় দেওনাই নদী (দেবনদী) থেকে ১.৫ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত এ দুর্গের নাম ধর্মপাল গড়। মৌজার নাম গড় ধর্মপাল।

অসমান্তরাল বাহুবিশিষ্ট ও চতুর্ভুজ আকারে নির্মিত এ দুর্গের অভ্যন্তরীণ প্রাচীরগুলি এখনও প্রায় অটুট অবস্থায় আছে। দৈর্ঘ্যে দক্ষিণ প্রাচীর প্রায় ১৩৬৬ মিটার ও উত্তর প্রাচীর প্রায় ১৩৯০ মিটার। পূর্ব ও পশ্চিম প্রাচীরের প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪৫৪ মিটার। উত্তর ও দক্ষিণ প্রাচীর ঠিক মাঝামাঝি স্থানে সামান্য উদগত (offset)। এ দুটি স্থানেই ছিল অভ্যন্তরীণ দুর্গের প্রবেশপথ। পশ্চিম দেয়ালের মাঝামাঝি স্থানে আছে বিরাট উদগত অংশ ও প্রবেশপথ। মাটির তৈরি প্রাচীরগুলি এখনও প্রায় ৩.৬৩ মিটার চওড়া এবং ৪.৫৪ মিটার উঁচু। প্রাচীর সংলগ্ন পরিখা প্রায় ১৫.১৫ মিটার প্রশস্ত। পরিখাগুলি এখনও বেশ গভীর। কোনো কোনো স্থানে চৈত্র-বৈশাখেও পানি থাকে।

অভ্যন্তরীণ দুর্গ প্রাচীর থেকে প্রায় ৩০ মিটার দূরে অবস্থিত ছিল দ্বিতীয় প্রাচীর। এ প্রাচীরের কিছু অংশ (অভ্যন্তরীণ প্রাচীরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে) এখনও টিকে আছে। মাটির তৈরি এই অপ্রশস্ত প্রাচীরের বর্তমান উচ্চতা প্রায় ১.৮ মিটার এবং সংলগ্ন পরিখা প্রায় ৪.৫ মিটার চওড়া। এই দ্বিতীয় প্রাচীরের প্রায় ৩০ মিটার দূরে ছিল দুর্গের তৃতীয় ও শেষ বেষ্টনী প্রাচীর। এ দেয়ালেরও সামান্য অংশ টিকে আছে এবং তা হচ্ছে দ্বিতীয় প্রাচীরের কাছাকাছি স্থানে। এ দেয়াল ও সংলগ্ন পরিখার গঠন, আকার ও উচ্চতা ছিল দ্বিতীয় প্রাচীরের মতই। এই তৃতীয় প্রাচীর দক্ষিণ দিকে ছিল খুব সম্ভব ২৫৪৪ মিটার উত্তর দিকে ২৩০৩.০৩ মিটার এবং পুর্ব ও পশ্চিম দিকে ২৩৩৩.০৩ মিটার লম্বা। এতে দেখা যাচ্ছে যে দুর্গটি ছিল বিরাট আয়তনের।

অভ্যন্তরীণ দুর্গে প্রাচীন ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন বহনকারী সামান্য কিছু উপকরণ দেখা যায়। সমগ্র দুর্গ এলাকা বহুকাল ধরে চাষের জমি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। জমি চাষ করার সময় কিছু কিছু ইট পাওয়া যেত বলে স্থানীয় লোকেরা বলেন। দুর্গের ভিতরে এখনও কিছু কিছু ইটের টুকরা এখানে-ওখানে দেখা যায়, তবে সংখ্যায় খুবই কম। মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ অবশ্য বেশ দেখা যায়। এখানে ইমারতের সংখ্যা বেশি ছিল বলে মনে হয় না। গড়ের ভিতরে কয়েকটি জলাশয় ছিল বলে জানা যায়। বর্তমানে

২টি জলাশয় আছে। সে দুটিও মজে গিয়ে প্রায় ডোবায় পরিণত হয়েছে। মিঃ গ্লেজিয়ারের (Mr. E. G. Glazier) রিপোর্টে দেখা যায় যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ধর্মপাল গড়ে স্থানীয় নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা কুঁড়েঘর বেঁধে বাস করতেন।[১]



দুর্গের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত স্থান সমূহে কোনো ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন চোখে পড়েনা, কোনো ইটও এখানে পাওয়া যায় না মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ অল্পবিস্তর দেখা যায়।

'বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ গ্রন্থের' প্রথম সংস্করণে আমরা সরে যমিনে তদন্ত করে যে নকশা তুলে ধরেছিলাম তা ছিল কিছুটা অনুমানভিত্তিক। বিশেষ করে দুর্গের বাইরের দেয়ালগুলি অনুমানের উপর ভিত্তি করে অঙ্কিত হয়েছিল। কাজেই তা যে কিছুটা প্রমাদপূর্ণ ছিল তা স্বীকার করতেই হবে। ১৮০৭-০৮ খ্রিস্টাব্দে ডক্টর ফ্রান্সিস বুকানন সরেযমিনে তদন্ত করে যে নকশা তৈরি করেছিলেন তা অধিক সঠিক ছিল বলে দেখা যায়। উপরে সেই মানচিত্রটি তুলে ধরা হলা।[২]

ময়নামতির কোট

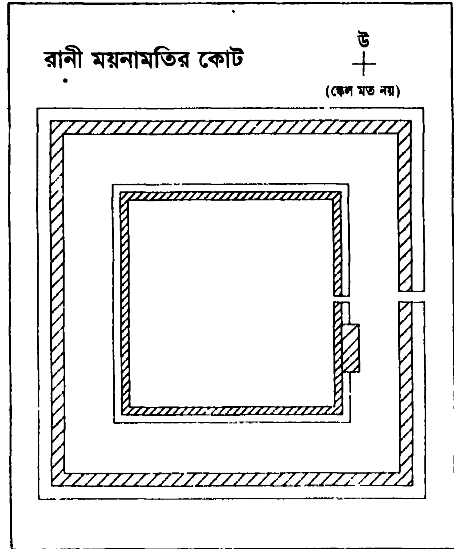
ধর্মপাল গড় থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার সোজা পশ্চিমে ও দেওনাই নদী থেকে ১.৫ কিলোমিটার পশ্চিমে ময়নামতি বা ময়নাবতিরকোট নামক একটি প্রাচীন মাটির দুর্গ আছে। ডিমলা থানার হরিণচরা ইউনিয়নের আটিয়াবাড়ি গ্রামে এ দুর্গ অবস্থিত।

প্রায় বর্গাকারে নির্মিত এ দুর্গের চারদিকে ২টি করে বেষ্টনী প্রাচীর ছিল। অভ্যন্তরীণ প্রাচীরের প্রত্যেক বাহু প্রায় ৯১০ মিটার দীর্ঘ। প্রাচীরগুলি প্রায় ১.৪ মিটার চওড়া ও প্রায় ৩.৬ মিটার উঁচু। সংলগ্ন পরিখা ৯ মিটারে বেশি প্রশস্ত নয়। পূর্ব দেয়ালের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে উত্তর দিক ঘেঁষে ছিল দুর্গের একমাত্র প্রবেশপথ। বর্তমানে দেয়াল সেখানে ভগ্ন।

---

১. Bengal District Records—Rangpur, 1770—1779, p.9—Mr. Walter K. Firminger (printed in 1914).

২. Montgumary Martin : Eastrn India. Vol 5. P. 449.



এ প্রবেশপথের সামান্য দক্ষিণে প্রায় ১২ মিটার দীর্ঘ ও প্রায় ৪.৫ মিটার প্রশস্ত একটি উদ্‌গত অংশ আছে। দেয়ালের সঙ্গে মাটি ভরাট করে এবং দেয়াল থেকে অনেক উঁচু করে এই উদ্‌গত অংশ সৃষ্টি করা হয়েছিল। এটি এখনও বেশ উঁচু। আগে এর উচ্চতা আরও অনেক বেশি ছিল। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে এখানে বেশ কয়েকটি গভীর গর্ত (fox-hole) খনন করা হয়েছিল। গর্তগুলিতে কোনো ইটের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

অভ্যন্তরীণ প্রাচীর থেকে প্রায় ১৫১ মিটার দূরে দূরে অবস্থিত ছিল দুর্গের বাইরের প্রাচীরগুলি। সংলগ্ন পরিখা ছিল প্রায় ৯ মিটার প্রশস্ত। বাইরের প্রাচীর সব টিকে নেই। একমাত্র উত্তর দিকের প্রাচীরটি এখন পর্যন্ত টিকে আছে। প্রায় ২.১২ মিটার প্রশস্ত এ প্রাচীরের উচ্চতা এখনও প্রায় ৩ মিটার।

দুর্গের ভিতরে কোনো ইট-পাথর, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ অথবা মনুষ্য বসবাসের নিদর্শন বহনকারী অন্য কোনো উপকরণ (cultural materials) পাওয়া যায়নি। এতে অতি সহজেই ধারণা করা যায় যে, দুর্গের ভিতরে কোনো কালেই কোনো স্থায়ী বসবাস গড়ে ওঠেনি। কোনো রাজা বা রাজপুরুষের বসতি যদি এখানে থাকত তবে সেখানে ইমারত গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল বেশি। ইমারত থাকলে সেগুলির ধ্বংসাবশেষ অথবা ইট-পাথর থাকত। শত শত বছর ধরে চাষবাসের পরে ইট-পাটকেলের সংখ্যা কমে গেলেও কিছু কিছু ইট যে এখানে ওখানে পড়ে থাকত, তাতে সন্দেহ নেই। ইমারত না থাকলেও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ থাকত প্রচুর পরিমাণে। অথচ সারা দুর্গ এলাকায় মৃৎপাত্রের বিশেষ কোন ভগ্নাংশই পাওয়া যায়নি। এতে ধারণা করা যায় যে, দুর্গটি কোনো সাময়িক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্মিত হয়েছিল, স্থায়ী বসবাসের জন্য নয়।

ধর্মপালের রাজবাড়ি

ধর্মপাল গড় থেকে প্রায় ১.৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে মাঠের মধ্যে একটি প্রাচীন জলাশয় আছে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ জলাশয়ের আয়তন প্রায় ৬১ মিটার × ৩১ মিটার। প্রায় মজে যাওয়া এ জলাশয়ের পাড়গুলি দুর্গ প্রাচীরেব মতো উঁচু। পূর্ব পাড়ে একটি বাঁধান ঘাট ছিল। পূর্ব পাড় থেকে প্রায় ৯০মিটার পূর্ব দিকে একটি বিরাট ঢিবি আছে। প্রায় গোলাকার আয়তনের এ ঢিবির ব্যাস প্রায় ৬১ মিটার। ঢিবির সর্বোচ্চ অংশ বর্তমানে ১.৮ মিটারের বেশি উঁচু নয়।

ঢিবির দক্ষিণ-পূর্ব অংশে একজন পীরের মাযার আছে। কবরটি পাকা নয়। কবরের উপরে একটি ছোট দোচালা টিনের ঘর আছে। এ মাযার কত প্রাচীন এবং এখানে কে সমাহিত আছেন, সে সম্পর্কে কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে জনপ্রবাদ মতে জানা যায় যে, বারমোল্লা ও তের গাযী উত্তর বঙ্গে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁদেরই একজন নাকি এ মাযারে শায়িত আছেন।

মিঃ গ্লোজিয়ার এ ঢিবিকে ধর্মপালের রাজবাড়ি বলে অভিহিত করছেন।[১] এখানে ধর্মপালের রাজবাড়ি অথবা এটি আদৌ কোন রাজা বা রাজ পুরুষের নিবাসস্থল ছিল কিনা, সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সমুদয় ঢিবির ভিতরে অজস্র প্রাচীন ইট ও ডিবির উপরিভাগের অনেক স্থানে প্রশস্ত দেয়ালের অস্তিত্ব দেখে সহজেই ধারণা করা যায় যে, এখানে প্রচীন ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষ আছে।

ঢিবির ধারে কাছে কোনো প্রতিরক্ষামূলক প্রাচীর বা পরিখার চিহ্ন কোথাও দেখা যায় না। ঢিবির অবস্থান ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একান্ত অভাব দেখে এ স্থানকে কোনো রাজা বা রাজপুরুষের নিবাসস্থল বলে ধরে নেওয়া আদৌ যুক্তি সঙ্গত বলে মনে হয় না। খুব সম্ভব এখানে ছিল বিরাট আকারের কোনো মন্দির অথবা বিরাট আকারের বৌদ্ধস্তূপ। এখানে কোনো ছোট আকারের বৌদ্ধ বিহার থাকাও বিচিত্র নয়।

পাইটকাপাড়া ধর্মপাল গ্রামের প্রাচীন ইমারত

ধর্মপাল গড় থেকে প্রায় ১.৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি প্রাচীন ইমারত ছিল। মৌজার নাম পাইটকাপাড়া ধর্মপাল। এ গ্রামে কোচ সম্প্রদায়ের এক ভদ্রলোকের বাড়ির পশ্চিমাংশে একটি প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আছে। প্রায় ১৫ মিটার × ৯ মিটার আয়তনের এ ধ্বংসাবশেষ কিছুকাল আগে পর্যন্ত প্রায় ৪.৫ মিটার উঁচু একটি ঢিবির আকারে এতদিন টিকে ছিল। বাড়ির মালিকের অনুমতিক্রমে গ্রামবাসীরা ইমারতের ভিত্তির ইট পর্যন্ত সরিয়ে নিয়ে গেছে। ফলে ইমারত সম্পর্কে কোনো সঠিক ধারণা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তবে বহু কক্ষবিশিষ্ট ইমারতটি যে মসজিদ ছিল না, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ধ্বংসাবশেস দেখে যতটুকু ধারণা করা যায়, তাতে মনে হয় যে, এখানে একটি হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দির জাতীয় কোনো ইমারত ছিল। ধ্বংসাবশেষের কাছে বেশ কয়েক খণ্ড বেলে পাথর পড়ে আছে, এগুলি ছিল খুব সম্ভব ইমারতের স্তম্ভ বা খিলান।

এ ধ্বংসাবশেষের আশে পাশে গ্রামের ভিতরে ও চাষের জমিতে অজস্র প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ দেখা যায়। সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও বেশ কয়েক খণ্ড পাথরের টুকরাও দেখা যায়। কেউ কেউ বলেন যে, এ সমস্ত পাথরের কোনো কোনোটিতে খোদিত লিপি ছিল এবং কালের প্রবাহে লিপিগুলি অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে। মনোযোগ সহকারে পাথরগুলি পরীক্ষা করলে সহজেই বোঝা যায় যে, পাথরের গায়ের দাগগুলি কোন অস্পষ্ট লিপির চিহ্ন নয়, পাথর কাটার দাগ মাত্র।

১. Bengal District Records—Rangpur, 1779, p.9—Mr. Walter K. Furminger (printed in 1914).

কয়েকটি পাথরের মূর্তিও এ অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছিল বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। বহু চেষ্টা করে, বাড়ি বাড়ি ঘুরেও মূর্তিগুলি উদ্ধার করা যায়নি। সুতরাং এগুলি হিন্দু কি বৌদ্ধ মূর্তি ছিল, সে সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছু বলা কঠিন।

ইতিহাস

ধর্মপাল গড়, ময়নামতির কোট, ধর্মপালের তথাকথিত রাজবাড়ি, পাইটকা পাড়ার ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি নিয়ে জনপ্রবাদ ভিত্তিক নানা কাহিনী বহুকাল থেকে প্রচলিত আছে এবং মধ্যযুগে এ সমস্ত কাহিনী নিয়ে ময়নামতির গান, রাজা মানিকচন্দ্রের গান, গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস প্রভৃতি বিভিন্ন কাব্যও রচিত হয়েছে। এ সমস্ত কাব্য ও জনশ্রুতিমূলে যে কাহিনী দাঁড়ায়, তাতে জানা যায় যে, মানিকচন্দ্র নামে একজন প্রতাপশালী নৃপতি বঙ্গে রাজত্ব করতেন। তাঁর 'নয়বুড়ি' ভার্যা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তিনি ফেরুসানগরের (মতান্তরে তিলকপুরের) তিলকচন্দ্র রাজার কন্যা ময়নামতিকে শেষ বয়সে বিবাহ করেন। নাথগুরু গোরক্ষনাথের শিষ্যা যোগসিদ্ধা ময়নামতি স্বামীর মৃত্যুর পরে (মতান্তরে মৃত্যুর আগে) গোপীচন্দ্র নামক এক পুত্র লাভ করেন। ময়নামতির বাসস্থান ছিল পূর্বোল্লিখিত ময়নামতির কোটে।

স্বামীর মৃত্যুর পরে তাঁর ভ্রাতা (মতান্তরে তাঁর শ্যালক) ধর্মপাল মানিকচন্দ্রের রাজ্য অধিকার করেন। পূর্বোক্ত ধর্মপাল গড়ে ছিল তাঁর নিবাস। মতান্তরে তাঁর নিবাস ছিল পূর্বে উল্লিখিত ধর্মপালের রাজবাড়িতে। রানী ময়নামতি তাঁর বালক পুত্র গোপীচন্দ্রের পক্ষ নিয়ে ধর্মপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিস্তা নদীর তীরে তাঁকে পরাজিত ও নিহত করে হৃত রাজ্য পুনরধিকার করেন। মতান্তরে মানিকচন্দ্রের জীবিত কালেই এ যুদ্ধ হয় এবং তিনি ধর্মপালকে পরাজিত ও নিহত করে ধর্মপাল গড় অধিকার করে সেখানে নিবাস স্থাপন করলেও ময়নামতি কোটেই অবস্থান রত থাকেন।

পিতার মৃত্যুর পর রাজা গোপীচন্দ্র সিংহাসনের অধিকারী হলেও প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারিণী থাকেন তাঁর মাতা ময়নামতি। রাজা হরিশচন্দ্রের (হরিশচন্দ্রের পাট দ্র.) দুই কন্যা অদুনা ও পদুনা এবং আরও অসংখ্য রমণীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। শতাধিক স্ত্রীর সান্নিধ্যে অতিষ্ঠ হয়ে এবং মায়ের প্ররোচনায় রাজা গোপীচন্দ্র তরুণ বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে যান।

এ কাহিনীর সূত্র ধরে রাজা মানিকচন্দ্র, রানী ময়নামতি, রাজা গোপীচন্দ্র প্রভৃতিকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে প্রমাণ করার প্রচেষ্টা বহুদিন ধরে চলে আসছে।[১] এ সম্পর্কে সংক্ষেপে এটুকু বলা চলে যে, নির্ভরযোগ্য ইতিহাস মতে এঁরা বাংলাদেশের অথবা কামরূপ তথা রংপুর অঞ্চলের ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে আজও পরিচিতি লাভ করতে পারেন নি। তাঁদের ঐতিহাসিকতা শুধু মাত্র জনপ্রবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত, কোনো প্রামাণ্য দলিলের উপর নয়। আর ধর্মপাল গড় ও ময়নামতির কোট যে তাঁদের সঙ্গে আদৌ সম্পৃক্ত নয়, তা বলাই বাহুল্য।

---

১. তাঁরা যে কেউ ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন, এ সম্পর্কে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থগার কর্তৃক সম্পাদিত ও বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস' গ্রন্থে 'ইতিহাস ও রাজা গুপিচন্দ্র' অধ্যায় দ্র.।

ধর্মপাল গড় বাংলাদেশের দ্বিতীয় পাল নৃপতি ধর্মপালদেবের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। তিনি কামরূপ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন, এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ দুর্গ খুব সম্ভব দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের কামরূপের রাজা ও হর্ষপালের পুত্র ধর্মপালের। তিনি উত্তর বঙ্গের কিছু অংশও জয় করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। খুব সম্ভব সে সময়ে ধর্মপাল এ দুর্গ নির্মাণ করেন। পরে গৌড়ের রাজা রামপাল ধর্মপালকে পরাজিত করেন এবং কামরূপে তাঁর প্রতিনিধি তিঙ্গদেবের মাধ্যমে পাল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মপালের বিরুদ্ধে এ অভিযানে খুব সম্ভব ময়নামতি কোট নামক মাটির দুর্গটি সাময়িক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নির্মিত হয়। সেজন্য ময়নামতির কোটে স্থায়ী বসবাসের কোনো চিহ্ন নেই।

রাজা হরিশচন্দ্রের পাট বা ধাপ

ধর্মপাল গড় থেকে প্রায় ৮ মাইল দক্ষিণে ও নীলফামারী জেলা শহর থেকে প্রায় ৭ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে দেওনাই নদীর ডান তীরে রাজা হরিশচন্দ্রের পাট নামক একটি ঢিবি আছে। প্রায় আড়াই বিঘা জমির উপর অবস্থিত এবং প্রাচীন কালের-ইট পাথরে পরিপূর্ণ এ ঢিবির উচ্চতা প্রায় ৩.৬৬ মিটার। ঢিবির কাছেই একখণ্ড বড় পাথর পড়ে আছে। দেখলে মনে হয়, ঢিবির ভিতরে যে প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ লুক্কায়িত আছে, সেই ইমারতের স্তম্ভ বা খিলান ছিল এ প্রস্তর খণ্ড।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' গানের সংগ্রাহক ও গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক শ্রী বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য নীলফামারীর মহকুমার প্রশাসক থাকা কালীন এ স্থান পরিদর্শন করে এখানে দুটি ঢিবি আছে বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি গ্রন্থের সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলেন, "রংপুর জেলার ময়নামতির কোটের অদূরে (ধর্মপাল হইতে ৭-৮ মাইল ব্যবধানে) হরিশচন্দ্র পাট বিদ্যমান। গ্রামের নাম এবং স্থানীয় প্রবাদ ও ধ্বংসাবশেষ হরিশচন্দ্রের অতীত মহিমার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দুইটি বৃহৎ মৃত্তিকা স্তূপ এখনও পার্শ্ববর্তী লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। একটির মধ্যে রাজার সমাধি ছিল বলিয়া ডাঃ গ্রীয়ার্সন উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্তূপ এখন বিপর্যস্ত ও ইহার উপকরণ এখন স্থানান্তরিত কিন্তু এক সুবৃহৎ প্রস্তর খণ্ড এখনও বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে আপনার একমাত্র অবস্থানজনিত গৌরব উপভোগ করিতেছে।"[১]

বর্তমানে এখানে একটি মাটির ঢিবিই কোনো রকমে টিকে আছে। পার্শ্ববর্তী স্থানে কিছু দূরে দূরে আরও কয়েকটি ঢিবির অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। সেগুলির মধ্যেও প্রাচীন ইট ছিল। প্রাচীন করতোয়া নদীর বাম তীরবর্তী অঞ্চলে এবং নদী থেকে কিছু দূরে অবস্থিত এস্থানে যে একটি প্রাচীন জনপদ ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তবে কতগুলি এলোমেলো কিংবদন্তি ছাড়া এ স্থানের কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না। সে সব কিংবদন্তি অনুসারে হরিশচন্দ্র নামে এক রাজা এখানে রাজত্ব করতেন। তাঁর দুই কন্যা অদুনা ও পদুনার সঙ্গে নাথ সাহিত্যের গোপীচন্দ্রের বিবাহ হয়। এটি যে একটি

১. গোপীচন্দ্রের গান, ভূমিকা ১৯ পৃ.—সম্পাদক শ্রী বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন ও শ্রী বসন্ত রঞ্জন রায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৪।

কাল্পনিক কাহিনী, তাতে সন্দেহ নেই। ময়নামতির কোটে যদি গোপীচন্দ্রের রাজধানী হয় তবে মাত্র ১৩/১৪ কিলোমিটার দূরে হরিশচন্দ্রের মতো আর এক স্বাধীন রাজার রাজধানী থাকার কথা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। খুব সম্ভব হরিশচন্দ্রেরপাট বলে কথিত ঢিবিতে একটি মন্দির জাতীয় ইমারতের ধ্বংসাবশেষ লুকিয়ে আছে।

বিন্নার দিঘি

ডোমার রেলস্টেশন থেকে আনুমানিক ১৩/১৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং দিনাজপুর জেলার খানসামা থানার পূর্ব-সীমান্তবর্তী এলাকার কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত 'বিন্নার দিঘি' একটি প্রাচীন ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য জলাশয়। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এই জলাশয়ের আয়তন প্রায় ৭৫০ মিটার × ৬০০ মিটার। পাড়গুলি পাহাড়ের মত উঁচু এবং খুবই প্রশস্ত। দিঘিতে বাঁধান ঘাটের অস্তিত্ব এতকাল পরেও টিকে আছে। কিন্তু পানির উপরে অর্থাৎ পাড়ের মধ্যে বাঁধান ঘাটের অস্তিত্ব নেই বললেও চলে।

স্থানীয় লোকেরা বলেন যে, দিঘির চার পাড়ের সমুদয় কাকচরই ইট বাঁধান। এসম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলা না গেলেও তাদের কথা অসত্য বলে মনে হয় না।[১] দিঘির চারপাড়ের কাকচরে যে জলজ উদ্ভিদ আছে, সেগুলি ছাড়া দিঘির ভিতরে আর কোন জঙ্গল নেই। জলাশয়ের পানি স্ফটিকের মতো পরিস্কার। লোকে বলে যে, দিঘির তলদেশে পারদ জমা রাখা আছে বলে পানি এত পরিষ্কার।

এই বিরাট জলাশয়ের কোনো সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। লোকে বলে 'বিন্না রাজার দিঘি'। কিন্তু এই অদ্ভুত নামধারী নৃপতিটি কে ছিলেন, সে সম্পর্কে কোনো সঠিক তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। 'কোচ বিহ্নরের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে (২৫ পৃ.) খান চৌধুরী আমানত উল্লা আহমদ বলেন, "ডোমারের নিকট 'বিন্নার দীঘি' নামক যে বৃহৎ দীঘি আছে, তাহা হব চন্দ্রের অধীনে বিন্না নামক কোন সামন্তের খনিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে; ঐ দীঘি দৈর্ঘ্যে সাতশত গজের ন্যূন নহে।"

এই দিঘির চার পাশে তেমন কোনো প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ বা প্রাচীন বসতির চিহ্ন দেখা যায় না। দিঘি থেকে প্রায় ৫০০ মিটার পশ্চিম-উত্তর দিকে একটি ছোট গ্রাম্য হাট আছে। সেই হাট থেকে প্রায় ১০০ মিটার উত্তরে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

ভীমের লাঙ্গল-জোয়াল, চৌধুরী ডাঙ্গা

দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর রেল জংশন থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বদিকে বদরগঞ্জ থানার অধীনে চৌধুরীডাঙ্গা নামক স্থান প্রাচীন করতোয়া নদীর একটি মৃতপ্রায়

১. ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি—মার্চ মাসের দিকে আমরা এ দিঘি দেখতে গিয়েছিলাম। দিঘির সারা কাকচর বা বকচর জলজ উদ্ভিদে ভরা ছিল। দক্ষিণ পাড়ের পূর্বভাগে খানিকটা ফাঁকা স্থান দেখে আমি দিঘিতে নেমে দেখলাম যে সে স্থানটি ছিল ইট বাঁধান এবং তা উভয় দিকে আরও প্রসারিত ছিল। যেখানে নেমে ছিলাম সে স্থানের দু'পাশেও অনেকদূর পর্যন্ত কাকচরটি ইট বাঁধান দেখেছিলাম।—গ্রন্থকার

ধারা ঘিরনাই নদীর বামতীরে অবস্থিত। এককালে করতোয়া এ স্থানের পার্শ্ব দিয়ে যে প্রবাহিত হত, তা বোঝা যায় একটি পরিত্যক্ত খাত দেখে। গোপীনাথপুর ও ডাঙ্গাপাড়া পার্শ্ববর্তী গ্রাম।

এখানে একটি অপেক্ষাকৃত উঁচু ও উন্মুক্ত মাঠের উত্তর প্রান্তে একটি বিদ্যালয় আছে। মাঠের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আছে একটি উঁচু ভিটি, আয়তন আনুমানিক ৯ মিটার × ৬ মিটার। ভিটিতে মাটির নিচে একটি প্রাচীন ইমারতের ভিত্তি দেয়াল দেখা যায়। ভিটির উপরে এবং ধারে-কাছে পড়ে আছে বেশ কয়েকটি কাল পাথরের টুকরা। স্থানীয় লোকেরা এগুলিকে ভীমের লাঙ্গল-জোয়াল বলে অভিহিত করেন। প্রকৃতপক্ষে এগুলি হচ্ছে একটি ইমারতের দরজার চৌকাঠ। এখানে একটি মন্দির জাতীয় ইমারত ছিল। কালক্রমে মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেলে দরজার পাথরের ফ্রেমগুলিও ভেঙ্গে গিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

খুব সম্ভব মন্দিরটি ছিল প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের।

এ স্থান থেকে প্রায় ৩.৫ কিলোমিটার উত্তরে লক্ষ্মণপুর গ্রামে মৃতপ্রায় করতোয়া (বর্তমানে ঘিরনাই) নদীর বাম তীরে প্রাচীন ইট-পাথরে পূর্ণ একটি বেশ বড় ঢিবি আছে। লোকে বলে বিরাট রাজার বাড়ি। খুব সম্ভব এখানে কোনো মন্দির বা স্তূপের ধ্বংসাবশেষ লুক্কায়িত আছে।

রংপুর জেলা

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ

উদয়পুর-বাগদুয়ার

'রাজা ভবচন্দ্রের পাট' বলে কথিত এ স্থান মিঠাপুকুর থানায় অবস্থিত। মিঠাপুকুর থেকে কয়েক কিলোমিটার দক্ষিণে রংপুর-বগুড়া পাকা সড়কের উপর অবস্থিত শঠিবাড়ি থেকে একটি কাঁচা রাস্তা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ভেণ্ডাবাড়ি পর্যন্ত চলে গেছে। সেই রাস্তা ধরে শঠিবাড়ি থেকে মাইল তিনেক গেলেই রাস্তার দক্ষিণ দিকে দেখা যায় অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন।

প্রায় ৪ বর্গ কিলোমিটার স্থান জুড়ে একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে অসংখ্য প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ও অসংখ্য জলাশয় ছিল বলে মিঃ গ্লেজিয়ার (Mr. E. G. Glazier) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদের এক প্রতিবেদনে বলেছেন। এ স্থানকে 'উদয়পুর ধাপ'ও বলা হত।[১] জঙ্গল কিছু পরিষ্কার হওয়ার পরে সেখানে পরবর্তীকালে প্রচীন ইট-পাথরে পরিপূর্ণ অসংখ্য ঢিবির অস্তিত্ব দেখা যায়। আর দেখা যায় অনেক বাঁধান রাস্তার অস্তিত্ব। কিন্তু কালক্রমে বেশির ভাগ ঢিবি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। জলাশয়গুলির বেশির ভাগ মজে গেছে। বাকিগুলিও মজে যাওয়ার পথে। বর্তমানে এখানে ৩টি ঢিবি আছে এবং এগুলি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত।[২]

উদয়পুর ধাপ থেকে কিছু দক্ষিণে 'বাগদেবীর মন্দির' বলে কথিত একটি প্রাচীন মন্দির অতি জীর্ণ অবস্থায় আছে। আদি মন্দিরটি প্রাচীন যুগের হলেও এটিকে পরে অনেকবার সংস্কার করা হয়েছে এবং সেই সংস্কারের কাজ ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত চলেছিল। এখন মেরামতের অভাবে মন্দিরটি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় আছে।

উদয়পুর-বাগদুয়ারকে জনপ্রবাদ মতে রাজা ভবচন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। তাঁর আর এক নাম নাকি ছিল উদয়চন্দ্র।[৩] নাথসাহিত্যের সুবিখ্যাত গাথা 'গোপীচন্দ্রের

---

১. "... the ruins which are situated in wellnigh impenetrable jungle. Nothing of special interest was lighted on, ruins of the palace and other buildings and tanks being the main feature." Bengal District Records, Rangpur, Vol. 1. 1770—1779, edited by Walter K. Firminger (1914)

২. এ সম্পর্কে রংপুর জেলার প্রথম গেজিটিয়ারে আছে :
"Dr. Buchanon saw large ruins and 'lines including streets or lanes between gardens'. At the present day two long rows of tanks on either side of a road may be seen."

৩. এ সম্পর্কে মিঃ গ্লেজিয়ার বলেন, "Gopi's son Bhaba Chandra, succeeded him. He

সন্যাস' কাহিনীর নায়ক রাজা গোপীচন্দ্রের পুত্র নাকি ছিলেন এই ভবচন্দ্র এবং তাঁর মন্ত্রী নাকি ছিলেন হবচন্দ্র। এই হবচন্দ্র রাজা ও তাঁর মন্ত্রী গবচন্দ্রকে নিয়ে হাস্যরসে ভরা অনেক মুখরোচক গল্প এদেশে বহুকাল থেকেই প্রচলিত।

রাজা ভবচন্দ্র নাকি ছিলেন বাগ্‌দেবীর ভক্ত এবং প্রত্যহ তিনি নাকি মন্দিরে গিয়ে দেবীকে পূজা করতেন। একদিন দেবী নাকি ঋতুবতী হয়ে রাজাকে পরবর্তী তিনদিন মন্দিরে যেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু রাজা হিসাবে ভুল করে দু'দিন পরে ঋতুবতী দেবীর কাছে উপস্থিত হলে দেবীর অভিশাপে তিনি নাকি সাধারণ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। মতান্তরে দেবীর অভিশাপে তিনি স্ত্রীদের হারিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যান। তাঁর পুত্র হবচন্দ্র রাজা হন এবং তিনি ছিলেন একজন অতি আহমক ব্যক্তি এবং তাঁর চেয়েও আহমক নাকি ছিলেন তাঁর মন্ত্রী গবচন্দ্র।

রাজা ভবচন্দ্র আদৌ ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা এবং হলেও কোন সময়ে তিনি রাজত্ব করতেন, সে সম্পর্কে কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ডক্টর বুকানন এই অঞ্চলের (পায়রাবন্দ পরগনা) একজন বৃদ্ধ লোকের কাছ থেকে কয়েকটি প্রাচীন মুদ্রা প্রাপ্তির সংবাদ জেনেছিলেন বলে মিঃ গ্লেজিয়ারের রিপোর্টে আছে। একটি মুদ্রার এক পৃষ্ঠে রাজা ভবচন্দ্র ও অপর পৃষ্ঠে বাগদেবীর নাম উৎকীর্ণ ছিল বলে নাকি সে ভদ্রলোক ডক্টর বুকাননকে বলেছিলেন।[১]

রাজা ভবচন্দ্র সম্পর্কে আর কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে উদয়পুর পাট বলে কথিত স্থানে, একাধিক নৃপতির প্রশাসন কেন্দ্র যে ছিল, তা এ স্থানের প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষগুলি দেখলেই বোঝা যায়। প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের পশ্চিম-দক্ষিণ প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং ঘোড়াঘাট-সাহেবগঞ্জ-বোগদহ-নবাবগঞ্জ-পাল্লরাজ প্রভৃতি প্রাচীন জনপদগুলির কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত এ স্থানে যে এককালে একটি বিরাট নগরী ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তথাকথিত গোপী চন্দ্রের পুত্র না হলেও ভবচন্দ্র নামক কোনো এক নৃপতির রাজধানী এ স্থানে থাকা বিচিত্র নয়।

দরিয়াও বা কাটাদুয়ার (রাজা নীলাম্বরের দুর্গ) ও সাতগড়া

রংপুর শহর থেকে প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণে রংপুর-বগুড়া পাকা সড়কের পশ্চিম দিকে অবস্থিত পীরগঞ্জ থানা। থানা থেকে প্রায় ৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে চতরা হাট নামক একটি বড় বাজার আছে। চতরা হাট থেকে প্রায় ১ $\frac{১}{২}$ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে দরিয়াও বা রাজা নীলাম্বরের দুর্গনগরী অবস্থিত।

সাতগড়া : পীরগঞ্জ থেকে কাঁচা রাস্তা ধরে পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে কিছু দূরে গেলেই লালমাটির অঞ্চল দেকা যায়। আরও বেশ কিছু দূর গেলে পাটগ্রাম, বাহাদুরপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি চোখে পড়ে। সেই এলাকায় পরপর ৭টি গড় বা দুর্গ আছে। এক দুর্গের গায়ে

---

is also called Uday Chandra, whence the name of his city Udaypur."—Bengal District Records, Rangpur, Vol. 1, 1770—1779. Edited by Walter K. Firminger, (1914).

১. Ibid

লাগান অন্য দুর্গ এবং সব ক'টা দুর্গই আলাদাভাবে নির্মিত, এবং এগুলি কোনো একক দুর্গের ভিতর ও বাইরের প্রাচীর নয়। প্রায় ৩ বর্গমাইল স্থান জুড়ে এই ৭টি গড় অবস্থিত। লাল মাটির প্রাচীর অনেক স্থানে ভেঙ্গে গেছে, কোন কোন প্রাচীর একদম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ফলে দুর্গগুলির প্রকৃত স্বরূপ কী ছিল, সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা খুব সহজ নয়। ৭টি গড়ের অস্তিত্ব আছে বলে এই সমগ্র স্থানের নাম সাতগড়া।

এই ৭টি গড়ের শেষ অর্থাৎ সর্ব পশ্চিম দিকের গড়টি একটু বিচিত্র ধরনের। সাতগড়া এলাকার সর্বশেষ অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত এই দুর্গটি আকারে সবচেয়ে বড়। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা এ দুর্গের আয়তন প্রায় '৪৫০০ ফুট × ৩৬০০ ফুট'। প্রশস্ত মাটির প্রাচীরগুলি এখনও প্রায় ৭ ফুট উঁচু। কিন্তু প্রাচীর বেষ্টিত প্রায় সমগ্র এলাকা জুড়ে আছে একটি বিল। নাম চাপুনদহ বা চাপদহ বিল। একটি বিলের চারদিকে বেষ্টনী প্রাচীর নির্মাণ করে বিলটিকে সুরক্ষিত করা হয়েছিল, এমন ধারণা খুব গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। খুব সম্ভব দুর্গ এলাকা পরবর্তী কালে ভূমিকম্প বা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণে দেবে গিয়ে বিলে পরিণত হয়। বিলটি বেশ গভীর এবং এখানে বার মাস পানি থাকে। এ রকম আর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া দুর্গে (কোটালিপাড়া দুর্গ দ্র:)।

সাতগড়ার কোনো সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। বিরাট রাজার গড়, বিরাট রাজার গোগৃহ, কুরু-পাণ্ডবের গড়, নোড়া রাজার বাড়ি, ইসমাইল গাজীর গড় ইত্যাদি বিভিন্ন পরিচয় পাওয়া যায় স্থানীয় জনপ্রবাদ অনুসারে। গড়গুলি অত্যন্ত প্রাচীন এবং গড়ের ভিতরে কিছু কিছু প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ পাওয়া যায়। কোন কোন গড়ে প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষের ক্ষীণ চিহ্নও দেখা যায়। এ দুর্গগুলি যখন তৈরি হয়েছিল, তখন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে খুব বিজ্ঞান সম্মত ধারণা হয়ত ছিল না।

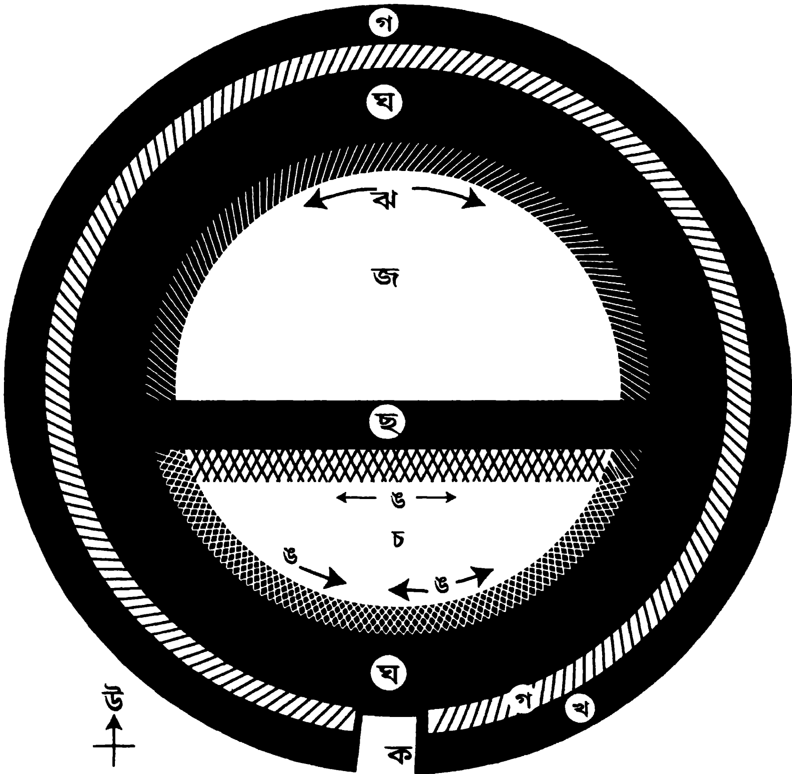
এলোমোলা ভাবে নির্মিত দুর্গগুলি এক সময়ে নির্মিত না হয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজশক্তি কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল, এমন ধারণাও খুব অযৌক্তিক বলে মনে হয় না। এগুলি যে রাজা নীলাম্বরের বহু আগের, তাতে সন্দেহ নেই। প্রয়োজন বোধে তিনি এগুলি হয়ত ব্যবহার করে থাকবেন।

দরিয়াও বা কাটাদুয়ার : সাতগড়ার শেষ প্রান্তে অবস্থিত চাপুনদহ গড় থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত চতরা হাট। চতরা হাট থেকে একটি কাঁচা রাস্তা ধরে ২.৫ কিলোমিটার গেলেই সামনে পড়ে দরিয়াওর বিশাল দুর্গ।

আদিতে এ দুর্গের প্রকৃত রূপটি কি ছিল, তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন ব্যাপার। কারণ, বর্তমান দরিয়াওর চার দিকে অনেক দূরে দূরে যে সমস্ত প্রাচীর ছিল সেগুলি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে প্রাচীরের কিছু কিছু চিহ্ন দেখা যায়। এগুলি থেকে দুর্গের আদি রূপ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। বর্তমান দুর্গের দক্ষিণে প্রায় ১.৫ কিলোমিটার দূরে একটি প্রাচীরের বেশ কিছু অংশ এখনও টিকে আছে। কাটাদুয়ার মাযারের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকেও একটি প্রাচীরের কিছু অংশ দেখা যায়। এ সমস্ত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অংশগুলি দেখে অনুমান করা যায় যে, বর্তমানে

দরিয়াও বা কাটাদুয়ার নামে যে দুর্গটি আছে, তাকে কেন্দ্র করে প্রায় ২০ বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে ছিল সমগ্র দুর্গের অবস্থান। বাইরের দিকে এ দুর্গ ছিল খুব সম্ভব আয়ত বা বর্গাকারে নির্মিত।

কাটা দুয়ার, রাজা নীলাম্বরের দুর্গ (রংপুর)
(মোট আয়তন ৬০০ একর)



ক = দুর্গের প্রবেশ পথ
খ = প্রথম পরিখা (বর্তমানে নিচু ধানক্ষেত)
গ = প্রথম প্রাচীর (বর্তমানে সামান্য আছে)
ঘ = দ্বিতীয় পরিখা (৯২ একর)
ঙ = রাজবাড়ির ইটের দেয়াল
চ = রাজবাড়ির স্থান (২২ একর)
ছ = তৃতীয় পরিখা
জ = কাচারি বাড়ি (২৩২ একর)

বর্তমানে যে দুর্গটি টিকে আছে, তার বিরাটত্বও কম নয়। প্রায় কমলা লেবুর আকারে তৈরি এ দুর্গের চারদিকে আছে প্রায় বৃত্তাকারে নির্মিত্ত বিশাল পরিখা। পরিখার প্রশস্ততা সর্বত্র সমান নয়। প্রায় ৯০ মিটার থেকে ২৭০ মিটার (১০০ থেকে ৩০০ গজ) পর্যন্ত এর প্রশস্ততা দেখা যায়। পরিখার গভীরতা ৬ মিটার থেকে ৯ মিটার। সমগ্র পরিখার আয়তন ৯২ একর। এত বড় পরিখাবেষ্টিত আর কোনো দুর্গ বাংলাদেশে নেই। তবে যশোহর জেলার বার বাজারে অনুরূপ একটি কীর্তি আছে। কিন্তু আয়তনে তা অনেক ছোট (বারবাজার দ্র.)।

পরিখার বাইরেই ছিল মাটির তৈরি অতি উঁচু প্রাচীর। সেই প্রাচীর বর্তমানে (১৯৭৭ খ্রিঃ) প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। স্থানে স্থানে কিছু কিছু অনুচ্চ অংশ টিকে থেকে অতীত অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করছে। প্রাচীরের বাইরেই ছি. গভীর পরিখা। প্রায় ১৫ মিটার প্রশস্ত এ পরিখা বর্তমানে নিচু ধানী জমিতে পরিণত হয়েছে।

ভিতরের প্রশস্ত পরিখার শেষ প্রান্তে প্রায় বৃত্তাকারে নির্মিত প্রাচীর। প্রাচীরের ভিতরে ইট দেখা যায়। খুব সম্ভব ইটের দেয়ালের উপর মাটি ফেলে দেয়ালকে মজবুত ও উঁচু করা হয়েছিল। এ প্রাচীর বর্তমান কালে প্রায় ২.৪ মিটার চওড়া ও প্রায় ৪.৫ মিটার উঁচু।

দুর্গের দক্ষিণ দিকে এই অভ্যন্তরীণ প্রাচীর ভগ্ন। খুব সম্ভব এখানেই ছিল দুর্গের প্রধান প্রবেশপথ। এ প্রবেশপথকে কেন্দ্র করে দুর্গের দক্ষিণ ভাগ সমগ্র দুর্গ এলাকা থেকে প্রায় পঞ্চমীর চাঁদের আকারে বিচ্ছিন্ন। প্রবেশপথের প্রায় ৪৫০ মিটার উত্তরে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা এক বিরাট প্রাচীর এই খণ্ডিত অংশের উত্তর সীমানা নির্দেশ করে। এই প্রাচীর এখনও প্রায় ৩.৬ মিটার চওড়া ও প্রায় ৬ মিটার উঁচু। এই প্রাচীর পূর্ব ও পশ্চিম দিকে অভ্যন্তরীণ দুর্গের বেষ্টনী প্রাচীরের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। দেয়ালের ভিতরে প্রচুর ইট আছে। ইটের তৈরি দেয়ালের উপর খুব সম্ভব মাটি চাপা দিয়ে শক্ত ও উঁচু করা হয়েছে। এ বিরাট প্রাচীরের লাগোয়া উত্তরেই প্রায় ৩০ মিটার চওড়া পরিখা। এ পরিখা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে প্রধান পরিখার সঙ্গে মিশে এই খণ্ডিত অংশকে সমগ্র দুর্গ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

পঞ্চমীর চাঁদের আকারে গঠিত ঐ বিচ্ছিন্ন অংশের মোট আয়তন ২২ একর। স্থানীয় জনপ্রবাদমতে এখানেই নাকি ছিল রাজবাড়ি। রাজবাড়ির চিহ্ন বহনকারী কোনো ...র ধ্বংসাবশেষ বা কোনো ইট-পাথর বর্তমানে এখানে নেই। সমগ্র স্থান জুড়ে

আছে চাষের জমি এবং ভিন্ন জেলা হতে আগত বেশ কয়েক ঘর মুসলমানের বসতি। জমি চাষ করার সময় কিছু কিছু ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ পাওয়া যায় বলে তারা বলেন। তবে খুব বেশি নয়। রাজবাড়ি বলে কথিত এ স্থানের পশ্চিমাংশে দুটি বাঁধান ঘাট বিশিষ্ট একটি জলাশয় ছিল বলে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্টে পাওয়া যায়। বর্তমানে পুকুরের কোনো চিহ্ন নেই।

এই অংশের উত্তর দিকের প্রাচীর ও পশ্চিম দিকের বেষ্টনী প্রাচীর যেখানে মিশেছে, সে স্থানটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। এখানে একটি ইমারতের প্রশস্ত ভিত্তি পাওয়া গেছে। এখানে ইটের তৈরি একটি বুরুজ (bastion or observation-tower) ছিল বলে ধারণা হয়। সে স্থানকে বর্তমানে ইসমাইল গাযীর তথাকথিত ইবাদতখানা বলে চিহ্নিত করা হয় এবং সেখানে সাম্প্রতিক কালে এ মর্মে একটি সাইনবোর্ড দেওয়া হয়েছে।

রাজবাড়ি বলে কথিত স্থানের উত্তর দিকে দুর্গের অবশিষ্ট অংশ। চারদিকে প্রায় ৪.৫ মিটার উঁচু ও প্রায় ২.৪ মিটার চওড়া প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এ স্থানের আয়তন ২৭৬ একর। সমগ্র স্থান বর্তমানে চাষের জমিতে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় জনপ্রবাদ মতে এ স্থানে ছিল রাজার কাচারি বাড়ি অর্থাৎ রাজকর্মচারী ও সৈন্যসামন্তের আবাসস্থল ছিল এই এলাকা।

সমগ্র দুর্গ এলাকায় কোনো প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ বা ভিত্তি পাওয়া যায়নি। রাজবাড়ি বলে কথিত স্থানে কিছু কিছু প্রাচীন ইট যে পাওয়া যায়, তা আগেই বলা হয়েছে। দুর্গ এলাকায় অবশ্য মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় পোড়া মাটির তৈরি পাথরের মতো শক্ত গোলা। দেড় ইঞ্চি, এক ইঞ্চি ও তিন পোয়া ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট বিভিন্ন মাপের এ সমস্ত গোলা সেখানে মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। খুব সম্ভব তীরের পরিবর্তে এগুলি ধনুকে ব্যবহার করা হত।

এ দুর্গনগরী সম্পকে কোনো নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে রংপুর-দিনাজপুর-বগুড়া অঞ্চলে প্রবল জনপ্রবাদ আছে যে, এটি ছিল কামরূপের রাজা নীলাম্বর রায়ের (১৪৮০-৯৮ খ্রিঃ) দুর্গ ও বাসস্থান। এই মতে ইসমাইল গাজী রাজা নীলাম্বরকে পরাজিত ও ধর্মান্তরিত করে এ দুর্গ অধিকার করেন। রাজা নীলাম্বর ইসমাইল গাযী বা তাঁর সুলতান বারবক শাহ্‌র সমসাময়িক যে ছিলেন না, তা পরে (কাটা দুয়ার মাযার ও মসজিদ দ্র.) আলোচনা করা হয়েছে। ইসমাইল গাযীর সময়ে এ দুর্গ এবং রংপুর অঞ্চল মুসলমানের অধিকারে এসেছিল বলে ধারণা করা যায়। কিন্তু ইসমাইল গাযীর মৃত্যুর পরে এ অঞ্চল মুসলমাননের অধিকারে খুব বেশি দিন ছিল না। খুব সম্ভব রাজা নীলাম্বর রংপুর অঞ্চল পুনরধিকার করেন এবং তাঁর রাজ্য সীমা করতোয়ার পশ্চিম তীরেও বিস্তৃতি লাভ করে। সুলতান হোসেন শাহ্‌র হাতে ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরাজিত ও রাজ্যহারা হন।

কাটাদুয়ারের এ দুর্গ বেশ প্রাচীন বলে মনে হয়। নীলাম্বরের পিতা চক্রধ্বজ ও পিতামহ নীলধ্বজের রাজত্বেরও আগে থেকেই এ দুর্গ অস্তিত্ববান ছিল বলে ধারণা হয়। কামরূপ রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত এ দুর্গ ছিল খুব সম্ভব গৌড় রাজ্যের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধ অথবা প্রয়োজন বোধে গৌড় রাজ্যে আক্রমণ করার জন্য। রাজা নীলাম্বর খুব সম্ভব এ দুর্গকে আরও সুরক্ষিত ও শক্তিশালী করেছিলেন।

এই দুর্গ এলাকা বহুকাল ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকার ফলে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। এখানে তখন বাঘ, অজগর সর্প ইত্যাদি হিংস্র প্রাণীর আড্ডা ছিল। লোকে দিনের বেলায়ও ভয়ে সেখানে যেতেননা। প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে দুর্গের পরিখাগুলি জলশূন্য ('dried up') ছিল। এই বর্ণনা কতটুকু সত্য, তা বলা কঠিন। কারণ, যে বিরাট ও সুগভীর পরিখা এখন (১৯৭৭ খ্রিঃ) দেখা যায়, তা কোনোদিন শুকিয়ে গিয়েছিল বলে ধারণা করা যায় না। এই বিরাট ও সুগভীর জলরাশির অস্তিত্বের জন্যই এ স্থানকে দরিয়া বা দরিয়াও বলা হয়ে থাকে।

লোহানীপাড়া বা চাপড়াকোট বিহার

বদরগঞ্জ রেল স্টেশন থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে ঘিরনাই নদী ও বৃহত্তর দিনাজপুর-রংপুর জেলাদ্বয়ের সীমানা থেকে কিছু পূর্ব দিকে লোহানীপাড়া গ্রামে একটি বিরাট প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আছে। লোকে বলেন চাপড়াকোট। এই ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রায় ১.৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব দিকে চাপড়ার বিল অবস্থিত। এটি একটি বেশ বড় আয়তনের বিল। এটি যে এককালে করতোয়া নদীর প্রবাহ ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নদী মরে গিয়ে এখন বিলে পরিণত হয়েছে।

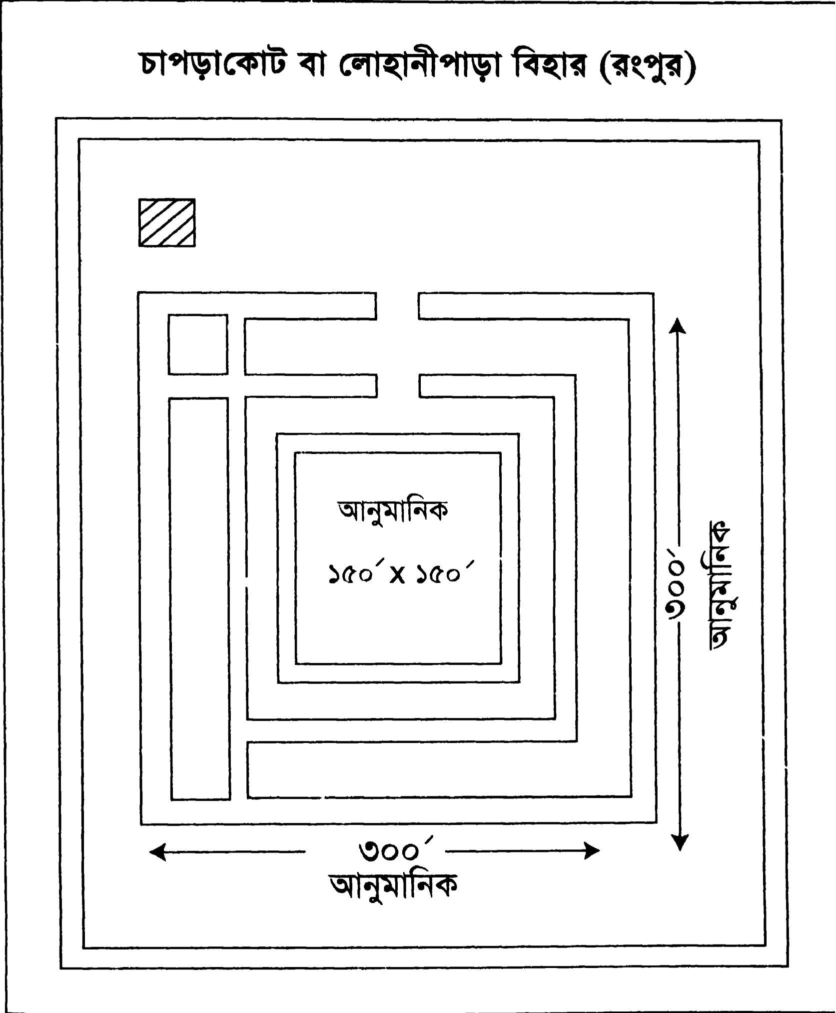
এই ধ্বংসাবশেষের লম্বা দিকে প্রায় ১ কিলোমিটার ও প্রায় চওড়া দিকে ১ কিলোমিটার বর্গাকারের পরিখা আছে। প্রায় ১৫ মিটার চওড়া পরিখাটি এখন মজে গেছে এবং শুষ্ক মৌসুমে তাতে পানি থাকেনা। পরিখার সঙ্গে কোনো প্রতিরক্ষা প্রাচীর ছিল বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরিখা বেষ্টিত স্থানের প্রায় কেন্দ্র স্থলে আলোচ্য ধ্বংসাবশেষটি অবস্থিত।

ইট হরণকারীদের দৌরাত্ম্যে এক কালের এই বিরাট কীর্তিটির বড় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু এখনও (১৯৭৯ খ্রিঃ) যা টিকে আছে, তাতে এই অট্টালিকার আকৃতি ও আয়তন সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা সহজেই করা যায়। এই কীর্তিটিকে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে সরেযমিনে তদন্ত করে আমরা যা পেয়েছি, তা নিম্নে তুলে ধরা হল।

এই ধ্বংসাবশেষের কেন্দ্রস্থলে আছে একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এই অঙ্গনের আনুমানিক আয়তন হবে ৪৮ মিটার × ৪৩ মিটার। এই অঙ্গনের পরেই চারদিক বেষ্টন করে আছে একটি প্রাচীর। প্রায় ১.৫ মিটার প্রশস্ত এই অনুচ্চ দেয়ালটি ইটের তৈরি। এই দেয়ালের পরেই আছে প্রায় ২.৫ মিটার চওড়া টানা বারান্দার মতো উন্মুক্ত স্থান। পরে আছে আর একটি টানা দেয়াল। এটি প্রায় ২.২ মিটার চওড়া। এই দেয়ালের প্রায় ৩.৬ মিটার দূরে বাইরের দিক আছে আর একটি দেয়াল। এটি প্রায় ৩ মিটার চওড়া এবং এটিই ধ্বংসাবশেষের বাইরের দেয়াল। নিম্নে এই ধ্বংসাবশেষের একটি খসড়া নকসা তুলে ধরা হল।

এতে মনে হচ্ছে যে, এটি ছিল একটি বৌদ্ধ বিহার। এই বিহারটি উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৮০ মিটার লম্বা ও পূর্ব পশ্চিমে প্রায় ৭৫ মিটার চওড়া ছিল। বাইরের বেষ্টনী

দেয়ালটি ছিল প্রায় ৩ মিটা মত চওড়া। এর পরেই ছিল বিহারের কক্ষগুলি। কক্ষগুলির ভিতরের দেয়াল ছিল বাইরের দেয়াল থেকে প্রায় ৪ মিটার দূরে দূরে। এর পরে ছিল প্রায় ২.৮ মিটার চওড়া টানা বারান্দা। এই বারান্দার শেষ প্রান্তে ছিল, প্রায় ১.৫ মিটার চওড়া টানা দেয়াল। এই দেয়ালের পরেই ছিল আয়তাকারে নির্মিত বিহারের ভিতরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ।



বিহারের উত্তর ব্লকের মাঝখানে ছিল প্রধান প্রবেশ পথ। এই প্রবেশপথটি উত্তর দিকে কিছুটা প্রসারিত (projected) ছিল বলে মনে হয়। প্রবেশপথের দুই ধারে ২টি কক্ষ ছিল বলে ধ্বংসাবশেষটি দেখে ধারণা হয়। বিহারের ভিতরে কোনো কেন্দ্রীয় মন্দির ছিল না।

প্রবেশপথ থেকে কিছু উত্তর-পশ্চিমে একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। খুব সম্ভব কুমিল্লার শালবন বিহারে (পরে শালবন বিহার দ্র.) যেমন একটি মন্দির আছে, এখানে সে ধরনের একটি মন্দির ছিল।

এখানে পোড়ামাটির চিত্রফলক, অলঙ্কৃত ইট ও অন্যান্য প্রত্নবস্তুসহ একটি শিলালিপিও পাওয়া গেছে। শিলালিপিটি রংপুর জেলা প্রশাসকের অফিসে রক্ষিত ছিল। বগুড়ার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কাযী মোহাম্মদ মেছের শিলালিপিটি সেখান থেকে ঢাকা যাদুঘরে নিয়ে আসেন। বর্তমানে শিলালিপিটি ঢাকা যাদুঘরেই আছে।

'২২´´ × ১২´´ × ১/৬ ইঞ্চি' আয়তনের শিলালিপিটির পূর্ণ পাঠোদ্ধার এখনও হয়নি। এতে সংস্কৃত ভাষায় ১১ পঙক্তি লিপি খোদিত আছে। ঢাকা যাদুঘরের তদানীন্তন সহকারী রক্ষক (Asstt. Keeper) শ্রীরণজিৎ কুমার শর্মা এই শিলালিপির যে আংশিক পাঠোদ্ধার করেছিলেন, তাতে জানা যায় যে, শ্রীধর বর্ধনের প্র-পৌত্র শ্রী পাইখ বর্ধনের পৌত্র ও শ্রী বিক্রম বর্ধনের পুত্র শ্রী অংশু বর্ধন একটি মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শিলালিপির সন-তারিখ এখনও উদ্ধার করা হয়নি। তবে লিপিতত্ত্বের বিচারে শ্রী রণজিৎ শর্মা অনুমান করেন যে, এটি নবম-দশম শতাব্দীর হতে পারে।

এটি একটি অতি মূল্যবান শিলালিপি। গৌড় রাজ্যের পূর্ব সীমান্তবর্তী ও কামরূপ বাজ্যের পশ্চিম সীমান্তের নিকটবর্তী অঞ্চলে নবম ও দশম শতাব্দীতে বর্ধন উপাধিধারী একটি রাজবংশ ও সেই রাজবংশের চার জন নৃপতির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। মীনহাজ বর্ণিত বর্ধনকোট নগরীর সন্ধান হয়ত এই শিলালিপির মাধ্যমে কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে দিনাজপুর জেলার হীরাবেশ্যার ভিটা ও বর্ধনকোট (পূর্ব আলোচিত) দ্র:।

রংপুর জেলার অন্যান্য প্রাচীন কীর্তি

অন্যান্য প্রাচীন কীর্তির মধ্যে বেশ কয়েকটি মাটির দুর্গের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। রংপুর শহর থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার পশ্চিমে একটি মাটির দুর্গ আছে। রংপুর-দিনাজপুর পাকা সড়ক এ দুর্গকে দু'ভাগে বিভক্ত করে কেটে বের হয়ে গেছে। প্রায় বর্গাকারে নির্মিত এ দুর্গের প্রত্যেক বাহু প্রায় ১.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ। মাটির দেয়ালের বর্তমান উচ্চতা ২.২ মিটারের বেশি নয়। দেয়াল সংলগ্ন পরিখা খুব প্রশস্ত নয়। দুর্গের ভিতরে কোনো ইমারতের তেমন কোনো ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে দেখা যায় না।

রংপুর শহর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণে আর একটি মাটির দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। রংপুর-বগুড়া পাকা সড়ক এ দুর্গকে ভেদ করে গেছে। পূর্ব-পশ্চিম লম্বা এ দুর্গের উত্তর ও দক্ষিণ বাহুর দৈর্ঘ্য ১.৫ কিলোমিটার কিছু বেশি এবং পূর্ব ও পশ্চিম বাহুর দৈর্ঘ্য ১.৫ কিলোমিটারের চেয়ে কিছু কম। প্রশস্ত দেয়ালের উচ্চতা এখন প্রায় ২মিটার। বাইরের পরিখা বেশ প্রশস্ত। এর ভিতরেও কোনো ইমারতের ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে নেই। দুর্গের অভ্যন্তর ভাগ বর্তমানে চাষের জমি।

মুসলিম আমল

শাহজালাল বোখারীর দরগা, মাহীগঞ্জ, রংপুর

রংপুর শহরের পূর্ব দিকে অবস্থিত মাহীগঞ্জে একটি দরগা আছে। শাহ্ জালাল বোখারীর দরগা নামে পরিচিত এই ইমারত মোঘল আমলের শেষ দিকে নির্মিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বহুবার সংস্কার করার ফলে এটি আধুনিক রূপ ধারণ করেছে। এই দরগাতে বহু লোকের সমাগত হয়।

মওলানা কেরামত আলীর মাযার ও মসজিদ, মুন্সীপাড়া, রংপুর

রংপুর শহরের মুন্সীপাড়া মহল্লায় মওলানা কেরামত আলী সাহেবের মসজিদ ও মাযার আছে। তিনি গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের এক কোণে মাযারটি অবস্থিত।

তিনি ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে জৌনপুরে (ভারত) জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২৫ বছর বয়সে বাংলাদেশে আগমন করেন এবং ইসলাম ধর্মের সংস্কার করেন। মৃত্যুর পরে তাঁকে রংপুরে সমাহিত করা হয়। তিনি সারাজীবন বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র ধর্ম সংস্কারের কাজে নিয়েজিত থাকেন।

বড় দরগাহ্ বা শাহ্ ইসমাইল গাযীর মাযার

রংপুর শহর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণে রংপুর-বগুড়া মহাসড়কের লাগোয়া পূর্ব পার্শ্বে ছোট মীর্যাপুর (ইসমাইলপুর) নামক স্থানে একটি মাযার আছে। লোকে বলেন বড় দরগাহ্ বা শাহ্ ইসমাইল গাযীর মাযার। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা প্রায় ১৫ মিটার × ৯ মিটার আয়তনের তিন কক্ষ বিশিষ্ট একটি একতলা ইমারতের মাঝের কক্ষে পীরের পাকা কবরটি অবস্থিত। দেয়ালগুলি প্রায় ১.০৬ মিটার প্রশস্ত। উপরের ছাদ সমতল (flat)। চারকোণে আছে ৪টি সরু মিনার বা টারেট (turret)। ইদানীং মাযারের দক্ষিণ দিকে বেআইনিভাবে একটি পাকা বারান্দা সংযোজিত হয়েছে।

পাশে দুটি কক্ষ অপেক্ষাকৃত ছোট আয়তনের। এই কক্ষ দুটির ভিতরের দেয়ালে জালির কাজ করা আছে। সেই জালির ভিতর দিয়ে কেন্দ্রীয় কক্ষে অবস্থিত সমাধিটি দর্শন করা যায়। পশ্চিম দিকের কক্ষের প্রবেশ পথ সেই কক্ষের পশ্চিম দেয়ালে এবং এটিকেই মাযার ইমারতের প্রধান প্রবেশপথ বলা যেতে পারে। পুর্ব দিকের কক্ষের পূর্ব দেয়ালে আছে একটি প্রবেশপথ। এটি খুব সম্ভব মহিলাদের জন্য।

কেন্দ্রীয় কক্ষটি বেশ বড় এবং সেই সঙ্গে পীরের কবরটিও বেশ বড় আকারের। মূল্যবান রেশমী বস্ত্র দ্বারা সতত আচ্ছাদিত কবরটিকে মোটেই প্রাচীন বলা যায় না। খুব সম্ভব প্রাচীন কবরটিকে ভেঙ্গে নূতন করে নির্মাণ করা হয়েছে।

এই কক্ষের দেয়ালের উপর স্থানে স্থানে ফুলের (rosette) কাজ করা আছে। পলেস্তারা (plaster) ও ঘন চুনকামের ফলে এই ফুলের কাজগুলি পোড়ামাটির চিত্র ফলক (terra-cotta plaques), না পলেস্তারার উপর করা কারুকার্য তা বোঝা যায় না। রজেটের কাজ দেখে এগুলিকে পোড়ামাটির চিত্রফলক বলে সন্দেহ হয়। ইমারতের গঠন-কৌশল দেখে মনে হয় যে, এটি মোঘল আমলে তৈরি হয়েছিল।

মাযার থেকে আনুমানিক ১০০ মিটার পূর্ব দিকে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, একটি মাঝারি আয়তনের প্রাচীন জলাশয় আছে। জলাশয়ের ভিতরে একটি 'শ্বেত কুয়া' ছিল বলে বলা হয়ে থাকে। এই কুয়ার পানি ব্যবহার করলে নাকি সর্ব রোগ নিরাময় হত। কিছু কাল আগে কুয়ার পানি অপবিত্র হয়ে যাওয়ার ফলে, তা নাকি এখন আর কাজে লাগেনা।

এই মাযারে গৌড়ের সুলতান রুকন-উদ্-দীন বারবক শাহ্‌র (১৪৫৯-৭৬ খ্রিঃ) সেনাপতি শাহ্ ইসমাইল গাযীর মুণ্ডহীন দেহ সমহিত আছে বলে স্থানীয় প্রবল জনপ্রবাদ থেকে জানা যায়। শাহ্ ইসমাইল গাযীর নামে রংপুর জেলায় কমপক্ষে ৪টি, দিনাজপুর জেলায় ১টি (ঘোড়াঘাট দ্র.) ও হুগলী জেলার (ভারত) গড় মান্দারণে ১টি মাযার আছে। স্থানীয় জনপ্রবাদ থেকে জানা যায় যে, সুলতান বারবক শাহ্ মিথ্যা ষড়যন্ত্রে বিশ্বাস করে ইসমাইল গাযীকে বিদ্রোহী ঘোষণা করে তাঁর শিরশ্ছেদের আদেশ দেন। রংপুরের পূর্ব দিকে অবস্থিত মাহীগঞ্জে আক্রান্ত গাযী প্রাণ ভয়ে পালাতে থাকেন। মাহীগঞ্জের পুর্বদিকে অবস্থিত বড় দরগায় নাকি তাঁর গদা রক্ষিত ছিল। পলায়নরত অবস্থায় গাযীর ঘোড়া আক্রান্ত হয়ে যেখানে মারা যায়, সেখানে নাকি ঘোড়ামারা নামক দরগার সৃষ্টি হয়। সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে পালাতে থাকলে বিভিন্ন স্থানে তাঁকে আক্রমণ করে আহত করা হয়। সর্বশেষ তিনি আলোচ্য মাযারের কাছে এলে নাকি সুলতানের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক তিনি নিহত হন। তাঁর ছিন্ন মুণ্ড নাকি লাফ দিয়ে প্রথমে মকিমপুর নামক স্থানে পড়ে এবং সেখানে কিছুক্ষণ থাকার পর তা নাকি বড় বিলার পানিতে লাফ দিয়ে পড়ে। বড় বিলার মধ্যভাগ এখনও জনপ্রবাদ মতে 'কাল্লার দরগা' নামে খ্যাত। সেই ছিন্ন মুণ্ড নাকি এখনও সেখানে আঁছে। হিন্দুরা বলে কাটারাম। এই কাহিনীটি মিঃ গ্লেজিয়ারও তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন।[১]

এই হল রংপুর অঞ্চলে ইসমাইল গাজী সম্পর্কে প্রবল জনপ্রবাদ। তাঁর সম্বন্ধে কিছু ঐতিহাসিক তথ্যও পাওয়া গেছে। এই জনপ্রবাদের সঙ্গে সে সব তথ্যের কিছু কিছু মিল দেখা যায় (কাটাদুয়ার মাযার ও মসজিদ দ্র.)।

এই মাযার ইমারত কবে নির্মিত হয়েছিল, তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। মিঃ গ্লেজিয়ার (১৭৭০-৭৯ খ্রিঃ) তাঁর প্রতিবেদনে এই দরগাকে একটি পুরাতন ইমারত ('old building') বলে আখ্যায়িত করেছেন। এতে দেখা যাচ্ছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকেও এই ইমারতটি পুরাতন ছিল। সেক্ষেত্রে এই দরগা সুলতানী আমলের শেষ দিকে অথবা মোঘল আমলের প্রথম দিকে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল ধরা যেতে পারে। তবে উপরের সমতল ছাদটি দেখে মনে হয় এটি খুব প্রাচীন নয়।

১. "At Buri Durga, nineteen miles south from Rangpur on the road to Bograh, is an old building of very rude construction, which is said to have been erected over the staff of the saint (Ismail Gazi), and offerings are made on the Burrobilla lake or marsh adjoining, to his spirit, at a place where a flag pointed out that some of his relics were deposited."—Bengal District Records, Rangpur, Vol. I, 1770-1779, p 11.—Mr. Walter K. Firminger (1914).

কাটাদুয়ার মাযার ও মসজিদ

রংপুর-বগুড়া মহাসড়কের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত পীরগঞ্জ থানা থেকে আনুমানিক ৯ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি ছোট নদীর তীরে আনুমানিক বিঘা দুই ভূমির উপর একটি প্রাচীন ঢিবি আছে। প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ ঢিবিটি বর্তমানে ৬ মিটারের বেশি উঁচু নয়। ঢিবির উপরে ও ঢালুতে প্রাচীন ইমারতাদির ভিত্তি-দেয়ালের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

ঢিবির সর্বোচ্চ অংশে এবং উত্তর ভাগ ঘেঁষে অপেক্ষাকৃত হাল আমলের একটি মাযার আছে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ছাদহীন এই ইমারতের আয়তন প্রায় ৫ মিটার × ৩ মিটার। দেয়ালগুলি খুব পুরু নয়, এবং খুবই মামুলি ধরনের। ভিতরের পাকা কবরটি যে একজন মুসলিমের, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কবরটিতে হাল আমলে এত সংস্কার কার্য করা হয়েছে যে, প্রাচীনত্বের কোনো চিহ্ন এতে খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই সমাধি ভবনের দক্ষিণ দেয়ালে একটি দরজা আছে। এই দরজার পাশে পাশাপাশি অবস্থান রত ২টি শিলালিপি ছিল বলে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ বাবু রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২৪-২৫ খ্রিস্টাব্দে 'আর্কিওলজিকেল সার্ভে রিপোর্ট অব ইণ্ডিয়া'-তে (৮৯ পৃ.) উল্লেখ করেছেন। তিনি এটিকে দরগাহ্ বা ঈদগাহ্ বলেছেন এবং একটি প্রাচীন মন্দিরকে ধ্বংস করে মুসলমানেরা এখানে একটি মসজিদ ও একটি দরগাতে পরিণত করেছিল বলে তিনি বলেছেন। মসজিদটি অনেক আগেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। তবে ছাদহীন দরগাটি তখনও টিকে ছিল বলে তাঁর প্রতিবেদনে দেখা যায়। শিলালিপির যে ছাপ স্থানীয় জমিদার তাঁকে দিয়েছিলেন, তাতে তিনি সুলতান আলাউদ-দীন-হোসেন শাহ্‌র নাম পড়তে সমর্থ হয়েছিলেন।

রাখালদাস বাবুর প্রতিবেদন থেকে বোঝা যায় যে, সে সময়ে (১৯২৪-২৫ খ্রিস্টাব্দের দু-এক বছর আগে) শিলালিপি দুটি মাযার ইমারতে ছিল না।[১] এর কিছুকাল আগে রহস্যজনকভাবে শিলালিপি দুটি হারিয়ে যায় এবং সদ্যপুষ্করিণী নামক গ্রামের স্থানীয় জমিদার রায় বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরীর বহু প্রচেষ্টার পরেও তা উদ্ধার হয়নি। এর পরে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে এক কৃষক মাযারের বেশ কিছু দূরে নদীতীরে এক বটবৃক্ষের নিচে একটি শিলালিপি পান এবং রায় বাহাদুরের কাছে তা সমর্পণ করেন।

> "At a distance of nearly one mile from the dried up moats, there is a large mound ... on which stands a little Darga or Idga built during the reign of Sultan Alaud Din Husain Shah of Bengal (1493-1518 A. D). The mound appears to contain the ruins of an ancient temple destroyed by the Musalmans and converted into a mosque and a Darga. The mosque has collapsed long ago and nothing can be seen of it at the the present day. The Dargah, however still stands roofless. At one time this Dargah possessed an inscription engraved on two different slabs of stone...which were placed side by side over the principal entrance of the structure ... the name of Alauddin Husain Shah can be read clearly from an impression of the inscription supplied by the Rai Bahadur."—*Archaeological Survey Report of India, 1924-26, p. 89* by R. D. Banerjee.
>
> —Inscriptions of Bengal, Voll, IV, p. 203.—Mvi Shamsuddin Ahmed.

এই শিলালিপির পাঠ থেকে জানা যায় যে, 'কামরূপ ও কামতা বিজয়ী' আলাউদ-দীন-হোসেন শাহ্‌র রাজত্বকালে (লিপিতে সন-তারিখ নেই) খান-ই-আযম এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।

এটিই মাযারে যে দুটি শিলালিপি ছিল, সেগুলির একটি কিনা, তা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। তবে এটি যে এই এলাকার নির্মিত একটি মসজিদের শিলালিপি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাকি শিলালিপিটি এ পর্যন্ত আর পাওয়া যায়নি। বহু চেষ্টা করেও আমরা এ সম্বন্ধে আর কোনো সংবাদ সংগ্রহ করতে পারিনি।

এই অঞ্চলে কোনো প্রাচীন মসজিদ ছিল, সে কথা এই অঞ্চলের অতি বৃদ্ধ লোকেরাও বলতে পারেন না। কোনো মসজিদের ধ্বংসাবশেষ এই এলাকা ছিল, সে কথাও কেউ জানেনা। তবে মসজিদের শিলালিপি যখন এখানে পাওয়া গেছে, তখন এ অঞ্চলে একটি মসজিদ ছিল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কাটাদুয়ারকে কেন্দ্র করে প্রায় ১৬ বর্গ কিলোমিটার স্থানের মধ্যে কোনো প্রাচীন মসজিদ বা তার ধ্বংসাবশেষ আছে বলে কেউ বলতে পারেন না। সেক্ষেত্রে মসজিদটি মাযারের ঢিবিতেই ছিল বলে ধারণা করা যায়। মাযারের লাগোয়া দক্ষিণে পূর্ব-পশ্চিম প্রায় ৯ মিটার লম্বা ও উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৮ মিটার চওড়া একখণ্ড সমতল ভূমি ঢিবির মধ্যে আছে। খুব সম্ভব এ স্থানেই একটি ছোট আকারের মসজিদ হোসেন শাহ্‌র আমলে নির্মিত হয়েছিল। এখানে মাটির নিচে প্রাচীন ইমারতের যে ভিত্তি দেখা যায়, সেগুলি খুব সম্ভব সেই মসজিদের ভিত্তি।

মাযারের বর্তমান (১৯৭৭ খ্রিঃ) খাদিম ৮৩ বছর বয়স্ক জনাব সৈয়দ আব্দুল হক। তাঁর পিতা ও প্রাক্তন খাদিম মরহুম সৈয়দ আব্দুল হাকিমের কাছেই নাকি ছিল 'রিসালাৎ-উশ্‌-শুহাদা' নামক ফারসি ভাষায় রচিত গ্রন্থের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি। তাঁর মতে ১৩২৪ বঙ্গাব্দে (১৯১৭ খ্রিঃ) এক সাহেব নাকি পাণ্ডুলিপি খানা তাঁর পিতার কাছ থেকে নিয়ে যান। তাঁর বর্ণনা প্রমাদপূর্ণ। কারণ মিঃ ডামান্ট (G.H. Damant) ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে এ গ্রন্থ প্রকাশ করেন এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে। ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে পীর মোহাম্মদ শাত্তারী কর্তৃক রচিত এ গ্রন্থের বর্ণনা সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

মক্কার কোরাইশ বংশীয় ধর্মপ্রাণ শাহ্ ইসমাইল গাযী একদল সঙ্গী নিয়ে গৌড়ের সুলতান বারবক শাহ্‌র দরবারে আসেন। সেখানে 'ছুটিয়া-পুটিয়া' নামক এক সর্বনাশা নদীস্রোতের উপর একটি সেতু নির্মাণ করে তিনি সুলতানের সুনযরে পড়েন। এর পরে উড়িষ্যার রাজা গণপতিকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দি করে গাযি তাঁর কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

এর কয়েক বছর পরে কামরূপের রাজা কামেশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযানে তিনি সেনাপতি নিযুক্ত হন। ঘোড়াঘাটের উপরে অবস্থিত বারপাইকের গড়ে (বার পাইকের গড় দ্র.) ছিল তাঁর ঘাঁটি। সন্তোষের রণক্ষেত্রে তুমুল যুদ্ধের পর গাযী পরাজিত হন। কিন্তু কাটাদুয়ারের দুর্গে (দরিয়াও বা নীলাম্বর রায়ের দুর্গ দ্র.) অবস্থানরত রাজা কামেশ্বর পরে গাযীর অলৌকিক কার্যাবলী দেখে যুদ্ধ করা নিরর্থক জেনে স্বেচ্ছায় সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইসমাইল গাযী সুলতানের নিকট থেকে প্রচুর পুরস্কার লাভ করেন

ইতোমধ্যে ঘোড়াঘাটের হিন্দু শাসনকর্তা ভান্দুসী রায় হিংসার বশবর্তী হয়ে সুলতানের নিকট মিথ্যা অভিযোগ করেন যে, ইসমাইল গাযী বিদ্রোহী হয়েছেন। সুলতান গাযীর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলে গাযী সুলতানের সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অনেক বীরত্ব প্রদর্শন করেন। অবশেষে তিনি পরাজিত হন এবং ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয়। তাঁর ছিন্ন মস্তক সুলতানের কাছে নীত হলে গাযী অলৌকিকভাবে সেখানে সশরীরে উপস্থিত হয়ে সুলতানকে তা কাটাদুয়ারে সমাহিত করার নির্দেশ দেন। সুলতান তখন প্রকৃত অবস্থা অবগত হয়ে গাযীর ছিন্ন মস্তক কাটা দুয়ারে সমাধিস্থ করার ব্যবস্থা করেন। তাঁর মস্তকহীন দেহ হুগলী (ভারত) জেলার গড় মান্দারণে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তা সমাহিত হয়। পরে অনুতপ্ত সুলতান বারবক শাহ্ তাঁর বেগমসহ দুটি মাযারেই উপস্থিত হন এবং গাযীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

এ কাহিনীর মধ্যে কতখানি সত্য আছে, তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। ইসমাইল গাযী সম্পর্কে কোনো শিলালিপি বা অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে রিসালৎ গ্রন্থ প্রকাশ, এমন কি রচিত হবার আগেও মধ্যযুগের কাব্যে ইসমাইল গাযীর উল্লেখ দেখা যায়। ষোড়শ-সপ্তদেশ শতাব্দীর কবি ফয়জুল্লাহ্‌র 'সত্যপীরের পাঁচালী' নামক গ্রন্থে আছে,

> "খোটাদুরের পীর ইসমাইল গাজী।
> গাজীর বিজয়ে সেহ মোক হইল রাজী।"

মধ্যযুগের অন্যান্য কবির রচনায়ও ইসমাইল গাযী সম্পর্কে উল্লেখ আছে। তখন পর্যন্ত রিসালাৎ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। রিসালাৎ ও মধ্যযুগের কাব্যগুলিতে বর্ণিত ইসমাইল গাযীকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলতে কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। রিসালাৎ-এ বর্ণিত কয়েকটি বিষয় প্রমাণ্য ইতিহাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দে বারবক শাহ্ গৌড়ের সুলতান ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে উড়িষ্যার গজপতি বংশীয় কপিলেন্দ্র দেব যে রাজা ছিলেন, তা প্রমাণিত হয়েছে। গড় মান্দারণ যে বারবকের রাজ্যের মধ্যে ছিল, তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। উড়িষ্যা ও কামরূপরাজের সঙ্গে যে বারবক শাহ্‌র যুদ্ধ হয়েছিল, তাও প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু কামেশ্বর বলে কোনো রাজা তখন কামরূপে ছিলেন বলে প্রামাণ্য ইতিহাস বলে না। খেন বংশীয় রাজা নীলধ্বজের (১৪৪০-৬০ খ্রিঃ) পুত্র চক্রধ্বজ (১৪৬০-৮০ খ্রিঃ) তখন কামরূপের রাজা। চক্রধ্বজের পুত্র নীলাম্বর (১৪৮০-৯৮ খ্রিঃ) যে ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে হোসেন শাহ্‌র নিকট কামরূপ রাজ্য হারান, সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা একমত।

রিসালতে বর্ণিত কামেশ্বর খুব সম্ভব চক্রধ্বজ ছিলেন না। তিনি পরাজিত ও ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন, এমন কোনো প্রমাণ তো দূরের কথা, এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখও পাওয়া যায় না। তিনি ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন এবং তাঁর পুত্রের রাজত্বকালে কামরূপের রাজ্যসীমা করতোয়ার পশ্চিম তীরেও বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

খুব সম্ভব এই কামেশ্বর ছিলেন কামরূপ রাজের অধীনে রংপুর অঞ্চলের একজন সামন্ত নৃপতি অথবা কামরূপ রাজের সেনাপতি। প্রথম যুদ্ধে জয়লাভের পর তিনি খুব সম্ভব পরবর্তী যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন এবং ইসমাইল গাযীর সঙ্গে তাঁর কোনো সন্ধি হয়েছিল এবং রংপুর শহর (মাহীগঞ্জ) পর্যন্ত সমুদয় পশ্চিমাঞ্চলে বোধ হয় গাযীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ইসমাইল গাযী বিদ্রোহী হয়ে ছিলেন, একথা খুব অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় না। তিনি যুদ্ধ করে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, এ বর্ণনা রিসালতেই আছে। কামরূপ রাজার সঙ্গে গাযীর কোনো ষড়যন্ত্রও অবিশ্বাস্য ঘটনা বলে মনে হয় না। সুলতান বারবকের মত একজন বিচক্ষণ ও ন্যায়পরায়ণ নৃপতি বিনা প্রমাণে গাযীকে প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন, তা বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা বলে মনে হয় না।

গাযীর দেহ গড় মান্দারণে সমাহিত হবার কাহিনী গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। রাজরোষে পতিত ও রাজদ্রোহে দণ্ডিত ব্যক্তির মুণ্ডহীন দেহ ৩২০ কিলোমিটার দূরে নিয়ে যাওয়া অবিশ্বাস্য ঘটনা বলে মনে হয়। তাছাড়া, সেখানে যে শিলালিপি আছে, তা গাযীর সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, সেটি হোসেন শাহ্‌র আমলে তৈরি একটি তোরণ নির্মাণের শিলালিপি।[১]

ইসমাইল গাযির মৃত্যুর পরে রংপুর-কাটাদুয়ার অঞ্চল খুব বেশি দিন মুসলমানের অধিকারে ছিল বলে ধারণা করা যায় না। রাজা নীলাম্বর এ অঞ্চল এবং ঘোড়াঘাট অঞ্চলও অধিকার করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ঘোড়াঘাটে তাঁর বাসস্থান ছিল বলেও জনপ্রবাদ আছে। কাটাদুয়ারে-খুব সম্ভব আগে থেকেই একটি দুর্গ ছিল। সেটি পুনরধিকার করে তিনি আরও শক্তিশালী করেছিলেন বলে ধারণা হয়।

কাটাদুয়ারের ঢিবিতে একটি মন্দির ছিল এবং তা ধ্বংস করে মুসলমানেরা সেখানে মসজিদ ও মাযার নির্মাণ করেছিলেন, রাখালদাস বাবুর এ অভিমত যুক্তির দিক থেকে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। সেখানে মন্দির বা এ জাতীয় কোন ইমারত ছিল, তা মেনে নিতেই হবে। কিন্তু সেই ইমারত যে আগেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। কোনো মন্দিরকে ভেঙ্গে চুরে মসজিদে রূপান্তরিত করা যায়। কিন্তু কোনো দণ্ডায়মান মন্দিরের উপরে কাউকে কবর দেওয়া যায় না, দেওয়া হয়েছে এমন নযীর ইতিহাসে মেলেনা, দেওয়া সম্ভবও নয়। ইসমাইল গাযীকে যখন এ ঢিবিতে দাফন করা হয়, তখন মন্দির জাতীয় ইমারতটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে মাটির স্তূপে পরিণত হয়েছিল এবং সেই মাটির স্তূপেই তাঁকে দাফন করা হয়েছিল। সে সময়ে বা পরে সেখানে মসজিদ স্থাপিত হয়েছিল। কালক্রমে উভয় ইমারতই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়। পরে কাটাদুয়ারের বর্তমান দরগাহ্‌টি নির্মিত হলেও মসজিদটি আর গড়ে ওঠেনি। খুব সম্ভব বড় দরগাতে ইসমাইল গাজীর মুণ্ডহীন দেহ সমাহিত আছে (বড় দরগাহ দ্র.)।

১. Mandaran and Mubarak Manzil in the Dist of Hugli—Mvi, Abdul Ali, Journal and proceeding Asiatic Society of Bengal (New Series), Vol. XIII, 1917, No 3, pp. 131—35.

মিঠাপুকুর মসজিদ

রংপুর শহর থেকে প্রায় ২৪ কিলোমিটার দক্ষিণে রংপুর-বগুড়া পাকা সড়কের উপর অবস্থিত মিঠাপুকুর একটি প্রাচীন স্থান। এখানে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি বিরাট জলাশয় আছে। নাম মিঠাপুকুর। দিঘিটি প্রাচীন। সঠিক সময় বলা না গেলেও এটি যে প্রাক-মুসলিম যুগের, তাতে সন্দেহ নেই। এ জলাশয়ের নামানুসারে এ স্থান ও থানার নাম হয়েছে মিঠাপুকুর।



মিঠাপুকুর মসজিদ, রংপুর

মিঠাপুকুরে মোঘল আমলের একটি মসজিদ আছে। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এ মসজিদটি আকারে খুব বড় নয়। মসজিদের চার কোণে ৪টি মিনার (turret) আছে। মিনারগুলি ছাদের কিছু উপরে উঠে ছোট গম্বুজে শেষ হয়েছে। সামনের দেয়ালে আছে ৩টি অর্ধবৃত্তাকার খিলান বিশিষ্ট দরজা। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে আছে অনুরূপ ১টি করে দরজা। কেন্দ্রীয় দরজাটি বাইরের দিকে কিছুটা উদগত। এ দরজার দু'দিকে দুটি গোলাকার সরু মিনার আছে এবং তা ছাদের উপরে উঠে গিয়ে ছোট গম্বুজে শেষ হয়েছে। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি মিহ্‌রাব। উপরে আছে ৩টি সুন্দর গম্বুজ। পূর্ব দেয়ালের সামনের দিকে সুন্দর প্যানেলিং দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল।

মসজিদের সঠিক বয়স বলা কঠিন, তবে এটি মোঘল আমলের শেষ দিকে অথবা কোম্পানির আমলে নির্মিত হয়েছিল বলে মসজিদের গঠন প্রণালী দেখে মনে হয়।

গাইবান্ধা জেলা

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ

বোগদহ-সাহেবগঞ্জ

বগুড়া-দিনাজপুর পাকা সড়কের উপরে অবস্থিত গোবিন্দগঞ্জ থানা থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম দিকে সরকারের একটি ইক্ষুফার্ম আছে। নাম বোগদহ বা বোগদা ইক্ষুফার্ম। মৌজার নাম বোগদহ কিন্তু এ স্থান সাহেবগঞ্জ নামেই অধিক পরিচিত। দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট থেকে এ স্থান প্রায় ৮ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তুত মেজর শেরউইলের-মানচিত্রে দেখা যায় যে, ঘোড়াঘাট দুর্গ যেখানে অবস্থিত, সেখান থেকে আরম্ভ করে প্রায় ৮ কিলোমিটার দক্ষিণের সমগ্র এলাকাকে 'সাহেবগঞ্জ' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে ইক্ষু ফার্মের অফিস যেখানে অবস্থিত, সেখানে থেকে প্রায় ১$\frac{১}{২}$ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত গ্রামটির নাম কচুয়া-কৃষ্ণপুর। এই গ্রামের পূর্ব দিকের বিরাট গ্রামটির নাম বোগদহ। বোগদহের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের বিরাট এলাকাকে বর্তমানে সাহেবগঞ্জ বা বোগদা ফার্ম এলাকা বলে। ফার্ম এলাকার পূর্ব প্রান্তে প্রাচীন করতোয়া নদীর তীরে একটি হাট আছে। নাম সাহেবগঞ্জ হাট।

বোগদহ-সাহেবগঞ্জ এলাকায় প্রায় ৩০ বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে এক কালে একটি বিশাল নগরীর অস্তিত্ব ছিল। প্রাচীন বোগদহ গ্রামের বহু স্থানে মাটির নিচে ইট-পাথরের সন্ধান পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় প্রাচীন ইমারতের ভিত্তি-দেওয়ালের চিহ্ন। এসব ধ্বংসাবশেষের কোনো জরিপ কার্য এখন পর্যন্ত হয়নি।

সাহেবগঞ্জ ইক্ষুফার্মের সমগ্র এলাকা ছিল জঙ্গলাবৃত। এখানে এককালে বাঘসহ অনেক হিংস্র জন্তু বাস করত। জঙ্গলের ভিতরে ছিল অসংখ্য ঢিবি এবং প্রাচীন জলাশয়। জলাশয়ের সংখ্যা ছিল ২৩। এগুলি সবই মাঝারি আকারের। কিন্তু প্রত্যেকটি জলাশয়েই ইটবাঁধান ঘাট ছিল।

ফার্মের ভূমি তৈরি, সেচ কাজের জন্য খাল খনন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য এখানে বুলডোজার চালান হয়। ফলে এখানকার প্রায় সব কীর্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এসব কাজের সময় প্রত্নকীর্তির নিদর্শন দেখে ফার্ম কর্তৃপক্ষ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগকে সংবাদ দেয়। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ যখন ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে এখানে পরীক্ষামূলক উৎখনন কার্য চালায়, তখন মাত্র ৫টি ঢিবি টিকে ছিল; বাকি সব ঢিবি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

বোগদহ বিহার

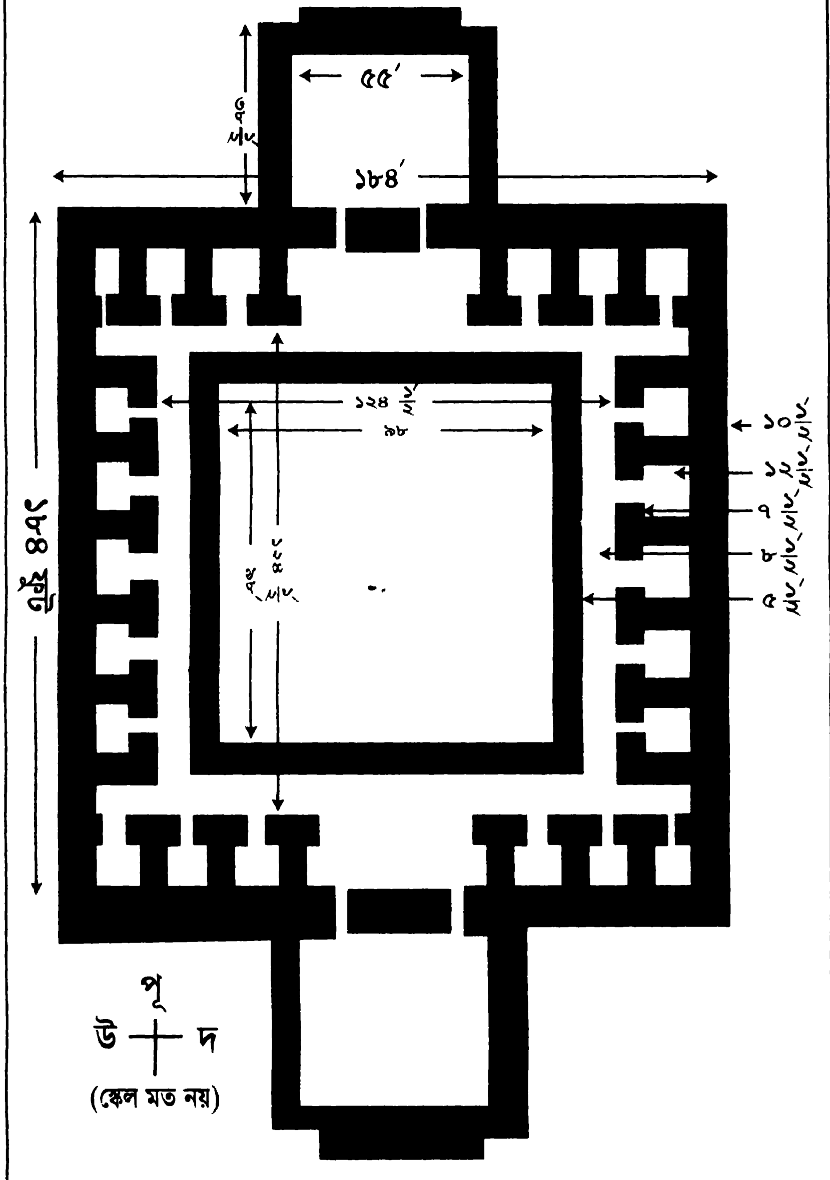
পাঁচটি ঢিবির মধ্যে মেড় নামে পরিচিত ঢিবি ছিল সর্ববৃহৎ। প্রায় বর্গাকৃতির এ ঢিবির প্রত্যেক বাহু ছিল প্রায় ৬০ মিটার দীর্ঘ এবং উচ্চতা ছিল প্রায় ৯ মিটার। আংশিক ও পরীক্ষা মূলক উৎখননের পরে এখানে সুপরিকল্পিতভাবে নির্মিত একটি সুবৃহৎ অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

বর্গাকারে নির্মিত এবং খুব সম্ভব একাধিক তলবিশিষ্ট এই ইমারতের প্রত্যেক বাহু ছিল (বাইরের দিকে) ৫৫.৭৫ মিটার দীর্ঘ। পূর্ব ও পশ্চিম ব্লকের মধ্যভাগে ১১.৬৬ মিটার × ১৬.৭ মিটার আয়তনের ১টি করে উদগত অংশ ছিল। এ দুটি হল কামরা ছিল বলে ধারণা হয়। এ দুটি কক্ষের ভিতরের দিকে '৪.৭ × ১৩.১৮ ফুট' আয়তনের দুটি কামরা ছিল। এ দুটি কামরা ও সামনের টানা বারান্দার মধ্যে কোনো প্রাচীর ছিল না।

এই অট্টালিকার ভিতরে ছিল প্রায় ২৬.৬৬ মিটার × ২৬.৬৬ মিটার আয়তন বিশিষ্ট একটি প্রাঙ্গণ (খুব সম্ভব উন্মুক্ত)। এই প্রাঙ্গণের সঠিক রূপটি কী ছিল, তা জানা সম্ভব হয়নি। কারণ, খননের সময় পুকুর আকারের বিরাট একটি গর্ত সেখানে দেখা গেছে। জনশ্রুতি মূলে জানা যায় যে, দেশ বিভাগের অনেক আগে গুপ্তধনের লোভে কে বা কারা নাকি সেখানে খনন কাজ করেছিলেন। একারণেই যে এখানে গর্তটি পাওয়া গেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কেন্দ্রীয় ভিতরের আঙ্গিনার চার পাশে ছিল ২.৫৭ মিটার চওড়া টানা বারান্দা। বারান্দার বাইরের দেয়াল ছিল ১.৫২ মিটার প্রশস্ত। বারান্দার পরেই ছিল বিভিন্ন ব্লকের কক্ষগুলি। উত্তর ও দক্ষিণ ব্লকে ছিল ৫টি করে মোট ১০ টি কক্ষ। এগুলির প্রত্যেকটির আয়তন ছিল ৪.৮৪ মিটার × ৪.২৪ মিটার। পূর্ব ও পশ্চিমে বাহুতে ছিল ৬টি করে মোট ১২ টি কক্ষ। এগুলির প্রত্যেকটি ছিল ৩.৮ মিটার × ৩.৮ মিটার আয়তন বিশিষ্ট। প্রত্যেক কক্ষের সামনের দেয়াল ছিল .৬৯ মিটার প্রশস্ত এবং পিছনের দেয়াল ছিল প্রায় .৯৩ মিটার প্রশস্ত। চার পাশের এই টানা দেয়ালে কোন দরজা বা জানালা ছিল না। দেয়াল গুলি ইট ও কাদামাটির সাহায্যে নির্মিত হয়েছিল। এটি ছিল দুর্গাকারে নির্মিত একটি বৌদ্ধবিহার।

এই ইমারতে অন্তত দুই পর্যায়ে নির্মাণ কার্য চলেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রথম পর্যায়ের নির্মান কার্য যে প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। উৎখননের পরে এখানে সে যুগের কিছু কিছু প্রত্ন বস্তু পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে আছে নকশা করা ইট, পোড়ামাটির ফলকে মানুষ ও প্রাণীর ছবি, মাটির তৈরি মানুষ ও জীবজন্তুর ছোট ছোট মূর্তি, মূল্যবান পাথরের তৈরি গুটিকা (beads of semi-precious stones), লোহার বর্শা ফলক ইত্যাদি। তাছাড়া, আংশিক খোদিত লিপিসহ একটি প্রস্তর মূর্তির ভগ্নাংশ এবং একটি ছোট ব্রোঞ্জ মূর্তিও (উপবিষ্ট অবস্থায়) এখানে পাওয়া গেছে। এ গুলি এবং এ ধরনের অন্যান্য প্রত্নবস্তু যা এখানে পাওয়া গেছে, সেগুলি যে প্রাক-মুসলিম যুগের, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।


মেড়, সাহেবগঞ্জ-বোগদহ (গাইবান্ধা)
৫৫′
১৮৪′
১২৪ ½′
৯৮
১০
১২
৭
৮
৫
পূ
উ
দ
(স্কেল মত নয়)

এখানে আরও পাওয়া গেছে চতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে প্রচলিত তৈজস পত্রের কিছু কিছু ভগ্নাংশ। এগুলির মধ্যে নীল বর্ণের চীনামাটির বাসনকোসনের ভগ্নাংশ (blue glazed pottery sherds) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলি সুলতানী আমলে প্রচলিত ছিল।

এ সমস্ত প্রত্নবস্তু দেখে সহজেই ধারণা করা যায় যে, প্রাক-মুসলিম যুগে নির্মিত এই ইমারতটি মুসলিম আমলেও ব্যবহৃত হয়েছিল এবং এ কারণেই সুলতানী আমলের তৈজসপত্রের নিদর্শন এখানে পাওয়া গেছে। তাছাড়া, প্রাচীন ভগ্নাবশেষের উপর মুসলিম আমলে নির্মিত চুন-সুরকির সাহায্যে তৈরি ইটের দেয়ালও এখানে পাওয়া গেছে।

কীতিটির যে ভূমি-নকশা প্রদত্ত হল তা থেকে অতি সহজেই ধারণা করা যায় যে, এটি একটি ছোট বৌদ্ধ বিহারের। উত্তর ও দক্ষিণের প্রান্তদেশে যে দুটি বর্ধিত অংশ (off-set) আছে, তা ছাড়া অবশিষ্ট ভূমি-নকশার সঙ্গে এদেশে আবিস্কৃত আর সব বিহার বিশেষ করে দিনাজপুর জেলার সীতাকোট বিহার, বগুড়া জেলার ভাসু বিহারা, কুমিল্লা জেলার বড় ইটাখোলা বিহারের ভূমি নকশার যে যথেষ্ট মিল অর্থচ্ছে তা মেনে নিতেই হয়। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মেড় ইমারতের অসাধারণ মিল দেখে এটিকে একটি বৌদ্ধ বিহার ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে এই প্রাচীন কীর্তিটিকে বিহার বলে অভিহিত করা হয়নি একারণে যে, এখানে এবং সমগ্র এলাকায় যে সর্ব প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছিল সেই সবই ছিল হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনো প্রত্নবস্তুই এখানে পাওয়া যায়নি।

এর কারণও হয়ত ছিল। এ বৌদ্ধ বিহারটি ছিল খুব সম্ভব পালপূর্ব যুগের। পালদের পরে এদেশে যখন হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক নৃপতিদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তখন যারা এখানে বাস করতেন তারা খুব সম্ভব বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির সব বস্তু অপসারিত করে এখানে তাদের সংস্কৃতিকেই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে সুলতানী আমলে এখানকার মুসলিম অধিকারীরা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত বস্তু ও বিষয়াবলী।

ইমারতটিকে সরেযমিনে দেখার পর এটিকে বৌদ্ধ বিহার ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

এই ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার উত্তরে আর একটি ঢিবিতে উৎখনন করা হয়। সেখানে কাল পাথরে তৈরি একটি অতি সুন্দর স্তম্ভ, পাথরের তৈরি একটি গৌরীপট্ট ও কয়েকটি বেদী আবিষ্কৃত হয়েছে। পোড়ামাটির চিত্রফলকসহ আরও অনেক ছোটখাট প্রত্নবস্তুও সেখানে পাওয়া গেছে। এখানে স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি অভ্যন্তরীণ কক্ষের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই কক্ষ ও চারপাশের ধ্বংসাবশেষের নমুনা দেখে মনে হয় যে, এটি ছিল এক বিরাট মন্দিরের অভ্যন্তরীণ কক্ষ (hall-room)। এখানেও দুই পর্যায়ে নির্মাণ কার্য হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

ফার্মের বিশ্রামাগারের নিকটবর্তী একটি ঢিবিতে খননের পর ৩০.৩ মিটার × ৩০.৩ মিটার আয়তনের একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এখানে

বিচিত্র ধরনের বিভিন্ন প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে। হাতের বলয়, কানের দুল, নাকফুল ইত্যাদি অলঙ্কার প্রস্তুতের জন্য পাথরের তৈরি কারুকার্যময় বিভিন্ন ছাঁচ (moulds) এখানে পাওয়া গেছে। ছাঁচগুলি "২ × ৪ ইঞ্চি থেকে ৫ × ৩ ইঞ্চি" ইত্যাদি বিভিন্ন মাপের। এখানে ব্রোঞ্জ নির্মিত স্বর্ণকারের একটি নিক্তিও পাওয়া গেছে। এতে মনে হয় যে, এখানে স্বর্ণ-রৌপ্যর অলঙ্কারাদি প্রস্তুতের জন্য একটি কারখানা ছিল।

বোগদহ-সাহেবগঞ্জ এলাকা থেকে অন্যান্য যে সব উল্লেখযোগ্য প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে, সেগুলির মধ্যে আছে কারুকার্য খচিত একটি তাম্রপাত্রের কানা ও অন্যান্য অংশ, কালপাথরে তৈরি ইঁদুর বাহনের একটি মূর্তির নিম্নাংশ (খুব সম্ভব গণেশ মূর্তি) এবং কালপাথরে তৈরি কারুকার্যময় একটি ষষ্ঠীর ভগ্নাংশ। তাছাড়া, অসংখ্য প্রস্তর স্তম্ভও এখানে পাওয়া গেছে।

ইক্ষুফার্মের জন্য বুলডজার দিয়ে জমি তৈরি করার সময় এখানে একটি প্রাচীন নগরীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। সেখানে প্রশস্ত রাস্তার দু'পাশে মাটির নিচে ছিল অসংখ্য পাকা ইমারতের ভিত্তি দেয়ালের অস্তিত্ব। অসংখ্য বাড়ি-ঘর সেখানে ছিল। আর ছিল পাকা ড্রেনের অস্তিত্ব। ইক্ষুফার্ম তৈরি করার পরে সে সব ধ্বংসাবশেষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

বিরাটনগর

গোবিন্দগঞ্জ থানার অধীনে ও বোগদহ-সাহেবগঞ্জ থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার পশ্চিম দিকে অবস্থিত বিরাটনগর একটি অতি প্রাচীন স্থান। অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ ও ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন আছে এ স্থানে। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তুত মেজর শেরউইলের (Major Sherwill) মানচিত্রে এ স্থানকে 'ব্রাদ রাজার গড়' (Brad Rajar Gar) বলে অভিহিত করা হয়েছে।

এককালে সমগ্র এলকা জুড়ে এখানে একটি বিরাট দুর্গনগরী ছিল বলে জানা যায়। সেই দুর্গনগরীর চারদিকে ছিল সুউচ্চ প্রাচীর এবং প্রাচীরের বাইরে ছিল প্রশস্ত ও সুগভীর পরিখা (moat)। পরিখার চিহ্ন বর্তমান 'বিরাট নগর' নামক গ্রামের স্থানে স্থানে দেখা গেলেও প্রাচীরের কোনো চিহ্ন কোথাও চোখে পড়ে না। গ্রামের চারদিকে বিশেষ করে পূর্ব ভাগে গড়ে উঠেছে ঘন বসতি। ফলে দুর্গ-প্রাচীরের সব চিহ্ন হয়ত বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ স্থান সম্পর্কে ১৯২৫-২৬ খ্রিস্টাব্দে একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের দিকেও এ স্থান ছিল জঙ্গলাবৃত এবং সামান্য কয়েক বছর আগে সাঁওতালেরা এ স্থান পরিষ্কার করেন। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের দিকে বিরাটনগর এলাকা থেকে ব্রোঞ্জ নির্মিত অতি সুন্দর ৫টি বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হয় এবং এখানে ৪-৫টি ঢিবি ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় ঢিবি থেকে মাটি কাটার সময় সাঁওতালরা সেখানে একটি ইমারতের পাকা দেয়ালের সন্ধান পান। বর্ধনকুঠির ছোট তরফের জমিদার কুমার শৈলেশ চন্দ্র রায় ছিলেন প্রত্নকীর্তির ব্যাপারে উৎসাহী। এটি ছিল তাঁর জমিদারির অন্তর্গত। তিনি উদ্যোগী হয়ে উৎখনন কার্য করান এবং '১৯৫ ফুট × ১৫০ ফুট'

আয়তনের একটি ইমারতের ভিত্তি দেয়াল আবিষ্কার করেন। এতে ৪টি প্রবেশপথ ও সামনের দিকে একটি মণ্ডপ (porch) ছিল। এই ইমারতের গর্ভগৃহ ছিল '১৭'-৬" × ১৭-৪" ফুট' আয়তনের।

এই দেবালয়ের মেঝে ছিল পাথরের তৈরি এবং ঢিবির উপরে ছিল কাল পাথরের তৈরি একটি সুন্দর 'গারগয়েল' (gargoyle)। দেবালয়ের দেয়ালগুলি পাহাড়পুর বিহারের দেয়ালের মতো করে তৈরি ছিল। কিন্তু এটি কোনো বৌদ্ধবিহার ছিল না, এটি ছিল খুব সম্ভব একটি হিন্দু মন্দির এবং গয়ার বিখ্যাত গদাধর মন্দিরের অনুকরণে এটি নির্মিত ছিল বলে তিনি অনুমান করেন।

এখানে পুরাপুরি খনন কার্য করা হয়নি এবং অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে এখানে খনন কার্য করা হবে বলে তিনি প্রতিবেদনে বলেছেন।[১] কিন্তু সেখানে এপর্যন্ত আর কোনো উৎখনন কার্য করা হয়নি।

---

১. "Birat lies in the south-eastern corner of Rangpur district far away from the headquarters of the district, to the south of the river Karotoa. From information gathered on the spot it appears that the locality was covered with jungle about 20 years ago and that has only recently been cleared by the Santals. Some sixteen years ago five magnificent metal images of Vishnu were discovered in the locality. There are four or five large mounds in this village which belongs to the zeminder of Bardhankot. One of the mounds was cleared last year by a santal who found in it a masonry wall and reported the matter to Kumar Sailesh Chandra Roy the minor Zeminder of Bardhankot, who takes great interest in the history and antiquity of his Zemindari. The latter followed up the excavation started up by the Santal and brought to light the remains of a large temple measuring 195'x 150' with four gateways and a porch 'mandap' in front. In the middle of the edifice he found remains of a small brick-built 'Garbhagriha' measuring 16'-6"by 17'-4". This shrine which was paved with stone and provided with a beautiful black basalt gargoyle, still in position, contained a basalt pedestal with a spout. The construction of the walls of this shrine is exactly similar to that of the Buddhist temple at Paharpur. The masonry is closejointed but laid in mud mortar. The foundation was strengthened by building several parallel walls and filling the inter spaces with mud. The entire building has not been excavated and steps are being taken to complete the work on scientific lines. Several fragments of terracotta plaques discovered during the excavation prove that, like the Paharpur temple, this one also was ornamented with *dados* composed of terra-cotta plaques. In plan, however, this temple is quite different from that at Paharpur and it shows a clear resemblance to the north-eastern Hindu type as exhibited, for example, by the temple of Gadadhara at Gaya. Four other mounds remain to be excavated at Birat and all of them deserve to be protected under the Ancient Monuments Presevation Act."

—The Annual Archaeological Survey of India Report, 1925-26, p. 113

—R.D. Banerjee.

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে আমরা এ স্থান পরিদর্শন করি। কিন্তু রাখালদাস বাবু বর্ণিত তথাকথিত '১৯৫ ফুট × ১৫০ ফুট' আয়তনবিশিষ্ট কোনো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের চিহ্নই সেখানে দেখতে পাইনি। স্থানীয় লোকেরাও এসম্বন্ধে কিছু বলতে পারেননি। তিনি স্থানটি সরেযমিনে দেখেছিলেন কিনা জানা নেই। সেখানে চারটি বা পাঁচটি বড় ঢিবি ('four or five mounds') ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেখানে ৪টি মাঝারি আকারের ঢিবি আছে।

সবচেয়ে বড় ঢিবিটি প্রায় বিঘা দেড়েক ভূমির উপর অবস্থিত এবং এখনও (১৯৬৮ খ্রিঃ) প্রায় '২৫ ফুট' উঁচু। এই ঢিবির উপরে কাল পাথর দিয়ে তৈরী প্রায় ১.২১ মিটার লম্বা একটি সুন্দর 'গারগয়েল' বা নালা (gargoyle) তখনও সেখানে পড়ে ছিল। এর সম্মুখ ভাগে ছিল অতি মনোরমভাবে নির্মিত বাঘের মুখাকৃতি। ঢিবিতে প্রচুর প্রাচীন ইটের অস্তিত্ব ছিল এবং উপরের দিকে ভিত্তি দেয়ালের চিহ্নও দেখা গেছে।

এই বড় ঢিবির কাছাকাছি দক্ষিণ দিকে ১টি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ১টি এবং পূর্ব দিকে আর ১টি ঢিবি ছিল। এগুলির প্রত্যেকটি প্রায় ১ বিঘা ভূমি জুড়ে অবস্থিত ছিল এবং প্রত্যেকটি ঢিবিতে প্রচুর ইট ও কিছু কিছু ভিত্তি দেয়ালের চিহ্ন দেখা গেছে।

প্রায় ৩ একর পরিমিত সমতল এবং অপেক্ষাকৃত উঁচু ভূমির দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাংশে ঢিবিগুলি অবস্থিত। ঢিবিগুলির সম্মুখে উত্তর দিকে যে উন্মুক্ত সমতল ভূমি ঘন দুর্বাদলে আচ্ছাদিত আছে, সেখানেই ছিল খুব সম্ভব রাখালদাস বাবু বর্ণিত বিরাট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এস্থান ছাড়া এতবড় মন্দিরের অবস্থান এস্থানের আর কোথাও থাকা সম্ভবপর নয়। কারণ, ঢিবিগুলির অন্তবর্তী যে উন্মুক্ত স্থান আছে, তা এক বিঘার চেয়েও অনেক কম। রাখালদাস বাবুর বর্ণনা যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এত বছর পরে হয়ত সেই দেবালয়ের সব চিহ্ন নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং ইট সরিয়ে নিবার ফলে স্থানটি সমতল মাঠে পরিণত হয়েছে এবং দূর্বাদলে আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছে।

এই সমতল মাঠের লাগোয়া উত্তর দিকে একটি পাড়হীন প্রাচীন জলাশয় আছে। পুকুরের উত্তর পাড়ে আছে একটি গ্রাম্য পথ। পথের লাগোয়া উত্তর পাশেই আছে একটি সরকারি তহসীল কাচারি। পুকুরের কাছেই আছে একটি প্রাচীন্ বৃক্ষ। বৃক্ষটি অপরিচিত এবং স্থানীয় লোকেরা এটিকে শমী বৃক্ষ বলেন। এই বৃক্ষের শাখায় নাকি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন তাঁর তীর-ধনুক (গাণ্ডীব) লুকিয়ে রাখতেন অজ্ঞাত বাসের সময়ে।

এ স্থান থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার পশ্চিমে একটি পাড়হীন প্রাচীন জলাশয় আছে। জলাশয়ের বাঁধান ঘাটের চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। মদীয়া দিঘি নামের পরিচিত এই প্রাচীন জলাশয়ের চার পাশের ভূমির রঙ খুব লাল হলেও স্থানটি বেশ নিচু এলাকা। এটি দেখতে প্রায় জলশূন্য বিলের মতো, অথবা বরেন্দ্র এলাকার মতো।

বিরাটনগর থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার দক্ষিণে কীচক গ্রাম। সেখানে মহাভারতে বর্ণিত বিরাট রাজার শ্যালক কীচকের নিবাস স্থল ছিল বলে স্থানীয় লোকের বিশ্বাস। বিরাট নগর থেকে ১.৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি প্রাচীন গ্রাম আছে।

সেখানে কিছু প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন অর্থাৎ কিছু কিছু প্রাচীন ইট কোথাও কোথাও দেখা যায়। এস্থানে দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম কর্তৃক কীচক নিহত হয়েছিলেন বলে স্থানীয় লোকেরা জোর দিয়ে বলেন। বিরাট নগর থেকে ১.৫ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত একটি স্থানে বিরাট রাজার নাট্যশালা ছিল বলেও তারা বলেন। সেখানে প্রাচীন কীর্তির কিছু ধ্বংসাবশেষ আছে।

বিরাটনগরের ঢিবিগুলিকে কেন্দ্র করে প্রায় ৮ বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির বিলুপ্তপ্রায় ধ্বংসাবশেষের কিছু চিহ্ন এখানে ওখানে আজও চোখে পড়ে। এই এলাকার প্রায় সর্বত্রই মাটির নিচে পাওয়া যায় অসংখ্য প্রাচীন ইট। ঢিবিগুলির পূর্ব দিকে যে ঘন বসতি গড়ে উঠেছে, সে সব বাড়িঘরের নিচে বহু ইমারতের ভিত্তিদেয়াল পাওয়া যায় বলে স্থানীয় লোকদের কাছে জানা গেছে। সেই এলাকার কিছু দূরে বিশেষ করে উত্তর দিকে প্রাচীন পরিখার (moat) চিহ্নও দেখা গেছে।

এখান থেকে সে সময়ে ২টি প্রস্তর মূর্তি উদ্ধার করা হয়েছিল। প্রথম মূর্তিটি ছিল কাল পাথরে তৈরি প্রায় ০.৬ মিটার উঁচু আলিঙ্গনরত একটি হরগৌরীর মূর্তি। মূর্তির গঠন কৌশল ও শিল্প চাতুর্য অতি উন্নত মানের। পূর্বে উল্লিখিত তহসীল কাচারি থেকে মূর্তিটি সংগৃহীত হয়েছিল। মূর্তিটি এই এলাকায়ই পাওয়া গিয়েছিল বলে কাচারির কর্মচারীদের কাছে জানা যায়।

দ্বিতীয় মূর্তিটি একটি গজলক্ষী মূর্তি। কাল পাথরে তৈরি এই মূর্তিটি দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় পড়েছিল ঢিবিগুলি থেকে প্রায় ১কিলোমিটার পূর্বদিকে অবস্থিত এক হিন্দু ভদ্রলোকের বাড়ির আঙ্গিনায়। অদ্ভুত শিল্প চাতুর্যের নিদর্শন আছে এ মূর্তিটিতেও। এটি এই এলাকায় পাওয়া গিয়েছিল বলে সেই ভদ্রলোকের কাছে জানা গেছে।

বিরাট নগরের কোনো সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। সমগ্র উত্তরবঙ্গে প্রচলিত প্রবল জনপ্রবাদ মতে এ স্থানে ছিল মহাভারতে বর্ণিত মৎস্য দেশের অধিপতি বিরাট রাজার রাজধানী, ঘোড়াঘাটে ছিল তাঁর অশ্বশালা (ঘোড়াঘাট দ্র.), কান্তনগরে (কান্তনগর দ্র.) ছিল তাঁর উত্তর গোগৃহ এবং গোয়ালদিহীতে (গোয়াল দিহী দ্র.) ছিল তাঁর আর এক গোগৃহ ইত্যাদি ইত্যাদি। উত্তর বঙ্গের প্রায় প্রত্যেকটি প্রাচীন স্থানের ধ্বংসাবশেষকে হয় রাজা বিরাট, না হয় চাঁদ সদাগরের ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত করার প্রবণতা দেখা যায়।

বিরাট রাজা আদৌ ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা, হলেও মৎস্য দেশ উত্তর বঙ্গে ছিল কিনা, সে সম্পর্কে বিরাট সন্দেহ আছে। তিনি একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন এবং মৎস্য দেশের অবস্থান উত্তর বঙ্গে ছিল, এই সিদ্ধান্ত তর্কের খাতিরে মেনে নিলেও বিরাট নগরে যে সব প্রত্ন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ ও প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে, সেগুলি যে মহাভারতেব যুগের নয়, সে সম্পর্কে অধিক বাক্য ব্যয় নিরর্থক। এগুলি যে পাল যুগের শেষ দিকের অথবা সেন যুগের, তাতে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। রাখালদাস বাবু কর্তৃক উল্লিখিত ধাতু নির্মিত বিষ্ণুমূর্তিগুলি দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। এগুলিও গুপ্ত যুগের আগের হয়ত নয়। সর্বোপরি এখানকার ইমারতের ধ্বংসাবশেষ গুলি যে পাল-সেন যুগের, তা মেনে নিতেই হয়।

মুসলিম আমল

বর্ধনকুঠি

বগুড়া-রংপুর পাকা সড়কের উপর অবস্থিত গোবিন্দগঞ্জ থানা সদর থেকে প্রায় ২.৫ কিলোমিটার পূর্ব দিকে অবস্থিত বর্ধনকুঠি নামক স্থানে রাজা নামে পরিচিত স্থানীয় জমিদারদের রাজবাড়ি ও মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ আছে। রাজবাড়ির সামনে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি বিরাট দিঘি আছে। দিঘিটি প্রায় মজে গেছে। দিঘির উত্তর দিকের ইমারত গুলিতে বর্তমানে নানারকম অফিস বসেছে। রাজবাড়ির বিভিন্ন ইমারত বর্তমানে বাসের অযোগ্য বলে পরিত্যক্ত হয়েছে। এখানে দুটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। সর্বমঙ্গলা ও শ্যামসুন্দরের মন্দির নামে পরিচিত মন্দির দুটি এমনভাবে ধ্বংস হয়েছে যে, এগুলির কোনো বর্ণনা দেওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। মোঘল আমলের পাতলা ইটে নির্মিত মন্দির দুটি ১৬০১ ও ১৬০৫ (?) খ্রিস্টাব্দে বর্ধন কুঠির জমিদার রাজা ভগবান দাস (?) কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল বলে মন্দির দুটির গাত্রে যে শিলালিপি ছিল তা থেকে জানা যায়।

বগুড়া জেলা

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ

মহাস্থানগড়

বগুড়া শহর থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার উত্তরে বগুড়া-রংপুর মহাসড়কের পশ্চিম পাশে ও প্রাচীন করতোয়া নদীর ডান তীরের বাঁকে অবস্থিত মহাস্থানগড় বাঙলার প্রাচীনতম নগরী গুলির মধ্যে অন্যতম। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত নগরীগুলির মধ্যে এটিকে সবচেয়ে প্রাচীন নগরীও বলা যেতে পারে এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে। বিভিন্ন প্রাচীন শিলা ও তাম্রলিপি এবং প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বর্ণিত বিখ্যাত পুণ্ড্রবর্ধন বা পুণ্ড্রনগরই বর্তমান কালে মহাস্থান নামে পরিচিত।

চারদিকে উঁচু প্রাচীর বেষ্টিত উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এই দুর্গ নগরীর আয়তন প্রায় ১৫১৫ মিটার × ১৩৬৩ মিটার। চার পাশের সমতল ভূমি থেকে গড়ের অভ্যন্তরস্থ ভূমি প্রায় ৫ মিটার উঁচু। কিন্তু গড়ের মধ্যভাগে অবস্থিত পূর্ব দেয়ালের নিকটবর্তী এলাকা অপেক্ষাকৃত নিচু। প্রাচীরগুলি প্রায় ৫ মিটার উঁচু। স্থানে স্থানে বিশেষ করে কোণ ও বুরুজের অংশে বাইরের সমতল ভূমি থেকে প্রাচীরের উচ্চতা প্রায় ১০ মিটার। কোনো কোনো স্থানে বিশেষ করে উত্তর প্রাচীরের পূর্বাংশে, পূর্ব প্রাচীরের উত্তর দিকের কিছু অংশ ও দক্ষিণ প্রাচীরের পূর্বাংশে প্রাচীরগুলি প্রধানত ইটের তৈরি।

গড়ের চারদিকে বর্তমানে পরিখার (moats) তেমন কোনো অস্তিত্ব দেখা যায় না। ডক্টর বুকানন-হ্যামিলটন তাঁর বর্ণনায় পরিখার কথা বলেননি। স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহ্যাম ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের দিকে এ স্থান পরিদর্শন করেন। দুর্গনগরীর উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে পরিখা[১] ছিল বলে তিনি তাঁর গ্রন্থেও সংযোজিত নকশায় উল্লেখ করেছেন।[২]

গড়ের চার দেয়ালে ৪টি তোরণের কথা বলে শিলাদেবীর ঘাট বরাবর আরও একটি তোরণ ছিল বলে তিনি উল্লেখ করে গেছেন। পূর্ব দেয়ালের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত প্রবেশপথকে 'দারাব শাহী তোরণ', উত্তর দেয়ালের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত প্রবেশ পথকে 'সনাতন সাহেবকা গলি', পশ্চিম দেয়ালের দক্ষিণভাগে অবস্থিত দরজাটিকে

---

১. "It was originally surrounded by a broad ditch on the north, south and west sides, and was no doubt protected by the Karatoya River on the east, as the low lands come right upto the foot of the rampart."— *Archaeological Survey of India Report*. Vol. xv. p. 105.
—Sir Alexander Cunningham.

২. Ibid, plate No. XXX.

'তাম্বা দরওয়াজা' এবং দক্ষিণ দেয়ালের পূর্ব দিক ঘেঁষে যে প্রবেশ পথটি ছিল সেটিকে 'বুড়িকা দরওজা' বলা হত বলে তিনি উল্লেখ করে গেছেন। অন্যগুলির কথা সঠিকভাবে বলা না গেলেও শেষোক্ত প্রবেশপথটি যে অনেক পরবর্তীকালে মুসলিম আমলে নির্মিত বা পুনর্নির্মিত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এই প্রবেশপথ দিয়ে মুসলিম আমলে নির্মিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ সোপানশ্রেণী বেয়ে উপরে যাবার পথে কতগুলি পাকা কবর চোখে পড়ে। একটি কবরকে তথাকথিত রাজা পরশুরামের তথাকথিত ঝাড়ুদার ও সুলতান মাহী সাওয়ারের ভক্ত ও ধর্মান্তরিত মুসলিম হরপালের বলে জনশ্রুতি মূলে চিহ্নিত করা হয়। বাকি কবরগুলি সেলবরষের জমিদার ও মাযারের খাদিমদের বলে জানা যায়।

সোপান শ্রেণী যেখানে শেষ হয়েছে, তার পরেই বাঁদিকে বর্গাকারে নির্মিত ও ৭.০৪ মিটার বাহুবিশিষ্ট এক গম্বুজের একটি মসজিদ আছে। মসজিদের দেয়ালগুলি পলেস্তারার উপরে ফুলের অনুকৃতি দ্বারা সাধারণভাবে অলঙ্কৃত ছিল। ভিতরের ৩টি মিহরাবের মধ্যে কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড়। মিহরাবগুলি পলেস্তারার উপরে লতাপাতা ও ফুলের অনুকৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। মসজিদের প্রবেশপথের উপরে ফারসি ভাষায় উৎকীর্ণ যে শিলালিপি আছে, তা থেকে জানা যায় যে, দিল্লীর সম্রাট ফররুখ সিয়রের রাজত্বকালে ১১৩০ হিজরী (১৭১৯ খ্রিঃ) সনে খোদাদীল নামক এক ব্যক্তি এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। ঘন ঘন সংস্কার, চুনকাম, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও ইচ্ছামত সম্প্রসারণের ফলে এক কালের এই সুন্দর প্রাচীন কীর্তির আদি অলঙ্করণ ও সৌন্দর্য সম্পর্কে আজ সঠিকভাবে কিছুই বলা সম্ভব নয়।

মসজিদের সামান্য উত্তর-পূর্ব দিকে একটি মাযার আছে। চারদিকে প্রাচীর বেষ্টিত একটি উন্মুক্ত স্থানে মাযারটি অবস্থিত। মাযারে একটি মাত্র প্রবেশপথ আছে। দক্ষিণ প্রাচীরে অবস্থিত এই প্রবেশ পথটি বেশ সংকীর্ণ। প্রবেশপথে পাথরের চৌকাঠে 'শ্রী নরসিংহ দাসস্য' কথা কয়টি বাংলাভাষায় উৎকীর্ণ আছে। এতে কোনো সন-তারিখ নেই। তবে লিপিতত্ত্বের বিচারে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, এই লিপি খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর আগের নয়। অঙ্গনের প্রায় কেন্দ্রস্থলে যে পাকা সমাধিটি আছে, তা সাধারণভাবে নির্মিত হলেও দেখতে ভারী সুন্দর। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত কবরের উপরে কোনো ইমারত ছিল না। হাল আমলে চাঁদোয়ার মত একটি পাকা আচ্ছাদন নির্মাণ করা হয়েছে।

স্যার কানিংহ্যাম (১৮৮০ খ্রিঃ) বলেন যে, কবরের উপরে এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকারে নির্মিত একটি ছোট ইমারত ছিল। প্রবেশপথের শিলালিপির কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন।[১] তিনি আরও বলেন যে, মাযার অঙ্গনে পদহীন একটি ভগ্ন জৈন মূর্তি ছিল। মূর্তিটি নগ্ন ছিল বলে তিনি এটিকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। কাছেই ছিল বরাহ অবতারের একটি ভগ্ন মূর্তি। মূর্তিটির পাদদেশ মাত্র টিকে ছিল। সেখানে ২টি

---

১. "Mahi-Sawar's tomb, or *asthan* as it is generally called, is a common white-washed square building covered by a low dome. The entrance door is very small, but each of the jambs has a short inscription in mediaeval Nagari letters, reading *Sri Narasinha dasasya'* or 'Sri Narasinha's slave."—Ibid, p. 107.

গৌরীপট্ট এবং শিবলিঙ্গও ছিল। সেখানে নীল পাথরে নির্মিত একটি নরমুণ্ডের অর্ধাংশও ছিল।[২]

দরগার কাছে বর্তমানে (১৯৭৮ খ্রিঃ) স্যার কানিংহ্যাম বর্ণিত ৪-৫´´ ব্যাস বিশিষ্ট কালপাথরে নির্মিত গোলাকার গৌরী পট্টটি আছে কিন্তু উঁচু শিবলিঙ্গটি নেই। স্যার কাণিংহ্যাম বর্ণিত দ্বিতীয় গৌরী পট্ট, লিঙ্গ ও অন্যান্য মূর্তির ভগ্নাংশ এখন আর মন্দির অঙ্গনে দেখা যায় না। তবে দরগার অঙ্গনে বহু প্রস্তর খণ্ড বিশেষ করে কাল পাথরের ভগ্নাংশ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখা যায়। এধরনের পাথর মুসলিম আমলে এখানে নির্মিত ইমারতেও দেখা যায়। মাযার অঙ্গনে সাদা চুনকাম করা একটি চতুষ্কোণ ছোট অনুচ্চ বেদী দেখা যায়। রাজা পরশুরামের অনুমতি পেয়ে এ স্থানেই সুলতান মাহী সাওয়ার সর্বপ্রথম নামাজ আদায় করেছিলেন বলে জনশ্রুতিমূলে জানা যায়।

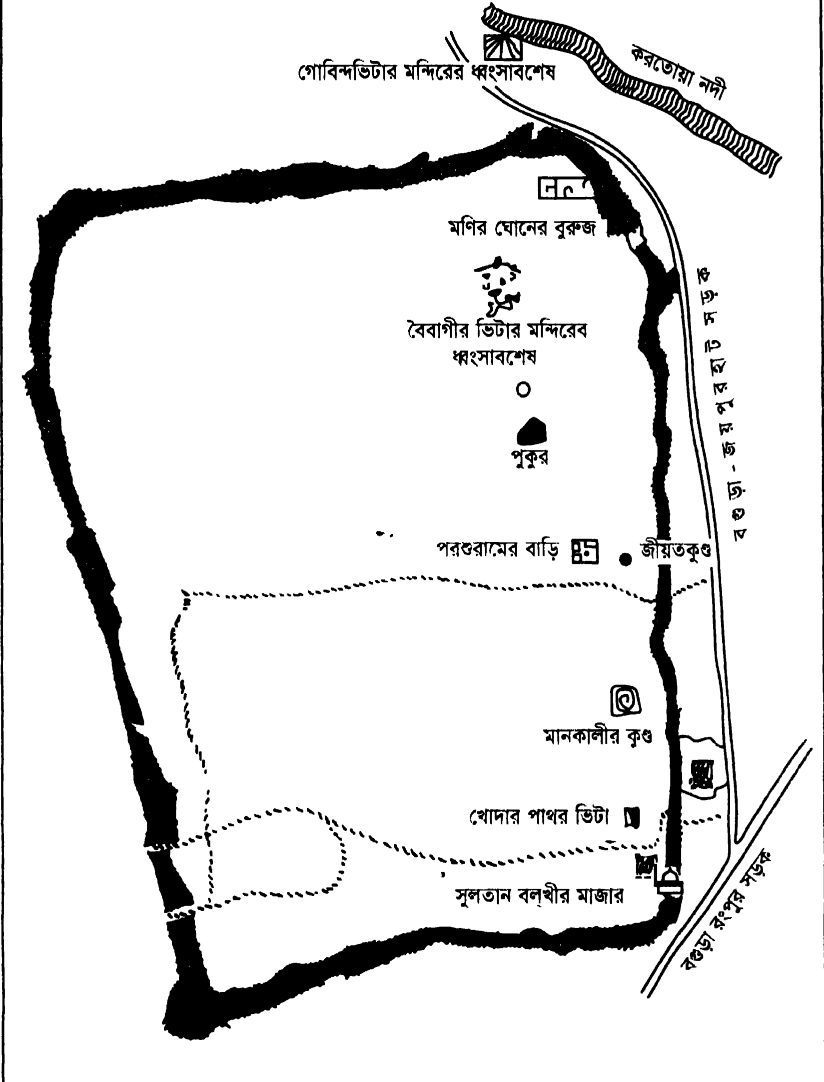
১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে মাযারের উত্তর-পশ্চিম দিকে আংশিক খননের ফলে বহুবার পুনর্নির্মিত অষ্টম শতাব্দীর একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। অপেক্ষাকৃত একটি আধুনিক কালের ইমারতের তলে এ ধ্বংসাবশেষটি পাওয়া যায়। উপরের এই ইমারতটি ছিল খুব সম্ভব উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নির্মিত। নিচের মন্দিরটি নানা করণে এমনভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে যে, এর পরিকল্পনা বোঝা কঠিন। তবে কাদার গাঁথুনি যুক্ত দেয়ালগুলি ছিল ১.৩ থেকে ২.৪ মিটার চওড়া এবং কোনো কোনো স্থানে দেয়ালের উচ্চতা ১.৫ মিটার পর্যন্ত পাওয়া গেছে। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে মাযার থেকে ১৮ মিটার উত্তরে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক কিছু উৎখনন কাজ করার ফলে এখানে ৪টি নির্মাণ যুগের ইমারতের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। উপরের দুই নির্মাণ যুগের ধ্বংসাবশেষ এমনভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে ষে, তা থেকে ইমারতটি সম্পর্কে কোনো ধারণাই করা যায় না। শেষ দুই স্তরের ধ্বংসাবশেষ থেকে ধারণা হয় যে, এখানে একটি বৃহৎ অট্টালিকা ছিল। বড় বড় ৩টি সঞ্চয় পাত্রের মধ্যে মানুষের হাড় ও দেহভস্ম পাওয়া গেছে। এগুলি ছিল খুব সম্ভব আংশিক সমাহিত করার একটি প্রক্রিয়া।

---

১. "In the courtyard there is a battered Jain statue without feet. I recognised it by the position of the arms hanging down close to the sides and reaching below the knees. As the figure is naked there can be no doubt whatever as to its being one of the twenty four Jain pontiffs. It has been deliberately chiselled all over by the Muhammadans. Close by there is the pedestal of a large figure of the Varaha Avatara, of which only the feet remain, trampling on a Naga or Nagini. It is this human bodied Naga ending with a serpent's coils which Mr. O'Donnel decribes as a figure of a girl, with a long fish's tail, half reclining on 'her left side,...Judging from the length of the foot the figure must have been of life size.

"There are two *argahs* of lingams with usual spouts, one circular, of 4 feet and 5 inches diameter, the other oblong, 3 feet 9 inches by 2 ft 4 inches. The lingam of the former was 11 inches in diameter. .

"Here also I found half a man's head in blue stone of life-size, but there is nothing to show the nature of the statue to which it belonged."—ibid, p. 108.



মহাস্থানগড়ের ভূমি পরিকল্পনা
(স্কেল মতো নয়)
গোবিন্দভিটার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ
করতোয়া নদী
মণির ঘোনের বুরুজ
বৈবাগীর ভিটার মন্দিরেব
ধ্বংসাবশেষ
পুকুর
বগুড়া - জয়পুরহাট সড়ক
পরশুরামের বাড়ি
জীয়তকুণ্ড
মানকালীর কুণ্ড
খোদার পাথর ভিটা
সুলতান বল্‌খীর মাজার
বগুড়া রংপুর সড়ক

এ স্থানের উৎখনন কার্য দক্ষিণে খুব বেশি দূরে প্রসারিত করা সম্ভব হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে বলে মনে হয় না। এ যাবত এ স্থানে যে উৎখনন কার্য করা হয়েছে, তাতে ধারণা হয় যে, মাযার ও মসজিদ প্রাচীন কীর্তির একটি বিরাট ধ্বংসস্তূপের উপরে অবস্থিত। মাযার ও মসজিদ যে স্থানে অবস্থিত, তা পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে প্রায় ৮ মিটার উঁচু। এ উঁচু ভূমি যে সাধারণভাবে গঠিত উঁচু ভূমি নয় এবং এগুলির নিচে যে প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আছে, তা সহজেই অনুমেয়। তবে ফকীরের কবরটি যখন এখানে খনন করা হয়, তখন যে এ স্থানে কোন মন্দির ছিল না এবং সমুদয় স্থান ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারেনা। কারণ কোনো দাঁড়িয়ে থাকা বা ভগ্ন মন্দিরে কবর খনন করা সম্ভব নয়। কবরটি যে অবস্থায় দেখা যাচ্ছে, তাতে সহজেই ধারণা করা যায় যে, একটি ঢিবির উপরে প্রথম থেকেই তার অবস্থান ছিল। এ কবর কবেকার সে সম্পর্কে এ স্থানের ইতিহাস প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

খোদার পাথরভিটা

মাযার থেকে উত্তর-পশ্চিমে কিছু উঁচু-নিচু ভূমি অতিক্রম করে প্রায় ২০০ মিটার দূরে গেলে একটি ঢিবি পাওয়া যায়। ঢিবির উপরে এবং চার ধারে অজস্র ইট ও পাথরের টুকরা পড়ে আছে। আর ঢিবির উপরে মাঝামাঝি স্থানে '৯-৪´´ × ২-৪´ × ২-৫´´' আয়তনের একখণ্ড বিরাট গ্রানাইট পাথর। পাথরের পূর্বদিকের সম্মুখভাগে ফুলের নক্সা উৎকীর্ণ আছে। উপরিভাগে দরজার চৌকাঠ স্থাপনের জন্য ১.৮১ মিটার দূরত্বে ২টি গর্ত আছে। এ পাথরের ওজন প্রায় সাড়ে তিন টন হবে বলে স্যার কানিংহ্যাম অনুমান করেন। এটিকে 'খোদার পাথর' বলা হয়ে থাকে এবং এ নাম থেকেই এ ঢিবির নাম হয় 'খোদার পাথর ভিটা'। ১৮৭৯-৮০ খ্রিস্টাব্দে স্যার কানিংহাম হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকদেরকেই জুতা খুলে এ পাথরের সামনে যেতে অর্থাৎ এ পাথরকে ভক্তি করতে দেখেছেন।[১]

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে এখানে যে খনন কার্য করা হয়, তাতে দেখা যায় যে, এ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড নুড়ি পাথরে তৈরি ২.৭২ মিটার লম্বা একটি দেয়ালের উপরিভাগ মাত্র। পাথরের চারদিকে ১.৫১ মিটার গভীর মাটি সরানোর ফলে একটি মন্দিরের পাথরের তৈরি মূল মেঝে আবিষ্কৃত হয়। ব্রিটিশ আমলের বগুড়া জেলার গেজেটিয়ারে এ মন্দির সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা নিম্নরূপ :[২]

"এ মন্দিরের মাপ ৭.২৭ মিটার × ৪.৫৪ মিটার এবং চারদিকে এর ভিত্তিতে .৯ মিটার উঁচু পর্যন্ত পাথরের গাঁথুনী ছিল, অর্থাৎ মেঝে থেকে প্রায় দুই ফুট উঁচু ছিল। পাথরের দেওয়ালের উপর কাদার গাঁথা ইটের দেয়াল ছিল। খুব সম্ভব এর চৌকাঠ এবং দরজার উপরের অলঙ্কৃত অংশও প্রস্তর নির্মিত ছিল (১৫৬ পৃ.)।"

---

১. Ibid, P. 105
২. মহাস্থান, ৩৫ পৃ.—ডক্টর নাজিমুদ্দিন আহমদ।

স্যার কানিংহ্যাম খোদার পাথর-এর কাছে আরও কয়েকটি বিরাট আকারের গ্রানাইট পাথর দেখেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। সেগুলি এখন আর সেখানে নেই। খননের সময় এস্থানে অনেকগুলো খোদাই কৃত পাথরের টুকরা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটির মাপ '২'-৩'' × ৮'' × ৭'' এবং তাতে একই সারিতে তিনটি বুদ্ধ মূর্তি উৎকীর্ণ ছিল। মধ্যস্থলের মূর্তিটি ধ্যান মুদ্রায় ও দু'পাশের দুটি ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় ছিল। প্রত্যেকটি মূর্তিই খিলান কুলঙ্গির (arched niche) মধ্যে সংস্থাপিত। প্রস্তরটির বাম পার্শ্বের প্রান্ত সীমায় এক উপাসক করজোড়ে উপবিষ্ট হয়ে আছে। এই উল্লেখযোগ্য প্ররখণ্ডটি বর্তমানে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির যাদুঘরে রক্ষিত আছে। উপরোক্ত তথ্য থেকে এবং মন্দিরটি পূর্বমুখী হওয়ায় প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, মূলত এখানে একটি বিরাট বৌদ্ধ মন্দির ছিল। কিন্তু কানিংহ্যাম এটাকে হিন্দু মন্দির বলে মনে করেছিলেন (A. S. R. XV, p.105)। তাঁর এ মত খুব সম্ভব সঠিক নয়। কারণ, হিন্দু মন্দির সাধারণত দক্ষিণ বা পশ্চিম মুখী হয়। ভিটার উপরে স্থাপিত প্রস্তরটি সেই মন্দিরেরই দরজার নিম্নস্থ প্রস্তর ছিল।

মানকালীর কুণ্ড

খোদার পাথর ভিটা থেকে প্রায় ২০০ মিটার উত্তর-পূর্বদিকে একটি উঁচু ঢিবি ছিল। ঢিবি সংলগ্ন পশ্চিম দিকের ভূমিতে আছে মজে যাওয়া ছোট আকারের একটি শুষ্ক পুকুর। ঢিবির উচ্চতা হেতু পুকুরটিকে অধিকতর গভীর দেখাত বলে খুব সম্ভব অনেক পরবর্তীকালে এটিকে কুণ্ড বলে অভিহিত করা হয়েছিল এবং সে-নামই এখন টিকে আছে। স্যার কানিংহ্যাম এই কীর্তিটি সম্পর্কে বলেন যে পরশুরামের পূর্বসূরী রাজা মানসিংহ ও তাঁর ভাই তানসিংহ এখানে একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে।[১]

'বগুড়ার ইতিহাস' গ্রন্থে বাবু প্রভাস চন্দ্র সেন এই ঢিবিতে একটি জৈন মূর্তি (বর্তমানে তা রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে) প্রাপ্তির ঘটনাকে অবলম্বন করে জৈন ধর্ম প্রচারক 'গোশালা মানখলি'-র পুত্রের নামে এই ঢিবির নামকরণ হয়েছিল বলে অনুমান করেন। সম্রাট আকবরের সেনাপতি ও সুবাদার মানসিংহের সমসাময়িক ঘোড়াঘাটের মানকলি উপাধিধারী মুসলমান আমিরদের সঙ্গেও এই নামের সম্পর্ক স্থাপনের প্রবণতা দেখা যায়।

মানকলি উপাধিধারী মুসলিম আমিরদের সঙ্গে এই নামের কোনো সম্পর্কের কথা কল্পনাও করা যায় না। রাজা মানসিংহ বা তাঁর ভাই তানসিংহ বলে কোনো ব্যক্তির নাম মোঘল আমলের আগে এদেশে পাওয়া যায় না। আর মোঘল আমলের এই দুই ব্যক্তির

১. "About 600 feet to the north there is another large mound known as Mankali Ka-Kundi. The Kund refers to a deep tank lying at its foot and the builder of the temple is said to have been Raia Mansing, who, with his brother Tan Singh preceeded Parasn rama."—AS. R. Vol. XV, P.106-Cunningham.

সঙ্গে এ স্থানের কোনো সম্পর্ক ছিল বলে কল্পনাও করা যায় না। জৈনধর্ম প্রচারক গোশালা মানখলির কথা সঠিকভাবে কিছুই বলা যায় না।

এতে দেখা যাচ্ছে যে, মানকালী নামকরণ সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলার মতো কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এস্থানে যে-মন্দিরাদি ছিল, সেগুলি যে খুবই প্রাচীন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। স্যার কানিংহ্যাম এখান থেকে অনেকগুলি অলঙ্কৃত ইট (মন্দিরে ব্যবহৃত ছিল বলে অনুমিত), বর্গাকৃতির ১২টি পোড়ামাটির অলঙ্কৃত টুকরা, একটি 'রেলিং'-এর স্তম্ভ ও অন্যান্য প্রত্নবস্তু আবিষ্কার করেছিলেন। লাল নরম ইটের উপর নক্সাকৃত চিত্রগুলি ছিল বিভিন্ন ভঙ্গিতে তিনটি মানুষের মূর্তি, একটি চক্র বা সূর্য, একটি মেষ, একটি ষাঁড়, একটি ব্যাঘ্র, একটি সজ্জিত অশ্ব, একটি তোতা ও একটি অচেনা পাখি, একটি উপবিষ্ট সিংহ ও একটি গোলাকার প্রস্ফুটিত পদ্মফুল। এগুলি ছাড়াও, ব্রোঞ্জ নির্মিত একটি গণেশ ও একটি গরুড় এবং নীলাভ প্রস্তরনির্মিত একটি বেদীও তিনি এখান থেকে উদ্ধার করেন। ভগ্নপ্রাপ্ত বেদীটিতে মধ্যযুগীয় নাগরী অক্ষরে উৎকীর্ণ, 'নাগ্রহার' ('nagrahar') শব্দটি থেকে তিনি অনুমান করেন যে এটি 'অগ্রহার' অর্থে ব্রাহ্মণদের অধিকারভুক্ত ভূমির অংশবিশেষ ছিল।[১]

১৯৬৫-৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এখানে খনন কার্য করে। খনন কার্যের ফলে শুঙ্গ যুগের কয়েকটি চিত্রফলক এবং খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী কি তার আগে প্রচলিত বিখ্যাত এন. বি. পি.-র (Northern Blook Polished Ware) কয়েকটি ভগ্নাংশ পাওয়া যায়।

খননের ফলে এখানে সর্বোচ্চ স্তরে ২৬.২১ মিটার × ১৪.৫৪ মিটার আয়তনের সুলতানী আমলের একটি সুবৃহৎ মসজিদের ধ্বংসাবশেষও অনাবৃত হয়। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা মসজিদের দেয়ালগুলি ছিল ১.২ মিটার থেকে ১.৫১ মিটার পর্যন্ত পুরু। অভ্যন্তরে জ্যামিতিক মাপে নির্মিত ২ সারি স্তম্ভ মসজিদটিকে লম্বালম্বিভাবে ৩ খণ্ডে ও আড়াআড়িভাবে ৫ খণ্ডে বিভক্ত করেছিল। পশ্চিম দেয়ালে অর্ধগোলাকারভাবে নির্মিত ৫টি মিহরাবের মধ্যে কেন্দ্রীয় মিহরাবটি ছিল সর্ববৃহৎ। মিহরাবগুলির বরাবর পূর্ব দেয়ালে ছিল ৫টি প্রবেশপথ। কেন্দ্রীয় মিহরাব নক্সাকৃত ইট দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল।

কেন্দ্রীয় মিহরাবের লাগোয়া উত্তরদিকে ছিল ১.৭৭ মিটার × ১.৫ মিটার আয়তনের উঁচু মিম্বার বা ভাষণ মঞ্চ। এতে উঠবার জন্য সিঁড়ি ছিল। মিম্বারের পাশে চারদিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র বর্গাকৃতির বিচ্ছিন্ন স্থান ছিল। এটি কোনো উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির নামাজ আদায়ের নির্দিষ্ট স্থান বলে কেউ কেউ মনে করেন। এই অভিনব বস্তু ছাড়াও মসজিদের ভিতরে ১.৫ মিটার থেকে .২২ মিটার উঁচু ৩টি বেদীর অস্তিত্ব দেখা যায়। একটি বেদী ছিল মসজিদের কেন্দ্রস্থলে কেন্দ্রীয় মিহরাবের বরাবর পূর্বদিকে। এটি ছিল খুব সম্ভব ইমামের সাহায্যকারী মোক্কাব্বেরের জন্য নির্দিষ্ট স্থান। মসজিদের পশ্চিমভাগে অবস্থিত বাকি দুটি বেদী ছিল খুব সম্ভব নামাজের সময়ের বাইরে মাদ্রাসা

১. "... nagrahar. which would seem to show that the great mound of *Mankali-Ka-Kundi* was part of an ancient *agrahar* or endowment of land' belonging Brahmana.

হিসাবে ব্যবহৃত এ মসজিদে শিক্ষকদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান। মসজিদের পূর্বদেয়ালের লাগোয়া পূর্বদিকে ৭.৫৭ মিটার প্রশস্ত একটি উন্মুক্ত অঙ্গন ছিল; সুলতানী আমলের অন্যান্য মসজিদের মতো সাধারণ ইট ও অলঙ্কৃত ইটের ব্যবহার এ মসজিদে দেখে ধারণা হয় যে, মসজিদটি মোঘল আমলের আগে নির্মিত হয়েছিল।

একটি অতি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর যে এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই মন্দিরটি গুপ্তযুগের পূর্বের ছিল বলে ধারণা হয়।

পরশুরামের বাড়ি ও জীয়ৎকুণ্ড

মানকালীর কুণ্ডের প্রায় ২০০ মিটার উত্তরে, পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ৬০.৬ মিটার × ৩০.৩ মিটার আয়তনের যে ধ্বংসাবশেষটি আছে, জনপ্রবাদ মতে এটিকে মহাস্থানের তথাকথিত শেষ হিন্দু নৃপতি পরশুরামের প্রাসাদ বলে অভিহিত করা হয়। খননের ফলে এখানে ৩টি নির্মাণযুগের প্রত্ন নিদর্শন পাওয়া গেছে।

উপরের স্তরে অর্থাৎ শেষ পর্যায়ে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে নির্মিত একটি বিরাট আবাসবাটীর প্রায় সম্পূর্ণ নক্সা উন্মোচন করা সম্ভব হয়েছে। অন্দর মহলে অবস্থিত ছোট একটি অঙ্গনের দিকে মুখ করে নির্মিত পৃথক পৃথক ৪টি মহল বা অংশের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এ মহলগুলিতে অনেকগুলি কক্ষ, বিভিন্ন প্রবেশপথ, প্রহরী-কক্ষ, সোপান শ্রেণী ও মহলগুলির পূর্ব ও পশ্চিম দিকে বেষ্টনী প্রাচীর ছিল।

মোঘল আমলে ব্যবহৃত ছোট ছোট ইট, পলেস্তরা, গাঁথুনিতে চুন-সুরকির ব্যবহার, সুন্দর চুনকামের কাজ, গঠনকৌশল ইত্যাদি দেখে সহজেই ধারণা করা যায় যে, এ ইমারত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে অথবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নির্মিত হয়েছিল। এখানে কোম্পানীর আমলের (১৮৩৫ ও ১৮৫৩ খ্রিঃ) দুটি মুদ্রা পাওয়াতে ধারণা করা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্যন্ত এ ইমারত বাসযোগ্য অথবা এখানে মানুষের যাতায়াত ছিল। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে খননকার্যের সময় এ ইমারত ভেদ করে দুটি গভীর খাল খনন করার ফলে দেখা যায় যে, এখানে আরও দুই পর্যায়ে নির্মিত ইমারতের ভগ্নাবশেষ আছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্মাণ কার্য সুলতানী আমলে হয়েছিল। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে প্রচলিত চাকচিক্যময় মৃৎপাত্রের (glazed pottery) নীল, সবুজ, বেগুনি ও হলুদ বর্ণের অনেকগুলি টুকরা পাওয়া যায় এ স্তরে। এতে সহজেই ধারণা করা যায় যে, এ যুগের নির্মাণ কার্য হয়েছিল সুলতানী আমলে।

এর নিচে প্রথম পর্যায় অর্থাৎ সর্বনিম্ন স্তরের ধ্বংসাবশেষ। অষ্টম শতাব্দীর পালযুগের পোড়ামাটির চিত্রফলক, প্রস্তর নির্মিত বিষ্ণুপট্টের ভগ্নাংশ ইত্যাদি দেখে ধারণা হয় যে, এই মন্দির জাতীয় ইমারত নির্মিত হয়েছিল খুব সম্ভব অষ্টম শতাব্দীর দিকে।

জীয়ৎ কুণ্ড

উপরে উল্লিখিত ধ্বংসাবশেষের সামান্য দূরে পূর্বদিকে অবস্থিত একটি বিরাট কূপকে 'জীয়ৎ কুণ্ড' বা 'জীবনকূপ' বলা হয়ে থাকে। জনপ্রবাদমতে জানা যায় যে, একূপের

পানির স্পর্শে নাকি মরা দেহে প্রাণ ফিরে আসত। মাহীসাওয়ারের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত স্বপক্ষীয় সৈনিকদের নাকি রাজা পরশুরাম এ কূপের পানির সাহায্যে পুনর্জীবিত করতেন। অবশেষে দরবেশ চিলের সাহায্যে গোমাংস নিক্ষেপ করিয়ে কূপের পানি অপবিত্র করলে নাকি পরশুরামের পরাজয় ঘটে।

কূপের ব্যাস ৩.৭৮ মিটার। কূপের দেয়াল পার্শ্ববর্তী ভূমি থেকে সামান্য উঁচু। কূপটি নিচের দিকে একটু সরু হয়ে গেছে। কূপের এক পাশে (উত্তর পূর্ব) '৬-১০″ × ১-৮″ × ১-৬″' আয়তনের একখণ্ড গ্রানাইট পাথর গাঁথা আছে। পাথরের '২-১' পরিমিত অংশ কূপের ভিতরে প্রসারিত আছে এবং বাকি অংশ কূপের বাইরে। খুব সম্ভব জল উত্তোলনের সুবিধার জন্য কূপ নির্মাণের সময় থেকেই এটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ফুলের প্রতিকৃতি দ্বারা শোভিত এ পাথর গুপ্ত যুগের কোনো মন্দিরের অংশবিশেষ ছিল বলে মনে হয়।

কূপের ভিতরের দেয়ালে দুই সারিতে সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহৃত বেশ কয়েকটি প্রস্তর খণ্ড কিছু দূরে দূরে সংযোজিত আছে। এগুলি কোনো মন্দির থেকে সংগৃহিত বলে ধারণা হয়। এগুলির মধ্যে অন্তত দুটি যে গৌরীপট্ট, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কোনো হিন্দু গৌরীপট্টকে সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করবে, তা কল্পনারও অতীত।

বর্তমানে কূপের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত বালি ও সিমেন্টের পলেস্তরা দেখা যায়। এটি খুব সম্ভব অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের মেরামতের নমুনা। কিন্তু স্থানে স্থানে পলেস্তরা খসে পড়াতে দেখা যায় যে, কূপটি মোঘল আমলের ছোট ছোট ইট দ্বারা নির্মিত এবং এতে চুন-সুরকির সাহায্যে গাঁথুনি করা হয়েছে। এতে অতি সহজেই ধারণা করা যায় যে, পরশুরামের আবাসবাটী বলে কথিত ঢিবিতে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর যে ইমারত ছিল, কূপটি তারই সমসাময়িক, তথাকথিত ও কাল্পনিক পরশুরামের জীয়ৎ কুণ্ড নয়।

বৈরাগীর ভিটা

পরশুরামের প্রাসাদ থেকে প্রায় ৭০০ মিটার উত্তর-পশ্চিমে বৈরাগীর ভিটা নামে একটি বিরাট ঢিবি ছিল। প্রায় '৯০.৯ মিটার × ৭৫.৭৫ মিটার' আয়তনের এ ঢিবি ছিল পার্শ্ববর্তী উঁচু ভূমি থেকে প্রায় ৩.০৩ মিটার উঁচু। খননের ফলে এখানে প্রথম ও শেষ পাল যুগের দুটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে।

পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা প্রথম পালযুগের মন্দিরের আয়তন ছিল ২৯.৭ মিটার × ১২.৭৩ মিটার। এর উত্তর ও পূর্ব দিকের ভিত্তির নমুনা পাওয়া গেছে। দক্ষিণ দিকের ভিত্তি পরবর্তী কালে নির্মিত মন্দিরের নিচে পড়ে গেছে। মন্দিরের কেন্দ্রীয় উপাসনালয় ছিল খুব সম্ভব কেন্দ্রস্থলে। "মন্দিরটির নিকটেই আংশিকভাবে ইট দ্বারা নির্মিত উত্তর-দক্ষিণে ৩৬ ফুট দীর্ঘ একটি কৃষ্ণ প্রস্তরের নালা আবিষ্কৃত হয়। মন্দিরের ভিত্তি হতে মাত্র ৫ ফুট দূরে অবস্থিত একটি মৃত্তিকা নির্মিত শোষক পাত্রের (soak jar) সাহায্যে নর্দমার পানি ও আবর্জনা নিষ্কাশিত হত। মুখ্যত মন্দিরের তর্পণ জল (libation water) নিষ্কাশনের

উদ্দেশ্যে নর্দমাটি নির্মিত হয়েছিল।" এখানে ব্যবহৃত পাথরগুলি খুব সম্ভব গুপ্ত যুগে নির্মিত কোনো ইমারতের ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল।

এ মন্দিরের লাগোয়া দক্ষিণে এবং এ মন্দিরেরই কিছু অংশ সহ এক বিরাট স্থানের উপর দ্বিতীয় মন্দিরটি খুব সম্ভব একাদশ শতাব্দীর দিকে নির্মিত হয়েছিল। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা এ বিশাল মন্দিরে আয়তন ছিল ৩৩.৬৩ মিটার × ১৭.২৭ মিটার। মন্দিরটি এমনিভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে যে, এর সম্পূর্ণ নক্সা বের করা সম্ভব হয়নি। মন্দিরের চারপাশে বিশেষ করে পূর্বদিকে ইট বাঁধান একটি ঢালু মেঝে দেখা যায়। এতে প্রত্যেকটি '৩'-৯" ত ৩'-৬" আয়তনের প্রায় ২৪ টি ছোট ছোট কক্ষ দেখা যায়। এগুলি খুব সম্ভব স্নান বা আচমনের জন্য নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরের অঙ্গনে ইষ্টক নির্মিত ৫টি মনোরম চৌবাচ্চার অস্তিত্ব এ ধারণার পিছনে সমর্থন যোগায়।

বৈরাগীর ভিটা সংলগ্ন উত্তর দিকের ভূমিতে কয়েকটি পুরাকীর্তির সুসংরক্ষিত ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। কয়েকটি কক্ষ, চতুষ্কোণ মেঝেবিশিষ্ট একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এবং তৎসংলগ্ন সারিবদ্ধ কতকগুলি কক্ষ এ সমস্ত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি। এগুলি পাল আমলের শেষ ভাগে নির্মিত দক্ষিণ দিকের বিরাট মন্দিরের চত্বরে অবস্থিত ছিল বলে ধারণা করা হয়।

বৈরাগীর ভিটার উত্তর প্রান্তে ৫৩.৩ মিটার দীর্ঘ ও ০.৯ মিটার প্রশস্ত ইটের তৈরি একটি প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে কয়েকটি ক্ষুদ্র কুঠুরির ১.২১ মিটার × ১.০.৬ মিটার ধ্বংসাবশেষ আছে। এগুলি প্রথম পর্যায়ে নির্মিত মন্দিরের অংশবিশেষ বলে অনুমিত হয়। প্রথম মন্দিরের সময়ের আর একটি ছোট মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে বৈরাগীর ভিটার উত্তর-পশ্চিম কোণে।

বৈরাগীর ভিটাতে গভীরতর স্তরে খনন কার্যের পরে প্রথম পালযুগে নির্মিত মন্দিরের নিচে অন্তত পক্ষে দুটি প্রাচীনতর নির্মাণ যুগের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এ দুটি স্তর থেকে জানা যায় যে, এখানে গুপ্ত ও পরবর্তী গুপ্ত যুগে মন্দিরাদি নির্মিত হয়েছিল।

নতুন আবিষ্কৃত মন্দির

বৈরাগীর ভিটা থেকে প্রায় ২০০ মিটার দক্ষিণ-পূর্বে একটি নতুন ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া গেছে। ১১.৯৭ মিটার × ৯.০৯ মিটার আয়তন বিশিষ্ট এ মন্দিরের সিঁড়িতে যে পাথর ব্যবহার করা হয়েছে, তা পূর্ববর্তী কোনো মন্দির থেকে সংগৃহীত। মন্দির গাত্রের পোড়ামাটির ফলকচিত্রগুলি ঠিক পাহাড়পুরে ব্যবহৃত ফলকের মতো দেখে ধারণা হয় যে, এ মন্দিরটি পাহাড়পুর বিহারের সমসাময়িক বা কিছুকাল পরের। মন্দিরের পর পর দু'বার সংস্কার কাজ করা হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। মূল মন্দিরের গর্ভগৃহের (চার পাশের রাস্তা সহ) মাপ ছিল ৯.৬৯ × ৭.২৭ মিটার।

মঞ্চ

এ মন্দির থেকে প্রায় ৩০ মিটার পূর্বে বর্গাকারে নির্মিত এবং ৮.৭৮ মিটার বাহুও ২.৭২ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট একটি মঞ্চ বা মণ্ডপ খনন করে বের করা হয়েছে। এটি ইট দ্বারা

নিরেটভাবে তৈরি। মঞ্চের চার পাশে ০.৯ মিটার ব্যাস বিশিষ্ট ৫টি পাতকুয়াও আবিষ্কৃত হয়েছে। আনুমানিক খ্রিস্টিয় ৮ম-৯ম শতাব্দীর এ মঞ্চটি কি উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল, তা এখন পর্যন্ত বোঝা যায়নি।

মুনির ঘোন

শিলাদেবীর ঘাটের কাছাকাছি গড়ের পূর্ব দেয়ালের উত্তরাংশে অবস্থিত একটি উঁচু ঢিবি খনন করে একটি বুরুজ (bastion) অনাবৃত করা হয়েছে। দেয়ালের দুই প্রান্তে আছে ০.৬ মিটার ইটের গাঁথুনি এবং মধ্যভাগ ইটের টুকরা ও কাদার সাহায্যে ভরাট করা। অনেক পরবর্তী কালে নির্মিত এ বুরুজ খুব সম্ভব নদীপথে আক্রমণকারীদের প্রতি দৃষ্টি রাখার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত। স্থানীয় জনপ্রবাদ মতে এ স্থানের নাম মুনির ঘোন। উত্তর-পূর্ব কোণের ধ্বংসাবশেষ গড়ের উত্তর-পূর্ব কোণের দেয়াল থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ দিকে প্রায় ৩০০ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই এলাকায় নানা ধরনের ও বিভিন্ন যুগে নির্মিত অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এগুলি এমনভাবে বিধ্বস্ত যে, তাদের স্বরূপ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। তবে নমুনা দেখে ধারণা হয় যে, এখানে বিভিন্ন যুগে নির্মিত আবাস গৃহাদি ছিল। এখানে উপরের স্তরে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর সুলতানি আমলের চাকচিক্যময় মৃৎপাত্রর টুকরা পাওয়া গেছে, কিন্তু সে যুগের কোনো ইমারতের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়নি। উপরের স্তরে পাওয়া গেছে পরবর্তী পাল যুগের স্থাপত্য নিদর্শন। ঐগুলি নির্মাণের সময় অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল বলে ধারণা হয়। গুপ্ত আমলের স্থাপত্য নিদর্শনও এখানে দেখা যায়। একটি গভীর খাত খনন করার পরে আনুমানিক খ্রি. পূ. তৃতীয় শতাব্দীর মৌর্য যুগের একটি প্রায় অবিকৃত মেঝে পাওয়া যায়। ধারে কাছে আরও ৩টি গভীর খাত খনন করার ফলে "পর্যায়ক্রমিক সভ্যতার ১৮টি বসতি স্তর (cultural layer) কাটার পর কোনো কোনোটিতে '৩০ ফুট বা ৩১ ফুট' নিচে অক্ষত আসল মাটির (virgin soil) সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছিল।"

প্রত্নবস্তু

মহাস্থানে খননের ফলে যে সমস্ত প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বস্তুগুলি হচ্ছে, পোড়ামাটির ফলকচিত্র, অলঙ্কৃত ইট, পাথরের তৈরি নানা দ্রব্য, স্বল্প মূল্যের পাথরের গুটিকা (beads and buttons of semi-precious stones) ও বোতাম, লোহা, তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরি বিভিন্ন দ্রব্য, পোড়ামাটির বল, ক্ষেপণীয় গোলক (missiles), অলঙ্কার, কড়ি এবং ছাঁচে ঢালা ও ছাপযুক্ত গোলাকার ও চতুষ্কোণ মুদ্রা (punch marked and cast coin)। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ থেকে দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে প্রচলিত এসব মুদ্রাপাপ্তি এ স্থানের প্রাচীনতার সাক্ষ্য বহন করে। অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে গুপ্ত যুগের লিপি উৎকীর্ণ একটি গোলাকার সীল ও মুকুট পরিহিতা একটি রমণীর মস্তক দেশের মূর্তি পাওয়া গেছে। শুঙ্গ যুগের বেশ কিছু পোড়ামাটির চিত্র ফলকও এখানে পাওয়া গেছে।

বেলে পাথরের একটি ছোট গণেশ মূর্তি, কাল পাথরে তৈরি একটি ভগ্ন নরসিংহ মূর্তি, বেলে পাথরে তৈরি একটি দণ্ডায়মান বুদ্ধ (?) মূর্তি, কাল-পাথরের তৈরি বিষ্ণুপট্টের ভগ্নাংশ, নীলাভ পাথরের তৈরি গোলাকার একটি মূর্তির অংশবিশেষ, পাথরে তৈরি স্বর্ণকারের ছাঁচ, কালপাথরে তৈরি নন্দীমূর্তি ইত্যাদি ইত্যাদি পাথরের দ্রব্য এখানে পাওয়া গেছে। ধাতব দ্রব্যের মধ্যে তামার বালা, আংটি, সুরমা দণ্ড, পদক, লোহার তৈরি বর্শাফলক, তীর, ছুরি, চাকু, পেরেক, অষ্টধাতুর বলয় এবং একটি সোনার কবজ এখানে পাওয়া গেছে।

অসংখ্য মৃৎপাত্র ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ পাওয়া গেছে এখানে। এগুলির মধ্যে সুবিখ্যাত এন. বি. পি. (N. B. P. = Northern Block Polished Ware) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর পরে যে সমস্ত মৃৎপাত্রের নাম করতে হয়, সেগুলি হচ্ছে প্রথম থেকে চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত প্রতিকৃতির নক্সার ছাপ দিয়ে নির্মিত ধূসর ও লাল বর্ণের অতি সুন্দর মৃৎপাত্র। তা ছাড়াও পাওয়া গেছে নানা ধরনের আরও অসংখ্য সাধারণ মৃৎপাত্র ও সেগুলির ভগ্নাংশ।

উত্তর দিকের দুর্গ প্রাচীর

উত্তর প্রাচীরের পূর্বাংশে একটি বিরাট আয়তনের উঁচু বুরুজ আকারের ঢিবি ছিল। ১৯৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দে খননের ফলে এখানে চারটি নির্মাণ যুগের প্রমাণ পাওয়া যায়। উপরের স্তরের ধ্বংসাবশেষ দেখে ধারণা করা হয় যে, খুব সম্ভব পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে সুলতানী আমলে নির্মিত বুরুজের ধ্বংসাবশেষ হল এটি। অর্ধ গোলাকার বুরুজ ও পরবর্তী যুগের অন্যান্য ধ্বংসাবিশেষের তলদেশে আবিষ্কৃত ২২.৪২ মিটার দীর্ঘ ৫.৩ মিটার প্রশস্ত দুটি সমান্তরাল ইষ্টক প্রাচীর গুপ্ত যুগে নির্মিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতদের অভিমত। গুপ্ত যুগের পরে ছিল খুব সম্ভব নবম-দশম শতাব্দীর পালদের কীর্তি। পালদের পরে খুব সম্ভব দ্বাদশ শতাব্দীতে সেন যুগেও এখানে নির্মাণকার্য চলে। এখানে মাটির গভীরে স্তরীভূত যে সমস্ত সাংস্কৃতিক নিদর্শন পাওয়া গেছে, তাতে ধারণা করা হয় যে শুঙ্গ যুগের আগেই মহাস্থানে বসতি স্থাপিত হয়েছিল।

গোবিন্দভিটা

মহাস্থান গড়ের উত্তর প্রাচীর থেকে প্রায় ২০০ মিটার উত্তরে বর্তমানে মৃতপ্রায় করতোয়া নদীর দক্ষিণ বাঁকে অবস্থিত গোবিন্দভিটা নামক যে বিরাট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, তাকে 'করতোয়া মাহাত্ম্য' নামক গ্রন্থে পবিত্র নগরীর উত্তর সীমা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সমগ্র ধ্বংসস্তূপ (আবিষ্কৃত ও অনাবিষ্কৃত) দেখে ধারণা হয় যে, এখানে অসংখ্য ইমারতাদি ছিল এবং সেগুলি ছিল বিরাট আকারের। বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের যে রেস্ট হাউস (Rest house) আছে, তার নিচে এবং সংলগ্ন উদ্যানের নিচেও নাকি প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আছে। উৎখননের ফলে যে সমস্ত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে এখানে গোবিন্দ অর্থাৎ বিষ্ণু মন্দির থাকার কোনো প্রত্ন নিদর্শন পাওয়া যায়নি।

খননের ফলে দেখা যায় যে গোবিন্দ ভিটার পুরাকীর্তিকে পশ্চিম ও পূর্ব এই দুই ভাগে মোটামুটিভাবে ভাগ করা যায়। [গোবিন্দ ভিটার রঙিন ছবি-৭]

পশ্চিম দিকের মন্দির

ষষ্ঠ শতাব্দীর পরবর্তী গুপ্তযুগ থেকে সুলতানী আমল পর্যন্ত চার পর্যায়ে নির্মিত ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষ এখানে পাওয়া গেছে। নবম শতাব্দীতে নির্মিত পশ্চিম দিকের বেষ্টনী প্রাচীর ৩৪.৫৪ মিটার লম্বা ও ১.৮ মিটার প্রশস্ত। স্থানে স্থানে প্রায় অটুট অবস্থায় প্রাপ্ত এ প্রাচীর ২.৪২ মিটার থেকে ৩.৩৩ মিটার উঁচু। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়াল পশ্চিম দেয়াল থেকে বের হয়ে ২৪.২৪ মিটার পূর্বদিক যাওয়ার পর নিশ্চিত হয়ে গেছে। "প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে পশ্চিমদিকে প্রথম নির্মাণকালের যে নিদর্শন পাওয়া যায়, তা খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দে নির্মিত। ১৬টি উদগত (offset) যুক্ত এর ভিত্তি পশ্চিমের বহিঃপ্রাচীর থেকেও ৩.৩ মিটার গভীরে প্রবেশ করেছে। প্রাচীরটির গঠন শৈলীর সঙ্গে পাহাড়পুরের প্রধান মন্দিরের ভিত্তি দেয়ালের বেশ সাদৃশ্য আছে। মন্দিরটির পশ্চিম বাহু বহিঃপ্রাচীরের সমান্তরালে ২ মিটার দূরে অবস্থিত। এর মধ্যস্থলে ১.৫১ মিটার চওড়া ও ৯.০৯ মিটার লম্বা একটি বারান্দার ভগ্নাবশিষ্ট বিদ্যমান। বারান্দাটি পরিত্যক্ত হওয়ার পর বেষ্টনী-প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। সুতরাং ধরা যেতে পারে যে, বেষ্টনী-প্রাচীর ও এখানকার দ্বিতীয় পর্যায়ের স্থাপত্য নিদর্শন প্রথম পালযুগে (৮ম-৯ম শতাব্দে) নির্মিত হয়েছিল। দ্বিতীয় নির্মাণযুগে পূর্বোক্ত বারান্দার একই স্থানে একই মাপের আর একটি বারান্দা তৈরি করা হয়েছিল। তবে তার পশ্চিম সীমানা ১.২১ মিটার সঙ্কুচিত করে বেষ্টনী-প্রাচীর নির্মিত হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ের দালানের ভিত্তিমূলকে কয়েক ফুট উঁচু করে মধ্যস্থলে বহুতল বিশিষ্ট এক সুউচ্চ ইমারত তৈরি করা হয়েছিল। উপর তলের মধ্যবর্তী দেওয়ালগুলোর বর্হিভাগকে কতকগুলো সমান্তরাল দেওয়ালের সঙ্গে ছোট ছোট আড়াআড়ি দেওয়াল দিয়ে এমনভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে যে, বহির্ভাগের ভিত্তি দেওয়ালে ছোট ছোট কুঠুরীর সৃষ্টি হয়েছে। একই পদ্ধতিতে কেন্দ্রস্থলে নিরেট ইটের তৈরি একটি বেদীর তিন পার্শ্বে পাঁচটি কুঠুরী নির্মিত হয়েছে। বেদীটির পূর্বদিকে কোন কক্ষ নেই। খুব সম্ভব বেদীটি উপরের সুউচ্চ গাঁথুনি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। উপরোক্ত কুঠুরীর তিনটির মধ্যে পাতকূপ দেখা যায়।

"পশ্চিম দিকের ইমারতের বহুতলবিশিষ্ট উপরিভাগ খুব সম্ভব মুসলমান বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত ব্যবহৃত হত।"[১]

পূর্বদিকের মন্দির

চারটি নির্মাণ যুগের নিদর্শন বহনকারী এস্থানে প্রথম নির্মাণ যুগের যে ধ্বংসাবশেষটি পাওয়া গেছে, তা খুব সম্ভব পরবর্তী গুপ্তদের সময়ে নির্মিত হয়েছিল। বর্গাকারে নির্মিত ও ১.৩ মিটার বাহুবিশিষ্ট এ মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে ২ মিটার × ১.৯০ মিটার আয়তনের

১. মহাস্থান, ২৫, ২৬ পৃ.—ডক্টর নাজিমুদ্দীন আহম্মদ।

একটি বেদী ও বেদীর চারপাশে ১ থেকে ১.২ মিটার প্রশস্ত প্রদক্ষিণ পথ ছিল। বর্তমান ধ্বংসাবশেষের ২ মিটার নিচে এ ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। এর পরে আরও ২পর্যায়ে এখানে নির্মাণ কাজ হয়েছিল। তৃতীয় পর্যায়ের যে ধ্বংসাবশেষটি বর্তমানে উপরিভাগে দেখা যায়, তা খুব সম্ভব পশ্চিম দিকের বহুতলবিশিষ্ট মন্দিরের (পূর্বে বর্ণিত) সমসাময়িক। চতুর্থ পর্যায়ের নির্মাণকার্য খুব সম্ভব মুসলমান আমলে হয়েছিল। সে সময়ের একটি মেঝে পাওয়া গেছে। মেঝের উপরে প্রাপ্ত একটি মৃৎপাত্রে সুলতান শামস-উদ্-দীন ইলিয়াস শাহর আমল থেকে (১৩৫৭ খ্রিঃ) সুলতান শামস্-উদ্দীন ইউসুফ শাহ্র আমল (১৪৮০ খ্রিঃ) পর্যন্ত কয়েকজন সুলতানের ১৮ টি মুদ্রা পাওয়া গেছে।

করতোয়ার গ্রাস থেকে মন্দিরটিকে রক্ষা করার প্রয়াসে এ মন্দির বা মন্দির গুলির পূর্ব-উত্তর দিকে বেশ কয়েকটি পাথরের তৈরি বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্বে এখানে ৪৫.৪৫ মিটার লম্বা একটি বাঁধ ও পূর্বদিকে প্রস্তর নির্মিত একটি ঘাট আবিষ্কৃত হয়েছিল। ১৯২২ সালের করতোয়ার মারাত্মক প্লাবনে এগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পরে খনন করে নদীর দিকে কতগুলি জটিল ধরনের প্রাচীর বের করা হয়।

এখানে গভীর খনন কার্য করার ফলে দেখা যায় যে, খ্রি. পূ. ৪র্থ শতাব্দীর পূর্বেও এখানে জনবসতি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সে সময়ের কোনো উল্লেখযোগ্য ইমারতের নিদর্শন সেখানে পাওয়া যায়নি। উপরে থেকে প্রায় ৭.৫৭ মিটার নিচে অক্ষত আসল মাটি (virgin soil) পাওয়া গেছে এবং সেখানে ১৭ টি সভ্যতা-স্তর পাওয়া গেছে। এখানে ছাঁচে ঢালা ও ছাপাযুক্ত তাম্র মুদ্রা ও বিখ্যাত এন. বি. পি (N. B. P) পাত্রের টুকরা পাওয়া গেছে। আর পাওয়া গেছে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান ও স্বল্পমূল্যবান পাথরের গুটিকা ও বোতাম (beads and buttons of semi-precious stones), কানবালা, লম্বমান কুণ্ডল, নাকফুল, পোড়ামাটির মূর্তি ও খেলনা, তাম্র ও ব্রোঞ্জ নির্মিত সুরমাদণ্ড, বলয় ইত্যাদি ইত্যাদি। দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মিত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কয়েকটি ভগ্নপ্রাপ্ত দেয়াল ও একটি মেঝে পাওয়া গেছে। মেঝের উপর ৩টি বৃহৎ মৃৎপাত্রের মধ্যে একটিতে একটি নরকঙ্কাল পাওয়া গেছে। বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আংশিক সমাহিত করণের নিদর্শন বলে এটিকে ধরা হয়।

এখানে প্রাপ্ত অন্যান্য প্রত্নবস্তুর মধ্যে পোড়ামাটির গোলাকার সিল একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রত্নবস্তু। মনোরম ছাঁচে গড়া মুকুট পরিহিতা একটি নারীর মস্তক, শুঙ্গ যুগের প্রায় ৬টি চিত্রফলক, নীলাভ পাথরে উৎকীর্ণ একটি অপূর্ব প্রসাধন থালাও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

শিলাদেবীর ঘাট

এ ঘাট নিয়ে যে চিত্তাকর্ষক গল্পটি আছে তা নিম্নরূপ : শাহ্ সুলতান মাহী সাওয়ার রাজা পরশুরামকে সসৈন্যে পরাজিত ও নিহত করে রাজভগ্নী (মতান্তরে রাজকন্যা) শীলাদেবীর পাণি গ্রহণে অভিলাষী হলে শীলাদেবী দরবেশের কাছে আত্মসমর্পণের

অভিনয় করে দরবেশকে ছুরিকাঘাতে নিহত করে আলোচ্য ঘাটে করতোয়া নদীতে ডুবে প্রাণ বিসর্জন করেন। মতান্তরে রাজা পরাজিত হলে দরবেশের হাত থেকে রক্ষা পাবার নিমিত্তে শীলাদেবী এ ঘাটে ডুবে প্রাণ ত্যাগ করেন এবং এই অসাধারণ আত্মত্যাগের জন্য মানবী হয়েও পরবর্তী কালে দেবী রূপে পূজা লাভের সৌভাগ্য তিনি অর্জন করেন।

গড়ের পূর্ব দেয়াল থেকে প্রায় ২০০ মিটার পূর্বে ও বৈরাগীর ভিটার বিপরীত দিকে শিলাদেবীর ঘাট অবস্থিত। স্যার কানিংহ্যাম এ ঘাট সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা বিভ্রান্তিকর। তিনি খুব সম্ভব মিঃ ও, ডোনেলের অনুসরণে গোবিন্দভিটার পূর্বদিকের মন্দিরের পূর্ব দিকে প্রস্তরনির্মিত প্রাচীর ও ঘাটের স্থান নির্ণয় করেছেন। তিনি বলেন যে সেই ঘাটে ৭.৫৭ মিটার থেকে ৯.০৯ মিটার দীর্ঘ প্রস্তরনির্মিত প্রাচীর ছিল। সেখানকার একটি অলঙ্কৃত পাথর পূর্বে মন্দিরে ব্যবহৃত ছিল বলে তিনি অনুমান করেন। তাঁর মতে সিলবারিস থেকে শিলাদেবী নামের উৎপত্তি।[১]

শিলাদেবীর ঘাট যে বৈরাগীর ভিটার পূর্বদিকে করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত সে কথা প্রথমেই বলা হয়েছে। 'করতোয়া মাহাত্ম্য' নামক গ্রন্থের কোনো কোনো শ্লোকে 'পুণ্ড্রে কোটি শিলাদ্বীপ'-এর উল্লেখ দেখা যায়। তাতে মনে হয় শিলাদ্বীপ থেকে শিলা দেবী এবং শিলাদেবী থেকে শিলাদেবীর ঘাট-এর উৎপত্তি হয়েছে।

মহাস্থান দুর্গনগরীর মধ্যে যে অসংখ্য অট্টালিকা নির্মিত হয়েছিল, সে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এসমস্ত ইমারতে ব্যবহৃত পাথরের সংখ্যা ছিল অসংখ্য। এসব পাথর এখানকার নয়, সবই বাইরে থেকে আনা। জলপথ ছাড়া এসব পাথর আনার আর কোনো উপায় সেকালে ছিল না। পাথরগুলি জলপথে এনে যেখানে জড়ো করা হত, সে স্থানটি খুব সম্ভব পরবর্তীকালে শিলাদ্বীপ নামে অভিহিত হয়। এই শিলাদ্বীপ থেকেই খুব সম্ভব শিলাদেবী এবং শিলাদেবীর ঘাট নামের উৎপত্তি।

পুকুরে প্রাপ্ত শিলালিপি

মানকালী কুণ্ডের সোজা পূর্বদিকে পূর্ব দেয়ালের বাইরে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে আংশিক খননের ফলে সংস্কৃত ভাষায় লিপিকৃত একটি শিলাখণ্ড লিপি পাওয়া যায়। লিপির তারিখ ও মূল বিষয় বস্তু পাওয়া যায়নি। তবে নন্দী বংশের কয়েকজন বর্তমান 'গোকুল' গ্রাম 'গোপগৃহ' নামক স্থানে বসবাস করতেন বলে উল্লেখ আছে। বর্তমান 'গোকুল' গ্রাম 'গোপগৃহ' হতে পারে বলে ধারণা করা হয়।

ইতিহাস

এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত বাঙলার প্রাচীন নগরগুলির মধ্যে মহাস্থান হচ্ছে প্রাচীনতম। প্রাচীনকালে এ স্থানের নাম ছিল পুণ্ড্রবর্ধন বা পুণ্ড্রনগর। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে আংশিক খননের

---

১. "At the ghat there is a 'stone wall' from 25 to 30 feet in lengah, with one large carved stone inserted, which no doubt once formed part of a Hindu temple, The name of Sila Debi is most probably connected with the name of the district silbaris, in which Mahasthan is situated."—*Archaeological Survey of India, Report*, Vol. XV. p. 103, by Sir Alexander Cunningham.

ফলে এস্থানে ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ ছয় পঙক্তির একটি শিলাখণ্ড লিপি পাওয়া যায় (ব্রাহ্মী লিপি ... ক্রমিক নং)। এই লিপির পাঠ থেকে জানা যায় যে, রাজ্যে দুর্ভিক্ষ বা সেই জাতীয় কোনো বিপদ ঘটেছিল বলে সম্রাট 'পুন্দনগলের (পুণ্ড্রনগরের) 'মহামাত্রকে' নির্দেশ দিয়েছিলেন, প্রজাদেরকে রাজভাণ্ডার থেকে "ধান্য এবং গণ্ডক ও কাকনিক মুদ্রা দিয়ে সাহায্য করিবার জন্য, কিন্তু সুদিন ফিরিয়া আসিলে ধান্য ও মুদ্রা উভয়ই রাজ ভান্ডারে প্রত্যার্পণ করিতে হইবে" (বাঙালির ইতিহাস, ৪৪২ পৃ., ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়)। লিপি প্রদানকারী ব্যক্তিটি সম্রাট আশোক ছিলেন বলে পণ্ডিতদের অভিমত।

এতে দেখা যাচ্ছে যে, সে সময়ে পুণ্ড্রবর্ধনে একটি প্রশাসন কেন্দ্র ছিল এবং সেখানে একটি নগরীও ছিল। মহাস্থানে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্নবস্তু বিশেষ করে ছাঁচে ঢালা ও ছাপযুক্ত মুদ্রা, এন. বি. পি. ইত্যাদি কালনির্দেশক প্রত্নবস্তুগুলিও এ স্থানে মৌর্যদের সময়ে একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদের অস্তিত্বের কথা প্রমাণ করে। এখানে গভীর খননের ফলে পর্যায় ক্রমে যে ১৭টি স্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে, তাতেও মনে হয় যে, আনুমানিক খ্রি. পূ. ৪০০ বছর আগে এখানে একটি জনপদের অস্তিত্ব ছিল।

মৌর্যদের পরে বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে পুণ্ড্রবর্ধনের কোনো সরাসরি ইতিহাস পাওয়া যায় না। এ সময়কার গোটা বাঙলার ইতিহাসও অন্ধকারাচ্ছন্ন। শুঙ্গ যুগের ভাস্কর্য শিল্পের বেশ কিছু নিদর্শন পুণ্ড্রবধনে পাওয়া গেছে। কিন্তু এগুলি ছাড়া পুণ্ড্রবর্ধন তথা বাঙলায় শুঙ্গদের রাজত্ব করার কোনো সরাসরি নিদর্শন পাওয়া যায়নি।

এর পরে দেখা যায় যে, খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দে গুপ্ত রাজবংশ বাঙলায় রাজত্ব করেছিল। খ্রিস্টীয় ষষ্ট শতাব্দী পর্যন্ত গুপ্তদের সময়ের অনেক প্রত্নবস্তু মহাস্থানে পাওয়া গেছে। গুপ্তদের তাম্রশাসনে দেখা যায় যে, তখন পুণ্ড্রবর্ধন নামে একটি ভুক্তির ছিল এবং সেই ভুক্তির প্রশাসন কেন্দ্রও ছিল পুণ্ড্রবর্ধনে। এটি ছিল একটি বিরাট ভুক্তি।

পালদের সময়েও পুণ্ড্রনগরের প্রাধান্য বজায় ছিল। এখানে পালদের সময়ের অসংখ্য মন্দির, স্তূপ ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। প্রকৃতপক্ষে এখানকার বেশির ভাগ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষই পাল আমলের কীর্তি বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। দ্বাদশ শতাব্দীর অর্থাৎ সেনযুগের কিছু মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ এবং কিছু ভাস্কর্যের নমুনাও এখানে পাওয়া গেছে। এতে দেখা যাচ্ছে যে, ১২০৪ কি ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী কর্তৃক গৌড় রাজ্য (উত্তর বঙ্গ) অধিকারের আগ পর্যন্ত মহাস্থানগড়ে পর পর বৌদ্ধ-হিন্দু-বৌদ্ধ-হিন্দু সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল প্রায় ১৬০০ বছর ধরে। এর পরে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে খুব সম্ভব এ স্থান মুসলিমদের অধিকারে আসে।

কিন্তু সে কথা বলার আগে সুলভান মাহী সাওয়ারের যে কাহিনী প্রবল জনপ্রবাদের উপর ভিত্তি করে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে, সেটি বলা আবশ্যক। কাহিনীটি নিম্নরূপ :

একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পরশুরাম নামক এক হিন্দু নৃপতি ছিলেন মহাস্থানের অধিপতি। মাছের পিঠে, মতান্তরে মাছের আকারে নির্মিত এক নৌকায় চড়ে এলেন এক মুসলিম ফকীর। তাঁর নাম 'মীর সৈয়দ মোহাম্মদ মাহী সাওয়ার' ওরফে সুলতান মাহী সাওয়ার বলখী। তিনি নামাজ পড়ার জন্য চর্মনির্মিত জায়নামাজ রাখার জন্য সামান্য একটু স্থান রাজার কাছ থেকে চেয়ে নিলেন। কিন্তু জায়নামাজ বিছান

মাত্রই তার চামড়া বাড়তে লাগল এবং তা বাড়তে বাড়তে রাজার রাজধানী পর্যন্ত ছেয়ে ফেলল। অবস্থা বেগতিক দেখে রাজা ফকীরকে মারার জন্য সৈন্য প্রেরণ করলেন। রাজার অগণিত ফৌজ ফকীরের হাতে মারা পড়তে লাগল। রাজা 'জীয়ৎ কুণ্ডের' (জীয়ৎ কুণ্ড দ্র.) পানি ছিটিয়ে তাদেরকে পুনর্জীবিত করে আবার যুদ্ধে পাঠাতে লাগলেন। রাজার ঝাড়ুদার হরপাল এ গোপন তথ্য ফকীরকে জানিয়ে দিলে ফকীর ব্রাহ্মণ-চিলের সাহায্যে এক খণ্ড গোমাংস কূপের মধ্যে ফেলে দিলে জীয়ৎ কুণ্ডের সঞ্জীবনী শক্তি চলে গেল। এবার রাজা সসৈন্যে ফকীরের হাতে নিহত হলেন।

রাজার কন্যা (মতান্তরে ভগ্নী) শীলাদেবী সম্পর্কে যে জনপ্রবাদ আছে তা শীলাদেবীর ঘাটের (শীলাদেবীর ঘাট দ্র.) বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে। বগুড়ার ইতিহাস রচয়িতা শ্রীপ্রভাস চন্দ্র সেনের মতে এ ঘটনা ঘটে ১০৪৩ খ্রিস্টাব্দে এবং তাঁর মতে মাহী সাওয়ার ও ময়মনসিংহ জেলার মদনপুরের পীর শাহ সুলতান রুমী অভিন্ন (মদনপুর দ্র.)। প্রভাস বাবু রাজা পরশুরাম ও মাহী সাওয়ার সম্পর্কে যা বলে গেছেন, তা সংশয়পূর্ণ হলেও অনেকে তা মেনে নিয়েছেন। জনপ্রবাদও এ মতের স্বপক্ষে। কিন্তু পরবর্তী কালে প্রভাস বাবু নিজেই এমত সংশোধন করে বলেছেন যে, এ ঘটনা ঘটে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে অর্থাৎ ঢাকার মোঘল সুবাদার শায়েস্তা খানের আমলে।[১]

মোহাম্মদ বখতিয়ারের লখনৌতি রাজ্য বিজয়ের ১৬০ বছর আগে কোনো মুসলিম শক্তি বাঙলা জয় করেছিল, একাহিনী শুধু অবিশ্বাস্য নয়, হাস্যকরও বটে। মোহাম্মদ বখতিয়ারের বিজয়ের পূর্বে কোনো মুসলমান পীর-ফকীর এদেশে এসেছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। এসে থাকলেও পুণ্ড্রনগরের রাজাকে সসৈন্যে নিহত করে সে রাজ্য অধিকার করে ছিলেন, এত বড় একটা ঘটনা অজানা থাকবে, তা বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপারই বটে!

১০৪৩ খ্রীস্টাব্দে নয়াপালের রাজত্ব কাল। এর পরে মহারাজা তৃতীয় বিগ্রহ পালের রাজত্ব কাল (১০৫৫-৭৭ খ্রিঃ)। সে সময়ে পুণ্ড্রবর্ধন তাঁদের রাজ্যসীমার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁরা কোনো মুসলিমের কাছে পরাজিত, নিহত বা রাজ্যহারা হয়েছিলেন, এমন কোনো প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। পরশুরাম বলে কোনো রাজার নাম বাঙলার ইতিহাসে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। একাদশ শতাব্দীর আগেও এ নামের কোনো রাজা এদেশে রাজত্ব করেননি, পরেও না। কেউ কেউ বলেন তিনি ছিলেন একজন সামন্ত নৃপতি। সেজন্য ইতিহাসে তাঁর নাম পাওয়া যায় না। তাই যদি হয় তবে তাঁর এ শোচনীয় পরাজয়ের পরে তাঁর মূল রাজা কি রাজ্যের এক বিরাট অংশ একজন মুসলমান ফকীরের হাতে ছেড়ে দিয়ে নীরবে বসেছিলেন? এসব যে আষাঢ়ে গল্প, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ফকীরের মাযারটির দিকে একবার তাকালেই এ কাহিনীর অসারতা ভাল করে চোখে পড়ে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতরের খননের রিপোর্টে দেখা যায় যে, মাযার সংলগ্ন ভূমির নিচে কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। এ সমস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির পাল আমলের বলে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অভিমত।[২] উপরের স্তরের মন্দিরগুলি অত্যন্ত বিধ্বস্ত

১. Mahasthan and its environs, p. 21.—P.C. Sen.
২. মহাস্থান ৪, ৩৪ পৃ.—ডক্টর নাজিমুদ্দিন।

অবস্থায় থাকায়, এগুলির সময়কাল সম্পর্কে কিছুই বলা যায়নি। তবে মাযারে যে কৃষ্ণ পাথরের বিরাট গৌরীপট্ট ও শিবলিঙ্গ ছিল,[১] তাতে ধারণা হয় যে, সেন আমলে এখানে একটি শিবমন্দির ছিল।

কোনো দণ্ডায়মান মন্দিরে যে শাহ্ বলখীকে কবর দেওয়া হয়নি, হতে পারেনা তা মেনে নিতেই হবে। সে ক্ষেত্রে যেখানে তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল, সে স্থানটি একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হলেও মন্দিরটি মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল বলে মেনে নিতে হবে। পাল-সেন যুগের একটি মন্দির যে ১০৪৩ খ্রিস্টাব্দে ধ্বংস হয়ে গিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে কবর করার যোগ্য ভূমিতে রূপান্তরিত হতে পারে না, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। সে সব মন্দির এরকম অবস্থায় আসতে আরও কয়েকশ' বছর সময় নিয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে মাহী সাওয়ারের সমাধি অনেক পরবর্তী কালে অর্থাৎ সুলতানী আমলের শেষ দিকে হয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে।

তাঁর সম্পর্কে যে মুখরোচক গল্পটি আছে, তা যে একটি আষাঢ়ে গল্প, তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারেনা।

খুব সম্ভব মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর সময়েই মহাস্থান মুসলিম অধিকারে এসেছিল। মহারাজা লক্ষ্মণ সেন বিক্রমপুরে পালিয়ে গেলে উত্তর বঙ্গে এমন কোনো হিন্দু রাজা ছিলেন না, যিনি তুর্কীদের বিরুদ্ধে লড়তে পারতেন। অবশ্য সে সময়ের কোনো ইতিহাসও মহাস্থান সম্পর্কে নেই। মহাস্থানে মুসলিমদের অবস্থান সম্পর্কে একটি শিলালিপি ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে উদ্ধার করেছেন বাবু নগেন্দ্র নাথ বসু। অত্যন্ত আনাড়ি হস্তে ৭০০ হিজরীতে (১৩০০ খ্রিঃ) উৎকীর্ণ এই আরবী শিলালিপিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যা আছে, তার বাঙলা অনুবাদ নিম্নরূপ :

(১) এ সমাধি নির্মিত হয়েছে (২) মহান ও শ্রদ্ধেয় খান নামোয়ার (?) খানের জন্য (৩) ৭০০ হিজরীতে শাওয়াল মাসে।

এতে ধারণা হয় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মহাস্থানে মুসলমানের বসতি গড়ে উঠেছিল। এস্থানে কোনো প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল কিনা বলা যায় না। তবে এটি যে বেশ উল্লেখযোগ্য একটি জনপদ ছিল, উদ্ধৃত লিপিই তা প্রমাণ করে। চতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর প্রত্ন প্রমাণে জানা যায় যে, সে সময়ে মহাস্থানে মুসলমানের নিবাস বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ছিল। মানকালীর ঢিবিতে যে বিরাট মসজিদটির (মানকালীর কুণ্ড দ্র.) ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, তা যে এক বিরাট জনপদের জন্য নির্মিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

মোঘল আমলের মসজিদটি অপেক্ষাকৃত ছোট। এটি ১৭১৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। কিন্তু তার আগেই খুব সম্ভব মহাস্থান নগরীর অবনতি ঘটে এবং এস্থানের প্রাধান্য যা থাকে, তা ছিল খুব সম্ভব মাহী সাওয়ারের দরগাকে কেন্দ্র করেই। সম্রাট অওরঙযেবের রাজত্ব কালে ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে যে দান-পত্র প্রদান করা হয়, তাতে দেখা যায় যে, 'মীর সৈয়দ মোহাম্মদ মাহী সাওয়ার'-এর মাযারের জন্য সিলবরষের জমিদারদের ভূমি দান করা

১. Archaeological Survey of India Report, Vol, XV, p. 107.—Sir Alexander Cunningham.

হয়েছিল। তখন পর্যন্ত মাযারটি খুব প্রসিদ্ধ ছিল বলে ধরা যায়। কিন্তু এ মাযার কবেকার দানপত্রে তার উল্লেখ নেই। সে সময়ে মহাস্থানে বিশেষ কোনো বসতি ছিল বলে ধারণা হয় না।

ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে এস্থান পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ ছিল বলে মন হয়। তখন ১৭৬৩ থেকে ১৭৮৭ সাল পর্যন্ত এস্থানে বিখ্যাত ফকীর সম্প্রদায়ের দলপতি মজনু শাহ্ মস্তানা বুরহানার আস্তানা ছিল বলে জানা যায়।

মহাস্থানগড়ের চারদিকের কীর্তিসমূহ

গোকুল মেড়

মহাস্থান দুর্গ থেকে প্রায় ১.৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে, গোকুল গ্রামের পশ্চিম সীমান্তে এবং গোকুল, রামশহর ও পলাশবাড়ি গ্রাম তিনটির সংযোগ স্থলে অবস্থিত গোকুল মেড় বা লক্ষ্মীন্দরের মেড় ছিল একটি অতি উঁচু ঢিবি। স্থানীয় জনপ্রবাদমতে জানা যায় যে, উঁচু ঢিবির উপর উঠলে রাজশাহী-পাবনা জেলায় অবস্থিত চলনবিলও নাকি দৃষ্টিগোচর হত।

১৯৩৪-৩৬ সালে উৎখনন কাজ করার ফলে এখানে একটি সুবৃহৎ ও আশ্চর্যজনক ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমানে ভগ্নপ্রাপ্ত অবস্থায়ও এ বিশাল ইমারত প্রায় ১৩ মিটার উঁচু। অটুট অবস্থায় এটি যে আরও উঁচু ছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

এ-মেড় স্থাপত্য শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। এখানে নানা আয়তনের ১৭২ টি ভরাট কক্ষ পাওয়া গেছে। "কুঠুরীগুলিকে বিভিন্ন তলে একই সারিতে নির্মাণ করে মৃত্তিকা দ্বারা এমনভাবে ভরাট করে দেওয়া হয়েছিল যাতে এগুলো কোনো এক সুউচ্চ মন্দির অথবা স্তূপের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।" এ পদ্ধতি বর্তমান কালে স্তূপীকরণ (piling system) প্রক্রিয়ার সঙ্গে কিছুটা তুলনীয় এবং মুসলিম আমলের বহু আগে থেকেই এদেশে প্রচলিত থাকার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

এই সুউচ্চ ইমারত প্রথমে কী উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল, তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। উৎখননের ফলে যে সমস্ত চিত্রফলক ও অন্যান্য উপকরণ পাওয়া গেছে, তাতে এর আদি নির্মাণকাল ষষ্ঠ শতাব্দীতে পরবর্তী গুপ্তদের সময়ে ছিল বলে ধরা হয়। ক্রুশাকারে নির্মিত ও বহুতল বিশিষ্ট ভিত্তিমণ্ডপের উপরে আদিতে এখানে একটি অতি উঁচু বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা। ভিত্তি প্রাচীরের উপর অষ্টকোণাকৃতির একটি গাঁথুনি দেখা যায়। এ গাঁথুনির উপর খুব সম্ভব মন্দির বা স্তূপটি নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু সেই মন্দির বা স্তূপের কোনো চিহ্ন আজ খুঁজে পাওয়া যায় না।

একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে সেন আমলে এখানে দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মাণ কার্য হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। উপরোক্ত স্তূপটিকে ভেঙ্গে (অথবা সেই স্তূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে তার ধ্বংসাবশেষের উপর) নতুন করে একটি বর্গাকৃতির মন্দির ও অলিন্দ নির্মাণ করা হয়। "বাইরে পশ্চিম দিকে একটি প্রশস্ত সিঁড়ির সাহায্যে মন্দিরে প্রবেশ করা যেত। কিন্তু পরবর্তী কালে মন্দিরের ও অলিন্দের দরজা বন্ধ করে মেঝেকে কোন এক অনির্দিষ্ট উচ্চতায় নির্মাণ করা হয়।" শেষ পর্যায়ে নির্মিত ইমারতটি ছিল খুব সম্ভব একটি শিব

মন্দির। মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগে উৎখনন কার্য চালানোর পরে একটি কক্ষ পাওয়া গেছে। সেই কক্ষের মধ্যে একটি নরকঙ্কাল পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এটিকে কোনো সন্ন্যাসীর কঙ্কাল বলে মনে করেন। খুব অসম্ভব নাও হতে পারে। তবে কোনো বিশেষ ব্যক্তির দেহকে কোনো বিশেষ কারণে এখানে বিশেষভাবে সমাহিত করে রাখার সম্ভাবনাকেও বিবেচনার মধ্যে গ্রহণ করা যেতে পারে।

এ কক্ষের নিচেই '১২ ফুট ৮ ইঞ্চি' পরিধির একটি ইটবাঁধান গর্ত দেখা যায়। "এর কেন্দ্র স্থলে '১-৮´´ × ১-৬' মাপের একটি প্রস্তর খণ্ড উন্মুক্ত করা হয়। প্রস্তরটির মধ্যস্থলের একটি বড় গর্তের চারদিকে মোট ১২টি অগভীর গর্ত ছিল। মধ্যভাগের গর্তটির ভিতরে প্রায় '১ইঞ্চি' বর্গাকার স্বর্ণের একটি ক্ষুদ্র পত্র পাওয়া গিয়েছে। স্বর্ণ পত্রটিতে একটি উপবিষ্ট ষাঁড়ের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ দেখে মনে হয় উপরিভাগের মন্দিরটি সম্ভবত কোন এক শিব মন্দির ছিল। প্রস্তর খণ্ডটির নিচে কোনোরূপ উল্লেখযোগ্য জিনিষ আবিষ্কার হয়নি।"

প্রবল জনপ্রবাদ অনুসারে এ স্থানকে বাঙলার জনপ্রিয় লোকগাথা লক্ষ্মীন্দর-বেহুলার কাহিনীর সঙ্গে জড়িত করার প্রবণতা দেখা যায়। সেন আমলে এখানে যে একটি শিব মন্দির ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত আদি মন্দিরটি কি জন্য নির্মিত হয়েছিল, তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও একটি বৌদ্ধ মন্দির বা স্তূপেরই অস্তিত্ব যে এখানে ছিল, তা সম্ভাব্য ঘটনা বলেই মনে হয়। অতএব লক্ষ্মীন্দর-বেহুলার কাহিনীটিকে আষাঢ়ে গল্প ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

নেতাই ধোপানীর পাট

গোকুল মেড় থেকে আনুমানিক ৫০০ মিটার পূর্ব-দক্ষিণ দিকে এবং বগুড়া রংপুর পাকা সড়ক থেকে প্রায় ৩০০ মিটার পশ্চিমে একটি বিরাট ঢিবি আছে। প্রভাস বাবু কর্তৃক ১৯২৯ রচিত মানচিত্রে এর আয়তন দেখা যায় ৯০.৯ মিটার × ৯০.৯ মিটার ও উচ্চতা ৯.০৯ মিটার। বর্তমানে এর আয়তন ও উচ্চতা অনেক কমে গেলেও এটি এখনও (১৯৮০ খ্রিঃ) একটি বিরাট ঢিবি এবং এর ভিতরে প্রচুর প্রাচীন ইট ও পাথর আছে। স্থানে স্থানে প্রশস্ত ইটের দেয়ালের ভিত্তিও নযরে পড়ে।

জনপ্রবাদ অনুসারে এখানেই নাকি ছিল লক্ষ্মীন্দর-বেহুলার কাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত মনসাদেবীর সহচরী নেতাই ধোপানীর আবাসস্থল। মনসার বস্ত্রাদি ধোলাই কালে বেহুলা নাকি মৃত স্বামীসহ এ ঘাটে উপস্থিত হয়ে তাঁরই সাহায্যে মনসাকে বশীভূত করে মৃত স্বামীর জীবন ফিরে পান। গল্পটি চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই। কিন্তু তথাকথিত বাসরঘর (গোকুল মেড়) থেকে মাত্র ৫০০ মিটার দূরে নেতাই ধোপানীর স্বর্গধামের নিবাসস্থল থাকাকে একটি হাস্যকর ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারেনা। এটি যে একটি আষাঢ়ে গল্প, তাতে সন্দেহ নেই। এখানে পরীক্ষামূলক উৎখননকার্য চালিয়ে দেখা গেছে যে, খ্রিস্টিয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত একটি বিরাট মন্দির বা স্তূপ জাতীয় ইমারতের ধ্বংসাবশেষ এখানে লুক্কায়িত আছে।

পরশুরামের সভাবাটী

মহাস্থান গড়ের পশ্চিম দেয়ালে অবস্থিত তাম্রদ্বার (তোরণ) ভেদ করে যে রাস্তাটি দারাব শাহী তোরণ থেকে শুরু হয়ে পশ্চিমে বিহার গ্রাম পর্যন্ত চলে গেছে, তা থেকে প্রায় ২০০ মিটার উত্তরে এবং মহাস্থান গড়ের পশ্চিম দেয়াল সংলগ্ন গীলাতলা খালের পশ্চিম তীরে মথুরা গ্রামে একটি ধ্বংসস্তূপ আছে। জনপ্রবাদ মতে এটি মহাস্থানের তথাকথিত রাজা পরশুরামের সভাবাটী বলা হয়ে থাকে।

গীলাতলা খালের সমান্তরাল রেখায় একটি পাকা বাঁধের ধ্বংসাবশেষ এ ঢিবির মধ্যে এসে পৌঁছেছে বলে দেখা যায়। মাঝে মাঝে ইটবাঁধান নালার চিহ্নও সেই বাঁধে আছে। এতে ধারণা করা হয় যে, নিকটস্থ কালীদহ বিল ও গীলাতলা খালের মধ্যে জল সরবরাহের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল এ বাঁধের মাধ্যমে। খুব সম্ভব সেই সঙ্গে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবেও বাঁধটির উপযোগিতা ছিল এবং পশ্চিম দিক থেকে শত্রুর আক্রমণের প্রথম প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছিল এ বাঁধ। তখন ভীমের জাঙ্গালের অস্তিত্ব ছিল কিনা বলা যায় না (ভীমের জাঙ্গাল দ্র.)। আলোচ্য ধ্বংসাবশেষটি ছিল খুব সম্ভব প্রহরীদের জন্য নির্মিত ঘাঁটি। এটি খুব সম্ভব পরবর্তী গুপ্ত যুগে নির্মিত হয়েছিল বলে ধারণা হয়।

স্কন্দের ধাপ ও গোপীনাথের ভিটা

মহাস্থান গড় থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দক্ষিণে বগুড়া-রংপুর পাকা সড়ক থেকে প্রায় ৫০ মিটার পূর্বে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা আনুমানিক ২৮২ মিটার × ৪৫ মিটার আয়তনের একটি অতি প্রাচীন জলাশয় আছে। জলাশয় থেকে প্রায় ১০০ মিটার পূর্বে আনুমানিক ৪৫.৪৫ মিটার × ৩৯.৩৯ মিটার আয়তনের একটি ঢিবি ছিল। ঢিবির উচ্চতা ছিল প্রায় ৪.৫৪ মিটার। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে এখানে আংশিক উৎখননকার্য করা হয়। কিন্তু কোনো রিপোর্ট পাওয়া যায়নি।

কলহণের 'রাজতরঙ্গিনী' নামক গ্রন্থে 'কার্তিকেয় মন্দিরের' উল্লেখ আছে। এ মন্দির ছিল পুণ্ড্রনগরে। স্কন্দের ধাপকে অনেকে সেই কার্তিকেয় মন্দির বলে মনে করেন। রামচরিতে (৩য় পরিচ্ছেদ, ৯ম শ্লোকে) যে স্কন্দনগরের কথা বলা হয়েছে এবং যেখানে শোণিতপুর বলে একটি নগরী আছে, সেই স্কন্দনগরকেও বর্তমান ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে কেউ কেউ অভিন্ন বলে ধরে থাকেন। এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা কঠিন। ১৯২৯ সালে প্রভাস বাবু যে মানচিত্র তৈরি করেছিলেন তাতে এ স্থানকে স্কন্দের ধাপ হিসাবেই দেখান হয়েছে।

গোপীনাথের ভিটা

স্কন্দের ধাপ থেকে প্রায় ৩০০ মিটার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ৬০.০৬ মিটার × ৪৫.৪৫ × ১.৮৯ মিটার আয়তনের একটি অনুচ্চ ঢিবি ছিল। এটি এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। খুব সম্ভব এখানে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছিল। এটির নাম ছিল গোপীনাথের ভিটা।

ওঝা ধন্বন্তরীর বাড়ি

মহাস্থান গড় থেকে প্রায় ৩.২ কিলোমিটার ও গোকুল মেড় থেকে প্রায় ১.৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং চাঁদনিয়া-হরিপুর, হাজরা দিঘি ও রামশহর নামক ৩টি গ্রামের প্রায় সংযোগ স্থানে একটি প্রাচীন ঢিবি দেখা যায়। ৩০.৩ মিটার × ২৪.২৪ মিটার আয়তনের এই ঢিবির উচ্চতা ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ৬ মিটার ছিল বলে প্রভাস চন্দ্র সেন উল্লেখ করেছেন। জনপ্রবাদ মতে এ ঢিবিটিকে 'ওঝা ধন্বন্তরীর বাড়ি' বলে চিহ্নিত করা হয়। ঢিবিতে প্রচুর ইট-পাথর দেখা যায়। এটি যে কোনো মন্দির বা স্তূপের ধ্বংসাবশেষ, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মঙ্গলকোট বা পদ্মাবতীর ধাপ

মহাস্থান গড়ের উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার পশ্চিমে কালিদহ বিলের পশ্চিম তীরে চিঙ্গাসপুর মৌজায় উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ৯০.৯ মিটার × ৬০.৬ মিটার আয়তন ও ৬ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট একটি ঢিবি ছিল বলে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তুত প্রভাস চন্দ্র সেনের মানচিত্রে দেখা যায়। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহ্যাম যে মানচিত্র দিয়েছেন, তাতেও চিঙ্গাসপুর নামে পরিচিত এ ঢিবির উল্লেখ আছে। ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে গ্রন্থকারের অনুরোধে বগুড়া জেলার ডেপুটি কমিশনারের তত্ত্বাবধানে যে জরিপ কাজ করা হয়, তাতে দেখা যায় যে, বগুড়া থানার অধীনে পলিবাড়ি মৌজার ২৮৭ দাগে অবস্থিত মঙ্গলকোট ঢিবিটি উত্তর-দক্ষিণে ৮৭.৮৭ মিটার লম্বা এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১২ মিটার থেকে ২১ মিটার চওড়া এবং এটি ২ থেকে ৩.৬৬ মিটার উঁচু ছিল। ঢিবির লাগোয়া পূর্ব দিকের গ্রামের নাম চিঙ্গাসপুর। বর্তমানে ঢিবির পূর্ব পশ্চিম দিক কেটে চাষের জমি করা হয়েছে বলে এর প্রশস্ততা অনেক কমে গেছে।

সম্প্রতি (১৯৭৩ খ্রিঃ) ঢাকা যাদুঘর কর্তৃক এ স্থান থেকে বেশ কয়েকটি অতি মূল্যবান পোড়ামাটির চিত্রফলক (Terra-cotta plaques) উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলিতে অতি উন্নত মানের শিল্পশৈলী দেখা যায় এবং এগুলি ষষ্ঠ শতাব্দীর পরবর্তী গুপ্ত যুগের বলে পণ্ডিতদের অভিমত।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ হাল আমলে এখানে কিছু জরিপ কাজ করেছে এবং এখানে একটি অতি মূল্যবান প্রত্নকীর্তি আছে বলে তাদের ধারণা। তবে কীর্তিটির প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উৎখনন কাজ না করে কিছুই বলা যায় না। খুব সম্ভব এখানে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল।

খামার ধাপ

গোকুল মেড় থেকে প্রায় আধ মাইল দক্ষিণে এবং বগুড়া-মহাস্থান পাকা সড়ক থেকে প্রায় ৭০০ মিটার পশ্চিমে রামশহর মৌজায় ৯৩.৯৩ মিটার × ৬০.৬ মিটার আয়তন ও ৩ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট একটি ঢিবির কথা প্রভাস বাবুর ১৯২৯ সালের বর্ণনা থেকে জানা যায়। খামার ধাপ নামে পরিচিত ও প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ এই ঢিবি যে একটি প্রাচীন মন্দির বা বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মঙ্গলনাথের ধাপ

বিহার গ্রাম থেকে প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণে এবং বিহার গ্রাম থেকে আসা গ্রাম্য পথটি যেখানে ক্ষেতলাল-বগুড়া রাস্তার সঙ্গে মিশেছে, ঠিক সেখানে তেঘর মৌজায় অবস্থিত ও মঙ্গলনাথের ধাপ নামে পরিচিত ৬০ মিটার × ২৪ মিটার আয়তন ও ৯ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট একটি ঢিবির কথা প্রভাস বাবু উল্লেখ করেছেন। এখান থেকে কিছু পোড়ামাটির চিত্রফলক ও কয়েকটি মূর্তি উদ্ধার করা হয়েছিল বলে জানা গেছে। এ স্থানে কোনো বৌদ্ধ মন্দির বা স্তূপের ধ্বংসাবশেষ লুক্কায়িত আছে বলে মনে হয়।

কাঁচের আঙ্গিনা, নরপতির ধাপ ও সন্ন্যাসীর ধাপ

মঙ্গলনাথের ঢিবির কাছে বেশ কয়েকটি ঢিবি আছে। এগুলির মধ্যে কাঁচের আঙ্গিনা (২৭ মিটার × ২৪ মিটার × ২ মিটার), নরপতির ধাপ (৩৯.৩৯ মিটার × ৩০.৩ মিটার × ২.৪২ মিটার) ও সন্ন্যাসীর ধাপ (১৫.১৫ মিটার × ১৫.১৫ মিটার × ৩.৬১ মিটার) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নরপতির ধাপ মঙ্গলনাথের ধাপ থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে, সন্ন্যাসীর ধাপ নরপতির ধাপ থেকে ৫০০ মিটার দক্ষিণে এবং কাঁচের আঙ্গিনা সন্ন্যাসীর ধাপ থেকে প্রায় ৮০০ মিটার দক্ষিণে অবস্থিত। প্রত্যেকটি ঢিবিতে প্রচুর ইট দেখা যায়। মনে হয় এগুলিতে মন্দিরাদি ছিল।
অতি সাম্প্রতিক কালে (জুলাই, ২০০৫ খ্রিঃ) অতি বিশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ পাওয়া গেল যে, কাচের আঙ্গিনা নামক বিরাট প্রাচীন কীর্তিটি থেকে সব ইট সরিয়ে ফেলা হয়েছে স্থানীয় লোকজন কর্তৃক এবং সেখানে পড়ে তখন শুধু মাটি আর পাটকেল।

বিহার গ্রাম বা তোতারাম পণ্ডিতের ধাপ

মহাস্থান থেকে আনুমানিক ৬ কিলোমিটার পশ্চিমে নাগর নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত বিহার গ্রামে একটি বিরাট ঢিবি আছে। প্রায় ২১২ মিটার × ১৮০ মিটার আয়তনের এ ঢিবির সর্বোচ্চ অংশ এখনও প্রায় ৮ মিটার উঁচু। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে স্যার কানিংহ্যাম এ ঢিবির প্রায় অনুরূপ আয়তনই দেখেছিলেন বলে তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায়।[১] তবে এ স্থান তখন জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। বর্তমানে ঢিবিতে কোনো রকমে চাষবাসের কাজ চলে।

উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ ঢিবির দক্ষিণ দিকের অর্ধাংশ অপেক্ষাকৃত উঁচু। উত্তরাংশ বিভিন্ন থাকে ক্রমশ ঢালু হয়ে পাশের সমতল ভূমির সঙ্গে প্রায় একাকার হয়ে গেছে।

ঢিবির উত্তর-পশ্চিম দিকে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা প্রায় তিন একর আয়তনের উঁচু পাড় বিশিষ্ট একটি প্রাচীন জলাশয় আছে। ঢিবির উত্তরাংশের উত্তর-পশ্চিম কোণ জলাশয়ের পূর্ব-দক্ষিণ কোণের সঙ্গে প্রায় সংলগ্ন। দিঘির দক্ষিণ পাড়ে (ঢিবির পাশে) কতগুলি আধুনিক কালের বাড়ি আছে। জলাশয় ও এ সমস্ত বাড়ির লাগোয়া পশ্চিমে রাস্তা ও বিহার হাট। রাস্তার পশ্চিম দিকে হাটের মধ্যে আছে দুটি মসজিদ। মসজিদ দুটির

১. *Archaeological Survey* of India Report. Vol. XV, p. 103
—Sir Alexander Cunningham.

পারস্পরিক দূরত্ব (উত্তর-দক্ষিণে) প্রায় ২০০ মিটার। উত্তর দিকের মসজিদের পশ্চিমে স্থানীয় মুসলিম জমিদারের প্রাচীর ঘেরা পরিত্যক্ত বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। এ বাড়ির উত্তরে কিছু ফাঁকা স্থানের পরে আরও একটি পরিত্যক্ত জমিদার বাড়ি। স্যার কানিংহ্যাম তাঁর গ্রন্থে বলেছেন যে, মসজিদ ও বাড়িগুলিতে ব্যবহৃত ইট উপরোক্ত ঢিবি থেকে নেওয়া।[১] মসজিদ ও বাড়িগুলি প্রাচীন নয়, খুব সম্ভব কোম্পানীর আমলে তৈরি। তবে ইটগুলি যে প্রাচীন তাতে সন্দেহ নেই।

ঢিবিটি প্রাচীন কালের ইটে পরিপূর্ণ। ঢিবির প্রায় অর্ধেক ভূমিতে (উত্তরাংশে) অনেকদিন ধরে চাষাবাদ চলছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমগ্র চাষের ভূমি জুড়ে পড়ে আছে অসংখ্য ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ। ঢিবির দক্ষিণ ভাগের পূর্বার্ধ এখনও পতিত জমিই রয়ে গেছে। সেখানে সর্বত্র অসংখ্য প্রাচীন ইট বের হয়ে থাকা অবস্থায় দেখা যায়। দক্ষিণাংশের পশ্চিমার্ধে একটি খামারবাড়ি আছে। সেখানে গোটা কয়েক ছোট গর্ত করা হয়েছে। গর্তগুলির ভিতরে প্রচুর প্রাচীন ইট পাওয়া গেছে। উত্তর ও দক্ষিণাংশের সীমান্তে অর্থাৎ ঢিবির প্রায় কেন্দ্রস্থলে আনুমানিক ৪.৫৪ মিটার × ৩.৬৩ মিটার × ১.৮১ মিটার আয়তনের একটি গর্ত খনন করা হয়েছে বেশ কিছুকাল আগে। সেই গর্তের দক্ষিণ দেয়ালে (প্রায় দক্ষিণাংশের শেষ সীমা ঘেঁষে) ইটের তৈরি দুটি প্রশস্ত দেয়াল বের হয়ে পড়েছে। দেয়াল দুটি উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রায় ৪.৫০ মিটার গভীরেও দেয়ালগুলি বেশ অটুট অবস্থায় আছে।

দক্ষিণ ভাগের পশ্চিমাংশে এর চেয়েও বড় আকারের একটি গর্ত আছে। সেটি আরও গভীর। সেই গর্তেও বিরাট বিরাট প্রাচীরের ভিত্তি বের হয়ে পড়েছে। এতে ধারণা করা যেতে পারে যে, সমগ্র ঢিবি জুড়ে একটি বিশাল ইমারত অথবা অনেকগুলি ইমারতের (cluster of buildings) ধ্বংসাবশেষ লুক্কায়িত আছে।

য়ুয়ান-চোয়াঙ যখন ৬৩৮-৩৯ খ্রিস্টাব্দের দিকে পুণ্ড্রবর্ধন ভ্রমণ করেন তখন তিনি এ নগর থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরে পো-সি-পো বিহার (ভাসু বিহার) ও অবলোকিতেশ্বরের বিরাট মন্দির দেখেছিলেন বলে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ আছে। তাঁর বর্ণনায় দেখা যায় যে, ভাসু বিহারে ৭০০ শ্রমণ অধ্যয়ন করতেন এবং দেশ-বিদেশ থেকে শ্রমণরা এখানে আসতেন। স্যার কানিংহ্যাম আলোচ্য ঢিবিকেই ভাসুবিহার বলে সনাক্ত করেছেন।[২]

এ ঢিবির লাগোয়া দক্ষিণ দিকে প্রায় ৬০ মিটার বাহুবিশিষ্ট বর্গাকারে ও উদগত (projected)ভাবে নির্মিত একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন দেখা যায়। ঢিবির দক্ষিণ সীমার প্রায় মধ্য রেখা থেকে এটি দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে প্রসারিত হয়ে একটি বর্গক্ষেত্রের সৃষ্টি করেছে।

---

১. Ibid.

২. *Archaeological Survey of India Report*, Vol. XV, p. 104—Sir Alexander "At the south-west corner of the mound there is an off-set of about 200 feet, but it is not so high as the main mound. I am inclined to identify this mound with the fort of *Basankat*, which was founded by Ghias-ud-Din Iwaz."

বিহারের ঢিবির চেয়ে এ ঢিবির উচ্চতা অপেক্ষাকৃত কম ছিল বলে স্যার কানিংহ্যাম উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে সেখানে ঢিবির কোন অস্তিত্ব নেই। সমুদয় ভূমি ভাল চাষের জমিতে পরিণত হয়েছে। হাল আমলে এই স্থানের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি ছোট পুকুর খনন করা হয়েছে। এই পুকুরের ভিতরে অনেক গভীরেও প্রাচীন ইমারতের ভিত্তি দেয়াল দেখা যায়। তা-ছাড়া সমগ্র স্থান জুড়ে আছে অসংখ্য প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ। স্যার কানিংহ্যাম উদগত অংশকে গিয়াস-উদ্-দীন ইওয়াজ খলজী (১২১২-২৭ খ্রিঃ) কর্তৃক নির্মিত বসনকোট দুর্গ বলে চিহ্নিত করেছেন।

তিনি কেন এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তার কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। কারণ, এখানে কোন দুর্গের চিহ্ন দেখা যায় না। দুর্গের চারদিকে যে পরিখা (moat) থাকার কথা, তার কোন চিহ্নও এখানে নেই, ছিলও না। সে যুগে পরিখাহীন দুর্গ নির্মাণের দৃষ্টান্ত এদেশে বিরল, নেই বললেও চলে। পূর্বদিকে হাল আমলে খনিত পুকুরের গভীরে যে দেয়াল পাওয়া গেছে, সেটিকে যদি দুর্গের পূর্বদিকের বেষ্টনী-প্রাচীর বলে ধরা হয়, তবে মেনে নিতে হয় যে বেষ্টনী প্রাচীরের ভিত্তি অন্তত ১০ ফুট গভীরেও ছিল। বেষ্টনী-প্রাচীরের জন্য এত গভীর ভিত্তি সাধারণত করা হতনা।

তাছাড়া 'তবকাতই-নাসিরী' গ্রন্থে সমসাময়িক ঐতিহাসিক মীনহাজ-ই-সিরাজ বসনকোট দুর্গের অবস্থান সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে সহজেই বোঝা যায় যে এ দুর্গ ছিল লখনৌতি (গৌড়) শহরের কাছাকাছি স্থানে।[১]

তোতারাম পণ্ডিতের ধাপ বলেও কথিত এ স্থানে ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত (মধ্যবর্তী ১৯৮৩-৮৪ সাল বাদ দিয়ে) সময়ে প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর কর্তৃক উৎখনন কার্য করা হয়। "ক্রমাগত খননের ফলে ঢিবিটিতে একটি বিহার, একটি চতুষ্কোনাকার ইমারত ও একটি স্তূপের ধ্বংসাবশেষ অনাবৃত হয়। তবে ঢিবিটির পূর্বাংশের অর্ধেক অংশ অদ্যাবধি খনন বহির্ভূত অবস্থায় রয়েছে। এ অংশের ভূ-পৃষ্ঠের সমোন্নতি রেখাগুলো পর্যবেক্ষণ করে অনুমান করা যায় যে, এ অংশে আরও দুটি ইট নির্মিত ইমারতের কাঠামো গচ্ছিত আছে। খননের ফলে সর্বাধিক তেরটি স্তর, সাতটি মেঝে ও তিনটি অধিবসতি আমল সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। সবচেয়ে নিচের দুটি মেঝের সাথে সম্পর্কযুক্ত স্থাপত্য কীর্তির বৈশিষ্ট্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় অধিবসতি সময়কালে প্রথম অধিবসতি সময়কালের ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাপত্যিক কাঠামোর উপর বর্তমানে দৃশ্যমান কাঠামোগুলোর নির্মাণ কাজ পরিচালিত হয়েছিল। আর তৃতীয় নির্মাণ সময়কালের ইমারতগুলোতে পুনর্নির্মাণ কাজ পরিচালিত হয়েছিল। এই প্রত্নস্থলে প্রায় পাঁচশত প্রত্নবস্তু অনাবৃত হয়েছে।

"তোতারাম পণ্ডিতের ধাপ নামের ঢিবিটি পূর্ব-পশ্চিমে ২১২ মিটার এবং উত্তর-দক্ষিণে ১৮২ মিটার বিস্তৃত। খননের পূর্বে এটি পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে ৩.৪ মিটার উঁচু ছিল। ঢিবিটির পশ্চিম দিকে একটি বিহার এবং দক্ষিণ-পূর্বকোণে একটি স্তূপের (মতান্তরে মন্দির) ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। দ্বিতীয় বিহারটি পশ্চিমাংশের বিহারের

---

১. তবকাত-ই-নাসিরী ৫৫-৫৬ পৃষ্ঠার পাঠ ও পাদটীকা দ্র.। অনুবাদ ও সম্পাদনা আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া।

লাগোয়া দক্ষিণ দিকের অংশে বিস্তৃত ছিল। প্রথম বিহারটি পূর্বমুখী এবং এর পরিমাণ ৬১ মিটার (পূর্ব-পশ্চিম) × ৫৭ মিটার (উত্তর-দক্ষিণ)। পূর্ববাহুর মধ্যবর্তী অংশে অবস্থিত এই তোরণের বরাবর পূর্বদিক দিয়ে একসময় নাগর নদী প্রবাহিত হত। এর উত্তর ও দক্ষিণের প্রত্যেকটিতে দশটি করে ভিক্ষু কক্ষ ছিল। অন্যদিকে পূর্বাবাহুতে প্রবেশ তোরণের দু'দিকের প্রত্যেক দিকে চারটি করে প্রকোষ্ঠ ছিল। পশ্চিম বাহুতে যদিও খনন পরিচালিত হয়নি তথাপি নয়টি প্রকোষ্ঠ ছিল বলে অনুমিত হয়েছে। এদের আকৃতি ২.৪৪ মিটার থেকে ৩.৬৬ মিটার এর মধ্যে পর্যন্ত উঠানামা করে। একইভাবে পেছনের দেয়ালের পুরুত্ব ২.৫৯ মিটার থেকে ২.৮২ মিটার, সম্মুখের দেয়াল ১.৯৮ মিটার থেকে ২.৬ মিটার এবং বিভাজক দেয়ালের পুরুত্ব ১.২২ মিটার থেকে ২.২১ মিঃ-এর মধ্যে বিদ্যমান। সারিবদ্ধ কক্ষগুলোর সামনে দিয়ে রয়েছে ২.৭৪ মিটার প্রশস্ত বারান্দা। বারান্দার সামনে রয়েছে ১.২ মিটার চওড়া ঠেস দেয়াল। মধ্যবর্তী অংশে রয়েছে খোলা চত্বর।

"তোতারাম পণ্ডিতের ধাপের পশ্চিমাংশে অবস্থিত প্রথম বিহারটির দুটি কক্ষের বিছান ইটের উপর জমাটবদ্ধ মেঝে এবং তার উপর ইটের তৈরি বেদী রয়েছে। এগুলো প্রত্নস্থলটির দ্বিতীয় স্তরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। দক্ষিণের বারান্দার পশ্চিমাংশ জুড়ে আছে ১২.১৯ মিটার লম্বা এবং ২.৮ মিটার চওড়া একটি ইটের তৈরি মঞ্চ। বিহারটিতে একটি অধিবসতি সময়কালে একটি মূল নির্মাণ ও একটি পুনঃনির্মাণ সময়কালের চিহ্ন লক্ষ্য করা গেছে। উত্তর বাহুর পূর্বপ্রান্ত থেকে চতুর্থ কক্ষের পেছন দিকে ২০ সে. মি. × ২৫ সে. মি. পরিমাপের নর্দমার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। পূর্ববাহুর দুই প্রান্তের কক্ষগুলোর পরিসর অত্যন্ত কম এবং দেয়ালগুলোও অঁপেক্ষাকৃত বেশি মোটা। পূর্ববাহুর মধ্যবর্তী তোরণটির পরিমান ২০.৭৮ মিটার (উত্তর-দক্ষিণ) × ৬.২৫ মিটার (পূর্ব-পশ্চিম)। এর বাইরের অংশে মূল বাহু থেকে বর্ধিত একটি প্রবেশ কক্ষ (৫.৫ মিটার × ৩.৯৬ মিটার) আছে। মূলবাহুর বাইরের দিকে বর্ধিত প্রবেশ কক্ষটির দু'পাশে আবার একটি করে কক্ষ ছিল। প্রতিটি কক্ষের পরিমাপ ৬.৩৬ মিটার × ৫.৮৬ মিটার। বিহারের বাইরে থেকে তোরণে এবং তোরণ থেকে বিহারের মধ্যবর্তী উন্মুক্ত তোরণ চত্বরে ওঠা-নামার জন্য সোপান শ্রেণী ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এগুলো কিছু সাংস্কৃতিক জঞ্জালের উপর নির্মিত হয়েছিল বলে এদের পূর্বে নির্মাণকালীন সংযোজন হিসেবে গন্য করার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই।

"তোতারাম পণ্ডিতের ধাপের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে প্রাপ্ত বিহারটির কেবল পূর্ব এবং দক্ষিণ বাহুর অংশ বিশেষে খনন পরিচালিত হয়েছে। ফলে এর ভিক্ষু কক্ষগুলোর পরিমাপ ৬.২৪ মিটার × ৩.৩৫ মিটার পাওয়া গেছে। পেছনের দেয়াল ২.৫৩ মিটার এবং সামনের দেয়াল ১.৮২ মিটার চওড়া। কক্ষগুলোর বিভাজক দেয়ালগুলো ১.২১ মিটার থেকে ১.২৬ মিটার চওড়া। সম্পূর্ণ খনন পরিচালিত না হওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে কিছু বলা সম্ভব নয়। তোতারাম পণ্ডিতের ধাপের দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত কাঠামোটি একটি স্তূপ বা মন্দির হতে পারে বলে ধারণা করা হয়েছে। এর সাথে যশোরের ভরতভায়না ও রংপুর গোকুলমেধে প্রাপ্ত স্থাপত্য কাঠামোর চমৎকার সৌসাদৃশ্য রয়েছে।

"তোতারাম পণ্ডিতের ধাপে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলোর মধ্যে সুলতান সিকান্দার শাহের আমলের (১৩৫৯-১৩৮৭ খ্রিঃ) একটি রৌপ্যমুদ্রা একটি ব্রোঞ্জের ধ্যানীবুদ্ধ, কিছু পোড়ামাটির ফলক, তিনটি পোড়ামাটির মূর্তির মস্তকের অংশ, কিছু পাথরের পুঁতি, অলংকৃত বট ও বিভিন্ন প্রকার মৃৎপাত্র উল্লেখযোগ্য।"[১]

ভাসু বিহার

বিহার গ্রাম থেকে প্রায় ১.৫ কিলোমিটার উত্তরে নরপতির ধাপ নামে একটি সুবৃহৎ উঁচু ভূমি ছিল। এই উঁচু ভূমির আয়তন ছিল প্রায় ২৪২ মিটার × ২১২ মিটার। সমগ্র ভূমির চারদিকে ছিল পরিখা। একমাত্র পশ্চিম দিক ছাড়া বাকি তিন দিকের পরিখার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। এ স্থান থেকে প্রায় ৩০৩ মিটার দক্ষিণে ঝিঞ্জিরাইলের দিঘি নামক একটি অতি প্রাচীন জলাশয় আছে। দিঘির চার পাশের উঁচু ভূমিতে ছোট ছোট কয়েকটি ঢিবির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। পরিখা বেষ্টিত উঁচু ভূমির সামান্য পূর্ব দিয়েই প্রবাহিত ছিল নাগর নদী। এ নদী আরও উত্তর-পূর্ব দিকে করতোয়া নদী থেকে বের হয়ে এই উঁচু ভূমির পাশ দিয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে প্রায় ২.৬ কিলোমিটার দক্ষিণে বিহার গ্রামকে বেষ্টন করে পশ্চিম মুখে কিছুদূর প্রবাহিত ছিল। এ নদীর পূর্বদিকেই ছিল ভীমের জাঙ্গাল। আর ভীমের জাঙ্গাল থেকে প্রায় ৫০০ মিটার পূর্ব দিকে ছিল সুবৃহৎ শব্দল দিঘি। উপরে উল্লিখিত উঁচু ভূমি থেকে এক প্রায় মাইল পূর্ব দিকে অবস্থিত শব্দল দিঘির আয়তন প্রায় ৮০০ মিটার × ৫০০ মিটার। এই উঁচু ভূমি ভাসু বিহার নামে পরিচিত।

এখানে প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর কর্তৃক ১৯৭৩-৭৮ খ্রিস্টাব্দে উৎখনন কার্য করা হয়েছিল। উপরে উল্লিখিত উঁচু ভূমিতে ৩টি বড় ও ২টি ছোট ঢিবি ছিল। সাবেক ঢিবির উত্তর-পশ্চিম ভাগে অবস্থিত ৩টি ঢিবিতে উৎখনন কার্য চালান হয়েছে। উৎখনন কার্য চালানর পর দেখা গেছে যে, ঢিবির অভ্যন্তরে অবস্থিত কীর্তিগুলি ঢিবির বাইরে মোটামুটি সমতল ভূমিতেও প্রসারিত।

প্রায় অসমাপ্ত উৎখনন কার্যের ফলে এই উঁচু ভূমিতে ২টি বৌদ্ধ বিহার ও ১টি বৌদ্ধ মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃত বিহার দুটি আয়তনে বড় নয়। প্রায় লাগালাগি অবস্থানরত বিহার দুটির মধ্যে বড়টি উত্তর দিকে এবং ছোটটি এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। বড়টিকে উত্তর বিহার ভবন এবং ছোটটিকে পশ্চিম বিহার বলা যেতে পারে। মন্দিরটি উত্তর বিহারের সোজা দক্ষিণে এবং পশ্চিম বিহারের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সামান্য দূরে অবস্থিত।

উত্তর বিহার ভবন

কিঞ্চিৎ পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা এই বিহারের আয়তন ৫৫.৭৫ মিটার × ৪৮.৯৩ মিটার। এদেশে আবিষ্কৃত আর সব বিহারের মতো এটিও দুর্গাকারে নির্মিত এবং এর বাইরের

১. মোঃ মোশাররফ হোসেন : প্রত্নতত্ত্ব : উদ্ভব ও বিকাশ, ২৪০-৪১ পৃ:।

দিকের প্রায় ২-৪৭ মিটার পুরু দেয়ালকে পিছনের প্রাচীর হিসাবে ব্যবহার করে বিহারের কক্ষগুলি নির্মিত হয়েছে। এতে মোট ৩১টি কক্ষ আছে। কক্ষগুলির আয়তন মোটামুটি ৩-৩৮ মিটার × ৩.০৩ মিটার। কক্ষগুলির সামনের দেয়াল প্রায় ২.৬৬ মিটার পুরু। কক্ষগুলির সামনে আছে প্রায় ২.৬৬ মিটার চওড়া টানা বারান্দা। বারান্দার শেষ প্রান্তে আছে প্রায় ১.৫৬ মিটার পুরু অনুচ্চ দেয়াল। এর পরেই ছিল উন্মুক্ত আঙ্গিনা। সেখানে কোন ইমারতাদি ছিল না। এই বিহারের প্রবেশপথ ছিল দক্ষিণ দেয়ালের মাঝামাঝি স্থানে।

পশ্চিম বিহার ভবন

উত্তর বিহার ভবনের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রায় ২২.৭৫ মিটার দূরে এই ভবনটি অবস্থিত ছিল। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এই ভবনের আয়তন ছিল ৪৯.০৯ মিটার × ৪৬.০৬ মিটার। বিহারের পূর্ব দেয়ালের কেন্দ্রস্থলে ছিল প্রবেশপথ ও তদসংক্রান্ত প্রকোষ্ঠাদি। উত্তর-দক্ষিণে ২২.০৭ মিটার ও পূর্ব পশ্চিমে ৭.৫৭ মিটার প্রশস্ত এই অংশ বাইরের দিকে উদগত (projected)। স্তম্ভ বেষ্টিত ৭.৫৭ মিটার × ৭.২৭ মিটার আয়তনের প্রবেশ পথের দু'ধারে ২টি কক্ষ আছে। কক্ষ দুটির এক একটির আয়তন ৩.০৩ মিটার × ৩.০৩মিটার করে বাইরের প্রবেশ পথের পরেই ছিল ১২.১২ মিটার × ৫.৪৫ মিটার আয়তনের একটি হলঘর। এর ভিতরের অর্থাৎ পশ্চিম দেয়ালের মধ্যে ২.৫৭ মিটার × ১.১৫ মিটার আয়তনবিশিষ্ট একটি দরজা ছিল। এটিই বিহারের একমাত্র প্রবেশপথ।

বিহারের পিছনের দেয়াল ছিল ৩.৫৭ মিটার প্রশস্ত। এ দেয়ালকে অবলম্বন করেই বিহারের কক্ষগুলি নির্মিত হয়েছে। এই ভবনে ২৬ টি কক্ষ ছিল। দুর্গাকারে নির্মিত বিহারে দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর ব্লকে (block) ৭টি করে এবং পূর্ব ব্লকে ৫টি কক্ষ ছিল। কক্ষগুলির সামনের দেয়াল ১.৯৮ মিটার ও পাশের দেয়াল ০.৯মিটার থেকে ১.৩৬ মিটার প্রশস্ত ছিল। প্রত্যেক কক্ষের সামনের দেয়ালে ১.৩৬ মিটার প্রশস্ত প্রবেশপথ ছিল। সামনের ২.৫৭ মিটার চওড়া টানা বারান্দা। বারান্দার শেষ প্রান্তে ছিল ১.০৬ মিটার প্রশস্ত অনুচ্চ দেয়াল। এই দেয়ালের পরেই ছিল ২৪.৮৪ মিটার × ২৪.২৪ মিটার আয়তনের উন্মুক্ত অঙ্গন। সেখানে কোন ইমারত ছিল না।

বৌদ্ধ মন্দির

পশ্চিম বিহার ভবন থেকে প্রায় ৪৫.৪৫ মিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটি বৌদ্ধ মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে। অর্ধ ক্রুশাকারে নির্মিত এই মন্দিরের আয়তন ছিল ৩৭.৮৭ মিটার × ২৬.৫১ মিটার। এর প্রবেশপথ ছিল উত্তর দেয়ালে। এই মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে ছিল একটি গর্ভগৃহ এবং গর্ভগৃহের চারদিকে ছিল প্রদক্ষিণ পথ।

প্রত্নবস্তু

উৎখনন কার্যের পরে এই ৩টি ইমারতে অসংখ্য প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, অসংখ্য ব্রোঞ্জ মূর্তি, পোড়ামাটির সীল, পোড়ামাটির চিত্রফলক, নক্সা

করা ইট ইত্যাদি। এখানকার ব্রোঞ্জ মূর্তিগুলি আকারে বেশ ছোট। পোড়ামাটির চিত্রফলকগুলির অধিকাংশই খুব উন্নত মানের। এখানে কোনো শিলা বা তাম্রলিপি পাওয়া যায়নি।

ইতিহাস

এখানে খনন কার্যের পরে ইমারতগুলির গঠন প্রণালী, মাল-মসলা ও বিভিন্ন প্রত্নদ্রব্য দেখে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, এই ইমারতগুলি দশম-একাদশ শতাব্দীর আগের নয়। সেক্ষেত্রে এগুলি যে য়ুয়ান-চুয়াঙ্ বর্ণিত ভাসু বিহার হতে পারেনা, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এখানকার উৎখনন কার্য উপরের স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে আবিষ্কৃত ইমারতাদির আরও নিচে প্রাচীনতর আরও কোনো ইমারতাদি ছিল কিনা, সেকথা তথ্যের অভাবে এখনও নিশ্চিত করে বলা যায় না।

তবে যতটুকু মনে হয়, য়ুয়ান-চুয়াঙ্ বর্ণিত ভাসুবিহার ও অবলোকিতেশ্বরের মন্দির ছিল খুব সম্ভব বিহার গ্রামে। প্রাথমিক খনন কার্যের পরে একটি বিরাট আকারের বিহারের কিয়দংশ উদঘাটন করা হয়েছে, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। বিহার গ্রামে খনন কার্য সমাপ্ত হলে এ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে হয়ত পৌঁছা যাবে যে, সেখানেও একটি ছোট বিহার এবং সেই সঙ্গে একটি ছোট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়েছে সে কথা পূর্বে (বিহার গ্রামের উৎখননের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে) উল্লিখিত হয়েছে। এই দুই স্থানে উৎখননের ফলে এখন পর্যন্ত সুয়ান-চুরায় বর্ণিত ভাসু বিহারের সমান পাওয়া যায়নি। আরও গভীরে উৎখননকার্য পরিচালনা করলে ফল কী দাড়ায় ভবিষ্যৎই তা বিচার করবে।

মহাস্থানের পার্শ্ববর্তী এলাকার অন্যান্য কীর্তি

মহাস্থান গড়ের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে করতোয়া নদী। নদীর পূর্বতী'রবর্তী এলাকা তুলনামূলকভাবে নিম্ন ভূমি। সেখানে কোনো প্রত্নকীর্তির চিহ্ন নেই। গড়ের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় ৮ কিলোমিটার, পশ্চিম দিকে প্রায় ৬ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণে প্রায় ১১ কিলোমিটার দক্ষিণে প্রায় ১১ কিলোমিটার এই বিরাট এলাকা জুড়ে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আছে। এগুলির মধ্যে গোকুল মেড়, নেতাই ধোপানীর পাট, পরশুরামের সভাবাটি, স্কন্দের ধাপ, ওঝা ধন্বন্তরীর বাড়ি, মঙ্গলকোট বা পদ্মাবতীর ধাপ, খামার ধাপ, যোগীর ভবন, বিহার গ্রাম ও ভীমের জাঙ্গাল নামে পরিচিত ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। এগুলি ছাড়া আরও যে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আছে, সেগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব হলনা বলে সংক্ষেপে এগুলির কিছু পরিচয় দেওয়া হল। এগুলি হল :

চিঙ্গাসপুর গ্রামে, '১। যোগীর ধাপ, আয়তন প্রায় '৩০ ফুট × ৩০ ফুট × ১০ ফুট', ২। মাদারীর গড়, আয়তন প্রায় '২০ ফুট × ২০ ফুট × ১৫ ফুট', ৩। ধনিকের ধাপ, আয়তন প্রায় '৩০ ফুট × ২৫ ফুট × ১২ ফুট', ৪। বিষ মর্দন ধাপ, আয়তন প্রায় '৫০

ফুট × ৫০ ফুট × ৭ ফুট' ও ৫। নামনাজানা ঢিবি, আয়তন প্রায় '২৫ ফুট × ১০ ফুট × ৮ ফুট'।

সেকেন্দ্রাবাদ ও পাশের গ্রামে, ১। লহনার ধাপ, আয়তন প্রায় '৩০ ফুট × ২৫ ফুট × ৩০ ফুট', ২। কাঞ্জীর হাঁড়ি, আয়তন প্রায় '৮০ ফুট × ৭৫ ফুট × ১৫ ফুট', ৩। সুরাদিঘির ধাপ আয়তন প্রায় '১০০ ফুট × ৯০ ফুট × ৩০ ফুট', ৪। প্রাচীর ধাপ, আয়তন প্রায় '১৫ ফুট × ১০ ফুট × ৮ ফুট' ও ৫। খুলনার ধাপ। প্রায় '৩০০ ফুট × ২৫০ ফুট' আয়তনের এই বিরাট ঢিবি প্রায় '৩০ ফুট' উঁচু। এটি একটি বিরাট কীর্তির ধ্বংসাবশেষ। এটি কোন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বলে ধারণা হয়।

শ্যামপুর গ্রামে, ১। যোগিনীর ধাপ, আয়তন প্রায় '৯০ ফুট × ৮০ ফুট × ৩৫ ফুট'। দোসতীনের পুকুর নামক একটি প্রাচীন জলাশয়ের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত এই ঢিবি একটি বিরাট কীর্তির ধ্বংসাবশেষ। এই ছোট গ্রামে আর কোনো ঢিবি নেই।

বামনপাড়া গ্রামে, ১। কানাই ধাপ আয়তন প্রায় '২৫ ফুট × ১৫ ফুট × ৭ ফুট'। অটবাল গ্রামে, ১। বলাই ধাপ, আয়তন প্রায় '২০ ফুট × ১৫ ফুট × ৮ ফুট'।

সরলপুর গ্রামে, '১। দলু মাঝির ভিটা, আয়তন ৯০ ফুট × ৮০ ফুট × ৬ ফুট।' চাঁদনিয়া হাটের উত্তরে অবস্থিত এই ঢিবিও একটি বিরাট কীর্তির ধ্বংসাবশেষ। এটি প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে।

বড় সরলপুর গ্রামে। '১। নাম না জানা ঢিবি। গ্রামের উত্তর সীমায় অবস্থিত এ ঢিবির আয়তন প্রায় ১৫ ফুট × ৮ ফুট × ৫ ফুট।' এ গ্রামে অসংখ্য প্রাচীন দিঘি-পুষ্করিণী আছে। আরও অনেক ঢিবি এ গ্রামে ছিল বলে জানা যায়। সেগুলি এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

তেঘর গ্রামে আছে, ১। নরপতির ধাপ, আয়তন '১৩০ ফুট × ১০০ ফুট × ৮ ফুট,' সন্ন্যাসীর ধাপ, আয়তন '৫০ ফুট × ৫০ ফুট × ১২ ফুট', ৩। কাঁচের আঙ্গিনা, আয়তন 'প্রায় ৯০ ফুট × ৮০ ফুট × ৭ ফুট' ও ৪। মঙ্গলনাথের ধাপ আয়তন প্রায় '১০০ ফুট × ৮০ ফুট × ২০ ফুট।' এ গুলির কিছু বর্ণনা আগেই দেওয়া হয়েছে।

চাঁদনিয়া-হরিপুর গ্রামে আছে, '১। রাসতলার ঢিবি, আয়তন প্রায় '১০০ ফুট × ৯০ ফুট × ১০ ফুট' ও ২। ষষ্ঠীতলা ঢিবি। এ ঢিবি দুটির মধ্যবর্তী ও পার্শ্ববর্তী স্থানে বড় বড় বেশ কয়েকটি প্রাচীন জলাশয় আছে।

রজকপুর গ্রামে আছে, ১। ধনভাণ্ডার, আয়তন প্রায় '১৫০ ফুট × ১০০ ফুট × ৩০ ফুট।' ২। চাঁদের ভিটা, আয়তন প্রায় '১৫০ ফুট × ১০ ফুট × ২৫ ফুট' ও ৩। সিংঘী নাথের ধাপ, আয়তনে ছোট। প্রথম দুটি ঢিবি বিরাট কোনো মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ বলে মনে হয়।

বাঘোহালী গ্রামে আছে, শালবান রাজার কাচারির ঢিবি। এ ঢিবিটি আকারে প্রায় ২০০ মিটার × ২০০ মিটার এবং এর উচ্চতা এখনও (১৯৯৬ খ্রিঃ) প্রায় ৪ মিটার। সমগ্র ঢিবিটিতে আছে প্রাচীন ইট। শালবান রাজার বাড়ির ঢিবির মতো এটিকে প্রথম দর্শনেই বৌদ্ধ বিহার তুলে চিহ্নিত করা যায়না। এটি যদি কোনো বিহারই হয়ে থাকে তবে তা হবে শালবন অথবা আনন্দ বিহারের মতো কেন্দ্রীয় মন্দিরবিশিষ্ট একটি সুবৃহৎ

বিহার। এই বিরাট কীর্তিটি ছিল প্রায় বর্গাকারে খনিত ও প্রায় ৪০০ মিটার × ৪০০ মিটার আয়তনবিশিষ্ট একটি প্রাচীন জলাধারের পুব পাড়ে সেই দিঘির প্রায় লাগোয়া পশ্চিমেই ছিল একটি প্রায় মরে যাওয়া বিল।

আরোরা গ্রামে আছে শালবান রাজার বাড়ির ঢিবি। প্রায় আধমাইল দীর্ঘ মশান দিঘির পূর্বতীরে অবস্থিত এই ঢিবি যোগীর ভবন থেকে প্রায় $\frac{১}{২}$মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে কেন্দ্রীয় মন্দির বিহীন একটি বৌদ্ধ বিহার যে ছিল তা, ঢিবিটি দেখলে সহজেই বোঝা যায়।

বাঘোপাড়া গ্রামে ছিল প্রায় '২০০ ফুট × ১৫০ ফুট × ৬ ফুট' আয়তনের গোপীনাথ ভিটা। স্কন্দের ধাপ থেকে প্রায় ৩০০ মিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এর অবস্থান ছিল।

প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন বহনকারী এসমস্ত ঢিবি ছাড়া অসংখ্য প্রাচীন জলাশয়ের অস্তিত্বও ছিল সমগ্র অঞ্চল জুড়ে। গড়ের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত গোকুল ও পলাশবাড়ি গ্রামে ছিল সবচেয়ে বেশি প্রাচীন জলাশয়ের অস্তিত্ব। দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত পীরপাট, যোগীরভবন ও অরোরা গ্রামেও অনেক জলাশয় ছিল। উত্তর-পশ্চিম দিকে সেকেন্দ্রাবাদ, চর দৌলতপুর, হাজরাবাটী গ্রামেও অসংখ্য প্রাচীন দিঘি-পুষ্করিণী আছে। শব্দল দিঘি গ্রামে আছে বিখ্যাত শব্দল দিঘি। এর আয়তন প্রায় ৮০০ মিটার × ৫০০ মিটার। এত বড় দিঘি এ অঞ্চলে আর নেই। ভাসুবিহারের উত্তর-পশ্চিমদিকে আছে শশাঙ্ক দিঘি। সেটি এক বিরাট প্রাচীন জলাশয়।

বগুড়া জেলার অন্যান্য প্রাচীন কীর্তি

বগুড়া জেলায় আরও অনেক প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আছে। বগুড়া শহরের পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এবং কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত এ সমস্ত স্থানে প্রায় শতাধিক প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আছে বলে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের জরিপ কার্য থেকে জানা যায়। বগুড়া শহরের দক্ষিণে এ জেলার শেষ সীমা পর্যন্ত করতোয়ার ডান তীরে অসংখ্য ঢিবি এখনও দেখা যায়। শেরপুরের দক্ষিণে পাকা সড়কের উভয় পার্শ্বে বেশ কয়েকটি প্রাচীন ঢিবি দেখা যায়। আদমদিঘি থানার দেওড়া গ্রামে প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ ও অসংখ্য (প্রায় শতাধিক) প্রাচীন দিঘি-পুষ্করিণী আছে। বগুড়া জেলার রায়কালী আর একটি গ্রাম যেখানে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের বহু চিহ্ন আছে। এ গ্রামে ৩০০ টি প্রাচীন জলাশয় আছে। ধুন্দাইল তেমনি একটি প্রাচীন স্থান। এখান কয়েকশ প্রাচীন জলাশয় ও একটি রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ আছে বলে জানা যায়। ভবানীপুর হিন্দুদের একটি পীঠস্থান। এখানে নাটোরের মহারাজা কর্তৃক নির্মিত মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ আছে। কিন্তু এ স্থান আরও প্রাচীন। বহু প্রাচীন দুর্গ ও ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষ এবং জলাশয় এখানে দেখা যায়। শেরপুরের দক্ষিণে অবস্থিত এ স্থানের পার্শ্বদিয়ে এককালে করতোয়া নদী প্রবাহিত হত।

সমগ্র বগুড়া জেলা জুড়ে এত প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আছে যে তা বলে শেষ করা যায় না।

ভীমের জাঙ্গাল

বগুড়া-রংপুর পাকা সড়ক বগুড়া শহরের উত্তর দিকে যেখানে ফুলবাড়ি গ্রামের পূর্ব প্রান্তে সুবিল নদীকে অতিক্রম করেছে, সেখান থেকে কিছু পুর্বদিকে অবস্থিত করতোয়া নদীর পশ্চিম তীর থেকে শুরু হয়ে পশ্চিম দিকে গিয়ে বৃন্দাবনপাড়াকে বেষ্টন করে উত্তর দিকে মোড় নিয়ে লালমাটির তৈরি যে উঁচু কৃত্রিম প্রাচীর বহু উত্তরে চলে গেছে, সেটিকে জনপ্রবাদ মতে 'ভীমের জাঙ্গাল' বলে অভিহিত করা হয়। বৃন্দাবন পাড়া থেকে উত্তর মুখী হয়ে মাটিডালী গ্রাম পর্যন্ত গিয়ে সেখানে থেকে ধরমপুর, চাঁদপুর, বারবকপুর প্রভৃতি গ্রামের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে হাজরাদিঘি গ্রামে অবস্থিত হাজরা দিঘি থেকে প্রায় ৪০০ মিটার পূর্ব দিকে সুবিল নদীর পূর্ব তীরে, তা হঠাৎ করে থেমে গেছে।

এ স্থান থেকে জাঙ্গালটি সুবিলের পূর্বতীর ধরে হাজরা দিঘি, গোকুল মেড়ের পশ্চিমে অবস্থিত রামশহর গ্রাম, মহাস্থান গড়ের পশ্চিমে অবস্থিত পলাশবাড়ি, বামন পাড়া, পলিবাড়ি, ঢলমন প্রভৃতি গ্রামের ভিতর দিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু হাজরা দিঘি থেকে উত্তর দিকে দৌলতপুর পর্যন্ত ৫কিলোমিটার স্থানে জাঙ্গালের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না, কোনো কালে ছিল বলেও ধারণা হয় না।

দৌলতপুর গ্রামের পূর্বপ্রান্ত থেকে জাঙ্গালটি আবার শুরু হয়ে পশ্চিম মুখে গিয়ে উত্তরমুখী গতি ধারণ করে শচীয়ানী গ্রামের ভিতর দিয়ে উত্তরমুখী হয়ে শব্দল দিঘির পশ্চিম দিক দিয়ে অগ্রসর হয়ে বানাইলের নিকট নাগর নদীর তীরে চন্দনী ঘাটে শেষ হয়েছে। নাগর নদীর উত্তর তীর থেকে আবার শুরু হয়ে এটি এগিলা গ্রামের উত্তর পার্শ্ব দিয়ে বরাবর পশ্চিমমুখী গতি ধারণ করে আলেয়ারহাট ও ফেনী গ্রাম অতিক্রম করে কীচক গ্রামে গিয়ে উত্তর মুখে অগ্রসর হয়ে শালদহ পর্যন্ত গিয়েছে। বৃন্দাবন পাড়া থেকে চন্দনী ঘাট পর্যন্ত (মাঝখানে ৫কিলোমিটার ফাঁকা অংশ বাদ দিয়ে) জাঙ্গালাটির দৈর্ঘ ১৩ কিলোমিটার। আর চন্দনীর ঘাট থেকে শালদহ পর্যন্ত বাকি অংশের দৈর্ঘ প্রায় ১৬ কিলোমিটার।

শালদহের পরে বগুড়া জেলা অতিক্রম করে জাঙ্গালটি রংপুর জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার দামোকদহ বিলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে বিরাট নগরের পার্শ্ব দিয়ে গিয়ে দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট পর্যন্ত নাকি বিস্তৃত ছিল। কেউ কেউ বলেন, এ জাঙ্গাল ঘোড়াঘাট অতিক্রম করে করতোয়া নদী পার হয়ে উত্তর ও পূর্ব দিকে কামরূপ পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। আবার কেউ কেউ বলেন যে; এটি ঘোড়াঘাট থেকে উত্তর মুখী হয়ে রংপুর জেলার নীলফামারী জেলায় অবস্থিত ডোমার পর্যন্ত অস্তিত্বশীল ছিল।

অন্য এক মতে ভীমের জাঙ্গালের একটি শাখা বগুড়া শহর অতিক্রম করে করতোয়া নদীর ডান তীর ধরে দক্ষিণে শেরপুর হয়ে আরও দক্ষিণে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ শহর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বর্তমান কালে বৃন্দাবন পাড়া থেকে শালদহ পর্যন্ত (মাঝখানের ৫কিলোমিটার বাদ দিয়ে) জাঙ্গালের অস্তিত্ব দেখা যায়। এর উত্তরে বা বৃন্দাবনপাড়ার দক্ষিণে জাঙ্গালের কোনো অস্তিত্ব চোখে পড়ে না। তবে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তুত মেজর শেরউইলের মানচিত্রে ঘোড়াঘাট অঞ্চলে করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলে একটি জাঙ্গালের

অস্তিত্ব দেখা যায়। কিন্তু বর্তমান কালে সেই জাঙ্গালের কোনো চিহ্ন নেই। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ঘোড়াঘাট থেকে পল্লরাজ, বেলওয়া, রাণীগঞ্জ, প্রভৃতি স্থান হয়ে রঘুনাথপুর পর্যন্ত তা প্রসারিত ছিল।

বর্তমান কালে রংপুর জেলায় একটি জাঙ্গালের কিছু অংশের অস্তিত্ব চোখে পড়ে। বদরগঞ্জ রেলস্টেশনের প্রায় এক মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত শঙ্করপুর গ্রামের পূর্ব প্রান্ত থেকে শুরু হয়ে এই জাঙ্গাল সোজা পূর্বদিকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার পর্যন্ত গিয়ে সদ্যপুষ্করিণী নামক গ্রামে গিয়ে শেষ হয়েছে। সেখান থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত খোরাগাছ-উত্তরপাড়া নামক একটি প্রাচীন স্থান থেকে আবার তা শুরু হয়ে সোজা পূর্বদিকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার গিয়ে খানপুরের উত্তরে দক্ষিণ মুখী হয়ে বলদি পুকুরনামক স্থানে দক্ষিণ-পূর্ব মুখী হয়ে রংপুর শহর থেকে প্রায় ১৭ কিলোমিটার দক্ষিণে সালাইপুর নামক স্থানে রংপুর-বগুড়া মহাসড়ক অতিক্রম করে প্রায় আধ মাইল দূরে তা শেষ হয়েছে। স্থানীয় জনপ্রবাদ মতে এটিও ভীমের জাঙ্গাল নামে পরিচিত। জনপ্রবাদ মতে জানা যায় যে, জাঙ্গালের এই অংশ সোজা পূর্বদিকে উলিপুর গিয়ে সেখান থেকে কামরূপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তবে সেই জাঙ্গালের কোনো চিহ্ন এখন টিকে নেই।

আবার বৃন্দাবন পাড়ার পশ্চিম প্রান্ত থেকে পূর্বপ্রান্তে সমকোণে উত্তর দিকে মোড় নিয়ে করতোয়ার ডান তীর ধরে বগুড়া সাবেক আজিজুল হক কলেজের পুরাতন ইমরতকে পশ্চিমে রেখে উত্তরদিকে বেশ কয়েক মাইল পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

ভীমের জাঙ্গাল ছিল এক বিরাট কীর্তি। বৃন্দাবনপাড়া ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় স্থানে স্থানে এর উচ্চতা ছিল প্রায় ১২ মিটারের কাছাকাছি। ফুলবাড়ি ও বৃন্দাবন পাড়া অঞ্চলে এটি খুবই প্রশস্ত ছিল এবং এর উপরে বহু বাড়িঘর, পাকা ইমারতাদি নির্মিত হয়েছে। এর উত্তর দিকে জাঙ্গালের উচ্চতা খুব বেশি নয়, ৩ থেকে ৪ মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই এলাকায় এর প্রশস্ততাও খুব বেশি নয়। তবে কোথাও এটি ৪.৫০/ ৬ মিটারের কম নয়।

বৃন্দাবনপাড়া থেকে আরম্ভ করে মহাস্থানের দক্ষিণ-পশ্চিম অবস্থিত হাজরা দিঘি পর্যন্ত এলাকায় স্থানে স্থানে জাঙ্গালের পশ্চিম দেয়ালকে কেন্দ্র করে তিন পাশে মাটির দেয়াল নির্মাণ করে বেশ কয়েকটি মাটির দুর্গ নির্মাণ করা হয়েছিল। অনেকগুলি দেয়াল আংশিকভাবে এখনও টিকে আছে। এ সমস্ত দুর্গ সম্পর্কে মিঃ হান্টার বলেন,[১]

"I am led to think that the enclosure was like the ringfort of Italy, a place of temporary refuge not only for the people of neighbouring town but of country round in times of danger."

ভীমের জাঙ্গালের নির্মাতাকে নিয়ে নানা রকম জনপ্রবাদ আছে। একমতে দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন এটি নির্মাণ করেছিলেন। এই ভীম আদৌ ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা, হলেও পুণ্ড্রবর্ধন অধিকার করে সেখানে জাঙ্গাল নির্মাণ করা তাঁর পক্ষে আদৌ প্রয়োজনীয় ছিল কিনা, তা বিচার্য বিষয়। মঙ্গলবাড়ির গরুড় স্তম্ভকে (মঙ্গলবাড়ি স্তম্ভ দ্র.) ভীমের

১. *Statistical Account of Bogra Dist., p. 193—W. W. Hunter.*

পান্টি বলে জনপ্রবাদ মতে আখ্যায়িত করা হয়। এটিও সেই মুখরোচক কাহিনীরই অংশ কিনা, তাও বিচার্য বিষয়।

মীর্যা আরজ ও মুনশি সুরজ নারায়ণ প্রণীত 'তারিখ-ই-বাঙ্গালা' নামক একটি ফারসি গ্রন্থ, 'করতোয়া মহাত্ম্য' নামক একটি সংস্কৃত গ্রন্থ ও অন্যান্য গ্রন্থের বরাত দিয়ে শ্রী প্রভাস চন্দ্র সেন পরশুরাম তথা নরসিংহ নামক ব্যক্তিকে মহাস্থানের শেষ হিন্দু নৃপতি বলে আখ্যায়িত করতে চেয়েছেন 'বগুড়ার ইতিহাস' নামক গ্রন্থে। এঁর পূর্বে ভগীরথ বংশীয় ৩ জন রাজার নাম নাকি ছিল অনঙ্গভীম, গজভীম ও রণভীম। ভীমের জাঙ্গাল এঁদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল, এমন সম্ভাবনার কথাও তিনি তুলেছেন। এটিও একটি কাল্পনিক ব্যাপার বলেই মনে হয়। একাদশ শতাব্দীর কৈবর্তরাজ ভীম এ জাঙ্গাল নির্মাণ করেছিলেন, এ রকম জনপ্রবাদও শোনা যায়। অনেক পণ্ডিতকে এ প্রস্তাব মেনে নিতে বেশ আগ্রহীও দেখা যায়। এর পিছনে কতটুকু যুক্তি আছে, তাও বিচার্য বিষয়।

ভীমের জাঙ্গালের যে বর্ণনা উপরে দেওয়া হয়েছে, তাতে সহজেই বোঝা যায় যে, দক্ষিণে বৃন্দাবনপাড়া থেকে আরম্ভ করে মহাস্থানের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত হাজরা দিঘি পর্যন্ত সমগ্র স্থানে জাঙ্গালটিকে সর্বাপেক্ষা মজবুত করে নির্মিত হয়েছিল। জাঙ্গালকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি মাটির দুর্গও এখানে নির্মিত হয়েছিল। জাঙ্গালের পশ্চিম পাশ ঘেঁষে ছিল গভীর ও প্রশস্ত পরিখা (সুবিল নদী)। এর পশ্চিমে ছিল কালিদহ বিল এবং পূর্ব দিকে ছিল সুবিশাল করতোয়া নদী।

এই বিশেষ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কারণ হিসাবে এখানে কোনো প্রশাসনিক কেন্দ্র বা সেনানিবাসের অস্তিত্বের কথা অনুমান করা যেতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে বহু যুগের জনবসতির চাপে এসব স্থানে তেমন উল্লেখযোগ্য প্রত্নকীর্তির চিহ্ন পাওয়া যায় না। তাই প্রশাসনিক কেন্দ্রের অস্তিত্বের কথা প্রমাণ করা খুবই কঠিন। তবে প্রশাসনিক কেন্দ্রের কথা বাদ দিলেও এখানে যে সেনানিবাস ছিল, তাতে বোধ হয় সন্দেহ নেই। এবং বিশেষ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবেই যে জাঙ্গালটি এখানে নির্মিত হয়েছিল, সে অনুমান যুক্তিসহ বলে মনে হয়।

হাজরা দিঘির পরে দৌলতপুর পর্যন্ত ৫ কিলোমিটার স্থানে জাঙ্গালের অস্তিত্ব নেই, কোনো কালে ছিল বলেও মনে হয় না। মহাস্থান গড়ের পশ্চিম দিকে অবস্থিত এ স্থানে কালীদহ বিল ও সুবিল নদী। এ দুটি স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পরে এখানে জাঙ্গাল তৈরির প্রয়োজনীয়তার কথা বোধ হয় নির্মাতারা মনে করেন নি।-

দৌলতপুরে জাঙ্গালটি সোজা উত্তর-দক্ষিণ মুখী নয়। কালীদহ বিলের কিছু পশ্চিমে অবস্থিত শ্যামপুর গ্রাম থেকে শুরু হয়ে তা প্রায় ১ কিলোমিটার পশ্চিম দিকে গিয়ে তার পর উত্তরমুখী হয়েছে। এখানে এটি যে একটি উঁচু রাস্তা এবং কোন প্রতিরক্ষামূলক প্রাচীর নয়, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

প্রাচীন কালে এ ধরনের উঁচু রাস্তা নির্মাণ করার বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। জাঙ্গাল শব্দের অর্থও উঁচু রাস্তা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থামূলক অর্থে তা ব্যবহৃত নয়। আর এ জাঙ্গালের অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরবর্তী ভূমিতে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে এটি নির্মিত হলে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল পশ্চিম দিক থেকে, পূর্ব ও পূর্ব-উত্তর দিকে অবস্থিত কামরূপ রাজ্য থেকে নয়। সেক্ষেত্রে এ স্থান কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল,

পুণ্ড্র রাজ্যের অধীনে নয়, এমন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়। অথচ এ স্থান যে সর্বসময়েই পুণ্ড্র-গৌড় রাজ্যের অধীনে ছিল এবং কামরূপের অধীনে যে ছিল না, এ সম্পর্কে প্রমাণের অভাব নেই। এ সমস্ত কারণে জাঙ্গালটির উত্তরাংশকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে কিছুতেই ধরা যায় না।

এ দেশের প্রাচীন কীর্তিগুলিকে কোনো পৌরাণিক কাহিনী অথবা চাঁদ সদাগরের কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে জড়িত করার বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। দ্বিতীয় পাণ্ডম ভীম যে এ জাঙ্গাল নির্মাণ করেন নি, সে সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উঠেনা। অনঙ্গভীম প্রমুখেরা এখনও ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে পরিচিত নন। কৈবর্তরাজ ভীমের পক্ষে এ জাঙ্গাল নির্মাণ করার কোন প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। তাঁর রাজধানী ছিল খুব সম্ভব গৌড়-পাণ্ডুয়া অঞ্চলে। মহাস্থান গড়ের মতো দুর্ভেদ্য দুর্গ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও পশ্চিম দিক থেকে সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বৃন্দাবন পাড়া অঞ্চলে আরও একটি দুর্গ নির্মাণের প্রয়োজন তাঁর ছিল, এ ধারণা অযৌক্তিক বলে মনে হয়। দৌলতপুর থেকে তিনি উত্তর দিকে কামরূপ রাজ্য পর্যন্ত জাঙ্গাল নির্মাণ করেছিলেন, তাও যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচিত হতে পারে না। তাঁর রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ ধরনের রাস্তা করার প্রয়োজন ছিল কিনা এবং স্বল্পকালীন রাজত্বকালে পালদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থেকে তিনি এ ধরনের কাজ করতে পেরেছিলেন কিনা, তা সন্দেহের বিষয়।

এ জাঙ্গাল খুব সম্ভব অতি প্রাচীন কালে নির্মিত হয়েছিল। তখন করতোয়া নদী ছিল খুব সম্ভব বিশালকায়া এবং করতোয়া কর্তৃক সৃষ্ট অসংখ্য নদী-নালা, খালবিল ও নিম্ন ভূমির জন্য এ অঞ্চলের যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল খুব সম্ভব অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। শুধু প্রজাদের নয়, প্রশাসনিক অসুবিধাও যে তাতে বিস্তর পরিমাণে ছিল, তাও সহজেই অনুমেয়। এ সমস্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে খুব সম্ভব প্রাচীন কালে কোনো রাজা এই জাঙ্গাল নির্মাণ করেছিলেন। কামরূপে অভিযান চালনা করার ব্যাপারেও এটি নির্মিত হয়ে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে এটি গুপ্ত আমলে নির্মিত হয়েছিল, এমন ধারণা অযৌক্তিক বলে মনে হয় না। দক্ষিণ দিকে বৃন্দাবন পাড়ায় অবস্থিত দুর্গগুলি কবে নির্মিত হয়েছিল, তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। তবে এগুলি মহাস্থান গড়ের আগেই নির্মিত হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে। মহাস্থান গড়ের পরে এগুলি নির্মাণের কোনো প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না।

য়ুয়ান-চোয়াঙ এ জাঙ্গালের কথা উল্লেখ করেননি। তিনি পুণ্ড্রবর্ধন সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন, তা খুব বিস্তারিত নয়। তাঁর বিবরণে উল্লেখ নেই বলে তখন এ জাঙ্গালের অস্তিত্ব ছিল না, এমন ধারণা যুক্তিসহ বলে মনে হয় না।

মুসলিম আমল

যোগীর ভবন

বগুড়া শহর থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে এবং মহাস্থান গড় থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত যোগীর বা যুগীরভবন নামক স্থান নাথ সম্প্রদায়ের

পবিত্র তীর্থভূমি। প্রায় ২৬ একর ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল এই ধর্মকেন্দ্র। বর্তমানে অতি সামান্য জমি নিয়েই এই প্রতিষ্ঠানটি প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় টিকে আছে।

এখানকার মন্দিরগুলি দু'ভাগে বিভক্ত। পশ্চিম ভাগে একটি প্রাচীর বেষ্টিত স্থান আছে। প্রায় বর্গাকারে নির্মিত এ স্থানের আয়তন প্রায় ৩০.৩ মিটার × ৩০.৩ মিটার। দক্ষিণ দিকে প্রধান ফটক। ফটকের দু'ধারে দুটি পাকা কক্ষ ছিল। খুব সম্ভব প্রহরীদের জন্য নির্মিত। এখন কক্ষ দুটি প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে।

দক্ষিণের তোরণ দিয়ে ঢুকলে বাম দিকে পড়ে একটি জীর্ণ ইমারত। ইমারতটি আকারে ছোট। নাম ধর্মডুঙ্গি। মন্দির গাত্রে ইটের উপর উৎকীর্ণ আছে, 'সর্ব্বসিদ্ধ সন ১১৪৮ (১৭৪১ খ্রিঃ) শ্রীসুফলা' কথা ক'টি। ধর্মডুঙ্গির উত্তর দিকে আছে অপেক্ষাকৃত বড় একটি ইমারত। এটিকে 'গাদিঘর' বলা হয়। এই ইমারতটি খুব প্রাচীন। এর ছাদ নষ্ট হয়ে গেলে এর উপর টিনের চাল দেওয়া হয়েছে। এখানে অষ্টপ্রহর আগুন জ্বালিয়ে রাখা হত। প্রাচীর বেষ্টিত এ স্থানকে মঠ বলা হত।

এ স্থানের পূর্ব দেয়ালের উত্তর প্রান্তে ঘেঁষে আছে একটি ছোট দরজা। এই দরজা দিয়ে পূর্ব দিকের চত্বরে যেতে হয়। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ও প্রায় ৬০.৬ মিটার × ৩০.৩ মিটার আয়তন বিশিষ্ট এই অঙ্গনটির চারদিকে অনুচ্চ দেয়াল আছে। পূর্ব দেয়ালের দক্ষিণ ভাগে আছে একটি দরজা। সেই দরজা দিয়ে লাগোয়া পূর্ব দিকে অবস্থিত যোগীর ভবন হাটে যাওয়া যায়।

এই অঙ্গনে ৪টি মন্দির আছে। উত্তর দিকে আছে ২টি মন্দির, সর্বমঙ্গলা ও দুর্গা মন্দির। দুর্গা মন্দিরের লাগোয়া পূর্ব-উত্তর কোণে আছে একটি কুয়া। আগে জিয়তকুণ্ড নামে পরিচিত ছিল। এখন লোকে বলে কাঁনস কুয়া (শিঙ্গি মাছের কুয়া)। পূর্ব দেয়ালের কাছে মাঝামাঝি স্থানে আছে গোরক্ষনাথের মন্দির। দক্ষিণ দেয়ালের কাছে আছে কাল ভৈরবীর মন্দির।

সর্বমঙ্গলা মন্দিরে ৩টি হরগৌরী মূর্তি, ১টি মহিষমর্দিনী মূর্তি, অষ্টমাতৃকা মূর্তি সংবলিত একটি প্রস্তরের ভগ্নাংশ, তিন মুখ বিশিষ্টা ১টি নারী মূর্তির ভগ্নাংশ ও বীণা বাদনরতা চতুর্ভুজা ১টি সরস্বতী মূর্তি আছে। শেষোক্ত সরস্বতী মূর্তি এখানে সর্বমঙ্গলা মূর্তিরূপে পূজিত হত। এ মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের উপরে যে লিপি আছে তাতে '১০৮৯ (১৬৮১ খ্রিঃ) মেহের নাথ সাদক শ্রী অভরাম মেহেতের' শব্দ ক'টি উৎকীর্ণ আছে।

দুর্গা মন্দিরে ১টি প্রস্তর নির্মিত চামুণ্ডা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এবং কাল ভৈরবী মন্দিরে ১টি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। কাল ভৈরবী মন্দির গাত্রে যে লিপি আছে তাতে 'শ্রীরাম সিদ্ধ সন ১১৭৩ (১৭৬৬ খ্রিঃ) সাল আমলে শ্রী জয়নাথ নর-নারায়ণ।' কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে।

গোরক্ষনাথের মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ আছে। মন্দিরের অতি কাছে ইষ্টক নির্মিত ৩টি সমাধি আছে। এগুলি খুব সম্ভব নাথ সিদ্ধা বা মহন্তদের সমাধি।

যোগীর ভবনের চারদিকে অসংখ্য প্রাচীন জলাশয়ের অস্তিত্ব দেখা যায়। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত জলাশয়ের সংখ্যাই ছিল খুব বেশি। এগুলির মধ্যে ফুল দিঘি ও দধিয়া দিঘি ছিল বিরাট আয়তনের। এ দুটির চেয়েও আকারে বড় ছিল প্রায়

আধ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে শালবান রাজার বাড়ি বলে কথিত একটি ঢিবির লাগোয়া পশ্চিমে অবস্থিত মশান দিঘি। এখানকার অধিকাংশ জলাশয় এখন প্রায় মজে গেছে।

বর্তমান কালে যোগীর ভবনের যে অবস্থা, তার সঙ্গে যে আগের অবস্থার মিল নেই, তা বলাই বাহুল্য। 'বগুড়ার ইতিহাস' নামক গ্রন্থে বাবু প্রভাস চন্দ্র সেন ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে এ স্থান সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ :

"উক্ত গ্রামে যে মঠবাড়ি আছে তাহা প্রায় ৮০ বিঘা জমির উপর স্থাপিত এবং চর্তুদিকে প্রাচীর বেষ্টিত। দক্ষিণ ধারের প্রাচীর গাত্রে খোদিত ইষ্টক গ্রথিত প্রকাণ্ড তোরণ বর্তমান। বাহির হইতে এই স্থানটি কোন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রাচীর বেষ্টনীর অভ্যন্তর ভাগে দক্ষিণ-পশ্চিম ধারে ধর্মডুঙ্গী বা ধর্মরাজার গাদী। এবং তদুত্তরে ধর্মের গাদীঘর নামক ভগ্ন মন্দির। প্রাচীরের বহির্ভাগে পূর্বধারে যথাক্রমে কাল ভৈরবের মন্দির, দুর্গা মন্দির ও সর্বমঙ্গলার মন্দির অবস্থিত তন্মধ্যে প্রথম দুইটি দক্ষিণ দ্বারী ও অপরটি পূর্বদ্বারী। এতদ্ব্যতীত গোরক্ষনাথের একটি মন্দির আছে।

"ধর্মডুঙ্গী মন্দিরে জন্মাষ্টমীর সময়ে উৎসব হইয়া থাকে। এই স্থানে ধর্মরাজ দেবগণ পরিবৃত হইয়া বিহার করিয়া থাকেন। এই মন্দিরে এই প্রকার একটি ইষ্টক লিপি আছে যথা 'সর্বসিদ্ধি সন ১১৪৮ শ্রীসুফল..' ইহা যে একটি বৌদ্ধ নিদর্শন তাহা স্পষ্ট অনুমিত হয়।

"গাদীঘর নামক মন্দিরটি ইষ্টক নির্মিত ছিল; ভূমিকম্পে ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় তদুপরি টিনের চালা স্থাপিত হইয়াছে। এই মন্দিরের মধ্যে একটি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত দৃষ্ট হয়। ইহা কখনও নির্বাপিত হয় না। এই মন্দিরটি কত প্রাচীন তাহা কেহ বলিতে পারেনা; অনুমান করাও দুরূহ।

"কাল ভৈরবের মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ আছেন। ঐ লিঙ্গটির পৃষ্ঠদেশে একটি পাষাণ পরিদৃষ্ট হয়। এই মন্দিরেও বঙ্গাক্ষরে এই প্রকার ইষ্টকলিপি আছে যথা—'শ্রীরাম সিদ্ধ সন ১১৭৩ সাল আমলে শ্রীজয়নাথ নরনারায়ণ ...।' সর্বমঙ্গলার মন্দিরে এইরূপ ইষ্টকলিপি পরিদৃষ্ট হয় যথা—'১০৮৯ মেহের নাথ সাদক শ্রী অভিরাম মেহেতর'। এই মন্দিরে তিনটি হরগৌরী, একখানি মহিষ মর্দিনী, একখানি পঞ্চশক্তি, একখানি ত্রিমুখ ভগ্নস্ত্রী ও একখানি চতুর্ভুজা বীণাবাদনরতা স্ত্রীমূর্তি আছে। শেষোক্ত মূর্তিটি সাধারণত সর্বমঙ্গলা নামে পরিচিতা।

"গোরক্ষনাথের মন্দিরের উত্তরে পূর্বোত্তর কোণে তিনটি ইষ্টক নির্মিত সমাধি আছে। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎটি গুরুর, দ্বিতীয়টি শিষ্যের ও তৃতীয়টি গুরুর কুক্কুরের। মঠবাড়ির উত্তরে মঠদহ ও পূর্বদিকে সিদ্ধপুকুর নামক পুষ্করিণী। মঠ দহের দক্ষিণ ও সর্বমঙ্গলা মন্দিরের উত্তরে ইষ্টক গ্রথিত 'জীয়ৎকুণ্ড'। দক্ষিণে সদর দরজার সম্মুখে শূরী পুকুর, তদ্দক্ষিণে ফুলদীঘি। শূরী পুকুরের প্রায় সম পশ্চিমে কিয়দ্দুরে হামকুড়া পুকুর। ফুলদীঘির সম পশ্চিমে দধিসরোবর। পশ্চিম-দক্ষিণে কালিকা পুকুর, কালিকা পুকুরের দক্ষিণে পোড়াদীঘি। পোড়া-দীঘির পশ্চিমে শালবান রাজার ধ্বংসস্তূপ, তৎপশ্চিমে মশানের দীঘি। শেষোক্ত দীর্ঘিকা দৈর্ঘ্যে আধ মাইলের ন্যূন নহে, ফুলদীঘি ও

দধিসরোবর তদপেক্ষা কিছু ছোট। দধিসাগরের উত্তর পাহাড়ে 'পদ্ম গুম্ফা'। প্রবাদ এইরূপ যে এই গুম্ফার সুড়ঙ্গ মহাস্থান গড় পর্যন্ত গিয়াছে। সম্ভবত এই গুম্ফার মৎসেন্দ্রনাথ পদ্মপাণি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ইহা একটি বৌদ্ধ নিদর্শন।

"মন্দিরগুলি খুব পুরাতন নহে; পুরাতন উপাদান পরবর্তীকালে নির্মিত বোধ হয়। ধর্মের গাদীঘরটি বহুপুরাতন বলিয়া বোধ হয়। শালবান রাজার বাড়ির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রাজা শ্রীনাথের বাড়ির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। ইঁহাকে বর্ধনকুঠির রাজা শ্রীনাথ বলিয়া অনুমান হয়।

"দিনাজপুর জেলার যোগীঘোপা ও গোরকুই মঠদ্বয় এই যোগীর ভবন মঠের অন্তর্ভুক্ত। শ্রী বালকাই নাথ মহন্ত যোগীর ভবনের বর্তমান সেবাইত। অন্য একটি বৃদ্ধ সন্ন্যাসীও তথায় অবস্থান করেন। ইঁহারা কানফট্ যোগী সম্প্রদায়ভুক্ত ও যোগী গোরক্ষনাথের মতানুবর্তী। ইঁহাদের কানে মোটা মোটা ছিদ্র, তন্মধ্যে গণ্ডার শৃঙ্গের শলাকা প্রবিষ্ট আছে। সমাজভুক্ত হওয়ার সময় ইঁহাদের কর্ণ ... ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইঁহারা গৈরিক বসন ও কৃষ্ণবর্ণ ফিতার পাগড়ী ব্যবহার করেন। নূতন যোগী ৪০ দিন পর্যন্ত একটি গৃহে আবদ্ধ থাকেন, তৎপর বহিষ্কৃত হইয়া পূর্ণ শিষ্যত্ব লাভ করেন। ইঁহারা ময়ূরপাখা নির্মিত পাখা হস্তে ধারণ করেন। ঐ পাখার নাম 'মরছল' ইঁহাদের বিশ্বাস ঐ মরছল হস্তে থাকিলে ভূতপ্রেতাদির কোন উপদ্রবের আশঙ্কা থাকেনা। মৃত্যু হইলে ইঁহাদের শবদেহ স্বগৃহে প্রোথিত করা হয়। বর্তমান সেবাইত কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্তী কর্নাল জেলার আউলওয়া মঠ হইতে আগমন করিয়াছেন। ইঁহার পূর্ববর্তী সেবাইত গণের নাম যথা—শম্ভুনাথ, গোলাপনাথ ও রামনাথ। কে কাহার পরবর্তী তাহা বিশুদ্ধভাবে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

"মাঠের নিমিত্ত ৪৬০ বিঘা জমি দেবোত্তর আছে। তন্মধ্যে ৮০ বিঘাতে মঠবাড়ি, ৩০ বিঘা ধান্য জমি খাস দখলে ও অবশিষ্ট ৩৫০ বিঘা জমি ১৫০ টাকা জমায় ইজারা বন্দোবস্ত আছে।

"জন্মাষ্টমী ও শিবরাত্রির সময় এখানে উৎসব হইয়া থাকে। শিবরাত্রির সময় এখানে যে মেলা হয় তাহাতে বহু যাত্রীর সমাগম হয়।"

পাল রাজত্বের অবসানের পূর্বে বৌদ্ধ ধর্মের নানা মতবাদ গড়ে ওঠে। এগুলির মধ্যে সহজযান সম্প্রদায় বেশ প্রাধান্য লাভ করে। এ সহজযান সম্প্রদায়ের সাধনপদ্ধতি ও ধ্যান-ধারণার ক্রমবিবর্তনের ফলে নাথ ধর্মের সৃষ্টি হয়। সহজযান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গুরু নাথদেরও বিশিষ্ট গুরু বলে পূজিত হন। মীননাথ, গোরক্ষনাথ, কানুফা প্রমুখ গুরুগণ উভয় সম্প্রদায়েরই বিশিষ্ট গুরু। বর্মণ-সেন আমলে নানা কারণে বাঙলার উত্তরাঞ্চল থেকে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হলেও নাথধর্ম টিকে থাকে।[১] পরবর্তীকালে মুসলিম আমলে এ ধর্মের প্রভাবে কোন ভাটা পড়েনি। প্রকৃতপক্ষে পঞ্চদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কে নাথধর্মের একটি গৌরবময় যুগ বলা হয়।

ধর্মের গাদীঘর ছাড়া যোগীর ভবনের বাকি মন্দিরগুলি এ যুগেই নির্মিত হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। গাদীঘর খুব সম্ভব প্রাক-মুসলিম আমলের একটি ইমারতের

---

১. এ সম্পর্কে গ্রন্থকার সম্পাদিত 'গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস' গ্রন্থে নাথধর্ম শীর্ষক প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

ধ্বংসাবশেষ। বাকি ইমারতগুলি প্রাক-মুসলিম আমলের উপকরণ দ্বারা নূতন করে নির্মিত হয়েছে। আদিতে এখানে যে সহজযানী বৌদ্ধদের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল, তাতে বোধ হয় কোনো সন্দেহ নেই। তাদের অনুবর্তী নাথেরা সেই ঐতিহ্যকে রক্ষা করা চলেছেন যুগ যুগ ধরে।

যোগীর ভবন ছাড়াও উত্তরবঙ্গে নাথধর্মের আরও ২টি বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। এ দুটি হচ্ছে রাজশাহী জেলার 'যোগীর ঘোপা' (পরে যোগীর ঘোপা দ্র.) ও ঠাকুরগাঁও জেলার গোরকুই (গোরকুই দ্র.)। এ তিনটির কেন্দ্রস্থল ছিল খুব সম্ভব যোগীর ভবন।

শেরপুর

বগুড়া শহর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দক্ষিণে মৃতপ্রায় করতোয়া নদীর পশ্চিমে অবস্থিত শেরপুর শহরের প্রাক-মুসলিম আমলের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। জনপ্রবাদ মতে প্রাচীন কালে এখানে সোনাপুর নামে একটি নগর ছিল বলে জানা যায়। সম্রাট শের শাহ্র আমলে নাকি এখানে সেই পুরাতন শহরের ধ্বংসাবশেষের উপর একটি নতুন শহর প্রতিষ্ঠিত হয়।

শেরপুর অঞ্চলে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ছোট বড় অনেক প্রাচীন জলাশয়ের চিহ্ন দেখা যায়। এখানে মুসলিম আমলে প্রতিষ্ঠিত কীতিগুলির মধ্যে প্রাক-মুসলিম যুগের মন্দিরাদিতে ব্যবহৃত অনেক পাথরের পূনর্ব্যবহার দেখা যায়। খেরুয়া মসজিদের প্রথম শিলালিপিতে যে একটি মূর্তি উৎকীর্ণ ছিল, তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। এ শিলালিপির পিছনের দিকে একটি বুদ্ধ মূর্তির চিহ্ন আছে বলে 'বগুড়ার ইতিকথা' গ্রন্থে (১১১ পৃ.) জনাব কাজী মেছের উল্লেখ করেছেন। শাহ্ বন্দেগীর কবরের শিয়রে 'আসা' বলে পরিচত যে বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডটি মেঝেতে পড়ে আছে, তা যে কোনো মন্দির বা স্তূপের খিলান বা স্তম্ভ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ সমস্ত পাথর খুব সম্ভব স্থানীয় কোনো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগৃহীত হয়ে মুসলিম আমলে ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রাচীন জলাশয়গুলির অস্তিত্বও এ ধারণার পিছনে সমর্থন যোগায়। খুব সম্ভব প্রাচীন বৌদ্ধ-হিন্দু যুগে এখানে সমৃদ্ধিশালী জনপদের অস্তিত্ব ছিল। সম্রাট শের শাহ্ নিজে এ নগরী স্থাপন করেছিলেন, না তাঁর কোন কর্মকর্তা তাঁর নামে একটি শহর পত্তন করেছিলেন, সে সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। বাঙলার পূর্বাঞ্চলে অভিযান চালানর জন্য খুব সম্ভব এস্থানই ছিল খুব সুবিধাজনক এবং সেজন্যই এখানে একটি শহর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

মোঘল আমলে এ স্থানকে ' শেরপুর মুরচা' বলা হত। 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবর নামা' উভয় গ্রন্থেই এ স্থানের নাম শেরপুর মুরচা। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত শেরপুর থেকে এ স্থানকে আলাদাভাবে পরিচিত করার উদ্দেশ্যেই খুব-সম্ভব 'মুরচা' নাম সংযুক্ত করা হয়েছিল। মুরচা নাম যোগ করার আরও একটি কারণ ছিল। রাজা মানসিংহ যখন বাঙলার সুবাহ্দার তখন তিনি শেরপুরে একটি দুর্গ নির্মাণ করে শাহ্জাদা সেলিমের (পরে জাহাঙ্গীর বাদশাহ্) নামানুসারে দুর্গের নাম রাখেন 'সেলিম গড়'। ফারসি 'মুরচা' শব্দের অর্থ দুর্গ বা গড়।

রাজা মানসিংহ কর্তৃক নির্মিত দুর্গের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। করতোয়ার তীরবর্তী অঞ্চলে যেখানে এ দুর্গ অবস্থিত ছিল বলে বলা হয়, সেখানকার অধিকাংশ ভূমি কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সেখানে দুর্গের কোনো চিহ্নও নেই। কিছুকাল আগে এ স্থান যখন জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, তখন এখানে-ওখানে ইটের ভগ্নাংশ পাওয়া যেত বলে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানকারীরা বলে গেছেন। কিন্তু দুর্গের অস্তিত্ব দেখেছেন, একথা কেউ বলেননি। খুব সম্ভব এটি ছিল সাময়িক উদ্দেশ্যে নির্মিত মাটির প্রাচীর ঘেরা একটি দুর্গ।

খেরুয়া মসজিদ

সঠিক তারিখ সংবলিত শেরপুরে মুসলিম আমলের সবচেয়ে প্রাচীন কীর্তি এটি। এ মসজিদের 'খেরুয়া' নামের কোনো ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়নি। আরবী বা ফার্সী ভাষায় খেরুয়া বলে কোনো শব্দ দেখা যায় না। তবে ফার্সী ভাষায় 'খায়ের গাহ্' (The interior of a house) বলে একটি শব্দ 'কোনো স্থানের অভ্যন্তরে' অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এ মসজিদ যদি শেরপুর দুর্গের অভ্যন্তরে নির্মিত হয়ে থাকে তবে 'খয়ের গাহ্' থেকে খেরুয়া নাম হওয়া বিচিত্র নয়।

১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে জওহর আলী কাকশালের পুত্র মীর্জা মুরাদ খান কর্তৃক এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল বলে মসজিদের শিলালিপিতে উল্লেখ আছে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ মসজিদের আয়তন (বাইরের দিকে) ১৭.২৭ মিটার × ৭.৪২ মিটার। দেয়ালগুলি ১.৮১ মিটার প্রশস্ত। পূর্ব দেয়ালে আছে ৩টি প্রবেশপথ। কেন্দ্রীয় দরজার দু'পাশে দুটি শিলালিপি ছিল। প্রবেশ পথে কোনো চৌকাঠের চিহ্ন নেই বলে ধারণা হয় যে, সেখানে দরজার কোনো পাল্লা ছিল না। উত্তর ও দক্ষিণ প্রাচীরের কেন্দ্রস্থলে আছে একটি করে ছোট প্রবেশপথ। পূর্ব দেয়ালের প্রবেশ পথগুলির বরাবর পশ্চিম দেয়ালের ভিতরে ছিল ৩টি মিহরাব। অতি সুন্দরভাবে কারুকার্য করা কেন্দ্রীয় মিহরাব অপেক্ষাকৃত বড়। মিহরাবের পিছনে পশ্চিম দেয়ালের বেশ কিছু অংশ জুড়ে উদগত। উপরে আছে আছে ৩টি সুন্দর গম্বুজ। গম্বুজগুলি বেশ বড়। মসজিদের চারকোণে ৪টি অষ্টকোণাকৃতির মিনার বা টারেট আছে। মসজিদের গম্বুজের ব্যাস ৩.৭১ মিটার। সুলতানী আমলের স্থাপত্য শিল্পের অনুকরণে নির্মিত হলেও মসজিদের বাইরের দেয়ালে পোড়ামাটির কোন চিত্রফলক নেই।

শিলালিপি দুটি থেকে জানা যায় যে, মসজিদের নির্মাণ কার্য ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়। এ মসজিদের নির্মাণ কার্য শেষ করতে আরও কয়েক বছর সময় লেগেছিল বলে ধারণা করা যায়। ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ হয়, তাতে বিহার ও বাঙলা সাময়িকভাবে সম্রাটের হস্তচ্যুত হয়। সে সময়ে কাকশাল উপাধিধারী তুর্কী জায়গীরদারগণের অধীনে ছিল ঘোড়াঘাট অঞ্চল। তাঁরাও বিদ্রোহী হয়ে মাসুম খান কাবুলীর সাথে যোগদান করেন। ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে খান-ই-আ'যম বাঙলার সুবাদার নিযুক্ত হয়ে নানারকম প্রলোভনে ভুলিয়ে কাকশাল নেতাদের বশীভূত করেন। এতে বিদ্রোহী মাসুম খান কাবুলী কাকশালদের উপর প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে তাঁদের

আবাসস্থল ঘোড়াঘাট আক্রমণ ও অবরোধ করেন। খান-ই-আ'যম ৪০০০ অশ্বারোহী সৈন্য পাঠিয়ে কাকশালদের বিপদমুক্ত করেন।

এতে দেখা যায়, ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে মসজিদের কাজ আরম্ভ হবার সময় মসজিদ নির্মাতা নওয়াব মীর্যা মুরাদ খান বিদ্রোহীদের দলভুক্ত ছিলেন। পরবর্তী বছরে অন্যান্য কাকশাল নেতার সঙ্গে তিনিও খুব সম্ভব সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করেন। মীর্যা মুরাদ খানের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়নি। তিনি খুব সম্ভব শেরপুর মুরচার জায়গীরদার বা ফৌজদার ছিলেন। এ সময়ে শেরপুর মুরচা ঘোড়াঘাটের অধীনে একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল।

বিবির মসজিদ

খেরুয়া মসজিদ থেকে প্রায় ১ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রাপ্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি মসজিদ দেখা যায়। বর্গাকারে নির্মিত এ মসজিদের প্রত্যেক বাহু (বাইরের দিকে) ছিল ৬.৬ মিটার। পূর্ব দেয়ালে ছিল ১টি মাত্র প্রবেশপথ। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালেও ১টি করে প্রবেশপথ ছিল। মসজিদের চারকোণে অষ্টকোণাকৃতির ৪টি মিনার বা টারেট ছিল। উপরে ছিল একটি মাত্র গম্বুজ। মসজিদে যে শিলালিপি ছিল, তাতে জানা যায় যে, সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ আলী মোতোয়াল্লী কর্তৃক এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। মোঘলদের সময়ে নির্মিত হলেও সুলতানী আমলের স্থাপত্য শিল্পের যথেষ্ট ছাপ মসজিদে ছিল। মসজিদটি এখন প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে।

খোন্দকার টোলার মসজিদ

খেরুয়া মসজিদ থেকে প্রায় ৭০০ মিটার পশ্চিম-উত্তরে ভগ্নপ্রাপ্ত এই বিরাট মসজিদের অস্তিত্ব দেখা যায়। মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপিতে দেখা যায় যে, সম্রাট শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে বাঙলার সুবাদার মোয়ায্‌যম খান কর্তৃক ১০৪২ হিজরী (১৬৩২ খ্রিঃ) সনে শেরপুর রাজ্যে ('বেলাদে') এ মসজিদ নির্মিত হয়।

খেরুয়া ও বিবির মসজিদের স্থাপত্যের কিছু প্রভাব থাকলেও এ মসজিদের মান অনেক উন্নত ধরনের। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এই মসজিদের আয়তন (বাইরের দিক থেকে) ২৩.৬৩ মিটার × ৯.০৯ মিটার, দেয়ালগুলি ১.৮১ মিটার প্রশস্ত। পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে দরজা ছিল। পশ্চিম দেয়ালে ছিল ৩টি মিহরাব। মসজিদের চার কোণে ৪টি অষ্ট কোণাকৃতির বিরাট বিরাট মিনার বা টারেট ছিল। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় দরজার দু'পাশে দুটি ও কেন্দ্রীয় মেহরাবের দু'পাশে বাইরের দিকে দুটি—মোট ৪টি বিরাট বিরাট স্তম্ভ ছিল। পূর্ব দেয়ালে কেন্দ্রীয় দরজার দু'পাশের স্তম্ভ দুটি অতি বিরাট আকারের এবং এ স্তম্ভ দুটিই এ মসজিদের বিশেষত্ব। উপরে ছিল ৩টি বিরাট আকারের গম্বুজ।

মসজিদের গায়ে যে শিলালিপি ছিল, তা থেকে জানা যায় যে, দাউদের পৌত্র ও মিঞা জুবন (অথবা মিঞা জিউ) ইয়াজীদ-এর পুত্র সদর-ই-জাহান মোয়ায্‌যম খান

কর্তৃক ১০৪২ হিজরী (১৬৩২ খ্রিঃ) সনে সম্রাট শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে সুবা-ই-বাঙলায় 'শেরপুর রাজ্যে' (বেলাদে শেরপুর) এই মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। মৌলভী শামস-উদ-দীন বলেন যে, এই মোয়ায্‌যেম খানের প্রকৃত নাম ছিল আ'যম খান মীর মোহাম্মদ বাকির ইবাদত খান এবং তিনি ছিলেন সে সময়ে বাঙলার সুবাদার ও সুলতান শাহ্‌শুজার শ্বশুর।[১] অধ্যাপক আহমদ হাসান দানীর মতেও তিনি তখন বাঙলার সুবাদার ছিলেন।[২]

এই মসজিদ ছিল একটি বিরাট ইমারত। এ রকম মজবুত ও বিরাটভাবে নির্মিত মসজিদ বাঙলার উত্তরাঞ্চলে খুব কমই দেখা যায়। অথচ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মসজিদটি অকালে ধ্বংস হয়ে গেছে। মসজিদের গম্বুজগুলি সব ভেঙ্গে পড়েছে। এর দেয়াল ও অতি বিরাট বিরাট আকারের মিনারগুলির কিছু কিছু অংশ এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

খোন্দকারটোলা নামক স্থানে এই মসজিদ নির্মিত হয়েছিল বলে এটিকে খোন্দকার টোলা মসজিদ বলা হয়ে থাকে।

বন্দেগী শাহ্‌র মাযার ও আশে পাশের কীর্তি

খোন্দকার টোলা মসজিদের কিছু পূর্বদিকে অনুচ্চ প্রাচীর ঘেরা একটি স্থান আছে। স্থানীয় লোকেরা এটিকে কবরস্থান বলে চিহ্নিত করেন। কিন্তু এখানে কোনো পাকা কবরের চিহ্ন এখন আর দেখা যায় না। তবে প্রাচীর বেষ্টিত স্থানের সর্বত্র প্রাচীন ইটের ভগ্নাংশ দেখা যায়। তাতে মনে হয় যে, এখানে মাযার বা পাকা কবরের অস্তিত্ব এককালে ছিল।

এই প্রাচীর বেষ্টিত কবরস্থানের উত্তর দিকে একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন দেখা যায়। খুব সম্ভব এখানে আবাসবাটি ছিল। স্থানীয় লোকেরাও তাই বলেন।

খোন্দকার টোলা মসজিদ থেকে প্রায় ২০০ মিটার পূর্বদিকে রাস্তার উত্তর পাশে বন্দেগী শাহ্‌র মাযার বলে কথিত একটি ইমারত আছে। এই মাযার ইমারতের উপর এত প্রলেপ পড়েছে যে বর্তমানে (১৯৭৯ খ্রিঃ) এটিকে একটি আধুনিক ইমারত বলেই মনে হয়। অত্যন্ত সাদাসিধাভাবে তৈরি এই ইমারতের কোন বিশেষত্ব নেই। খুব সম্ভব মোঘল আমলে এটি নির্মিত হয়েছিল।

মাযারে কোন শিলালিপি নেই। বন্দেগী শাহ্‌র বলে কথিত পাকা কবরটির উত্তর পাশে একটি প্রস্তর খণ্ড মেঝেতে প্রোথিত আছে। এই স্তম্ভটি মাটির নিচে কতখানি আছে তা বলার উপায় নেই। তবে মাটির উপরের অংশ প্রায় .৯ মিটার উঁচু এবং সেখানে এর বেড় প্রায় '১২˝ × ৯˝।' কারুকার্য খচিত এই পাথর কোন প্রাচীন মন্দির বা স্তূপের স্তম্ভ বা চৌকাঠের অংশ ছিল বলে ধারণা হয়। স্থানীয় লোকেরা এটিকে বন্দেগী শাহ্‌র 'আসা' বা হাতের লাঠি বলে থাকে। বন্দেগী শাহ্‌র কবরের পাশের কামরায় আরও ২টি কবর আছে। এ ২টি কবর নাকি তাঁর পুত্র বা পৌত্রের।

১. Inscriptions of Bengal, Vol. IV. p. 276,—Mvi Shamsudding Ahmad.
২. Muslim Architecture in Bengal, p. 178,—Prof. A. H. Dani.

শিরমোকাম ও ধড়মোকাম

খেরুয়া মসজিদ থেকে প্রায় ১.৫ কিলোমিটার পূর্বদিকে করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে একটি বিচিত্র ধরনের ইমারত দেখা যায়। বহুকাল ধরে এটি শির মোকাম নামে পরিচিত হয়ে আসছে। এটি একটি ছোট ইমারত এবং এর নিচের অংশে একটি ভিত্তি বেদী ও উপরের অংশে আছে দরগা ইমারত।

দ্বাদশ কোণাকারে নির্মিত ভিত্তি বেদীটি আকারে মোটেই বড় নয়। কিন্তু প্রায় ১.৮১ মিটারের মত উঁচু। এই বিচিত্র ধরনের ভিত্তি বেদীর উপর নির্মিত হয়েছে ক্ষুদ্র মাযার ইমারত। এই ইমারতের দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব দেয়ালে আছে একটি করে প্রবেশ পথ। এগুলি আকারে বেশ ছোট। প্রবেশ পথের চৌকাঠ পাথরের তৈরি হলেও এগুলিতে এত চুনকাম করা হয়েছে যে, সহজে পাথর বলে চেনা যায় না। ভিতরে আছে একটি ক্ষুদ্র কক্ষ এবং তাতে আছে একটি পাকা কবর। ইমারতের চারকোণে আছে ৪টি মিনার বা টারেট। উপরে আছে ১টি মাত্র গম্বুজ।

এটি তুর্কান শহীদ নামক এক পীরের মাযার বলে জনপ্রবাদ মতে জানা যায়। এ সম্পর্কে 'বগুড়ার ইতিহাস' নামক গ্রন্থে শ্রী প্রভাস চন্দ্র সেন বলেছেন,

"শেরপুর শহরের মধ্যে তুর্কান শহিদের 'শির মোকাম' ও শহরের বাহিরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে কিয়দ্দূরে 'ধড় মোকাম' এই দুইটি দরগা (shrines) পরিদৃষ্ট হয়। মুসলমানেরা এই দরগাদ্বয়কে অত্যন্ত পবিত্র মনে করে। কথিত আছে বল্লাল সেনের সহিত 'তুরকান সহিদের' ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া অবশেষে তুরকান সাহেব যুদ্ধে নিহত হন। তাঁহার শির যে স্থানে নিপতিত হইয়াছিল তথায় শির মোকাম এবং ধড় (দেহ) যেখানে পড়িয়াছিল তথায় ধড় মোকাম নামে দুইটি মসজেদ নির্মিত হইয়াছিল। শির মোকাম নামক মসজেদটি কতগুলি ফকিরের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হইতেছে। এই মসজিদ সংলগ্ন একটি প্রস্তর ফলকে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি নাগরী অক্ষরে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। যথা, 'ভাবয়ন্তি ঠক্কুর শ্রী বামনস্বামী। দানপতি ঠাকুর শ্রীশ্বর স্বামী'। মসজিদটি দক্ষিণ দুয়ারী। অধিক সম্ভব কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দির এই মসজিদে পরিণত হইয়াছে।

"চল্লিশ আউলিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—
অলি আল্লা বাবা আদম শা জালাল আর।
শা তুরকান শা ফরমান সঙ্গে এল তার।"

তুর্কান শহীদ সম্পর্কে 'বগুড়ার ইতিকাহিনী' নামক গ্রন্থে (৩৯১-৯২ পৃ.) কিংবদন্তী-কাহিনীকে ভিত্তি করে জনাব কে, এম, মেছের বলেন.

"শাহ্ তুর্কান শহীদ হইলে তাঁহার কবন্ধ হইতে শিরটি, অর্ধমাইল শূন্য পথে যাইয়া নদীতটে নিপতিত হয়। যে স্থানে শির ভূপতিত হইয়াছে তথায় 'শির মোকাম' ও যেস্থানে ধড়টি (দেহ) নিপাতিত হইয়াছে, তাহা ধড় মোকাম নামে পরিচিত এবং তথায় 'ধড় মোকাম' ও 'শির মোকাম' নামক দুই দরগায় পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে ধড় মোকামের উপর একটি বিরাট অশ্বত্থ বৃক্ষ ও নামাজের আসন এবং কতগুলি পাথর দৃষ্ট হয়। এখানে তথায় বাস্তুহারা কর্তৃক একটি জুম্মা মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 'শির

মোকাম' দরগাটির ভিত্তি প্রায় ২.৩ মিটার ও অষ্ট কোণ বিশিষ্ট—মাদ্রাসা গৃহের সম্মুখে নদীতটে অবস্থিত। উভয় দর্গার ব্যয় নির্বাহার্থে কিছু 'পীরপাল' ভূমির ব্যবস্থা আছে।"

হান্টার সাহেব (W.W. Hunter) এ সম্পর্কে বলেন যে 'তুর্কান সাইদের' ('Turkan Syyed') দরগা গুলিকে বেশ মান্য করা হত। তিনি বল্লাল সেনের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। শির মোকাম ও ধড় মোকামের উপরে উল্লিখিত বর্ণনাই তিনি দিয়েছেন।[১]

শির মোকাম দরগার উপরে যথেষ্ট প্রলেপ পড়েছে। সেকারণে এবং কোনো সঠিক কাল নির্ধারক প্রমাণের অভাবে ইমারতটির সঠিক সময় নির্ধারণ করা সহজ হয়। দক্ষিণ মুখী এই ইমারতটি যে একটি মাযার, তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং সেই মাযার (কবর) যে কোনো মন্দির বা স্তূপের উপর হওয়া সম্ভবপর ছিল না, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। ভিত্তি বেদীটি দ্বাদশ কোণাকারে নির্মিত হলেও এটি যে উপরে প্রতিষ্ঠিত মাযারেরই অংশ বিশেষ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। নাগরী অক্ষরে উৎকীর্ণ শিলালিপিটি দেখে মনে হয় যে, এটি প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের নয়, অনেক পরবর্তী কালের অর্থাৎ মুসলিম আমলের। এটি কোনো মন্দিরের হতে পারে। খুব সম্ভব নিকটবর্তী কোনো ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির থেকে এটি সংগৃহীত হয়ে এই দরগায় লাগান হয়েছিল। প্রভাস বাবু এটিকে 'মসজেদ' বলে অভিহিত করেছেন। আদতে এটি একটি দরগা। ইমারতের গঠন প্রণালী দেখে মনে হয় এটি মোঘল আমলে নির্মিত হয়েছিল।

হান্টার সাহেব কর্তৃক উল্লিখিত বল্লাল সেনকে কেন্দ্র করে তুর্কান শহীদ সম্পর্কে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বল্লাল্‌ সেনের সঙ্গে (১১৫৮-৭৯ খ্রিঃ) যে কোনো মুসলমানের যুদ্ধ হয়নি, তা ইতিহাসই প্রমাণ করে। দ্বিতীয় বল্লাল সেনও কল্পনার সৃষ্টি। অতএব কোনো বল্লাল সেনের সঙ্গেই শাহ্ তুর্কানের যুদ্ধ হয়নি। হান্টার সাহেব শাহ্ তুর্কানকে তুর্কান শহীদ বলেননি, তিনি বলেছেন 'তুর্কান সাইদ'। এই 'সাইদ' শব্দ থেকেই পরবর্তীকালে 'শহীদ' শব্দ উৎপত্তি লাভ করে সমস্ত বিষয়টাকে একটা জগা খিঁচুড়িতে পরিণত করেছে। খুব সম্ভব শাহতুরকান ছিলেন এই অঞ্চলে মুসলিম আমলের একজন ধর্ম প্রচারক।

কেল্লা কুশী বা কেল্লা পোশী ও শাহ্ মাদার

শেরপুরের কেল্লা কুশী বা কেল্লা পোষী নামক স্থানে অনেকগুলি পাকা কবরের অস্তিত্ব ছিল। এগুলির মধ্যে বেশির ভাগই মোঘল আমলের কবর বলে অনুমিত হয়। শাহ্ মাদার ও গাযী উপাধি ধারী বিভিন্ন দরবেশের মাযার বলেও এগুলি বিখ্যাত।

মোঘল আমলে মাদার উপাধিধারী ফকিরদের যথেষ্ট প্রভাব এ অঞ্চলে ছিল। শাহ্ বদি উদ-দীন মাদার (১৩১৫-১৪৩৬ খ্রিঃ) একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে এসব মাদারী পীরদের সম্পর্ক স্থাপন সহজ নয়। উত্তর বঙ্গের অনেক স্থানে মাদার পীর বা শাহ্

১. "The Dargahs or shrines of Turkan Syyed are highly revered. He was a Ghazi slain in battle by the Hindu king Ballal Sen. One shrine is called 'Shir Mokam' where the head fell and the other 'Dhar Mokam' were his body fell."—*Statistical Accounts of Bogra District*, p. 190 , W. W. Hunter.

মাদার খেতাবধারী পীরের নামে বিচিত্র ধরনের মাযার দেখা যায়।[১] এগুলি উত্তরবঙ্গে শাহ্ মাদারের ব্যাপক প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শেরপুর অঞ্চলে শাহ্ মাদারের ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল তাঁরই শিষ্য বলে কথিত গাযী পীর বা গাযী মিঞার বিবাহোৎসব।

কেল্লাকুশীতে শাহ্ মাদারের যে দরগা আছে সেখানে একটি শিলালিপি পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে প্রভাস বাবু 'বগুড়ার ইতিহাস' নামক গ্রন্থে বলেন,

"বগুড়ার ভূতপূর্ব ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্টমেকট সাহেব সা-মাদারের দরগায় একখানি প্রস্তর লিপি প্রাপ্ত হইয়া উহার ছাপ বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ব বিৎ ব্লকম্যান সাহেবকে পাঠাইয়াছিলেন। ব্লকম্যান সাহেব ঐ প্রস্তর লিপি সম্বন্ধে এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে (See Journal of the Asiatic Society of Bengal part 1, No. III 1875) যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

'সেরপুর মুরচার নিকটস্থ মসজেদ বিশেষের জালাল শা নামীয় প্রস্তর লিপি—তারিখ ৯৬০ হিঃ ইং ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে। বগুড়ার অন্তর্গত সেরপুরের ঠিক উত্তরদিকের একটি ক্ষুদ্র মসজেদে ই, ডি, ওয়েষ্টমেকট সি. এস. মহোদয় এই প্রস্তর লিপিটি প্রাপ্ত হইয়া ইহার প্রতিলিপি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার মাপ ১৬´´ × ৯´´। খোদিত লিপিটির উভয় পার্শ্বে দুইটি কারুকার্য আছে। উপরিভাগেরটি একটি মিম্বারের আকৃতি—তাহাতে মুসলমান ধর্মোপদেশ লিখিত আছে। নিম্ন ভাগেরটিতে ইয়া আল্লা (হে ঈশ্বর) লিখিত আছে। ফলকের মধ্যাংশ 'ইয়াফতে' (হে প্রকাশক) এই বাক্যাংশ দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই বাক্যাংশটি চারিবার উল্লিখিত এবং ইয়া শব্দের দীর্ঘ আলেফ অক্ষর দ্বারা চতুর্দিক সীমাবদ্ধ। ..."

কিছুকাল আগে এ শিলালিপিটি প্রকাশিত হয়েছে।[২] মোহাম্মদ শাহ্ গাযীর পুত্র সুলতান গিয়াস উদ-দুনিয়া ওয়াদ-দীন আবুল মোযাফ্ফর জালাল শাহ্র রাজত্বকালে ৯৬০ হিজরী (১৫৫৩ খ্রিঃ) সনে ... দোয়া খান কর্তৃক [এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল]। শিলালিপিতে উল্লিখিত মসজিদের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। খুব সম্ভব শাহ্ মাদারের দরগা বলে কথিত স্থানের নিকটেই ছিল শেরপুর অঞ্চলের এই প্রাচীন মসজিদ।

গড় ফতেহ্পুর

সোনাতলা রেলস্টেশনের কাছাকাছি স্থানে এবং মানস ও বাঙালি নদীদ্বয়ের সংযোগ স্থলে গড় ফতেহপুর নামক একটি দুর্গের (mud-fort) চিহ্ন দেখা যায়। এখানে-ওখানে উঁচু মাটির প্রাচীর ও সংলগ্ন পরিখার কিছু কিছু মজে যাওয়া অংশ ছাড়া গড়ের আর কোনো চিহ্ন বর্তমানে টিকে নেই। তবে এক-কালে যে এখানে একটি বিরাট আকারের দুর্গ ছিল, বর্তমান ধ্বংসাবশেষ দেখে সে সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যায়।

কামরূপরাজ নীলাম্বর এ দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। তাঁর পূর্ব পুরুষ (মতান্তরে পিতামহ) বগুড়া জেলায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং সামান্য অবস্থা

১. গ্রন্থকার সম্পাদিত গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রন্থের চুরানব্বই পুণ্ড্র.।
২. Inscriptions of Bengal, vol. IV, pp. 248-49-MVI Shamsuddin Ahmed.

থেকে কামরূপের অধিপতি হয়েছিলেন বলে জনপ্রবাদমতে জানা যায়। এ সম্পর্কে অথবা গড়টি আদৌ রাজা নীলাম্বরের ছিল কিনা, সে সম্পর্কে কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না। এ গড় যে মুসলিম আমলের, গড়ের ফতেহ্ পুর (বিজয় স্থান) নামই তা প্রমাণ করে। এ সূত্র ধরে এ স্থান অধিকার করার পর সুলতান হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) কর্তৃক এখানে একটি দুর্গ নির্মিত হয়েছিল বলে আর একটি জনপ্রবাদ শোনা যায়। এটা যে নিছক গল্প তাতে সন্দেহ নেই। হোসেন শাহ্র বহু আগে মহাস্থান অঞ্চল মুসলমানের অধিকারে এসেছিল এবং যুগ যুগ ধরে এ অঞ্চলে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল মোহাম্মদ বখতিয়ারের পরে থেকেই এবং এরপরে বগুড়া অঞ্চল মুসলিম অধিকারের বাইরে যায়নি। সেক্ষেত্রে হোসেন শাহ্ কর্তৃক এ স্থান অধিকার করার কোনো প্রশ্নই উঠে না। প্রথম মুসলিম অধিকারের পরপরই খুব সম্ভব বঙ্গ ও কামরূপ অঞ্চলে অভিযান চালানোর সুবিধার্থে এখানে একটি দুর্গ নির্মিত হয়েছিল।

গড় দুর্গাহাটা

বগুড়া শহর থেকে প্রায় ৬ মাইল পূর্বদিকে দুর্গাহাটা নামক একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। স্থানে স্থানে মাটির প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ ও মজে যাওয়া পরিখার চিহ্ন ছাড়া দুর্গের আর কিছুই বর্তমানে অবশিষ্ট নেই। এ দুর্গ খুব সম্ভব মুসলিম আমলের আগে নির্মিত হয়েছিল এবং মুসলিম আমলে এখানে খুব সম্ভব একটি সেনানিবাস ছিল। রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায় যে, গৌড় থেকে জামালগঞ্জ, ক্ষেতলাল ও শিবগঞ্জ হয়ে একটি রাস্তা গড় ফতেহপুর ও দুর্গাহাটা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এতে মনে হয় যে, মুসলিম আমলে এ দুর্গ দুটির বেশ প্রাধান্য ছিল।

আলিয়ার হাট মসজিদ

শিবগঞ্জ থানার অধীনে গাংলই নামক একটি ছোট নদীর তীরে আলিয়ার হাট অবস্থিত। এখানে মোঘল আমলের একটি মসজিদ আছে। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এই ছোট মসজিদের উপরে ৩টি সুন্দর গম্বুজ আছে। পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে পত্রাকারে নির্মিত খিলান বিশিষ্ট প্রবেশপথ আছে। পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি মিহরাব।

মসজিদের গায়ে একটি শিলালিপি আছে। ফারসি ভাষায় লিপিকৃত এ লিপির পাঠোদ্ধার করা যায়নি বলে কাজী মোহাম্মদ মেছের 'বগুড়ার ইতিকাহিনী' নামক গ্রন্থে (৬৩ পৃ.) উল্লেখ করেছেন।

বেড়ুঞ্জের প্রাচীন কীর্তি

দুপ চাঁচিয়া থানার অধীনে বেড়ুঞ্জ গ্রামে মুসলিম আমলের কয়েকটি বড় বড় ইমারত ও একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ ও বেশ কয়েকটি প্রাচীন জলাশয় অবস্থিত থেকে এ স্থানের প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করছে। কাজী মেছের 'বগুড়ার ইতিকাহিনী' গ্রন্থে (৮০-৮৩ পৃ.) এ স্থানের যে বর্ণনা দিয়াছেন তা নিম্নরূপ :

"সৈয়দ হোসেন আলী সাহেবের রাজ প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টে মনে হয়, ইহা দুই একর জমির উপর বৃত্তাকারে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই রাজপ্রাসাদের সম্মুখে এবং পার্শ্বে আরও কয়েকটি বৃহৎ অট্টালিকা এবং ইহার মধ্যভাগে একটি সুপ্রশস্ত আঙ্গিনা ছিল। আঙ্গিনার চারিদিকের প্রাসাদগুলির চারিধার কারুকার্য খচিত বড় বড় থাম দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এই সুরম্য প্রাসাদগুলিতে শিল্পকার্য সু-শোভিত চত্বর, থাম, অলিন্দ, স্তরে স্তরে তোরণ ও প্রাচীর ছিল। এই রাজবাটীর প্রাচীরের ভিতরে, পূর্বধারে ২টি এবং পশ্চিম ধারে একটি পুষ্করিণী আজো বিদ্যমান থাকিয়া, অতীতের স্মৃতি বহন করিয়া বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। এই পুষ্করিণী কয়েকটির চারিধারে দশ বার গজ চওড়া ইষ্টক নির্মিত সিঁড়ি। এই শাহী প্রসাদের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য, নানা-রূপ কারুকার্য্যে সজ্জিত একটি বৃহৎ ফটক ছিল বলিয়া মনে হয়। প্রাসাদের চারিপার্শ্বে সুপ্রশস্ত একটি পরীখার চিহ্ন বিশেষ আজও বর্তমান আছে। আবার, এই পরীখার চারিপার্শ্বে স্থানে স্থানে যে কয়েকটি ছোট ছোট বৃত্তাকারের দালানের চিহ্ন দেখা যায়, সম্ভবত ঐ সমস্ত দালানে পাহারারত সৈন্য-সামন্ত থাকিতেন। প্রাসাদের আশে পাশে যে কয়েকটি দালানের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, ইহার মধ্যে একটি পরিখার দক্ষিণ তীরে একটি প্রাচীন মসজিদ বিদ্যমান, ইহার কারুকার্য্য অপরূপ।

"আবার ইহাতে যে সমস্ত কারুকার্য্য রহিয়াছে, তাহা অধিকাংশই ইষ্টকের কাঁচা অবস্থায় খোদাই করা বলিয়া মনে হয়,..। এই মসজিদ তিনটি গম্বুজ বিশিষ্ট ছিল। এক্ষণে একটি গম্বুজ বর্তমান; অবশিষ্ট ২টি ১২৮০ সালের ভূমিকম্পে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। উক্ত মসজিদের পার্শ্বে বড় একটি পুষ্করিণী আছে। ইহার বেড় প্রায় ৭/৮ একরের কম নহে। চারিধারে সম্ভবত পাকা ইট দ্বারা তল হইতে বাঁধা ছিল।

"এই রাজবাটীর পশ্চিম পার্শ্বে প্রথম পরিখার পর কতগুলি ইষ্টক নির্মিত সমাধী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পশ্চিমে আরোও দুইটি সমাধী জাঁকাল অবস্থায় বিদ্যমান আছে। কথিত হয় যে, সৈয়দ হোসেন আলী এবং তাঁহার পত্নীর মৃত্যুর পর তাঁহাদিগকে পাশাপাশি সমাহিত করা হয়। সম্ভবত এই শেষোক্ত সমাধী দুইটিই তাঁহাদের সমাধী।"

কাজী মেছেরের মতে সৈয়দ হোসেন আলী ছিলেন একজন আরব দেশীয় ধর্মপ্রচারক এবং তিনি এখানে একটি স্বাধীন সামন্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন সম্ভবত খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। ইতিহাসে অবশ্য এ রকম কোন রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা বা দরবেশের পরিচয় পাওয়া যায় না।

শালদহ-শোলাগাড়ী মসজিদ ও মাযার

শিবগঞ্জ থানার কীচক ইউনিয়নের অন্তর্গত শালদহ-শোলাগাড়ী মৌজায় লশকর সাহেবের মাযার ও মসজিদ আছে। মসজিদটির ধ্বংসাবশেষ এখন বিদ্যমান। এই মসজিদ খুব সম্ভব মোঘল আমলে নির্মিত হয়েছিল।

শালদহে একটি বিরাট দিঘি আছে। পুকুরে কুনীর আছে বলে লোকের বিশ্বাস। জনাব কাজী মেছের "বগুড়ার ইতিকাহিনী" নামক গ্রন্থে (৬৫ পৃ.) এ তথ্য পরিবেশন করেছেন। ধারে কাছে আরও অনেক প্রাচীন জলাশয় আছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

জয়পুরহাট জেলা

বৌদ্ধ -হিন্দু যুগ

পাথরঘাটা

মহাস্থান থেকে প্রায় ৭২ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ও জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি থানা থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বদিকে পাঁচবিবি-ঘোড়াঘাট রাস্তার দক্ষিণে অবস্থিত প্রায় ১০ বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষে পূর্ণ একটি প্রাচীন স্থান আছে। পাঁচবিবি থানার আটপাড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত এ স্থানের পোশাকী নাম নোয়াপাড়া মৌজা। তুলসীগঙ্গা নদীর ডানতীরে অবস্থিত এ স্থান মাহীপুর-কসবাউচাই-পাথরঘাটা প্রভৃতি নামে, বিশেষ করে পাথরঘাটা নামে সমধিক পরিচিত। পূর্বদিক থেকে আগত উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত তুলসীগঙ্গা নদী এবং পশ্চিম দিক থেকে উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত খালের মতো একটি অতি ছোট নদী সমগ্র স্থানকে বেষ্টন করে নিমাই পীরের দরগার কিছু দক্ষিণে মিলিত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছে। দুই নদী পরিবেষ্টিত উত্তর দিকে অবস্থিত পাঁচবিবি-ঘোড়াঘাট রাস্তা পর্যন্ত সমগ্র ভূমিতে, এমনকি রাস্তার উত্তরেও অনেক স্থান জুড়ে যে প্রাচীন কালে একটি বিরাট জনপদ ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় সমগ্র এলাকা জুড়ে বিদ্যমান প্রাচীন ইট, পাথর ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ থেকে।

পাঁচবিবি-ঘোড়াঘাট রাস্তা থেকে যে গ্রাম্য রাস্তাটি নিমাই পীরের দরগার কাছে শেষ হয়েছে, তার দু'ধারে ধ্বংসাবশেষের সংখ্যা খুবই বেশি। দরগা থেকে প্রায় ২০০ মিটার উত্তরে আছে একটি ছোট প্রাচীন জলাশয়। এই পুকুরের চার পাড় যে এক কালে বাঁধান ছিল, তা বোঝা যায় পাড়ের ঢালু অংশ থেকে বেরিয়ে পড়া অসংখ্য প্রাচীন ইট দেখে। এ পুকুরের কিছু পূর্বে খ্রিস্টান মিশনারীদের হাল আমলে নির্মিত গির্জা, স্কুল, অফিস, হাসপাতাল, খামারবাড়ি ও আবাস-গৃহাদির অবস্থান। এ সমস্ত ইমারতে ব্যবহৃত বেশির ভাগ ইটই এ গ্রামের বিভিন্ন টিবিতে ও মাটির নিচে প্রাপ্ত প্রাচীন ইট। প্রায় ১২ একর স্থান জুড়ে এ সমস্ত ইমারতাদির অবস্থান।

এ স্থানে প্রাচীন ইট-পাথরে পরিপূর্ণ অনেক টিবি ছিল। মিশনের বুলডোজার দিয়ে সমুদয় স্থান সমতল করার পরেও চারদিকের সমভূমি থেকে এ স্থান প্রায় ৩ মিটার উঁচু। বুলডোজার চালানোর ফলে মাটির নিচ থেকে বের হয়েছে রাশি রাশি প্রাচীন ইট, গ্রানাইট ও কাল পাথরের বিরাট বিরাট খণ্ড, অসংখ্য প্রস্তর মূর্তি ও মূর্তির ভগ্নাবশেষ, পোড়ামাটির চিত্রফলক, নকশা করা ইট, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ইত্যাদি ইত্যাদি। জমিতে জলসেচনের জন্য যে সমস্ত নালা করা হয়েছে সেগুলি থেকেও অসংখ্য ইট ও মৃৎপাত্রের

ভগ্নাংশ বের হয়েছে। এ সমস্ত নালা মিশনের পশ্চিমে অবস্থিত উপজাতীয় ওঁরাও পল্লীর ভিতর দিয়ে চলে গেছে। ওরাঁওদের ঘরবাড়িগুলির নিচে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ লুক্কায়িত আছে বলে এতে ধারণা হয়। মিশনবাড়ির সামনে উত্তর দিকে যে খোলা মাঠটি আছে, তার কিছু অংশ আঙ্গিনা হিসাবে ব্যবহৃত। এখানে অসংখ্য পাথরের মূর্তির ভগ্নাংশ, কাল ও ধূসর বর্ণের গ্রানাইট পাথরের প্রকাণ্ড খিলান, স্তম্ভ, ব্র্যাকেট ইত্যাদি জড়ো করা আছে। এগুলি উত্তর দিকের মাঠ ও চার দিকের ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগ্রহ করা বলে জানা গেছে। মিশন অফিসের সংগ্রহশালায় আছে অজস্র প্রত্নবস্তুর এক বিরাট সংগ্রহ। যাদুঘর ছাড়া এ ধরনের সংগ্রহ অন্যত্র সচরাচর দেখা যায় না। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের আগের সংগ্রহ এর চেয়েও অনেকগুণে বেশি ছিল। সেগুলি সব লুটপাট হয়ে গেছে বলে মিশন কর্তৃপক্ষ গ্রন্থকারকে জানিয়েছে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে।

গির্জা থেকে প্রায় ১৫০ মিটার পূর্ব-দক্ষিণ দিকে তুলসীগঙ্গা নদী। নদীর পাড় সেখানে খুব উঁচু। উঁচু পাড়ের উপর থেকে প্রায় ৬ মিটার নিচে পর্যন্ত পাথর দ্বারা সুবিন্যস্তভাবে বাঁধান প্রশস্ত ভিত্তি চোখে পড়ে। এ ভিত্তিগুলি নদীতে নামার জন্য বাঁধান ঘাট, নাকি কোনো ইমারতের ধ্বংসাবশেষ, তা উৎখনন না করে সঠিকভাবে বলা কঠিন। এগুলি সংলগ্ন উঁচু ভূমির অনেক ভিতরে চলে গেছে বলে বোঝা যায়।

নদীর পাড় থেকে প্রায় ১৫০ মিটার উত্তর দিকে অপেক্ষাকৃত একটি আধুনিক কালের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। মন্দিরের ভিতরে ও বাইরে অনেক মূর্তির ভগ্নাবশেষ পড়ে আছে। মন্দির সংলগ্ন দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকের ভূমিতে মিশনের চাষাবাদের কাজ হয়। সেখানে আগে বেশ কয়েকটা ডিবি ও অনেক প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ছিল বলে জানা যায়। বুলডোজার চালিয়ে সমুদয় ভূমি থেকে ইট-পাথর সরিয়ে সমতল করা হলেও এখন পর্যন্ত সেখানে ইট-পাথরের জন্য ভাল করে চাষাবাদ করা যায় না। বিশেষ করে মন্দিরের দক্ষিণের ভূমি এখনও ইট, পাথর ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশে ভরা। এখানে বিরাট বিরাট ইমারত ছিল এবং নদীর তীরে যে সমস্ত ভিত্তির কথা আগে বলা হয়েছে, সেগুলির সঙ্গে এ সব ইমারত জড়িত ছিল বলে ধারণা হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে মিশনের সমগ্র এলাকা জুড়েই ছিল খুব সম্ভব অসংখ্য প্রাচীন ইমারতের অস্তিত্ব।

নিমাই পীরের দরগা

গীর্জা থেকে প্রায় ২০০ মিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে নিমাই পীরের দরগা নামক একটি মাযার আছে। কেউ কেউ বলেন নাসির-উদ্-দীন পীরের দরগা। কিন্তু নিমাই পীরের দরগা নামেই এটি সমধিক প্রসিদ্ধ। অপেক্ষাকৃত আধুনিকালে নির্মিত এই ইমারত একটি প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত বলে স্থানীয় লোকের কাছে জানা গেছে। মাযারের বাইরে গ্রানাইট পাথরের একটি বিরাট স্তম্ভখণ্ড মাটিতে প্রোথিত আছে। স্তম্ভের গায়ে অতি উত্তম ও সূক্ষ্ম ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের ক্ষয়প্রাপ্ত নিদর্শন দেখা যায়। দরগার দেয়ালে সুলতান নাসির-উদ-দীন নসরত শাহ্‌র আমলের (১৫১৯-৩১ খ্রিঃ) একটি শিলালিপি ছিল বলে জানা যায়। শিলালিপিটি বর্তমানে সেখানে নেই। 'বগুড়ার

ইতিকাহিনী'-তে (১২৪ পৃ.) কাজী মোহাম্মদ মিছের শিলালিপির যে পাঠ দিয়েছেন তাতে মাযারে শায়িত ব্যক্তির নাম বা পরিচয় পাওয়া যায় না। এ পাঠ যদি ঠিক হয়ে থাকে এবং নিচের নামটি যদি পীরের বলে ধরা যায় এবং শিলালিপিটি যদি মাযারের হয়ে থাকে তবে মাযারে শায়িত ব্যক্তির নাম নাসির-উদ-দীন এবং তিনি সুলতান নুসরত শাহ্‌র সময়ের বা তাঁর পূর্ববর্তী সময়ের ছিলেন বলে ধরা যেতে পারে। এখানে প্রত্যেক বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে একটি মেলা বসে।

নিমাই পীরের দরগার কিছু উত্তর থেকে আরম্ভ হয়ে দক্ষিণে দুই নদীর মিলন স্থল পর্যন্ত প্রায় ১০ একর পরিমিত স্থানটি একটি উঁচু ভূ-খণ্ড। সমস্ত স্থান জুড়ে অসংখ্য ইট ও পাথরের টুকরা ছড়িয়ে আছে। মাটির নিচেও ইটের অস্তিত্ব আছে। দরগার পশ্চিম দিকে আছে একটি ছোট পুকুর। কত প্রাচীন, তা বলা কঠিন। পূর্ব ও দক্ষিণ দিক দিয়ে নদী প্রবাহিত এ সুরম্য স্থানে বেশ কয়েকটি দেবালয় ছিল বলে ধারণা হয়।

পাথরের সেতু

নিমাই পীরের দরগা থেকে প্রায় ১০০ মিটার দক্ষিণে তুলসী গঙ্গা নদীর উপরে গ্রানাইট ও অন্যান্য পাথর দ্বারা নির্মিত একটি প্রাচীন সেতু ছিল। নদীর দুই তীরে পাথরের ভিত্তি ও খিলান এখনও টিকে থেকে সেতুর এক কালের অস্তিত্ব নীরবে ঘোষণা করছে। দুই পাড়ের ভিত্তি দেখে মনে হয় সেতুটি প্রায় ৪৫ থেকে ৬০ মিটার লম্বা ছিল। মাঝের সব অংশ ভেঙ্গে গেছে এবং পাথরগুলি নিচে এবং কিছু ভাটিতে পড়ে আছে। বাংলাদেশে পুরাপুরি পাথরে নির্মিত আর কোনো সেতুর সন্ধান আজও পাওয়া যায়নি।

সেতুর উজানেও অনেক পাথর স্তূপীকৃত হয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে গির্জার পূর্বদিকে অবস্থিত যে উঁচু ভূমির কথা আগে বলা হয়েছে, সেখান থেকে আরম্ভ করে সেতুর প্রায় ১০০ মিটার দক্ষিণ পর্যন্ত নদী-গর্ভের সমগ্র এলাকা জুড়ে বিরাট বিরাট কাল ও গ্রানাইট পাথরে পড়ে আছে। ক্ষীণস্রোতা তুলসী গঙ্গাকে এখানে শিলারাশির ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়া একটি পার্বত্য নদী বলে ভ্রম হয়। সেতুর উজানের পাথরগুলি ছিল নদীর উভয় তীরে বাঁধান ঘাট বা সিঁড়ির পাথর। সে সব বাঁধান ঘাটের কিছু চিহ্ন এখনও টিকে আছে। অসংখ্য প্রস্তর খণ্ডের অস্তিত্বের জন্য এ স্থানকে লোকে পাথরঘাটা বলে অভিহিত করে থাকেন।

নওপুকুরিয়া

মিশনের কিছু পশ্চিমে একই স্থানে ৯টি বিরাট জলাশয় আছে বলে এ-স্থানের নাম নয় বা নও পুকুরিয়া। জলাশয়গুলি অত্যন্ত প্রাচীন এবং গোটা তিনেক জলাশয় ছাড়া বাকিগুলি মজে গিয়ে নিচু ধানী জমিতে পরিণত হয়েছে। জলাশয়গুলি আকারে এত বৃহৎ যে, এগুলিকে পুকুর না বলে দিঘি বলাই অধিক সঙ্গত। দিঘিগুলিতে ইট ও পাথর দিয়ে বাঁধান ঘাটের চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। দিঘিগুলির পাড়ে ও পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ইট ও পাথরে তৈরি অসংখ্য ইমারতের ভিত্তি চোখে পড়ে। আর চোখে পড়ে ইট,

পাথর ও মৃৎপাত্রের অজস্র ভগ্নাংশ। একটি সুবৃহৎ ইমারতের ধ্বংসাবশেষকে ধনভাণ্ডার বলে চিহ্নিত করা হয়। এখান থেকে কিছু মূর্তি পাওয়া গেছে বলে জানা গেছে। খুব সম্ভব নওপুকুরিয়াতেই ছিল পাথরঘাটার প্রশাসনিক কেন্দ্র বা আবাসিক এলাকা। এখানে অবস্থানরত জলাশয়গুলিই তার সাক্ষ্য বহন করে।

কসবা-উঁচাই

গির্জা থেকে ১.৫ কিলোমিটার উত্তরে পাঁচবিবি-ঘোড়াঘাট সড়কের উপরে উবস্থিত উঁচাই হাইস্কুলের প্রশস্ত মাঠের উত্তর প্রান্তে একটি বড় ঢিবি ছিল। ঢিবির পশ্চিম ও পূর্ব পার্শ্বে আছে ২টি মাঝারি আকারের দিঘি। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা পশ্চিম পার্শ্বের দিঘির আয়তন প্রায় ২১২ মিটার × ১২১ মিটার। পূর্ব পার্শ্বের দিঘিটি আর একটু ছোট। দুটি দিঘিই অত্যন্ত প্রাচীন এবং বর্তমানে শুষ্কপ্রায়। দিঘি দুটির মাঝখানে অবস্থিত ঢিবিটি বর্তমানে প্রায় ৩০ মিটার × ২৪ মিটার আয়তনের। এই ঢিবির উচ্চতা প্রায় ৫ মিটার। সমগ্র ঢিবির উপরে বর্তমানে ইট, ইটের টুকরা ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। স্থানে স্থানে কাদার গাঁথুনিযুক্ত ইটের তৈরি প্রশস্ত ভিত্তি নযরে পড়ে। এ স্থানে আরও একটি ঢিবি ছিল। বর্তমানে সে ঢিবিটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

কসবা গ্রামেও এ ধরনের কিছু ঢিবি ও প্রাচীন জলাশয় আছে। আর আছে কসবা গ্রামের পশ্চিম দিকে অবস্থিত মহিপুর গ্রামে। সেখানে মহীপালের স্মৃতি বিজড়িত একটি বিরাট দিঘি ও দিঘির নিকটে প্রাচীন ইট ও পাথরে ভরা কয়েকটি ছোট ছোট ঢিবি আছে।

নদীর অপরতীরের ধ্বংসাবশেষ

নদীর বাম (পুর্ব) তীরেও যে অসংখ্য প্রাচীন ইমারত ছিল, তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় সেখানে অবস্থিত বেশ কয়েকটি প্রাচীন ডিবি ও প্রায় ২ বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে স্থানে স্থানে ইট, পাথর ও মৃৎপাত্রের অজস্র ভগ্নাংশের অস্তিত্ব দেখে। নদীতীর থেকে অল্প দূরে অবস্থিত ঢিবিগুলি জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় আছে। একটি ঢিবির উপর পড়ে আছে, ৪ মিটার দীর্ঘ ধূসর বর্ণের এক খণ্ড গ্রানাইট পাথর। কোনো ইমারতের 'লিন্টেল' বলে অনুমিত এ প্রস্তর খণ্ডে যে উৎকৃষ্ট কারুশিল্পের নিদর্শন আছে, তা ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও মালীসহ একদল পুষ্পমাল্য বাহকের মিছিল বলে ধরা যায়। অন্যান্য ঢিবিগুলির উপরেও বড় বড় প্রস্তরখণ্ড পড়ে থাকা অবস্থায় দেখা যায়।

পাথর ঘাটা অঞ্চলে যে সমস্ত ঢিবি এখনও টিকে আছে, সেগুলির মধ্যে কাসিয়া-বাড়ি ধাপ নামে পরিচিত ঢিবিটি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তুলসী গঙ্গার পূর্ব তীরে অবস্থিত প্রায় গোলাকার আয়তনের এ ঢিবির ব্যাস প্রায় ৭৬ মিটার ও উচ্চতা প্রায় ৭.৫ মিটার। প্রায় অক্ষত অবস্থায় টিকে থাকা এ ঢিবির উপরে প্রচুর প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ছাড়া ইষ্টক নির্মিত প্রশস্ত প্রাচীরের চিহ্ন স্থানে স্থানে দেখা যায়। ঢিবির উপরে আছে কয়েকটি বট ও অশ্বথ গাছ। গাছের নীচে স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে ছিল কাল ও বেলে পাথরে তৈরি অসংখ্য দেব-দেবীর মূর্তি ও মূর্তির ভগ্নাংশ। মূর্তিগুলির মধ্যে ছিল প্রায় ৪

ফুট উঁচু একটি বিষ্ণুমূর্তি, অনুরূপ আকারের একটি মূর্তির ভগ্নাংশ, শিবলিঙ্গ ও গৌরীপট্ট এবং আরও অসংখ্য পাথরের মূর্তির ভগ্নাংশ। এগুলি স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীদের দ্বারা পূজিত হত। পার্শ্ববর্তী গ্রামে এস্থান থেকে নেওয়া অনেক মূর্তি আছে বলে জানা যায়। নিকটস্থ সাঁওতাল পাড়ায় একটি আধুনিক কালী মন্দিরে এখান থেকে নেওয়া একটি বৃহৎ পাষাণ মূর্তি পূজিত হচ্ছে বলে জানা গেছে।

ইতিহাস

এ স্থানের ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক সময় নির্দেশক কোনো লিপি বা অন্য কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। মাহীপুর নাম এবং এখানে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্ন নিদর্শন থেকে এ স্থানকে পাল নৃপতি প্রথম মহীপালের (৯৮৮-১০৩৮ খ্রিঃ) সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রবণতা দেখা যায়। পাথরঘাটা অঞ্চলে প্রায় ১০/১২ বর্গ কিলোমিটার স্থান জুড়ে যে বিরাট জনপদের ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব দেখা যায়, তা যে কোনো রাজা বা রাজন্যবর্গের অর্থানুকূল্য ছাড়া গড়ে ওঠেনি, উঠতে পারেনি, সে সম্পর্কে বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন। এখানে যে একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল, সে ধারণাও অমূলক বলে মনে হয় না। অথচ সমগ্র ধ্বংসাবশেষ ও প্রত্নবস্তুর যে সন্ধান পাওয়া গেছে, সেগুলির মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত একটি নিদর্শনও পাওয়া যায়নি। যা পাওয়া গেছে, সবই হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত। অথচ ধর্মপাল ও পাল বংশীয় নৃপতিরা সবাই ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁদের উদারতা যথেষ্ট ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তাই বলে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল নৃপতি কর্তৃক নির্মিত এ বিশাল জনপদে বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত কোন নিদর্শনই থাকবেনা, তা যুক্তির দিক থেকে গ্রহণীয় বলে ধারণা করা যায় না।

এখানে ব্যবহৃত পাথরগুলির মধ্যে বেশির ভাগই গ্রানাইট পাথর। পাল যুগের যে সমস্ত প্রত্নকীর্তি এ দেশে দেখা গেছে, সে গুলির মধ্যে বেলে পাথর ও রাজমহলের কাল পাথরই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রানাইট পাথরের ব্যবহার খুবই কম। আর গুপ্ত যুগের ধ্বংসাবশেষগুলিতে বেলে পাথরের সঙ্গে গ্রানাইট পাথরের ব্যবহারই বেশি দেখা যায়। কাল পাথরের ব্যবহারই সেখানে অপেক্ষাকৃত অল্প বলা চলে।

পাথরঘাটার ধ্বংসাবশেষগুলি দেখে মনে হয় এ স্থান অত্যন্ত প্রাচীন। খুব সম্ভব এখানে গুপ্ত যুগে, কি তারও আগে একটি জনপদ গড়ে উঠেছিল। গুপ্ত যুগে এ স্থান একটি অতি সমৃদ্ধিশালী জনপদে পরিণত হয়। খুব সম্ভব গুপ্ত যুগেই গ্রানাইট পাথরের তৈরি সেতুটিও নির্মিত হয়। নদীর দু'পাড়ে গড়ে ওঠে অসংখ্য দেবালয়। খুব সম্ভব পালদের সময়ে বিশেষ করে মহীপালের সময়ে এ স্থানে বিশেষ করে কসবা-উচাই-মহীপুর প্রভৃতি স্থানে নতুন করে আর একটি জনপদ গড়ে ওঠে এবং সমগ্র এলাকা মাহীপুর নামে পরিচিত হয়। সেনদের সময়েও এ স্থানের প্রাধান্য ছিল বলে ধারণা হয় এ স্থানে প্রাপ্ত সেন যুগের কাল পাথরে তৈরি বিভিন্ন মূর্তি দেখে। কসবা-উঁচাই অঞ্চলে মুসলিম আমলে একটি জনপদ গড়ে উঠেছিল বলে ধারণা হয় এ স্থানের কসবা নাম ও নদীতীরে অবস্থিত নিমাই পীরের দরগার অবস্থান দেখে। খুব সম্ভব নুসরত শাহ্‌র আমলে এ দরগার ইমারত নির্মিত হয়েছিল। খুব সম্ভব এর অনেক আগে এই নাম না

জানা পীরের আবির্ভাব হয়েছিল এ স্থানে। নামটি হারিয়ে গেলেও তাঁর মাহাত্ম্য হারিয়ে যায়নি বলে খুব সম্ভব এ স্থানে মাযারের ইমারতটি নির্মিত হয়েছিল। মুসলিম আমলের পরে এ স্থান খুব সম্ভব পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে এবং অসংখ্য পাথরের অবস্থানের জন্য সমগ্র স্থানের নাম হয় পাথরঘাটা।

কেউ কেউ বলেন যে, এখানেই ছিল পঞ্চনগরী নামক প্রাচীন জনপদের অস্তিত্ব। সে সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছু বলার উপায় নেই। খুব সম্ভব পঞ্চনগরী ছিল দিনাজপুর জেলার চরকাই-বিরামপুর (পঞ্চনগরী ও চরকাই-বিরামপুর দ্র.)। পঞ্চনগরী না হলেও এ স্থানে যে একটি সুবৃহৎ ও সুপ্রাচীন জনপদ ছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

হারুঞ্জা ধাপ

জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলার অধীনে ও উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে হারুঞ্জা মৌজার ফসলের মাঠের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র জলাশয়ের দক্ষিণ পাড়ে হারুঞ্জা ঢিবিটি অবস্থিত। লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে স্থানীয় জনগণ ঢিবিটিকে দ্বীপ বলে। প্রায় ৫৯ মিটার × ৪০ মিটার ও ৩ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট এ ঢিবিতে প্রচুর প্রাচীন ইট অন্যান্য প্রত্নবস্তু দেখা যায়। এখানকার ইটের মাপ '১৬˝ × ৮˝ × ২.৫ইঞ্চি'।

বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে ঢিবির উত্তরে অবস্থিত মজে যাওয়া ক্ষুদ্র পুকুরটির পুনর্খনন কালে মাটির নিচে নিম্ন মানের বেলে-পাথরে নির্মিত একটি মূর্তি আবিষ্কৃত ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর কর্তৃক সংগৃহীত হয়। প্রায় ২৮ সে. মি. উঁচু মূর্তিটির নিচের অংশ প্রায় ২৬.৫ সে. মি. প্রশস্ত। এটি খ্রিস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর বলে অনুমিত হয়। ঢিবিটিতে যে একটি প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

গয়াকুণ্ড ধাপ

কালাই উপজেলার অধীনে ও উপজেলা সদর থেকে প্রায় ২.৫ কিলোমিটার উত্তর-পূবে ঘাতিয়ার মৌজায় ১২ বিঘার অধিক আয়তনের ভূমিতে গয়াকুন্ড নামক একটি প্রাচীন দিঘি ছিল। মজে যাওয়া দিঘির অধিকাংশ ভূমি এখন চাষের ভূমি। উঁচু পাড়ের কিছু ভূমি এখন মুসলমানের কবরস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

দিঘির দক্ষিণ ও পূব পাড়ে প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ বহনকারী দুটি ঢিবি ছিল। দক্ষিণ পাড়ের ঢিবিটি এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পুব পাড়ের ঢিবিটির আয়তন ছিল ১২১ মিটার × ৪৭ মিটার এবং উচ্চতা প্রায় ২ মিটার।

স্থানীয় জনসাধারণ এখান থেকে অসংখ্য প্রাচীন ইট অপহরণ করেছেন। ফলে এখানে দুটি গর্তেরও সৃষ্টি করেছে। ঢিবির ইট প্রায় শেষ হয়ে গেছে এবং পড়ে আছে শুধু ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ। প্রাচীন কালে এখানে যে একটি বিরাট আয়তনের অট্টালিকা ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই ইমারত সম্পর্কে অলীক কাহিনী ছাড়া কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না।

মাত্রাই রাজবাড়ির ধাপ

কালাই উপজেলার অধীনে ও উপজেলা সদর থেকে ৯.৬ কিলোমিটার উত্তরে মাত্রাই মৌজায় মাত্রাই রাজবাড়ি ধাপ নামে পরিচিত একটি ঢিবি আছে। একটি প্রাচীন জলাশয়ের দক্ষিণ পাড়ে অবস্থিত ঢিবিটির আয়তন প্রায় ১১৮ মিটার × ১১৭ মিটার ও উচ্চতা প্রায় ৩.৫ মিটার। এই অনুচ্চ ঢিবি ক্রমশ ঢালু হয়ে পাশের সমতল ভূমিতে গিয়ে মিশেছে। এখনও (১৯৮৩ খ্রিঃ) ঢিবিটির তেমন কোনো ক্ষতি সাধিত হয়নি। তবে বৃষ্টির পানি নামার ফলে ঢিবিতে একটি নালা সৃষ্টি হওয়ার কারণে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ইষ্টক নির্মিত একটি প্রাচীরের কিছু অংশ বের হয়ে পড়েছে। ঢিবিটিতে প্রচুর প্রাচীন ইট দেখা যায়।

এ ঢিবির কোনো ইতিহাস পাওয়া যা.্নি। তবে একাদশ শতাব্দীর বৈদ্যদেব কর্তৃক প্রদত্ত তাম্রলিপির ছিলিমপুর মৌজা মাত্রাই মৌজা থেকে সামান্য পূর্বদিকে অবস্থিত এবং গাইবান্ধা জেলার বিরাট নগর (বিরাট নগর দ্র.) এ স্থান থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার উত্তর-পূবে অবস্থিত। এ স্থান থেকে প্রস্তরনির্মিত অনেক বিষ্ণুমূর্তি উদ্ধার করা হয়েছিল বলে জানা গেছে এবং সেসব মূর্তি ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন যাদুঘরে রক্ষিত আছে বলে জানা যায়। হাল আমলে (১৯৮৬ খ্রিঃ) এখান থেকে একটি বিষ্ণুমূর্তি ও একটি বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রস্তর নির্মিত মূর্তি দুটি মহাস্থান যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

বলিগ্রাম রাজবাড়ি

কালাই উপজেলার অধীনে ও উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে বলিগ্রাম নামক এই প্রাচীন স্থান অবস্থিত। এখানে প্রায় ৩৬৩ মিটার × ৩০০ মিটার আয়তন বিশিষ্ট একটি মোটামুটি উঁচু স্থানে মোট ১৭ টি ঢিবির অস্তিত্ব ছিল। এগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ ঢিবিটির আয়তন ছিল ৩০ মিটার × ২১ মিটার। সমগ্র স্থানের পূর্ব ও পশ্চিম দিকের মজে যাওয়া পরিখার চিহ্ন এখনও (১৯৮৩ খ্রিঃ) বিদ্যমান। অন্য দুই দিকেও খুব সম্ভব পরিখার অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

এখানকার ১৭ টি ঢিবির মধ্যে ৮টি ঢিবিই ইটহরণকারীগণ কর্তৃক বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এগুলি থেকে অসংখ্য প্রাচীন ইট সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। উত্তরদিকের একটি ঢিবিতে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ একটি প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ অনাবৃত হয়ে পড়েছে। এস্থানে অনেক ক্ষতি সাধনের পরও কয়েকটি ঢিবি এখনও (১৯৮৩ খ্রিঃ) প্রায় অক্ষত অবস্থায় দেখা যায় এবং সেসব ঢিবির প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাশেষ আছে বলে মনে হয়। এখানে প্রাপ্ত ইটের পরিমাপ সাধারণত '৮″ × ৭.৪″ × ১.৫″ ইঞ্চি।'

স্থানীয় জনপ্রবাদমতে এ স্থানকে বলিধর নামক এক নৃপতির রাজবাড়ি বলে চিহ্নিত করা হয় এরা সেই বলিধর রাজার বাড়ি দিনাজপুর জেলার হিলির নিকট অবস্থিত বৈগ্রামেও ছিল বলা হয়ে থাকে। এসব কল্প কাহিনীর সঙ্গে প্রামাণ্য ইতিহাসের যে কোনো সম্পর্ক নেই তা বলাই বাহুল্য। ১৮০৭-০৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে ডক্টর ফ্রান্সিস বুকানন এ স্থান সম্পর্কে বলে গেছেন,"

"At Boligram about eight miles north and east of Khyetlal are shown the ruins of Boli Raja's abode, which consists of many heaps of brciks covered with earth and bushes and traces of walls or roads, constructed of brick and reaching from heap to heap may be clearly distinguished. The bricks are of small size and in some places foundations of house may be clearly traced. These heaps occupy a place about a mile in diameter, which is raised very high by numerous tanks and in some places containing...."

বিয়ালা গ্রামের প্রাচীন কীর্তি ও তাম্রশাসন

উপরে উল্লিখিত বলিগ্রাম থেকে মাত্র ২.৫ কিঃ মিঃ দক্ষিণ-পূবে বিয়ালা গ্রাম অবস্থিত। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে এখানকার অতিক্ষুদ্র ও ব্যক্তিমালিকানাধীন একটি কবরস্থানে কবর খুঁড়তে গিয়ে প্রায় ৭০ সে. মি. মাটির নিচে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীরের পাশে একটি তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয়। ধ্বংসসপ্রাপ্ত ইটের প্রাচীর ছাড়াও এখানে আরও কিছু প্রত্নবস্তুর আস্তিত্ব দেখা যায়। এখানে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের পাঠ থেকে জানা যায় যে, বিগ্রহপালদেবের পুত্র প্রথম মহীপালদেব (৯০৮-১০৩৮) ... তাঁর তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে পুন্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত সুবিখ্যাত আমলক মণ্ডলের অধিনস্থ কোটিবর্ষ বিষয়ে ভগবান বুদ্ধের জন্য ভূমি দান করিয়াছেন।

ক্ষেতলাল

বগুড়া শহর থেকে ৪০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ও পাথরঘাটা থেকে প্রায় ২৪ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত ক্ষেতলাল একটি প্রাচীন স্থান। স্যার কানিংহ্যাম ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে এ স্থান পরিদর্শন করেন এবং এখানে প্রাচীন কীর্তির বহু ধ্বংসাবশেষ দেখেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।[১] থানা থেকে প্রায় ৮০০ মিটার দক্ষিণে অবস্থিত প্রায় ৪.৫ মিটার × ৩ মিটার আয়তনের একটি প্রাচীন ঢিবিতে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তিনি ৪টি প্রস্তরমূর্তি দেখেছিলেন। এগুলি ছিল, (১) একটি দণ্ডায়মান পুরুষ মূর্তি, (২) একটি বিষ্ণু মূর্তি, (৩) একটি বুদ্ধ মূর্তি ও (৪) একটি 'সদ্যোজাত' মূর্তি। থানা থেকে প্রায় ১২০০ মিটার পশ্চিমে একটি প্রাচীন জলাশয়ের কাছে মাঝারি আকারের একটি অনুচ্চ ঢিবি ছিল। মহাদেবের মন্দির বলে কথিত একটি ভগ্ন মন্দির ছিল সেখানে। সেই ভগ্ন মন্দিরে ৪টি মূর্তি ছিল বলে প্রভাস চন্দ্র সেন তাঁর রচিত 'বগুড়ার ইতিহাস' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এগুলি (১) সদ্যোজাত মূর্তি, (২) হরগৌরীর আলিঙ্গনরত মূর্তি, (৩) বিষ্ণুমূর্তি ও (৪) বুদ্ধ মূর্তি ছিল বলে তিনি বলেছেন। থানার দক্ষিণে 'রাজবাড়ির চড়া' নামক একটি উঁচু ভূমি আছে। এতে একটি প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ লুকিয়ে আছে বলে মনে হয়। রাজবাড়ির চড়ার পূর্ব দিকে

১. *Archaeological Survey of India Report*, Vol xv, pp 100—102—Sir Alexander Cunningham, C.&I., & I.E.

মহল পুকুর নামক একটি জলাশয়ের দক্ষিণে 'গোপী নাথের মন্দির' বলে কথিত একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ছিল। মন্দিরের প্রাঙ্গণ কাঁচের তৈরি ছিল বলে জনপ্রবাদ আছে। ক্ষেতলালে 'সনকা' ও 'মেনকা' দিঘি নামক দুটি প্রাচীন জলাশয় আছে।

ময়ুর ধাপ

ক্ষেতলাল উপজেলার মামুদপুর ইউনিয়নে ও উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১১ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে সামন্তনগর মৌজায় একটি ক্ষুদ্র প্রাচীন জলাশয়ের পশ্চিম তীরে অবস্থিত একটি ঢিবির নাম ময়ুর ধাপ। এর আয়তন প্রায় ৪৯ মিঃ × ৪২ মিঃ ও উচ্চতা প্রায় ৪ মিটার। ঢিবিতে প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ দেখা যায়। বৃষ্টির জল নামার কারণে ঢিবির পূর্ব ভাগে যে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে তাতে প্রাচীন ইষ্টক নির্মিত একটি প্রাচীরের অংশ বিশেষ অনাবৃত হয়ে পড়েছে। ঢিবিটিতে যে একটি প্রাচীন ইমারত ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

তাজপুর ধাপ

জয়পুরহাট উপজেলার অধীনে ও উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত তাজপুর মৌজায় প্রায় ৫৪ মিটার × ৩৫মিটার আয়তন ও প্রায় ৪মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট একটি ঢিবি আছে। ইট হরণকারীরা ঢিবিটিতে বেশ কয়েকটি গর্ত খুঁড়ে ইট সরিয়ে ফেলেছেন এবং এর ফলে ঢিবির উত্তর-পশ্চিমকোণে প্রায় ৭.৫ মিটার রাস্তা ও প্রায় ২.৫২ মিটার গভীরতা বিশিষ্ট ইষ্টক নির্মিত একটি নিরেট ও প্রাচীন ইমারতের অংশ বিশেষ অনাবৃত হয়ে পড়েছে। ঢিবির উত্তর দিকেও প্রায় ১.৬১ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট ইষ্টক নির্মিত প্রাচীন দেয়ালের অংশ বিশেষ বের হয়ে পড়েছে এবং সেই প্রাচীরে দরজার জন্য, ৭৬ মিটার প্রশস্ত ফাঁকা স্থানও ছিল। এই চমকপ্রদ ঢিবির কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না। ঢিবিটি এখনও (১৯৮৩ খ্রিঃ) মোটামুটি ভাল অবস্থায় টিকে আছে। খুব সম্ভব এখানে কোনো বৌদ্ধ স্তূপ বা কোনো বৌদ্ধ মন্দির বা হিন্দু মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল।

অন্যান্য কীর্তি

জয়পুরহাট উপজেলার পুরানা পায়েল ইউনিয়নের হিলাকুণ্ড মৌজায় প্রায় ৪৮ মিটার × ৩০ মিটার × ২.১১ মিটার আয়তন বিশিষ্ট একটি এবং পাঁচবিবি উপজেলার বালিঘাটা ইউনিয়নের মাধকুর মৌজায় আর একটি ঢিবি ছিল এবং উভয় ঢিবিতে প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

মুসলিম আমল

বেল আমলা

জয়পুরহাট রেলস্টেশন থেকে প্রায় দেড় মাইল পশ্চিমে বেল আমলা গ্রাম অবস্থিত। এখানে একই স্থানে পাশাপাশি ১২টি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। ঘট, পদ্ম, তরবারি

ইত্যাদির নক্সা মন্দিরে ব্যবহৃত ইটের মধ্যে দেখা যায়। এগুলি সম্পর্কে 'বগুড়ার ইতিহাস' প্রণেতা শ্রী প্রভাসচন্দ্র সেন বলেন যে, এগুলির নক্সা ছাঁচে তৈরি নয় (অর্থাৎ পোড়ামাটির ফলক চিত্র নয়)। ইট-গুলি তৈরি করার পর তীক্ষ্মধার অস্ত্র দিয়ে নিপুণভাবে ছবিগুলি খোদিত বা উৎকীর্ণ হয়েছে। মন্দিরগুলি অত্যন্ত কারুকার্যময় এবং বহু অর্থ ব্যয়ে এগুলি নির্মিত হয়েছিল। একটি মন্দিরে অতি কারুকার্যময় একজোড়া কাঠের কপাট ছিল। এতে ৩৬০ টি মূর্তি খোদিত বা উৎকীর্ণ আছে। এই কপাট জোড়া ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর কর্তৃক সংগৃহীত হয়েছিল বলে জানা যায়। এই ১২ টি মন্দিরের কিছু পশ্চিমে আরও ৬টি শিব মন্দির আছে। সবগুলি মন্দিরের অবস্থাই খুব জীর্ণ হয়ে পড়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজীবলোচন মণ্ডল নামক একজন অতি ধনবান ব্যক্তি মন্দিরগুলি নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা গেছে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের এ মন্দিরগুলি ছাড়াও বেল আমলাতে প্রাচীন কীর্তির কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এখানে একটি গীতাবলী তারামূর্তি, একটি সূর্যমূর্তি ও একটি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়েছিল বলে প্রভাস বাবু উল্লেখ করেছেন।

পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলা

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ

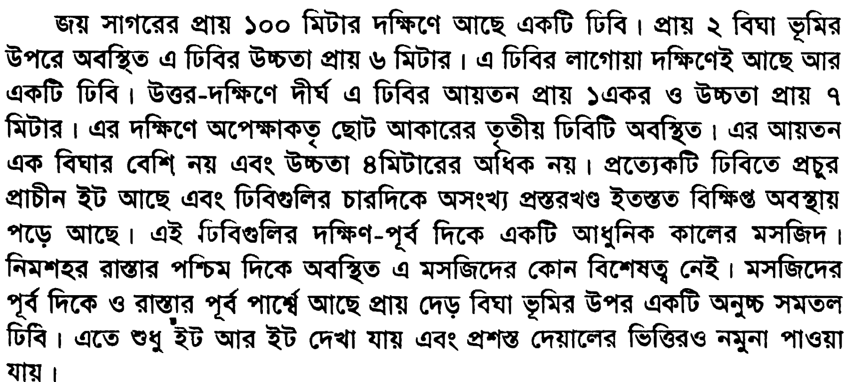
নিমগাছি-বিরাটশহর ও জয়সাগর

বগুড়া জেলার শেরপুর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দক্ষিণে ও নগরবাড়ি বগুড়া পাকা সড়ক থেকে প্রায় ৯ কিলোমিটার পশ্চিমে বৃহত্তর পাবনা জেলার রায়গঞ্জ থানার অধীনে নিমগাছি নামক একটি অতি প্রাচীন স্থান আছে। এখানে একটি হাট ও একটি হাইস্কুল আছে। নিমগাছি গ্রামকে কেন্দ্র করে উত্তরে, দক্ষিণে ও পশ্চিমে প্রায় ১২ বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এ স্থানকে মহাভারতে বর্ণিত মৎস্য দেশের বিরাট রাজার রাজধানী বলে জনপ্রবাদ মতে অভিহিত করা হয়ে থাকে এবং সেই সূত্রে এ স্থানের আর এক নাম বিরাটশহর।

নিমগাছির পূর্বদিক দিয়ে একটি প্রাচীন ও সুবৃহৎ নদীর খাত দেখা যায়। এ খাত ভরাট হয়ে বর্তমানে চাষের জমিতে পরিণত হয়েছে। এ খাত থেকে পূর্বদিকে পাকা সড়ক পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে বালুকা মিশ্রিত পলিমাটির প্রাচুর্য দেখা যায়। এ খাতের পশ্চিম তীরবর্তী এলাকা লালমাটির (late laterite formation) অঞ্চল। শেরপুর থেকে করতোয়ার একটি ধারা প্রাচীন কালে মীর্যাপুরের দক্ষিণ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভবানীপুর, নিমগাছি, তাড়াশ, সোনাপাড়া, হাণ্ডিয়াল ও অষ্টমনীষা হয়ে দক্ষিণে পদ্মায় গিয়ে মিলিত হত বলে জানা যায়। বর্তমানে এটি 'মরা করতোয়া' নামে পরিচিত। বর্তমান কালের এই মরা করতোয়ার ডান তীরেই প্রাচীন কালে গড়ে উঠেছিল নিমগাছির এই বিরাট জনপদ। হাট এলাকাকে স্থানীয় লোকেরা নিমশহর বলে থাকেন।

হাটের উপর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে যে রাস্তাটি চলে গেছে, হাট থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার উত্তরে ও প্রায় ১.৫ কিলোমিটার দক্ষিণে এ রাস্তার নিচে স্থানে স্থানে এখনও প্রাচীনকালের ইটের অস্তিত্ব দেখা যায়। এতে মনে হয় যে, এক কালে রাস্তাটি পাকা ছিল। নিমশহর থেকে যে গ্রাম্য রাস্তাটি পশ্চিম দিকে চলে গেছে, তা ধরে প্রায় ৮০০ মিটার পশ্চিম দিকে গেলে একটি বিরাট প্রাচীন জলাশয় দেখা যায়। নাম জয় সাগর। দিঘির অতি প্রশস্ত পাড়গুলি এখনও প্রায় ৪.৪৫ মিটার উঁচু। এ দিঘির আয়তন আনুমানিক ৩৮০ বিঘা। প্রায় বগাকৃতির এ দিঘি উত্তর-দক্ষিণে ঈষৎ লম্বা। দিঘির পানি বেশ পরিষ্কার এবং এখনও (১৯৭৪ খ্রিঃ) খুব গভীর বলে স্থানীয় লোকদের কাছে জানা গেছে। দিঘির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পাড়ের বাইরে একটি প্রাচীন ইমারত ছিল বলে জানা যায়। ইট ও মাটি সরিয়ে নিবার ফলে সেখানে একটি নিম্ন ভূমির সৃষ্টি হয়েছে। দিঘিতে যে বাঁধান ঘাট ছিল, তার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান।

ভূমি-নকশা
নিম গাছি-বিরাটশহর
(রায়গঞ্জ, সিরাজ গঞ্জ)
(১৯৭৩ খ্রি.)
উ
স্কেল মতো নয়



জয় সাগরের প্রায় ১০০ মিটার দক্ষিণে আছে একটি ঢিবি। প্রায় ২ বিঘা ভূমির উপরে অবস্থিত এ ঢিবির উচ্চতা প্রায় ৬ মিটার। এ ঢিবির লাগোয়া দক্ষিণেই আছে আর একটি ঢিবি। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এ ঢিবির আয়তন প্রায় ১একর ও উচ্চতা প্রায় ৭ মিটার। এর দক্ষিণে অপেক্ষাকতৃ ছোট আকারের তৃতীয় ঢিবিটি অবস্থিত। এর আয়তন এক বিঘার বেশি নয় এবং উচ্চতা ৪মিটারের অধিক নয়। প্রত্যেকটি ঢিবিতে প্রচুর প্রাচীন ইট আছে এবং ঢিবিগুলির চারদিকে অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। এই ঢিবিগুলির দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটি আধুনিক কালের মসজিদ। নিমশহর রাস্তার পশ্চিম দিকে অবস্থিত এ মসজিদের কোন বিশেষত্ব নেই। মসজিদের পূর্ব দিকে ও রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে আছে প্রায় দেড় বিঘা ভূমির উপর একটি অনুচ্চ সমতল ঢিবি। এতে শুধু ইট আর ইট দেখা যায় এবং প্রশস্ত দেয়ালের ভিত্তিরও নমুনা পাওয়া যায়।

মসজিদ থেকে প্রায় ২০০ মিটার দক্ষিণে একটি প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ প্রায় নিশ্চিহ্ন হবার পথে। লোকে বলে হাউরিয়া মোল্লার মাযার। কতগুলি প্রাচীন ইট স্তূপীকৃত হয়ে এখানে পড়ে আছে। এটিকে মাযার বলে চিহ্নিত করা কষ্টকর। তবে স্থানীয় লোকের কাছে জানা যায় যে, এখানে কিছুকাল আগেও নাকি একটি পাকা কবর জীর্ণ অবস্থায় ছিল। কিন্তু ইটগুলি দেখে মনে হয় যে, এগুলি বৌদ্ধ-হিন্দু যুগের, মুসলিম আমলের নয়।

এ মাযারের কিছু পূর্বদিকে জঙ্গলের মধ্যে ভোলা দিওয়ানের মাযার বলে একটি স্থানকে চিহ্নিত করা হয়। সেখানে তেমন কোনো ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন নেই। মাদার পীর, পীরতলা, পাঁচপীর প্রভৃতি পীরদের স্থান ধারে কাছে তিনটি স্থানের মধ্যে চিহ্নিত করা হয়। এ সমস্ত স্থানে বিশেষ কোনো ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন না থাকলেও চারদিকে মাটির নিচে প্রচুর প্রাচীন ইটের সন্ধান পাওয়া যায়।

জয়সাগরের উত্তর দিকে প্রায় ৭০০ মিটার দূরে বেশ কয়েকটা বড় বড় প্রাচীন জলাশয় আছে। উদয় দিঘি ও শৈল দিঘি এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলির এক একটার জলভাগ প্রায় ৮০ বিঘা। পাড়গুলি জয় সাগরের পাড়ের মতই প্রশস্ত ও উঁচু। জয় সাগর ও এ দিঘিগুলির মধ্যবর্তী স্থানে আছে ৫টি প্রাচীন ঢিবি। প্রত্যেকটি ঢিবিতেই অজস্র প্রাচীন ইট ও পাথর দেখা যায়। ঢিবিগুলির অবস্থান একটু বিচিত্র ধরনের। পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় একই রেখায় অবস্থিত ঢিবিগুলি একে অন্য থেকে প্রায় সমদূরত্বে অবস্থিত। এগুলির এক একটির আয়তন প্রায় দেড় বিঘা এবং উচ্চতা প্রায় ৬ মিটার।

নিমগাছি হাটের উপর দিয়ে চলমান উত্তর-দক্ষিণে লম্বা যে প্রাচীন পাকা সড়কের কথা আগে বলা হয়েছে, তা ধরে ২ কিলোমিটার উত্তর দিকে গেলে রাস্তার পশ্চিম পাশে পরপর বেশ কয়েকটি উঁচু ঢিবি দেখা যায়। বিভিন্ন আয়তনের এ ঢিবিগুলির এক একটি ১ থেকে ৩ বিঘা ভূমি জুড়ে অবস্থিত। ঢিবিগুলির ভিতরে যে অজস্র প্রাচীন ইট আছে, তা বাইরে থেকেই বোঝা যায়। আর আছে অসংখ্য প্রস্তর খণ্ড। এ ঢিবিগুলি থেকে উত্তর দিকে প্রায় ২ বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে রাস্তার উভয় পার্শ্বে অসংখ্য প্রাচীন ঢিবি আছে। তবে রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত ঢিবির সংখ্যাই বেশি। এ সমস্ত ঢিবির শেষ প্রান্তে রাস্তার পূর্ব দিকে আছে একটি বিরাট আকারের ঢিবি আয়তনে প্রায় ২ একর।

এটিকে ১টি ঢিবি না বলে ৩ টি ঢিবির সমন্বয়ে গঠিত একটি বড় আকারের ধ্বংসাবশেষ বলেও আখ্যায়িত করা যায়। এ ধ্বংসাবশেষের সর্বোচ্চ স্থান প্রায় ৭ মিটার উঁচু। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা এ ধ্বংসাবশেষের পূর্বভাগ ছিল দক্ষিণ দিকে প্রসারিত। সেখানে ঢিবির উচ্চতা আরও বেশি ছিল।

দেশ বিভাগের কিছু আগে উত্তর ভারত থেকে এক সন্ন্যাসী এসে নাকি গুপ্তধনের সন্ধানে ঢিবির পূর্বাংশের উঁচু স্থানে কিছু খনন কার্য চালিয়েছিলেন। সেখানে কী পাওয়া গিয়েছিল, তা জানা যায়নি। তবে এলোপাথাড়ি খননকার্যটি যে বেশ বড় রকমেরই

হয়েছিল, তা বোঝা যায় সেখানে সৃষ্ট বিরাট এক গর্ত দেখে। সেই খননের ফলে সেখানে বিরাট ও প্রশস্ত দেয়ালের ভিত্তি বের হয়ে পড়েছে।

এ ঢিবিটির আয়তন ২ একরের মত হলেও ঢিবির চারদিকের বিশেষ করে উত্তর দিকের সমতল ভূমিতেও যে এক কালে ইমারতাদির অস্তিত্ব ছিল, তা বোঝা যায় সেখানে মাটির উপরে ও নিচে অসংখ্য প্রাচীন ইটের অস্তিত্ব দেখে। প্রায় ৫ একর ভূমি জুড়ে এককালে যে এখানে অনেক ইমারতাদির অস্তিত্ব ছিল, তা সহজেই বোঝা যায়। এস্থান থেকে প্রায় ৩০০ মিটার উত্তরে একটি প্রাচীন জলাশয় আছে। প্রায় ৮০ বিঘা ভূমি জুড়ে অবস্থিত এ জলাশয়ের নাম প্রতাপ দিঘি। এ দিঘির উত্তরে প্রাচীন জনপদের কিছু কিছু চিহ্ন পাওয়া যায়, তবে উল্লেখযোগ্য কোনো ঢিবির অস্তিত্ব দেখা যায় না।

নিমশহরে একটি উল্লেখযোগ্য মাযার আছে। হাটের লাগোয়া পশ্চিমে রাস্তার পশ্চিম পাশে এ মাযার অবস্থিত। প্রায় ৬ × ৪ মিটার আয়তনের ও প্রায় ১.২ মিটার উঁচু প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে মাযারটি অবস্থিত। ইট দেখে মনে হয় মাযারটি মোঘল আমলে নির্মিত হয়েছিল। পূর্ব দেয়ালে মাযারের প্রধান প্রবেশপথ। তা ছাড়া, উত্তর দেয়ালে উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে একটি সংকীর্ণ প্রবেশপথ দেখা যায়। এ দরজাটি নাকি একটি বাঘের আসা-যাওয়ার জন্য রাখা হয়েছিল এবং উক্ত বাঘ নাকি মাযারে প্রতি রাত্রেই আসা-যাওয়া করত। স্থানীয় লোকদের বিশ্বাস মাযারে সমাহিত স্বয়ং দিওয়ান পীরই সেই বাঘ। হাল আমলে নাকি বাঘটি আর দেখা যায় না।

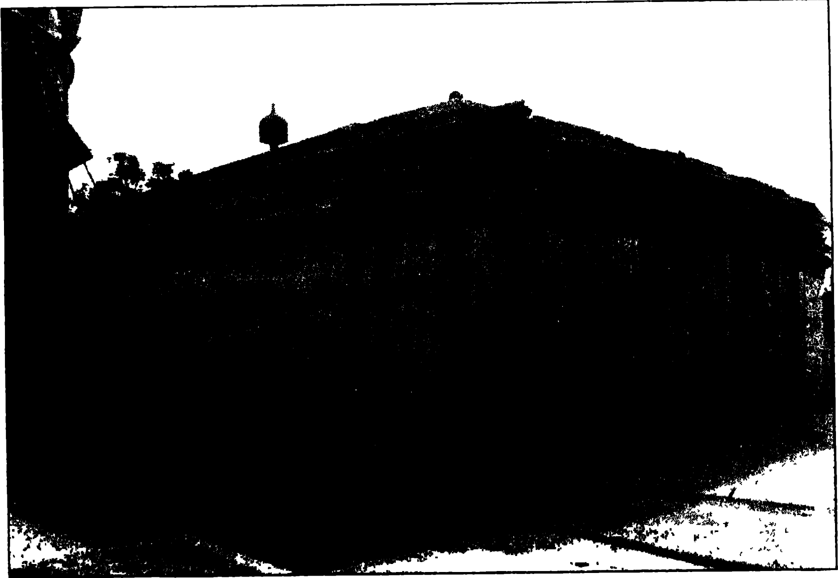
পূর্বে উল্লিখিত ২ একরের অতিকায় ঢিবিটিকে মহাভারতে বর্ণিত মৎস্য দেশের রাজা বিরাটের রাজপ্রাসাদ বলে চিহ্নিত করা হয় এবং সংক্ষেপে রাজবাড়ি বলা হয়। নৃত্যশালা, কীচক স্থান, বুরুজ ইত্যাদি ইত্যাদি নামে অন্যান্য ঢিবিগুলিকে পরিচিত করা হয়। পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাসে থাকা কালীন এখানে নাকি আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। প্রমাণ স্বরূপ একটি অতি প্রাচীন বৃক্ষকে মহাভারতে বর্ণিত শমীবৃক্ষ ও একটি স্থানকে বিরাট রাজার গো-গৃহ বলে চিহ্নিত করা হয়। গাইবান্ধা জেলার বিরাট নগরকেও যে বিরাট রাজার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়, সে সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে (বিরাট নগর দ্র.)।

রাজবাড়ির ঢিবিতে প্রাপ্ত ও স্থানীয় হাইস্কুলে রক্ষিত ৩টি পোড়ামাটির চিত্রফলক দেখে ধারণা হয় যে, এগুলি খুব সম্ভব পরবর্তী গুপ্ত যুগের। এখানে গুপ্ত আমলের একটি মুদ্রা পাওয়া গেছে বলে জানা গেছে। অনেক চেষ্টা করেও মুদ্রাটি হস্তগত করা সম্ভব হয়নি (১৯৭৪ খ্রিঃ)। এ মুদ্রা প্রাপ্তির সংবাদ, ৩টি পোড়ামাটির চিত্রফলক ও সারা অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত ধ্বংসাবশেষ গুলি দেখেই এ স্থানের সময় নির্ধারণ করা আদৌ সঙ্গত হবে না। তবে যতটুকু মনে হয় এ স্থান অত্যন্ত প্রাচীন এবং খুব সম্ভব গুপ্ত যুগে কি পাল আমলের প্রথমদিকে প্রাচীন করতোয়া নদীর তীরে একটি অতি সমৃদ্ধিশালী জনপদের অস্তিত্ব এখানে ছিল। এখানে অবস্থিত প্রায় ৫০ টি ছোট বড় ঢিবির মধ্যে লুক্কায়িত আছে মন্দির ও স্তূপাদির ধ্বংসাবশেষ। গুপ্ত যুগে এ জনপদের পত্তন হলে পাল আমল পর্যন্ত খুব সম্ভব এটি গৌরবের সঙ্গেই টিকে ছিল। তার পরে করতোয়া নদী মরে যাওয়ার ফলে এ স্থানের প্রাধান্য কমে যায় এবং পরে এ স্থানটি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে।

মুসলিম আমল

শাহজাদপুর বা মখদুম শাহ্‌র মসজিদ

নগরবাড়ি-বগুড়া পাকা সড়কের প্রায় ২ কিলোমিটার পূর্বদিকে অবস্থিত শাহজাদপুর মসজিদ সুলতানী আমলে নির্মিত এক বিরাট কীর্তি। করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত এবং উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এ মসজিদের দৈর্ঘ্য (বাইরের দিকে) ১৯.১৩ মিটার ও প্রস্থ ১২.৬০ মিটার। দেয়ালগুলি ১.৭৪ মিটার প্রশস্ত। মসজিদের ভিতরের মাপ ১৫.৬৮ মিটার × ১৯.৫২ মিটার। পূর্ব দেয়ালে ৫ টি প্রবেশপথ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ৩টি করে কুলঙ্গি আছে। প্রবেশপথগুলির উপরের অংশ অর্ধচন্দ্রকারে নির্মিত এবং প্রত্যেকটি ২.১ মিটার উঁচু ও ১.৮ মিটার চওড়া। পশ্চিম দেয়াল সংলগ্ন যে মিম্বরটি আছে, তাতে ওঠার জন্য ৭টি ধাপ বিশিষ্ট একটি সিঁড়ি আছে। মিম্বরের আয়তন ১ মিটার × .৯ মিটার।



▲ শাহ মখদুম মসজিদ, শাহজাদপুর

মসজিদের ভিতরে কাল পাথরে অতি মনোরমভাবে নির্মিত ৮টি স্তম্ভ (pillar) আছে। এই স্তম্ভ ও চারপাশের দেয়ালের উপর মসজিদের ১৫টি গম্বুজ নির্মিত। গম্বুজগুলি মাটি থেকে ৬-১৩ মিটার উঁচু। মসজিদের বাইরের দেয়ালে লতাপাতা ও ফুল-ফলের সুন্দর পোড়ামাটির চিত্র ফলক এককালে ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু মোঘল আমলে ও পরবর্তী কালে মসজিদের প্রচুর সংস্কার করা হয়। ফলে পোড়ামাটির চিত্রফলকের অধিকাংশই নষ্ট হয়ে যায়। এর পরে মসজিদে যে নতুন নতুন কাজ হয়েছে এবং চুনকাম করা হয়েছে তাতে, এগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই যে, মসজিদটি সুলতানী আমলে নির্মিত হয়েছিল। তবে মসজিদের গঠন প্রণালী ও সাবিক

স্থাপত্য শিল্পের নমুনা দেখে সহজেই ধারণা করা যায় যে, এটি পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে নির্মিত হয়নি।

মখদুম শাহ্‌দৌলা শহীদ কর্তৃক এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল বলে প্রবল জনশ্রুতি আছে। এই ধর্ম প্রচারক সম্পর্কে যে জনপ্রবাদ আছে তার উপর ভিত্তি করে খান সাহেব আব্দুল ওয়ালী যে প্রবন্ধ লিখেন[১] সংক্ষেপে তার সারমর্ম এই : ইয়েমেনের সুলতান ও হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) সঙ্গী হযরত মো'আম্ম-ইবনেজবাল-এর পুত্র শাহ্‌জাদা মখদুম শাহ্‌দৌলা তাঁর তিন ভাগিনা (১) খোওয়াজা কলন দানিশমন্দ, (২) খোওয়াজা নূর, (৩) খোওয়াজা আনোয়ার ও তাঁর ভগ্নী এবং ১২ জন দরবেশ ও অসংখ্য সহচর নিয়ে ৭টি কি ৪০ টি জাহাজযোগে এ দেশে ধর্ম প্রচার করতে আসেন। জলমগ্ন এ স্থানে আসার পর তাঁদের জাহাজ চরায় ঠেকে গেলে তাঁরা এখানেই চরের মধ্যে আস্তানা গাড়েন এবং আলোচ্য মস্‌জিদ নির্মাণ করেন। অতঃপর এ স্থানের অধিপতি বিহার (?) প্রদেশের রাজার সঙ্গে পীরের বিরোধ ঘটে। কারণ, বিধর্মী রাজা এখানে মুসলমানের বসতি স্থাপন করতে দিবেন না। যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত মখদুম শাহ্ দৌলা পরাজয় বরণ করেন এবং তাঁর মাথা কেটে বিহারে নিয়ে গেলে সেখানে রাজা অনুতপ্ত হয়ে স্থানীয় মুসলমান ডেকে এনে এটিকে সমাধিস্থ করার ব্যবস্থা করেন। পীরের মস্তকহীন দেহ মসজিদের দক্ষিণ দিকে সমাহিত করা হয়। পীরের ভগ্নী নিজের ইজ্জত বাঁচাতে গিয়ে নিকটস্থ খালে ডুবে আত্মহত্যা করেন।

এ গল্পের যে কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই এবং হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) সমসাময়িক কোনো ব্যক্তির পুত্র যে বাঙলায় আসেন নি, এ সম্পর্কে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। খুব সম্ভব পঞ্চদশ শতাব্দীতে গৌড়ের কোনো সুলতানের অর্থানুকুল্যে এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। সে সময়ে পাবনা জেলার এ স্থানে যে মুসলিম অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং কোনো হিন্দু নরপতির সঙ্গে যুদ্ধে কোনো মুসলিম পীরের শহীদ হবার সম্ভাবনা যে আদৌ ছিল না, তা বলাই বাহুল্য। খুব সম্ভব মখদুম শাহ্ দৌলা ছিলেন একজন খ্যাতনামা ধর্ম প্রচারক এবং তিনি এ অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরে মসজিদ সংলগ্ন স্থানে তাঁকে এবং পরে তাঁর সহকর্মীদের দাফন করা হয়।

পোতাজিয়া নবরত্ন মন্দির

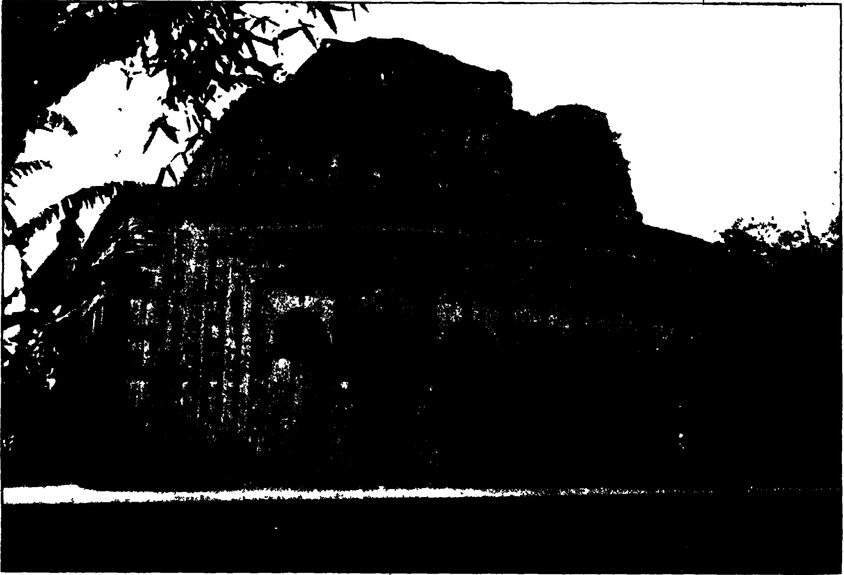
শাহ্‌জাদপুর থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পোতাজিয়া নামক একটি উল্লেখযোগ্য গ্রাম আছে। সেই গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও টিকে আছে। বর্গাকারে নির্মিত এই মন্দিরের প্রত্যেক বাহু ছিল প্রায় ৯.০৯ মিটার। দোলমঞ্চ আকারে নির্মিত মন্দিরটি ছিল তিনতল বিশিষ্ট। প্রথম তলের চার কোণে ৪টি, দ্বিতীয় তলের চারকোণে ৪টি এবং তৃতীয় তলের উপরে ১টি মোট এই ৯টি চূড়া বা রত্ন মন্দিরের উপরে ছিল। মন্দিরের চূড়াগুলি এখন (১৯৮০ খ্রিঃ) ধ্বংসপ্রাপ্ত। জঙ্গলে ঢাকা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখে মনে হয় এটি সপ্তদশ শতাব্দীর একটি কীর্তি। বৃহত্তর পাবনা

১. On the Antiquities and Traditions of Shahazdpur, J. A. S. B., pt. 1, No. 3, 1904, pp. 262-64—Khan Saheb Abdul Wali.

জেলার ইতিহাস গ্রন্থের লেখক রাধারমণ সাহা লিখেছেন : এই মন্দিরটি ১৭০০ সালে গোবিন্দরাম রায়-কৃষ্ণবল্লভ রায় তৈরি করেছিলেন বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের পক্ষে।

হাটি কুমরুলের দোলমঞ্চ ও অন্যান্য মন্দির

নগরবাড়ি-বগুড়া পাকা সড়ক থেকে আধ মাইল পূর্ব দিকে উল্লাপাড়া থানায় অবস্থিত হাটিকুমরুল নামক গ্রামে ৪টি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। সবচেয়ে বড় মন্দিরের নাম দোলমঞ্চ বা নবরত্ন মন্দির। প্রায় দিনাজপুর জেলার কান্তনগর মন্দিরের অনুকরণে গঠিত দ্বিতলবিশিষ্ট এ মন্দিরের আয়তন ১৭ মিটার × ১৭ মিটার। মন্দিরের চারদিকে টানা বারান্দা। মন্দির কক্ষটি বেশ বড়। চারদিকে প্রশস্ত দেয়াল। বারান্দার ইটের স্তম্ভগুলিও বিরাট আকারের। দেয়াল ও স্তম্ভের উপরে অতি সুন্দর পোড়ামাটির চিত্রফলক ছিল। বেশির ভাগ চিত্রফলকে ফুল ও লতাপাতার কাজ ছিল। চিত্রফলকগুলি অতি উঁচু মানের।



▲ নবরত্ন মন্দির, হাটকুমরুল, সিরাজগঞ্জ

মন্দিরের উপর তলার প্রধান কক্ষটি এখনও (১৯৭৫ খ্রিঃ) কোনো রকমে টিকে আছে। উপরের টানা বারান্দার বেশির ভাগ ধ্বসে গেছে। বারান্দার উপরের ছাদও পড়ে গেছে। মন্দিরের লাগোয়া পশ্চিম দিকে একটি মজে যাওয়া ছোট পুকুর আছে। পুকুরে নাকি একটি লোহার সিন্দুক আছে এবং সেই সিন্দুক নাকি মন্দিরের তলদেশ থেকে লোহার শিকলে আবদ্ধ। মন্দিরে সর্বমোট ৯টি চূড়া ছিল। বর্তমানে সে গুলি বিনষ্ট হয়ে গেছে।

এ মন্দির থেকে প্রায় ২০০ মিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি মাঝারি আকারের জলাশয় আছে। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা এ জলাশয়ের পশ্চিম পাড়ে একটি শিবমন্দির আছে। বর্গাকারে

নির্মিত আনুমানিক ৪ মিটার বাহু বিশিষ্ট এ মন্দিরে একটি মাত্র চূড়া আছে। চূড়াটি ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে। মন্দিরে একটি মাত্র প্রবেশ পথ এবং তা পূর্ব দেয়ালে। মন্দিরের পূর্ব দেয়ালে পোড়া মাটির চিত্রফলক আছে। ফলকগুলি নানা জীবজন্তুর এবং বেশ উন্নত মানের।

নবরত্ন মন্দির থেকে প্রায় ৫০ মিটার উত্তর-পূর্ব দিকে একটি ছোট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। বর্গাকারে নির্মিত এ মন্দিরের প্রত্যেক বাহু প্রায় ৩ মিটার। মন্দিরে যে একটি মাত্র চূড়া আছে, তা ক্রমশ সরু হয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে। মন্দির গাত্রে নানা কারুকার্য আছে। শিব মন্দির বলে কথিত এই মন্দির দোলমঞ্চের সমসাময়িক বলে জানা যায়।

এই ছোট মন্দির থেকে প্রায় ৫০ মিটার পশ্চিম দিকে প্রায় ৬ মিটার × ৪ মিটার আয়তনের একটি বিচিত্র ইমারত দেখা যায়। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এই ইমারতের উপরে দোচালা ঘরের আকারে নির্মিত পাকা ছাদ। ছাদটি দেখতে বড়ই সুন্দর। এই ইমারতের গায়ে কোনো কারুকার্য বা পোড়ামাটির চিত্র ফলক নেই। সাদাসিধাভাবে নির্মিত হলেও এই ইমারত দেখতে বড়ই মনোরম এবং ও এটি বেশ অটুট অবস্থায়ই আছে। স্থানীয় লোকদের মতে অন্তঃপুরের মহিলাদের জন্য এ মন্দির নির্মিত হয়েছিল। মন্দির নির্মাতার আবাসবাটীর ধ্বংসাবশেষ মন্দিরের লাগোয়া পশ্চিমেই দেখা যায়।

মন্দিরগুলির কোনোটাতেই কোনো শিলালিপি নেই। ডক্টর সৈয়দ মাহমুদ-উল হাসান দোল মঞ্চকে খ্রিস্টীয় ১৭ শতকের আগের নয় বলে উল্লেখ করেছেন এবং এটি ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ভূমিকম্পে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বলে তিনি বলেছেন।[১] স্থানীয় লোকদের মতে মন্দির গুলি এত প্রাচীন নয়। তাদের মতে প্রায় ১০০ বছর আগে দেবেন্দ্র ভাদুড়ী নামক একজন ব্রাহ্মণ জমিদার মন্দির গুলি নির্মাণ করেছিলেন। এই নিঃসন্তান ভদ্রলোক নাকি শেষ জীবনে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। তার পর থেকেই নাকি মন্দিরগুলি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংস হতে থাকে। পাবনাজেলার ইতিহাসে বলা হয়েছে, নবাব মুরশিদ কুলি খাঁর সময়ে (১৭০৪-১৭২৮ খ্রিঃ) রামনাথ ভাদুড়ি এটি নির্মাণ করেছিলেন।

নবগ্রাম মসজিদ ও মাযার

তাড়াশ থানার অধীনে নবগ্রাম বা নওগাঁ নামে একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। মুসলিম আমলে এখানে একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। মুসলিম আমলের অনেক কীর্তির চিহ্ন এই গ্রামে আছে। এগুলির মধ্যে নবগ্রাম শাহী মসজিদ বা মামার মসজিদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ এই মসজিদের বাইরের দিকের আয়তন ১৫.১৫ মিটার × ৯.৮ মিটার। মসজিদের প্রধান কক্ষটির ভিতরের আয়তন ৭.১২ মিটার × ৭.১২ মিটার এবং সামনের দিকে (পূর্ব দিকে) যে বারান্দাটি আছে সেটির আয়তন ৭.১২ মিটার × ৩.৬৬ মিটার। দেয়ালগুলি প্রায় ১.৫১ মিটার প্রশস্ত। মসজিদের চারকোণে ৪টি এবং বারান্দায় ২টি মিনার বা টারেট আছে। এগুলি অষ্টকোণাকৃতির এবং উপরে ছোট গম্বুজে শেষ

১. Ancient Monuments of East Pakistan, p. 206,—Dr. S.M. Hasan

হয়েছে। বারান্দার মিনার দুটি কাল পাথরে তৈরি এবং প্রত্যেকটির ব্যাস ১.৮১ মিটার। মসজিদের উপরে আছে ১ টি মাত্র গম্বুজ এবং তা বিরাট আকারের। এটি আদিতে ৭.৮৭ মিটার উঁচু ছিল। পরবর্তীকালে মসজিদটি কিছু দেবে যাওয়ার ফলে গম্বুজের উচ্চতা এখন কমে গেছে। মসজিদের সামনের দেয়ালে অনেক কারুকার্য ছিল।

বারান্দায় বর্তমানে ৩টি ছোট গম্বুজ আছে বলে জানা গেছে।

মেরামতের অভাবে এই বিরাট কীর্তিটি বহুদিন ধরে পতিত অবস্থায় পড়ে ছিল। বেশ কয়েক বছর আগে এটিকে সংস্কার করে পুনরায় চালু করা হয়েছে। এটিকে মামার মসজিদও বলা হয়ে থাকে।

মসজিদের গায়ে একটি শিলালিপি আছে। তা থেকে জানা যায় যে, সুলতান নাসির-উদ-দীন নুসরত শাহর রাজত্বকালে ৯৩২ হিজরী (১৫২৬ খ্রিঃ) সনে মোবারক খানের পুত্র জঙ্দার খান-ই-মোয়ায্যম মিঞা মোয়ায্যম আজিয়াল মিঞা এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।

মাযার

মসজিদ প্রাঙ্গণে একটি ছোট ইমারত আছে। মাযার ইমারতটি ২.৭১ মিটার লম্বা, ১.৮১ মিটার চওড়া এবং ১.৮৫ মিটার উঁচু। হযরত আব্দুল আলী বা'কী শাহ্ শরীফ জিন্দানী নামক একজন বুজুরগ পীরের মাযার বলে এটিকে চিহ্নিত করা হয়।

ভাগ্নের মসজিদ

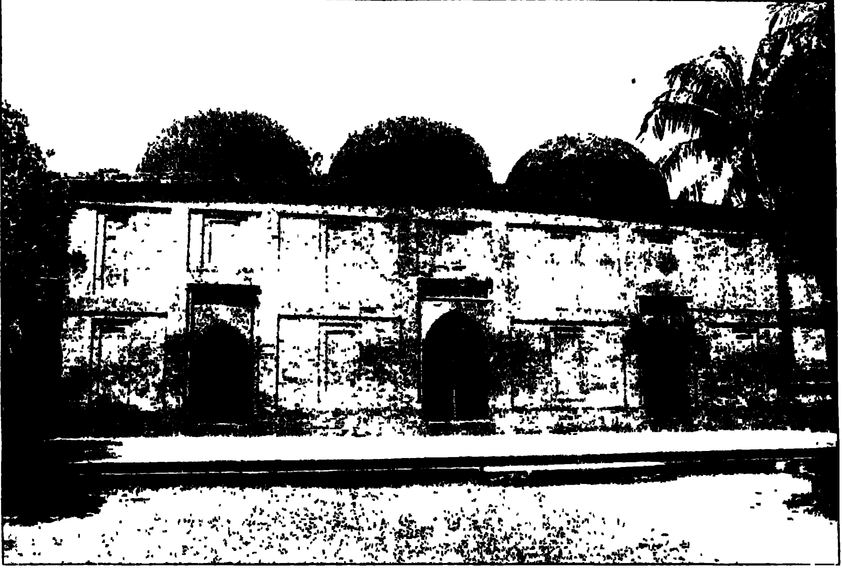
উপরে উল্লিখিত নবগ্রাম মসজিদ থেকে প্রায় ২০০ মিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি প্রকাণ্ড মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আছি। মসজিদের কোনো অংশই বর্তমানে (২০০০ খ্রিঃ) টিকে নেই। টিকে নেই কোনো দেযাল বা মিহ্‌রাব। সমগ্র মসজিদটি এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তবে সে ধ্বংসস্তূপের মাঝে দেখা যায় যে, মসজিদের ভিতরে ৮টি স্তম্ভ ছিল এবং সেগুলি ছিল প্রস্তরনির্মিত। স্তম্ভগুলি এখন ভেঙ্গে পড়ে গেছে। এসব স্তম্ভের অস্তিত্ব দেখে বোঝা যায় যে, মসজিদের উপরে মোট ১৫টি গম্বুজ ছিল এবং সামনের দেয়ালে ছিল ৫টি প্রবেশপথ। মসজিদের গায়ে একটি শিলালিপি ছিল এবং তা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পড়ে ছিল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর এ কে এম ইয়াকব আলী কর্তৃক উদ্ধারকৃত পাঠ থেকে জানা যায় যে, ১৪৫৪-৫৫ খ্রিস্টাব্দে সুলতান নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহির রাজত্ব কালে নির্মিত স্থানীয় জনপ্রবাদ মতে এটিকে ভাগ্নের মসজিদ নামক আজগুবি নামে অভিহিত করা হয়।

চাটমোহর জামে মসজিদ ও অন্যান্য কীর্তি

সিরাজগঞ্জ-ঈশ্বরদী রেল লাইনের উত্তর পার্শ্বে বড়াল নদীর তীরে অবস্থিত চাটমোহর একটি প্রাচীন স্থান। এখানে একটি বিরাট মসজিদের ধ্বংসাবশেষ এবং অন্যান্য কীর্তির

১. Dr. Abdul Karim : Corpus of Arabic and Persian Inscriptions of Bengal, pp. 127-28

চিহ্ন দেখা যায়। চাটমোহর রেল স্টেশন থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বদিকে এবং চাটমোহর নতুন বাজার থেকে প্রায় ৬০০ মিটার পূর্বদিকে একটি ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় এই মসজিদ অবস্থিত। মসজিদের গম্বুজগুলি ধসে পড়েছে, প্রাচীরের সব অংশও এখন আর টিকে নেই। তবু স্থানীয় লোকেরা এখনও এতে কোন রকমে নামাজ পড়েন।



চাট মোহর শাহী মসজিদ, পাবনা

চারদিকে অনুচ্চ প্রাচীর ঘেরা প্রায় বিঘা দুই ভূমির পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ মসজিদটির আয়তন ছিল ভিতরের দিকে ১৫.৪৫ মিটার × ৬.৮১ মিটার এবং বাইরের দিকে প্রায় ১৯.৯ মিটার × ১০৬ মিটার। মোঘল আমলের পাতলা ইটে তৈরি প্রাচীরগুলি ছিল প্রায় ১.৮১ মিটার পুরু। উপরে ছিল ৩টি সুন্দর গম্বুজ। এগুলি ছিল প্রায় ১৪ মিটার উঁচু। মসজিদের সামনের দেয়ালে সুন্দর কারুকার্য ছিল।[১]

মসজিদের উত্তর পাশে অনুচ্চ দেয়াল ঘেরা একটি ছোট কবরস্থানে একটি পাকা কবর আছে। সামনের প্রাঙ্গণের মাঝামাঝি স্থানে আছে একটি পাকা কুয়া। কূপের প্রাচীরে গ্রথিত এক খণ্ড কাল পাথরে 'কলেমা তৈয়ব' উৎকীর্ণ আছে।

মসজিদে একটি শিলালিপি ছিল। শিলালিপির পিছন দিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মূর্তি উৎকীর্ণ ছিল। শিলালিপিটি বর্তমানে রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে বলে জানা যায়। শিলালিপির পাঠ থেকে জানা যায় যে, সুলতান-উল-আ'যম আবুল ফতেহ মোহাম্মদ মাসুম খানের রাজত্বকালে তুয়ী মোহাম্মদ খান কাকশালের পুত্র

[১] প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর কর্তৃক ইতোমধ্যে মসজিদের গম্বুজগুলি নতুন করে নির্মিত হয়েছে।— গ্রন্থকার

খান মোহাম্মদ (কাকশাল) এই 'আলীশান' ইমারত ৯৮৯ হিজরী (১৫৮১-৮২ খ্রিঃ) নির্মাণ করেছিলেন।

আবুল ফজল রচিত 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, এই মাসুম খান কাবুলী ছিলেন সম্রাট আকবরের একজন সেনাপতি এবং বাঙলার বার ভূইঞাদের একজন।

তিনি বিদ্রোহী হন এবং পাবনা অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে সেখানে কিছুকাল রাজত্ব করেন। মসজিদের একটু দূরেই ছিল একটি দুর্গ। সেই দুর্গের বিশেষ কোনো চিহ্ন এখন আর টিকে নেই। তবে কিছু দূরে দূরে কয়েকটি অতি ছোট আকারের 'পাহারাঘর' এখনও দেখা যায়।

এখানে এককালে (হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে) প্রাচীন মন্দিরাদির অস্তিত্ব ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

হাণ্ডিয়ালের জগন্নাথ মন্দির ও দোচালা মন্দির

চাট মোহর থানার অধীনে ও থানা থেকে প্রায় ১৯ কিলোমিটার উত্তর, উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত হাণ্ডিয়াল একটি প্রাচীন স্থান। এখানে বৌদ্ধ-হিন্দু যুগে একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদের অস্তিত্ব ছিল। প্রাচীন করতোয়ার একটি ধারা শেরপুর মুরচা থেকে দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হয়ে ভবানীপুর, নিমগাছি, তাড়াশ, সোনাপাড়া, হাণ্ডিয়াল ও অষ্টমনীষা হয়ে দক্ষিণে পদ্মায় গিয়ে পড়ত।

বর্তমান কালে অবস্থিত মন্দির দুটি ছাড়া আরও অনেক প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ এখানে দেখা যায়। মুসলিম আমলেও এ স্থানের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। পরে এ স্থানের প্রাধান্য কমে যায়।



জগন্নাথ মন্দির, হাডিয়াল, পাবনা

জগন্নাথ মন্দির

এ স্থানের জগন্নাথ মন্দির একটি বিশিষ্ট প্রাচীন কীর্তি। ইষ্টক নির্মিত একটি অনুচ্চ ভিত্তিবেদীর উপরে নির্মিত বর্গাকৃতির এ মন্দিরের প্রত্যেক বাহু বাইরের দিকে প্রায় ১৬$\frac{১}{২}$ × ৫.৩ মিটার দীর্ঘ। দেয়ালগুলি বেশ প্রশস্ত। সামনের দিকে আছে একটি মাত্র প্রবেশপথ। খিলানের সাহায্যে নির্মিত প্রবেশ পথের উপরিভাগ খাঁজকাটা। প্রবেশপথের দু'পার্শ্ব ও উপরিভাগ সুন্দর কারুকার্য করা ইট দ্বারা অলঙ্কৃত। মন্দিরটি চার কোণাকারে প্রায় ৪.৫ মিটার সোজা উপরে উঠে গেছে। তারপরে চার কোণাকারে ক্রমাগত সরু হয়ে কলস শোভিত সূক্ষ্ম চূড়াতে শেষ হয়েছে। মাটি থেকে এর উচ্চতা প্রায় ১১.২১ মিটার।

মন্দিরে যে শিলালিপি আছে, তা থেকে জানা যায় যে, ১৫১২ শকাব্দে (১৫৯০ খ্রিঃ) জনৈক ভবানী প্রসাদ কর্তৃক এ মন্দিরের সংস্কার কার্য করা হয়েছিল। এতে ধারণা হয় যে, এর অনেক আগে আনুমানিক ১০০ বছর আগে অর্থাৎ পঞ্চাদশ শতাব্দে এ মন্দির নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে টিকে থাকা হিন্দু মন্দির গুলির মধ্যে এটি একটি প্রাচীনতম মন্দির। মন্দিরটি প্রত্নতত্ত্ব অধি কর্তৃক সংরক্ষিত আছে। মন্দিরগাত্রে যে শিলালিপি আছে, তা নিম্নরূপ,

"শাকে পক্ষেন্দু বানজ গণিতে
শ্রী জগৎপতে শ্রীমৎ ভবানী
প্রসাদেন ভগ্ন প্রাসাদাঃ উদ্ধৃতঃ।[১]

অর্থাৎ ১৫১২ শকাব্দে (১৫৯০ খৃঃ) ভবানীপ্রসাদ কর্তৃক এই মন্দিরে জীর্ণ সংস্কার হয়।"

দোচালা মন্দির বা শেঠের বাংলা

ইষ্টক নির্মিত এই দোচালা ইমারত হাণ্ডিয়াল তথা বৃহত্তর পাবনা জেলার একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এই ইমারতের আয়তন ৪.৩৪ মিটার × ২.৯২ মিটার এবং উচ্চতা প্রায় ৩.১৮ মিটার। এর চাকোণে ৪টি 'টারেট' আছে এবং এগুলিতে বলয়াকারের অলঙ্করণের কাজ আছে। সামনের দিকে আছে ১ টি মাত্র প্রবেশপথ। খিলানের সাহায্যে নির্মিত প্রবেশ পথের উপরিভাগে সুন্দর খাঁজকাটা (cusped) আছে। দরজার উভয় পার্শ্বে আছে ২টি সরু স্তম্ভ। দেয়ালের গায়ে বহু দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কিত আছে। দরজার উপরিভাগে একটির পর একটি বাঁকান রেখা আছে। মন্দিরের পাকা ছাদ বাংলাদেশের দোচালা ঘরের চালের মত করে নির্মিত। পার্শ্বদেশের দেয়াল প্রায় ত্রিভুজাকারে সোজা উপরের দিকে ছাদের চূড়া পর্যন্ত উঠে গেছে।

দরজার উপরে একটি শিলালিপি আছে এবং তা নিম্নরূপ :

"বিধু সুন্য সপ্তাবনি সংখ্যা
সাকে ব্রজরাম দাসস্য সু
তেন গেহেন্দু কৃত হিতর্থার
বদের তয়ো পূর্বসিতা বেদমনয়ত।

এতদ্দৃষ্টে জানা যায়, ইহা ১৭০১ শকাব্দে (১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে) ব্রজরাম দাসের পুত্র কর্তৃক দেবতার উদ্দেশ্যে নির্মিত।"[২]

পাইকপাড়া মসজিদ ও বুড়াপীরের মাযার

হাণ্ডিয়াল বাজারের পশ্চিম সীমান্তে পাইক পাড়ায় একটি প্রাচীন মসজিদ ছিল। ইষ্টক নির্মিত এই মসজিদে প্রস্তর স্তম্ভ ছিল। উপরে ছিল ১টি মাত্র গম্বুজ। সংস্কারের অভাবে

১. চলন বিলের ইতিকথা, ২১৪ পৃ. এম. এ. হামিদ।
২. চলনবিলের ইতিকথা, ২১৫ পৃ.—আবদুল হামিদ খান।

এই প্রাচীন কীর্তিটি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। উপরে চারদিকে গজিয়েছিল ঘন জঙ্গল। হাল আমলে মসজিদটি প্রায় নূতন করে নির্মাণ করা হয়েছে।

এটি খুব সম্ভব সুলতানী আমলের একটি মসজিদ। মসজিদের গায়ে একটি আরবী শিলালিপি ছিল। এখন সেই লিপির কোন হদিস পাওয়া যায় না। মসজিদের পূর্ব পার্শ্বেই আছে বুড়াপীর নামক এক পীরের মাযার।

তাড়াশের কপিলেশ্বর শিব মন্দির ও অন্যান্য মন্দির

হাণ্ডিয়াল থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার এবং চাটমোহর রেলস্টেশন থেকে প্রায় ৩২ কিলোমিটার উত্তর দিকে অবস্থিত তাড়াশ নামক স্থানে মোঘল আমলের একটি সুন্দর শিব মন্দির আছে, নাম কপিলেশ্বর শিব মন্দির। বর্গাকারে নির্মিত দক্ষিণ দুয়ারী এই মন্দিরের প্রত্যেক বাহু ৩.১৮ মিটার লম্বা। এর দেয়াল গুলি প্রায় ৩.০৩ মিটার সোজা উপরে উঠার পরে মঠাকারে সরু হয়ে বিন্দুতে শেষ হয়েছে। মাটি থেকে মন্দিরের চূড়া প্রায় ১২.১২ মিটার উঁচু। মন্দির গাত্রে নানা দেবদেবীর মূর্তিসহ কিছু কুৎসীৎ (obscene) মূর্তিও অংকিত আছে।



দক্ষিণমুখী শিবমন্দির, সিরাজগঞ্জ

মন্দির গাত্রে সংস্কৃত ভাষায় দুটি খোদিত লিপি আছে। একটির পাঠ থেকে জানা যায় যে "১৫৫৭ শকাব্দে (১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে) কৃতিবান নারায়ণ দেব মাতার স্বর্গারোহণ সৌকার্যার্থে পৃথিবীতে সোপান স্বরূপ অদৃষ্ট ও অশ্রুত পূর্ব এই মন্দির শম্ভুকে দান করিয়াছেন।"[১]

দ্বিতীয় লিপির পাঠ থেকে জানা যায় যে "১৬৩৬ শকাব্দে (১৭১৪ খ্রীস্টাব্দে) প্রবীণ বলরাম রায় ভক্তি সহকারে ইষ্টকাদি দ্বারা এই শিব মন্দির একবার জীর্ণ সংস্কার করিয়া দেন।"[২]

তাড়াশে আরও কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল। এগুলির মধ্যে কালিকা দেবীর মন্দির, বাসুদেব ও গোপীনাথের মন্দির উল্লেখ যোগ্য। এগুলি অতি জীর্ণ অবস্থায় টিকে আছে।

১. প্রাগুক্ত, ২৪২ পৃ.।
২. প্রাগুক্ত, ২৪২-৪৩ পৃ.।

জোড় বাংলা মন্দির

পাবনা শহরের উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত জোড় বাংলা মন্দির জেলার একটি বিশিষ্ট প্রাচীন কীর্তি। ইষ্টকনির্মিত এ মন্দির আকারে বড় নয়। এর উপরের পাকা ছাদ বাংলাদেশের অতি পরিচিত দুটি সংযুক্ত দোচালা ঘরের ছাদের মত। এ জেলার হাণ্ডিয়াল গ্রামে এ ধরনের দোচালা ঘরের মতো ছাদ বিশিষ্ট মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় (হাণ্ডিয়ালের দোচালা মন্দির দ্র.)। কিন্তু সেখানকার মন্দিরের ছাদ একটি মাত্র দোচালা ঘরের আকারে নির্মিত। আর এখানকার মন্দিরে দুটি দোচালা ঘরের ছাদ সংযুক্ত করে মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়েছে। এ ধরনের জোড় দোচালা ছাদ বিশিষ্ট ইমারত এ দেশে অতি অল্পই দেখা যায় যদিও মধ্যযুগের সাহিত্যে জোড়মন্দিরের অনেক উল্লেখ আছে। মন্দিরের সামনের দিকে ৩টি অর্ধবৃত্তাকারের খিলান বিশিষ্ট প্রবেশপথ (arch) আছে। দরজাগুলির উপরিভাগ সুন্দরভাবে খাঁজকাটা; দরজার উপরিভাগে যে কার্নিশ আছে, তা বেশ বাঁকান। সেখানে সুন্দর প্যানেলিং-এর কাজ আছে। দেয়ালগুলি বেশ প্রশস্ত। মন্দিরের বাইরের দিকে বিশেষ করে সম্মুখ ভাগে নকশা করা ইটের অতি সুন্দর কাজ আছে। বাঁকান রেখা কারুকার্যের এটি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। [জোড় বাংলা মন্দির-এর রঙিন ছবি-২]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ মন্দির নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। মন্দিরের ভিটি নির্মাণকালে বেশ উঁচু ছিল। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে মন্দিরটি বেশ দেবে যায় এবং বর্তমানে এর ভিত্তি মাটি থেকে মাত্র ২ফুট উপরে আছে।

মুর্শিদাবাদের নবাবের তহ্সীলদার জনৈক ব্রজ মোহন ক্রোরী কর্তৃক এ মন্দির নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। তাঁর সম্পর্কে গল্প আছে যে, তিনি নবাবের রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হলে নবাব তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। ব্রজমোহন তাঁর সমুদয় অর্থ নিকটস্থ জলাশয়ে নিক্ষেপ করে সপরিবারে সেই জলাশয়ে ডুবে মরেন। মন্দিরের কাছেই তাঁর পাকা বাসগৃহের ধ্বংসাবশেষ ছিল। কিন্তু এখন (১৯৮২ খ্রিঃ) সেগুলি আর টিকে নেই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
নওগাঁ জেলা

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ

মঙ্গলবাড়ি শিবমন্দির

বর্তমান কালের জয়পুরহাট জেলা শহর থেকে ১০ কিলোমিটার পশ্চিমে এবং রাজশাহী জেলার ধামইরহাট থানার অন্তর্গত এবং থানা থেকে কয়েক কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত প্রাচীন মঙ্গলবাড়ি হাট। হাট থেকে একটি রাস্তা প্রায় ৭০০ মিটার দক্ষিণ দিকে গিয়ে পশ্চিম দিকে মোড় নিয়ে প্রায় ৮০ মিটার পরে আবারও দক্ষিণ দিকে মোড় নিয়েছে। রাস্তার এই মোড়ে এবং উত্তর ও পশ্চিম দিকে রাস্তা সংলগ্ন একটি ঢিবি আছে। প্রায় দেড় বিঘা ভূমি জুড়ে অবস্থিত এবং পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা এ ঢিবির আয়তন প্রায় ৪৫.৪৫ মিটার × ৩০.৩ মিটার এবং উচ্চতা প্রায় ৪.৫ মিটার। ঢিবির উপরে (খুব সম্ভব ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে নির্মিত) একটি ছোট মন্দিরের দেয়ালগুলি ভগ্ন অবস্থায় এখনও টিকে আছে। উপরে ছাদ নেই।

মন্দিরের ভিতরে একটি আলিঙ্গনরত হরগৌরীর মূর্তির ভগ্নাবশেষ আছে। প্রস্তর নির্মিত মূর্তিটি প্রায় ১.২১ মিটার উঁচু এবং এককালে এটি যে অতি সুন্দর মূর্তি ছিল, তা সহজেই বোঝা যায়। স্থানীয় অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক তেল-সিঁদুর দিয়ে এই ভগ্ন মূর্তিকেই পূজা করে থাকেন।

মন্দিরের ভিতরে আর কোনো মূর্তি নেই। তবে মন্দিরের বাইরে ঢিবির বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি মূর্তির ভাঙ্গা অংশ পড়ে আছে। জনাব কাজী মেছের 'রাজশাহীর ইতিহাস' নামক গ্রন্থে (২য় খণ্ড, ১৫৮ পৃ.) "মন্দির চত্বরে শিবমূর্তি অঙ্কিত শিবলিঙ্গ স্থাপিত" আছে এবং "১৯৫৭ সালে হরগৌরীর সেবাইত—হরগৌরীর যুগল মূর্তিসহ ভারতে পলায়ন করিয়াছেন" বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শিবলিঙ্গ এখানে নেই এবং ভগ্ন অবস্থায় হরগৌরীর এককালের অতি সুন্দর মূর্তিটি ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দেও এখানে দেখা গেছে। এটি ছাড়া আরও কোনো হরগৌরীর মূর্তি ছিল বলে জানা যায় না।

অপেক্ষাকৃত হাল আমলের এই ভগ্ন মন্দিরটি যে-ঢিবির উপর নির্মিত, তাতে যে একটি প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ লুক্কায়িত আছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঢিবির সর্বত্র প্রাচীন কালের ইটের ছড়াছড়ি এবং স্থানে স্থানে ইটের তৈরি প্রশস্ত ভিত্তি দেয়ালের অস্তিত্বও দেখা যায়। ঢিবির লাগোয়া পূর্ব দিকে আছে একটি মজে যাওয়া প্রাচীন জলাশয়। এই ক্ষুদ্র জলাশয়ের পশ্চিম পাড়ে আছে একটি বাঁধান ঘাটের

ধ্বংসাবশেষ। খুব সম্ভব মন্দিরের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল এই বাঁধান ঘাট ও মজে যাওয়া জলাশয়টি।

মন্দিরটি খুবই প্রাচীন ছিল বলে মনে হয়। খুব সম্ভব পালযুগের মন্দির ছিল এটি। এটি হিন্দু কি বৌদ্ধ মন্দির ছিল, তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। তবে এখানে প্রাচীন হরগৌরীর মূর্তি দেখে অনেকেই এটিকে শিবমন্দির বলেই মনে করেন। খুব সম্ভব শিবমন্দিরই ছিল এটি। বর্তমান কালের ভগ্ন মন্দিরটি শিবমন্দির বলেই পরিচিত। খুব সম্ভব প্রাচীন শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর এটি নির্মিত হয়েছিল।

গরুড় স্তম্ভ

মঙ্গলবাড়ি শিবমন্দির থেকে প্রায় ১৫০ মিটার দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত নিচু স্থানে 'গরুড় স্তম্ভ' নামক একটি অতি উল্লেখযোগ্য প্রাচীন কীর্তি আছে। স্তম্ভের পশ্চিম পাশ দিয়ে মঙ্গলবাড়ি থেকে শিবমন্দির হয়ে আসা রাস্তাটি দক্ষিণ-দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চলে গেছে এবং সেই রাস্তা থেকে আর একটি রাস্তা (সরু) পূর্বদিকে চলে গেছে। এই দুই রাস্তার কোণে নিম্ন ভূমিতে স্তম্ভটি অবস্থিত। দক্ষিণ পাশের রাস্তার দক্ষিণে প্রায় ১০০ একর স্থান জুড়ে যে ভূখণ্ড আছে, তাতে ফাল্গুন-চৈত্র মাসেও কিছু কিছু পানি দেখা গেছে। এটি খুব সম্ভব একটি মজে যাওয়া বিল, মানুষের তৈরি কোনো জলাশয় নয়। স্তম্ভটি যেখানে অবস্থিত, সেই নিম্নভূমিও এককালে সেই বিলের অংশ ছিল বলে ধারণা হয়। বিলের উত্তরাংশে খুব সম্ভব স্তম্ভটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অথবা এমনও হতে পারে যে, স্তম্ভটি যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সমগ্র এলাকা জুড়ে উঁচু ভূমি ছিল। পরবর্তীকালে কোনো প্রাকৃতিক কারণে এস্থান হয়ত নিচু ভূমিতে পরিণত হয়েছে। এ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলা কঠিন। [গরুড় স্তম্ভের রঙিন ছবি-২৩]

এই বিলের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে বেশ কিছু দূরে কয়েকটি প্রাচীন জলাশয়ের অস্তিত্ব আজও টিকে আছে। কিন্তু সেখানে কোনো প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া যায় না। হয়ত ছিল। কালক্রমে সেগুলি হয়ত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। স্তম্ভের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের বিল-ভূমিতে ধান চাষ করা হয়। স্তম্ভের উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বদিকে প্রাচীন উঁচু ভূমি এবং সমগ্র অঞ্চল জুড়ে ঘন বসতি বিদ্যমান। মঙ্গলবাড়ি হাটকে কেন্দ্র করে চারদিকে আছে বেশ কয়েকটি প্রাচীন দিঘি-পুষ্করিণী। এই সমগ্র অঞ্চলে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য প্রাচীন ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় না। তবে মাটির নিচে এখানে-ওখানে প্রাচীন কালের ইট পাওয়া যায়। মঙ্গলবাড়ি হাট থেকে মাইল তিনেক দূরে বাদাল নামে একটি প্রাচীন স্থান আছে। সেখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে একটি 'কুঠীবাড়ি' ছিল। সেই কুঠীবাড়ির অধ্যক্ষ স্যার চার্লস উইলকিন্স ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে আলোচ্য স্তম্ভটি 'একটি বনভূমির মধ্যে' আবিষ্কার করেছিলেন।

'কৃষ্ণাভ ধূসর প্রস্তরে' (black basalt) নির্মিত স্তম্ভটি বর্তমানে অগ্রভাগ ভগ্নাবস্থায় প্রায় ৩.৬ মিটার উঁচু এবং নিচের দিকে এর পরিধি ১.৭৬ মিটার। স্তম্ভটি আদিতে আরও উঁচু ছিল এবং এর চূড়ায় একটি গরুড় মূর্তি ছিল। পরবর্তীকালে বজ্রপাতে মূর্তিসহ উপরের অংশ ভেঙ্গে গেছে এবং স্তম্ভটি একদিকে কিছুটা হেলেও

পড়েছে। দেশ বিভাগের বেশ কিছুকাল আগে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ স্তম্ভের মূলদেশ ইট দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছে এবং চারপাশে একটি বেড়াও দিয়েছে। এই বাঁধান অংশের পরিধি ৫.৭ মিটার। বর্তমানে বাঁধান বেদী থেকে ০.৫ মিটার উপরে সংস্কৃত ভাষায় ২৮ পঙ্ক্তির একটি শিলালিপি আছে। পঙক্তিগুলি প্রায় .৫৩ মিটার দীর্ঘ এবং অক্ষরের আয়তন প্রায় 'আধা ইঞ্চি'। স্তম্ভের গায়ে 'বজ্রলেপ' ছিল। তা স্থানে স্থানে উঠে গেলেও স্তম্ভটির 'গাত্র' মসৃণ!

স্তম্ভলিপির বাংলা অনুবাদ নিম্নে তুলে ধরা হল :[১]

১. "শাণ্ডিল্য বংশে [বিষ্ণু?] তদীয় অন্বয়ে বীরদেব, তদ্‌গোত্রে পাঞ্চাল এবং পাঞ্চাল হইতে [তৎপুত্র] গর্গ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২. "সেই গর্গ এই বলিয়া বৃহস্পতিকে উপহাস করিতেন যে,—[শক্র] ইন্দ্রদেব কেবল পূর্বদিকেরই অধিপতি, দিগন্তরের অধিপতি ছিলেন না; [কিন্তু বৃহস্পতির মত মন্ত্রী থাকিতেও] তিনি সেই একটি মাত্র দিকেও [সদ্যঃ] দৈত্যপতিগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন; [আর] আমি সেই পূর্বদিকের অধিপতি ধর্ম [নামক] নরপালকে অখিল দিকের স্বামী করিয়া দিয়াছি।

৩. "নিসর্গ-নির্মল-স্নিগ্ধা চন্দ্রপত্নী কান্তিদেবীর ন্যায়, অন্তর্বিবর্তিনী ইচ্ছার অনুরূপা, তাঁহার ইচ্ছা নাম্নী পত্নী ছিলেন।

৪. "বেদচতুষ্টয়রূপ-মুখপদ্ম-লক্ষণাক্রান্ত, স্বাভাবিক উৎকৃষ্ট পদগৌরবে ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, কমলযোনি ব্রহ্মার ন্যায়, তাঁহাদের দ্বিজোত্তম পুত্র নিজের 'শ্রীদর্ভপাণি' এই নাম ধারণ করিয়াছিলেন।

৫. "সেই দর্ভপাণির নীতি কৌশলে শ্রীদেবপাল [নামক] নৃপতি মতঙ্গজ-মদাভিষিক্ত-শিলাসংহতিপূর্ণ রেবা [নর্মদা] নদীর জনক [উৎপত্তি স্থান বিন্ধ্য পর্বত] হইতে [আরম্ভ করিয়া] মহেশ-ললাট-শোভি-ইন্দু-কিরণ-শ্বেতায়মান গৌরীজনক [হিমালয়] পর্বত পর্যন্ত, সূর্যোদয়াস্ত কালে অরুণ রাগ-রঞ্জিত [উভয়] জলরাশির আধার পূর্ব-সমুদ্র এবং পশ্চিম-সমুদ্র [মধ্যবর্তী] সমগ্র ভূভাগ কর-প্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

৬. "নানা-মদমত্ত-মতঙ্গজ-মদবারি-নিষিক্ত-ধরণিতল-বিসর্পি ধূলিপটলে দিগন্তরাল সমাচ্ছন্ন করিয়া দিকচক্রাগত-ভূপাল বৃন্দের চিরসঞ্চারমান সেনাসমূহ যাঁহাকে নিরন্তর দুর্বিলোক করিয়া রাখিত, সেই দেবপাল [নামক] নরপাল [উপদেশ গ্রহণের জন্য] দর্ভপাণির অপেক্ষায়, তাঁহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন।

৭. "সুররাজ কল্প [দেব পাল] নরপতি [সেই মন্ত্রিবরকে] অগ্রে চন্দ্রবিম্বানুকারী [মহার্হ] আসন প্রদান করিয়া, নানা নরেন্দ্র-মুকুটাঙ্কিত-পাদ-পাংসু হইয়াও, স্বয়ং সচকিতভাবেই সিংহাসনে উপবেশন করিতেন।

---

১. শ্রী অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় রচিত গৌড় লেখমালা গ্রন্থে (৭৭-৮৫ পৃ.) প্রদত্ত পাঠ থেকে সংগৃহীত। যুক্তাক্ষর বর্জন করা হয়েছে।

৮. "অত্রি হইতে যেমন চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেইরূপ তাঁহার এবং শর্করাদেবীর পরমেশ্বর বল্লভ শ্রীমান সোমেশ্বর [নামক] পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল।

৯. "তিনি বিক্রমে ধনঞ্জয়ের সহিত তুলনা লাভের উপযুক্ত [উচ্চ] স্থানে আরোহণ করিয়াও, [বিক্রম প্রকাশের পাত্রাপাত্র-বিচার-সময়ে ধনঞ্জয়ের ন্যায়] ভ্রান্ত বা নির্দয় হইতেন না; তিনি অর্থিগণকে বিত্ত বর্ষণ করিবার সময়ে, [তাহাদের মুখের] স্তুতি-গীতি শ্রবণের জন্য উদগর্ব হইতেন না, তিনি ঐশ্বর্যের দ্বারা বহু বন্ধুজনকে [সংবলিগত] নৃত্যশীল করিতেন; [বৃথা] মধুর বচন প্রয়োগেই তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিতেন না। [সুতরাং] এই সকল জগতবিসদৃশ-স্বগুণ গৌরবে তিনি সাধুজনের বিস্ময়ের উৎপাদন করিয়াছিলেন।

১০. "শিব যেমন শিবার, [এবং] হরি যেমন লক্ষ্মীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ গৃহাশ্রম-প্রবেশ-কামনায় আত্মানুরূপা রল্লাদেবীকে যথাশাস্ত্র [পত্নীরূপে] গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১১. "তাঁহাদিগের কেদার মিশ্র নামে তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণাভ কার্তিকেয়-তুল্য [এক] পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার [হোম কুণ্ডোত্থিত] অবক্রভাবে বিরাজিত সুপুষ্ট হোমাগ্নি-শিখাকে চুম্বন করিয়া, দিক্‌চক্রবাল যেন সন্নিহিত হইয়া পড়িত। তাঁহার বিস্ফারিত শক্তি দুর্দমনীয় বলিয়া পরিচিত ছিল। আত্মানুরাগ-পরিণত অশেষ বিদ্যা [যোগ্য পাত্র পাইয়া] তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল। তিনি স্ব-কর্মগুণে দেব-নরের হৃদয়-নন্দন হইয়াছিলেন।

১২. "তিনি বাল্যকালে একবার মাত্র দর্শন করিয়াই, চতুর্বিদ্যা পয়োনিধি পান করিয়া, তাহা আবার উদগীর্ণ করিতে পারিতেন বলিয়া, অগস্ত্যপ্রভাবকে উপহাস করিতে পারিয়াছিলেন।

১৩. "[এই মন্ত্রিবরের] বুদ্ধি-বলের উপাসনা করিয়া, গৌড়েশ্বর [দেবপাল দেব] উৎকল-কূল উৎকলিত করিয়া, হূণ-গর্ব খর্বীকৃত করিয়া এবং দ্রবির-গুর্জর-নাথ-দর্প-চূর্ণীকৃত করিয়া, দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমুদ্র-মেখলা-ভরণা বসুন্ধরা উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৪. "তিনি যাচকগণকে যাচক মনে করিতেন না;—মনে করিতেন, তাঁহার দ্বারা অপহৃত-বিত্ত হইয়াই, তাহারা যাচক হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার আত্মা শত্রু-মিত্রে নির্বিবেক ছিল। [কেবল] ভব-জলদি-জলে পতিত হইবার ভয় এবং লজ্জা [ভিন্ন] অন্য উদ্বেগ ছিল না। তিনি [সংযমাদি অভ্যাস করিয়া] বিষয় বাসনা ক্ষালিত করিয়া, পরম-ধাম-চিন্তায় আনন্দ লাভ করিতেন।

১৫. "সেই বৃহস্পতি-প্রতিকৃতি [কেদার মিশ্রের] যজ্ঞস্থলে সাক্ষাৎ ইন্দ্র তুল্য শত্রু-সংহারকারী নানা-সাগর-মেখলা-ভরণা বসুন্ধরার চির-কল্যাণকামী শ্রী শূরপাল [নামক] নরপাল, স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, অনেকবার শ্রদ্ধা-সলিলাপ্লুত হৃদয়ে নতশিরে পবিত্র [শান্তি] বারি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৬. "তাঁহার দেবগ্রাম জাতা বব্বা [দেবী] নাম্নী পত্নী ছিলেন। লক্ষ্মী চঞ্চলা বলিয়া, এবং [দক্ষ-দুহিতা] সতী অনপত্যা [অপুত্রবর্তী] বলিয়া, তাঁহাদের সহিত [বব্বা দেবীর] তুলনা হইতে পারেনা।

১৭. "দেবকী গোপাল-প্রিয়কারক পুরুষোত্তম তনয় প্রসব করিয়াছিলেন; যশোদা সেই লক্ষ্মীপতিকে [আপন পুত্ররূপে] স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। বব্বা দেবীও, সেইরূপ, গো-পাল-প্রিয়কারক পুরুষোত্তম তনয় প্রসব করিয়াছিলেন; যশো-দাতারা তাঁহাকে লক্ষ্মীর পতি বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

১৮. "তিনি জমদগ্নিকুলোৎপন্ন সম্পন্ন-ক্ষত্র-চিন্তক [অপর] দ্বিতীয় রামের [পরশুরামের] ন্যায়, রাম [অভিরাম] গুরুব মিশ্র এই আখ্যায় [পরিচিত ছিলেন]।

১৯. "[পাত্রাপাত্র-বিচার] কুশলগুণবান্ বিজিগীষু শ্রীনারায়ণ পাল [নরপতি] যখন তাঁহাকে মাননীয় মনে করিতেন, তখন আর তাঁহার অন্য [প্রশস্তি] প্রশংসা-বাক্য কি [হইতে পারে?]।

২০. "তাহার বাগবৈভবের কথা, আগমে ব্যুৎপত্তির কথা, নীতিতে পরম নিষ্ঠার কথা, মহতের গুণ-কীর্তনে আসক্তির কথা, জ্যোতিষে অধিকারের কথা, এবং বেদার্থ-চিন্তা-পরায়ণ অসীম-তেজঃসম্পন্ন তদীয় বংশের কথা, ধর্মাবতার ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

২১. "সেই শ্রীভৃৎ [ধনাঢ্য] এবং বাগধীশ [সুপণ্ডিত] ব্যক্তিতে একত্র মিলিত হইয়া, পরস্পরের সখ্য-লাভের জন্যই, স্বাভাবিক শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়া, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী উভয়েই যেন [একত্র] অবস্থিতি করিতেছেন।

২২. "শাস্ত্রানুশীলন-লব্ধ-গভীর-গুণ-সংযুক্ত বাক্যে [তর্কে] তিনি বিদ্বৎ সভায় প্রতিপক্ষের মদগর্ব চূর্ণ করিয়া দিতেন, এবং যুদ্ধক্ষেত্রেও অসীম-বিক্রম-প্রকাশে, অল্পক্ষণের মধ্যেই, শত্রুবর্গের 'ভটাভিমান' [যোদ্ধা বলিয়া অভিমান] বিনষ্ট করিয়া দিতেন।

২৩. "যে বাক্যের ফল তৎক্ষণাৎ প্রতিভাত হইতনা, তিনি সেরূপ [বৃথা] কর্ণ-সুখকর বাক্যের অবতারণা করিতেন না। যেরূপ দান পাইয়া [অভিষ্ট পূর্ণ হইল না বলিয়া] যাচককে অন্য ধনীর নিকট গমন করিতে হয়, তিনি কখনও সেরূপ [কেলি-দানের] দান-ক্রীড়ার অভিনয় করিতেন না।

২৪. "কলিযুগ-বাল্মীকির জন্ম-সূচক, অতি রোমাঞ্চোৎপাদক, ধর্মেতিহাস-গ্রন্থ-সমূহে, সেই পূণ্যাত্মা শ্রুতির বিবৃতি [ব্যাখ্যা] করিয়াছিলেন।

২৫. "তাহার সুর-তরঙ্গিনীর ন্যায় অ-সিন্ধু-গামিনী প্রসন্ন-গম্ভীরা বাণী [জগৎকে] যেমন তৃপ্তিদান করিত, সেইরূপ পবিত্র করিত।

২৬. "তাঁহার বংশে ব্রহ্মা স্বয়ং পিতৃত্ব গ্রহণ করিয়া, আবার স্বয়ং পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; [ইতি] এইরূপ মনে করিয়া, [লোকে] তাঁহার পূর্বপুরুষগণের এবং তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিত।

২৭. "তাঁহার [সুকুমার] শরীর-শোভার ন্যায় লোক-লোচনের আনন্দদায়ক, তাঁহার উচ্চান্তঃকরণের অতুলনীয় উচ্চতার ন্যায় উচ্চতা-যুক্ত, তাঁহার সুদৃঢ় প্রেম-বন্ধনের ন্যায় দৃঢ়সংবদ্ধ, কলি-হৃদয়-প্রোথিত-শল্যবৎ সুস্পষ্ট [প্রতিভাত] এই স্তম্ভে, তাঁহার দ্বারা হরির প্রিয়সখা ফণিগণের [শত্রু] এই গরুড়মূর্তি [তার্ক্ষ্য] আরোপিত হইয়াছে।

২৮. "তাঁহার যশ অখিল দিগন্ত পরিভ্রমণ করিয়া, এই পৃথিবী হইতে পাতাল-মূল পর্যন্ত গমন করিয়া, [আবার] এখানে হৃতাহি-গরুড়চ্ছলে উত্থিত হইয়াছে। [এই] প্রশস্তি সূত্রধার বিষ্ণুভদ্র কর্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছে।"

পাল নৃপতি নারায়ণপাল দেবের রাজত্বকালে (৮৫৪-৯০৮ খ্রিঃ) তাঁর মন্ত্রী গুরব মিশ্রের এই প্রশস্তিতে তাঁর পূর্ব-পুরুষ কেদার মিশ্র (পিতা), সোমেশ্বর (পিতামহ), দর্ভপাণি (প্র-পিতামহ), গর্গ (প্র-প্র-পিতামহ) প্রমুখ সম্পর্কেও প্রশংসা বাক্য আছে। গুরব মিশ্র নারায়ণ পালের, কেদার মিশ্র শূরপাল ও দেবপালের, দর্ভপাণি দেবপালের এবং গর্গ ধর্মপালের মন্ত্রী ছিলেন বলে স্তম্ভলিপিতে উল্লেখ আছে।

স্তম্ভলিপিটি দেখে অতি সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, এটি একটি বিশেষ লিপি এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে এবং একটি বিশেষ স্থানে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অথচ বর্তমান মঙ্গলবাড়িতে প্রাচীন কীর্তির এমন কোনো ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় না, যাতে এ স্থানকে পালদের কোনো জয়স্কন্ধাবার বা কোন প্রশাসনিক কেন্দ্র বলে ধরা যায়। কতগুলি প্রাচীন জলাশয়, একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বহনকারী একটি ঢিবি (শিব মন্দিরের ঢিবি), মাটির নিচে এখানে ওখানে কিছু কিছু প্রাচীন কালের ইটের অস্তিত্ব এবং কিছু কিছু প্রাচীন মূর্তির ভগ্নাংশ এ স্থানের প্রাচীনত্বের নির্দেশ বহন করে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ পর্যন্তই।

এতে মনে হয় যে, এখানে পালবংশীয় নৃপতিদের কোনো প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল না। খুব সম্ভব এখানে গুরবমিশ্র-কেদার মিশ্রের বাসস্থান বা মিশ্রবংশীয় ব্রাহ্মণদের আদি নিবাস ছিল এবং তাঁদের বংশের প্রশস্তি প্রচার করার প্রকৃষ্ট স্থান হিসাবে স্তম্ভলিপিটি তাঁদের বংশপরম্পরাগত বাসস্থানের নিকটবর্তী স্থানে স্থাপিত হয়েছিল। তাঁদের বাসস্থান যে এখানে ছিল, তা লিপির পাঠ থেকেই বোঝা যায়। পঞ্চদশ শ্লোকে আছে, "সেই বৃহস্পতি প্রতিকৃতি [কেদার মিশ্রের] যজ্ঞস্থলে; সাক্ষাৎ ইন্দ্র-তুল্য শত্রু-সংহারকারী নানা-সাগর-মেখলাভরণা বসুন্ধরার চির-কল্যাণকামী শ্রী শূরপাল [নামক] নরপাল স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, অনেক বার শ্রদ্ধা-সলিলাপ্লুত হৃদয়ে নতশিরে, পবিত্র [শান্তি] বারি গ্রহণ করিয়া ছিলেন"। এতে কেদার মিশ্রদের যজ্ঞ শেষে শান্তিবারি প্রদান করার সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখা যাচ্ছে।

এই অঞ্চলে এ ব্যাপারে যে জনশ্রুতি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে, তা থেকে জানা যায় যে, এই শান্তিবারি (মঙ্গলবারি) প্রদান করার প্রথা পালদের পরেও বহুকাল ধরে প্রচলিত ছিল। নানা স্থান থেকে বহুলোকের সমাগম হত এখানে এবং এখানকার ব্রাহ্মণগণ তাদেরকে মঙ্গলবারি প্রদান করতেন। সেই ট্র্যাডিশনের অস্তিত্ব প্রতি বৈশাখে

অনুষ্ঠিত একটি বাৎসরিক মেলার মধ্যে আজও বেঁচে আছে বলে স্থানীয় লোকের কাছে জানা যায়। প্রতি মঙ্গলবারে এখানে একটি হাট বসে। মুকুন্দপুর মৌজায় অবস্থিত এই মঙ্গলবাড়ি হাট যে 'মঙ্গলবারি' নামেরই রূপান্তর, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় গৌড়লেখমালা গ্রন্থে এ স্থানকে মঙ্গলবারি নামেই অভিহিত করেছেন। এ হাট অত্যন্ত প্রাচীন।

এখানে পালদের রাজধানী ছিল বলে অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় বলেছেন। ষষ্ঠ শ্লোকের টীকায় (৭৯ পৃ.) তিনি বলেন, "এই শ্লোকের বর্ণনা কৌশলে রাজভবনের নিকটেই মন্ত্রি-ভবন অবস্থিত থাকিবার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে গরুড় স্তম্ভটি অদ্যপি তাহার পুরাতন প্রতিষ্ঠাভূমির উপর দণ্ডায়মান আছে; তাহা যে মন্ত্রি-ভবনের একাংশমাত্র, তদ্বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইবার কারণ নাই; সুতরাং রাজধানীও তাহার অনতিদূরেই বর্তমান ছিল।" শ্রী মৈত্রেয় স্তম্ভটি সরেযমিনে দেখেছিলেন কিনা, জানা নেই। দেখে থাকলে তিনি এ মন্তব্য কেমন করে করেছিলেন, তা বোধগম্য হচ্ছে না।

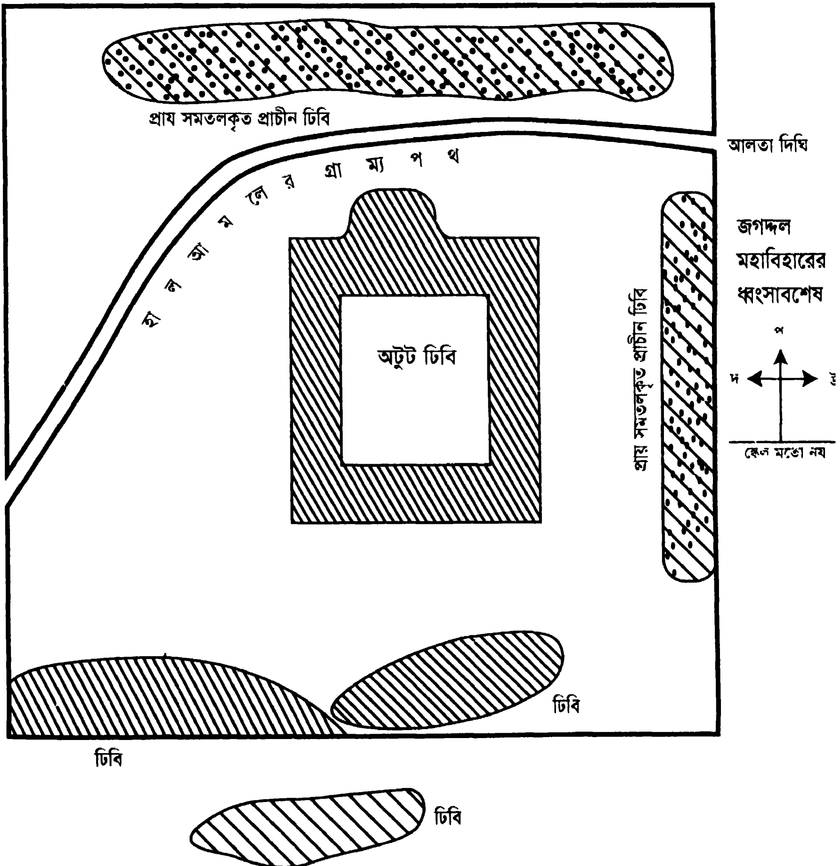
আগেই বলা হয়েছে যে, একটি নিচু ভূমির উত্তরাংশে স্তম্ভটি অবস্থিত। সে স্থানে যদি সে সময়েই উঁচু ভূমি থাকত এবং পরবর্তীকালে তা যদি প্রাকৃতিক কারণে বিলে পরিণত হয়ে থাকত (তা অসম্ভব নয়) তবে শ্রী মৈত্রেয় বর্ণিত তথাকথিত মন্ত্রি-ভবনের কিছু না কিছু ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন সেখানে অবশ্যই থাকত। স্তম্ভের মাত্র ১৫০ মিটার উত্তরে অবস্থিত শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রূপে অবস্থিত ঢিবি এ ধারণার পিছনে প্রবল সমর্থন যোগায়। অথচ স্তম্ভের চার পাশের বিস্তীর্ণ এলাকার নিম্ন ভূমিতে কোনো প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের তো দূরের কথা, একখণ্ড প্রাচীন ইট বা মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশেরও সন্ধান পাওয়া যায় না। স্তম্ভটি যদি এতকাল টিকে থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে এখানে যদি ইমারতাদি (মন্ত্রি-ভবন ইত্যাদি) থাকত তবে সেগুলির কিছু না কিছু চিহ্ন (এবং তা যতই ক্ষুদ্রই হোকনা কেন) টিকে থাকার কথা। অথচ একখণ্ড প্রাচীন ইটও এই স্তম্ভ-এলাকায় খুঁজে পাওয়া যায় না। তাতে সহজেই ধারণা করা যায় যে, এখানে কোনো ইমারতের অস্তিত ছিল না। এতে আরও মনে হয় যে, শিবমন্দিরের সামনে নিচু ভূমিতে (খুব সম্ভব বিলে) ইচ্ছা করেই এই স্তম্ভটি স্থাপন করা হয়েছিল। ধীবর বা দীবর দিঘির স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। (পরে ধীবর বা দীবর দিঘি দ্র.)।

খুব সম্ভব গুরব মিশ্রদের আবাসভবন ছিল স্তম্ভের উত্তর দিকে মঙ্গলবাড়ি হাটের নিকটবর্তী কোনো স্থানে এবং পালদের রাজধানী ছিল মঙ্গলবাড়ি থেকে কয়েক মাইল দূরে। মঙ্গলবাড়ি থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত আমাইর বা আমৈর, জগদল, যোগীর ঘোপা প্রভৃতি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ অতি প্রাচীন স্থানগুলির কোনো একটিতে পালদের তৎকালীন রাজধানী ছিল বলে ধারণা হয়। মঙ্গলবাড়ি থেকে মাত্র ১২ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত পাহাড়পুর (সোমপুর) বিহারও এই ধারণার পিছনে সমর্থন যোগায়। রাজধানীর কাছাকাছি স্থানেই যে ধর্মপালদেব এই বিশাল কীর্তি (সোমপুর বিহার) স্থাপন করেছিলেন, তাও ধারণা করা যায়।

জগদ্দল মহাবিহার

নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলায় অবস্থিত ও উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত একটি ধ্বংসাবশেষকে স্থানীয়ভাবে রাজবাড়ি নামে অভিহিত করা হয়। এটি জগদ্দল মৌজার দক্ষিণাংশে ও জগৎনগর মৌজার উত্তর দিকে অবস্থিত। জয়পুরহাট-ধামইরহাট পাকা সড়কের সামান্য উত্তরে অবস্থিত হরিতকিডাঙ্গা হাট থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার উত্তরে ও বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত থেকে প্রায় ১.৫ কিলোমিটার দক্ষিণে এটি অবস্থিত। সমগ্র বাংলাদেশের বৃহত্তম প্রাচীন জলাশয় আলতাদিঘি এই স্থান থেকে প্রায় ২.৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

বর্তমানে যে ঢিবিটি প্রায় অক্ষত অবস্থায় আছে এর চারদিকে আরও অনেক ঢিবি ছিল। এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণ ও পূর্বদিকের ঢিবিটি ছাড়া অন্যসব ঢিবি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও সে সব স্থানে অসংখ্য পাথর ও ইটের টুকরা, হাঁড়ি-পাতিলের ভগ্নাংশ ও অন্যান্য প্রত্নবস্তু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। নিচে এ ধ্বংসাবশেষের একটি স্কেচ ম্যাপ তুলে ধরা হল :



উপরে উল্লিখিত স্কেচ মানচিত্রটি আমরা যখন এ স্থানটি ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে শেষবারের মত দেখি, তখনকার অবস্থা দৃষ্টে অঙ্কিত। তখন পুর্ব পশ্চিমে দীর্ঘ এই কীর্তির পরিমিতি ছিল ১০৫ মিটার × ৮৫ মিটার এবং মাঝখানে ছিল একটি উন্মুক্ত অঙ্গন। চার পাশের প্রাচীরের উচ্চতা ছিল প্রায় ৫.৫ মিটার। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে সংরক্ষিত এ ঢিবিতে ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর কর্তৃক উৎখনন করা হয়। এর পরে পরপর দু'বার উৎখননের প্রক্রিয়া চলমান থাকলেও এখানকার উৎখনন কাজ সমাপ্ত হয়নি এবং এটিকে আংশিক খননকাজ বলাই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

উৎখননের ফলে এখানে বৌদ্ধ বিহারের যে ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে তার আয়তন পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ ১০৫ মিটার × ৮৫ মিটার এবং দেয়ালগুলি ৫.৫ মিটার উঁচু। এর পূর্ব দেয়ালে প্রায় মাঝামাঝি স্থানে একটি প্রবেশপথ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে পশ্চিম দেয়ালের মাঝামাঝি স্থানে একটি বৌদ্ধ মন্দিরও আবিষ্কৃত হয়েছে। এবং সেই মন্দির ছিল অন্তর্মুখী এবং এর পিছন দিকে ছিল একটি গর্ভগৃহ ও সামনের দিকে ছিল একটি মন্ডপ (ante-chamber)। আর এগুলিকে বেষ্টন করে নির্মিত হয়েছিল একটি প্রদক্ষিণপথ। এই প্রদক্ষিণ পথে পাশের দেয়ালের কয়েকটি স্থানে অলংকৃত কুলুঙ্গি নির্মিত হয়েছিল।

উৎখননকার্য অসম্পূর্ণ হলেও ইমারতের পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম বাহুতে (উত্তর বাহুতে এখন পর্যন্ত কোনো খননকার্য করা হয়নি) সারিবদ্ধভাবে নির্মিত কয়েকটি কক্ষ (cell) আবিষ্কৃত হয়েছে। কক্ষগুলি বেশির ভাগ মোটামুটিভাবে বর্গাকারে নির্মিত এবং এগুলির আয়তন সাধারণত ৩.৫০ মিটার × ৩.৩০ মিটার। কক্ষগুলির পিছনের দেয়াল, সামনের দেয়াল ও বিভাজক দেয়াল (partition wall) যথাক্রমে ২.৩০ মিটার ২.৩৫ মিটার ও ১.৮৫ মিটার প্রশস্ত। কক্ষগুলির প্রবেশপথের আয়তন ছিল ১.৩৫ মিটার থেকে ১.৪৫ মিটার প্রশস্ত। প্রস্তর নির্মিত গোবরটি (doorsill) পাওয়া গেছে প্রত্যেকটি প্রবেশপথে এবং কোনো কোনো কক্ষের বারান্দায় পাওয়া গেছে প্রস্তরনির্মিত বেদি (altar)। বিহারের চারকোণে অর্ধবৃত্তাকারে নির্মিত চারটি টাওয়ার (tower) ছিল বলে অনুমিত হয় এবং এর সমর্থনে দুটি টাওয়ারের অস্তিত্ব উৎখনন কালে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই বিহারটি যে একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গনকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য।

উৎখননের পরে আবিষ্কৃত স্থাপত্য শিল্পের বাইরে বেশ কিছু প্রত্নবস্তুও এখানে পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে লিপিসহ দুটি প্রস্তর স্তম্ভ (এগুলির কথা পরে আলোচিত হয়েছে) ছাড়াও পাওয়া গেছে তিনটি প্রস্তরমূর্তি, বেশ কয়েকটি পোড়ামাটির চিত্রফলক,বেশ কয়েকটি গোবরাট (doorsill), পাথরের গুটিকা ,বল ও লোহার সরঞ্জাম (iron objects)। প্রস্তরমূর্তিগুলর মধ্যে একটি হচ্ছে বিষ্ণুমূর্তি, একটি হেবজ্রমূর্তি ও তৃতীয়টি হচ্ছে মস্তকবিহিন একটি মূর্তি। বিশেষজ্ঞদের মতে তৃতীয় মূতির্টি খুব সম্ভব অবলোকিতেশ্বরের।

লিপিযুক্ত প্রস্তরস্তম্ভ দুটির একটি পাওয়া গেছে বিহারের পূর্ব দিকে প্রবেশপথের নিকট। স্তম্ভটি সর্ম্পূর্ণ রূপে উন্মুক্ত নাহলেও দুই পংক্তির লিপিটি উদ্ধার করা হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতরের কর্মকর্তা ডক্টর বিজয়কৃষ্ণ বণিক কর্তৃক যে পাঠ দেওয়া হয়েছে

তা হচ্ছে, "শ্রী গঙ্গাপুরিয়া লেখক শ্রী মক্কদান্দ নন্দিনহ্"। এর অর্থ হচ্ছে "সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাপুরের মক্কদা নন্দী কর্তৃক লিপিকৃত।"

পুনশ্চ। উপরের প্রবন্ধটি রচনার পর প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতরের উপপরিচালক জবাব মোশাররফ হোসেন কর্তৃক রচিত ও এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ ও সংলগ্ন একটি ভূমি-নকশার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। ১৯৯৬, ১৯৯৯ ও ২০০০ খ্রিস্টাব্দে উপরে উল্লিখিত কেন্দ্রীয় ঢিবির পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম ব্লকে (উত্তর ব্লকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোনো উৎখনন কার্য হয়নি) যে উৎখনন কাজ করা হয়েছে সে সম্পর্কে মোটামুটি একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন তিনি দিয়েছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে যে, পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ ও বাইরের দিকে ৮০ মি × ৭৮ মিটার আয়তন বিশিষ্ট একটি পঞ্চায়তন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ সেখানে আছে (নিম্নে প্রদত্ত ভূমি-নকশা দ্র.)। পূর্বমুখী এই মন্দিরের পশ্চিম ব্লকের মাঝামাঝি স্থানে ৬টি স্তম্ভবিশিষ্ট একটি হল কামরা ছিল। হলের পশ্চিম দিকে অফসেটের মধ্যে ছিল একটি গর্ভগৃহ(sanctum)। এর চারিদিকে ছিল প্রদক্ষিণ পথ। প্রদক্ষিণ পথের পরে উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দেয়ালে ছিল একটি করে কুলঙ্গি, পূর্ব দিকে দেয়ালের পরিবর্তে ছিল উপরে উল্লিখিত ৬টি স্তম্ভ। প্রত্যেকটি কুলঙ্গির মধ্যে মূর্তি রাখার জন্য একটি করে অলঙ্কৃত পেডেস্টেল ছিল। এগুলি ছিল খুব সম্ভব সাধারণ মূর্তি স্থাপণের জন্য এবং এ প্রতিষ্ঠানে প্রধান মূর্তিটি খুব সম্ভব কেন্দ্রীয় গর্ভ গৃহে রক্ষিত হত।

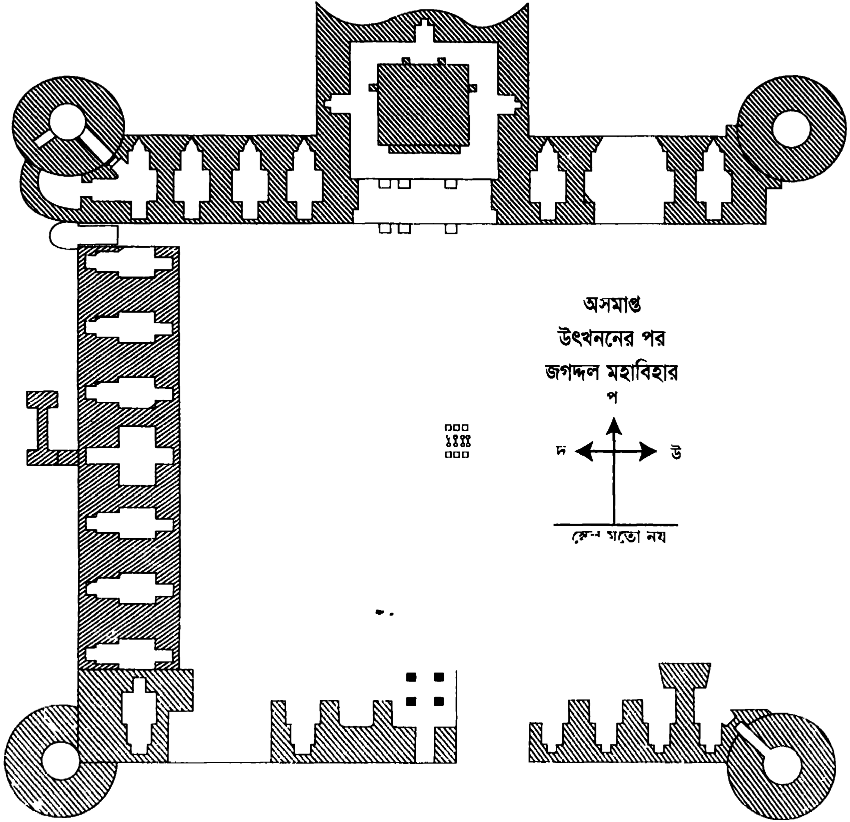
এই আয়তকার ধ্বংসাবশেষের প্রত্যেক কোণে একটি করে বৃত্তাকারের ও বিরাট আকারের সংলগ্ন স্তম্ভের অস্তিত্ব ছিল। এই স্তম্ভগুলির প্রত্যেকটির বাইরের দিকের আয়তন ছিল ২৫.৯০ মিটার এবং এগুলির প্রত্যেকটির ভিতরে ছিল একটি করে গোলাকার কক্ষ এবং সেই কক্ষের ব্যাস ছিল ৩.৫৮ মিটার। পশ্চিম দেয়ালের কেন্দ্র স্থানে ছিল তা পশ্চিম দেয়ালের অনেক দূরে প্রসারিত ছিল। এই কেন্দ্রীয় মন্দির বরাবর পূর্ব দেয়ালের কেন্দ্রস্থলে খুব সম্ভব একটি প্রবেশ পথ ছিল। উৎখননের পর সেই প্রবেশ পথের চিহ্ন ছাড়া বিশেষ কোন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়নি।[১]

এই ধ্বংসাববেশষের দক্ষিণ ও পশ্চিম বাহুতে খুব সম্ভবত ৮টি করে ছোট ছোট কক্ষ ছিল এবং পূর্ব বাহুতে ছিল খুব সম্ভবত ৯টি ছোট কক্ষ। অতিশয় ক্ষুদ্র কক্ষগুলিতে বেদি ও অন্যান্য অর্চনার জন্য ব্যবহৃত হত। দক্ষিণ বাহুর কেন্দ্রস্থলে একটি ছোট মন্দির ছিল বলে ধারণ হয় এবং সেই মন্দিরটা দক্ষিণ দেয়ালের বাইরে প্রসারিত ছিল। মন্দিরটিতে ভিতরের আঙ্গিনা থেকে প্রবেশের জন্য একটি প্রবেশপথ, প্রবেশপথের পরে একটি হলকামরা এবং হলকামরার পবে আর একটি প্রবেশপথ ছিল।

পশ্চিম বাহুর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কেন্দ্রীয় মন্দিরটি বিভিন্নরূপে অলঙ্কৃত ছিল। এর মধ্যে প্রস্তর নির্মিত একটি গোবরাটি (door sill) ছিল। এগুলির মধ্যে যে সব অলঙ্করণ ছিল সেগুলি ছিল বেশির ভাগ ধ্যানিবুদ্ধ, বুধিসত্ব, অপ্সরা, দ্বারপাল প্রভৃতির। এ মন্দিরে

১. Musharraf Husain : "panchyaa Temple discovered at Jagaddala.— Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, Vot 45, Number, 2000, PP.129-50.

টেরাকোটা মূর্তি স্থাপনের জন্য প্যানেলেয় অস্তিত্বও দেখা গেছে। ধ্বংসবাশষের মধ্যে বেশ কয়েকাট টেরাকোটা মূর্তি ও অলঙ্কৃত ইট পাওয়া গেছে। টেরাকোটাপ্লেট গুলিতে মানুষ ও প্রাণী জগতের মূতি দেখা গেছে।



মন্দিরটির ছাদ পাওয়া যায়নি বলে সে সম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে মন্দিরের মধ্যে বেলে পাথরের বহুসংখ্যক স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে এবং বেশিরভাগ স্তম্ভ ছিল অলঙ্কৃত। (carved)। এখানে ব্যবহৃত ইটের মাপ হচ্ছে ২৫.৬ সে. মিটার × ২৫.৬ সে.মি. × ৪ সে.মি. ও ২২ সে.মি. × ২২ সে.মি. × ৩ সে.মি.। এ ধরনের ইট পাল বংশো নৃপতিদের সমসয়ের কীর্তি গুলিতে দেখা যায়। ১০ থেকে ১২ খ্রিস্টীয় শতকের এই কীর্তি খুব সম্ভব পাল নৃপতি রামপালের সময়ে (১০৮২-১১২৮খ্রিঃ) নির্মিত হয়ে থাকতে পারে, সন্ধ্যাকর নন্দীর সাক্ষ্য অনুসারে।

দ্বিতীয় স্তম্ভটি পাওয়া গেছে বিহারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। স্তম্ভটি আংশিক উন্মোচিত হলেও লিপিটির পাঠ উদ্ধার করা গেছে এবং তাতে যে তিন পঙক্তির পাঠ আছে তা (ডক্টর বণিক কর্তৃক উদ্ধারকৃত) নিম্নরূপ :

'কস্থিকায় (Kosthi Kaya) স্থাত শ্রী ভব্যদাসস্যম' অর্থাৎ কায়স্তকুলের শ্রী ভবলদাসের' লিখিত বর্ণনা ('The writen acount of Sri Bhavadass (who) belonged to writer class')

ডক্টর বণিকের মতে প্রথম লিপির লিপিকাল দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ এবং দ্বিতীয়টি লিপিকৃত হয়েছিল এয়োদশ শতাব্দীতে।

ডক্টর বণিকের প্রদত্ত সময় যদি সঠিক হয়ে থাকে তবে মেনে নিতে হয় ১২০৪ কি ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়র উদ-দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পরও জগদ্দল বিহারে নির্মাণ কাজ চলেছিল। তা বোধ হয় সম্ভাব্য ঘটনা বলে ধরা যায় না। খুব সম্ভবত লিপি দুটি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকেই লিপিকৃত হয়েছিল।

এই বিহার সম্পর্কে আলোচনা শেষ করার আগে একটি কথা বলে রাখা আবশ্যক। সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিতম' গ্রন্থে 'জগদ্দল মহাবিহার'-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য উৎখননের পরে যে ক্ষুদ্র বিহারটি আবিষ্কৃত হয়েছে সেটিকে কোনো মতেই মহাবিহার বলে অখ্যায়িত করা যায় না। এর চারদিকে যে সব ধ্বংসাবশেষ এখনও (২০০০ খ্রিঃ) আছে এবং আরও যেসব ধ্বংসাবশেষ মাটির উপরে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সেগুলিতে খননকার্য চালালে খুব সম্ভব রামচরিতে উল্লিখিত মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে উপরে প্রদত্ত স্কেচ ম্যাপটিতে প্রদত্ত ধ্বংসাবশেষগুলির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে।

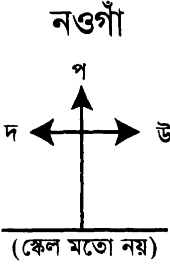
আমাদের ধারণা এখানে মহাবিহার জাতীয় একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা ছিল এবং বর্তমানে আবিষ্কৃত বিহারের মন্দিরের চারদিকে ছিল এর অবস্থান এবং এর আয়তন ছিল প্রায় ২৫০ মিটার × ২৫০ মিটার। সেই বিহারের অভ্যন্তরে আলোচ্য কেন্দ্রীয় মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং তারই ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে বর্তমান উৎখনন কার্যের পরে। এখানে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে একেবারে প্রথম দিকে মোহাম্মদ বখতিয়ারের বঙ্গবিজয়ের পরে উত্তর বঙ্গে কোনো বিহার জাতীয় ইমারত নির্মাণকে কোনো মতেই সম্ভাব্য ঘটনা বলে ধরা যেতে পারে না।

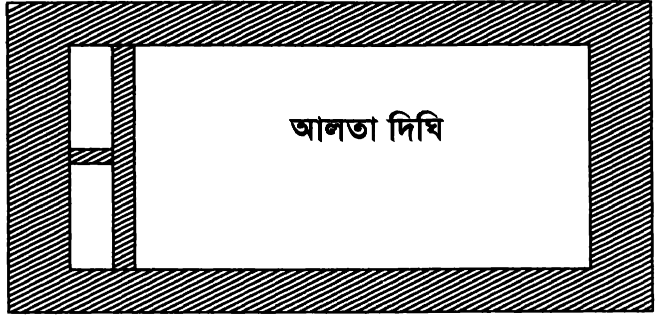
আলতা দিঘি ও অন্যান্য জলাশয়

জগদ্দল বিহার থেকে প্রায় আড়াই কিলোমিটার উত্তর-উত্তর-পশ্চিমে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী এলাকার বেশ কাছাকাছি স্থানে আলতা দিঘি নামে একটি সুবৃহৎ প্রাচীন জলাশয় আছে। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এই জলাশয়ের আয়তন আনুমানিক ১০০০মিটার × ৫০০ মিটার। আমাদের জানামতে এটি বোধ হয় বাংলাদেশের সকল হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের সর্ববৃহৎ প্রাচীন দিঘি। এর চেয়েও বড় প্রাচীন দিঘি এ দেশে আছে। কিন্তু সেগুলির কোনটাই ব্যবহারযোগ্য নয়। কারণ এগুলি সবই প্রায় ভরাট হয়ে গেছে। কিন্তু এ জলাশয়টি এখনও জলে পরিপূর্ণ এবং এতে বর্তমানে মাছের চাষ হচ্ছে।

দিঘির পাড়গুলি পাহাড়ের মতো উঁচু এবং এর দক্ষিণ পাড় খুবই প্রশস্ত। প্রত্যেক পাড়েই অনেক শালগাছ দেখা যায়। এ স্থান বর্তমান কালে উত্তরবঙ্গে একটি

উল্লেখযোগ্য প্রমোদ-কেন্দ্র এবং এখানে বনভোজনের জন্য অসংখ্য লোকের সমাগম হয়। মাছ চাষের সুবিধার জন্য দিঘির দক্ষিণাংশে দুটি ছোট পুকুরের সৃষ্টি করা হয়েছে।





আলতা দিঘি থেকে শুরু করে জগদ্দল মহাবিহার পর্যন্ত প্রায় ২০ বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে অসংখ্য প্রাচীন জলাশয়ের অস্তিত্ব ছিল। আমরা ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে যখন এ স্থান শেষ বারের মতো দেখি তখনও সমগ্র এলাকায় এক শতেরও বেশি জলাশয়ের অস্তিত্ব ছিল এবং এগুলির অধিকাংশই ছিল প্রায় মজে যাওয়া জলাশয় এবং সেগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটিতে বাঁধান ঘাটের চিহ্নও আমরা দেখতে পেয়েছি এবং অনেক ক'টা জলাশয় যে নিচু ধানি জমিতে পরিণত করার চেষ্টা চলেছে তাও আমরা দেখেছি। এসব জলাশয়ের ধারে কাছে অসংখ্য ভগ্ন ইট ও হাঁড়ি-পাতিলের অংশ প্রচুর সংখ্যায় দেখা গেছে।

আলতা দিঘি খুবই প্রাচীন। কত প্রাচীন তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও এটি যে পালযুগের পরের নয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পাহাড়পুর (সোমপুর) বিহার

শান্তাহার-পার্বতীপুর রেল লাইনের জামালগঞ্জ স্টেশন থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার পশ্চিমে নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলায় অবস্থিত পাহাড়পুর বিহারের প্রকৃত নাম সোমপুর বিহার। দ্বিতীয় পাল নৃপতি ধর্মপালদেব (৭৭০-৮১০ খ্রিঃ) কর্তৃক নির্মিত এই অসাধারণ কীর্তি ও পার্শ্ববর্তী এলাকা বহুকাল ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল। ফলে বিহারটি পাহাড়ের মতো উঁচু এক বিরাট ঢিবিতে পরিণত হয়। চারদিকের সমতল ভূমির মাঝখানে প্রায় ৪০ একর স্থান জুড়ে অবস্থিত, এবং প্রায় ৩১ মিটার উঁচু এ ঢিবিকে স্থানীয় লোকেরা পাহাড়পুর বলে আখ্যায়িত করেন।

মিঃ বুকানন-হ্যামিলটন সর্ব প্রথম এই ধ্বংসাবশেষের কথা কাগজে-কলমে উল্লেখ করেন।[১] ১৮০৭-১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে পূর্ব ভারত সফর কালে তিনি এ স্থান পরিদর্শন করেন এবং ঢিবির উচ্চতা ৩০ থেকে ৪৫ মিটার বলে উল্লেখ করেন। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের আগে দিনাজপুর জেলার তদানীন্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ওয়েস্টমেকট এস্থান পরিদর্শন করেন এবং এখানে অনুসন্ধান কার্য চালান। তিনি মিঃ বুকানন-হ্যামিলটনের

১. Montugomery Martin, Eastern India pt III. p. 669. "The most remarkable ruin in this division......"

অনুমানকে সমর্থন করেন এবং এ স্থানকে পাল যুগের একটি বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বলে চিহ্নিত করেন। এর পরে বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহ্যাম এখানে এসে কেন্দ্রীয় মন্দিরের চূড়ার উচ্চতা ২৬ মিটার বলে সঠিকভাবে অনুমান করেন। তিনি এখানে বিরাট আকারের উৎখনন কার্যের প্রচেষ্টা চালালে এই ভূখণ্ডের মালিক বলিহারের জমিদার কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হন। এ স্থান ছিল তখন গভীর ও দুর্গম জঙ্গলে আচ্ছাদিত এবং চিতাবাঘ ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ। এসব সত্ত্বেও তিনি ঢিবির শীর্ষদেশে খনন কার্য চালান। কিন্তু জমিদারের প্রতিকূলতার জন্য তিনি কাজ শেষ করতে পারেননি। কিন্তু তিনি ভুল করে এটিকে ব্রাহ্মণ্য মন্দির ('Brahmanical temple') বলে অভিহিত করেন।

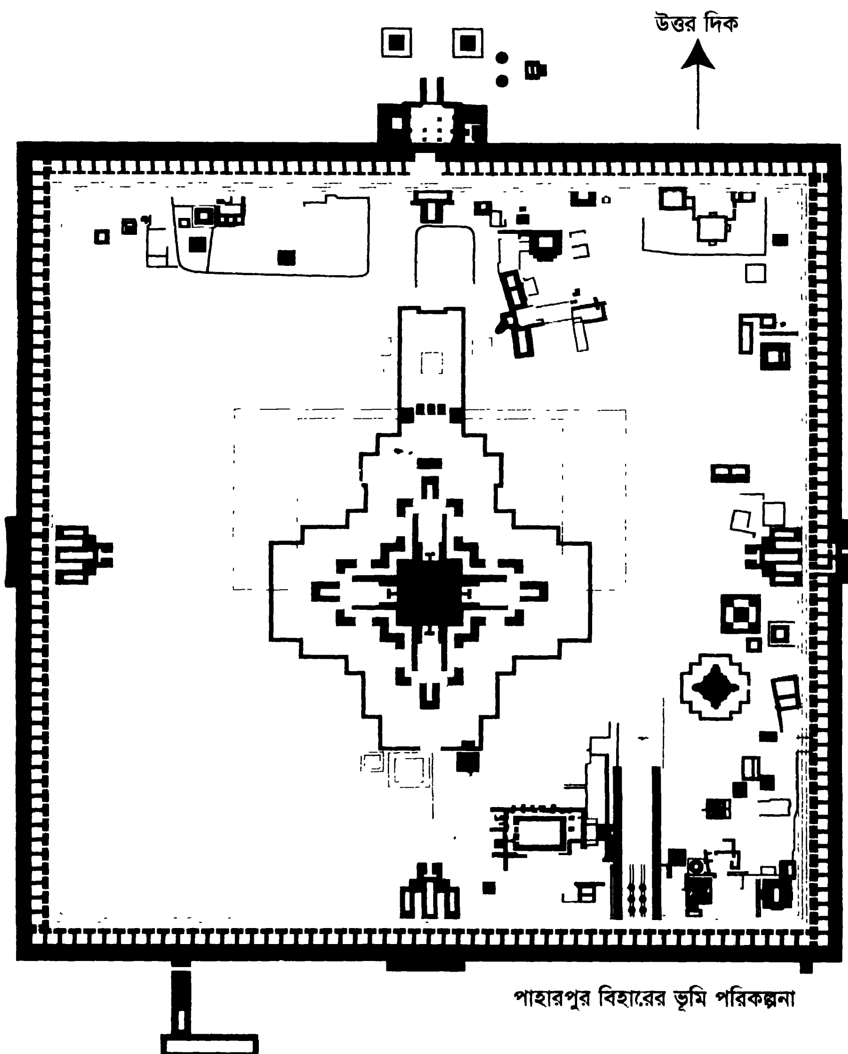
১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে এই কীর্তিটি তদানীন্তন ভারত সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত কীর্তি (Protected monument) বলে ঘোষিত হয়। তখন দীঘাপতিয়ার জমিদার কুমার শরৎ কুমার রায়ের অর্থানুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভাণ্ডারকারের তত্ত্বাবধানে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে এখানে সর্বপ্রথম নিয়মিত (regular) উৎখনন কার্য করা হয়। এর পরে ১৯২৫-২৬ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ বাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে এখানে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক উৎখনন কার্য করা হয়। তিনি কেন্দ্রীয় মন্দিরের ভূমি-পরিকল্পনা (ground-plan), উত্তর দিকের প্রধান সিঁড়ি, উত্তর দিকের মণ্ডপ, হল কামরা প্রভৃতি এবং দেয়াল-চিত্রণ রীতির কিছু পরিচয় উদ্ধার করেন। ১৯৩০-৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বাবু জি, সি, চন্দ্রের পরিচালনায় এখানে আরও উৎখনন কার্য চলে। পরিশেষে ১৯৩৩-৩৪ খ্রিস্টাব্দে বাবু কে, এন, দীক্ষিতের পরিচালনায় এখানে সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ উৎখনন কার্য করা হয়। এবং সত্যপীরের ভিটাসহ পাহাড়পুর বিহারের একটি মোটামুটি পরিচ্ছন্ন রূপ ধরা পড়ে। এর পরে আজ (১৯৮৩ খ্রিঃ) পর্যন্ত এখানে তেমন বড় ধরনের খনন কার্য আর করা হয়নি।

বিহার ইমারত

দুর্গাকারে নির্মিত ও উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ পাহাড়পুর বিহারের আয়তন প্রায় ২৮৩.৮ মিটার × ২৮২.০৭ মিটার। চারদিকের বেষ্টক প্রাচীর প্রায় ৪.৪ মিটার চওড়া। এটিকে পিছনের দেয়াল হিসাবে ব্যবহার করে বিহারের চার ব্লকের কক্ষগুলি নির্মিত হয়েছে। উত্তর ব্লকে মোট ৪৫টি এবং অন্য তিন ব্লকের প্রত্যেকটিতে ৪৪ টি করে সমগ্র বিহারে মোট ১৭৭ টি কক্ষ আছে। এগুলি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বসবাস ও অধ্যয়নের জন্য নির্মিত হয়েছিল।

কক্ষগুলির সামনে ছিল ২.৩২ মিটার থেকে ২.৪০ মিটার চওড়া টানা বারান্দা এবং বারান্দার শেষ প্রান্তে ছিল অনুচ্চ দেয়াল এবং তাতে বিহার অঙ্গনে অবাধ প্রবেশের পথ বন্ধ ছিল। তবে প্রত্যেক ব্লকে মাঝে মাঝে পাকা সিঁড়ি ছিল এবং সেখানে দেয়ালে ছোট ছোট প্রবেশপথ ছিল। এগুলির সাহায্যে কেন্দ্রীয় মন্দির ও বিহার অঙ্গনে যাবার ব্যবস্থা ছিল। বারান্দার উপরে পাকা ছাদ ছিল এবং কক্ষগুলির শেষ দেয়াল ও বারান্দার প্রান্তে নির্মিত স্তম্ভের উপরে নির্মিত ছিল সেই ছাদ।

ভিক্ষুদের বসবাসের জন্য নির্মিত ১৭৭ টি কক্ষের প্রায় সব ক'টাই ছিল প্রায় একই আয়তনের। প্রত্যেকটি কক্ষের আয়তন ছিল ৪.২০ মিটার × ৪.০১ মিটার। প্রত্যেক কক্ষে ১টি করে প্রবেশপথ ছিল এবং তা ছিল বাইরের দিকে সরু এবং ভিতরের দিকে প্রশস্ত। কক্ষগুলিতে কোনো জানালা ছিল না। তবে দেয়ালের মধ্যে কুলঙ্গি ছিল। কতগুলি কক্ষে পাকা বেদীর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। খুব সম্ভব পরবর্তী কালে সে সব কক্ষ ধর্মীয় ক্রিয়া-কলাপের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল এবং বেদীগুলি সেকারণেই নির্মিত হয়েছিল।



পাহারপুর বিহারের ভূমি পরিকল্পনা

কোনো কক্ষেরই ছাদ বা সম্পূর্ণ উচ্চতা পাওয়া যায়নি। তাই কক্ষগুলি একাধিক তলবিশিষ্ট ছিল কিনা, তা সঠিকভাবে বলার মতো কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। তবে দেয়ালগুলির অসাধারণ প্রশস্ততা এবং কেন্দ্রীয় মন্দিরের অসাধারণ উচ্চতা দেখে ধারণা হয় যে, বিহারের কক্ষগুলি হয়ত একাধিক তলবিশিষ্ট ছিল।

পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ ব্লকের ঠিক মধ্যভাগে বিহারের বহির্দেয়াল ছিল উদগত। সেই উদগত অংশের ঠিক সামনে ছিল ৩টি করে কক্ষ। এই কক্ষ ৩টির তিনদিকে ছিল সরু টানা বারান্দা এবং তা সামনের প্রধান বারান্দার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। উত্তর ব্লকের ঠিক কেন্দ্রস্থলে ছিল বিহারের প্রধান প্রবেশ পথ ও হলঘর। এ সম্পর্কে পরে বর্ণনা আছে।

কক্ষগুলি প্রথমে ভিক্ষুদের বসবাসের জন্য নির্মিত হলেও পরবর্তী পর্যায়ে বিহারটি পুনর্নির্মাণ কালে সর্বমোট ৯২ টি কক্ষে অলঙ্কৃত বেদী-আসন (pedestal) তৈরি করা হয়েছিল বলে দেখা যায়। এতে ধারণা হয় যে, পরবর্তীকালে এসব কক্ষে ধর্মীয় ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠনাদি হত। গভীর খনন কার্যের পরে যে সব কক্ষের প্রথম পর্যায়ের নির্মাণ কার্য উদ্ধার করা হয়েছে, সে-গুলির মেঝেতে কোনো বেদী-আসন দেখা যায়নি।

দুর্গাকারে নির্মিত এ বিহারের সদর প্রবেশপথ ছিল মাত্র একটি এবং তা যে উত্তর ব্লকের কেন্দ্রস্থলে ছিল, সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বহির্দেয়ালে উদগত অংশ সৃষ্টি করে প্রধান প্রবেশ পথটি নির্মাণ করা হয়েছে। এই উদগত অংশটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ছিল সুবৃহৎ। এই উদগত অংশের বাইরে উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম দিকে বেশ কয়েকটি ছোট আকারের ইমারতের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এগুলি প্রহরীদের কক্ষ ছিল, না অতিথি-অভ্যাগতদের বিশ্রামাগার ছিল, তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। এগুলির মধ্যে দু-একটিতে নিবেদন স্তূপের ধ্বংসাবশেষ থাকাও বিচিত্র নয়।

প্রথম প্রবেশপথের শুরুতেই ছিল বিরাট আকারের একটি তোরণ। সেই তোরণের ভিতর দিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলে সামনেই পড়ত বিরাট হলকামরা। উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ এই হলকামরার আয়তন ছিল ১৫.২৫ মিটার × ১৪.২৪ মিটার। চার পাশের দেয়াল এবং ভিতরে অবস্থিত কয়েক সারি স্তম্ভের উপরে নির্মিত ছিল এর পাকা ছাদ। হল ঘরের দু'পাশে ছিল ২টি করে কক্ষ। কিন্তু হল ঘর থেকে এ গুলির কোনো প্রবেশপথ ছিল না। ভিতরের টানা বারান্দা থেকে দু'দিকে দুটি আবাসিক কক্ষের ভিতর দিয়ে এ কক্ষ দুটিতে প্রবেশ করতে হত। এই চারটি কক্ষ কি উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছিল, তা সঠিকভাবে জানা যায়নি।

হলঘরের দক্ষিণ দেয়ালে ছিল একটি অপরিসর প্রবেশপথ। এ দরজার কপাট ভিতর থেকে বন্ধ থাকত। দরজার পরেই ছিল উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ ১১.২১ মিটার × ৭.২৭ মিটার আয়তনের ভিতরের হলঘর। তিন দিকের দেয়াল ও ভিতরে অবস্থিত কয়েক সারি স্তম্ভের উপরে নির্মিত ছিল এই হলঘরের পাকা ছাদ। এই হল ঘরের দক্ষিণ দিকে কোনো দেয়াল ছিল না এবং এর উন্মুক্ত অংশ বিহারের প্রধান টানা বারান্দার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

বিহারের এই প্রধান প্রবেপথ ছাড়া আরও ২টি ক্ষুদ্র প্রবেশপথের সন্ধান পাওয়া গেছে। উত্তর ব্লকের ১৫ ও ১৬ নম্বর কক্ষের (প্রধান প্রবেশপথের পূর্বদিক থেকে গণনা

করে) মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র প্রবেশপথের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে। আর একটি ছোট প্রবেশপথের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গেছে পূর্ব ব্লকের মধ্যস্থলে অবস্থিত উদগত অংশের ঠিক মাঝখানে। সত্যপীরের ভিটায় অবস্থিত মন্দিরাদিতে ও নিকটস্থ নদীর ঘাটে যাতায়াতের জন্য খুব সম্ভব পূর্বদিকের পথটি রাখা হয়েছিল। উত্তর ব্লকের ছোট পথটি কেন রাখা হয়েছিল, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছেনা। এগুলি ছাড়া সমগ্র বিহারে আর কোনো প্রবেশ পথ ছিল না।

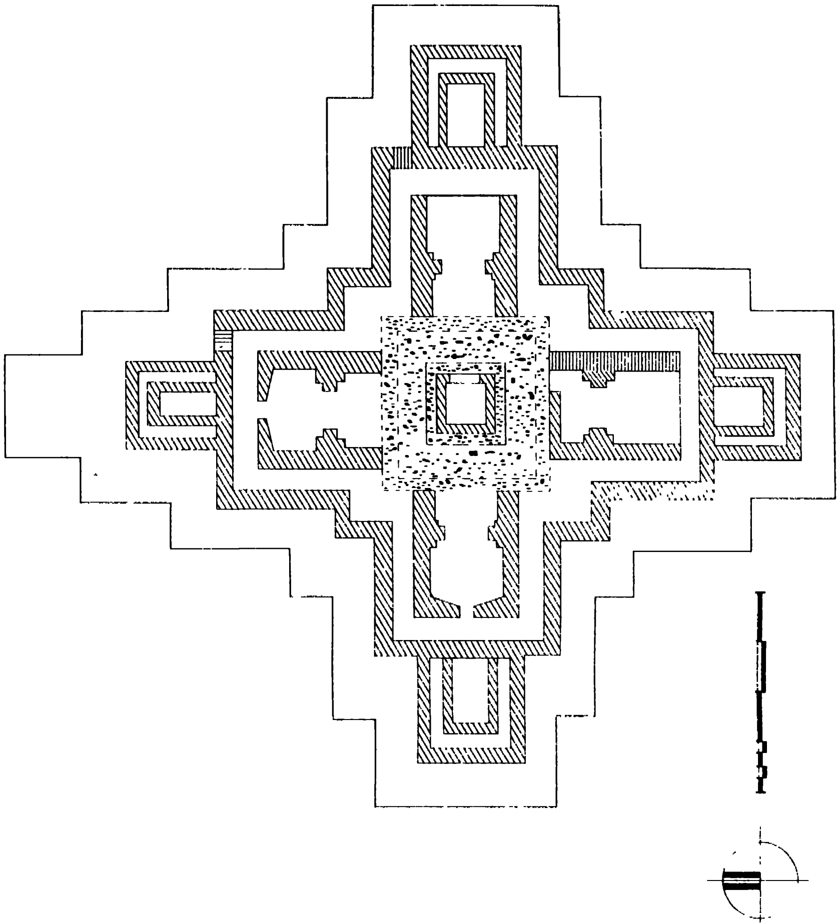
সদর তোরণ, বাইরের ও ভিতরের হলঘর অতিক্রম করার পরেই ছিল প্রশস্ত সিঁড়ি। সিঁড়ির পরেই ছিল সামান্য একটু উন্মুক্ত স্থান। এর পরেই ছিল মাঝারি আয়তনের পাড় বাঁধান একটি পুকুর। এই জলাশয়ের পশ্চিম ও পূর্ব পাড় ঘেঁষেই ছিল দক্ষিণ দিকে অবস্থিত কেন্দ্রীয় মন্দিরে যাবার জন্য বাঁধান পথ। বিহার অঙ্গনের পানি নালার সাহায্যে এই পুকুরে এনে জমা করা হত।

কেন্দ্রীয় মন্দির

বিহার অঙ্গনের প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই মন্দির এক বিরাট অট্টালিকা এবং স্থাপত্য শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এই মন্দিরের আয়তন ১০৭.৮৭ মিটার × ৯৫.১৫ মিটার। ভূমি পরিকল্পনায় মন্দিরটি দেখতে ক্রুশের মতো এবং এর প্রত্যেক বাহুতে উদগত অংশ আছে। ইট ও কাদার সাহায্যে নির্মিত এই বিরাট মন্দির ধাপে ধাপে উঁচু হয়ে গেছে এবং সর্বোচ্চ অংশ বর্তমানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও এখনও যা টিকে আছে, তা পাশের সমতল ভূমি থেকে প্রায় ২১.৮১ মিটার উঁচু। আদিতে মন্দিরের শীর্ষদেশ আরও অনেক উঁচু ছিল। তবে কত উঁচু ছিল, তা সঠিকভাবে জানা যায়নি।

মন্দিরের চারদিকের দেয়ালের নিম্নাংশে ৬৩ টি প্রস্তরমূর্তি সংযোজিত আছে। পার্শ্বস্থ ভূমি মাটি পড়ে পড়ে উঁচু হয়ে যাওয়ার ফলে মূর্তিগুলি এখন মাটিতে ঢেকে গেছে। এই মূর্তিগুলির উপরে তিনসারি অলঙ্কৃত ইটের তৈরি উদগত কার্নিশের পরেই একসারি পোড়ামাটির চিত্রফলক মন্দিরের চারদিকের দেয়ালের গাত্রে সংযুক্ত ছিল। এই সারিবদ্ধ চিত্রফলকগুলির উপরে মন্দিরের চারদিক বেষ্টন করেছিল প্রশস্ত টানা বারান্দা বা প্রদক্ষিণপথ। এই বারান্দা বা প্রদক্ষিণপথের ভিতরের উঁচু দেয়ালে আছে আর এক সারি পোড়ামাটির চিত্রফলক। এর পরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে মন্দিরের দ্বিতীয় ধাপ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ধাপে আছে আর একটি প্রদক্ষিণপথ। সমান্তরাল প্রাচীর বেষ্টিত এ প্রদক্ষিণপথের দেয়ালের উপরে আছে আর এক সারি পোড়ামাটির চিত্রফলক। প্রথম সারির মতো এ সারির চিত্রফলকগুলিও মন্দিরের চারদিকেই আছে।

এর পরের ধাপে মন্দিরের চারদিকে ছিল ৪টি বিরাট বিরাট কক্ষ। এ কক্ষগুলির চারদিকেও প্রদক্ষিণপথ ছিল এবং প্রদক্ষিণপথের চারদিকে ছিল সমান্তরাল দেয়াল। কক্ষ চারটি অত্যন্ত প্রশস্ত এবং মেঝে অত্যন্ত শক্তভাবে নির্মিত। এগুলির মধ্যে প্রস্তর নির্মিত বেদী ও চৌকাঠ পাওয়া গেছে। কক্ষগুলির উপরে ছাদ ছিল। কিন্তু বর্তমানে সেগুলি নেই। প্রস্তরনির্মিত বেদীগুলিতে খুব সম্ভব মূর্তি রাখা হত।



কেন্দ্রীয় মন্দিরের ভূমি নকশা

এ কক্ষগুলির উপরে বর্তমান ধ্বংসাবশেষের যে সর্বোচ্চ কক্ষটি আছে, তা চতুষ্কোণ এবং নিরেটভাবে.ইটের তৈরি। উৎখননের পরে মিঃ দীক্ষিত অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, মন্দিরের প্রধান কক্ষটি মন্দিরের শীর্ষদেশে ছিল এবং সেই কক্ষটি বর্তমান ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই অস্তিত্ববান ছিল। অর্থাৎ উপরে বর্ণিত নিরেট কক্ষটিই ছিল মন্দিরের প্রধান কক্ষ।

কিন্তু এ কক্ষ উৎখনন করে দেখা গেছে যে, এটি শূন্যগর্ভ এবং সেখানে ইটবাঁধান মেঝে আছে। এই মেঝে উপরে উল্লিখিত ৪টি কক্ষের মেঝের প্রায় সমতলে অবস্থিত। কিন্তু চারদিকের কক্ষ থেকে এ কক্ষে যাওয়ার কোনো প্রবেশ পথ নেই এবং পূর্বে ছিল

এবং পরে সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তেমন কোনো চিহ্নও নেই। সেই কক্ষে কোনো বেদী বা দেয়ালে কোনো কুলঙ্গি নেই যেখানে মূর্তি রাখা যেত। পাকা মেঝের উপরে 'করবেল' পদ্ধতিতে ইটের উপর ইট ন্যস্ত করে ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে তার উপরে উঁচু দেয়াল নির্মাণ করাই ছিল খুব সম্ভব পূর্বোক্ত কেন্দ্রীয় কক্ষটি নির্মাণের একমাত্র উদ্দেশ্য। পূর্বোক্ত চারটি বিরাট কক্ষই ছিল খুব সম্ভব এই বিশাল মন্দিরের প্রধান কক্ষসমূহ। এই কক্ষ চারটিতেই খুব সম্ভব মূর্তিগুলি রক্ষিত হত এবং ধ্যান-ধারণার কাজ চলত। [কেন্দ্রীয় মন্দিরের রঙিন ছবি-২৯]

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তবে চারটি প্রধান কক্ষের উপরেও মন্দিরকে আরও অনেক উঁচু করা হয়েছিল কেন? এ চারটি কক্ষের উপরে অবস্থিত নিরেট কক্ষটি যে অনেক উঁচু এবং এর উপরেও যে মন্দিরটি আরও অনেক উঁচুতে উঠেছিল, তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ নিরেট কক্ষটি খুব সম্ভব নির্মিত হয়েছিল উপরে নির্মিত অংশটির ভিত্তি হিসাবে এবং এই উপরের অংশটি ছিল খুব সম্ভব মন্দিরের শীর্ষদেশে অবস্থিত ও মন্দিরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি কল্পে নির্মিত 'টাওয়ার' জাতীয় কোন স্থাপত্যকলার নিদর্শন।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপে অবস্থিত বিশ্ববিখ্যাত 'বরবদোর' বৌদ্ধ মন্দিরের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দে নির্মিত এই বিশাল মন্দিরের গঠন-প্রণালী দেখে এক নযরেই বোঝা যায় যে, এটি পাহাড়পুর বিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরের অনুকরণে নির্মিত হয়েছে। মন্দিরের সর্বোচ্চ অংশে স্তূপ জাতীয় যে গোলাকার স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন আছে, তাতে উৎখনন করে দেখা গেছে যে, সেখানে কোনো মূর্তি নেই, কোনো মূর্তি স্থাপিত হবার প্রমাণও নেই এবং সেখানে কোনো প্রবেশ পথও নেই। নিছক সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যই এ 'টাওয়ার' জাতীয় শীর্ষদেশ নির্মিত হয়েছিল। পাহাড়পুর মন্দিরের সর্বোচ্চ অংশে যে টাওয়ারের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়, সেটিও খুব সম্ভব অনুরূপ উদ্দেশ্যেই নির্মিত হয়েছিল।

সিঁড়ি

উত্তর ব্লকের মাঝামাঝি স্থানে যে বাঁধান পুকুরটি আছে তার দক্ষিণেই ছিল কেন্দ্রীয় মন্দিরে যাবার জন্য ইটবাঁধান প্রশস্ত পথ। রাস্তার পরেই ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে গেছে তিন তলায় অবস্থিত এবং উপরে বর্ণিত ৪টি প্রধান প্রকোষ্ঠের উত্তর দিকেরটির সীমানা পর্যন্ত। সেখানে মন্দিরের বেশ কিছু অংশ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে উপরে ওঠার আর কোনো সিঁড়ির অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। খুব সম্ভব মন্দিরশিখরে ওঠার সিঁড়ি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক স্থাপত্যকার্য ছিল সেখানে। জাভার বরবদোর মন্দিরের সর্বোচ্চ অংশে ওঠার জন্য সিঁড়ির অস্তিত্ব দেখে ধারণা হয় যে, পাহাড়পুর বিহারেও অনুরূপ সিঁড়ি ছিল।

প্রস্তরমূর্তি

মন্দিরের ভিত্তিভূমিসংলগ্ন দেয়ালে যে ৬৩ টি প্রস্তর মূর্তি আছে, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে উত্তর দেয়ালে ২২ টি ও দক্ষিণ দেয়ালে আছে ৪১ টি মূর্তি।

মূর্তিগুলি সামঞ্জস্যহীনভাবে স্থাপিত দেখে ধারণা হয় যে, কোনো পূর্ব পরিকল্পিত নীতি অনুসরণ করে এগুলি স্থাপিত হয়নি। কিন্তু মূর্তিগুলির উচ্চতা একই মাপের দেখে মনে হয় যে, এগুলি আদিতে পরিকল্পিতভাবেই স্থাপিত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে খুব সম্ভব মন্দির মেরামতকালে এগুলি হয়ত যথেচ্ছভাবে এখানে-ওখানে লাগান হয়েছে।

এই ৬৩ টি মূর্তির মধ্যে মাত্র একটি ছাড়া বাকি ৬২ টি মূর্তিই হিন্দু দেব-দেবীর। দক্ষিণ দেয়ালের প্রায় মধ্যভাগে স্থাপিত এই বৌদ্ধ মূর্তিটি হচ্ছে বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির। এত বিরাট একটি বৌদ্ধ বিহারের মধ্যে শুধু একটি বৌদ্ধ মূর্তির অস্তিত্ব বিশেষ কৌতূহলের সৃষ্টি করে। পাল নরপতিরা ধর্মের ব্যাপারে যে বেশ উদারপন্থী ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাঁদের বিভিন্ন তাম্রশাসন থেকেই। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যে ব্যবধান ও রক্ষণশীলতার বাধা-নিষেধ পরিলক্ষিত হয়, পালদের সময়ে এবং তাঁদের আগেও তেমনটি বোধ হয় ছিল না। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে একটি সমন্বয়ের ভাব ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে একটি সহমর্মিতার পরিবেশ খুব সম্ভব সেকালে বিদ্যমান ছিল।[১] তাই বৌদ্ধ মন্দির গাত্রে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি স্থাপন করা হয়ত আদৌ দূষণীয় ছিল না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নালন্দা মহাবিহারেও অনুরূপ হিন্দু দেবদেবীর অনেক মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।

গঠনশৈলী ও শৈল্পিক উৎকৃষ্টতার বিচারে পণ্ডিতেরা মূর্তিগুলিকে সাধারণত ৩ ভাগে বিভক্ত করে থাকেন। কতগুলি মূর্তির শৈল্পিক উৎকর্ষ ও গঠন-সৌকর্য দেখে এগুলিকে 'গুপ্ত ক্লাসিকেল' যুগের যথাযথ প্রাচ্য সংস্করণ বলে ধরা হয়। কৃষ্ণ, বলরাম, শিব, যমুনা প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর প্রশস্ত বক্ষ ও ক্ষীণ কটিদেশ, দেহের সঙ্গে সংলগ্ন সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ আবরণ এবং সর্বোপরি মূর্তিগুলির গঠনে স্বাভাবিকতা ও বিভিন্ন অংগ-প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য সমুদয় ভাস্কর্যকে যে সূক্ষ্মতা ও কমনীয়তা দান করেছে, তাতে এগুলিকে পরবর্তী গুপ্ত যুগের বলেই ধরে নিতে হয়। সংখ্যায় কম হলেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তার জন্য এসব মূর্তির সত্তা পৃথকভাবে ধরা পড়ে।

গুপ্ত ক্লাসিকেল যুগের এই সব শিল্প-নিদর্শনগুলি বাদ দিলে বাকি মূর্তিগুলির মধ্যে যে সমস্ত স্থানীয় বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তাতে এগুলিকে মন্দির নির্মাণের সমসাময়িক কালের বলে ধরা হয়ে থাকে। এগুলির মধ্যে আছে কৃষ্ণলীলা ও রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনী ও অন্যান্য বিষয় অবলম্বনে সৃষ্ট ভাস্কর্য। এগুলির মধ্যে উন্নত মানের শিল্প সৌকর্যের বিশেষ কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। মূর্তিগুলির গঠনের মধ্যে আনুপাতিক হারের অভাবও পরিলক্ষিত হয়। অপটু হস্তে গঠিত মূর্তিগুলিতে দেহের সুন্দর সুন্দর বাঁক গুলি ঢেকে দেওয়া হয়েছে মোটা খাড়া কাপড় দিয়ে। মূর্তিগুলির বড় বড় চোখ, পুরু ঠোঁট, গোলাকার স্থূল মুখাবয়ব এক স্থূল সৌন্দর্য বোধের পরিচয় বহন করে। এগুলি 'শিল্পশাস্ত্র' ও প্রতিমা গঠনের গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত বলে ধরা যেতে পারে। কিন্তু এসব মূর্তি নির্মাণে পারিপার্শ্বিকতার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও তার প্রতি গভীর অনুভূতি

১. The Jagadishpnr Copper plate grant of the Gupta year 128—Journal of the Varendra Research Museum, 1972 Vol. I, p. 28.

শিল্পীকে যে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল, তার ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে প্রতিটি ভাস্কর্যের অঙ্গে। সমসাময়িক মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার চিত্র রূপায়িত হয়েছে মূর্তিগুলির অঙ্গে। শৈল্পিক অপরিপক্কতার ত্রুটিগুলি পূরণ করে দিয়েছে সূক্ষ্ম ও গভীর মানবতাবোধের প্রকাশ। এই মানবতাবোধের ভিত্তি হচ্ছে পারিপার্শ্বিক দৈনন্দিন জীবনের রূঢ় বাস্তবতা। এদিক থেকে বিচার করতে গেলে এ শ্রেণীর ভাস্কর্যগুলির তাৎপর্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ শ্রেণীর ভাস্কর্যগুলির সংগে সময়ের দিক থেকে সম্পৃক্ত আর এক শ্রেণীর ভাস্কর্য আছে। এগুলির পৃথক সত্তা সহজেই ধরা পড়ে। এগুলি সম্পর্কে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের পরিচালক ডক্টর নাজিমুদ্দীন বলেন, "মূর্তিগুলোর শরীরের বিরাটত্ব, বস্ত্রের স্থূলভাব এবং অলঙ্করণ বাহুল্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই শ্রেণীভুক্ত মাত্র গুটিকয়েক মূর্তি ছাড়া প্রায় সবগুলোতেই একটা নিষ্প্রাণ কাঠিন্য ও দেহের বিশেষ করে পায়ের গঠনে ঋজু ভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। এ সমস্ত ভাস্কর্যে পায়ের গঠন এমন যে, সেগুলোকে দেহের ভার বহনকারী স্তম্ভ বলেই মনে হয়। গঠন মাধুর্যের অভাব ও চাতুর্যহীনতার জন্য এ জাতীয় ভাস্কর্যগুলোতে গুপ্ত 'ক্লাসিকেল' রীতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রৈখিক সারল্যের একান্ত অভাব। এই ভাস্কর্যগুলোতে পায়ের নখ ও আঙ্গুলের গঠনের কোন চেষ্টা নেই। কেবলমাত্র আঁচড় কেটে নখ ও আঙ্গুলের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া চোখের ভ্রূও অত্যন্ত মোটা করে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এ জাতীয় ভাস্কর্যগুলো নিশ্চিতভাবে ক্ষীয়মান গুপ্তযুগ ও সমৃদ্ধিশালী পালযুগের যুগ সন্ধিক্ষণে বাঙালি শিল্পীদের ভাস্কর্য প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি।"[১]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, গুপ্ত যুগের মূর্তিগুলি মহারাজা ধর্মপালদেব কর্তৃক নির্মিত এ মন্দির নির্মাণ কালে গঠিত হয়নি। এর থেকে কেউ কেউ অনুমান করেন যে, পরবর্তী গুপ্তযুগের শেষ ভাগে এ মন্দিরের নির্মাণ কার্য শুরু হয়। এ অনুমানের পিছনে কোনো হেতু আছে বলে মনে না। উৎখনন কার্যের ফলে দেখা গেছে যে, গুপ্ত যুগে নির্মিত হবার কোনো চিহ্নই পাহাড়পুর বিহারের কোনো ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নেই। পরবর্তীকালে সংস্কার ও পুনর্গঠনের প্রমাণ বহন করলেও সমগ্র বিহার যে, একই পর্যায়ে (এবং তা ধর্মপালের সময়ে) নির্মিত হয়েছিল, তার পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া গেছে উৎখনন কার্যের ফলে।

সেক্ষেত্রে ধারণা করা যেতে পারে যে, গুপ্তযুগের মূর্তিগুলি খুব সম্ভব অন্য কোনো ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির থেকে সংগ্রহ করে বিহারের কেন্দ্রীয় মন্দির গাত্রে সন্নিবেশিত করা হয়েছিল। কেউ কেউ অনুমান করেন যে, বর্তমান কেন্দ্রীয় মন্দিরের স্থানে একটি জৈন মন্দির অবস্থিত ছিল। এ সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছু বলা কঠিন। ১৯৩৩-৩৪ খ্রিষ্টাব্দে পাহাড়পুর বিহারের যে উৎখনন কার্য সমাপ্ত হয়েছে, তাতে কেন্দ্রীয় মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগের তলদেশের খুব গভীরে যাওয়া হয়নি। ফলে ধর্মপালদেবের সময়ে নির্মিত মন্দিরের সন্ধানই পাওয়া গেছে। এর বাইরে কিছু আছে কি নেই, সে সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে তা যে অনুমান ভিত্তিক হবে, তা বলাই বাহুল্য।

---

১. মহাস্থান ময়নামতী পাহাড়পুর, ৮১ পৃ.—ডক্টর নাজিমুদ্দীন আহমদ।

পোড়ামাটির চিত্রফলক (Terra-cotta Plaques)

বর্তমান কালে মন্দির গাত্রে ৩ সারি পোড়ামাটির চিত্রফলক যে সংযোজিত অবস্থায় দেখা যায়, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। এগুলির সংখ্যা প্রায় ২ হাজার। তা ছাড়া প্রায় ৮০০ পোড়ামাটির চিত্রফলক খননকালে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকা অবস্থায় পাওয়া যায়। চিত্রফলকগুলি বিভিন্ন মাপের। কোনো কোনোটি বেশ বড় আকারের ০.৩৯ মিটার × ০.৩০ মিটার × ০.০৮ মিটার। আবার কোনো কোনোটি মাত্র ০.১০ মিটার × ০.১০ মিটার আয়তনের। তবে সাধারণভাবে এগুলি ০.১২ থেকে ০.১৯ মিটার লম্বা ও ০.১৩ মিটার চওড়া। ফলকচিত্রগুলি সুপরিকল্পিতভাবে মন্দির গাত্রে সংযোজিত অবস্থায় দেখা যায় না। এগুলি কি আদিতেও এ রকম পরম্পরাহীন অবস্থায় সংযোজিত হয়েছিল, না পরবর্তীকালে মন্দির সংস্কারের সময় এ ঘটনা ঘটেছিল, তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন।



▲ পোড়ামাটির ফলকচিত্র.

এদেশে পোড়ামাটির চিত্রফলকের অস্তিত্ব পালযুগের অনেক কাল আগেও যে প্রচুর পরিমাণে ছিল, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং ক্রমেই পাওয়া যাচ্ছে। গুপ্ত যুগের অসংখ্য চিত্রফলক পাওয়া গেছে। এমন কি শুঙ্গ যুগের পোড়ামাটির চিত্রফলকও পাওয়া গেছে। তার আগের কথা অবশ্য সঠিকভাবে বলা যায় না। গুপ্তযুগের বিশেষ করে পরবর্তী গুপ্ত যুগের চিত্রফলকগুলির শৈল্পিক সৌকর্য অতি উন্নতমানের। এদিক থেকে বিচার করতে গেলে পাহাড়পুরের চিত্রফলকগুলি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট মানের। মন্দির গাত্রে স্থাপিত পালযুগের প্রস্তর মূর্তিগুলির (প্রস্তর মূর্তি দ্র.) মধ্যে যে সূক্ষ্ম গঠন-নৈপুণ্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়, পোড়ামাটির চিত্রফলক গুলিতেও সে ত্রুটি পুরাপুরিই বিদ্যমান। দুই এর মধ্যে এ সাদৃশ্য দেখে মনে হয় যে, পোড়ামাটির চিত্রফলক ও প্রস্তর মূর্তিগুলি

একই সময়ের এবং মন্দির নির্মাণের সমসাময়িক কালের। অর্থাৎ পোড়ামাটির চিত্রফলকগুলি নবম শতাব্দীর প্রথম দশক অথবা অষ্টম শতাব্দীর শেষ পাদের আগের নয়।

ধর্মীয় তাৎপর্য প্রদর্শনের নিমিত্ত পোড়ামাটির চিত্রফলকগুলি যে বিশেষভাবে নির্মিত হয়নি, তার প্রমাণ চিত্রফলকগুলির মধ্যেই আছে। একটিমাত্র বুদ্ধমূর্তির (ভূমি স্পর্শ মুদ্রায়) চিত্রফলক আছে পূর্বদিকের ভিত্তি দেয়ালের প্রায় কেন্দ্রস্থলে। এটি ছাড়া বোধিসত্ব, পদ্মপাণি, মঞ্জুশ্রী, তারা প্রভৃতি মহাযান মতবাদ সম্পর্কিত বৌদ্ধ দেবদেবীর বেশ কিছু চিত্রফলক আছে। শিবের বিভিন্নরূপ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গণেশ, সূর্য প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর চিত্রফলকও এখানে-ওখানে সংযোজিত আছে। এ সমস্ত চিত্রফলক ধর্মীয় তাৎপর্য প্রদর্শন অপেক্ষা সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্যই স্থাপিত হয়েছিল বলে ধারণা হয়। ধর্মীয় তাৎপর্য প্রদর্শনের জন্য হলে মূর্তিগুলির ধারাবাহিকতা বজায় থাকায় ও পার্শ্ববর্তী ইতর প্রাণী ও সাধারণ মানুষের চিত্রগুলি থেকে পৃথকভাবে স্থাপিত হবার কথা। তা নেই। এ ধরনের এলোমেলোভাবে সাজান কি আদিতেই ছিল, না পরবর্তী-কালে মন্দির সংস্কার করার সময় করা হয়েছে, তা অবশ্য সঠিকভাবে বলা যায় না।

পোড়াপাটির চিত্রফলকগুলির ধর্মীয় তাৎপর্য বা শৈল্পিক সৌন্দর্য যা'ই থাক না কেন, এগুলির মাধ্যমে তখনকার দিনের বাঙালি জীবনের যে চিত্রটির পরিচয় পাওয়া যায়, তার মূল্য অপরিসীম। শ্রীকৃষ্ণের লীলাখেলার ছবি বিভিন্ন ফলকচিত্রে আছে। কিন্তু দেবতা কৃষ্ণের চেয়ে মানুষ কৃষ্ণের প্রেমের খেলার চিত্রটিই সেখানে পরিস্ফুট হয়েছে বেশি। প্রেমিক কানুর সংগে বাঙালি জীবনের যে কোনো প্রেমিকের একাত্মতা লাভ করার মতো শ্রীকৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক চিত্রফলকগুলি সাধারণ মানুষের প্রেমের কাহিনীকেই চিহ্নিত করেছে যেন। 'পঞ্চতন্ত্র', 'বৃহৎ কথা' প্রভৃতি লোক-সাহিত্যের আখ্যানবস্তুকেও রূপায়িত করা হয়েছে চিত্রফলকগুলির মাধ্যমে এবং প্রচুর হাস্যরসের উপাদান সেগুলিতে আছে।

সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনের দৈনন্দিন সাধারণ সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার যে আলেখ্য বেশির ভাগ চিত্রফলকগুলিতে তুলে ধরা হয়েছে, তা সত্যই অপূর্ব ও অতুলনীয়। সন্তান-কোলে জননী, কূপ হতে পানি উত্তোলনকারিণী, কলসী কাঁখে রমণী, দরজার পাশে প্রতিক্ষারতা স্ত্রী, কঙ্কালসার কুব্জদেহে কাঁধে ঝুলায়মান বোঝা, লাঠি হাতে দাঁড়িওয়ালা পথিক ও সন্ন্যাসী, পূজারত ব্রাহ্মণ, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রসহ পুরুষ ও স্ত্রী গায়ক-গায়িকা, লাঙল কাঁধে কৃষক, উপবিষ্ট মনুষ্য মূর্তি, হাতের উপর দেহের ভারসাম্য রক্ষারত ব্যায়ামবীর, প্রণয়াসক্ত নারী ও পুরুষ প্রভৃতি চিত্রফলকগুলিতে বাঙালি সমাজ জীবনের যে চিত্রগুলি তুলে ধরা হয়েছে, তা যেমন প্রাণবন্ত তেমনি বাস্তবধর্মী। এ ধরনের আরও অসংখ্য চিত্রফলক আছে। তখনকার দিনের বাঙালি সমাজজীবন ও সংস্কৃতির একটি পূর্ণ আলেখ্য যেন তুলে ধরা হয়েছে এ চিত্র-ফলকগুলির মাধ্যমে।

আর আছে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের চিত্র। নানারকম গাছ, লতাপাতা ও ফুলের মধ্যে কলাগাছ ও পদ্মফুলের প্রাধান্য বেশি দেখা যায়। প্রাণী জগতের চিত্রগুলি অধিক ব্যাপক। হস্তী, ব্যাঘ্র, সিংহ, বরাহ, বৃষ, মহিষ, বানর, শৃগাল, হরিণ, বেজী, খরগোশ,

সর্প, টিকটিকি, রাজহাঁস, পাতিহাঁস, ময়ুর, কচ্ছপ, বৃশ্চিক, বিভিন্ন মৎস্য ইত্যাদির চিত্রগুলির মধ্যে মধ্যে যে ভঙ্গিমা ও স্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়, তা সত্যই অপরূপ।

এ সমস্ত পোড়া মাটির চিত্রফলকের মধ্যে উন্নত মানের শৈল্পিক উৎকর্য ও সূক্ষ্ম গঠন পদ্ধতির অভাবের কথা আগেই বলা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে চিত্রগুলির দেহের গঠন মোটেই সমানুপাতিক নয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আঙ্গুল বা নখ গঠনের কাজ সামান্য আঁচড় কেটেই সমাধা করা হয়েছে। শিল্পকলার মাপকাঠি দিয়ে বিচার করতে গেলে এগুলির মধ্যে তেমন মহত্ব (greatness) আরোপ করা যায় না সত্য কিন্তু শিল্পসম্মতভাবে বিচারই এগুলির সঠিক মূল্যায়নের একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়। "বৈচিত্র্যপূর্ণ এই লোকায়ত শিল্পে প্রকৃতি ও মানুষ স্থিতিশীলতা ও গতিবেগে সম্ভব-অসম্ভব সকল ভঙ্গীতেই শিল্পায়িত হয়ে এক অপূর্ব মহত্ত্ব লাভ করেছে।" তখনকার দিনের সহজ সরল গ্রামীণ শিল্পীরা সহজলভ্য পুকুর বা বিলের এঁটেল মাটি দিয়ে গ্রামীণ জীবনের সর্বস্তরের যে সব মূর্তি গঠন করতেন, তারই নমুনা (হয়ত রাজানুগ্রহে আরও একটু উন্নতরূপে) প্রতিফলিত হয়েছে মন্দির গাত্রে। সেখানে শিল্পচাতুর্যের দৈন্য থাকতে পারে, দৈন্য থাকতে পারে জ্যামিতিক পরিমাপের, কিন্তু জীবনের প্রতি গভীর অনুভূতি ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের প্রাচুর্য সেই দৈন্যকে পূরণ করে দিয়েছে। আর সেই সঙ্গে চিত্রগুলি হয়েছে প্রাণবন্ত ও বাস্তবমর্ধী।

বিহার অঙ্গনের বিভিন্ন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ

পূর্বার্ধ (দক্ষিণভাগ)

বিহারের পূর্বব্লকের কেন্দ্র স্থলে অবস্থিত সিঁড়ির দক্ষিণ দিকে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আছে। এগুলির মধ্যে পরবর্তীকালে নির্মিত কেন্দ্রীয় মন্দিরের একটি প্রতিকৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতে প্রধান মন্দিরের পরিকল্পনাটি অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রতিকৃতির উত্তর দিকে ছোট ছোট ৩টি "মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। এগুলি নিবেদন স্তূপ। এই প্রতিকৃতির দক্ষিণে ৫টি ছোট মন্দিরের ভিত্তি দেখা যায়। এগুলিও নিবেদন স্তূপ বলে মনে হয়। মন্দিরগুলির উপরিভাগ বিশেষভাবে অলঙ্কৃত এবং ভিত্তিতেও অলঙ্কৃত প্রোজেকশন যুক্ত অর্ধ গোলাকার কার্নিশ রয়েছে।"[১] এগুলির মধ্যে ষোল কোণবিশিষ্ট একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ বড়ই আকর্ষণীয়। এটির আকার নক্ষত্রের মত। "এর পাশাপাশি উত্তর দিকে আয়তাকার 'প্রোকেজশন'-যুক্ত দুইটি চতুষ্কোণ ভিত্তি বেদী আছে। তাতে ছিদ্র বিশিষ্ট কার্নিশ আছে। পশ্চিম দিকের একটি মাত্র 'প্রজেকশন'যুক্ত, অন্য তিনটি মন্দিরের ভিত্তি পরিকল্পনা পূর্বদিকের দুটির তুলনায় সরল অলঙ্করণযুক্ত ও প্রাচীনতর। কেননা দেখা যায় নক্ষত্রাকৃতি মন্দিরের ভিত্তি বেদী অপর তিনটি মন্দিরের ভিত্তিবেদীর উপর রচিত।"[২] এ পাঁচটি ছোট মন্দিরের চারদিকে যে বেষ্টনী প্রাচীর দেখা যায়, তা পরবর্তীকালের বলে

১. মহাস্থান ময়নামতী পাহাড়পুর, ৭৮ পৃ.।—ডক্টর নাজিমুদ্দীন আহমদ।
২. প্রাগুক্ত।

ধারণা হয়। বিহারের বারান্দা থেকে এগুলির সংগে যে সিঁড়ি-সংযোগ দেখা যায়, তাও পরবর্তীকালের বলে মনে হয়।

এ মন্দিরগুলির উপর দিকে ২.৫১ মিটার ব্যাসবিশিষ্ট ইটের তৈরি একটি সুন্দর কূপ দেখা যায়। কূপের কিছু পশ্চিমেই একটি লম্বা হলঘর। এটি ছিল বিহারের ভোজনশালা। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ হল ঘরের দু'পাশের দেয়াল ৩৬ মিটার পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। স্তম্ভ ও চারপাশের দেয়ালের উপর প্রতিষ্ঠিত এ গৃহের কাঠের ছাদ খুব সম্ভব অগ্নিকান্ডের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। কারণ, এখানে স্তূপীকৃত পোড়া কাঠ ও ছাই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। ভোজনশালার পশ্চিম দিকে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা যে হল ঘরটির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, সেটি ছিল খুব সম্ভব বিহারের রন্ধনশালা। রন্ধনশালার কাছে ৩টি পাকা কূপের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিহারের এ অংশে আরও কিছু ধ্বংসাবশেষ আছে এবং উৎখনন করলে আরও অনেক ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যাবে।

পূর্বার্ধ (উত্তর ভাগ)

পূর্বব্লকের মধ্যভাগে ৩.৫ মিটার প্রশস্ত একটি সিঁড়ি বিহার অঙ্গনে প্রায় ১০ মিটার পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। এ সিঁড়ির ৬টি ধাপ পাথরের তৈরি এবং ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে শেষ ধাপের পাথরগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত। এ সিঁড়ির উত্তরে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আছে। এগুলি খুব উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয় না। এগুলির পশ্চিমেও বিহারের প্রধান প্রবেশ দ্বারের দক্ষিণে অবস্থিত পুকুরের পূর্বদিকে বেশ কয়েকটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আছে।

পশ্চিমার্ধ (উত্তরাংশ)

উত্তর ব্লকের সম্মুখের অঙ্গনে কয়েকটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। ১৬২ নম্বর কক্ষের সম্মুখস্থ বারান্দা থেকে ১৬৭ নম্বর কক্ষের বারান্দার সম্মুখ পর্যন্ত প্রাচীর বেষ্টিত একটি আয়তক্ষেত্রাকার ভূমি আছে। এর অভ্যন্তর ভাগ থেকে জল নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য প্রাচীরের নিচে স্থানে স্থানে ছিদ্র করা আছে। এ স্থানে বর্গাকৃতির একটি ছোট ইমারত আছে এবং ৩ কক্ষ বিশিষ্ট এ ইমারতের উপরের অংশ 'করবেল' প্রথায় নির্মিত। এ প্রাচীরঘেরা স্থান ও ইমারত কী উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল, তা বোঝা যাচ্ছে না। এই ইমারতের পশ্চিমে একটি বেশ বড় আকারের পাকা কূপ প্রায় অক্ষত অবস্থায় টিকে আছে। অঙ্গনের এ অংশে আরও অনেক ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আছে। সেগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

দক্ষিণ ভাগ

দুটি ছোট স্তূপ ও দুটি পাতকুয়ার ধ্বংসাবশেষ ছাড়া সমগ্র দক্ষিণ ভাগে আর কোনো প্রত্নকীর্তির চিহ্ন পাওয়া যায়নি। অবশ্য তেমন কোনো বিস্তারিত উৎখনন কার্যও সেখানে করা হয়নি।

বিহারের বাইরের স্থাপত্য নিদর্শন

শৌচাগার : দক্ষিণ ব্লকের পশ্চিমার্ধের প্রায় মাঝামাঝি স্থানের সোজা ২৬.৯ মিটার সমান্তরাল দক্ষিণে ৩১.৮৭ মিটার × ৮.০২ মিটার আয়তনের একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আছে। পার্শ্বস্থ ভূমি থেকে এটি প্রায় ৩.৪৩মিটার উঁচু। একটি কক্ষ থেকে (১০২ নং কক্ষ) একটি ইট-বাঁধান পথ দিয়ে এই ইমারতে যাওয়ার একমাত্র উপায়। ৪.৮ মিটার প্রশস্ত এ বাঁধান রাস্তার দু'ধারে আছে প্রায় ১.৮ মিটার প্রশস্ত ইটের প্রাচীর।

উপরোক্ত ৩১.২০ মিটার × ৮.০৮ মিটার আয়তনের মঞ্চটির দক্ষিণাংশে আনুমানিক ১.২১ মিটার দূরে দূরে অবস্থিত অনেকগুলি পানি-নিষ্কাশনী পথ আছে। ১ মিটার × ০১ মিটার আয়তনের এ নালাগুলি ইট দিয়ে এমন সুন্দরভাবে গঠিত যে, পানি দেয়ালের মধ্যে প্রবেশ করতে পারত না। এগুলির উপরে যে 'প্লাটফরম' ছিল, সেগুলি ছিল পাকা ও দক্ষিণ দিকে ঢালু। এগুলি ছিল খুব সব মলমূত্রাগার এবং সে জন্যই বিহার থেকে এতদূরে (২৬.৯১ মিটার) নির্মিত হয়েছিল। এগুলির নিচে ছিল একটি নদী বা প্রশস্ত পরিখা। তার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান।

স্নানঘাট

বিহারের পূর্ব-দক্ষিণ কোণ থেকে প্রায় ৪৮.৪৮ মিটার দূরে একটি বাঁধান ঘাট দেখা যায়। ঘাটের দু'পাশের দেয়াল খাড়াভাবে স্থাপিত এবং ইট ও কঙ্ক্রীট দ্বারা মজবুত করে তৈরি। প্রায় ৩.০০ মিটার চওড়া এ ঘাটের সর্বোচ্চ অংশ ইটের সঙ্গে বিরাট বিরাট প্রস্তরখণ্ড দ্বারা নির্মিত। ঘাটটি ক্রমশ ঢালু হয়ে প্রায় ১২.৪২ মিটার নিচে নেমে গেছে এবং ঘাটের সর্ব নিম্ন অংশ চুনাপাথরে নির্মিত। উৎখননের সময় দেখা গেছে যে, ঘাটের বেশির ভাগ (নিচের দিকে) বালিতে ঢাকা ছিল। ঘাটের ধারে-কাছের নিম্নভূমি এখনও বালিতে ভরা। এ সমস্ত বালি একটি মরে যাওয়া নদীর খাতের মধ্যে স্তূপীকৃত হয়ে আছে।

এ ঘাট নিয়ে একটি চমকপ্রদ গল্প আছে : এখানে নাকি ছিল নূরনদী, পাহাড়পুর বিহার নাকি ছিল রাজা মইদল বা মহীদলের বসতবাটী। রাজার কুমারী কন্যা সন্ধ্যাবতী নাকি এ ঘাটে নিত্য স্নান করতেন। একদিন ঘাটে স্নান করতে এসে খোদাপ্রদত্ত ভেসে আসা এক ফুলের গন্ধ গ্রহণ করলে নাকি তিনি কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হয়ে পড়েন এবং পরে নির্বাসিতা হয়ে দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত কুলবনে সত্যপীরের জন্ম দেন (দিনাজপুর জেলার মীর্যাপুর-জম্বুলেশ্বর দ্র.)। সত্যপীর নাকি পরে মইদল রাজাকে 'সত্যপীরের সিন্নি' দিতে বাধ্য করেন। এটি যে নিছক গাঁজাখুরী গল্প তাতে সন্দেহ নেই (সত্যপীরের ভিটা দ্র.)।

গন্ধেশ্বরী মন্দির

স্নান ঘাট থেকে প্রায় ১১ মিটার পশ্চিম-দক্ষিণে একটি ছোট ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আছে। স্থানীয়ভাবে গন্ধেশ্বরীর মন্দির বলে কথিত এই ইমারতের সম্মুখ দেয়ালে ব্যবহৃত ইটে পদ্ম ও অন্যান্য ফুলের প্রতিকৃতি এবং দেয়ালের গাঁথুনিতে চুন-সুরকি ইত্যাদি মসলার ব্যবহার দেখে এটিকে সুলতানী আমলের প্রথম দিকে নির্মিত ইমারত বলে

অনুমান করা হয়। ইমারতের সম্মুখভাবে ৩.৬৬ মিটার × ৩.৩৩ মিটার আয়তনের একটি হলঘর আছে। হলঘরের প্রায় কেন্দ্রস্থলে ইষ্টক নির্মিত অষ্টকোণাকার একটি স্তম্ভের ভিত্তি ভাগ দেখা যায়। হলঘরের পশ্চিম দেয়ালের মধ্যভাগ থেকে একটি উদগত কক্ষ দেখা যায়। ১.৪৩ মিটার বাহুবিশিষ্ট বর্গাকারে নির্মিত এ কক্ষটি পূজার স্থান ছিল বলে অনুমিত হয়। চার দেয়ালে মূর্তি স্থাপনের জন্য কুলঙ্গিও দেখা যায়। হলঘরের সম্মুখে ৫.২ মিটার ব্যাস বিশিষ্ট একটি গোলাকার অঙ্গন ছিল।

প্রত্নবস্তু

তাম্রলিপি

উৎখনন কালে বিহারের উত্তর-পূর্ব কোণের বারান্দায় একটি তাম্রলিপি পাওয়া গেছে। ১৫৯ গুপ্তাব্দে (৪৭৯ খ্রিঃ) প্রদত্ত এ লিপি মহারাজ বুধগুপ্তের রাজত্ব কালে লিপিকৃত হয়েছিল। এ লিপি থেকে জানা যায় যে, এক ব্রাহ্মণ দম্পতি কর্তৃক বটগোহালীতে অবস্থিত একটি জৈন বিহারে 'অইত'-এর পূজা ও একটি বিশ্রামাগারের জন্য কিছু রাষ্ট্রীয় ভূমি ক্রয় ও দান করা হয়েছিল। এ বিহারের প্রধান ছিলেন বিখ্যাত জৈন গুরু গুহনন্দী এবং তাঁর বহু শিয-প্রশিষ্য ছিলেন বলে জানা যায়। খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর জৈন বিহারটি যে একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ছিল, আলোচ্য তাম্রলিপিই তা প্রমাণ করে। এই তাম্রলিপি পাহাড়পুর বিহারে প্রাপ্ত লিপিগুলির মধ্যে প্রাচীনতম।

এ প্রসঙ্গে জগদীশপুর তাম্রলিপির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।[১] ১২৮ গুপ্তাব্দে (৪৪৭-৪৮ খ্রিঃ) মহারাজা কুমারগুপ্তের সময়ে প্রদত্ত এ লিপি থেকে জানা যায় যে, আদিতে পুণ্ড্রবর্ধনের অধিবাসী ও লিপিকালে গুল্মগন্ধিকায় বসবাসকারী শিবের উপাসক ভয়িলা নামক এক ব্যক্তি সমগোহালীতে অবস্থিত গুল্মগন্ধিকার সবুজ আম্রকাননে বিদ্যমান একটি জৈন বিহারে 'সিদ্ধায়তন' ভগবান জৈনের পূজা-অর্চনার জন্য কিছু রাষ্ট্রীয় ভূমি ক্রয় ও দান করেন। পুঠিয়া থানার ৫কিলোমিটার উত্তরে জগদীশপুর নামক স্থানে এ শিলালিপিটি আবিষ্কৃত হয়।

গুপ্ত যুগের এ দুটি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীরা জৈন বিহারে পূজা-অর্চনার জন্য ভূমিদান করেছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, সে অঞ্চলে সে সময় বিভিন্ন ধর্ম বিশেষ করে ব্রাহ্মণ্য ও জৈন ধর্মের মধ্যে কোনো বিরোধ তো ছিলই না বরং ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল জৈন ধর্মের প্রতি। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে জৈন ধর্ম যে, সে সময়ে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণও এ দুটি লিপি থেকে পাওয়া যায়।[১]

শিলালিপি

পাহাড়পুর বিহারে ৪টি শিলাস্তম্ভ লিপি পাওয়া গেছে। শিলাস্তম্ভলিপিগুলি বুদ্ধ বা 'ত্রিরত্ন'-র উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছিল। লিপিগুলি থেকে জানা যায় যে, দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এগুলি লিপিকৃত হয়েছিল। অজয় গর্ভ, শ্রী গর্ভ ও দশবল গর্ভ

১. Journal of the Varendra Research Museum, 1972, VOL. I, pp. 35-37.

১. এ সম্পর্কে গোয়াল ভিটা দ্র.। সেখানে আরও আলোচনা আছে।—গ্রন্থকার

নামক 'গর্ভ' উপাধিধারী তিন ব্যক্তি তিনটি স্তম্ভ উৎসর্গ করেছিলেন। এতে ধারণা হয় যে, খুব সম্ভব একই সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুরা দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালে পর্যায়ক্রমে পাহাড়পুর বিহারে বসবাস করতেন। চতুর্থ শিলাস্তম্ভ লিপিটি নন্দী উপাধিধারী এক ব্যক্তি কর্তৃক উৎসর্গ করা হয়েছিল।

মুদ্রা

পাহাড়পুর বিহারে উৎখননের ফলে অসংখ্য মুদ্রা পাওয়া গেছে। কিন্তু প্রায় সবগুলি মুদ্রাই মুসলিম আমলের। বাগদাদের বিখ্যাত খলিফা সুলতান হারুন-অর রশীদের রাজত্বকালের (১৭২ হিঃ, ৭৭৮ খ্রিঃ) একটি রৌপ্যমুদ্রা প্রাপ্তি সুধীমহলে বিশেষ বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। এ সূত্র ধরে অনেকে এমন ধারণাও করেন যে, মোহাম্মদ বখতীয়ার খলজীর বঙ্গ বিজয়ের (১২০৫ খ্রিঃ) বহু আগে থেকেই বাঙলায় মুসলিম বসতি স্থাপিত হয়েছিল। এ ধারণা যে যুক্তিভিত্তিক ও কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তা বলাই বাহুল্য। খুব সম্ভব বাণিজ্যের সূত্র ধরে মুদ্রাটির আগমন এদেশে ঘটেছিল। এ মুদ্রা তখনকার দিনে আরব ও বাঙলার মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং পাহাড়পুর বিহারের নির্মাণকাল সম্বন্ধে ইঙ্গিত বহন করে।

অন্যান্য মুদ্রার মধ্যে শেরশাহ্র ৬টি মুদ্রা (১৫৪০-৪৫ খ্রিঃ), ইসলাম শাহর ২টি মুদ্রা (১৫৫০ ও ১৫৫৩ খ্রিঃ), গিয়াস উদ্-দীন বাহাদুর শাহ্র ৩টি মুদ্রা (১৫৫৭, ১৫৫৮ ও ১৫৬১ খ্রিঃ), দাউদ কররানীর ২টি মুদ্রা (১৫৭৩ ও ১৫৭৪ খ্রিঃ), সম্রাট আকবরের ১টি রৌপ্য মুদ্রা (১৫৭৩ খ্রিঃ) ও জৌনপুরের সুলতান হোসেন শাহ্ শর্কীর ১টি তাম্রমুদ্রা পাওয়া যায়।

"খননের ফলে পাল সম্রাটদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি গোলাকার তাম্রমুদ্রা এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির উপরের দিকে (obverse) অত্যন্ত অনিপুণভাবে একটি ষাঁড়ের উপর 'শ্রী বিগ্রহ' লিপি ও উল্টাদিকে (reverse) তিনটি করে মৎস্য অঙ্কিত আছে। তাম্র মুদ্রার 'শ্রীবিগ্রহ' লিপি থেকে সাধারণত মনে করা হয় যে, এগুলো পাল সম্রাট বিগ্রহ পালের সময়ে অঙ্কিত মুদ্রা এবং এগুলিকে 'বিগ্রহ পাল দ্রম্ম' বলা হয়। 'দ্রম্ম' অর্থে এখানে খুব সম্ভব মুদ্রাকেই বুঝায়, কারণ, ধর্মপালের বোধগয়া লিপিতে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে।"[২]

এখানে প্রচুর কড়ি পাওয়া গেছে। একটি কক্ষের (১২২ নম্বর কক্ষ) বারান্দায় একটি পাত্রেই প্রায় সাড়ে তিন সের কড়ি পাওয়া গেছে। পাল আমলের বিশেষ কোনো মুদ্রা না পাওয়ায় ধারণা হয় যে, সে কালে কড়িই মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হত। সেন আমলে যে, মুদ্রা হিসাবে কড়ি ব্যবহৃত হত, তার প্রমাণ পাওয়া যায়, 'তবকাত-ই-নাসিরী' নামক সমসাময়িক গ্রন্থে।

ধাতুময় মূর্তি

নালন্দা মহাবিহার, শালবন বিহার বা ভাসুবিহারের তুলনায় পাহাড়পুর বিহারে প্রাপ্ত ধাতুময় মূর্তির সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। এখানে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য মূর্তির সংখ্যা মোটে

২. পাহাড়পুর—ডক্টর নাজিমুদ্দীন আহমদ, ২৯ পৃ.।

পাঁচ। এগুলি হচ্ছে। (১) হরগৌরী মূর্তি, (২) বুদ্ধমূর্তি, (৩) জৈনমূর্তি, (৪) গণেশ মূর্তি ও (৫) কুবের (জম্ভলা) মূর্তি।

'সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি' উঁচু অতি মনোরম হরগৌরীর মূর্তিটি পাওয়া যায় বিহার অঙ্গনের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে একটি প্রস্তর নির্মিত নালার কাছে। অভয় মুদ্রায় দণ্ডায়মান বুদ্ধ মূর্তিটি পাওয়া যায় বিহার অঙ্গনের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে যেখানে প্রধান মন্দিরের প্রতিকৃতি অবস্থিত। কুবেরের মূর্তিটিও এস্থান থেকে পাওয়া গেছে। বিহার অঙ্গনের উত্তর-পশ্চিম দিকে (১৭০ নং কক্ষের সম্মুখে) নগ্ন জৈন মূর্তিটি পাওয়া গেছে। এ স্থান থেকে কিছু পশ্চিমে (১৫৯ কক্ষের সামনের অঙ্গনে) পাওয়া গেছে উপবিষ্ট গণেশ মূর্তিটি।

পাহাড়পুরের মতো বিরাট একটি বৌদ্ধ বিহারে জৈন মূর্তি, জৈন বিহার সংক্রান্ত তাম্রলিপি, হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি প্রভৃতি প্রাপ্তি তখনকার দিনে ধর্মের ব্যাপারে উদার মনোভাবের পরিচয় বহন করে।

চুনবালি দ্বারা তৈরি মুণ্ড (stucco head)

চুন-বালিদ্বারা নির্মিত ৪টি বুদ্ধের মাথা পাওয়া গেছে। এগুলি কেন্দ্রীয় মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের বারান্দায় আবিষ্কৃত হয়েছে। দুটি মুণ্ডতে মাথার চুল চক্রাকারে সাজান ও অপর দুটিতে চুল উষ্ণীষ বা জটার আকারে মাথার উপরে স্থাপিত। প্রত্যেক মুণ্ডতেই কানের দুল অত্যন্ত লম্বা এবং একটি মুণ্ডে ঊর্ণা রয়েছে। এই মুণ্ডগুলি যে বিহার নির্মাণ কালে পাল যুগের প্রথম দিকের শিল্পকলা, তা বোঝা যায় এগুলির স্ফীতপ্রায় গোলগোল চোখ দেখে।

মৃৎপাত্র ও অন্যান্য দ্রব্য

অসংখ্য মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে পাহাড়পুর বিহারে। এগুলি বিভিন্ন ধরন ও আকারের। মৃত্তিকানির্মিত বড় বড় সঞ্চয়পাত্র থেকে আরম্ভ করে ছোট ছোট প্রদীপ, দোয়াত (মস্যাধার) ইত্যাদি পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের হাঁড়ি-পাতিল এখানে পাওয়া গেছে। আর পাওয়া গেছে মাটির তৈরি জগৎ মাতার মূর্তি, বিভিন্ন জন্তুর প্রতিকৃতি, মন্দির চূড়া, কুমারের হাঁড়ি-পাতিল নির্মাণের হাতিয়ার, চ্যাপ্টা চাকতি, সীল-মোহর, নলাকার গুটিকা ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য পোড়ামাটির তৈরি দ্রব্য। পদ্মপাপড়ি, দাবার ছক, আধফোটা পদ্মফুল ও পীরামিডাকৃতির নকশাসহ অসংখ্য অলঙ্কৃত ইট এখানে পাওয়া গেছে। মৃৎপাত্রগুলি মধ্য ও শেষ পালযুগের বলে পণ্ডিতদের ধারণা। তাঁদের মতে প্রথম পাল যুগের কোনো মৃৎপাত্র অখণ্ড অবস্থায় পাওয়া যায়নি।

পাহাড়পুর বিহারে মূল্যবান পাথরের গুটিকাও কিছু কিছু পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে আছে 'করনেলিয়ান' (cornelian) ও 'এগেট' (agate) নামক মূল্যবান পাথরের গুটিকা (beads of semi-precious stones)।

সত্যপীরের ভিটা

পাহাড়পুর বিহারের পূর্ব দেয়াল থেকে আনুমানিক ৪০০ মিটার পূর্বদিকে সত্যপীরের ভিটা অবস্থিত। জনপ্রবাদ মতে জানা যায় যে, (স্নানঘাট দ্র.) সত্যপীর তাঁর মাতামহ

মইদল বা মহীদল রাজাকে শায়েস্তা করে তাঁর কাছ থেকে 'সিন্নি' আদায় করেন এবং সত্যপীর এর পরে 'সত্যপীরের ভিটা' নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন।

সত্যপীরের সঙ্গে এ ভিটার কোনো সম্পর্ক নেই। সত্যপীরের কাহিনী প্রচলিত হয় খুব সম্ভব ষোড়শ শতাব্দীর শেষ অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। এ কাহিনী প্রচলিত ও প্রচারিত হবার পরেই খুব সম্ভব এস্থানকে সত্যপীরের সংগে সংযুক্ত করা হয় এবং মূল বিহারকে বলা হয় মহীদল রাজার বাড়ি। এটি যে একটি আষাঢ়ে গল্প, তা আগেই বলা হয়েছে।

অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষে পূর্ণ 'সত্যপীরের ভিটা' নামক স্থান বিষম বাহুবিশিষ্ট একটি চতুর্ভুজ আকারের ভূমি। পূর্ব বাহুর দৈর্ঘ ৭৫.৪৫মিটার, পশ্চিম বাহুর দৈর্ঘ্য ৯০.৯ মিটার, দক্ষিণ বাহুর দৈর্ঘ্য ৪২.৪২ মিটার ও উত্তর বাহুর দৈঘ্য ৫৩.৬০ মিটার। পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্বদিকে ইটের তৈরি প্রাচীর ছিল। কিন্তু উত্তরদিকে প্রাচীরের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। উত্তর দিকে দেয়ালের চিহ্ন না পাওয়ায় সেদিকের প্রবেশ পথের কথাও কিছুই বলা যায় না। তবে অন্য তিন দিকের মধ্যে শুধু দক্ষিণ দেয়ালেই একটি প্রবেশপথ ছিল।

সত্যপীরের ভিটার প্রায় মাঝামাঝি স্থানে কিছুটা পূর্বদিকে ঘেঁষে একটি প্রাচীন মন্দিরের যে ধ্বংসাবশেষটি আছে, সেটিকেই এ স্থানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রত্নকীর্তি বলে ধরা যেতে পারে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, দক্ষিণমুখী ও আয়তাকারে নির্মিত এ মন্দিরের ভূমি-নকশা আয়তন ২৪.২৪ মিটার × ১৪.৫৪ মিটার। মন্দিরটি দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। দক্ষিণ ভাগে রয়েছে একটি হলঘরের ধ্বংসাবশেষ। চারদিকের প্রাচীর ও মাঝখানে স্থাপিত স্তম্ভের উপর ছিল হলঘরের ছাদ। হলঘরের চারদিক বেষ্টন করে ছিল একটি প্রদক্ষিণপথ। এতে মনে হয় যে, হলঘরে বিশেষ পূজ্য কোনো বস্তু ছিল। হলঘরের উত্তর দিকে ছিল খুব সম্ভব পূজার স্থান। এ মন্দিরে বিভিন্ন যুগে পর্যায়ক্রমে এত সংস্কার করা হয়েছিল যে, এর প্রকৃত স্থাপত্য-পরিচয় বের করা সম্ভবপর হয়নি।

এ মন্দিরের চারদিকে অসংখ্য নিবেদন-স্তূপের অস্তিত্ব ছিল। এ পর্যন্ত ১৩২টি নিবেদন-স্তূপের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। গোলাকার, বর্গাকার ও আয়তাকার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরন এবং বিভিন্ন আকারের স্তূপ এখানে দেখা যায়। সবচেয়ে বড় স্তূপটি প্রধান মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এ স্তূপ গোলাকার ও এর ব্যাস ছিল ৭.৫৭ মিটার। সবচেয়ে ক্ষুদ্র স্তূপটিও গোলাকার এবং এর ব্যাস .৮৩ মিটার (২ ফুট ৯ ইঞ্চি)।

অঙ্গনের পুর্ব প্রান্তে ৩.৪ মিটারবিশিষ্ট ও বর্গাাকারে নির্মিত একই আকারের ২ সারি স্তূপ আছে। এক সারিতে ১৪টি ও অন্য সারিতে ৭টি স্তূপের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। প্রধান মন্দিরের উত্তর দিকে এক সারিতে একই আকারের ৯টি স্তূপের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

প্রধান মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্বদিকে ৩.১ মিটার বাহু বিশিষ্ট ও বর্গাকারে নির্মিত যে স্তূপটির ধ্বংসাবশেষ আছে, তা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এ স্তূপের বাইরের দিক অলঙ্কৃত ইট দ্বারা সুশোভিত ছিল। খননকার্যের পরে এ স্তূপের ভিতরে ১.০৬ মিটার

বাহুবিশিষ্ট ও বর্গাকারে নির্মিত একটি স্মারক-কক্ষ (relic-chamber) আবিষ্কৃত হয়েছে। স্মারক-কক্ষটি মাটির তৈরি কয়েক হাজার নিবেদন স্তূপে পরিপূর্ণ ছিল। "এই নিবেদন স্তূপগুলি ছিল গতানুগতিক ধারায় নির্মিত একটি প্রশস্ত ভিত্তিদেবীর উপরে নলাকার ড্রাম, চতুষ্কোণ হার্মিকা ও সর্বোপরি সুঁচালো চূড়াবিশিষ্ট। এই স্তূপগুলির ভিতরে 'যে ধর্ম মহাশ্রমণ' ইত্যাদি বৌদ্ধ মহাযান মন্ত্রযুক্ত দুইটি মাটির সীল পরস্পরের মুখোমুখি করে এঁটে দেওয়া হত।" এটি ছিল বৌদ্ধদের কাছে এক মহাপুণ্যের কাজ এবং এ মহাপূণ্যের কাজের নমুনা এখানে ও পাহাড়পুর বিহারে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। সাধারণত তীর্থ যাত্রীরা এ ধরনের স্তূপ নিবেদন করতেন তাঁদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্ঘ্য স্বরূপ।

যে বৃহৎ মন্দিরটির কথা আগে বলা হয়েছে, তা ছিল একটি তারা মন্দির। এটি যে একটি বিখ্যাত মন্দির ছিল, তা বোঝা যায় মন্দিরের চারপাশে অসংখ্য নিবেদন স্তূপের অস্তিত্ব দেখে। "এই মন্দির অঙ্গনে বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত আটহাত বিশিষ্ট দেবীমূর্তি ও বৌদ্ধ ধর্মীয় মতবাদলিপি খোদিত পোড়ামাটির গোল সীলগুলো থেকেই এই ভিটা ও তারা মন্দিরের অভিন্নতা প্রমাণিত হয়েছে। আবিষ্কৃত দেবী মূর্তিটি বৌদ্ধ দেবী শীতাতপত্র তারা বলেই মনে হয়।"[১]

নালন্দা মহাবিহারে বিপুলশ্রী মিত্রের একটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর বলে অনুমিত হয়। এ তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, বিপুলশ্রী মিত্র সোমপুর বিহারে অঙ্গনসহ একটি তারা মন্দির নির্মাণ ও একটি জলাশয় খনন করিয়েছিলেন।

এই সূত্র ধরে কেউ কেউ অনুমান করেন যে, সত্যপীর ভিটার প্রধান তারা মন্দিরটির কথাই বিপুলশ্রী মিত্রের তাম্রশাসনে উল্লিখিত হয়েছে। এই মন্দির যে দ্বাদশ শতাব্দীর অনেক আগেই নির্মিত হয়েছিল, উৎখনন কার্যের ফলে তা প্রমাণিত হয়েছে। অতএব দ্বাদশ শতাব্দে তিনি এ মন্দির নির্মাণ করতে পারেন না। দ্বাদশ শতাব্দীতে এ মন্দিরে বড় ধরনের সংস্কার কার্যকে নির্মাণ কার্য বলে ধরে কেউ কেউ তাঁকে এ মন্দিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি এখানে একটি জলাশয় খনন করিয়েছিলেন বলে যে তাম্রলিপিতে উল্লেখ আছে, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু সে জলাশয়ের চিহ্ন মন্দিরঅঙ্গন বা ধারে কাছে কোথাও নেই। প্রায় ৮০০ বছর পরে পুকুরটি মজে যেতে পারে, ভরে যেতে পারে কিন্তু একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে না। এতদিন পরে হলেও পুকুরের কিছু না কিছু চিহ্ন থেকেই যাবে যদি ইচ্ছে করে কেউ এটিকে না ভরে ফেলে দেয় অথবা নদীস্রোতে তা না ভেসে যায়। সত্যপীরের ভিটা ও চারপাশের এলাকা বহু শতাব্দী ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। সেই পরিত্যক্ত স্থানে ইচ্ছে করে কেউ পুকুরটি ভরতে যাবে এমন সম্ভাবনার কথা চিন্তা করা যায় না। সত্যপীরের ভিটা ও সোমপুর বিহারের মাঝখানে একটি ছোট নদী প্রবাহিত ছিল (স্নান ঘাট দ্র.)। সেই নদী কালক্রমে মরে যায় এবং সেই মরা নদীর খাত এখনও বিদ্যমান। সেই ছোট নদী দ্বারা

১. মহাস্থান ময়নামতী পাহড়পুর, ৮৬ পৃ.। ডক্টর নাজিমুদ্দীন আহমদ।

পুকুরটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এমন সম্ভাবনার কথাও ভাবা যায় না। এতে বোঝা যায় যে, সত্যপীর ভিটা বা ভিটার কাছাকাছি স্থানে কোনো পুকুরের অস্তিত্ব ছিল না।

বিপুলশ্রী মিত্রের তাম্রলিপিতে সোমপুর বিহারে মন্দির ইত্যাদি নির্মাণের কথা আছে। সত্যপীর ভিটা সোমপুর বিহারের অংশ বা অঙ্গ নয়। এটি একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এর নাম কী ছিল, তা জানা যায়নি। তবে সোমপুর বিহারের ৪০০ মিটার দূরে ও একটি নদীর অপরতীরে অবস্থিত এবং সম্পূর্ণ পৃথকভাবে নির্মিত এ মন্দিরকে বিহারের অঙ্গ হিসাবে ধরে নেওয়া যুক্তির দিক থেকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না।

তারা মন্দিরটি যে দ্বাদশ শতাব্দীর অনেক আগে নির্মিত হয়েছিল সে কথা আগেই বলা হয়েছে। মন্দিরের চার পাশে যে অসংখ্য স্তূপ আছে সেগুলির বেশির ভাগই দ্বাদশ শতাব্দীর অনেক আগে নির্মিত বলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের অভিমত। এতেও ধারণা করা যায় যে, আলোচ্য তারা মন্দির বিপুলশ্রী মিত্রের তাম্রলিপিতে উল্লিখিত তারা মন্দির নয়।

বিপুলশ্রী মিত্রের তারা মন্দিরের সন্ধান সোমপুর বিহারের অভ্যন্তরেই মিলতে পারে। বিহার অঙ্গনে যে অসংখ্য মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ আছে, সেগুলির মধ্যে তারা মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। বিহার অঙ্গনে উৎখনন কার্য চালালে হয়ত সেই মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। বিহারের প্রধান প্রবেশপথের দক্ষিণে ও কেন্দ্রীয় মন্দিরে উত্তরে যে পাড় বাঁধান জলাশয়টি দেখা যায়, তা বিহার নির্মাণের বহু পরে খনন করা হয়েছিল বলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা। তা-ই যদি হয় তবে এই জলাশয়টি নালন্দা লিপির বিপুলশ্রী মিত্র কর্তৃক খনিত হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়।

সত্যপীর ভিটায় তিনখানা 'বহুবর্ণ রঞ্জিত চাকচিক্যময় পাত্রখণ্ড' পাওয়া গেছে। এগুলিতে চকলেট ও সাদা ফুলের নকশা এবং লাল রঙের উপর সাদা ও সবুজ রঙের লতাপাতার নকশা আছে। এগুলি অনেক পরবর্তীকালের সুলতানী আমলের বলে ধারণা হয়। পণ্ডিতদের মতে মুসলিম আমলের এই পাত্রখণ্ডগুলি কোনো কারণে এখানে এসে গিয়েছিল এবং এগুলির সংগে এস্থানের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে এ সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছু বলা কঠিন। সুলতানী আমলে এই ইমারতটি সাময়িক আস্তানা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েও থাকতে পারে এবং হয়েছিল বলেই ধারণা হয়।

ব্রোঞ্জ নির্মিত একটি তারা মূর্তি এখানে পাওয়া গেছে। এটি একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। ব্রোঞ্জ নির্মিত কয়েকটি অন্য মূর্তিও যে এখানে পাওয়া গেছে সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া স্ফটিকের তৈরি গুটিকা, পোড়া মাটির তৈরি স্তূপ শীর্ষ, অসংখ্য অলঙ্কৃত ইট এবং কিছু কিছু পোড়ামাটির চিত্রফলকও এখানে পাওয়া গেছে।

বট গোহালী বা গোয়ালভিটা

পাহাড়পুর বিহার ইমারতের প্রায় লাগোয়া উত্তর থেকেই প্রাচীন গোয়ালভিটা গ্রামের শুরু ও উত্তর-পশ্চিমে বিস্তৃত। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে যখন মিঃ বুকানন-হ্যামিলটন পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে যান তখন তিনি গোয়াল ভিটাকে পাহাড়পুর বলে অভিহিত করেছিলেন। এ সম্পর্কে স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহ্যাম বলেন যে, উত্তর-পশ্চিম দিকে

অবস্থিত গোয়ালভিটা নামক ক্ষুদ্র গ্রামকে মিঃ বুকানন ভুল করে 'গোপাল চিতার পাহাড়' বলে মুদ্রিত করছেন।[১]

এঁরা গোয়াল ভিটা সরেজমিনে দেখেছিলেন কিনা অথবা গোয়াল ভিটাতে কোনো প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ ছিল কিনা, সে সম্পর্কে কোনো উল্লেখ তাঁদের বর্ণনায় নেই। 'পাহাড়' ও 'ভিটা' শব্দ দুটি উঁচু ভূমির অস্তিত্বের ইঙ্গিত বহন করে। এগুলি সাধারণ ভাষায় ঢিপি বা ঢিবি নামে পরিচিত। তখন পর্যন্ত গোয়ালভিটাতে কোনো ঢিবির অস্তিত্ব ছিল কিনা, থাকলে ঢিবির আয়তন ও উচ্চতা কী ছিল এবং ঢিবিতে প্রাচীন ইট-পাথরের অস্তিত্ব ছিল কিনা, সে সম্বন্ধে কোনো বর্ণনা কোথাও পাওয়া যায় না। বুকাননের 'পাহাড়' শব্দ থেকে সেখানে একটি উঁচু ঢিবির অস্তিত্বের কথা অনুমান করা যায়। তেমন কোনো উঁচু ঢিবির অস্তিত্ব না থাকলেও কোনো প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষের স্মৃতি বহন করে খুব সম্ভব গোয়ালভিটা নামটি তখন পর্যন্ত টিকে ছিল এবং এখনও তা টিকে আছে। বর্তমান কালে গোয়াল ভিটা গ্রামে কোনো প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। স্থানীয় লোকদের কাছে জানা যায় যে, এখানে মাটির নিচে প্রাচীন যুগের ইট পাওয়া যায়।

পাহাড়পুর বিহারে যে তাম্রলিপিটি পাওয়া গেছে (পাহাড়পুর তাম্রলিপি দ্র.), তাতে বর্ণিত আছে যে জনৈক ব্রাহ্মণ নাথ শ্রমণ ও তাঁর স্ত্রী রামী বটগোহালীতে অবস্থিত জৈন বিহারের 'অইত' (Artat)-এর পূজা-অর্চনা ও বিশ্রামাগারের জন্য একখণ্ড রাষ্ট্রীয় ভূমি ক্রয় ও দান করেছিলেন। এই বটগোহালীকেই পণ্ডিতেরা বর্তমান গোয়াল ভিটা বলে মনে করেন। খুব সম্ভব পাহাড়পুর তাম্রলিপিতে উল্লিখিত জৈন বিহারটি বর্তমান গোয়াল ভিটাতেই ছিল।

কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন যে, এই জৈন বিহার পাহাড়পুর বিহারেই অবস্থিত ছিল এবং সেই বিহারের ধ্বংসাবশেষের উপরই বর্তমান বিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় মন্দিরের তলদেশে আরও গভীর এবং ব্যাপক খননকার্য চালালে হয়ত এ প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। তবে আপাতদৃষ্টিতে এই অনুমানের পিছনে কোনো যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। গোয়ালভিটা নামক একটি প্রাচীন স্থান এবং সেখানে প্রত্নবস্তুর কিছু সন্ধানও যখন পাওয়া গেছে, তখন প্রাচীন বটগোহালীর সন্ধান অন্যত্র করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে 'গোহালী' সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। রাজশাহী জেলার জগদীশপুর নামক স্থানে গুপ্তযুগের যে তাম্রলিপিটি[১] পাওয়া গেছে, তাতে 'সমগোহালী' নামক একটি স্থানের উল্লেখ দেখা যায়। এস্থান গোয়ালভিটা (বটগোহালী) থেকে প্রায় ৮৮ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং পুঠিয়া থেকে ৫কিলোমিটার

---

১. "To the north-west is the small village of *Gwal Bhita* which is erroneously printed in Buchanan's account as *Gopal Chitar Pahar. Gwal Bhita* means simply the cow-herd's mound, *Gwala* being the contraction of Go-wala or 'cow-keeper."
—*Archaeological Survey of India Report. Vol. XV, p. 117*

১. Journal of the *Varendra Research Museum*, 1972, Vol. I. pp. 35-37.

উত্তরে অবস্থিত খুব সম্ভব গন্ধগোহালী নামক স্থান। ১২৮ গুপ্তাব্দে (৪৪৮খ্রিঃ) সম্রাট কুমার গুপ্তের রাজত্বকালের বৈগ্রাম তাম্রলিপিতে (দিনাজপুর জেলার বৈগ্রাম দ্র.) 'শ্রীগোহালী' গ্রামের উল্লেখ আছে। সেই তাম্রলিপিতে দেখা যায় যে 'ভয়িলা' ও 'ভাস্কর' নামক দুই ভাই গোবিন্দ স্বামীর মন্দিরের জন্য রাষ্ট্রীয় ভূমি ক্রয় ও দান করেছিলেন। এই ভয়িলা ও সমগোহলীর ভয়িলা এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি কিনা, তা বলা কঠিন। তবে তাঁরা দু'জন ছিলেন প্রায় একই সময়ের। শ্রীগোহালী বটগোহালী থেকে প্রায় ৩২ কিলোমিটার এবং সমগোহালী থেকে প্রায় ১১২ কিলোমিটার উত্তর-উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত।

প্রায় একই সময়ের ৩টি তাম্রলিপিতে শ্রীগোহালী, বটগোহালী ও সমগোহালী নামক ৩টি 'গোহালী' নামান্তক ধর্মকেন্দ্রের অবস্থান বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে। গোহালী শব্দ খুব সম্ভব সংস্কৃত গোপাল (>প্রাঃ গোব্াল, গোআল> বাঃ গোআল>গোয়াল> গোহাল>গোহালী) শব্দ থেকে উদ্ভূত এবং গো অর্থাৎ গরু সম্পর্কিত অর্থে ব্যবহৃত ছিল। গোরক্ষণ, গোপালন ইত্যাদি কর্ম সেকালে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। গোপালন কেন্দ্রের সঙ্গে ধর্ম কেন্দ্রের সম্পর্ক খুব নিবিড় ছিল বলে ধারণা হয়।

উপসংহার

সারা বিশ্বে যত বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে পাহাড়পুর (সোমপুর) বিহার দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ একক বিহার (largest single monastery)। এটি যে দ্বিতীয় পাল নৃপতি ধর্মপাল দেবের রাজত্ব কালে (৭৭০-৮১০ খ্রিঃ) নির্মিত হয়েছিল, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। একটি ছোট নদীর তীরে এবং বসতিহীন স্থানে এই সুবিশাল বিহারটি কেন নির্মাণ করা হয়েছিল, তার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

পার্শ্ববর্তী বটগোহালী (বটগোহালী দ্র.) নামক স্থানে একটি প্রাচীন জৈন মন্দির ছিল বলে ধারণা হয়। কিন্তু শুধু সে কারণেই যে এখানে এই সুবিশাল বৌদ্ধ বিহার নির্মিত হয়নি, তা সহজেই বোঝা যায়। এখানে এই বিহার নির্মাণের পিছনে নিশ্চয় কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। একমাত্র বটগোহালী ছাড়া পাহাড়পুরের ধারে কাছে আর কোনো প্রাচীন স্থানের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু কিছু দূরে দূরে অবশ্য বেশ কয়েকটি প্রাচীন স্থান আছে। মঙ্গলবাড়ি (ঐ গরুড়স্তম্ভ দ্র.) এ স্থান থেকে আনুমানিক ১১ কিলোমিটার পুব-উত্তরে এবং যোগীরঘোপা এখান থেকে আনুমানিক ৯ কিলোমিটার পশ্চিম-উত্তর দিকে অবস্থিত। যোগীর ঘোফা থেকে আমইরের দূরত্ব প্রায় ৫ কিলোমিটার। পাহাড়পুর থেকে প্রায় ১৯ কিলোমিটার সোজা দক্ষিণে হলুদবিহার (হলুদ বিহার দ্র.) নামক প্রাচীন স্থান।

আমাইরকে কেউ কেউ রামাবতী বলে মনে করেন। এ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলা না গেলেও এ স্থান যে অত্যন্ত প্রাচীন (আমইর দ্র.) এবং এখানে যে এককালে কোনো নৃপতির রাজধানী ছিল, তাতে বোধ হয় কোনো সন্দেহ নেই। যতটুকু মনে হয় এ স্থানেই হয়ত ছিল মহারাজা ধর্মপালদেবের রাজধানী। সেই রাজধানীর কাছাকাছি স্থান সোমপুরে তিনি এই মহাকীর্তি স্থাপন করেছিলেন।

খুব সম্ভব এস্থানে আগে থেকেই বিরাট কোনো মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল। পাহাড়পুর বিহারের তলদেশে খনন কার্য শেষ করা হয়নি। ফলে বিহারের বিশেষ করে কেন্দ্রীয় মন্দিরের তলদেশে কী আছে তা জানা যায়নি। খুব সম্ভব এখানে একটি ধর্মকেন্দ্র আগে থেকেই ছিল এবং সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরাদির স্থানেই এই বিরাট কীর্তিটি স্থাপন করা হয়েছিল।

এই মহাবিহারকে কেন্দ্র করে খুব সম্ভব পরবর্তীকালে নদীর অপর তীরে সত্যপীরের ভিটায় তারা মন্দির ও নিবেদনস্তূপগুলি নির্মাণ করা হয়েছিল।

সেকালে বিহারগুলি লোকালয় থেকে বেশ দূরে নির্মাণ করা হত যাতে ভিক্ষুরা জনকোলাহল থেকে দূরে থেকে নির্বিঘ্নে পঠন, পাঠন ও ধ্যানধারণায় আত্মনিবেদন করতে পারতেন। তাঁদের জীবনযাত্রা ছিল কঠিন অনুশাসনের নিগড়ে আবদ্ধ। তাঁরা প্রভাতে দূরে লোকালয়ে যেতেন ভিক্ষার জন্য। ভিক্ষালব্ধ অতি সামান্য বস্তু নিয়ে তারা ফিরে আসতেন এবং একাংশ ভিতরে জমা দিয়ে বাকি অংশ নিয়ে রন্ধন করে খেতেন এবং তাও এক বেলা। বাকি সময় তাঁরা পঠন, পাঠন ও ধ্যান-ধারণায় কাটিয়ে দিতেন।

পাহাড়পুর বিহারের ধারে কাছে বিশেষ কোনো বসতি ছিল বলে মনে হয় না। খুব সম্ভব ভিক্ষুদের সুবিধার জন্য এই নিভৃত স্থানে এই মহাবিহারটি স্থাপন করা হয়েছিল।

হলুদ বিহার

পাহাড়পুর বিহার থেকে সোজা প্রায় ১৯ কিলোমিটার দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, বদলগাছি থানার অধীনে এবং থানা থেকে প্রায় ১১ কিলোমিটার দক্ষিণে বিলাসবাড়ি ইউনিয়নে হলুদ বিহার নামে একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। গ্রামের পায় কেন্দ্রস্থলে আছে একটি গ্রাম্য বাজার। বিস্তীর্ণ উন্মুক্ত স্থানের উপর অবস্থিত এ গ্রাম্য বাজারে কয়েকটি প্রাচীন বটবৃক্ষের নিচে আছে প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের অজস্র ভগ্নাংশ। বাজারের পশ্চিম পার্শ্বেই আছে একটি বড় ঢিবি। লোকে বলে হলুদ বিহার।

এ ঢিবির আকার ও আয়তন পূর্বে কী রকম ছিল, তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। তবে ক্রমাগত আক্রমণের ফলে ঢিবিটি ক্রমশ ছোট হতে হতে বর্তমানে প্রায় গোলাকার রূপ ধারণ করেছে এবং এর বর্তমান ব্যাস প্রায় ৩০ মিটার। হাল্ আমলেও ঢিবিটির বেশ ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ঢিবির ভিতরে যে প্রশস্ত ইটের দেয়াল ছিল, তা নিশ্চিহ্ন করে ঢিবির প্রায় এক তৃতীয়াংশ মাটির সমান করে ফেলা হয়েছে। এর ফলে ঢিবির ভিতরে যে বিরাট বিরাট দেয়াল ও স্তম্ভ আছে, তা বের হয়ে পড়েছে।

জনাব কাজী মেছের 'রাজশাহীর ইতিহাস' নামক গ্রন্থে (১ম খণ্ড, ১৫৩ পৃ.) উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে এ ঢিবি থেকে কালপাথরে তৈরি একটি বুদ্ধমূর্তির একাংশ ও কয়েকটি পোড়ামাটির চিত্রফলক (terra-cotta plaques) পাওয়া গিয়েছিল। চিত্রফলকগুলির মধ্যে একটি রাজহংসের চিত্রফলক খুবই সুন্দর এবং তার ছবিও তিনি গ্রন্থে দিয়েছেন। এখান থেকে প্রাচীন কালের মুদ্রা পাওয়ার কথাও তিনি বলেছেন।

তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, সে সময়ে (১৯৬৩ খ্রিঃ) এখানে আরও ৩টি ঢিবি ছিল। বর্তমানে (১৯৭৯ খ্রিঃ) সেই ৩টি ঢিবির কোনো অস্তিত্ব নেই। খুব সম্ভব সেগুলি থেকে ইট সরিয়ে ঢিবিগুলিকে সমতল ভূমি করা হয়েছে এবং সেখানে হাল আমলের বাজারটিকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। সমগ্র হাট এলাকায় অসংখ্য প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ এবং স্থানে স্থানে প্রাচীন ইমারতের প্রাচীরের ভিত্তি চিহ্ন দেখে ধারণা হয় যে, এককালে সমুদয় স্থান জুড়ে একটি সুবিশাল ইমারত বা অনেকগুলি ছোট ছোট ইমারত বিদ্যমান ছিল।

সেই ইমারত বা ইমারতগুলি যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির সংগে সম্পৃক্ত ছিল, হলুদ বিহার ঢিবিতে প্রাপ্ত বুদ্ধ মূর্তি ও চিত্রফলকগুলিই তা প্রমাণ করে। পাহাড়পুর অথবা সীতাকোট বিহারের মতো একক ইমারত বিশিষ্ট বিহার না হয়ে ভাসুবিহারের মতো (ভাসুবিহার দ্র.) একাধিক ইমারতের সমন্বয়েও সেই বিহারটি গঠিত হয়ে থাকতে পারে।

হলুদ বিহার ঢিবি থেকে কিছু দক্ষিণ-পূর্ব-দক্ষিণ দিকে একটি বিরাট প্রাচীন জলাশয় ছিল এবং বর্তমানে তা মজে গেছে এবং এর পাড়গুলি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই জলাশয়টি ছিল খুব সম্ভব বিহারের জল প্রাপ্তির উৎস। দিঘির পূর্বদিকের উঁচু ভূমি বর্তমানে চাষের ভূমিতে পরিণত হলেও এখানে ওখানে বেশ কয়েকটি অনুচ্চ ঢিবি এখনও টিকে আছে। ঢিবিগুলির উপরের অংশ কেটে ফেলা হয়েছে। ফলে সে সব ঢিবিতে প্রাচীন ইট ও প্রাচীন ইটের তৈরি ভিত্তিদেয়াল বের হয়ে পড়েছে। সে সব ঢিবিতে পাওয়া গেছে পোড়ামাটির ফলকচিত্রের ভগ্নাংশ, কড়ি ইত্যাদি। সমগ্র উঁচু ভূমি জুড়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে অসংখ্য প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ। এই উঁচু ভূমি একটি বিস্তীর্ণ মাঠ জুড়ে অবস্থিত। মাঠের কোনো কোনো স্থানে হাল আমলে কিছু পুকুর খনন করা হয়েছে। সে সব পুকুরেও অনেক প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ বের হয়ে পড়েছে।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতরের প্রাক্তন সুপারিনটেনডেন্ট ডক্টর হারুন-অর-রশীদ কয়েক বছর আগে এস্থানে অনুসন্ধান কাজ চালিয়েছিলেন। তাঁর মতে বর্তমান হলুদ বিহার গ্রামের সবটাই একটি প্রাচীন জনপদের ধ্বংসাবশেষের উপর অবস্থিত। তিনি গ্রামের সর্বত্র, রাস্তায়, ঘাটে, ধ্বসে যাওয়া রাস্তার নিচে, হাল আমলে খনিত খালের ধারে, নালা-ডোবার পাশে, নূতন কাটা পুকুরের ঢাল ইত্যাদিতে অসংখ্য প্রাচীন ইট, নকসা করা ইট, পোড়ামাটির চিত্রফলকের ভগ্নাংশ, প্রাচীন ইমারতের ভিত্তি দেয়ালের অংশ ইত্যাদি ইত্যাদি দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

সেখানে অনুসন্ধান কালে দৈবাৎ একজন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের বাড়িতে তিনি (ডক্টর রশীদ) বেশ কয়েকটি চিত্রফলক দেখতে পান। এগুলির মধ্যে ৪টি ছিল পাথরের ও ১টি ছিল পোড়ামাটির চিত্রফলক। সেই ভদ্রলোকের বাইরের ঘরের কাছেই নাকি ছিল একটি প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ এবং সেখান থেকেই নাকি চিত্রফলকগুলি এনে তাঁর বাড়ির ভিতরের দেয়ালে লাগান হয়েছে। এরকম আরও দৃষ্টান্তের কথা ডক্টর রশিদ উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী কালে আমরা নিজেরাও কিছু অনুসন্ধান কার্য চালাই এবং ডক্টর বশীরের বর্ণনা যাচাই করে দেখি যে, তাঁর বর্ণনা পুরাপুরি সত্য।

এই হলুদ বিহার গ্রামে যে প্রাচীন কালে একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। খুব সম্ভব এখানে এক বা একাধিক বৌদ্ধ বিহার ছিল। এই বিহার পাহাড়পুর বিহারের সমসাময়িক, কি আগের ছিল, তা সঠিকভাবে বলার কোনো সূত্র নেই।

যোগীঘোপা

পাহাড়পুর বিহার থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে এবং মঙ্গলবাড়ি গরুড় স্তম্ভ থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ধামইরহাট থানার অন্তর্গত ও ঘোকশী বিলের পূর্বতীরে অবস্থিত যোগীঘোপা নাথ সম্প্রদায়ের একটি প্রাচীন ধর্মকেন্দ্র। উত্তর বঙ্গের ৩টি প্রধান নাথ ধর্মকেন্দ্রের মধ্যে যোগীঘোপা অন্যতম। অন্য দুটি হচ্ছে বগুড়া জেলার যোগীরভবন (যোগীরভবন দ্র.) ও দিনাজপুর জেলার গোরকুই (গোরকুই দ্র.)। অনেকের মতে যোগীরভবন ছিল প্রধান কেন্দ্র এবং বাকি দুটি ছিল এর শাখা। এ নিয়ে নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ আছে এবং গোরকুই ও গোপী ঘোপার প্রাধান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ছেড়ে দিতে মোটেই রাজী নন। আলোচ্য যোগীঘোপার জন্য প্রায় ৩০০ বিঘা লাখেরাজ জমি বহু আগে থেকেই বরাদ্দ ছিল বলে জানা যায়।

পালযুগের শেষ দিকে বৌদ্ধ ধর্মে বহু মতবাদ গড়ে উঠে। এগুলির মধ্যে সহজযান ছিল একটি। নাথধর্মের প্রবর্তক ও আদি গুরু মৎসেন্দ্রনাথ ছিলেন আদিতে একজন বৌদ্ধ গুরু। তাঁর প্রবর্তিত নাথধর্ম তাঁর প্রধান ও সুবিখ্যাত শিষ্য-গুরু গোরক্ষনাথের সময়ে সারা বাঙলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং বাঙলার বাইরে সমগ্র উপমহাদেশেও এর বিস্তার ঘটে। এ ধর্মের আরও দুজন প্রধান গুরু ছিলেন এবং এরা ছিলেন হাড়িপা ও কানুপা বা কৃষ্ণাচার্য। বর্মণ-সেন যুগে বৌদ্ধ ধর্ম বাঙলায় প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু নাথধর্ম টিকে থাকে। মুসলিম আমলে এই নাথধর্ম সগৌরবে অস্তিত্বশীল ছিল। মধ্যযুগের সাহিত্য বিশেষ করে নাথসাহিত্য থেকে তা জানা যায়। এই তান্ত্রিক ধর্ম মুসলিম সমাজেও বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

আলোচ্য যোগীঘোপা বা গোফা কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা সঠিকভাবে বলার কোনো সূত্র নেই। তবে নাথ ধর্মের প্রবর্তন ও সম্প্রসারণের সময় যে এ ধর্মের বেশ কয়েকটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল, তা সহজেই ধারণা করা যায়। আদিতে এসব নাথ ধর্মকেন্দ্রগুলি ছিল খুব সম্ভব বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্র। পরে সেগুলি নাথধর্মের কেন্দ্র রূপে টিকে থাকে। খুব সম্ভব যোগীঘোপা ছিল সে রকম একটি কেন্দ্র।

১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহ্যাম এস্থান পরিদর্শন করেন এবং এস্থানের কিছু বর্ণনা রেখে যান এবং তা খুবই মূল্যবান। তিনি বলেন যে, বুকাননের মতে এস্থান ছিল রাজা দেবপালের বাড়ি। কিন্তু স্থানীয় লোকের কাছে তিনি জানতে পারেন যে, এস্থানকে 'রাজা দেবপালকা ছত্রী' বলা হত এবং তাঁর মতে বিশিষ্ট লোকের চিতাভস্মের উপর নির্মিত স্মৃতিসৌধকে ছত্রী বলা হত। তিনি ধারণা করেন যে, এ স্থানে রাজা দেবপালের মৃত্যু হয়েছিল এবং তাঁর দেহ এখানে ভস্মীভূত হয়েছিল।

গোফার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন যে, মাত্র ১.৮১ মিটার প্রশস্ত একটি লম্বা কক্ষ ছিল গোফাটি এবং এতে একটি শিবলিঙ্গ ছিল। প্রবেশপথের ডান ও বাম দিকে ছিল দুটি 'প্লাটফরম' (platform) বা বেদী। একটিতে ছিল একটি তুলসী গাছ এবং অপরটিতে ছিল শিবের ত্রিশূল। গোফার সামনে ছিল যোগীর বাসস্থান এবং এর ডানদিকে ছিল দুটি ছোট মন্দির। একটিতে ছিল একটি সাধারণ শিবলিঙ্গ এবং অন্যটিতে ছিল একটি চতুর্মুখী শিবলিঙ্গ। গোফার বাইরে ছিল ১.০১ মিটার উঁচু চার হস্তবিশিষ্ট একটি বিষ্ণুমূর্তি এবং একটি সদ্যোজাত মূর্তি।[১]

১.৮১ মিটার প্রশস্ত লম্বা আকারের গোফার যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় যে, গোফাটির নিচের প্রায় অর্ধাংশ মাটির নিচেই ছিল। তাঁর বর্ণনার 'অর্ধপ্রোথিত বিচিত্র শিবলিঙ্গ মন্দিরটির' ("a curious half-sunken lingam temple") খুব সম্ভব একটি প্রাচীন ইমারতের দেবে যাওয়া অংশের একটি অপ্রশস্ত কক্ষ। গোফাসহ এ স্থানের কীর্তিগুলি একটি বৃহৎ অনুচ্চ ঢিবির উপরে অবস্থিত। কয়েক বিঘা আয়তন বিশিষ্ট এ ঢিবি যে একটি প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঢিবি সংলগ্ন ভূমিও বেশ উঁচু। তবে পূর্বদিক ছাড়া ঢিবির বাকি প্রায় তিনদিকেই আছে নিম্ন ভূমি। এই নিম্নভূমি ঘুকশীর বিল নামে পরিচিত এবং এতে এখন বোরো ধানের চাষ হয়। এক কালে এই নিম্ন ভূমিতে আত্রাই নদী বা তার কোনো শাখার প্রবাহ ছিল বলে ধারণা হয়।

'রাজা দেবপালকা ছত্রী' কিংবদন্তিমূলক নাম থেকে স্যার কানিংহ্যাম এস্থানকে তৃতীয় পাল নৃপতি দেবপালের মৃত্যু ও চিতাভস্মের স্থান বলে ধারণা করেছিলেন। এ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছুই বলা সম্ভব নয়। গোফাটি যেখানে আছে, সেই ঢিবি ছাড়া অন্য কোনো প্রাচীন কীর্তির বিশেষ কোনো চিহ্ন এখানে দেখা যায় না। তাতে দেবপালের মতো একজন প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতির নিবাসস্থল এখানে ছিল বলে ধারণা করা যায় না।

---

১. "... The Jabuna temple stands on a large low mound of brick ruins, which is said to have been the 'house' of Raja Deva Pala, according to Buchanon. But the name given to it by the people is *Raja Deva Pala ka Chhatri*, which is the usual term for a mausoleum built over the ashes of a person of consequence. I think, therefore, that this must be the place where Raja Deva Pala died and where his body was burnt.

"The Gupha is a small oblong room only 6 feet wide, containing a Śiva lingam, To the right and left of the entrance there are two platforms, one bearing the holy *tulsi* or basil, and the other the trident of Śiva. In front is the Jogi's residence, and to the right there are two small shrines, one with a commom plain lingam, the other with a four-faced lingam, called 'Brahmo lingam'. But there should be a fifth face on the top to represent Śiva. Outside the Gupha temple there is a four armed figure of Vishnu, 3 feet 7 inches in height, and a broken figure of a female lying on a bed with a child by her side."

—*Archaeological Survey of India Report, vol. XV, p. 121 by Sir Alexander Cunningham.*

তবে কোনো বিশেষ কারণে এখানে তাঁর শবদেহ সমাহিত অথবা ভস্মীভূত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু সে সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

খুব সম্ভব এখানে বৌদ্ধ মন্দির বা স্তূপ জাতীয় কোনো ইমারতের অস্তিত্ব ছিল। পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তি ও নাথধর্মের অভ্যুদয়ে, এই নির্জন স্থান নাথধর্মের আস্তানা হিসাবে গড়ে ওঠে। শিবলিঙ্গ ও শিবের ত্রিশূলের অস্তিত্ব দেখেও ধারণা হয় যে, এটি নাথধর্মেরই কেন্দ্রস্থল ছিল। কারণ, নাথদের মতে তাদের প্রধান গুরু গোরক্ষনাথ শিবেরই অঙ্গ থেকে জন্ম লাভ করেছিলেন এবং গোরক্ষনাথের পূজা শিবলিঙ্গের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। বিষ্ণু ও সদ্যোজাত মূর্তি দুটি বোধ হয় পরবর্তীকালে অন্য কোনো স্থান থেকে এখানে আনা হয়েছিল।

যোগীর গোফার সঙ্গে বগুড়া জেলার যোগীর ভবনের সুড়ঙ্গ পথে যোগাযোগ ছিল বলে স্যার কানিংহ্যাম একটি জন প্রবাদের কথা উল্লেখ করেছেন। এটি যে একটি আষাঢ়ে গল্প, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

যোগীর গোকাকে পণ্ডিতেরা স্তূপে প্রতিকৃতি বলেই মনে করেন (উপক্রমনিকায় স্তূপও এর প্রতিকৃতি দ্র:)।

আমাইর

যোগীগোফা থেকে প্রায় ৫কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং ধামইরহাট উপজেলার প্রায় শেষ প্রান্তে অবস্থিত আমাইর একটি অতি প্রাচীন স্থান। গ্রামের দৈর্ঘ্য (পূর্ব-পশ্চিমে) ১.৫ কিলোমিটারে চেয়ে কিছু বেশি। কিন্তু উত্তর দিকে অবস্থিত বৃন্দাবন ও কাযীপাড়া এবং দক্ষিণ দিকে অবস্থিত চান্দর ও আরানগরসহ সমগ্র এলাকার আয়তন হবে ১০ বর্গকিলোমিটারে চেয়েও বেশি এবং প্রাচীন কালে এই সমুদয় অঞ্চল ও আশেপাশের এলাকা যে একই জনপদের অন্তর্গত ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সমগ্র স্থান জুড়ে আছে অসংখ্য প্রাচীন জলাশয়, প্রাচীন ইমারতের বেশ কয়েকটি ধ্বংসাবশেষ এবং প্রাচীন পাকা সড়কের চিহ্ন। অসংখ্য প্রাচীন প্রস্তরমূর্তি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে ছিল সমগ্র এলাকায়। এখানে পড়ে থাকা অসংখ্য মূর্তি কলকাতা ও রাজশাহীর যাদুঘরের জন্য সংগৃহীত হয়েছে। এখনও এ স্থানে মাঝে মাঝে প্রাচীন মূর্তি পাওয়া যায়।

এককালে খুব সম্ভব ইছামতী নামক আত্রাই নদীর একটি ধারা এ স্থানের পূর্বদিক দিয়ে প্রবাহিত হত। সে নদী মরে এখন ঘুকশীর বিল নাম ধারণ করে নিম্নভূমিতে পরিণত হয়েছে। এই ঘুকশী বিলের পশ্চিম তীরে অবস্থিত এই আমাইর নামক প্রাচীন স্থান এবং পূর্ব তীরে অবস্থিত যোগীর গোফা (যোগীঘোপা দ্র.)।

এখানে ছোট বড় সব মিলিয়ে ১৩০০ টি জলাশয় ছিল বলে স্থানীয় লোকের কাছ থেকে জানা যায়। ১৩০০ জলাশয়ের কথা সঠিকভাবে বলা না গেলেও উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েও যে এখানে অসংখ্য জলাশয় ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তুত মেজর শের উইলের (Major Serwill) রেভিনিউ সার্ভে মানচিত্র থেকেই। বর্তমান কালে বেশির ভাগ জলাশয় মজে গিয়ে চাষের জমিতে

পরিণত হয়েছে। কিন্তু যেসব প্রাচীন জলাশয় এখনও টিকে আছে, সেগুলির সংখ্যাও কম নয়।

কালীসাগর এস্থানের সুবৃহৎ জলাশয়গুলির মধ্যে একটি। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এই জলাশয়ের আয়তন প্রায় ৫৪৫.৫৪মিটার × ৩৬৩.৩৬ মিটার। পাড়গুলি পাহাড়ের মতো উঁচু ও বেশ চওড়া। দিঘির দক্ষিণ পাড় ঘেঁষে বিরাট একটি প্রাচীন সড়ক চলে গেছে পূর্বদিকে যোগীর গোফার দিকে। যোগীর গোফা থেকে সে সড়কের একটি শাখা মঙ্গলবাড়ি (মংগলবাড়ি দ্র.) হয়ে মহাস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং অন্য শাখা পাহাড়পুর বিহার হয়ে হলুদবিহার পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। আমাইর গ্রামে কালীসাগরের কাছে এ রাস্তা ছিল প্রায় ৪৫.৪৫ মিটার চওড়া এবং আমাইর গ্রামে এ রাস্তা যে পাকা ছিল সে প্রমাণ পাওয়া যায় রাস্তার স্থানে স্থানে মাটির নিচে প্রাচীন ইটের অস্তিত্ব দেখে। আমাইর গ্রামের বাইরে এ রাস্তা পাকা ছিল কিনা, তা বলা যায় না। খুব সম্ভব ছিল না। কালী সাগর থেকে প্রায় ৬০৫ মিটার দক্ষিণে আছে আর একটি প্রাচীন জলাশয়, নাম 'তক্কেমারীর দিঘি'। এই জলাশয়ের আয়তন কালী সাগর থেকে খুব কম নয়। দিঘির চারপাড়ে ৪টি বিরাট আকারের বাঁধান ঘাট ছিল। ঘাটগুলি এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত। দিঘির পাড়গুলি এখনও পাহাড়ের মত উঁচু। এই দিঘির উত্তর দিকে একটি বিরাট ঢিবি আছে। প্রায় ৫ বিঘা স্থান জুড়ে অবস্থিত এ ঢিবির ভিতরে প্রচুর প্রাচীন ইট ও পাথর আছে। এটি একটি চকমিলান ও বিরাট অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ বলে সহজেই বোঝা যায়। এখন ঢিবির উপরে একজন পীরের মাযার আছে। অনেক পরবর্তীকালের এই মাযারকে যমিন পীরের দরগা বলা হয়ে থাকে।

যমিন পীরের দরগার পূর্বদিকে আর একটি ঢিবি আছে। এটির আয়তন অপেক্ষাকৃত ছোট। এই ঢিবিতেও অসংখ্য প্রাচীন ইট ও কিছু কিছু পাথর দেখা যায়। খুব সম্ভব এই ঢিবিতে কোনো প্রাচীন হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লুক্কায়িত আছে।

কালীসাগরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত যে বিরাট রাস্তার কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে আর একটি পাকা রাস্তা তক্কেমারী দিঘির উত্তর পাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ রাস্তাটি তক্কেমারী দিঘিকে উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে বেষ্টন করে দক্ষিণ-পূর্বদিকে চলে গিয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এটি যে ইট বাঁধান ছিল, সে প্রমাণের অভাব নেই। এ দুটি পাকা রাস্তা ছাড়া সমগ্র অঞ্চল জুড়ে আরও অসংখ্য রাস্তা ছিল। সেগুলির মধ্যেও কিছু কিছু পাকা রাস্তা ছিল বলে ধারণা হয়।

সমগ্র এলাকা বহুকাল ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকার ফলে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। ধারে কাছে ছিল কিছু কিছু স্থানীয় অধিবাসীদের বসতি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এখানে সাঁওতালদের বসবাসও গড়ে ওঠে। এরা এবং পরে স্থানীয় অধিবাসীরা প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ বহনকারী ঢিবিগুলিকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলেন। ফলে মূল্যবান প্রাচীন কীর্তিগুলির শেষ চিহ্নও চিরদিনের মতো শেষ হয়ে গেছে। বর্তমানে সামান্য কয়েকটি ঢিবি ছাড়া আর বিশেষ কিছুই টিকে নেই। তবে সমগ্র এলাকা জুড়ে পড়ে আছে অসংখ্য প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ। মাটির নিচে পাওয়া যায় প্রাচীন ইট ও প্রাচীন ইমারতের ভিত্তি-দেয়ালের চিহ্ন।

১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহ্যাম এ স্থান পরিদর্শন করে যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন তা নিম্নরূপ : তিনি বলেছেন যে, যোগীর ঘোপা থেকে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে 'আমারী' বা 'আমাই' নামক একটি বড় গ্রাম আছে। এখানকার বহু মূর্তি ও মূর্তির ভগ্নাংশ দেখে মনে হয় যে, এককালে এটি ছিল একটি বিশিষ্ট স্থান। গ্রামটি পূর্ব-পশ্চিমে একমাইলের চেয়ে কিছু দীর্ঘ, মাঝে মাঝে আছে কিছু কিছু বাড়িঘর এবং এগুলির ফাঁকে ফাঁকে আছে অসংখ্য প্রাচীন জলাশয়। দেড় মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে বৃন্দাবনে একটি পিপুল গাছের নিচে বেশ কয়েকটি পাথরের মূর্তি জড়ো করা আছে। এগুলির মধ্যে উৎকৃষ্টতম মূর্তিটি হচ্ছে অষ্টশক্তি মূর্তি। কাযীপুরের নিকট শিবতলাতে একটি উৎকৃষ্ট বিষ্ণুমূর্তি আছে। এই মূর্তি ৩ ফুট১ মিটার উঁচু। তা ছাড়া, পিপুলগাছের শিকড়ের মধ্যে বেশ কিছু মূর্তির ভগ্নাংশ আটকে পড়ে আছে। প্রতি বছর চৈত্র মাসে এখানে একটি মেলা বসে।[১]

আমাইরকে কেউ কেউ প্রাচীন 'রামাবতী' নগরী বলে মনে করেন। উত্তর বঙ্গে 'র' অক্ষর অনেক স্থানে 'অ' হিসাবে উচ্চারিত হতে দেখা যায়। সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে আমাইরকে (আমইর<আমাইর<রামাইর<রামাবতী) রামাবতী বলার পিছনে কিছু কষ্টকল্পিত ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

তবে এখানে রামাবতীকে টেনে আনার পিছনে বিশেষ কোনো যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। খুব সঠিকভাবে কিছু বলা না গেলেও খুব সম্ভব পালযুগের প্রথম দিকেই আমাইরে একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ গড়ে উঠেছিল। মহারাজ ধর্মপাল কতৃক নির্মিত পাহাড়পুর বিহার এস্থান থেকে প্রায় ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্বদিকে এবং মহারাজ নারায়ণ পালের সময় প্রতিষ্ঠিত গরুড় স্তম্ভলিপি প্রায় প্রায় ১১ মাইল উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত। গরুড় স্তম্ভলিপি থেকে অনুমিত হয় যে, সে সময়ে মঙ্গলবাড়িতে ছিল কেদারমিশ্র-গুরবমিশ্র প্রমুখ মন্ত্রীদের নিবাস। সেক্ষেত্রে রাজার নিবাস যে খুব দূরে ছিল না, তা সহজেই ধারণা করা যায়। সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে মনে হয় যে আমাইরেই ছিল নারায়ণ পাল ও তাঁর পূর্ব পুরুষদের বাসস্থান বা রাজধানী।

---

১. "About 3 miles to the south-west of Jogi-Gupha there is a large scattered village called Amair or Amai, which possesses several sculptures and fragments of sculpture, and has evidently been a place of some consequence in former days. The village extends for upwards a mile in length from east to west in small collections of houses, with numerous old tanks between them. At Brindaban, $1\frac{1}{2}$ mile to the north west of Amari, there are several sculptures collected under a pipul tree, of which the best is a slab containing the figures of the *Astho-Sakti*, or eight female energies of the gods. At *Siv-Tala* near Kadipur, there is a fine figure of Vishnu, 3 feet $3\frac{1}{2}$ in height, besides several fragments of sculptures enclosed in the roots of a pipul tree. A mela or fair is held there in the month of Chaitra."

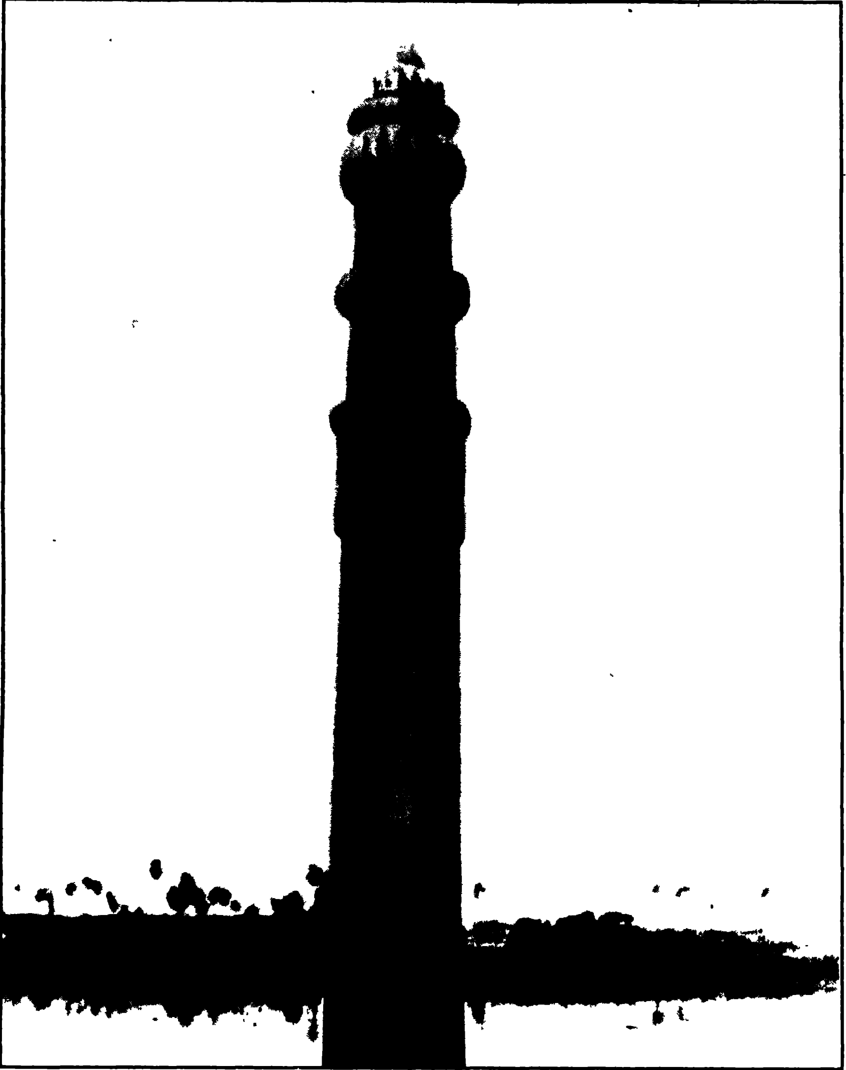
—Archaeological Survey of India Report, Vol. XV p. 122 by Sir Alexander Cunningham.

দিবর বা ধীবর দিঘি স্তম্ভ

নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলার অধীনে ও উপজেলার প্রান্তদেশে এবং পত্নীতলা উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে দিবর বা ধীবর দিঘি নামক একটি অতি প্রাচীন জলাশয়ের কেন্দ্র স্থলে অতি বিস্ময়কর একটি অতিশয় প্রাচীন কীর্তির অস্তিত্ব দেখা যায়। প্রায় বর্গাকারের হলেও উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ এই সুবিশাল জলাশয়ের প্রত্যেক বাহু ছিল প্রায় ১০০০ মিটার দীর্ঘ। তবে বহু শত বর্ষ পূর্বে খনিত এ প্রাচীন জলাশয়ের পাড়গুলি খুব সম্ভবত কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ধসে পড়ে উঁচু কাকচর বা বকচরে রূপান্তরিত হয়ে শত শত একরের কৃষিভূমিতে (ধানি জমি) পরিণত এবং প্রায় মজে যাওয়া সুবিশাল জলাশয়টি আপাতত একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জলাশয়ের আকার ধারণ করেছে। হাল আমলে (বিংশ শতাব্দীর নব্বই-এর দশকে) সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতরের অনুমতিক্রমে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উদ্যোগে প্রায় মজে যাওয়া জলাশয়টির জল নিষ্কাশন করে সেখানে আনুমানিক ১২ একর আয়তনের একটি জলাশয় নতুন করে খনন করা হয়েছে। এবং নতুন করে খনন করা জলাশয়ের সব কাদামাটি সব বকচর না কাকচরে জমা করা হয়েছে। নতুন করে খনন করা জলাশয়ে বর্তমানে (১৯৯৬ খ্রিঃ) মাছের চাষ করা হচ্ছে এবং বকচর-কাকচরের শত শত একর ভূমিতে ইরি-বোরো ধানের চাষ করা হচ্ছে।

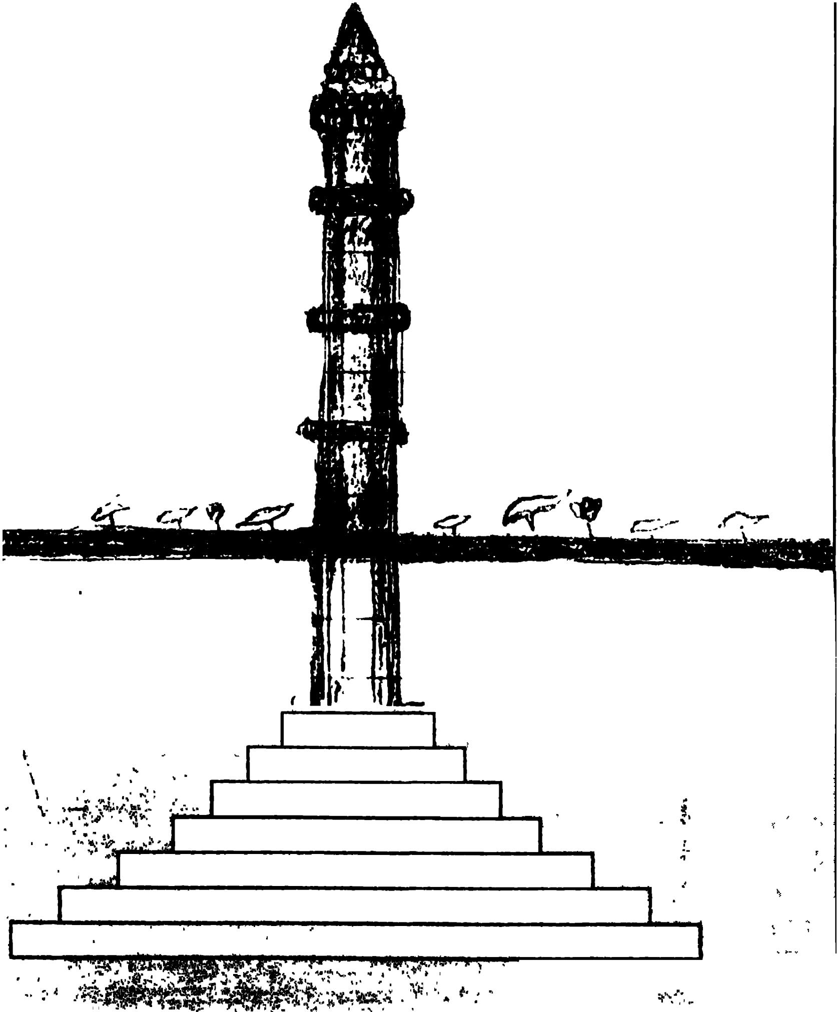
সুবিশাল এই অতি প্রাচীন জলাশয়ের কেন্দ্রস্থলে একটি অতি প্রাচীন শিলাস্তম্ভের অস্তিত্ব দেখা যায়। ১৮০৭-০৮ খ্রিস্টাব্দে ডক্টর ফ্রান্সিস বুকানন এই অনুপম ও অতুলনীয় স্তম্ভটি সরেযমিনে অবলোকন করে এর দৈর্ঘ্য '৩০.৭৫ ফুট' হবে বলে উল্লেখ করা করেছেন। তাঁর মতে অখণ্ড গ্রানাইট পাথরে নির্মিত ছিল এ স্তম্ভ। স্যার আলেকজাণ্ডার ক্যানিংহ্যাম ১৮৭৯ সালে স্তম্ভটি পরিদর্শন করে বলেন যে, পানির উপরে স্তম্ভটি প্রায় ৩.০৩ মিটার (১০ ফুট) উঁচু ছিল। তাঁর মতে পানির নিচে জলাশয়ের তলদেশ পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৩.৬৩ মিটার (প্রায় '১২ ফুট') এবং মাটির নিচে স্তম্ভটি ২.৪২ মিটার থেকে ৩.০৩ মিটার (প্রায় ৮ থেকে ১০ ফুট) পর্যন্ত প্রোথিত ছিল এবং তাতে, তাঁর মতে, সম্পূর্ণ স্তম্ভটির দৈর্ঘ্য ছিল ৯.০৯ মিটার (প্রায় ৩০ ফুট)। তাঁর বর্ণনা মতেও এটি ছিল একটি অখণ্ড গ্রানাইট পাথরে নির্মিত।

স্যার ক্যানিংহ্যামের বর্ণনামতে স্তম্ভটিতে মোট ৯টি কোণ এবং এক কোণ থেকে অন্য কোণের দূরত্ব প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার (১২ ইঞ্চি)। স্তম্ভের উর্ধ্বাংশে আছে পর পর ৩টি বলয়াকারের স্ফীত রেখা-অলঙ্করণ এবং তার উপরে আছে আমলকের অলঙ্করণ এবং শীর্ষদেশে আছে স্ফীতরেখার উপরে আমলকের অলঙ্করণের উপরে আছে উষ্ণীষ জাতীয় অলঙ্করণ। অনেক হিসাব করে তিনি বলে গেছেন যে, এ স্তম্ভের ব্যাস হবে ৭৩ সেন্টিমিটার (২৯ ইঞ্চি)। তিনি স্তম্ভের যে বর্ণনা দিয়ে গেছেন তা মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য। তবে ইতোমধ্যে নিচের প্রোথিত অংশ সম্বন্ধে যে নতুন ও চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া গেছে তা নিচে তুলে ধরা হল।



দীবর স্তম্ভ, পোরশা, রাজশাহী।

আমরা ১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসে স্তম্ভটি সরেযমিনে দেখতে যাই। তখন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের যে চেয়ারম্যানের (তাঁর নাম ভুলে গেছি) তত্ত্বাবধানে নতুন করে খননকার্য করা হয়েছিল তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একজন সুশিক্ষিত লোক (গ্রাজুয়েট)। দিঘির সম্পূর্ণ জল নিষ্কাশন ও পুনর্খননের সময় তিনি সরেযমিনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এ সম্পর্কে আমাদের বিশদ বর্ণনা দেন। তাঁর মতে বহুতলবিশিষ্ট অট্টালিকার ভিত্তি দেশের মত স্তম্ভটির মাটির নিচের নিম্নদেশ সাতটি স্তবকে (step) নির্মিত ছিল এবং নিচের স্তবকগুলি নিচের দিকে ক্রমশ: স্ফীতকায় করে নির্মিত ছিল।



আমরা নিজের চোখে স্তম্ভের মাটির নিচের অংশ যে দেখতে পাইনি তা বলাই বাহুল্য এবং চেয়ারম্যান নিজেও স্তম্ভের সেই অংশের পরিমাপ রাখেন নি বলে আমাদেরকে তা দিতে পারেন নি। তবে তাঁর বর্ণনায় কিছুটা হেরফের থাকলেও তা যে মোটামুটিভাবে ঠিক ও গ্রহণযোগ্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্তম্ভটির নিম্নদেশ অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে নির্মিত ও প্রোথিত হয়েছিল বলে বহুশত বর্ষের পরেও স্তম্ভটি বিন্দুমাত্রও হেলেনি এবং বরাবরের মতো ঋজু অবস্থায় জলাশয়ের মধ্যে দণ্ডায়মান। যদি

এর তলদেশ বিভিন্ন স্তবকে নির্মিত না হয়ে সোজাভাবে নির্মিত ও প্রোথিত হত তবে তা এতদিনে হেলে পড়ত, বিশেষ করে একটি জলাশয়ের নরম মাটিতে এর অবস্থান হেতু।

এই স্তম্ভ নিয়ে মহাভারতের দ্বিতীয় পাণ্ডব 'ভীমের পান্টির' যে আষাঢ়ে গল্প আছে তা আলাপ ও আলোচনার যোগ্য নয়। প্রচলিত জনপ্রবাদমতে এটি কৈবর্তরাজ দিব্যক, তাঁর ভ্রাতা রোদক বা ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমের কীর্তি বলে সুধী সমাজে মোটামুটিভাবে প্রচলিত। দ্বিতীয় মহীপালের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রাজ্যের অধিকাংশ অমাত্য দিব্যকের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হয়ে রাজাকে হত্যা করে দিব্যককে সিংহাসনে বসান। দিব্যকের পরে তাঁর ভ্রাতা রোদক এবং রোদকের পরে তাঁর পুত্র ভীম সিংহাসনে বসেন এবং রামপাল তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন। এ সম্পর্কে প্রচারিত মত, এর আগে তিন জন কৈবর্ত নৃপতির মধ্যে একজন এ জলাশয় খনন করে এখানে তাঁদের বিজয় স্তম্ভ হিসাবে কীর্তিটি স্থাপন করেন।

কিন্তু এ মত মেনে নেবার বিপক্ষে বেশ কয়েকটি জোরালো যুক্তি আছে। প্রথমত, জলাশয়টি ধীবর দিঘি নয়, দিবর দিঘি হিসাবে পরিচিত হয়ে আসছে। সংস্কৃত ধীবর (কৈবর্ত) শব্দ থেকে দিবর বা দীবর শব্দের উৎপত্তি অগ্রহনযোগ্য। উত্তর বঙ্গে মহাপ্রাণ ধী বর্ণ অল্পপ্রাণ দি বা দী বর্ণে রূপান্তরিত হয় না, যদিও পূর্ববঙ্গে এ ধরনের রূপান্তর অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। কাজেই এদিক থেকে দিবর দিঘির নামকরণ মোটেই সম্ভাব্য ঘটনা বলে ধরা যায় না।

দ্বিতীয়ত, স্তম্ভটি একটি অখণ্ড গ্রানাইট পাথরে নির্মিত। গ্রানাইট পাথরের প্রাপ্তিস্থান সাধারণত মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে। পাল, চন্দ্র, সেন বা কৈবর্তদের রাজ্যসীমা কোনো দিনও মধ্য বা দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল না। পাথরের ক্ষেত্রে রাজমহলের কালপাথর বা চুনারের বেলে পাথর ছিল এসব রাজবংশের একমাত্র ভরসা। এ কারণে এসব রাজবংশের প্রস্তর-কর্মের প্রায় সবই এই দুই স্থানের পাথরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

তৃতীয়ত, গ্রানাইট পাথরটির তলদেশ সহ এর যে পরিচয় পাওয়া গেল তাতে মনে হয় যে, বর্তমান অবস্থায়ও এর ওজন হবে বেশ কয়েক টন। আদি ও অকর্তিত অবস্থায় এর ওজন যে আরও বহুগুণ বেশি ছিল তা বলাই বাহুল্য। মধ্য বা দক্ষিণ ভারত থেকে এত বড় ও এত ভারি পাথর কৈবর্ত বংশীয় একজন ক্ষুদ্র নৃপতির পক্ষে এদেশে আনা আদৌ সম্ভবপর ঘটনা বলে ধারণা করা যায় না। কৈবর্ত বংশীয় নৃপতিরা কেন, প্রবল প্রতাপান্বিত পালবংশীয় নৃপতিরাও তাঁদের প্রস্তর-কর্ম কালপাথর বা বেলেপাথর দিয়েই করেছিলেন বলে দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মঙ্গলবাড়ি গরুড় স্তম্ভ অথবা পাহাড়পুর বিহারের প্রস্তর-কর্মের উল্লেখ করা যেতে পারে।

চতুর্থত, আলোচ্য দিবর দিঘির স্থান কৈবর্ত রাজবংশের জন্য এমন কোনো বিশিষ্ট স্থান ছিল না যে, এখানে একটি সুবিশাল জলাশয় খনন ও এত বড় একটি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার কোনো কারণ ছিল।

এটিকে তৃতীয় পাল নৃপতি দেবপালের কীর্তি বলেও ধরে নেবার পিছনে কোনো কারণ দেখা যায় না। এত বিরাট এক দিঘি খনন ও দিঘির মধ্যে স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা যে কোনো বিশেষ বিজয়কে চিরস্মরণীয় করার জন্য সৃষ্ট হয়েছিল তা অতি সহজেই অনুমেয়। কিন্তু

এ স্থানে বা ধারে কাছে এমন কোনো উল্লেখযোগ্য স্থান দেখা যায় না যে, যার জন্য দেবপাল কর্তৃক এত বড় একটি কীর্তি একটি জনশূন্য মাঠের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর এই বিজয়স্তম্ভ কোন্ বিজয়ের উপলক্ষে এখানে স্থাপিত হয়েছিল এবং দেবপাল কোথা থেকে এত বিশাল গ্রানাইট পাথর এনেছিলেন, সে প্রশ্ন খুবই যুক্তিসঙ্গত।

এসব কারণেই হয়ত স্যার কানিংহ্যাম যথার্থই বলেছিলেন যে, এটি অনেক আগের কীর্তি। তিনি বলেন ... "no single shaft of such a large single stone as 3o feet in length and $3\frac{1}{2}$ feet in diameter has not yet been found of the later date than the times of Asoka and it seems to me quite possible that this may be one of Asoka's monoliths."[1]

মিশরের পিরামিডের পাশে অবস্থিত স্ফীংস একটি অতুলনীয় প্রাচীন কীর্তি এবং প্রাচীন বিশ্বের সপ্ত আশ্চর্যের এক আশ্চর্য। একটি মাত্র পাথর কেটে সেই বিরাট মূর্তিটি নির্মিত হয়েছিল এবং সেই পাথরও আনা হয়েছিল শত শত মাইল দূরের এক স্থান থেকে। আলোচ্য দিবর দিঘির স্তম্ভটি স্ফীংস এর তুলনায় কিছুটা ছোট (অবশ্যই দৈর্ঘ্যে নয়) হলেও সেই কীর্তির সঙ্গে যুক্তি সঙ্গত কারণেই এর তুলনা করা চলে। এ পাথরটিও আনা হয়েছিল শত শত মাইল দূরবর্তী মধ্য বা দক্ষিণ ভারত থেকে এবং একখণ্ড পাথর কেটে তা নির্মিত হয়েছিল।

খুব সম্ভব দিঘি ও স্তম্ভের আদিনামটি হারিয়ে যাওয়ার ফলে অনেক অনেক পরে এর নামকরণ হয়েছিল কিংবদন্তি ভিত্তিক।

ঘাটনগর

পোরশা উপজেলা থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার পূর্বদিকে এবং পত্নীতলা উপজেলা থেকে প্রায় ১৯ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ঘাটনগর একটি বিরাট প্রাচীন গ্রাম। প্রায় ৪ বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় এখানে অসংখ্য প্রত্নকীর্তির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন দেখা যায়। সমগ্র এলাকায় মাটির উপরে ও নিচে দেখা যায় অসংখ্য প্রাচীন ইট, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ও প্রস্তরখণ্ড। গ্রামের মধ্যে বেশ কয়েকটি রাস্তা আছে। সেগুলি বেশ প্রশস্ত এবং রাস্তাগুলির কোনো কোনো স্থানে মাটির নিচে প্রাচীন ইটের অস্তিত্ব দেখা যায়। এতে ধারণা হয় যে, এককালে রাস্তাগুলি ইট বাঁধান ছিল।

এখানে গোটা পাঁচেক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও ঢিবিরূপে বিদ্যমান। এসব ঢিবি ও আশে পাশের এলাকা থেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, চামুণ্ডা প্রভৃতি দেবদেবীর অনেক মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এতে ধারণা করা হয় যে, এ সমস্ত ঢিবিতে হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লুক্কায়িত আছে।

১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে স্যার কানিংহ্যাম এ স্থান পরিদর্শন করেন এবং এটি যে একটি প্রাচীন স্থান, সে সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন।[২] এসব ধ্বংসাবশেষের কিছু দক্ষিণে এক পীরের

১. Sir Alexander Cuniaghuam : Archaeological survey of India Report, Vol. XV, p. 123

২. "It is an old site as evidenced by the numerous sculptures and quantities of old bricks to be seen in all directions."—Ibid, p. 124

মাযার আছে। স্যার কানিংহ্যামের সময়ে মাযারের উপরে ছাদ ছিল না। দরজার দু'পাশে তোতা পাখী ও ফুলের নকশা করা ইটের কাজ তিনি দেখেছিলেন বলে উল্লেখ করে গেছেন। নকশার কাজ খুব উঁচুমানের ছিল না বলে তিনি বলে গেছেন।

মাযারের কাছেই আছে বেশ কয়েকটি প্রাচীন জলাশয়। এগুলির মধ্যে ছয়ঘাটির দিঘি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এই দিঘির পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ে ২টি করে এবং উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ে ১টি করে বাঁধান ঘাট ছিল বলে এটিকে ছয়ঘাটির দিঘি বলা হত।

দিঘি থেকে বেশ কিছু দূরে এক জমিদারের একটি কাচারি বাড়ি ছিল। কাচারি বাড়িটি একটি প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত ছিল বলে স্যার কানিংহ্যাম বলে গেছেন। এর দেয়ালগুলি ছিল প্রাচীন ইটের তৈরি, খুব সম্ভব সেই ধ্বংসাবশেষের ইটই ছিল সেগুলি। কাচারির দেয়ালে একখণ্ড পাথর বসানো ছিল। তাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও অন্য ২জন দেবতার দণ্ডায়মান মূর্তি উৎকীর্ণ ছিল বলে তিনি উল্লেখ করে গেছেন।

ঘাটনগরের পাশ দিয়ে এককালে একটি নদী প্রবাহিত ছিল। স্যার কানিংহ্যামের মতে এ নদী ছিল আত্রাই। কিন্তু আত্রাই নদীর ধারা এত পশ্চিমে ছিল বলে জানা যায় না। খুব সম্ভব অন্য একটি নদীর ধারা এ খাত দিয়ে প্রবাহিত ছিল।

আগ্রা-দ্বিগুণ

পাশাপাশি অবস্থানরত দুটি গ্রাম আগ্রা ও দ্বিগুণ মিলে আগ্রা-দ্বিগুণ নামক একটি প্রাচীন স্থান। পোরশা থানার সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত এ স্থান দেশ বিভাগের পূর্বে দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে এ স্থান নওঁগা জেলার অধীনে।

প্রায় ৬ বর্গ কিলোমিটার স্থান জুড়ে এখানে অসংখ্য প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন ও অসংখ্য প্রাচীন জলাশয়ের অস্তিত্ব দেখা যায়। জলাশয়গুলির মধ্যে দ্বারকা দিঘি, সংহার দিঘি, ধাক্‌রানী দিঘি ও পাথর দিঘি সমধিক উল্লেখযোগ্য। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এসব জলাশয় যে প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের, তাতে সন্দেহ নেই। এগুলির ধারে কাছে আছে অসংখ্য প্রাচীন ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন।

এখানকার অধিকাংশ প্রাচীন কীর্তি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। একটি বড় ঢিবি এখনও কোনো রকমে টিকে আছে। প্রায় ১ একর ভূমি জুড়ে অবস্থিত এ ঢিবিটি এখনও প্রায় ৪.৫৪ মিটার উঁচু। এর ভিতরে আছে অসংখ্য প্রাচীন ইট এবং উপরে পড়ে আছে অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড। এখান থেকে অসংখ্য প্রস্তরমূর্তি উদ্ধার করা হয়েছে। সে সব মূর্তির বেশ কয়েকটি কলকাতা আশুতোষ মিউজিয়াম ও রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। কালপাথরে উৎকীর্ণ গরুড় বাহন বিশিষ্ট একটি বিষ্ণু মূর্তি এবং একজন নারীর মুখ মণ্ডলের মূর্তিতে অপূর্ব শৈল্পিক সৌকর্য দেখা যায়।

এই বিরাট ঢিবিটি কোনো বৌদ্ধ না হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, তা উৎখনন না করে সঠিকভাবে বলা কঠিন। তবে এটি যে একটি বিরাট আকারের ইমারত ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মুসলিম আমল

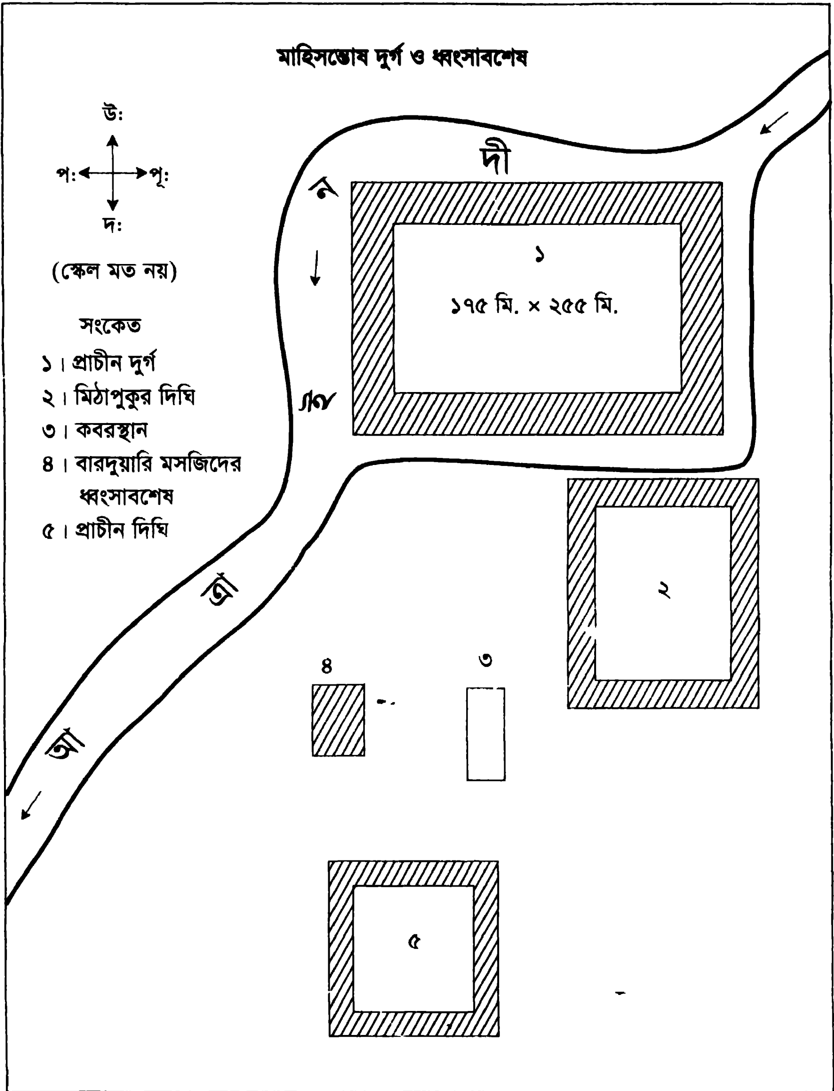
মাহীগঞ্জ বা মাহী সন্তোষ

নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলার অধীনে ও উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে, ভারতের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহর থেকে আনুমানিক ৩ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণে ও আত্রাই নদীর পূর্ব তীরবর্তী অঞ্চলে মাহী সন্তোষ বা মাহীগঞ্জ নামক স্থান অবস্থিত। এ স্থানের পোশাকী নাম চৌঘাটা মৌজা। প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ থেকে আরম্ভ করে মোঘল আমল পর্যন্ত এ স্থান একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ বলে বরাবরই পরিচিত ছিল। এখানে অবস্থিত বিভিন্ন প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ, একটি প্রাচীন দুর্গ, অসংখ্য প্রাচীন জলাশয়, বিভিন্ন স্থানে স্তূপীকৃত প্রস্তরখণ্ড, অসংখ্য অখণ্ড ও ভগ্ন প্রাচীন ইট, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ, শিলালিপি ও অন্যান্য প্রত্নবস্তু এ স্থানের প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করে।

একমাত্র প্রাচীরবেষ্টিত একটি দুর্গ ও অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড ছাড়া হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের অন্য তেমন কোনো সুনির্দিষ্ট প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ এখানে পাওয়া যায়নি। তবে যতটুকু ধারণা হয়, দুর্গটি বোধ হয় হিন্দু-বৌদ্ধ যুগেই নির্মিত হয়েছিল এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের পরে এটি মুসলিম আমলেও ব্যবহৃত হয়েছিল। তবে হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের কিছু কিছু জলাশয়ও এখানে ছিল বলে ধারণা করা যায়। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ মাটির প্রাচীর ও প্রাচীরের বাইরে সুপ্রশস্ত পরিখা বেষ্টিত এ দুর্গের আয়তন ২৫৫ মিটার × ২২৫ মিটার। পরিখাগুলি শুধু প্রশস্ত নয়, গভীরও বটে। দুর্গের অভ্যন্তরে অভগ্ন ও ভগ্ন, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ও অন্যান্য প্রত্নবস্তু প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া গেছে। কিন্তু কোনো ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়নি।

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের সুনির্দিষ্ট তেমন কোন প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ এখানে পাওয়া যায়নি। প্রাচীর বেষ্টিত যে সুবৃহৎ দুর্গটির ধ্বংসাবশেষ আজও এখানে দেখা যায়, তা প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের, না মুসলমান আমলের, তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়নি। এই বিরাট দুর্গের মাটির তৈরী প্রাচীরগুলি এখনও পাহাড়ের মত উঁচু। প্রাচীরের বাইরেই আছে বিরাট আকারের পরিখা। তবে এই দুর্গ খুব সম্ভব হিন্দু-বৌদ্ধ যুগেই নির্মিত হয়েছিল এবং পরে মুসলমান আমলেও এটিকে আরও সুদৃঢ় করা হয়েছিল।

এস্থানে অসংখ্য প্রাচীন দিঘি-পুষ্করিণী আছে। বেশির ভাগ জলাশয় উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। এতে ধারণা হয় যে এগুলি প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের। কয়েকটি প্রাচীন পাকা সড়কের চিহ্নও পাওয়া যায় মাহী সন্তোষে। খুব সম্ভব এসব রাস্তাও সে যুগের। অসংখ্য প্রস্তর খণ্ড পাওয়া গেছে এ স্থানে। হোসেন শাহর আমলে নির্মিত একটি মসজিদে অসংখ্য পাথর ব্যবহৃত হয়েছিল। এগুলি যে হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে নির্মিত কোন মন্দির জাতীয় ইমারতের ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগৃহীত হয়ে মসজিদে ব্যবহৃত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কোন কোন পাথরের পিছন দিকে উৎকীর্ণ মূর্তিও পাওয়া গেছে।



এস্থানের মাহীসন্তোষ বা মাহীগঞ্জ নাম পালবংশের প্রথম মহীপালদেবের সংঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল অনেক পণ্ডিতের ধারণা। বিখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় থেকে আরম্ভ মৌলভী শামসউদ-দীন আহমদ পর্যন্ত অনেক বিশিষ্ট পণ্ডিত এ মতের সমর্থক। কিন্তু এ স্থানের প্রকৃত নাম আদৌ 'মাহীসন্তোষ' ছিল কিনা, তাতে প্রচুর সন্দেহ দেখা দেয় ১২৬০ খ্রীস্টাব্দে মীনহাজ-ই-সিরাজ রচিত 'তবকাত-ই-নাসিরী' নামক গ্রন্থে এ স্থানের বর্ণনা দেখে। সেখানে দেখা যায় যে ১২০৭ খ্রীষ্টাব্দে মোহাম্মদ শীরান খলজী

নামক পরলোকগত মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর একজন আমির দিল্লীর সুলতান কুতব-উদ্-দীন আইবাকের সৈন্যদলের নিকট পরাজিত হয়ে দেবকোট থেকে পালিয়ে এসে 'মকসিদা ও সন্তোষ' নামক স্থানে নিজেদের মধ্যে আত্মকলহের কারণে নিহত হন এবং সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।[১] বর্তমান মাহীসন্তোষ খুব সম্ভব তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থে বর্ণিত সন্তোষ। এ স্থান সেন যুগেও সন্তোষ (মাহীসন্তোষ নয়) নামেই পরিচিত ছিল বলে দেখা যায়।

এ স্থানের এই মাহীগঞ্জ নাম নিয়ে বিভিন্ন অভিমত দেখা যায়। কেউ কেউ বলেন যে সংস্কৃত 'মহী'শব্দের সংগে ফারসী 'গঞ্জ' শব্দের সংযোগে মুসলমান আমলে এই নামকরণ হয়েছিল। আবার কেউ কেউ বলেন, 'মায়ি' (মাই বা মা) শব্দের অপভ্রংশ 'মাহী' (এবং তা একজন মহিলা পীরের সমাধির সংগে সম্পৃক্ত বলে) শব্দের সংগে গঞ্জ শব্দের সংযোগে এ নামকরণ হয়েছিল। এই তথাকথিত মহিলা পীরের মাজার সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

এস্থানের নামকরণ সম্পর্কে সঠিকবাবে কিছুই বলা যায় না। তবে সুলতান রুকন-উদ্-দীন বারবক শাহ্‌র আমলে ৯১৪৫৯-৭৬ খ্রী:) এ স্থানের নাম যে বারবকাবাদ ছিল, সে প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর আমলের মুদ্রা থেকেই। ৮৬৪ হিজরী (১৪৫৯ খ্রী:) সনে বারবকাবাদ টাকশাল থেকে এই মুদ্রা প্রচলিত হয়েছিল। এতে সহজেই ধারণা করা যায় যে তাঁর রাজ্যপ্রাপ্তির আগেই এখানে উল্লেখযোগ্য জনপদ ছিল এবং তিনি সেটিকে বারবকাবাদ নামে অভিহিত করেছিলেন। এর পরে সুলতান শামস-উদ্-দীন মোযাফ্‌ফর শাহ্‌র আমলে ৮৯৬ হিজরী (১৪৯০ খ্রী:) সনের একটি মুদ্রা ও সুলতান নাসির-উদ্-দীন নুসরত শাহ্‌র আমলে ৯২৮ হিজরী (১৫২১ খ্রী:) সনের আর একটি মুদ্রা বার বকাবাদ টাকশাল থেকে প্রচলিত হয়েছিল।[২]

আবুল ফজল রচিত 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে দেখা যায় যে সম্রাট আকবরের আমলে বাঙলার ১৯টি সরকারের মধ্যে বারবকাবাদ ছিল একটি। এর অধীনে ৩৮টি মহল (বা পরগনা) ছিল এবং এর বার্ষিক রাজস্ব ছিল ১,৭৪,৫১,৫৩২ দাম (৪,৩৬,২৮৮ টাকা)। রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলাগুলির বিভিন্ন অংশ এই সরকারের অধীনে ছিল। এ সরকার ৫০ জন অশ্বারোহী ৭০০০ হাজার পদাতিক সৈন্য সরবরাহ করত।

মাহি সন্তোষে ৩টি শিলালিপি পাওয়া গেছে। দিনাজপুর জেলার তদানীন্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. ভি, ওয়েস্টমকেট (Mr. V. Westmacot) দু'টি লিপি উদ্ধার করেন, একটি বড় ও একটি ছোট। বড় লিপিটি 'মাহি' বা 'মায়ি সন্তোষ' নামক একজন মহিলা পীরের মাজারের ভিতরের দরজার উপর লাগান ছিল। লিপির পাঠ থেকে জানা যায় যে সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ্‌র আমলে খান-উল-মোয়ায্‌যেম উলুঘ ইকরার খান

১. তবকাত-ই-নাসিরী, মূল রচনা (ফারসী ভাষায়) কাজী মীনহাজ-ই-সিরাজ। অনুবাদ ও সম্পাদনা আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, ৪৭ পৃ: ও ৪ পাদটীকা। মূল ফারসী পাঠ ১৩ পৃ:। মেজর রেভাটির ইংরেজী অনুবাদ ৫৭৬ পৃ: ও ৪ পাদটিকা।
২. Corpus of the Muslim Coins of Bengal, Table II.—*Dr. A. Karim.*

৮৬৫ হিজরী (১৪৬০-৬১ খ্রী:) সনে খান-ই-মোয়াযযেম আশরাফ খানের মাধ্যমে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।[১]

এতে দেখা যাচ্ছে যে মায়ি সন্তোষ মাযারের সঙ্গে এই শিলালিপির কোন সম্পর্কই নেই। যে মসজিদে এই শিলালিপিটি ছিল, সেই মসজিদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এ স্থানে অসংখ্য পাকা ইমারতও এককালে পাকা প্রাচীর বেষ্টিত চত্বরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। দেয়াল গুলি এখন আর টিকে নেই। কিন্তু ধ্বংসাবশেষ দেখে সহজেই বোঝা যায় যে এসব স্থানে ইমারতাদি ছিল। খুব সম্ভব আলোচ্য মসজিদটি এগুলির মধ্যে কোন একটিতে বিদ্যমান ছিল। সেই মসজিদটি ধ্বংপ্রাপ্ত হয়ে গেলে খুব সম্ভব অনেক পরবর্তীকালে শিলালিপিটি মাজারে এনে লাগান হয়েছিল। মাজারটি মসজিদেরও আগে নির্মিত হয়েছিল বলে মিঃ ব্লকম্যান (Mr. Blochman) অনুমান করেন ও মাযারের কাছেরই একটি প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ মসজিদ ছিল বলে অনুমান করা হয়। শিলালিপিটি সেই মসজিদেরও হতে পারে।

দ্বিতীয় শিলালিপিটিও মি: ওয়েস্টমকেট উদ্ধার করেন। কিন্তু কোন্ স্থানে এটি পাওয়া গিয়েছিল, তা সঠিক ভাবে জানা যায়নি। তবে স্থানীয় জনশ্রুতিমূলে জানা যায় যে, এই লিপিটি প্রথম লিপির পাশেই ছিল। এই শিলালিপির সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধার করা যায়নি। যেটুকু পাঠ উদ্ধার করা গেছে, তা থেকে জানা গেছে যে সুলতান বারবক শাহ্র আমলে খান-উল-আযম ওয়াল মোয়ায্যম উলুব [খান] বিখ্যাত বারবকাবাদ শহরের উজীর ৮৭৬ হিজরী (১৪৭১-৭২ খ্রী:) সনে এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।[২]

এ স্থানের তৃতীয় শিলালিপিটি রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠাতা কুমার শরৎ কুমার রায় কর্তৃক একটি বিরাট মসজিদের ধ্বংসাবশেষ থেকে আবিষ্কৃত হয়। লিপির পাঠ থেকে জানা যায় যে সুলতান হোসেন শাহ্র আমলে ৯১২ হিজরী (১৫০৫ খ্রী:) সনে সোহেলের পুত্র ... (নামের অংশের পাঠ উদ্ধার করা যায়নি) কর্তৃক এ মসজিদ রমজান মাসে নির্মিত হয়েছিল।[৩]

এই মসজিদের ধ্বংসাবশেষ গভীর জঙ্গলে ঢাকা ছিল। বর্তমানে জঙ্গল পরিষ্কার করে প্রাচীন মসজিদের প্রাঙ্গণে একটি টিনের তৈরী ছাপরা ঘরে নামাজ পড়া হয়। প্রাচীন মসজিদের পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর দেয়াল মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। পশ্চিম দেয়ালের কিছু কিছু অংশ এখনও টিকে আছে এবং তা মাটি থেকে প্রায় ৩ ফুট উঁচু। বেশির ভাগ ইট এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। শুধু পাথরগুলি স্তূপীকৃত হয়ে মসজিদ প্রাঙ্গণে পড়ে আছে এখানে ওখানে। এগুলির মধ্যে অধিকাংশই কাল পাথর।

মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে যে ৫টি মিহরাব ছিল, সে প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রস্তর নির্মিত মিহরাবগুলিতে লতাপাতা, ঝুলন্ত শিকল, প্রস্ফুটিত পুষ্প ইত্যাদি অলঙ্করণের কাজ অতি নিখুঁতভাবে করা ছিল। কুমার শরৎ রায় একটি মিহরাবের পাথর বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের জন্য নিয়ে আসেন। পাথরগুলির পিছনে সূর্য ও বিষ্ণু মূর্তি উৎকীর্ণ ছিল বলে দেখা যায়।

১. Inscriptions of Bengal, Vol. IV, by Mvi. Shamsuddin Ahmad, p. 74.
২. Ibid, p. 90.
৩. Ibid, p. 90.

এ মসজিদের নাম বারদুয়ারি বা রাজবাড়ি মসজিদ। রাজশাহির বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম কর্তৃক ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে এখানে উৎখনন কার্য করা হলে বহু দরজাবিশিষ্ট একটি বড় ধরনের মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয় এবং এর প্রকৃত আয়তন ও আকৃতি উদ্ধার করা যায়নি বলে এটিকে রাজবাড়ির বারদুয়ারি মসজিদ নামে অভিহিত করা হয়। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে বেশ কয়েকটি মিহরাব ছিল। মিহরাবগুলি ছিল প্রস্তরনির্মিত। এগুলির মধ্যে একটি মিহরাবকে বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে নিয়ে যাওয়া হয়। অপূর্ব শিল্প শৈলীর নিদর্শন বহনকারী প্রস্তর নির্মিত সেই মিহরাব এখনও (১৯৯৬ খ্রিঃ) সেখানে রক্ষিত আছে।

মসজিদের শিলালিপিটি ১৯´´ × ৯´ আয়তনের একটি কাল পাথরে উৎকীর্ণ। পাথরের পিছনদিকে একটি বিষ্ণু মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। শিলালিপি ও মেহরাবের পাথরে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ দেখে অতি সহজেই ধারণা করা যায় যে পাথরগুলি কোন প্রাচীন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হিন্দু মন্দির থেকে সংগ্রহ করে মসজিদে ব্যবহার করা হয়েছিল। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরটি যে মাহি সন্তোষেই ছিল, তা অনুমান করা যায়। উৎকীর্ণ মূর্তিগুলি পাল-সেন যুগের বলে মনে হয়।

এখানে অসংখ্য প্রাচীন জলাশয় আছে। এগুলির মধ্যে মিঠাপুকুর নামক দিঘিটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে যে দুর্গ বা গড়ের কতা আগে বলা হয়েছে, তা মিঠাপুকুরের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। মিঠাপুকুরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত পূর্বোক্ত মায়ি সন্তোষ ও তৎার কন্যার মাজার। একটি অনুচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে মাজার দু'টি অবস্থিত। মায়ি সন্তোষ বলে কথিত মহিলা পীরের কথা কিছুই জানা যায় না। আদতে তিনি আদৌ কোন মহিলা ছিলেন কিনা সে সম্পর্কেও কোন সঠিক সন্ধান পাওয়া যায় না। তাঁর কন্যা বলে কথিত ব্যক্তির পরিচয়ও জানা যায় না। মাজার দু'টির বয়স সম্পর্কে মি: ব্লকম্যান বলেন যে মাজারটি শিলালিপিটির চেয়ে প্রাচীন।[১]

১২০৭ খ্রীস্টাব্দের দিকে মোহম্মদ শিরান খলজী যে এখানে নিহত ও সমাহিত হয়েছিলেন, সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর সমাধি বা সমাধির চিহ্ন এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। উপরে উল্লিখিত মায়ি সন্তোষ মাজারটি শিরান খলজীর কিনা, তা নিঃসন্দেহে বলা না গেলেও এধরনের সম্ভাবনার কতা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

মাজার দু'টির কিছু পশ্চিম দিকে একটি প্রাচীন কবরস্থান আছে। সেখানে একটি প্রাচীন বাঁধান কবরকে 'উজিরের কবর' বলা হয়ে থাকে। এটিকে তৃতীয় শিলালিপির মসজিদ নির্মাতার কবর বলে অনেকে বলে থাকেন।

পরিত্যক্ত মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখে এটিকে বহু গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ বলে ধরা হলেও জঙ্গলে ঢাকা মসজিদটির প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করা যায়নি। বিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতরের উপ-পরিচালক মোশাররফ হোসেন

---

১. 'In all probability, the tomb is older than the inscription. Tombs have always been storeplaces for inscriptions of ruined mosques of the neighbourhood. They add to the sanctity of the tomb because their characters are generally tougher and therefore unintelligible to the common people. These are poured with milk and oil by votaries who look upon them as powerful amulets, or by the sick who catch the dripping liquid and get cured." Ibid, p. 74.

মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ৩টি করে প্রবেশ পথের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন এবং সেই সঙ্গে পূর্ব দেয়ালে ৫টি প্রবেশ পথের। তাতে দেখা যায় যে মসজিদটি ১৫ গম্বুজ বিশিষ্ট ছিল। এ বিষয়ে তিনি একটি প্রবন্ধও প্রকাশ করেন।[২]

মাসিদা (মাকসুদা?)

নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার অধীনে ও উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১১ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং আত্রাই নদীর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলে সদুর-উদ-দোহা ('Sadur-doha') নামক স্থানে একজন সুবিখ্যাত পীরের মাযার এবং সেই সঙ্গে তাঁর পিতা বদর-উদ-দোহা এবং সেই সঙ্গে এই পরিবারের আরও কয়েকজন সদস্যের পাকা কবর ছিল বলে ডক্টর ফ্রান্সিস বুকানন ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে এ স্থান পরিদর্শন করে বলে গেছেন। তিনি আরও বলেন যে, প্রাক-মুসলিম যুগের ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারতাদি থেকে মাল-মসলা সংগ্রহ করে মাযারগুলি নির্মিত হয়েছিল।

মীনহাজ-ই-সিরাজ তাঁর রচিত তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থে বলে গেছেন যে, ১২০৭-০৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে সুলতান কুতব-উদ-দীন আইবাকের সেনা বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়ে পরলোকগত মোহাম্মদ বখতিয়ারের বিশ্বস্ত আমির মোহাম্মদ শিরান খলজি মাকসুদা ও সন্তোষ নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং আত্ম-কলহের কারণে তিনি সন্তোষে মৃত্যু মুখে পতিত হন। মীনহাজ বর্ণিত মাকসুদা ছিল খুব সম্ভব বুকানন কর্তৃক উল্লিখিত মাসুদা এবং এ দুটি স্থান খুবই উল্লেখযোগ্য ছিল বলে মনে হয়।

কুসুম্বা মসজিদ

রাজশাহী শহর থেকে প্রায় ৩৩ কিলোমিটার উত্তরে ও মান্দা থানা থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার দক্ষিণে কুসুম্বা নামক একটি প্রাচীন গ্রামে অবস্থিত এ মসজিদের নাম কুসুম্বা মসজিদ। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ৩৭৮ মিটার × ২৪২ মিটার আয়তনের একটি প্রাচীন জলাশয়ের পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ মসজিদের আয়তন ১৭.৫৭ মিটার × ১২.৭২ মিটার। দেয়ালগুলি প্রায় ১.৮১ মিটার প্রশস্ত। ইটের তৈরি এ মসজিদের দেয়ালগুলি বাইরে ও ভিতরে পাথর দ্বারা আবৃত। অবশ্য ছাদ ও গম্বুজে এবং মিহরাবের অংশবিশেষে পাথরের আচ্ছাদন নেই।

মসজিদের চার কোণে ৪টি অষ্টকোণাকার মিনার বা টারেট (turret) আছে। পূর্ব দেয়ালে সম আয়তনের খাঁজকাটা ও খিলানযুক্ত ৩টি প্রবেশ পথ। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে আছে ২টি করে খিলানযুক্ত দরজা। দক্ষিণ দেয়ালের দরজা দুটি জ্যামিতিক মাপে নির্মিত পাথরের জাফরি দ্বারা বন্ধ। পূর্ব দেয়ালের প্রবেশপথ ৩টির বরাবর পশ্চিম দেয়ালের অভ্যন্তর ভাগে ৩টি নক্‌শা করা মিহবার আছে। কেন্দ্রীয় মিহরাব ও তার দক্ষিণের মিহরাবটি আয়তনে বড়। উত্তরের মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের। উত্তরের মিহরাবের সামনে পাথরের স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি ছোট দ্বিতল প্রকোষ্ঠ

---

২. Md Mosharrof Hossain : Fifteen Domed Mosques of Bangladesh, Journal of the Asiatic Socicty of Bangladesh, Hum. Vol. 44. No. 1, June, 1999.

আছে। এটি ছিল স্থানীয় সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তার জন্য নির্দিষ্ট করা এবং ছোট সোনা মসজিদ ও দরসবাড়ি মসজিদের অনুকরণে নির্মিত (ছোট সোনা মসজিদ দ্র.)।

মসজিদের ভিতরের অংশ পূর্ব-পশ্চিমে দুইভাগে (aisles) বিভক্ত এবং উত্তর-দক্ষিণে তিন ভাগে (bays) বিভক্ত। মসজিদের অভ্যন্তরে মাত্র ২টি প্রস্তর স্তম্ভ আছে। এ দুটি স্তম্ভ ও চারপাশের দেয়ালের উপর মসজিদের ৬ টি গম্বুজ অবস্থিত। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে ৩টি গম্বুজ ভেঙ্গে পড়ে ও মসজিদের বহু ক্ষতি সাধিত হয়। পরে আরও একটি গম্বুজ ভেঙ্গে পড়ে। পরে মসজিদে অনেক মেরামতের কাজ করা হয়। [কুসুম্বা মসজিদের রঙিন ছবি-৪]

মসজিদের বাইরের দেয়ালে ও মিহরাবে পাথরের উপর পোড়ামাটির চিত্রফলকের (terra-cotta plaques) অনুকরণে নানা রকম কারুকার্য আছে। সুলতানী আমলে টেরাকোটা শিল্প ও পাথরের উপর কাজ করার যে গৌরবময় দৃষ্টান্ত ও নৈপুণ্য দেখা যায়, ১৫৫৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত এ মসজিদে সেগুলির অনুকরণ ও অনুসরণ দেখা গেলেও শিল্প চাতুর্যের উৎকৃষ্টতার অভাব এখানে পরিলক্ষিত হয়। বাঘা বা গৌড়ের সুলতানী আমলের কোনো মসজিদের টেরাকোটা শিল্পের সঙ্গে এ মসজিদের শিল্প চাতুর্যের কোনো তুলনাই চলেনা। টেরাকোটা শিল্পের অনুকরণে পাথরের উপরে অলঙ্করণের সম্ভবত শেষ প্রচেষ্টা এখানে করা হয়েছে। কিন্তু এ শিল্প তার পূর্ব গৌরব হারিয়ে ফেলেছে বলে মনে হয়, আছে খানিকটা অন্ধ ও প্রাণহীন অনুকরণ। এ সম্পর্কে অধ্যাপক দানী বলেন,[১]

"The stone cutter's art has reached its evening of life, where nothing intelligent remains, but everything points to its decay and death. Hereafter we no more hear of stone-works in Bengal, excepting the inscription tablets, a few cenotaphs, and those used at the tomb of Bibi Pari at Dacca probably a work of foreign masons."

মসজিদের যে শিলালিপি আছে, তা থেকে জানা যায় যে, সুলতান মাহমুদ শাহ্ গাযীর পুত্র সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন বাহাদুর শাহ্‌র রাজত্বকালে সোলায়মান কর্তৃক ৯৬৬ হিজরী (১৫৫৮ খ্রিঃ) সনে এ মসজিদ নির্মিত হয়। সম্রাট শের শাহ্‌র মৃত্যুর পরে বাঙলায় নিযুক্ত তদানীন্তন আফগান শাসনকর্তা মোহাম্মদ খানসুর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং শাম্স-উদ্-দীন মাহমুদ শাহ্ গাযী নাম ধারণ করে বাঙলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর শাহ্ ছয় বছর (১৫৫৪-৬০ খ্রিঃ) বাঙলায় রাজত্ব করেন। শিলালিপিতে দেখা যাচ্ছে, তাঁরই রাজত্বকালে জনৈক সোলায়মান এ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে কুমারপুর শিলালিপির (কুমারপুর মসজিদ দ্র.) উল্লেখ করা যেতে পারে। উভয় শিলালিপির মসজিদ নির্মাতার নাম সোলায়মান ও নির্মাণকাল একই ১৫৫৮ খ্রিঃ।

এই সোলায়মানের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। এই সোলায়মানকে রাজশাহীর এককালের কালেকটর মিঃ কার্সটেয়ারস্ (Mr. Carstairs) কিংবদন্তি অনুসরণ করে একজন ধর্মান্তরিত মুসলমান (converted Muslim) বলে অভিহিত করে গেছেন (J.

১. Muslim Architecture in Bengal, p. 164.—Dr, A. H. Dani.

A. S. B. vol. L X X 111 1904, pp.108-117)। তিনি নাকি ছিলেন চিলমন মজুমদার নামক একজন হিন্দু জমিদার। রাজস্ব আদায়ে অক্ষম হলে তিনি কারারুদ্ধ হন। পরে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও মসজিদাদি নির্মাণ করেন। এ সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ তিনি দিতে পারেননি।

কুসুম্বাকে কোনো কোনো ঐতিহাসিক প্রাচীন কৌশম্বী নগর বলে মনে করেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতে' ও মহারাজ বিজয় সেনের দেওপাড়া লিপিতে যে বর্ধন রাজার উল্লেখ আছে, তাঁদের মতে সেই বর্ধন রাজা ছিলেন আলোচ্য কুসুম্বার (প্রাচীন কৌশম্বী) অধিপতি। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা একমত নন।

কুসুম্বা প্রাচীন কৌশম্বী না হলেও এ স্থান অত্যন্ত প্রাচীন এবং এখানে যে প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের অসংখ্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। মসজিদে ব্যবহৃত পাথর কোনো প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল বলে ধারণা হয়। মসজিদ প্রাঙ্গণের নিচে কতগুলি পাথরে বিষ্ণু ও গণেশের মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। এগুলি ছাড়াও কুসুম্বা অঞ্চলে প্রাক মুসলিম আমলের অনেক প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন দেখা যায়। একটি প্রাচীন পাকা রাস্তার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। যে দিঘির পাড়ে মসজিদটি অবস্থিত, তাও যে প্রাক মুসলিম আমলের, তাতে বোধ হয় সন্দেহ নেই।

এ সমস্ত কারণে বর্তমান কুসুম্বাতে বৌদ্ধ-হিন্দু যুগে একটি প্রাচীন জনপদের অস্তিত্ব ছিল বলে প্রমাণিত হয়। পরবর্তীকালে মুসলিম আমলে এ স্থানে আবার নূতন করে একটি জনপদ গড়ে ওঠে এবং প্রাচীন আমলের অনেক উপকরণ দিয়ে আলোচ্য মসজিদটি নির্মিত হয়।

অন্য একটি মসজিদ

এ মসজিদ ছাড়া আরও একটি মসজিদ এখানে নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। আলোচ্য মসজিদের সামান্য উত্তর-পশ্চিম দিকে এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। মসজিদের কাছে অন্যান্য ইমারতের ধ্বংসাবশেষও আছে। পরিখা বেষ্টিত এ স্থানকে মসজিদ নির্মাতার বাড়ি বলে কেউ কেউ অনুমান করেন। সেই মসজিদের কোনো শিলালিপি পাওয়া যায়নি। তবে পূর্বোক্ত কুমারপুর মসজিদের শিলালিপির পাঠ থেকে জানা যায় যে, জনৈক সোলায়মান কর্তৃক একটি মসজিদ ও প্রাচীর নির্মিত হয়েছিল। প্রাচীরের উল্লেখ দেখে এবং অন্যান্য কারণে কুমারপুর মসজিদের শিলালিপিটি কুসুম্বার এ মসজিদের শিলালিপি বলেই মনে হয়।

সোলায়মান তথা চিলমন্ মজুমদার সম্পর্কে জনপ্রবাদভিত্তিক যে কাহিনীর কথা বলা হয়েছে, তাতে কোনো সত্য আছে বলে মনে হয় না। খুব সম্ভব মসজিদ নির্মাণকারী সোলায়মান ছিলেন একজন স্থানীয় শাসন কর্তা। শিলালিপিব 'বানা কারদা-ই সোলায়মান দাম আদিলুহু' অর্থাৎ ' সোলায়মান কর্তৃক নির্মিত—তাঁর [ন্যায়] বিচার টিকে থাকুক!' পাঠ থেকে ধারণা হয় যে, তিনি খুব সম্ভব একজন প্রশাসক অথবা বিচারক ছিলেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ

নওদা-রহনপুর

চাঁপাই-নবাবগঞ্জ জেলার অধীনে রহনপুর রেলস্টেশন থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বদিকে নওদা গ্রাম অবস্থিত। সেখানে বেশ কয়েকটি প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আছে। এক কালে পুনর্ভবা নদী নওদার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হত। এখন নদী প্রায় ১.৪ কিলোমিটার পশ্চিমে সরে গেছে এবং নদীর প্রাচীন খাত এখন (১৯৭৮ খ্রিঃ) নিম্নভূমিতে পরিণত হয়েছে। রহনপুরের কয়েক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে পুনর্ভবা নদী মহানন্দা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

এককালে নওদা ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি নিয়ে একটি বিরাট নগরী গড়ে উঠেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। নওদা, মীরাপুর, পীরপুর, রহনপুর, ভাগলপুর, পুনার, প্রসাদপুর, কসবা প্রভৃতি গ্রাম যেখানে অবস্থিত, সেখানেই ছিল এই প্রাচীন জনপদ এবং তা ছিল আয়তনে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ বর্গকিলোমিটার। এ স্থানে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের যে সব চিহ্ন পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় যে, প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে এখানে একটি বিরাট নগরীর অস্তিত্ব ছিল। এখানকার প্রায় সব কীর্তিই বিলুপ্ত হয়ে গেছে, প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশই এ স্থানের অতীত গৌরবের একমাত্র সাক্ষী। আর আছে মজে যাওয়া অসংখ্য প্রাচীন জলাশয়। বর্তমান রহনপুর শহর ও বাজার এলাকা যে একটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, এস্থানের প্রায় সর্বত্রই মাটির নিচে প্রাচীন ইমারতের ভিত্তি-দেয়ালের চিহ্ন এবং অসংখ্য প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ দেখা যায়।

নওদা গ্রামের উত্তর দিকে উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ বহনকারী কয়েকটি ঢিব দেখা যায়। ঢিবিগুলি যেখানে আছে, সে স্থানটি পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে অপেক্ষাকৃত উঁচু। এ স্থান উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৩০৩ মিটার দীর্ঘ ও পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ২০৬ মিটার প্রশস্ত। এস্থানের পূর্ব পাশ দিয়ে একটি গ্রাম্য পথ উত্তর-পূর্ব দিকে চলে গেছে এবং এখান থেকে প্রায় মাইল ১.৪ কিলোমিটার পূর্বদিকে আছে একটি খ্রিস্টান মিশন। স্থানটির উত্তর ও পূর্বদিকে আছে প্রায় মজে যাওয়া পরিখা। পরিখা দুটি খুব প্রশস্ত নয়, আগে হয়ত ছিল। লাগোয়া দক্ষিণ পাশে আছে প্রশস্ত ও গভীর নিম্নভূমি। এ ধরনের নিম্নভূমি বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রায়ই উঁচুভূমির পাশে দেখা যায়। এককালে এই নিম্নভূমি পশ্চিম দিক দিয়ে এক কালে প্রবাহিত পুনর্ভবার সঙ্গে যুক্ত ছিল কিনা সঠিকভাবে বলার উপায় নেই।

এ স্থানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি বিরাট ঢিবি আছে। ঢিবিটি প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ। আজও (১৯৭৮ খ্রিঃ) এর উচ্চতা প্রায় ১৫ মিটার এবং এর নিম্নদেশ (base) প্রায় ২বিঘা ভূমি জুড়ে অবস্থিত। ঢিবিটি দেখে অতি সহজেই বোঝা যায় যে, এটি একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এই ঢিবির পূর্বদিকে আছে অপেক্ষাকৃত একটি ছোট ঢিবি। এককালে এটিও ছিল বিরাট আকারের। ইট হরণকারীদের দৌরাত্ম্যে এটি বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এর দক্ষিণে আছে আর একটি ক্ষুদ্র ঢিবি। ইট হরণকারীরা এটিকে এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

দ্বিতীয় ঢিবির কিছু উত্তর-পূর্বদিকে প্রায় ৩০ মিটার × ৩০ মিটার আয়তনের একটি অনুচ্চ সমতল ঢিবি এখনও টিকে আছে। ঢিবিটি দেখে মনে হয় যে, দুর্গাকারে নির্মিত একটি চকমিলান অট্টালিকা এখানে ছিল এবং মাঝখানে ছিল একটি উন্মুক্ত অঙ্গন। প্রশস্ত প্রাচীরের অংশ বিশেষসহ সেই ইমারতের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন আজও বিদ্যমান যদিও ইট হরণকারীরা এর যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করেছে। এটি বর্তমানে প্রায় ৩.২ মিটার উঁচু।

চকমিলান ইমারতের ধ্বংসাবশেষ দেখে আপাতদৃষ্টিতে এটিকে ক্ষুদ্র বৌদ্ধ বিহার বলে মনে হয়। কিন্তু এস্থান থেকে যত মূর্তি পাওয়া গেছে, সেগুলি সবই বিষ্ণু, শিব, সূর্য, গণেশ প্রভৃতি হিন্দু দেবতার মূর্তি, এবং কোনো বৌদ্ধ মূর্তি এখানে পাওয়া গেছে বলে জানা যায় না। মৃৎশিল্পের নানারকম নিদর্শন, অলঙ্কৃত ইট ইত্যাদি প্রত্নবস্তুও এখানে পাওয়া গেছে। এখানে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলির বেশির ভাগ মালদহ ও কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়েছে বলে জানা গেছে। পুরিকল্পিতভাবে উৎখনন কার্য না করে এ স্থানের সঠিক পরিচয় সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছুই বলা যায় না। তবে হিন্দু দেবতার মূর্তিগুলি দেখে ধারণা হয় যে, এক সময়ে (খুব সম্ভব একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে) এ স্থান হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল এবং এমনও হতে পারে যে, এর আগে এখানে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল।

উপরে উল্লিখিত বড় ঢিবি থেকে প্রায় ৮০০ মিটার দক্ষিণে একটি বিচিত্র ধরনের ইমারত আছে। অষ্টকোণাকারে নির্মিত এই ক্ষুদ্র ইমারতের চারদিকে ৪টি প্রবেশপথ আছে এবং উপরে আছে ১টি মাত্র গম্বুজ। প্রবেশপথগুলি ধনুকাকারের খিলানের সাহায্যে নির্মিত। দরজার উভয় পার্শ্বের দেয়ালে সুন্দর প্যানেলিং-এর কারুকার্য ছিল এবং প্রত্যেক দরজার দু'পাশে ছিল ১টি করে সরু মিনার। উপরের গোলাকার গম্বুজের উপরে অসংখ্য আগাছা গজিয়ে গম্বুজটিকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। কেউ কেউ বলেন যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম দিকে তৈরি একটি মন্দির এটি। কিন্তু ইমারতের নির্মাণকৌশল দেখে মনে হয় যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত একটি মাযার ইমারত এটি। ডক্টর আহমদ হাসান দানীও এমত পোষণ করেন।[১] অবশ্য বর্তমানে (১৯৭৮ খ্রিঃ) এখানে কবরের কোনো চিহ্ন নেই। খুব সম্ভব কবরটি ভেঙ্গে পড়েছিল এবং এর ইটগুলি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

---

১. Muslim Architecture in Bengal, p. 255. Prof. A. H. Dani.

উন্মুক্ত উঁচু মাঠের উপরে এই ইমারতটি একাকী পরিত্যক্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। সেই মাঠের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে অসংখ্য প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ। সেগুলি সরিয়ে উঁচু মাঠটিকে ধানক্ষেতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এসব দেখে মনে হয় যে, এককালে এই মাঠে অসংখ্য ইমারতাদির অস্তিত্ব ছিল এবং সেগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলে সমগ্র এলাকাকে শস্যক্ষেত্রে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

স্থানীয় বৃদ্ধ লোকেরা এই গ্রন্থকারকে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে বলেছিলেন যে, বহু বছর আগে উত্তর দিকে অবস্থিত বড় ঢিবি বরাবর দক্ষিণ দিকের নিম্নভূমিতে চাষ করার সময় তাঁরা ইষ্টক নির্মিত একটি পথের সন্ধান পেয়েছিলেন এবং সেই পথ বড় ঢিবি থেকে অষ্টকোণাকৃতির এই ইমারতের নিকটবর্তী স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই বাঁধান পথের কোনো চিহ্ন এখন আর টিকে নেই। খুব সম্ভব দুটি স্থানের ইমারতগুলি প্রাচীন কালে প্রায় একই সময়ে নির্মিত হয়েছিল এবং অষ্টকোণাকৃতির ইমারতটি অনেক পরে মোঘল আমলে নির্মিত।

এই এলাকা দেখে ধারণা হয় যে, বর্তমান ঢিবিগুলি যেখানে আছে সেটি ছিল মন্দিরাদির জন্য নির্দিষ্ট স্থান এবং ছোট বড় অনেক মন্দির সেখানে নির্মিত হয়েছিল। আর অষ্টকোণাকৃতির ইমারতটি যেখানে আছে, সেখানে ছিল নগরের আবাসিক ও অন্যান্য এলাকা।

মুসলিম আমল

ছোট সোনামসজিদ

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে, পশ্চিম বঙ্গের মালদহ জেলার দক্ষিণ প্রান্তে ও প্রাচীন গৌড় নগরীর দক্ষিণ প্রাচীরে কোতোয়ালী দরজা অবস্থিত। কোতোয়ালী দরজা থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং চাঁপাই-নবাবগঞ্জ জেলা থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার উত্তরে ফিরোজাবাদ বা ফিরোজপুর মৌজায় ছোট সোনামসজিদ অবস্থিত। এই মসজিদ মুসলিম আমলের স্থাপত্য শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন।

উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এই মসজিদের আয়তন বাইরের দিকে ২৪.৮৪ মিটার × ১৫.৭৫ মিটার এবং ভিতরের দিকে ২১.৭৪ মিটার × ১২.২৭ মিটার। মসজিদের প্রাচীর গুলি প্রায় ১.৭ মিটার প্রশস্ত। দেয়ালগুলি মূলত ইটের তৈরি। কিন্তু দেয়ালের বাইরের দিক সম্পূর্ণরূপে পাথর দিয়ে আবৃত। তবে ভিতর দিকে দেয়ালের অংশ পুরাপুরি পাথর দিয়ে ঢাকা নয়। সেখানে দেয়ালের নিচের অংশ পাথর দিয়ে আবৃত হলেও যেখান থেকে গম্বুজ নির্মাণের জন্য ধনুকাকৃতির খিলানের কাজ শুরু হয়েছে, সেখানে পাথরের কাজ শেষ হয়েছে। খিলান ও গম্বুজগুলি সব ইটের তৈরি।

মসজিদের চারকোণে আছে ৪টি অষ্টকোণাকৃতির মিনার বা টারেট (turret)। মিনারগুলি বিরাট আকারের এবং এগুলি ছাদের কার্নিশের উপরে ওঠেনি। এগুলিতে ধাপে ধাপে অতি মনোরম বলয়াকারের স্ফীতরেখায় অলঙ্করণের কাজ আছে। কেন্দ্রীয় মিহ্‌রাবের পিছনের দেয়ালে যে উদগত (offset) অংশ আছে, তার দু'পাশে ২টি সরু

মিনার আছে। এ'দুটি মিনারও অষ্ট কোণাকৃতির। মসজিদের কার্নিশগুলি বাঁকান (curved)ভাবে নির্মিত।

মসজিদের পূর্ব দেয়ালে আছে ধনুকাকারের খিলানের সাহায্যে নির্মিত ৫টি প্রবেশ পথ। প্রবেশপথগুলির উর্ধ্বাংশে সুন্দর খাঁজকাটা (multi-cusped) আছে। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে পূর্ব দেয়ালের অনুরূপ ৩টি করে প্রবেশপথ আছে। তবে উত্তর দেয়ালের সর্ব পশ্চিমের প্রবেশপথটি মসজিদের ভিতরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র দোতালা কক্ষের প্রবেশদ্বার ও সিঁড়ির জন্য ব্যবহৃত হত। এই কক্ষটি ছিল মসজিদের উত্তর-পশ্চিম গম্বুজের নিচে। সেখানে বাদশাহ বা শাসনকর্তার পৃথকভাবে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা ছিল স্তম্ভের উপর সামান্য একটু উঁচু করে নির্মিত এই ক্ষুদ্র দ্বিতল কক্ষে। মসজিদের ভিতরে আছে ৫টি মিহ্‌রাব। মিহ্‌রাব গুলি পূর্ব দেয়ালের প্রবেশপথগুলির বরাবর অবস্থিত। উপরে ক্ষুদ্র কক্ষে ছিল ১টি মিহ্‌রাব।

এই মসজিদের অভ্যন্তর ভাগ পূর্ব-পশ্চিমে ৩ ভাগে এবং উত্তর-দক্ষিণে ৫ ভাগে বিভক্ত। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ ও কেন্দ্রীয় মিহ্‌রাবের মধ্যবর্তী স্থান ৩টি আয়তক্ষেত্রে বিভক্ত। ৩.৬৬মিটার × ৩.৪৩ (উত্তর-দক্ষিণে লম্বা) আয়তন বিশিষ্ট ৩টি আয়তক্ষেত্রের মধ্যে কেন্দ্রীয়টির চারকোণে ৪টি প্রস্তরনির্মিত স্তম্ভ (stone pillar) আছে। এই স্তম্ভ গুলির উত্তর ও দক্ষিণ দিকে আছে আরও ২টি করে অনুরূপ স্তম্ভ।

এই ৮টি স্তম্ভ ও চারদেয়ালের উপর নির্মিত হয়েছে মসজিদের ১৫টি গম্বুজ। কেন্দ্রীয় প্রবেশদ্বার ও কেন্দ্রীয় মিহ্‌রাবের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ৩টি গম্বুজ চৌচালা ঘরের ছাদের আকারে নির্মিত। এগুলি বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ ও গৌড়ের দরসবাড়ি মসজিদের চৌচালা গম্বুজের অনুকরণে নির্মিত বলে পণ্ডিতদের অভিমত (ষাটগম্বুজ ও দরসবাড়ি মসজিদ দ্র.)। অবশিষ্ট ১২টি গম্বুজ অর্ধ গোলাকার (hemispherical)। ৩টি চৌচালা গম্বুজের উত্তর দিকে পূর্ব-পশ্চিমে দুই সারিতে আছে প্রত্যেক সারিতে ৩টি করে মোট ৬টি গম্বুজ। একইভাবে দক্ষিণ পাশেও আছে ৬টি গম্বুজ।

মসজিদের বাইরের দেয়ালে বিশেষ করে সামনের দেয়ালে অতি মনোরম কারুকার্য আছে। পোড়ামাটির চিত্রফলকের (terra-cotta plaques) অনুকরণে এসব অলঙ্করণের কাজ পাথরের উপরে করা। লতাপাতা, গোলাপ ফুল (rosette) ঝুলন্ত শিকল ও ঘন্টা (hanging chain and bell motif) ইত্যাদির প্রতিকৃতিসহ নানারকম অলঙ্করণের কাজ মসজিদের গায়ে দেখা যায়। সামনের দেয়ালের ৫টি দরজাতে আয়তকারে নির্মিত যে সব পাথরের 'ফ্রেম' (frame) আছে সে গুলিতে অতি সুন্দর কারুকার্য আছে।

কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের ফ্রেমের উপরদিকে একটু ব্যতিক্রম আছে। সেখানে একটি সুবৃহৎ শিলালিপি আছে। শিলালিপির মাঝের পঙ্‌ক্তিতে ৩টি কারুকার্যময় বৃত্ত আছে। মাঝের বৃত্তের ভিতরে 'ইয়া আল্লাহ্‌', ডান দিকেরটিতে 'ইয়া হাফিয' ও বাম দিকেরটিতে 'ইয়া রাহিম' কথা গুলি আরবী অক্ষরে অতি সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ আছে।

পশ্চিম দেয়ালে যে ৫টি মিহ্‌রাব আছে, সেগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় মিহ্‌রাবটি অন্যগুলির চেয়ে অনেক বড়। মিহ্‌রাবগুলিতে অতি মনোরম ও কারুকার্যময় যে সব

পাথর ছিল, সেগুলি এখন মসজিদের ভিতরে নেই। একটি মিহরাবের অলঙ্কৃত পাথর লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামের জন্য নিয়ে গেছে বলে খান সাহেব আবিদ আলী তাঁর 'মেমোয়েরস অব গৌড় এণ্ড পাণ্ডুয়া' ('Memoirs of Gaur and Pandua') গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তবে এখন মিহরাবগুলিতে যেসব অলঙ্করণ আছে, তাও উঁচু মানের এবং মসজিদের সামনের দেয়ালে যে সব কারুকার্য আছে প্রায় সেগুলির মতোই। উপরে দ্বিতলকক্ষের মিহরাবেও অনেক কারুকার্য ছিল। এখন সব ক'টা পাথর আর সেখানে নেই। [ছোটা সোনা মসজিদের রঙিন ছবি-৩৩]

ছোট সোনা মসজিদে পাথরের উপর যে কারুকার্য ছিল, তা ছিল সত্যই অতুলনীয়। স্যার কানিংহ্যাম ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে এই মসজিদ পরিদর্শন করেন এবং এর অলঙ্করণের ভূয়সী প্রশংসা করেন।[১] মসজিদটি তখন বেশ জীর্ণ অবস্থায় থাকলেও এর গায়ে সোনালী পদার্থ দ্বারা গিল্টি করা কাজের নমুনা দেখতে পেয়েছিলেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। এই সোনালী রঙ্ থেকেই মসজিদের নাম ছোট সোনা মসজিদ হয়েছিল বলে তিনি মনে করেন।[২]

মসজিদের শিলালিপিটির বাম দিকের উপর ও নিচের কোণ ভেঙ্গে গেছে। নিচের কোণ ভেঙ্গে যাবার ফলে মসজিদ নির্মাণের সন পাওয়া যায়নি। তবে লিপির বাকি অংশের পাঠ থেকে জানা যায় যে সুলতান হোসেন শাহ্‌র আমলে আলীর পুত্র মজালিস-ই-মজলিস মজলিস-ই-মনসুর ওয়ালী মোহাম্মদ কর্তৃক এই মসজিদ নির্মিত হয়েছিল ১৪৯৩ থেকে ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী কোনো এক সনের রজব মাসের ১৪ তারিখ।

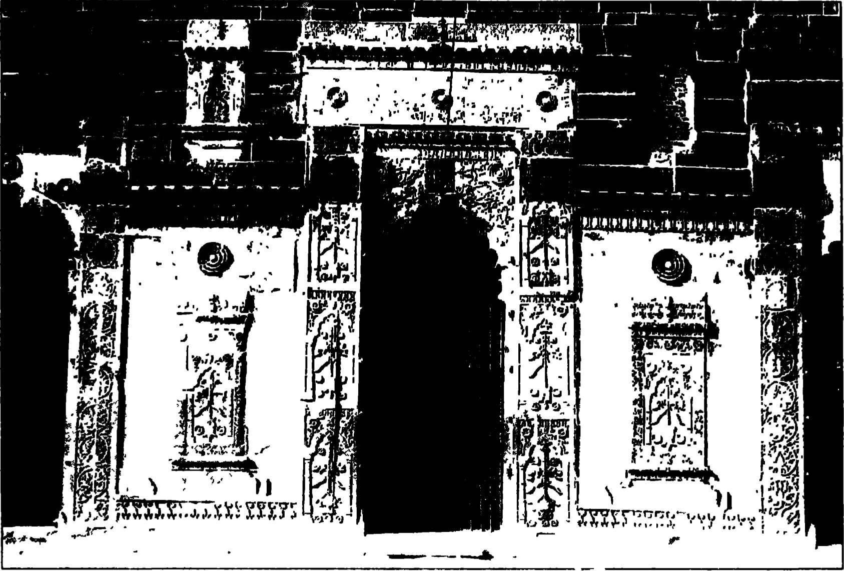
১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে কেন্দ্রীয় চৌচালা গম্বুজ ৩টি এবং অপর ৩টি গম্বুজ ভেঙ্গে যায়। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে তদানীন্তন ভারত সরকার ভগ্ন গম্বুজগুলি নূতন করে নির্মাণ করেন। মসজিদের পূর্ব দিকে আছে একটি উন্মুক্ত অঙ্গন। অঙ্গনের পূর্ব প্রান্তে আছে একটি বিরাট তোরণ। ইষ্টকনির্মিত তোরণের বাইরের দিক পাথর দিয়ে আবৃত ছিল। পাথরগুলি এখন নেই। তবে জীর্ণ তোরণটিকে এখন মেরামত করা হয়েছে।

মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের পিছন দিকের উত্তরাংশের পাথরগুলি এখন নেই। এমন কি সেই দেয়ালের কিছু অংশ এক সময়ে ধসেও পড়েছিল। সেই ধসে পড়া অংশটি পরে মেরামত করা হলেও পাথরগুলি আর বসান হয়নি। সেই পাথরও এখন ধারে কাছে নেই, অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। স্যার কানিংহ্যাম মিঃ ক্রেইটনের (Mr. Creighton) উক্তির উল্লেখ করে বলেছেন যে, মসজিদে ব্যবহৃত কোনো কোনো পাথরের পিছনে

১. "The whole of the interior of this masjid is covered with carving of the same kind ... In its original state, therefore, I can easily believe that the interior of the mosque was strikingly rich and beautifull"—Archaeological Survey of India Report by Sir Alexander Cunningham, Vol, XV pp 74-75.

২. "It received its present name of the 'Little Golden Mosque' from the quantity of gilding employed in its ornamentation, of which some still remains to justyify the popular appellation, Creighton first noticed it, and I verified his statement mysefl by inspecting some remains of gilding found by my servant."—Ibid, pp. 73-74.

ার মূর্তি উৎকীর্ণ ছিল। এতে তিনি অনুমান করেন যে, এসব পাথর কোনো ধ্বংস প্রাপ্ত মন্দির থেকে সংগ্রহ করে মসজিদে ব্যবহার করা হয়েছিল।



▲ সম্মুখ ফাসাদ। ছোট সোনা মসজিদ, চাপাই নবাবগঞ্জ

মসজিদের পূর্বদিকের তোরণ থেকে সামান্য পূর্ব-উত্তর দিকে ৩.২৩ মিটার আয়তনের মঞ্চাকারে নির্মিত একটি উঁচু বেদীতে পাশাপাশি অবস্থানরত ২টি বাঁধান কবর আছে। কবরের দেয়ালে উৎকীর্ণ লিপি গুলিতে কোরানের বাণী আছে। কবর দুটি মসজিদ নির্মাতা ওয়ালী মোহাম্মদ ও তাঁর পিতা আলীর বলে মিঃ ক্রেইটন অনুমান করেন। আবার কেউ কেউ বলেন কবর দুটি আসলে কোনো কবরই নয়। মসজিদ নির্মাতা এখানে গুপ্তধন লুকিয়ে রেখে এখানে নকল কবর তৈরি করেছিলেন। এটি যে উদ্ভট কল্পনা, তাতে সন্দেহ নেই।

মসজিদের উত্তর দিকে আছে একটি মাঝারি আকারের দিঘি। নবাবগঞ্জ থেকে শিবগঞ্জ ও কানসাট হয়ে যে পথটি উত্তর দিকে কোতোয়ালী দরজা পর্যন্ত চলে গেছে, তা মসজিদের পশ্চিম পাশ দিয়ে দিঘির পশ্চিমপাড় ঘেঁষে অবস্থিত। দিঘির দক্ষিণ পাড়ে ও মসজিদের তোরণদ্বারের কিছু উত্তর-পূর্ব দিকে একটি বাঁধান ঘাট ছিল। সেইঘাটে মুসল্লীরা ওজু করতেন। ঘাটটি এখন ভেঙ্গে গেছে। দিঘির পানি খুবই পরিষ্কার।

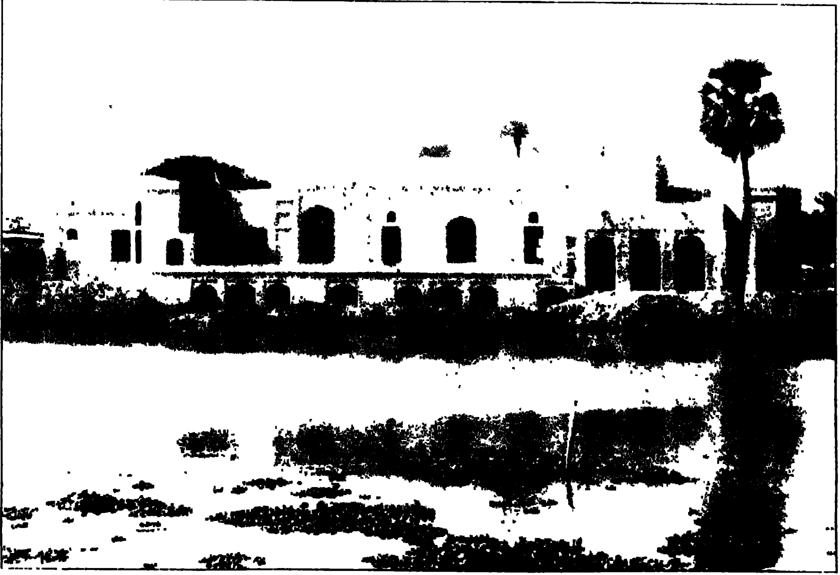
তাহ্‌খানা

ছোট সোনামসজিদের পশ্চিম পাশ দিয়ে যে রাস্তা গেছে, তা ধরে প্রায় ৫০০ মিটার উত্তর দিকে গেলেই দেখা যায় একটি ছোট পথ সেই রাস্তা থেকে বের হয়ে পশ্চিম দিকে চলে গেছে। সেই পথ ধরে একটু এগিয়ে গেলেই পথের উত্তর পাশে পড়ে উত্তর-দক্ষিণে

লম্বা একটি বিরাট প্রাচীন দিঘি। দিঘির পশ্চিম পাড়ে আছে পর পর (দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে) ৩টি প্রাচীন ইমারত। সর্ব দক্ষিণের ইমারতটিই তাহ্‌খানা।

এককালে এটি ছিল দুইতল বিশিষ্ট একটি বিরাট ইমারত এবং উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এই ইমারতের আয়তন ছিল ৩৫.১৫ মিটার × ১১.২২ মিটার। তিনভাগে বিভক্ত এই অট্টালিকা এককালে খুবই জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। মেরামতের অভাবে ইমারতটি প্রায় ভেঙ্গে পড়েছিল। প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর এটিকে মেরামত করে কোনো রকমে টিকিয়ে রেখেছে এবং বর্তমানে নিচের তলাটিই (ground floor) টিকে আছে।

সারা ইমারতে বেশ কয়েকটি কক্ষ ছিল। মাঝের কক্ষের দু-'পাশের কামরা গুলিতে ছিল খুব সম্ভব হাম্মামখানাটি। ইমারতটির লাগোয়া পূর্ব দিকেই আছে পূর্বে উল্লিখিত দিঘিটি। দিঘির ভিতর থেকে ভিত্তি গেড়ে ইমারতটির পূর্বাংশ নির্মিত হয়েছিল। দিঘির ভিতর থেকে পাইপের সাহায্যে দু'পাশের কামরাতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। সেই পাইপের চিহ্ন এখনও টিকে আছে।



তাহ্ খানা, চাপাই নবাবগঞ্জ

তাহ্‌খানার সামনে পশ্চিম দিকে একটি ছোট ও অনুচ্চ তোরণ এখনও টিকে আছে। এই তোরণের ধারে কাছে আরও কিছু ইমারতাদি ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু বর্তমানে সে সব ইমারতের কোনো চিহ্নও দেখা যায় না।

এই তাহ্‌খানা কে নির্মাণ করেছিলেন, সে সম্পর্কে কোনো লিখিত প্রমাণ নেই। তবে প্রবল জনশ্রুতি আছে যে, সম্রাট শাহ্‌জাহানের পুত্র সুলতান শাহ্‌শুজা' ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে এই ইমারতটি তৈরি করেছিলেন তাঁর নিজের বসবাসের জন্য। খান সাহেব আবিদ আলী বলেন যে, গৌড় নগরী পরিত্যক্ত হবার অনেক পরে শাহ্ শুজা এ স্থানে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর নিজের বসবাসের জন্য তিনি এই

ইমারতটি নির্মাণ করেছিলেন। অন্য মতে শাহশুজা' গৌড়ে বসবাসকারী তাঁর পীর শাহ্ নিয়ামত উল্লাহ্র জন্য এই সৌধ নির্মাণ করেছিলেন। এ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছুই বলা যায় না। তবে ইমারতের জাঁকজমক ও হাম্মামখানার অস্তিত্ব দেখে মনে হয় না যে, এটি কোনো পীরের নিবাসস্থল ছিল।

শাহ্ নিয়ামত উল্লাহ্র মসজিদ

এই মসজিদ তাহ্খানার প্রায় লাগোয়া উত্তরেই অবস্থিত। মসজিদের সামনে অর্থাৎ পূর্ব দিকেই আছে একটি ছোট পাকা আঙ্গিনা (court-yard)। আঙ্গিনার দক্ষিণ, পূর্ব ও উত্তর দিকে আছে অনুচ্চ দেয়াল। পূর্ব দেয়ালের মাঝামাঝি স্থানে আছে পাকা সিঁড়ি এবং তা লাগোয়া পূর্ব দিকে অবস্থিত দিঘির বাঁধান ঘাটে নেমে গেছে।

পাকা অঙ্গনের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত উত্তর-দক্ষিণে লম্বা মসজিদের আয়তন (বাইরের দিকে) ২০.৭৫ মিটার × ৭.৫ মিটার। চারকোণে আছে ৪টি মিনার বা টারেট (turret)। কার্নিশ পর্যন্ত এগুলি আট কোণাকার এবং এর পরে গোলাকার হয়ে চূড়ায় ছোট গম্বুজে (ribbed cupola) শেষ হয়েছে। উপরে আছে ৩টি অতি সুন্দর গম্বুজ।

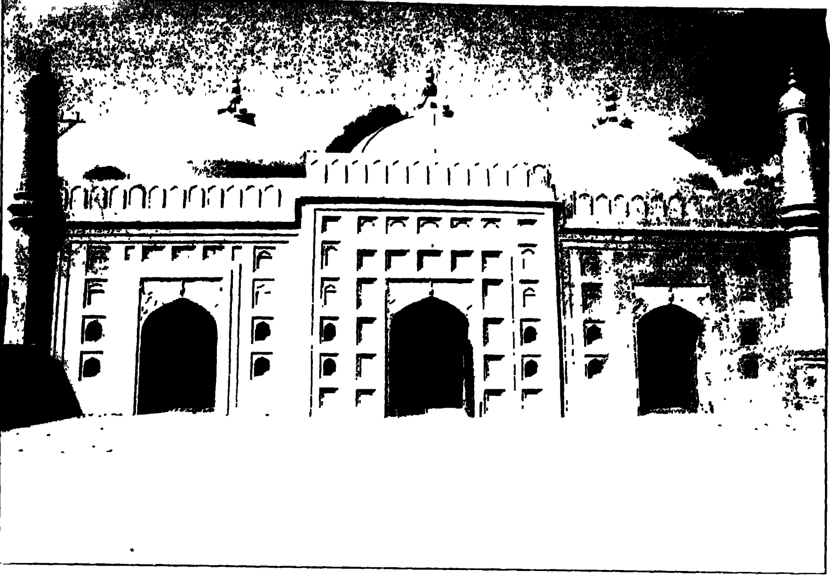
মসজিদের সামনের দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে আছে ১টি করে প্রবেশপথ। সামনের দেয়ালের কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটি অন্যগুলির চেয়ে আকারে বড় এবং সামনের দিকে কিছুটা প্রসারিত (projected)। প্রবেশ পথগুলি চতুষ্কোণ খিলানের সাহায্যে নির্মিত। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি সুন্দর মিহরাব।

সামনের দেয়ালের (facade) উপর অতি সুন্দর প্যানেলিং-এর অলঙ্করণ আছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবের পিছন দিক বাইরের দিকে উদগত। মসজিদের উপরিভাগে অলঙ্কৃত 'ব্যাট্লমেন্টের' (battlement) কাজ আছে।

এ মসজিদ কে নির্মাণ করেছিলেন, সে সম্বন্ধে কোনো লিখিত প্রমাণ নেই। তবে এই অঞ্চলে প্রবল জনশ্রুতি আছে যে, সম্রাট শাহ্জাহান শাহ্নিয়ামত উল্লাহকে বছরে পাঁচ হাজার টাকা আয়ের একটি সম্পত্তি দান করেছিলেন। তিনি ৩৩ বছর এ সম্পত্তি ভোগ-দখল করেন এবং এর আয় থেকে 'খানকার' ব্যয় নির্বাহ করে উদ্বৃত্ত অংশ দিয়ে এই মসজিদ নির্মাণ করেন। অন্যমতে সম্রাট অওরঙযেব এ সম্পত্তি দান করেছিলেন। খুব সম্ভব প্রথম জনমতই সত্য। কারণ, সম্রাট অওরঙযেবের রাজ্য অধিকারের (১৬৫৮ খ্রিঃ) পরে শাহ্ নিয়ামত উল্লাহ্ খুব বেশি দিন বেঁচে ছিলেন না।

শাহ্ নিয়ামত উল্লাহ্র মাযার

মসজিদের লাগোয়া উত্তর দিকে মাযার এলাকা অবস্থিত। প্রায় বিঘা তিনেক ভূমি জুড়ে আছে মাযার এলাকার বেষ্টনী-প্রাচীর। মসজিদের উত্তর বেষ্টনী-প্রাচীর ও মাযারের দক্ষিণ বেষ্টনী-প্রাচীরের কিছু অংশ (পূর্বদিকে) অভিন্ন। অবশ্য মাযারের দক্ষিণ দেয়ালের বাকি অংশ পশ্চিমদিকে আরও প্রসারিত।



শাহ নিয়ামত উল্লাহ্ মসজিদ, চাপাই নবাবগঞ্জ

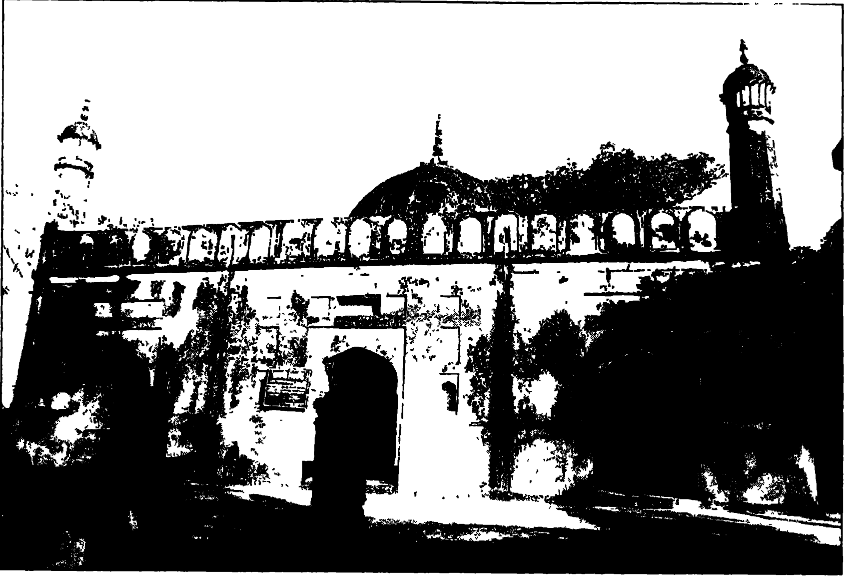
মাযার এলাকার দক্ষিণের দেয়ালে আছে একটি ছোট ফটক। মসজিদের অঙ্গন থেকে সেই ফটকের ভিতর দিয়ে ইটবাঁধান পথের উপর দিয়ে কিছুদূর উত্তর দিকে গেলেই পড়ে মাযার ইমারত। এই সমাধিসৌধের চারদিকে মাযার প্রাঙ্গণে আছে অসংখ্য পাকা কবর আর নানা রকম ফল-ফুলের গাছ। মাযার অঙ্গনের দক্ষিণ ভাগেই পাকা কবরের সংখ্যা বেশি। এ গুলির মধ্যে কিছু কিছু প্রাচীন কবরও আছে।

মাযার ইমারতটি বর্গাকারে নির্মিত এবং এর প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য বাইরের দিকে ১৬.০৬ মিটার ও ভিতরের দিকে ১৩.৬৩ মিটার। ইষ্টক নির্মিত প্রাচীরগুলি প্রায় ১.২১ মিটার প্রশস্ত। প্রত্যেক দেয়ালে ৩টি করে দরজা আছে এবং এ কারণে এটিকে 'বারদুয়ারী' বলা হত। দরজাগুলি প্রায় একই মাপের এবং এর প্রত্যেকটি মোটামুটিভাবে প্রায় ১.৬৬ মিটার প্রশস্ত। দেয়ালের পরে ভিতরে চারদিকে আছে ৩.৪৩ মিটার চওড়া টানা বারান্দা। এই টানা বারান্দার পরে আছে মাযার ইমারতের কেন্দ্রীয় কক্ষ।

বর্গাকারে নির্মিত এই কক্ষের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য বাইরের দিকে ৭.৪২ মিটার ও ভিতরের দিকে ৫.০৫ মিটার। এই কক্ষের কেন্দ্রস্থলে আছে শাহ্ নিয়ামত উল্লাহ্‌র পাকা কবর। এই কামরায় ঢোকার জন্য দক্ষিণ, পূর্ব ও উত্তর দেয়ালে ১টি করে প্রবেশপথ ছিল। পশ্চিম দেয়ালে ছিল ১টি মিহরাব। এখন শুধু দক্ষিণ দেয়ালের দরজাটিই আছে। বাকি দুটি দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

মাযার ইমারতের চারকোণে ৪টি মিনার বা টারেট (turret) আছে। এগুলি বেশ উঁচু ও আট কোণাকারে নির্মিত। এগুলি ছাদের অনেক উপরে উঠে চূড়ায় ছোট গম্বুজে (ribbed cupola) শেষ হয়েছে। কেন্দ্রীয় কক্ষের উপরে আছে একটি অতি সুন্দর গম্বুজ

(bulbous dome)। উপরে আর কোনো গম্বুজ নেই এবং বারান্দাগুলির উপরে আছে 'ফ্ল্যাট ভল্টেড' ছাদ (flat vaulted roof)।



৯ শাহ নিয়ামত উল্লাহ মাজার, গৌড়, চাপাই নবাবগঞ্জ

মুন্সী ইলাহী বখ্শ্ রচিত ' খোরশ্শীদ-ই-জাহান নামা' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, দিল্লীর করনৌল প্রদেশের অধিবাসী শাহ্ নিয়ামত উল্লাহ্ ছিলেন একজন মস্ত বড় সুফী সাধক ও বুযুর্গ্ আলিম। একজন দেশ ভ্রমণকারী হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। দেশ ভ্রমণ করতে করতে তিনি নাকি গৌড়ে এসে উপস্থিত হন। শাহ্ শুজা' তখন বাঙলার সুবাদার। রাজমহলে তাঁর দফতর স্থানান্তরের পূর্বে তিনি কিছুকাল গৌড়ে অবস্থান করেন এবং এ সময়েই নাকি তিনি শাহ্ নিয়ামত উল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন।

শাহ্ নিয়ামত উল্লাহ্ প্রাচীর বেষ্টিত গৌড় দুর্গ নগরীর কোতোয়ালী দরজা থেকে প্রায় ২.৪৪ কিলোমিটার দক্ষিণে ফিরোজপুর বা ফিরোজাবাদ্ নামক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন এবং সেখানেই তিনি ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে (খান সাহেব আবিদ আলীর মতে ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এই মাযার ইমারত কে নির্মাণ করেছিলেন, সে সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। শাহ্ শুজা'র প্রচেষ্টায় এই ইমারত ও মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল বলে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু শাহ্ শুজা' ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ব্রহ্মদেশে পালিয়ে যান এবং এর পরে তাঁর সম্পর্কে আর কোনো সংবাদই পাওয়া যায় না। তিনি মসজিদটি তৈরি করে থাকতে পারেন। কিন্তু মাযারটি তিনি তৈরি করেছিলেন বলে মনে হয় না। অবশ্য শাহ্ নিয়ামত উল্লাহ্র মৃত্যুর অনেক বছর পূর্বে যদি মাযার ইমারতটি নির্মিত হয়ে থাকে তবে তা হবে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু এমনটি হয়েছিল বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

দরসবাড়ি মাদ্রাসা

ছোট সোনামসজিদ থেকে প্রায় ১.৫ কিলোমিটার উত্তর দিকে রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে আছে বালিয়াদিঘি নামক উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি বিরাট প্রাচীন জলাশয়। প্রাচীর বেষ্টিত গৌড় নগরীর বাইরে সেই এলাকায় এত বড় জলাশয় আর কোথাও নেই। এই দিঘি পার হয়ে উত্তর দিকে কিছু দূর গেলেই রাস্তার পশ্চিম দিকে পড়ে একটি ছোট আম বাগান। এই বাগান পার হয়ে মাঠ ভেঙ্গে প্রায় ৪০০ মিটার পশ্চিম দিকে গেলেই সামনে পড়ে একটি উঁচু ভিটা। এই ভিটার দক্ষিণ দিকের ভূমিতে নানা রকম তরি-তরকারির চাষ হয়।



দরসবাড়ী মাদ্রাসা, গৌড়, চাপাই নবাবগঞ্জ

এখানে চাষ করার সময়ে কয়েক বছর আগে স্থানীয় লোকেরা একটি শিলালিপির সন্ধান পান। সৌভাগ্যক্রমে শিলালিপিটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতরের হাতে পড়ে। আরবী ভাষায় লিখিত ও অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ এই শিলালিপির পাঠ নিম্নরূপ :[১]

আরবি পাঠের অনুবাদ : "সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য; যাঁরা পণ্ডিত ব্যক্তিদের আশ্রয় দিয়েছেন তিনি (আল্লাহ্‌) তাঁদের প্রতি অসীম করুণার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যাঁরা পণ্ডিত ব্যক্তির প্রতি সুব্যবহার করেছেন আল্লাহ্‌র দয়া তাঁদের উপর অজস্র।

১. প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতরের সাবেক সুপারনিটেনডেন্ট ও পরবর্তীকালে চট্টগ্রাম অধ্যাপক ডক্টর আবদুল গফুরের সৌজন্যে শিলালিপির আরবী পাঠ ও ইংরেজী অনুবাদ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে এবং দরসবাড়ি মাদ্রাসার উৎখনন কার্যের ফলে প্রাপ্ত তথ্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে একই বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট আবদুল কাদির গ্রন্থকারকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তিনি খনন কার্যের পরিচালক ছিলেন।

"তাঁদের (পণ্ডিত ব্যক্তিদের) প্রতি যাঁরা খুব শ্রদ্ধাশীল আল্লাহ্ তাঁদেরকে উন্নীত করেন এবং যাঁরা তাঁদেরকে (পণ্ডিত ব্যক্তিদেরকে) সাহায্য করেন তিনি (আল্লাহ্) তাঁদেরকে সাহায্য করেন।

"আল্লাহ্র রহমত তাঁর রসুলের উপর [বর্ষিত] হোক! তিনি (রসুল) বলেছেন, 'যিনি একজন পন্ডিত ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়েছেন আল্লাহ্ তাঁকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত আশ্রয় দিবেন।' তাঁর (রসুলের) পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী যাঁরা এই উঁচু স্তরে পৌঁছেছিলেন তাঁদের উপরও আল্লাহ্র রহমত [বর্ষিত] হোক!

"সৈয়দ আশরাফ আল হোসাইনীর পুত্র মহানুভবতার উৎস ও বিজয়কারী সুলতান আলা-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ-দীন আবুল মোযাফ্ফর হোসেন শাহ্ সুলতান—আল্লাহ্ তাঁর এই রাজ্য এবং পুত্র ও পৌত্রদের এ রাজ্য কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করুন!—কৃতকার্য হয়েছিলেন।

'তিনি (সুলতান) ৯০৯ হিজরী (১৫০৬ খ্রিঃ) সনে এই লতিফিয়া মাদ্রাসা নির্মাণ করেন।"

যে ঢিবির কাছে শিলালিপিটি পাওয়া গেছে সেখানে চাষাবাদ করার সময় কয়েকটি ইষ্টক নির্মিত প্রাচীরের ভিত্তির সন্ধান পাওয়া যায়। বিষয়টি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শ্রুতিগোচর হলে ১৯৭৪-৭৫ খ্রিস্টাব্দে সেখানে আংশিক ও পরীক্ষামূলক উৎখনন কার্য করা হয় এবং বিরাট মাদ্রাসা ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করা হয়। দুর্গাকারে নির্মিত এই মাদ্রাসার চার ব্লকেই অসংখ্য কক্ষ ছিল। মাঝখানে ছিল একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। খনন কার্য সম্পূর্ণ হয়নি বলে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া সম্ভব হল না।

দরসবাড়ি মসজিদ

মাদ্রাসা ইমারতের ধ্বংসাবশেষের কিছু পশ্চিম দিকেই আছে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি ছোট দিঘি। দিঘিটি খুব চওড়া নয়, তবে এটি প্রায় ৭৫ মিটার লম্বা। দিঘির পূর্বপাড়ের মাঝামাঝি স্থানে এবং মাদ্রাসার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি প্রাচীন কবরস্থান ছিল। সেখানে বেশ কয়েকটি প্রাচীন পাকা কবর ছিল। হাল আমলে (১৯৮১ খ্রিঃ) স্থানীয় লোকেরা সেই সব কবর থেকে ইট সরিয়ে নিয়ে কবরস্থানটিকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছেন এবং সেখানে চাষবাস করছেন।

দিঘির পশ্চিম পাড়ে আছে একটি সুবিশাল মসজিদের ধ্বংসাবশেষ। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এই মসজিদের গম্বুজগুলি সব ধসে পড়েছে, ইষ্টক নির্মিত প্রাচীরগুলিও সব টিকে নেই। তবু এই মসজিদের বিরাটত্ব সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা করা যায়। অভ্যন্তরীণ কক্ষ ও বারান্দা এই দুই ভাগে মসজিদটি বিভক্ত ছিল। ভিতরের দিকে অভ্যন্তরীণ কক্ষের আয়তন ৩০.১৫ মিটার × ১১.৭৫ মিটার এবং এই কক্ষের পূর্ব দিকে যে বারান্দা ছিল, তার অভ্যন্তরীণ আয়তন ছিল ৩০.১৫ মিটার × ৩.১১ মিটার। অভ্যন্তরীণ কক্ষের চারকোণে ৪টি এবং বারান্দার দুই কোণে ২টি এই মোট ৬টি মিনার বা টাওয়ার (corner tower) মসজিদে ছিল। এগুলি ছিল বিরাট আকারের। মিনারগুলির নিম্নাংশ এখনও টিকে আছে।

মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ছিল ৭টি প্রবেশপথ। ইষ্টকনির্মিত বিশালকায় স্তম্ভের উপর নির্মিত ছিল দ্বারপথের খিলানগুলি। এগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি ছিল আকারে অন্যগুলির চেয়ে অনেক বড়। অভ্যন্তরীণ কক্ষের পূর্ব দেয়ালেও ৭টি দরজা ছিল। অভ্যন্তরীণ কক্ষের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ছিল ৩টি করে প্রবেশপথ। উত্তর দেয়ালের পশ্চিমের দরজাটি মসজিদের উত্তর-পশ্চিম কোণে নির্মিত দ্বিতল কক্ষে যাবার জন্য সিঁড়িপথ হিসাবে ব্যবহার করা হত (দ্বিতল কক্ষের কথা একটু পরেই বলা হয়েছে)। বারান্দার উত্তর ও পশ্চিম দেয়ালে ১টি করে দরজা ছিল।



▲ দরসবাড়ী মসজিদ, গৌড়, চাপাই নবাবগঞ্জ

মসজিদের অভ্যন্তরীণ কক্ষটি তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা কেন্দ্রীয় অংশের আয়তন ছিল ১১.৭৫ মিটার × ৫.৩৭ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা পাশের দুটি অংশের প্রত্যেকটির আয়তন ছিল ১১.৭৫ মিটার × ১১.৩২ মিটার। পাশের দুটি অংশের প্রত্যেকটি আবার তিন ভাগে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক বিভাগে দুই সারিতে ৩টি করে মোট ৬টি পাথরের স্তম্ভ ছিল। এই ৬টি স্তম্ভ ও পাশের দেয়ালের উপরে নির্মিত হয়েছিল পাশের প্রত্যেক বিভাগে ৯টি করে মোট ১৮টি অর্ধ-গোলাকার গম্বুজ। উত্তর বিভাগের উত্তর-পশ্চিম কোণের স্তম্ভটি ছিল আকারে বৃহত্তর ও অষ্ট কোণাকার। এই স্তম্ভের সাহায্যে উপরে একটি জেনানা মহল (এটি প্রকৃত পক্ষে জেনানা মহল ছিল, না সুলতান বা সর্বোচ্চ শাসনকর্তার নামাজের স্থান হিসাবে নির্দিষ্ট স্থান ছিল এ সম্বন্ধে যথেষ্ট বিতর্ক আছে)। এটির আয়তন ছিল ৫.৪৫ মিটার × ৩.৩৩ মিটার।

অভ্যন্তরীণ কক্ষের কেন্দ্রীয় অংশে ছিল ৩টি ভিন্ন ধরনের আচ্ছাদন। এই আচ্ছাদন গুলি এখন টিকে নেই বলে এগুলির আকৃতি সম্পর্কে মতের বিভিন্নতা দেখা যায়।

গৌড়ের লটন মসজিদ, বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ এবং পরবর্তীকালের ছোট সোনামসজিদে যে চৌচালা ধরনের আচ্ছাদন দেখা যায় (ষাটগম্বুজ ও ছোট সোনা মসজিদ দ্র.) ঠিক অনুরূপ আচ্ছাদন কেন্দ্রীয় অংশে ছিল বলে ডক্টর আহমদ হাসান দানী অভিমত প্রকাশ করেছেন। খান সাহেব আবিদ আলী ও শ্রী এস, কে, সরস্বতী এ সম্পর্কে যে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন, সেগুলি খণ্ডন করে ডক্টর দানী যে সব যুক্তির উপর ভিত্তি করে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা অধিক যুক্তিসঙ্গত।[১] আমরা সরেযমিনে মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখেছি এবং ডক্টর দানীর অভিমতই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি।

মসজিদের বারান্দায় ছিল ৬টি অর্ধ গোলাকার ও ১টি চৌচালা ধরনের গম্বুজ। এতে দেখা যাচ্ছে যে, সমগ্র মসজিদে ২৪টি অর্ধ গোলাকার ও ৪টি চৌচালা ধরনের এই মোট ২৮টি গম্বুজ ছিল। বর্তমানে (১৯৮১ খ্রিঃ) মসজিদের কোনো গম্বুজই টিকে নেই।

ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ৯টি মিহরাব এবং উপরে দ্বিতল কক্ষে আছে ১টি মিহরাব। মসজিদের অভ্যন্তরে যে তিনটি বিভাগের কথা বলা হয়েছে, তার প্রত্যেকটিতে ৩টি করে মিহরাব আছে। এতে দেখা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ বরাবর ৩টি এবং পূর্ব দেয়ালের আর সব প্রবেশপথ বরাবর ১টি করে মিহরাব নির্মাণ করা হয়েছিল। মিহরাবগুলিতে যে অলঙ্করণ ছিল, তার কিছু কিছু চিহ্ন এখনও টিকে আছে। তাতে দেখা যায় যে, মিহরাবগুলিতে ইটের উপরে অতি সূক্ষ্ম ও মনোরম কারুকার্য ছিল। মিহরাব গুলি আয়তাকার ফ্রেমের সাহাযে নির্মিত ছিল এবং সে সব ফ্রেমের উপরে লতা-পাতার অতি সুন্দর কারুকার্য ছিল। মিহরাব গুলির অভ্যন্তরেও ছিল সুন্দর কারুকার্য। অলংকরণের কাজ ছিল অতিশয় নিপূণভাবে করা।

মসজিদে যে শিলালিপিটি ছিল, তা মসজিদের পার্শ্ববর্তী জঙ্গল থেকে উদ্ধার করেন জনাব ইলাহী বখশ। তিনি তাঁর রচিত 'খোরশীদ-ই-জাহান নামা' গ্রন্থে এই শিলালিপি সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ করেন। পরে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে স্যার কানিংহ্যাম তাঁর গ্রন্থে শিলালিপিটির ছবি প্রকাশ করেন। ৩.৪ মিটার × .৬৪ মিটার আয়তনের একখণ্ড কাল পাথরের (black basalt) উপরে এক পঙ্ক্তিতে 'নশ্‌খ্‌' লিপিতে উৎকীর্ণ লিপিটি আরবী হস্তলিপির (calligrahpy) এক অপূর্ব নিদর্শন। লিপি পাঠে জানা যায় যে, বাঙলার সুলতান রুকন-উদ্‌-দীন বারবক শাহ্‌র পুত্র সুলতান শামস-উদ্‌-দীন ইউসুফ শাহ্‌ (১৪৭৬-৮১ খ্রিঃ) ৮৮৪ হিজরী (১৪৭৯ খ্রিঃ) সনে এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।

শিলালিপিতে মসজিদটিকে জামে' মসজিদ ('আল-মসজিদ-উল জামে') বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে সুলতান হোসেন শাহ্‌র আমলে নিকবর্তী স্থানে একটি 'দরস' অর্থাৎ মাদ্রাসা (দরসবাড়ি মাদ্রাসা দ্র.) হওয়ার কারণে খুব সম্ভব পরবর্তীকালে মসজিদটির নাম হয় দরসবাড়ি মসজিদ। মসজিদটি অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় ছিল। হাল আমলে প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর কিছু সংস্কার কার্য করেছে। কিন্তু গম্বুজগুলি বসাতে পারেনি।

১. Muslim Architecture in Bengal, pp. 110-11—prof. A. H. Dani.



▲ মিহরাব, দরসবাড়ী মসজিদ, গৌড়, চাপাই নবাবগঞ্জ

খনিয়াদিঘি বা রাজবিবি মসজিদ

দরসবাড়ি মসজিদ থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত বালিয়াদিঘির দক্ষিণ পাড় ঘেঁষে যে গ্রাম্য রাস্তা পূর্ব দিকে চলে গেছে, তা ধরে কিছুদূর গেলেই চোখে পড়ে আর একটি প্রাচীন জলাশয়, নাম খনিয়াদিঘি। এই দিঘির পাড়ে একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আছে। খনিয়াদিঘির পাড়ে অবস্থিত বলে এর নাম খনিয়াদিঘি মসজিদ। কিন্তু এই অঞ্চলে মানুষের কাছে এটি রাজবিবি মসজিদ বলে অধিক পরিচিত।

বহুকাল ধরে মসজিদটি জঙ্গলের ভিতর অজানাভাবে পড়েছিল। জঙ্গলের মধ্যে থাকত বড় বড় অজগর সর্পসহ বহু হিংস্র প্রাণী। খান সাহেব আবিদ আলীর গ্রন্থে এই মসজিদের সর্ব প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। তিনি মসজিদের যে বর্ণনা দিয়ে গেছেন, তা সঠিক। কিন্তু তিনি ভুল করে এটি 'ধুনিচক বা রাজবিবি' মসজিদের নামে আখ্যায়িত করেছেন। ধুনিচক নামক আর একটি স্বতন্ত্র মসজিদ এই মসজিদের কাছেই আছে (পরে ধুনিচক মসজিদ দ্র.)।

খনিয়াদিঘি বা রাজবিবি মসজিদের পূর্ণ অবয়ব এখন আর টিকে নেই বলে এর সঠিক আকার ও আয়তন সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে খান সাহেব আবিদ আলী বলে গেছেন যে, এর আয়তন ছিল ১৮.৭৫ মিটার × ১২.২ মিটার। এই বর্ণনার সঙ্গে মসজিদের বর্তমান ভগ্নাবশেষকে মিলিয়ে দেখলে মসজিদের আকার ও আয়তন সম্পর্কে মোটামুটি একটি পরিষ্কার ধারণা করা যেতে পারে।

বর্তমানে মসজিদের প্রধান কক্ষটি ভগ্ন অবস্থায় টিকে আছে। বর্গাকারে নির্মিত এই কক্ষের ভিতর দিকের আয়তন ৮.৪৮ মিটার × ৮.৪৮ মিটার। এর দেয়ালগুলি প্রায় ২.১

মিটার প্রশস্ত। এতে দেখা যাচ্ছে যে, এই কক্ষটির বাইরের দিকের আয়তন ছিল ১৩ মিটার x ১৩ মিটার। এই কক্ষের সামনের (পূর্ব) দিকে ছিল একটি বারান্দা। বারান্দার পূর্ব দেয়াল এখন টিকে নেই। পূর্ব দেয়াল সহ বারান্দাটি ছিল প্রায় ৬.২ মিটার প্রশস্ত। তাতে দেখা যাচ্ছে যে মসজিদটি পূর্ব-পশ্চিমে ১৮.৭৮মিটার লম্বা ও উত্তর-দক্ষিণে ১২.৭২ মিটার চওড়া ছিল।



▲ রাজবিবি/খানিয়া দিঘি মসজিদ, গৌড়, চাপাই নবাবগঞ্জ

প্রধান কক্ষের উপরে ছিল একটি বিরাট ও উঁচু গম্বুজ। গম্বুজটি অতি জীর্ণ অবস্থায় এখনও টিকে আছে। সামনের বারান্দার উপরে ছিল ৩টি ছোট গম্বুজ। সে গুলি এখন আর টিকে নেই। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং বারান্দাসহ উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ২টি করে প্রবেশপথ ছিল। ভিতরে পশ্চিম দেওয়ালে ছিল ৩টি মিহ্‌রাব। মসজিদের কোণে বাইরের দিকে ছিল বিরাট আকারের মিনার বা 'টারেট' এবং ভিতরে ছিল দেয়ালের সঙ্গে লাগান পাথরের স্তম্ভ।

মসজিদের সামনের দেয়ালে অতি সুন্দর অলঙ্করণ ছিল। মসজিদের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সে সব অলংকরণের কিছু কিছু নমুনা এখনও চোখে পড়ে।

জনাব কাজী মেছের 'রাজশাহীর ইতিহাস' নামক গ্রন্থে (২য় খণ্ড, ২০৫ পৃ.) "কেন্দ্রীয় মিহ্‌রাবের উপরে একটি কৃষ্ণ প্রস্তরে লিপি আছে" বলে উল্লেখ করেছেন এবং "একটু অসুবিধার দরুণ লিপিটি পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নাই" সে কথাও বলেছেন। খান সাহেব আবিদ আলী, অধ্যাপক দানী বা অন্য কেউ এ লিপির কথা বলেননি। এ লিপি এখন (১৯৮১ খ্রিঃ) দেখাও যায় না।

আকারে অপেক্ষাকৃত বড় হলেও এই মসজিদের সঙ্গে দিনাজপুর সুরা মসজিদের (সুরা মসজিদ দ্র.) যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। দুটি মসজিদ দেখে মনে হয় যে, এদুটি

ইমারত একই সময়ে নির্মিত হয়েছিল। অধ্যাপক দানী মনে করেন যে, এই মসজিদ পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় বা চতুর্থ পাদে নির্মিত হয়েছিল। খুব সম্ভব তাঁর অভিমত সঠিক।

পরবর্তীকালে প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর কর্তৃক মসজিদটিকে নতুন করে পুরাতন আকারে নির্মাণ করা হয়েছে। এবং উপরে প্রদত্ত ছবিটি সেই সময়ের।

ধুনিচক মসজিদ

খনিয়াদিঘি মসজিদ থেকে একটু দূরেই এই প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। মসজিদে কোনো শিলালিপি পাওয়া যায়নি। এই এলাকায় এককালে ধুনকরেরা বসবাস করতেন বলে এটিকে ধুনিচক মসজিদ বলে অভিহিত করা হয়।

ইলাহী বখশ্ যে বর্ণনা দিয়ে গেছেন, তা থেকে জানা যায় যে, মসজিদের উপরে ৩টি গম্বুজ ছিল। মসজিদের কাছে একটি ছোট ইমারত ছিল বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি এটিকে মসজিদ নির্মাতা ও তাঁর পরিবারের সমাধি সৌধ বলে অনুমান করেন। সেই ইমারত এখন আর টিকে নেই।

মসজিদের উত্তর ও পশ্চিম দেয়ালের অংশ বিশেষ এখনও টিকে আছে। কোণের মিনার (turret) গুলির কোনো চিহ্নও দেখা যায় না। মসজিদের ভিতরে ২টি স্তম্ভ আছে। প্রস্তর নির্মিত স্তম্ভ দুটির ১টি দণ্ডায়মান অবস্থায় (সঠিক স্থানে কিনা তা বলা দুষ্কর) এবং অপরটি পতিত অবস্থায় আছে।



▲ ধুনিচক মসজিদ, গৌড়, চাপাই নবাবগঞ্জ

অধ্যাপক দানী অনুমান করেন যে, মসজিদের উপরে ১টি মাত্র গম্বুজ ছিল এবং তা ছিল বিরাট আকারের। কিন্তু হাল আমলে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট জনাব আব্দুল কাদির মসজিদটি খুব ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং তাঁর মতে এতে ৬টি গম্বুজ ছিল এবং এর পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ২টি করে প্রবেশপথ ছিল। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে ছিল ৩টি মিহরাব (প্লেট নম্বর ২৮)।

জনাব আবদুল কাদিরের অভিমতের সঙ্গে আমরা একমত। মসজিদের ভিতরে যে দুটি স্তম্ভ ছিল সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ২টি স্তম্ভের সাহায্যে মসজিদের উপরে ৬টি গম্বুজ নির্মাণ করা যায় এবং এরকম বহু দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের প্রাচীন মসজিদগুলিতে আছে (কুসুম্বা মসজিদ ও বিক্রমপুরের বাবা আদম শহীদ মসজিদ দ্র.)।

সমগ্র মসজিদটি প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ার ফলে মসজিদের আয়তন ও আকার সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছুই বলা যায় না। তবে যতটুকু মনে হয় এটি ছিল উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি ৬ গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। সরেযমিনে তদন্ত করে আমরাও সেই মতেরই সমর্থক।

মসজিদের গায়ে অতি সুন্দর অলংকরণের কাজ ছিল বলে জানা যায়। একটি মিহরাবের গায়ে যে কারুকার্য আছে তাতে দেখা যায় লতাপাতা, ফুল, বৃক্ষ ইত্যাদির প্রতিকৃতি দ্বারা মিহরাবটি সুশোভিত ছিল।

এই মসজিদ পঞ্চদশ শতাব্দিতে নির্মিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতদের অভিমত। পুরাতন ভিত্তিকে অনুসরণ ছয়গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটিকে নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর কর্তৃক এবং উপরে প্রদত্ত ছবিটি সেই মসজিদেরই।

অন্যান্য মসজিদ

প্রাচীর বেষ্টিত গৌড় নগরীর বাইরে দক্ষিণ দিকে উপরে উল্লিখিত কীর্তিগুলির ধারে-কাছে তিনটি পনের গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের ধ্বাংসাবশেষ দেখা যায়। সেগুলো হচ্ছে, (১) দুধপুকুর মসজিদ, (২) শিয়ালমারা মসজিদ ও (৩) বাঘবাড়ি মসজিদ।[১]

মসজিদ তিনটি এমনভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত যে, এগুলি সম্বন্ধে বিশেষ কোনো বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। ধ্বংসাবশেষগুলি পরিত্যক্ত ও মঙ্গলাকীর্ণ। আর তিনটি ধ্বংসাবশেষের প্রত্যেকটিতে দেখা যায় যে, এগুলির প্রত্যেকটিতে ৮টি করে স্তম্ভ ছিল। এই স্তম্ভগুলির ধ্বাংসাবশেষের অবস্থান ও ভূমি-পরিকল্পনা অনুমান করে সহজেই ধারণা করা যায় যে, মসজিদ তিনটি ছিল পনেরগম্বুজবিশিষ্ট ;

১. জনাব মোশাররফ হোসেন, উপ-পরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর : Fifteen-Domet Mosques of Bangladesh : Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, Vol. 44. January, 1994, pp. 57-70.

রাজশাহী জেলা

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ

বিহারৈল-ধানোরা-পাড়িশোঁ-মাদারিপুর

রাজশাহী শহর থেকে প্রায় ৩২ কিলোমিটার সোজা উত্তরে তানোর থানার অন্তর্গত আধুনিক মাদারীপুর গ্রামের মাইল খানেক উত্তরে অবস্থিত বিহারৈল একটি প্রাচীন স্থান। একটি বিলের পশ্চিম তীরে অবস্থিত এ স্থান। এককালে খরস্রোতা ও বিশালকায়া বারাহী (বর্তমানে বারনই) নদীর প্রবাহ ছিল এ বিল। হাল আমলে নদী গতি পরিবর্তন করে বিলের সৃষ্টি করেছে।

বিলের পশ্চিম তীরে অবস্থিত বিহারৈল-মাদারীপুর-ধানোরা-পাড়িশোঁ প্রভৃতি গ্রামে অসংখ্য প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ও প্রাচীন জলাশয়ের অস্তিত্ব আছে। অনেক প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ এককালের খরস্রোতা বারাহী নদীর স্রোতে ভেসে গেছে বলে জানা যায়। অবশ্য বর্তমানে যে সব ধ্বংসাবশেষটিকে আছে, সেগুলির সংখ্যাও খুব কম নয়। প্রায় ৮ বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে এ সব প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ, প্রাচীন রাস্তার চিহ্ন ও অসংখ্য প্রাচীন জলাশয়ের অস্তিত্ব দেখা যায়।

বিহারৈল : ১৯২২-২৩ খ্রিস্টাব্দে অবিভক্ত ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্মকর্তা মিঃ কে, এন, দীক্ষিত এস্থান পরিদর্শন করেন এবং এস্থানকে প্রত্নতত্ত্বের দিক থেকে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান বলে অভিহিত করেন। বিহারৈল থেকে সংগৃহীত একটি বুদ্ধমূর্তি রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। বেলেপাথরে (sand-stone) নির্মিত এ মূর্তি মিঃ দীক্ষিতের মতে পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্তযুগে নির্মিত এবং সারনাথে প্রাপ্ত বুদ্ধ মূর্তিগুলির সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে বলে তিনি বলেছেন।

সে সময়ে তিনি এখানকার 'রাজবাড়ি' নামক একটি ঢিবিতে আংশিক ও পরীক্ষামূলক উৎখনন কার্য পরিচালনা করেন এবং একটি অতি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের অংশ বিশেষ উদ্ধার করতে সমর্থ হন। তাঁর প্রতিবেদন[১] থেকে জানা যায় যে,

১. "The part examined by me this year (1922-23) was the western part of the Rajbari mound, where it slopes abruptly to the level of the surrounding padc. fields. Brickbats lying scattered at places particularly near the mouths of recently dug pits on the highest portion of the mound, show the extent to which the spoilation of the mound for its brick contents has been carried away. Sinking pits partly on unbroken ground and partly in the craters of the old pits I found portions of a wall 4′ 7′′ to 4′ 10′′ to breadth running north and south within 2 or 3 feet from the surface. This

মাঝখানের উন্মুক্ত অঙ্গনের চারদিকে প্রাচীন প্রচলিত রীতিতে এখানে একটি বিহার নির্মিত হয়েছিল। তিনি দুই স্থানে বিহারের পশ্চিম দেয়ালের অংশ বিশেষ (এক স্থানে ১৩.৩৩ মিটার ও আর এক স্থানে ৯.৩৯ মিটার) আবিষ্কার করতে সমর্থ হন। উত্তর দেয়ালেরও কিছু অংশ অনাবৃত হয়। এই দেয়ালগুলি ছিল ১.৩৮ মিটার থেকে ১.৪৬ মিটার পুরু। এই দেয়ালের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে নির্মিত দেয়ালও আবিষ্কৃত হয়। তাতে তার ধারণা হয় যে, প্রাচীন ও পরিচিত পদ্ধতিতে নির্মিত ছিল এই বিহার। ব্যাপকভাবে ইট সরিয়ে নেবার ফলে এই বিহারে আরও উৎখনন কার্য ফলদায়ক হবেনা বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে এই বিহারটি গুপ্তদের (পঞ্চম শতাব্দী) পরবর্তীকালে নির্মিত হয়নি। অর্থাৎ এটি গুপ্তদের সময়ে কি তার আগে নির্মিত হয়ে থাকতে পারে।

ধানোরা : মাদারীপুর থেকে আনুমানিক ২.৫ কিলোমিটার পশ্চিমে এই প্রাচীন গ্রামটি অবস্থিত। এখানে অসংখ্য প্রাচীন জলাশয় আছে। জলাশয়গুলির কাছেই আছে ২টি প্রাচীন ঢিবি। এ দুটি ঢিবির বড়টিকে 'রাজবাড়ি' ও ছোটটিকে 'বুরুজ' বলা হয়ে থাকে। বড় ঢিবির উচ্চতা ২.১ থেকে ২.৮ মিটার এবং ছোটটি এখনও ৩.৫ মিটার থেকে ৪.৫৪ মিটার উঁচু।

রাজবাড়ি ঢিবিটি খোলা মাঠের মধ্যে অবস্থিত এবং এর উপরে কোনো বৃক্ষলতা নেই। কিন্তু ছোট ঢিবির উপরিভাগ বাঁশঝাড় ও গুল্মলতা দ্বারা আবৃত। বড় ঢিবিটিকে একটি বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ বলে মনে করা হয়। এ সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা না গেলেও এটি যে একটি বিরাট অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ছোট ঢিবিটি খুব সম্ভব কোনো হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।

পাড়িশোঁ : ধানোরা গ্রামের কাছেই আছে পাড়িশোঁ নামক একটি প্রাচীন গ্রাম। এ গ্রামেও অসংখ্য প্রাচীন জলাশয় আছে, আর আছে চারদিকে পরিখাবেষ্টিত একটি স্থান। এ স্থানের পরিখাগুলি প্রায় মজে গেছে এবং ভিতরে যে সব কীর্তির ধ্বংসাবশেষ ছিল, সেগুলিও বিলুপ্তপ্রায়। স্থানীয় লোকের ধারণা এখানে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। গ্রামের

---

was traced to a length of 44 feet on the north, other walls of lesser thickness crossing it at intervals on the east, thus indicating that the exposed structure was constructed on the familiar ancient plan of a row of cells round a central courtyard. At a distance of about 32 feet from the broken north end of the main wall, ahother wall of the same breadth was found running to the east with a cross wall to the south evidently forming part of a cell. The removal of bricks on a large scale from the site has resulted in breaking the continuity of the walls. The size of the bricks used in the building is fairly large, being 14.5 inches in length by 10 inches in breadth and 2.5 inches in thickness. Judging from the analogy of the bricks dicovered in other ancient sites, it can be safely concluded that the structures here belong to period not later thant the Guptas which is further corroborated by the discovery of the antiquities now preserved in the Rajshahi district."—Ancient Monuments of East Pakistan, pp. 227-28 by Dr. S.M. Hasan.

মধ্যে অনেক প্রাচীন রাস্তার সন্ধান পাওয়া যায়। রাস্তাগুলি এককালে ইট বাধান ছিল। এখানে একখণ্ড পাথরের উভয় দিকে মূর্তি ছিল বলে কাজী মেছের 'রাজশাহীর ইতিহাস' নামক গ্রন্থে (১৯১ পৃ.) উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "এখানে প্রস্তরখণ্ডের এক পিঠে বামন বরাহ প্রভৃতি অপর পিঠে কয়েকটি মহাবিদ্যার মূর্তি উৎকীর্ণ আছে।"

বিহারৈল-ধানোরা-পাড়িশোঁ এলাকা জুড়ে অতি প্রাচীনকালে যে একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ গড়ে উঠেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। গুপ্ত যুগেই যে এখানে একটি বিরাট আকারের বৌদ্ধ বিহারের অস্তিত্ব ছিল, তা মিঃ দীক্ষিতের উৎখনন কার্য থেকেই জানা যায়। এই নগরী এর আগে থেকেই এখানে অস্তিত্বশালী ছিল বলে মনে হয়। তারপরে গুপ্ত, পাল-বর্মণ-সেন যুগেও এ স্থানের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল বলে মনে হয়।

প্রাচীন গৌড় নগরী থেকে একটি সড়ক নওদা-রহনপুর-নাচোল হয়ে এ স্থানকে বিজয়পুর, কুমারপুর, বোয়ালিয়া প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে সংযুক্ত করত বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

দেওপাড়া-বিজয়নগর-কুমারপুর

রাজশাহী শহর থেকে প্রায় ১১ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে শীতলাই রেলস্টেশনের নিকট অবস্থিত প্রাচীন দেওপাড়া গ্রাম। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে মিঃ সি, টি, মেটকাফ (Mr. C.T. Metcalfe) এখান থেকে ' দেওপাড়া শিলালিপি' নামক একটি প্রস্তরলিপি উদ্ধার করেন। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে কুমার শরৎ চন্দ্র রায়ের উদ্যোগে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দ এবং আরও কয়েকজন পণ্ডিত এই এলাকায় অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত অসংখ্য প্রাচীন জলাশয়, শিলাখণ্ড ও প্রাচীন ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারে সমর্থ হন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে দেওপাড়া শিলালিপিতে উল্লিখিত দিঘিটি সংস্কার করা হয় এবং তাতে অসংখ্য প্রস্তর মূর্তিসহ ১২৯ টি শিলাখণ্ড পাওয়া যায়। ইট হরণকারীদের দৌরাত্ম্যে এ স্থানের প্রাচীন কীর্তিগুলির ভিত্তি-প্রাচীরের কিছু অংশ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি।

শিলালিপির পাঠ থেকে জানা যায় যে, মহারাজ বিজয় সেন অতি উঁচু দেবগৃহাদি নির্মাণ ও বিরাট আকারের জলাশয়াদি খনন করেন।[১] মন্দিরগুলির মধ্যে 'প্রদ্যুম্নেশ্বর' মন্দির ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন শাখা-উপশাখা, ভিত্তি ও প্রধান অট্টালিকাসহ এ মন্দির ছিল এক বিরাট ইমারত। সূর্যের অশ্বগুলির গতিপথ রোধ করে দণ্ডায়মান ছিল এ মন্দিরের উচ্চতা এবং বিন্ধ্য পর্বত আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেও এর সমান উচ্চতা লাভে সমর্থ হতনা (২৬-২৭ চরণ)। সুমেরু দেশকে একটি কলসিতে রূপান্তরিত করলে মন্দিরের শীর্ষদেশে স্থাপিত সুবর্ণ কলসীর সঙ্গে তুলনীয় হত (২৮ চরণ)। মন্দিরের সম্মুখে মহারাজ বিজয়সেন এক সরোবর খনন করেন (২৯ চরণ)। বাল্মীকি বা ব্যাসদেবের সঙ্গে তুলনীয় কবি উমাপতি ধর শিলালিপির প্রশস্তি রচনা করেন এবং বরেন্দ্র শিল্প গোষ্ঠীর চূড়ামণি শূলপাণি কর্তৃক লিপিটি উৎকীর্ণ হয়েছিল।

---

১. Inscriptions of Bengal, vol 111, pp. 42-56.—N.G. Majumdar.

শিলালিপির কবিসুলভ অত্যুক্তিগুলি বাদ দিলে যা থাকে, তাতে বোঝা যায় যে, মহারাজা বিজয়সেন কর্তৃক নির্মিত প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দির ছিল এক বিরাট ও সুউচ্চ অট্টালিকা। মন্দিরের সম্মুখে খনিত হয়েছিল এক বিরাট জলাশয়। আশেপাশে আরও অনেক মন্দিরাদি নির্মিত ও জলাশয়াদি খনিত হয়েছিল। ৩০ চরণের পাঠ দেখে ধারণা হয় যে, সেখানে একটি জনপদেরও অস্তিত্ব ছিল।

প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দির কোথায় নির্মিত হয়েছিল, সে উল্লেখ শিলালিপিতে নেই। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে আরব্ধ অনুসন্ধান কার্যের ফলে দেওপাড়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে সমস্ত প্রত্নকীর্তির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, সেগুলির মধ্যে 'পদুমশার' দিঘি নামক এক বিরাট জলাশয়ের তীরে অবস্থিত একটি ধ্বংসাবশেষকে প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দির বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। শিলালিপির ২৯ চরণে প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের সম্মুখে খনিত যে দিঘির কথা উল্লিখিত হয়েছে, তাতে দিঘির কোনো নাম নেই। তবে জনশ্রুতিমূলে এ দিঘির 'পদুমশার' নাম বহুকাল থেকে প্রচলিত। এটি যে 'প্রদ্যুম্নেশ্বর'-এর পরিবর্তিত ও বিকৃত রূপ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এসমস্ত কারণে পণ্ডিতসমাজ দেওপাড়াকে প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের অবস্থানস্থল বলে অতি যুক্তিসঙ্গত কারণেই ধরে নিয়েছেন। তদুপরি এস্থানের কিছু দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বিজয়নগর এই সিদ্ধান্তের পিছনে সমর্থন যোগায়।

কুমারপুর-বিজয়নগর

দেওপাড়া থেকে ২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম ও রাজশাহী শহর থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার পশ্চিমে রাজশাহী-গোদাগাড়ি পাকা সড়কের লাগোয়া উত্তরে একটি মাটির তৈরি দুর্গ (mud-fort) আছে। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এই দুর্গের আয়তন প্রায় ১৩৬৩ মিটার × ৯০৯ মিটার। লাল মাটির তৈরি দেয়ালগুলি বেশ চওড়া এবং ৪.৫৪ মিটার থেকে ৬.০৬ মিটার উঁচু। দুর্গের ভিতরে তেমন কোনো প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ নেই। সমগ্র দুর্গ এলাকা এখন চাষের জমি।

এ স্থানের নাম কুমারপুর। দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আছে একটি বেশ বড় আকারের ঢিবি। ঢিবির উপরে আছে একটি পাকা মাযারের ধ্বংসাবশেষ (এ সম্বন্ধে পরে কুমারপুর মাযার ও মসজিদ শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে)।

মাযার ঢিবির কিছু উত্তরে 'উপরবাড়ি' নামক আর একটি ঢিবি আছে। রাজশাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক উপরবাড়ি ঢিবিতে আংশিক উৎখনন কার্য চালানর ফলে একটি ইমারতের দেয়াল ও কিছু কিছু প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়। খনন কার্যের কিছু পরে পাহাড়পুর বিহারের খনন কার্যের পরিচালক (১৯২২-২৩ খ্রিঃ) এটিকে একটি বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ বলে অভিহিত করেন।[১]

কুমারপুরের কিছু পশ্চিম-উত্তরে একটি বিরাট চকমিলান ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ছিল। ধ্বংসাবশেষটির বিশেষ কিছুই টিকে নেই বলে এর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব

১. "From the ruins of the walls which are still to he seen at the site it appears the mound was the site of a monastery or Vihar with an open courtyard in the center, surrounded by cells (rooms)"—Ancient Monuments of East Pakistan, p. 229—Dr. S.M. Hasan.

নয়। বর্তমানে পড়ে আছে শুধু প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ এবং কিছু কিছু পাথরের টুকরা। এই ধ্বংসাবশেষের অদূরে অবস্থিত একটি পতিত ভিটা ছিল। এতেও প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। এটিকে বলা হত 'কুমার রাজার বাড়ি'। আর এখন এস্থানকে বলা হয় 'বিজিপুর' বা 'বিদিরপুর'।

কুমারপুরের লাগোয়া পূর্বদিকের গ্রামের নাম বিজয়নগর। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি হচ্ছে, প্রেমতলী, খেতুর, ব্রাহ্মণ-পুষ্করিণী, ধর্মপুর, দেওপাড়া, ছাব্বিশনগর প্রভৃতি। এক বিরাট এলাকা জুড়ে এ সমস্ত গ্রাম অবস্থিত। সমগ্র অঞ্চল জুড়ে দেখা যায় অসংখ্য প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ও অজস্র পাথরের টুকরা। আর আছে অসংখ্য প্রাচীন দিঘি-পুষ্করিণী ও প্রাচীন ইমারতের ভিত্তি-দেয়ালের চিহ্ন। এসব দেখে ধারণা হয় যে, এককালে সমগ্র অঞ্চল জুড়ে একটি বিরাট ও সমৃদ্ধিশালী জনপদের অস্তিত্ব ছিল।

কবি ধোয়ীর 'পবনদূত' নামক কাব্য থেকে জানা যায় যে, 'বিজয়পুর' নামক স্থানে সেন নৃপতিদের রাজধানী ছিল। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দের মতে আলোচ্য বিজয়নগরই সেই বিজয়পুর। এই অনুমানের পিছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে এবং তা গ্রহণযোগ্য।

মুসলিম আমল

মখদুম শাহ্‌র মাযার

রাজশাহী শহরের দরগা পাড়ায় যে মাযারটি আছে তা সাধারণভাবে মখদুম শাহ্‌র দরগা বলে পরিচিত। দরগার দক্ষিণ দিকের প্রবেশ পথের উপরে ফারসী ভাষায় যে শিলালিপিটি আছে তার অনুবাদ নিম্নরূপ :

অনুবাদ—"বিখ্যাত সৈয়দ পদবীর অধিকারী, মরহুম ও [আল্লাহ্‌র] করুণা, ক্ষমা ও সান্নিধ্য লাভকারী শাহ্ দরবেশের (মতান্তরে শাহ্ রূপশের) সমাধির উপরে গম্বুজ নির্মাণের সৌভাগ্য [আলীকুলী বেগ] লাভ করেন ১০৪৫ হিজরী (১৬৩৪ খ্রিঃ) সনে। ঐশ্বরিক করুণা ও সুখ লাভকারী, সমকালীন ও সমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলীকুলী বেগ [ছিলেন] আলা হযরত ও মহান ও সম্ভ্রমশালী সম্রাটের ভৃত্য, মহান ও সম্ভ্রমশালী সম্রাটের রাজত্বের অনুগ্রহ লাভকারী। [সেই সম্রাট ছিলেন] ভৃত্যদের নিকট [হযরত] ইউসুফের মতো [দয়ালু], রাজাদের নিকট আদর্শ, সম্রাটদের নিকট আইন [স্বরূপ] এবং পরগম্বরদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠতম তাঁর বংশসম্ভূত, সুলতানের পৌত্র, সুলতানের পুত্র সুলতান এবং সম্রাটের পৌত্র, সম্রাটের পুত্র সম্রাট, ইরানের সেনাপতি, দ্বাদশ ইমামের ধর্মপ্রচারকারী এবং বিশ্বাসীদের প্রভু ও ধর্মানুরাগীদের নেতা রাসুল উল্লাহ্‌র—তাঁর উপর আল্লার রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক!—পরেই যিনি মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ [সেই] আবু তালিবের পুত্র আলীর—তাঁর উপর আল্লাহর রহমত শান্তি বর্ষিত হোক!—অঙ্গনের কুকুর সদৃশ [প্রহরী]—হোসেনের বংশজাত শাহ্ আব্বাস সাফাভি—তিনি নব নবভাবে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য ও সুখলাভ করুন! এই লিপি খোদিত করার উদ্দেশ্য যাতে আমি স্মরণীয় হতে পারি, কারণ [কোনো] অস্তিত্বকেই আমি চিরস্থায়ী দেখিনা।"

বর্গাকারে নির্মিত প্রায় ৬.০৬ মিটার দীর্ঘ বাহু বিশিষ্ট এ সমাধি সৌধের উপরে একটি মাত্র গম্বুজ অবস্থিত। দক্ষিণ দিকে প্রবেশপথ। দরজার চৌকাঠ কালপাথরের।

চৌকাঠের পাথরে নানারকম চিত্র উৎকীর্ণ আছে। লতাপাতার মাঝে অতি ছোট ছোট জীবজন্তুর চিত্র একটু ভাল করে দেখলে খালি চোখেই ধরা পড়ে। অতি সূক্ষ্ম কারুকার্যে ভরা চৌকাঠের পাথর যে, কোনো ধ্বংসপ্রাপ্ত হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দির থেকে সরিয়ে এনে মাযারের দরজায় সংযোজিত করা হয়েছে, তাতে বোধ হয় কোন সন্দেহ নেই। মাযারের চারকোণে ৪টি সরু মিনার (turret) আছে।

সমাধিসৌধের ভিতরে মূল্যবান গেলাফে ঢাকা পাকাকবর। অসংখ্য ভক্তের সমাবেশ প্রতিদিন সেখানে ঘটে। ইমারতের ভিতরে ও বাইরে প্রতিবছর প্রচুর চুনকাম হয় বলে এর আদিরূপ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলা কঠিন। ইমারতের গঠনপ্রণালী ও স্থাপত্যকৌশল দেখে এটিকে সুলতানী আমলের বলে ধরে নিলে খুব ভুল করা হবে বলে মনে হয় না। সুলতান জালাল-উদ-দীন মোহাম্মদ শাহর (১৪১৭-৩২ খ্রিঃ) বিখ্যাত 'একলাখী' সমাধিসৌধের প্রায় অনুকরণে নির্মিত এটি। অথচ শিলালিপি দৃষ্টে ধরে নিতে হয় যে, ১৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহ্জাহানের রাজত্বকালে এটি নির্মিত হয়েছিল। মোঘল আমলে বিশেষ করে সম্রাট শাহ্ জাহানের সময় নির্মিত ইমারতাদিতে এ ধরনের গঠনকৌশল সচরাচর দেখা যায় না। শিলালিপিতে আছে "শাহ্ দরবেশের (রূপশের?) কবরের উপরে 'গম্বুজ' নির্মাণের সৌভাগ্য [আলীকুলী বেগ] লাভ করেন।" এখানে 'গম্বুজ' শব্দ অত্যন্ত তাৎপর্যপুর্ণ বলে মনে হয়। সমাধিসৌধ, দরগা, মাযার ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার না করে শুধু গম্বুজ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ফারসী গম্বুজ শব্দের অর্থ কোনো ইমারতের শীর্ষদেশে অবস্থিত অংশ ("an arch, vault, cupola, dome, tower, an arched gateway" ইত্যাদি), কোনো ইমারতকে বোঝাতে এ শব্দ ব্যবহৃত হয় না। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, আলীকুলী বেগ যখন গম্বুজটি নির্মাণ করেন, তখন সেখানে একটি ইমারত আগে থেকেই ছিল। সেই ইমারত খুব সম্ভব জীর্ণ হয়ে পড়ে এবং যে কোনো কারণেই হোক গম্বুজটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আলীকুলী বেগ খুব সম্ভব সমাধিসৌধের আমূল সংস্কার করে বর্তমান গম্বুজটি নূতন করে স্থাপন করেন। সে জন্যই তিনি গম্বুজ নির্মাণের কথা বলেছেন, মাযার নির্মাণের কথা বলেননি। যে ব্যক্তির সমাধির উপর সৌধটি স্থাপিত তাঁর নাম জনাব শামস্-উদ-দীনের মতে 'শাহ্ দরবেশ'[১] আর জনাব আবু তালিবের মতে 'শাহ্ রূপশ'[২]।

জনাব শামসুদ্দীন আহমদ শিলালিপির কোনো আলোকচিত্র দেননি। জনাব আবু তালিব যে আলোকচিত্র দিয়েছেন, তা পড়ার সাধ্য কারোর আছে বলে মনে হয় না। আমরা নিজেরা লিপিটি পাঠ করতে চেষ্টা করেছি। তাতে খুব কৃতকার্য হইনি। 'শাহ্' শব্দের পরে 'দাল' 'রে' 'ওয়াও' 'ইয়ে' ও 'শিন' অক্ষরগুলিতে 'রূপশ' পাঠ আছে বলে জনাব আবু তালিবের অভিমত। ফারসী বাষায় 'রুপশ' শব্দ নেই, 'রুপুশ' শব্দ আছে এবং রুপুশ শব্দের অর্থ হচ্ছে মুখ আচ্ছাদনকারী ঘোমটা ('a veil covering the whole face, especially a virgin bride's of red silk; concealed, disappearing out of sight'.)।

---

১. Inscrptions of Bengal, Vol IV, p. 274.—Mvi. S. Ahmad.
২. বিস্মৃত ইতিহাসের তিন অধ্যায়, ৮৪ পৃ.।—অধ্যাপক আবু তালিব।

জনাব আবু তালিব একখানা প্রাচীন ফারসী গ্রন্থের (১০৭৬ হিজরীতে রচিত ও ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষায় অনূদিত বলে কথিত) দোহাই দিয়ে পীর সাহেবকে মখদুম শাহ্ রূপশ মখদুম বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন। মখদুম কোন নাম নয়। মখদুম শব্দের আভিধানিক অর্থ যিনি [অনুচর, ভৃত্য প্রভৃতি দ্বারা] সেবিত হন। আর সাধারণ অর্থে এশব্দ কোন মুসলিম ওলী-দরবেশকে বোঝায়। এতে দেখা যায় যে, মখদুম শব্দ দ্বারা পীর সাহেবের নামের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না।

জনাব আবু তালিব অবশ্য তাঁকে হজরত আবদুল কাদির জিলানীর পুত্র আজালা শাহ্র দ্বিতীয় পুত্র হজরত আবদুল কুদ্দুস বলে পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর মতে তাঁর মৃত্যুকাল ১৩২৩ খ্রিস্টাব্দে। তিনি প্রাগুক্ত পাণ্ডুলিপি ও নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জ থানার শ্যামপুর দায়রা শরীফে রক্ষিত একটি তাম্রলিপির উপর নির্ভর করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। শ্যামপুর দায়রা শরীফের তথাকথিত তাম্রলিপি খানা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন কিনা, সে কথা বলেননি। তিনি ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের এর বাংলা অনুবাদের কথাই বলেছেন। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ বলে তথাকথিত তাম্রলিপি খানা অথবা এর আলোকচিত্র বা মুদ্রণ না দেখলে এ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা বা এর উপর নির্ভর করা আদৌ নিরাপদ বলে মনে হয় না। আর ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষায় অনূদিত বলে যে গ্রন্থের কথা জনাব আবু তালিব বলেছেন, মূল ফারসী পাণ্ডুলিপি না দেখে তার উপর নির্ভর করাও খুব যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না। জনাব আবু তালিবই বলেছেন, মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যাপারে দলীল হিসাবে ব্যবহারের জন্য এ প্রামাণ্য গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ হয়েছিল। তার উপর ১০৭৬ হিজরী (১৬৬৬-৬৭ খ্রিঃ) সনে যদি মূল ফারসী গ্রন্থটি রচিত হয়েও থাকে তবে পীর সাহেবের মৃত্যুর (তাঁর মতে তাঁর মৃত্যুর তারিখ ১৩২৩ খ্রিঃ) প্রায় সাড়ে তিনশ বছর পরে মূল ফারসী গ্রন্থের রচনা কাল। এতে সত্য ঘটনাটি এতদিন অবিকৃত অবস্থায় রয়েছিল, এ রকম ধারণাও খুব সঙ্গত বলে ধরা যায় না।

আর একটি মজার কথা হল যে, আলোচ্য শিলালিপিতে 'মখদুম শাহ্র' কোনো উল্লেখ নেই। এসময়ে মাযারটি পুনর্নির্মিত হয়েছিল এবং এতে বহু যত্ন করে একটি শিলালিপি উৎকীর্ণ করে সংস্থাপিত হয়েছিল। সে সময়ে দরবেশের নামধাম ও পরিচয় সম্পর্কে যদি কোনো নির্ভরশীল তথ্য জানা থাকত, তবে তা শিলালিপিতে নিশ্চয়ই স্থান পেত। অথচ শিলালিপির মাত্র ৩৪/৩৫ বছর পরে (১০৭৬ হিঃ) রচিত গ্রন্থে দরবেশের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এতে যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়, তা নিরসন করা সহজ নয়। আর তথাকথিত শ্যামপুর শিলালিপি সম্পর্কে যত কম কথা বলা যায়, ততই ভাল।

মৌলভী শামসুদ্দীন ধারণা করেন যে, শাহ্ দরবেশ ছিলেন গৌড়-পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত পীর নুরে কুতব-ই-আলমের প্র-পৌত্র শেখ আফ্কার পৌত্র শেখ জাহিদের তৃতীয় পুত্র।[১] তাঁর এ অভিমতের পিছনে কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ তিনি দেননি এবং নেইও।

১. Inscriptions of Bengal vol. Iv, p. 272.—Mvi. S. Ahmed.

শিলালিপিটি সম্রাট শাহ্‌জাহানের রাজত্ব কালে উৎকীর্ণ হলেও এতে দিল্লীর সম্রাট বা তাঁর কোনো আমিরের উল্লেখ নেই। উল্লেখ এবং স্তুতি আছে ইরানের সম্রাট শাহ্‌ আব্বাস সাফাভির (১৫৮৭-১৬২৯ খ্রিঃ)। এটি বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়। আরও কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হল এই যে, শিলালিপি উৎকীর্ণ হবার ৫ বছর আগে শাহ্‌ আব্বাস মারা গিয়েছিলেন। এবং একজন নূতন শাহ্‌ তখন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এতে মনে হয় ইরানের শাহ্‌র প্রতি আলীকুলি বেগের পূর্ণ আনুগত্য থাকলেও সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন না। অর্থাৎ বহুকাল আগে তিনি ইরান ছেড়ে এসে সেখানে আর ফিরে যাননি এবং সেখানকার কোনো খবরও রাখেননি।

আলীকুলী বেগ ছিলেন একজন শিয়া। খুব সম্ভব তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে এদেশে এসেছিলেন। তখন শাহ্‌ আব্বাস ইরানের অধিপতি। জাহাঙ্গীরের সময়ে তাঁর পত্নী নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁর (তিনি শিয়া ছিলেন) দৌলতে খুব সম্ভব আলীকুলীর খুব প্রতিপত্তি হয়। পরে শাহজাহানের সময়ে (তিনি পাক্কা সুন্নী ছিলেন) তিনি বোধ হয় অসুবিধায় পড়ে ধনরত্নসহ সুদূর রাজশাহীতে চলে আসেন।

শাহ্‌ মখদুম শিয়া ছিলেন, কি সুন্নী ছিলেন সে সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। জনাব শামসুদ্দীন তাঁকে সুন্নী বলেছেন হজরত নুর-ই-কুতব-ই-আলমের তথাকথিত বংশধর হিসাবে। জনাব আবু তালিব তাঁকে 'কাদেরীয়া তরীকাপন্থী সুফী সাধক' বলেছেন তাঁর নিজস্ব থিউরি অনুসারে।

সম্রাট হুমায়ুনের শিয়া ধর্মের প্রতি অনুরাগ ছিল প্রবল। অসমর্থিত প্রমাণে জানা যায় যে, তিনি মখদুম শাহ্‌র দরগার জন্য বিস্তর ভূ-সম্পত্তি দান করেছিলেন। শিয়া আলী কুলী বেগ বহু অর্থব্যয়ে এ দরগা পুনর্নির্মাণ করেছিলেন এবং শিলালিপিতে শিয়া মতবাদের প্রশস্তিও গেয়েছেন। এ দরগা যদি কোনো সুন্নী মুসলিমের হত, তবে আলীকুলী বেগের মতো একজন শক্ত শিয়া এখানে কোনো কাজ করতেন কিনা সন্দেহজনক। তিনি যে সুন্নী সম্রাটের (সম্রাট শাহজাহান) রাজ্যে বাস করতেন, তাঁর প্রতি তাঁর কোনো আনুগত্য ছিল না। সেক্ষেত্রে কোনো সুন্নী পীরের প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল এ কথা মেনে নেওয়া যেতে পারেনা। এতে মনে হয় যে, সে সময়ে দরগাটি একজন শিয়ার দরগা বলেই খুব সম্ভব পরিচিত ছিল।

এ প্রসঙ্গে মখদুম শাহ্‌র দরগাতে শিয়া ধর্মের যে অনুষ্ঠানাদি হয় তার উল্লেখ করা যেতে পারে। এ সম্বন্ধে জনাব আবু তালিব বলেন, "উল্লেখ্য যে, শাহ্‌ আব্বাস ও হযরত আলীকুলী বেগ উভয়েই শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন এবং শাহ্‌ মখদুমেরই নির্দেশে শিয়া মতানুযায়ী মহরম অনুষ্ঠানাদি ইত্যাদির জন্য আলীকুলী বেগ ইমামমবাড়া, নহবৎখানা ইত্যাদি নির্মাণ করেছিলেন। আজ আলীকুলী বেগ নেই, কিন্তু কাদেরীয়া তরীকাপন্থী সুফী সাধকের দরগায় শিয়া মতানুসারী মহরম অনুষ্ঠনাদি পরিচালিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য বাংলাদেশের এই অঞ্চলে শিয়া প্রভাবের সবচেয়ে বড় নিদর্শন হ'ল—রাজশাহীর এই দরগাহের অনুষ্ঠান।"[১]

---

১. বিস্তৃত ইতিহাসের তিন অধ্যায়, ৪২ পৃ.।—মুহম্মদ আবুতালিব।

আলীকুলী বেগের সময় এ দরগাহ্ শিয়া অনুষ্ঠানের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখনও শিয়া অনুষ্ঠান এখানে হয়। এতে ধারণা করতে অসুবিধ হয় না যে, এ দরগা একজন শিয়া ফকীরের।

কুমারপুর মাযার ও মসজিদ

কুমারপুর ঢিবির (কুমারপুর-বিজয়নগর ইত্যাদি দ্র.) দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি পাকা কবরের উপর একটি স্মৃতি-সৌধের ধ্বংসাবশেষ আছে। ইট ও কাল পাথরে তৈরি এই ইমারতের ইটগুলি খুব সম্ভব স্থানীয়ভাবে তৈরি, কিন্তু পাথরগুলি যে কোনো প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগ্রহ করে এখানে লাগান হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। যে ঢিবির উপরে মাযারটি অবস্থিত সেটিও যে হিন্দু-বৌদ্ধ আমলের কোনো ইমারতের ধ্বংসাবশেষ তাতেও বোধহয় কোনো সন্দেহ নেই।

বর্গাকারে নির্মিত এই ইমারতের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য বাইরের দিক থেকে ৭.০১ মিটার ও ভিতরের দিক থেকে ৫ মিটার। চারকোণে ৪টি অষ্টকোণাকৃতির মিনার ছিল। মিনারগুলিতে নানা রকম কারুকার্য ছিল। এগুলি বর্তমানে ভেঙ্গে পড়েছে। মাটিতে পড়ে থাকা একটি মিনার দেখে ধারণা হয় যে, এগুলির শীর্ষ দেশে ছোট আকারের গম্বুজ ছিল।

পূর্ব দেয়ালের কেন্দ্রস্থলে মাযারের একমাত্র প্রবেশপথ। সেটি ছিল ১.৩০ মিটার প্রশস্ত। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের মধ্যভাগে ছিল দুটি আয়তাকার কুলঙ্গি। খুব সম্ভব বাতি রাখার জন্য এগুলি ব্যবহৃত হত। পশ্চিম দেয়ালে ছিল মিহরাব আকারে নির্মিত ৩টি কুলঙ্গি। মধ্যেরটি অপেক্ষাকৃত বড়। পশ্চিম দিকে, মিহরাবের পিছনে, দেয়াল বাইরের দিকে উদগত। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের কুলঙ্গির দুই পাশে দুটি ছোট স্তম্ভ ছিল। পাকা কবরের উপর তিন থাকে ৭ খণ্ড কালপাথর সাজান ছিল। বর্তমানে একখণ্ড পাথর নেই। কবরের চার পাশের মেঝে পাকা ছিল এবং এতে নানা রকম কাজ করা ছিল। উপরে এককালে গম্বুজ ছিল। সেটি সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে পাকা কবরটি বর্তমানে উন্মুক্ত আকাশের নিচে আছে।

কবরের উপর ৩টি শিলালিপি আছে। কবরের উপরে মাথার দিকে যে ভগ্ন লিপিটি আছে তা 'হু-আল ফাতাহ' (তিনি একাই বিজয়ী) বলে জনাব এ, বি, এম, হোসেন বলেন।[১] এর পূর্ব পাশে যে আরবী লিপিটি আছে তার অর্থঃ[২] পৃথিবীতে যা আছে সব ধ্বংস হবে। সম্মান, প্রাচুর্য ও প্রভুত্বপূর্ণ তোমার প্রভুর চেহারা [চিরদিন] অটুট থাকবে। পশ্চিম দিকে ফারসী ভাষায় যে লিপিটি আছে তার অর্থ হচ্ছে,[৩]

> যদি কোন ব্যক্তি এই ইমারতের প্রস্তর এখান থেকে সরিয়ে ফেলে,
> তবে পবিত্র কোরান দু'জাহানে তাহার শত্রু হবে;
> হাজার দুঃখ ও অভিশাপ তার উপর পতিত হবে;
> দোজখের আগুনে সে [দগ্ধ] হবে [এবং] সে পরিত্যক্ত হবে।

---

১. Kumarpur Tomb.—Mr. A.B. M. Hussam. Journal of the Varendra Research Museum 1972, pp. 86-87.

২. প্রাগুক্ত।

৩. প্রাগুক্ত।

তৃতীয় চরণের পাঠে ভুল আছে বলে জনাব হোসেন বলেছেন।[১] শিলা লিপিগুলিতে যে মাযার নির্মাণের সন, তারিখ এবং এখানে কে শায়িত আছেন, সে সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই, তা বলাই বাহুল্য। ইমারতের গঠনপদ্ধতি ও স্থাপত্য কৌশল দেখে বোঝা যায় যে, এটি মোঘল আমলের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত হয়েছিল। স্থানীয় লোকেরা এটিকে মোকাররম শাহ্ নামক এক জন অজ্ঞাত পরিচয় দরবেশের মাযার বলে পরিচয় দিলেও মাযারটি দেখে আমাদের ধারণা হয় যে, এটি কোনো রাজপুরুষের স্মৃতি-সৌধ হিসাবে নির্মিত হয়েছিল।

সম্প্রতি জনাব এ, বি, এম, হোসেন রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের জার্নালে এ মাযার সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন।[২] রাজশাহী শহরের মখদুম শাহ্‌র সাগরেদ মীর্জা আলীকুলী বেগের কবরের উপর এ দরগা নির্মিত হয়েছিল বলে জনাব খোন্দকার আখতার আলী নামক এক ব্যক্তি উনবিংশ শতাব্দীতে এককানি হস্তলিখিত পুস্তকের উপর ভিত্তি করে 'হজরত শাহ্ মখদুম ও মহাকালের গড়ের ইতিকথা' নামক গ্রন্থে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

তিনি আরও বলেন যে, হজরত মোকররম শাহ্‌র কবর নাকি কুমারপুর অঞ্চলে আজও অনাবিষ্কৃত অবস্থায় আছে। এসব উক্তির পিছনে সত্য কতটা আছে, তা বলা কঠিন। মীর্জা আলীকুলী বেগের মাযার হলে এটি সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের হবে বলে ধরে নিতে হবে। আলীকূলী বেগ কেন এই পরিত্যক্ত স্থানে নিজের সমাধি নির্মাণ করেছিলেন, তা বোধগম্য হচ্ছেনা। মখদুম শাহ্‌র ভক্ত হিসাবে সেখানেই তার মাযার হওয়ার কথা।

এই মাযারের বাইরে পূর্বদিকে আরও ৩টি পাকা কবর আছে। দুটি কবর কাল ও সাদা পাথরে তৈরি ও তৃতীয় কবরটি অমসৃণ ধূসর রঙের পাথরের তৈরি। এগুলি কার কবর তা জানা যায়নি।

মসজিদ : কুমারপুর গ্রামে একটি পুরাতন ও জীর্ণ মসজিদের কাছে গাছতলায় একটি প্রাচীন আরবি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয় বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। জনাব বেলাল-উদ্-দীন নামক একজন আইনজীবী এটি সংগ্রহ করেন। শিলালিপির পাঠ থেকে জানা যায় যে, মাহমুদ শাহ্ সুলতান-ই-গাযীর পুত্র গিয়াস-উদ্-দীন বাহাদুর শাহর রাজত্বকালে সোলায়মান কর্তৃক এই মসজিদ ও প্রাচীর নির্মিত হয় ৯৬৬ হিজরী (১৫৫৮ খ্রিঃ) সনে।

অধ্যাপক শরফ-উদ্-দীনের মতে যে মসজিদের কাছে শিলালিপিটি পাওয়া গিয়েছিল, সেটির বয়স ২০০ বছরের বেশি নয়। অথচ এ শিলালিপির বয়স ৪০০ বছরের কিছু বেশি। তিনি ও পরে জনাব শামসুদ্দিন আহমদ অভিমত প্রকাশ করেন যে, শিলালিপিটি খুব সম্ভব মান্দা থানার কোনো মসজিদের ধ্বংসাবশেষ থেকে আনিয়ে কুমারপুরের অনেক পরবর্তীকালে নির্মিত এ মসজিদে লাগান হয়েছিল (কুসুম্বা মসজিদ দ্র.)। এই অভিমত গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। এ প্রসঙ্গে কুসুম্বার এক গম্বুজ মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দ্র:।

---

১. প্রাগুক্ত।
২. প্রাগুক্ত।

পুঠিয়ার মন্দিরসমূহ

নাটোর-রাজশাহী পাকা সড়কের দক্ষিণ দিকে ও নাটোর থেকে প্রায় ১০ মাইল পশ্চিম, পশ্চিম-দক্ষিণে অবস্থিত পুঠিয়া নামক স্থানে একটি প্রসিদ্ধ জমিদার বংশ ছিল। এখানে বেশ কয়েকটি হিন্দু মন্দির আছে। মন্দিরগুলির কোনটাই অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর আগে নির্মিত নয়। কিন্তু এগুলির গঠন প্রণালীতে যে অভিনবত্ব আছে এবং পোড়ামাটির চিত্রফলক শিল্পের যে প্রাচুর্য ও উন্নত মান দেখা যায়, তাতে মন্দির গুলি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এগুলির মধ্যে, ১। গোবিন্দ মন্দির, ২। দোলমঞ্চ, ৩। শিব মন্দির, ৪। গোপাল মন্দির ও ৫। জগদ্ধাত্রী মন্দির উল্লেখযোগ্য। এখানে শিবসাগর ও গোবিন্দ সাগর নামক দুটি বিরাট জলাশয়ও আছে।

দোলমঞ্চ

বর্গাকারে নির্মিত এই ৪ তল বিশিষ্ট মন্দির একটি বিরাট ইমারত। এই মন্দিরের প্রত্যেক বাহু ২১.৫৪ মিটার দীর্ঘ। মাটির তৈরি দোলমঞ্চের আকারে মন্দিরটি থাকে থাকে উপরে উঠে গেছে। অর্থাৎ মন্দিরের দ্বিতল নিচের তলা থেকে ছোট, ত্রিতল দ্বিতলের চেয়ে ছোট এবং ত্রিতলের উপরে চতুর্থ তলটি আরও ছোট। চতুর্থ তলের উপরে আছে মন্দিরের গম্বুজাকৃতির চূড়া। চূড়ার শীর্ষদেশ 'ফিনিয়েল' দ্বারা শোভিত। প্রত্যেক তলের চারদিকে প্রশস্ত টানা বারান্দা।



▲ দোলমঞ্চ, পুঠিয়া

নিচতলার প্রত্যেক বাহুতে অর্ধবৃত্তাকার খিলানের সাহায্যে ৭টি করে প্রবেশপথ (arch) আছে। দ্বিতলের প্রত্যেক বাহুতে ৫টি করে, ত্রিতলের প্রত্যেক বাহুতে ৩টি করে এবং চতুর্থ তলের প্রত্যেক বাহুতে ১টি করে একই ধরনের প্রবেশপথ আছে।

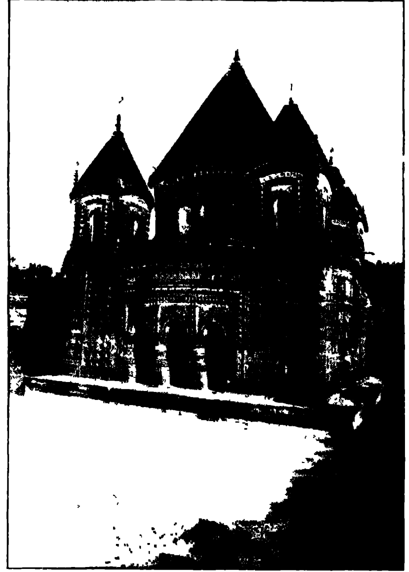
মন্দিরের কার্নিশ ও প্যারাপেট সরল রেখায় নির্মিত। মাটি থেকে এ মন্দির ২০ মিটার উঁচু। দক্ষিণমুখী এ মন্দিরের সম্মুখে মাঠ ও মাঠের দক্ষিণেই রাজবাড়ি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে পুঠিয়ার পাঁচ আনী জমিদার বাড়ির রাণী হেমন্ত কুমারী দেবী কর্তৃক এই মন্দির নির্মিত হয়।

গোবিন্দমন্দির

পুঠিয়া পাঁচ আনী জমিদার বাড়ির (রাজবাড়ি) অঙ্গনে অবস্থিত গোবিন্দমন্দির একটি উল্লেখযোগ্য ইমারত। ইষ্টকনির্মিত একটি উঁচু বেদীর উপর এ মন্দির প্রতিষ্ঠিত। বর্গাকারে নির্মিত এ মন্দিরের প্রত্যেক বাহু ১৪.৬ মিটার দীর্ঘ। মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে আছে একটি কক্ষ। বর্গাকারে নির্মিত এই কেন্দ্রীয় কক্ষ বা গর্ভগৃহের প্রত্যেক বাহু ৪ মিটার দীর্ঘ। কেন্দ্রীয় কক্ষের চারদিকে বারান্দা। মন্দিরের চার কোণে ৪টি কক্ষ আছে। বর্গাকারে নির্মিত এই কক্ষগুলি সম আয়তনের এবং এগুলির প্রত্যেক বাহু ৩ মিটার দীর্ঘ।

মন্দিরের কার্নিশ ঈষৎ বাঁকান। উপরে আছে ৫টি চূড়া বা রত্ন। কেন্দ্রীয় কক্ষের চূড়াটি সর্বাপেক্ষা বড় ও উঁচু। চারকোণের ৪টি কক্ষের উপরে অবস্থিত চূড়াগুলি আকারে ও উচ্চতায় অপেক্ষাকৃত ছোট। চূড়াগুলি চতুষ্কোণ আকারে নির্মিত কক্ষের উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং ঊর্ধ্বাংশে চারকোণাকারে ক্রমশ সরু হয়ে উপরে উঠে গিয়ে শেষ হয়েছে।



▲ পঞ্চরত্ন গোবিন্দ মন্দির, পুঠিয়া. রাজশাহী

মন্দির গাত্রে অসংখ্য ে আছে। রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনীর রূপায়ণ ছাড়াও গুলির মাধ্যমে আঞ্চলিক প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের ছবিও তুলে ধরা হয়েছে। এবং এদিক দিয়েই মন্দিরটির বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য।

এ মন্দির প্রায় ২৫০ বছর আগে নির্মিত বলে কথিত হলেও মন্দিরে যে সমস্ত পোড়ামাটির চিত্রফলক আছে, সেগুলি দেখে, ধারণা হয় যে, এ মন্দির উনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল।

শিবমন্দির

বর্গাকারে নির্মিত এই শিবমন্দির পুঠিয়ার মন্দিরগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এর প্রত্যেক বাহু ২০ মিটার দীর্ঘ। এর প্রত্যেক বাহুতে ৫টি করে অর্ধবৃত্তাকারে নির্মিত খিলানবিশিষ্ট প্রবেশপথ আছে। এগুলির মধ্যে দু'পাশের ২টি প্রবেশপথ বেশ চওড়া এবং মাঝের ৩টি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ।

মন্দিরের উপরে চারকোণে ৪টি ও কেন্দ্রস্থলে ১টি চূড়া বা রত্ন আছে। কোণের চূড়াগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের। কেন্দ্রীয় চূড়াটি বেশ বড় ও উঁচু। মাটি থেকে এ চূড়ার সর্বোচ্চ অংশ ২০ মিটার উঁচু। চতুষ্কোণাকৃতির কাঠামোর উপরে পিরামিড আকৃতির চূড়াগুলি নির্মিত হয়েছে। এ গুলির চারপাশে সন্নিবেশিত রয়েছে বিভিন্ন স্তরে মোচার আকারে নির্মিত অসংখ্য ছোট ছোট চূড়া। এই মোচার আকারের চূড়াগুলি, প্রত্যেক কোণের চূড়াতে তিন স্তরে এবং কেন্দ্রীয় চূড়াতে পাঁচটি স্তরে নির্মিত।



দক্ষিণমুখী শিবমন্দির

মন্দির গাত্রের বাইরের দেয়ালের পলেস্তারা বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীর চিত্র দ্বারা অতি সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত ছিল। বর্তমানে এ সমস্ত অলঙ্করণের অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গেছে।

১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে পাঁচআনী জমিদার বাড়ির রাণী ভুবনময়ী দেবী এ মন্দির নির্মাণ করেন। এ মন্দিরকে ভুবনেশ্বর মন্দিরও বলা হয়ে থাকে।

গোপাল মন্দির

বর্গাকারে নির্মিত গোপাল মন্দিরের প্রত্যেক বাহু ১০.৪৭ মিটার দীর্ঘ। এক কক্ষ বিশিষ্ট এ মন্দিরের দক্ষিণ ও পূর্বদিকে সংকীর্ণ ঢাকা বারান্দা আছে। মন্দির গাত্র রাধাকৃষ্ণের লীলার বিভিন্ন চিত্র, বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি এবং রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনী মৃৎফলকের চিত্র দ্বারা অলঙ্কৃত। এ মন্দির উনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল।



গোপাল মন্দির, পুঠিয়া, রাজশাহী

জগদ্ধাত্রী মন্দির

আয়তাকারে নির্মিত এ মন্দিরের আয়তন ১৬.৩০ মিটার × ১০.৪৭ মিটার এবং উচ্চতা ৮ মিটার। দক্ষিণ মুখী এ মন্দিরে

৩টি কক্ষ আছে। সামনের দিকে আছে সংকীর্ণ বারান্দা। দেয়ালে পলেস্তারার উপরে নক্সার কাজ অত্যন্ত সীমিত। এ মন্দির অপেক্ষাকৃত হাল আমলে নির্মিত।

বিড়ালদহ মাযার

নাটোর-রাজশাহী পাকা সড়কের উত্তর পাশে ও পুঠিয়া থানার অধীনে একটি মাযার আছে। মাযারটির উপরে যে ছাদ আছে তা অনেক পরবর্তীকালে নির্মিত সমতল ছাদ। খুব সম্ভব মাযারটিও সেই সময়ে সংস্কার করে আধুনিক ইমারত হিসাবে নির্মাণ করা হয়েছে।

কিন্তু মাযারের পূর্বদিকে একটি ছোট দোচালা ইমারত আছে। এটি মাযার অঙ্গনের প্রবেশপথ। এই দোচালা ইমারতটি খুব সম্ভব মোঘল আমলের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত হয়েছিল।

আছিনঘাট মসজিদ

বাগমারা থানার অধীনে অবস্থিত আছিনঘাট একটি প্রাচীন স্থান। এখানে সুলতানী আমলের একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আছে বলে কাজী মেছের 'রাজশাহীর ইতিহাস' নামক গ্রন্থে (২য় খণ্ড, ২১০ পৃ.) উল্লেখ করেছেন। ৫ গম্বুজ, ৫ দরজা ও ৫ মিহরাব বিশিষ্ট এ মসজিদের পূর্বদিকের দেয়াল ছাড়া বাকি ৩ দিকের দেয়ালের অংশবিশেষ ও প্রস্তরস্তম্ভের মূল অংশ এখনও টিকে আছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে এই ধ্বংসাবশেষের উপর একটি জুম্মাঘর নির্মিত হয়েছে। মসজিদের কাছে ২টি বাঁধান কবর 'পাঁচ পীরের সমাধি' নামে পরিচিত।

এখানে মোঘল আমলের এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি ছোট মসজিদ আছে বলেও কাজী মেছের উল্লেখ করেছেন। মসজিদের যে ফটো দেওয়া হয়েছে (২১১ পৃ.) তাতে দেখা যায় যে মসজিদের চারকোণে অষ্টকোণাকৃতির ৪টি মিনার আছে এবং মিনার ও মসজিদের সম্মুখ দেয়ালে কিছু প্যানেলের কাজ করা ছিল।

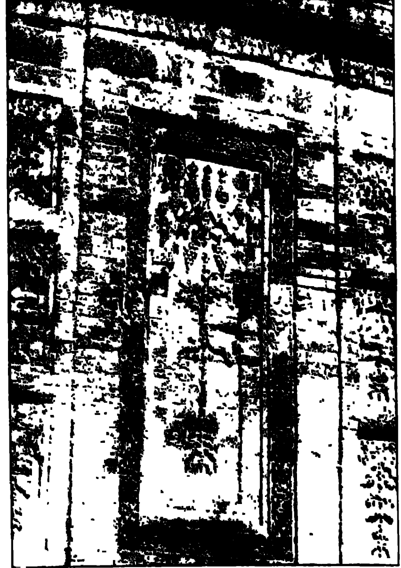
বাঘা মসজিদ

রাজশাহী শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বদিকে, লালপুর থানা থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার পশ্চিমে ও চারঘাট থানা থেকে প্রায় ১৭ কিলোমিটার পূর্ব দিকে অবস্থিত বাঘা নামক স্থান এককালে গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। বাঘ-ভল্লুক ইত্যাদি হিংস্র জন্তুর আড্ডা ছিল সেই জঙ্গলময় স্থানে এবং এগুলির ভয়ে মানুষ সেখানে যেতেন না।

কথিত আছে যে, সুলতান আলা-উদ্-দীন হোসেন শাহ্‌র আমলে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) পশ্চিম দেশ থেকে একজন মুসলিম ফকীর পাঁচজন সঙ্গী নিয়ে শ্বাপদসঙ্কুল এই গভীর জঙ্গলে আস্তানা গাড়েন। কালক্রমে সেই ফকীরের দৌলতে জঙ্গল পরিষ্কৃত হয়ে সেখানে বসতি গড়ে ওঠে। হযরত মওলানা শাহ মোয়য্‌যেম-উদ্-দৌলা বা মোহাম্মদ-দৌলা ওরফে শাহ্ দৌলা নামে পরিচিত এ দরবেশের সুদূর প্রসারী খ্যাতি ও কেরামতির

ফলে বহু শিষ্য-সাগরেদের আবির্ভাব এখানে ঘটে। ব্যাঘ্রঅধ্যুষিত এ স্থান আবাদকৃত হওয়ার পরে বাঘা নামে পরিচিত হয়। শাহদৌলার ওফাতের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মওলানা আবদুল হামিদ দানিশমন্দ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। এ সময়ে বাঙলার সুলতান নাসির-উদ্-দীন নুসরত শাহ্ ৯৩০ হিজরী (১৫২৩ খ্রিঃ) সনে এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং মসজিদের সম্মুখ দেয়ালে একটি শিলালিপি স্থাপন করেন (বর্তমানে তা করাচী যাদুঘরে আছে বলে জানা গেছে)। [বাঘা মসজিদের রঙিন ছবি-৩২]

মসজিদ নির্মাণের সময় আনুমানিক ৪০০ মিটার × ২০০ মিটার আয়তনের একটি জলাশয়ও খনন করা হয়। জলাশয়ের তীরে প্রায় ৪৮ মিটার বাহু বিশিষ্ট বর্গাকারের এক-খণ্ড উঁচুভূমি। প্রাচীর ঘেরা এই উঁচুভূমির পশ্চিমাংশে এ মসজিদ অবস্থিত। উত্তর ও দক্ষিণ বেষ্টনী-প্রাচীরে একটি করে প্রবেশপথ আছে। উত্তর প্রাচীরের প্রবেশপথ নতুন করে নির্মিত হয়েছে। দক্ষিণ দেয়ালের প্রবেশপথে অষ্টকোণাকৃতির স্তম্ভ, খিলান ও উপরে একটি গম্বুজ আছে। তোরণের দু'ধারে ইটের দেয়ালের উপর লতাপাতা, ফুল ইত্যাদির প্রতিকৃতির সূক্ষ্ম কাজ করা পোড়ামাটির চিত্রফলক আছে।



টেরাকোটা অলংকরণ, বাঘা মসজিদ, রাজশাহী

উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ মসজিদের আয়তন ২২.৯২ মিটার × ১২.৭৮ মিটার এবং দেয়ালগুলি ২.২২ মিটার প্রশস্ত। পূর্ব দেয়ালে আছে খিলানবিশিষ্ট ৫ টি প্রবেশপথ। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে আছে দুটি করে প্রবেশপথ। মসজিদের চারকোণে ৪টি বিরাট আকারের অষ্টকোণাকৃতির মিনার (turret) আছে। মিনারগুলি কারুকার্যখচিত। শীর্ষদেশ গম্বুজাকৃতির এবং সেগুলি এখনও টিকে আছে। উত্তর দেয়ালের দরজা দুটি 'গ্র্যাটিংস' দ্বারা বন্ধ করা। খুব সম্ভব পরবর্তীকালের কাজ। পশ্চিম দেয়ালে কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের বরাবর মসজিদের কেন্দ্রীয় মিহরাব। কেন্দ্রীয় মিহরাবের দক্ষিণ দিকে পূর্ব দেয়ালের দক্ষিণ দিকের দরজা দুটির বরাবর দুটি মিহরাব। উত্তর দিকে চতুর্থ মিহরাবের স্থানে একটি কারুকার্য খচিত 'প্যানেল (panel) এবং পঞ্চম মিহরাবের উপরে দ্বিতলে আছে একটি ছোট মিহরাব। শেষোক্ত মিহরাবের অস্তিত্ব দেখে ধারণা হয় যে, ছোট সোনা মসজিদের মতো (ছোট সোনা মসজিদ দ্র.) সেখানে দ্বিতলে একটি ছোট কক্ষ ছিল।

মিহরাবগুলিতে অতি সুন্দর কারুকার্য আছে। মিহরাবের দু'পাশে ও উপরে আছে একটি 'ফ্রেম'। ফ্রেমের উপর নানারকম লতাপাতা ও ফুলের প্রতিকৃতি অতি সুন্দরভাবে

করা। এই অলঙ্কৃত ফ্রেমের ভিতর দিকে দু'পাশে আছে দুটি অলঙ্কৃত স্তম্ভ। স্তম্ভ দুটির ফাঁকে ভিতরে আছে মিহরাবের ভিতরের অংশ। সেখানেও অতি সুন্দরভাবে বিভিন্ন প্যানেলের উপর কারুকার্য করা। মিহরাবের ফ্রেমের বাইরে প্যানেলের উপর লতাপাতা, ফুল, ঝুলন্ত আঙ্গুর গাছ ইত্যাদির প্রতিকৃতি পোড়ামাটির চিত্রফলকে অতি মনোরমভাবে রূপায়িত করা হয়েছে।

মসজিদের অভ্যন্তরীণ অংশ উত্তর-দক্ষিণে দু'সারিতে (aisles) ও পূর্ব পশ্চিমে পাঁচ ভাগে (bays) বিভক্ত। প্রত্যেক সারিতে ৫টি করে মোট ১০ টি গম্বুজ ছিল। চারপাশের দেয়াল ও মসজিদের অভ্যন্তরে অবস্থিত ৪টি প্রস্তর স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত গম্বুজগুলি ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের প্রবল ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। হাল আমলে (১৯৮০ খ্রিঃ) গম্বুজগুলি নূতন করে বসান হয়েছে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক।

টেরাকোটা শিল্পের অতুলনীয় নিদর্শন মসজিদের দেয়ালের বাইরের দিকেও আছে। প্রবেশপথের পার্শ্বে ও উপরে বিভিন্ন প্যানেলে পোড়ামাটির ফলকে লতাপাতা, ফুল, টব থেকে গজিয়ে ওঠা ফলন্ত বৃক্ষের প্রতিকৃতি অতি সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে করা। মিনার গুলিতেও অনুরূপ কাজের বিস্তর নিদর্শন আছে। এককথায় পোড়ামাটির চিত্রফলক শিল্পের অপূর্ব ও অতুলনীয় নিদর্শন মসজিদের বাইরে ও ভিতরে ছিল এবং এখনও কিছু কিছু আছে।

প্রাচীরঘেরা মসজিদ অঙ্গনের উত্তর-পূর্ব কোণে শাহদৌলা, তাঁর পাঁচ সঙ্গী ও নাম না জানা আরও অনেকের সমাধি আছে। শাহ্ আবদুল হামিদ দানিশমন্দ ও মওলানা শের আলীর সমাধিও এখানে আছে। শাহ্ দৌলা এখানে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেই মাদ্রাসা উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত টিকে ছিল বলে জানা যায়। এ মাদ্রাসার প্রথম অধ্যক্ষ নাকি ছিলেন মওলানা শের আলী।

মসজিদ, প্রাগুক্ত মাযারসমূহ, মাদ্রাসার ধ্বংসাবশেষ, দিঘি ইত্যাদি ছাড়াও মুসলিম আমলে নির্মিত আরও অনেক ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আছে বাঘাতে। শাহ্ দৌলার বংশধরদের জন্য সুলতানী আমলে ও পরবর্তীকালে নির্মিত আবাসবাটি ও অন্যান্য ইমারতাদি বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এখানে আরও আছে অনেক পীর-ফকিরের মাযার।

বাঘা মসজিদের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, সুলতান নাসির উদ্-দীন নুসরত শাহ্ ৯৩০ হিজরী (১৫২২-২৩ খ্রিঃ) সনে এই জামে' মসজিদ নির্মাণ করেন। শিলালিপিতে শাহ্দৌলা বা তাঁর পুত্র আবদুল হামিদ দানিশমন্দের কোনো উল্লেখ নেই। যুবরাজ খুরম (পরে সম্রাট শাহ্জাহান) ১০৩০ হিজরী (১৬২৩-২৪ খ্রিঃ) সনে শাহ্ আবদুল হামিদ দানিশমন্দের তৃতীয় পুত্র শাহ্ আবদুল ওহাবকে বাৎসরিক ৮০০০ টাকা আয়ের ৪২ টি মৌজা 'মদদ মাস' হিসাবে দান করেম বলে কাজী মেছের তাঁর রাজশাহীর ইতিহাস' নামক গ্রন্থে (২য় খণ্ড, ২৩১ পৃ.) উল্লেখ করেছেন এবং রাজশাহী কালেক্টরীতে সেই দলীলের নকল আছে বলেও তিনি বলেছেন। এতে দেখা যাচ্ছে যে, মসজিদ নির্মাণের ঠিক ১০০ বছর পরে এ দান করা হয়েছিল। যদি এ মসজিদ শাহ দৌলার সময়ে নির্মিত হয়ে থাকে তবে মেনে নিতে হবে যে, তিনি বা তাঁর পুত্র শাহ্ দানিশমন্দ

অত্যন্ত দীর্ঘজীবী ছিলেন এবং তাঁদের একজন বা উভয়েরই পুত্র খুব শেষ বয়সে হয়েছিলেন। নতুন শিলালিপি ও মদদ মাসের তারিখ দুটির মধ্যে যে ১০০ বছরের ব্যবধান আছে তা সমন্বয় করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

বিরাট দিঘির এক কোণে (দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে) মসজিদের অবস্থান দেখে অতি যুক্তিসঙ্গত কারণেই ধারণা করা যায় যে, দিঘিটি আগে থেকেই অস্তিত্বশীল ছিল।



বাঘা মসজিদের মেহরাব

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ

মেহেরপুর জেলায় অতি সীমিত সংখ্যার যে ক'টি হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আছে, সেগুলি সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না।

আমদহের ধ্বংসাবশেষ

মেহেরপুর মহকুমা শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার দক্ষিণে, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত থেকে কিছু পুর্বদিকে আমদহ নামক একটি প্রাচীন স্থান আছে। প্রায় ১.৫ কিলোমিটার লম্বা ও প্রায় ১ কিলোমিটার চওড়া একটি স্থান জুড়ে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এ স্থানের পশ্চিম পাশ দিয়ে এককালে একটি ছোট নদী প্রবাহিত হত ' বর্তমানে (১৯৭৬ খ্রিঃ) সেই নদীর কোনো অস্তিত্ব নেই, কিন্তু খাতটি টিকে আছে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে অন্য তিন দিক দিয়ে ছিল পরিখা। উত্তর দিকের পরিখাটি এখনও দেখা যায়। বর্তমানে খুব প্রশস্ত না হলেও এককালে এটি যে বেশ বড় আয়তনের ছিল, তা সহজেই বোঝা যায়। দক্ষিণ দিকের পরিখার ক্ষীণ অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান। কিন্তু পূর্বদিকের পরিখার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি। খুব সম্ভব ছিল, ক্রমবর্ধমান মানুষের চাপে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পরিখা সংলগ্ন কোনো প্রাচীর ছিল কিনা, তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে কোন প্রাচীরের চিহ্ন কোথাও দেখা যায়নি।

এ স্থানে এককালে যে অসংখ্য ইমারতাদি ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বর্তমানে সমগ্র এলাকায় চাষের কাজ করার চেষ্টা চলছে এবং প্রাচীন ইমারতগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করে ফসল ফলান হচ্ছে। কিন্তু সমগ্র স্থানে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য প্রাচীন ইট ও ইটের ভগ্নাংশ। কৃষকেরা মাটিতে লাঙল দিতেই প্রাচীন ইট বের হয়ে পড়ে। আর তারা সে সব ইট ক্ষেতের আলে জড়ো করে রাখেন। এ রকম অসংখ্য ইটের স্তূপ আমাদের নযরে পড়েছে।

সমগ্র এলাকায় ৯টি ছোট বড় ঢিবি এখনও টিকে আছে। এগুলিতে প্রচুর প্রাচীন ইট আছে। কোনো কোনো ঢিবিতে ছোট বড় পাথরের টুকরাও দেখা গেছে। সে সব ঢিবির ধারে কাছে এবং সমগ্র স্থান জুড়ে আছে অসংখ্য মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ (pot-sherds)। ঢিবিগুলির উত্তর দিকে, উত্তর দিকের পরিখার বাইরে অপেক্ষাকৃত একটি উঁচু স্থানে বেশ কয়েক খণ্ড পাথর পড়ে আছে। এগুলি কোনো ইমারতের স্তম্ভ ছিল বলে

ধারণা হয়। এখান থেকে সংগৃহীত একটি বিরাট আকারের প্রস্তরস্তম্ভ বর্তমানে (১৯৭৬ খ্রিঃ) মেহেরপুর মহকুমা প্রশাসকের সরকারি আবাসগৃহের উদ্যানে প্রোথিত আছে।

এখানকার ইটগুলি বিভিন্ন মাপের। বেশির ভাগ ইটের মাপ '৮´´ × ৮´´ × ২´´'। '৬½ × ৬½ × ২´´' মাপের ইটও পাওয়া যায়। এগুলির চেয়ে বড় এবং ছোট মাপের ইটও এখানে পাওয়া যায়। ইটগুলি খুবই প্রাচীন বলে মনে হয়।

এ স্থানের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। স্থানীয় লোকেরা বলেন, এখানে এক বিরাট রাজার বাড়ি ছিল, কিন্তু কোন্ রাজার বাড়ি, তা কেউ বলতে পারে না। এখানকার ধ্বংসাবশেষগুলি দেখে মনে হয় যে, এককালে এখানে একটি বিরাট আকারের বৌদ্ধ বিহার ছিল এবং সেই বিহারের ধারে কাছে ছিল অসংখ্য বৌদ্ধ স্তূপের অস্তিত্ব। এখন পর্যন্ত যে সব ঢিবি টিকে আছে, সে গুলিতেই ছিল খুব সম্ভব বৌদ্ধ স্তূপের অস্তিত্ব। বিহারটি খুব সম্ভব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

এখানে মাঝে মাঝে প্রাচীন কালের মুদ্রা পাওয়া যায় বলে স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে জানা গেছে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও এখানকার কোনো মুদ্রা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

খনন না করে এস্থান সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা যায় না। তবে এখানে পাল যুগে, কি তারও আগে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল বলে মনে হয়। প্রাচীন কালে অবিভক্ত নদীয়া জেলায় 'সুবর্ণ বিহার' নামক একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল।[১] আলোচ্য আমদহের ধ্বংসাবশেষ গুলি সেই সুবর্ণ বিহারেরই কিনা, সে সম্বন্ধে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে।

মুসলিম আমল

মুসলিম যুগের পুরাকীর্তির নিদর্শনও এ জেলায় খুব বেশি নেই। মোঘল আমলের কিছু কিছু মন্দির-মসজিদের সন্ধান পেলেও সুলতানী আমলের কোনো কীর্তি এ জেলাতে আছে বলে জানা যায় না।

বল্লভপুরের মন্দিরসমূহ

মেহেরপুর মহকুমায় (বর্তমানে জেলা) অবস্থিত আমদহ (আমদহ দ্র.) থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে সীমান্তের অত্যন্ত কাছাকাছি স্থানে একটি খ্রিস্টান পল্লী এবং আধুনিক গীর্জা সহ একটি খ্রিস্টান ধর্মকেন্দ্র আছে। খ্রিস্টান পল্লীর দক্ষিণ দিকে একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে বেশ কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। প্রায় এক বিঘা পরিমিত অনুচ্চ প্রাচীর ঘেরা স্থানে এ মন্দিরগুলি অবস্থিত। বর্তমানে প্রাচীরগুলির সামান্য অংশই মাটির উপরে টিকে আছে। পূর্বদিকে রাস্তার পাশেই ছিল পূর্বদিকের বেষ্টক প্রাচীর এবং সে খানেই ছিল মন্দির অঙ্গনের প্রধান প্রবেশপথ :

১. কোচবিহারের ইতিহাস ৫ পৃ.। খান চৌধুরী আমানত উল্লা আহমদ।

মাঝখানে ছিল কেন্দ্রীয় মন্দির। কেন্দ্রীয় মন্দিরের দক্ষিণ দিকে এক সারিতে ছিল ৩টি মন্দির, পশ্চিম দিকে এক সারিতে ছিল ২টি মন্দির এবং উত্তর দিকে ছিল লম্বাটে ধরনের একটি ইমারত। কেন্দ্রীয় মন্দিরসহ এখানে মোট ৭টি মন্দির ছিল।

কেন্দ্রীয় মন্দিরটি অপেক্ষাকৃত বড়। মন্দিরটি এমনভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে যে, এর আকার ও আয়তন সঠিকভাবে নির্ধারণ করা কঠিন। তার উপর এরিমধ্যে গজিয়েছে কাঁটালতা ও ঝাড়-জঙ্গল। তবে যতটুকু ধারণা হয়, বর্গাকৃতির এ মন্দিরের আয়তন ছিল প্রায় ৪.৮৪ মিটার × ৪.৮৪ মিটার। দেয়ালগুলি ছিল প্রায় ১ মিটার প্রশস্ত। বর্গাকারে নির্মিত গর্ভগৃহের ভিতরের আয়তন ছিল প্রায় ১.৫৪ মিটার × ১.৫৪ মিটার। এর চারদিকে ছিল বারান্দা। গর্ভগৃহের দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব দেয়ালে ১টি করে প্রবেশ পথ ছিল। উত্তর দিক বন্ধ ছিল এবং সেখানেই ছিল খুব সম্ভব কুলঙ্গির মধ্যে বিগ্রহের অবস্থানস্থল।

মন্দিরের বারান্দার ছাদ ধ্বংস হয়ে গেছে বলে এর প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করা মুশকিল। তবে গর্ভগৃহের উপরে যে অংশটি আছে, তা মঠের আকারে উপরে উঠে গেছে। খুবসম্ভব বারান্দার অংশেও এ ধরনের শিখর ছিল এবং এটি ছিল খুব সম্ভব একটি পঞ্চরত্ন মন্দির। মন্দিরের গর্ভগৃহের উপরে যে চূড়াটি আছে, তা প্রায় ৬.০৬ মিটার উঁচু।

পার্শ্ববর্তী আরও দু-একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখে মনে হয় যে, বাকি মন্দিরগুলিও একই ধরনের নির্মিত হয়েছিল। তবে উত্তর দিকের মন্দিরটির কথা সঠিকভাবে বলা যায় না। অন্য ৬টি মন্দির বর্গাকৃতির হলেও এটি ছিল খুব সম্ভব আয়তাকারের এবং এর ছাদও বোধ হয় ভিন্ন ধরনের ছিল।

মন্দিরগুলির কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না। এখানকার অধিবাসীরা প্রায় সবাই খ্রিস্টান এবং এ অঞ্চলের খুব পুরাতন অধিবাসী বলে মনে হয় না। এরা এ সম্পর্কে কিছুই বলতে পারেন না। কেউ কেউ বলেন যে, এগুলি প্রাক মুসলিম যুগে নির্মিত বৌদ্ধ মন্দির। কিন্তু মন্দিরগুলিতে ব্যবহৃত মোঘল আমলের ছোট ছোট পাতলা ইট ও মন্দিরের খিলান নির্মাণের পদ্ধতি দেখে সহজেই ধারণা করা যায় যে, এগুলি মোঘল আমলের খুব সম্ভব ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নির্মিত হয়েছিল। এগুলি ছিল খুব সম্ভব নাথ সম্প্রদায়ের মন্দির। এ স্থানের ধারে কাছে যোগী সম্প্রদায়ের বসতি এককালে ছিল বলে জানা যায়।

এস্থান থেকে ১.৫ কিলোমিটার দক্ষিণ দিকে একটি প্রাচীন দিঘি আছে। দিঘির ঘাট বাঁধান ছিল। দিঘির পূর্ব তীরে প্রাচীরবেষ্টিত একটি উঁচু স্থানে এককালে একটি বিরাট আকারের বসতবাড়ি ছিল। এটি কোন্ সময়ের, তা বলা কঠিন। এই ধ্বংসাবশেষের কিছু দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটি একক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। খুব সম্ভব পূর্বোক্ত মন্দিরগুলির সমসাময়িক ছিল খোলা মাঠের উপরে অবস্থিত এ মন্দির। এটি কোনো মঠও হতে পারে।

বলরাম হাড়ির মন্দির

মেহেরপুর শহরের বাইরে পশ্চিম দিকে বলরাম হাড়ির মন্দির বলে পরিচিত একটি বিচিত্র ধরনের ইমারত আছে। বর্গাকারে নির্মিত এ মন্দিরের প্রত্যেক বাহু বাইরের দিকে

প্রায় ৪.৫৪ মিটার লম্বা। দেয়ালগুলি প্রায় ১ মিটার চওড়া। ভিতরের গর্ভগৃহের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য প্রায় ২.৪২ মিটার। মঠের আকারে নির্মিত এ মন্দির খুব সম্ভব উনিশ শতকে নির্মিত হয়েছিল। বলরাম হাড়ি ছিলেন অনুন্নত হাড়ি সম্প্রদায়ের গুরু। তিনি সকলের ভক্তিভাজন ছিলেন বলে জানা যায়। হাড়ি সম্প্রদায়ের লোকেরা এখানে এখনও ভীড় করেন।

ঝাউদিয়া মসজিদ

কুষ্টিয়া শহর থেকে প্রায় ২১ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ পাকা সড়ক থেকে কয়েক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ঝাউদিয়া মসজিদ মোঘল আমলের একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ মসজিদের বাইরের মাপ প্রায় ১৭.৫৭ মিটার × ৭.২৭ মিটার। দেয়ালগুলি ১.২১ মিটার প্রশস্ত। পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশপ্রথ আছে। পশ্চিম দেয়ালে ৩টি মিহরাব ছিল। বর্তমানে কেন্দ্রীয় মিহরাবটি আছে এবং পাশের দুটি মিহরাবের চিহ্ন আছে। উপরে আছে ৩টি গম্বুজ। মসজিদের পূর্ব দিকে আছে পাকা বারান্দা। বারান্দার পরেই মসজিদের আঙ্গিনা ও তার পরেই আছে সুন্দর ফটক।



ঝাউদিয়া শাহী মসজিদ, কুষ্টিয়া

মসজিদটিকে হাল আমলে প্রায় নূতন করে নির্মাণ করার ফলে এর আদিরূপ কিছুটা নষ্ট হয়েছে। মসজিদের ভিতরে ও বাইরে যে সব সুন্দর প্যানেলিং এর অলঙ্করণ ছিল, তা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

মসজিদে থেকে প্রায় ১০০ মিটার উত্তর-পশ্চিমে অপেক্ষাকৃত নিচু জমির মধ্যে একটি সাদাসিধা ধরনের মাযার গৃহ আছে। মসজিদ নির্মাণকারী চৌধুরী পরিবারের একজন সদস্য আদারি মিঞা চৌধুরীর এই মাযার। তিনি একজন কামেল ফকীর ছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে।

মসজিদে কোনো শিলালিপি নেই। তবে চৌধুরী পরিবারের ফার্সী ভাষায় লিপিবদ্ধ অনেক হস্তলিখিত কাগজপত্র আমাদেরকে দেখান হয়েছিল। অল্প সময়ের মধ্যে, অযত্নে ও এলোমেলোভাবে রক্ষিত কাগজ-পত্রগুলির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে যতদূর বোঝা গেল, তাতে মনে হল যে, পাণ্ডুলিপিটি একটি প্রাচীন ফারসী কাব্য গ্রন্থের। বর্তমান মালিক এটিকে হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানান। এ মসজিদ খুব সম্ভব সম্রাট অওরঙযেবের রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল। মসজিদ নির্মাতার বংশধর পার্শ্ববর্তী চৌধুরীরা তাঁদের বাড়িটিও সে সময়ে নির্মিত হয়েছিল বলে থাকেন। বাড়ির অবস্থা অত্যন্ত জীর্ণ হয়ে পড়েছে সংস্কারের অভাবে এবং অসংখ্য অংশীদারের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে।

স্বস্তিপুর মসজিদ

কুষ্টিয়া শহর থেকে মাত্র ৯ কিলোমিটার দক্ষিণে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ পাকা সড়কের পশ্চিম দিকে স্বস্তিপুর (শায়েস্তাপুর?) নামক গ্রামে একটি উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর এ মসজিদ অবস্থিত ছিল। আদি মসজিদটি আকারে ছোট ছিল এবং এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেলে এর উপর নতুন করে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। আদি মসজিদ নবাব শায়েস্তা খানের আমলে একরাতে নির্মিত হয়েছিল বলে প্রবল জনপ্রবাদ আছে। মসজিদের পার্শ্ববর্তী ভাদালিয়া গ্রামে একটি চৌকি ছিল এবং মসজিদের পাশ দিয়ে মুর্শিদাবাদ-ঢাকা সড়ক চলে গিয়েছিল বলে কুষ্টিয়ার ইতিহাস প্রণেতা জনাব শ, ম, শওকত আলী 'ইস্পাত' কাগজের একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে একটি বড় গম্বুজের পাশে ৪টি ছোট গম্বুজবিশিষ্ট এ মসজিদ শায়েস্তা খানের আমলে সৈন্যদের জন্য নির্মিত হয়েছিল।

ঘোলদাড়ি মসজিদ

চুয়াডাঙ্গা জেলার অধীনে আলমডাঙ্গা গ্রামের নিকটবর্তী ঘোলদাড়ী নামক স্থানে একটি মসজিদ আছে। এটি একটি প্রাচীন মসজিদ। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ৩রা মার্চ ১৯৭৪ সালে 'নিজস্ব সংবাদ দাতা' কর্তৃক প্রেরিত তথ্যে জানা যায় যে, বাংলা ৪১৩ সালে (১০০৬ খ্রিস্টাব্দে) হজরত খায়রুল বাশার ওমজ (রঃ) নাকি এ মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদের পাশে নির্মাতার মাযারও নাকি আছে। একাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে একজন মুসলিম ফকীর কর্তৃক কুষ্টিয়া জেলায় একটি মসজিদ নির্মাণের ঘটনা কল্পনারও অতীত। সে মসজিদ এতদিন টিকে থাকারও কথা নয়। এদেশে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে নির্মিত প্রায় সব ক'টি মসজিদই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এ আলোচ্য

মসজিদ একাদশ শতাব্দীর হতে পারে না। মসজিদটি দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। তবে যতদূর শুনেছি, তাতে মনে হয়, এটি মোঘল আমলে নির্মিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে সঠিকভাবে অবশ্য কিছুই বলা যায় না।

গোস্বামী দুর্গাপুরের রাধারমণ মন্দির

কোতোয়ালী থানা থেকে প্রায় ১৯ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে গোস্বামীদূর্গাপুর গ্রাম অবস্থিত। এখানে রাধারমণের একটি মন্দির আছে। এটি একটি বিখ্যাত মন্দির এবং মন্দিরগাত্রে নকশা করা ইটের সুন্দর অলঙ্করণ ছিল। মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার উপক্রম হলে ১৩১২ বঙ্গাব্দে এর সংস্কার করা হয়। মন্দিরে যে-শিলালিপি আছে, তার পাঠ নিম্নরূপ :

কালাঙ্ক বাণেন্দু মিতে শকাব্দে
জ্যৈষ্ঠে শুভ মাসি সুনির্মলাশয় :।
শ্রীকৃষ্ণ রায় : শুভ সৌধ মন্দিরা
শ্রীযুক্ত রাধা রমণায় মন্দদৌ ॥

কাল (৬), অঙ্ক (৯), বাণ (৫) ও ইন্দু (১) ধরে অঙ্কের বামাগতি অনুসারে ১৫৯৬ শকে অর্থাৎ ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণ রায় কর্তৃক এ মন্দির নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়।

খোরশেদপুর-গৌপীনাথপুর মন্দির

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিলাইদহ কুঠির কিছু পূর্বদিকে অবস্থিত এ স্থানে নাটোরের জমিদার রানীভবানী কর্তৃক খনিত একটি সুন্দর জলাশয় আছে। দিঘির পূর্বপাড়ে একজন মুসলিম ফকীরের মাযার আছে। খোরশেদ-উল-মুলক নামক এই দরবেশ নাকি বাগেরহাটের খান-ই-জাহানের (মৃত্যু ১৪৫৯ খ্রিঃ) সমসাময়িক। তাঁর নামেই নাকি এ স্থানের খোরশেদপুর নামকরণ হয়। এ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছুই বলা যায় না।

এখানে একটি হাট আছে। হাটের পূর্বদিকে একটি মন্দির ও একটি মঠ আছে। মন্দির ও মঠে পোড়ামাটির সুন্দর চিত্রফলক আছে। মন্দিরটিতে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির ফলকে যে লিপি আছে, তাতে জানা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নাটোরের মহারাজা কর্তৃক এ মন্দির নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরের কাছে একটি দোলমঞ্চও ছিল। মন্দিরের উত্তর দিকে ছিল একটি মঠ। সেটি মন্দিরের চেয়ে অনেক প্রাচীন। মঠটি প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

হরিনারায়ণপুর মসজিদ

এ মসজিদটি আকারে ছোট এবং দেখতে সুন্দর। এটি শাহ্ শুজা'র সময়ে নির্মিত হয়েছিল বলে বলে জনপ্রবাদ আছে। খুব সম্ভব এতে অতিরঞ্জন আছে। এই মসজিদ মোঘল আমলের একদম শেষ দিকে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

সাতবাড়িয়া মসজিদ

ভেড়ামারার সাতবাড়িয়া গ্রামে একটি সুন্দর মসজিদ আছে। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এ মসজি মাঝারি ধরনের। পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং দক্ষিণ ও উত্তর দেয়ালে ১টি করে দরজা আছে। দরজাগুলি অর্ধবৃত্তাকার খিলানের সাহায্যে নির্মিত। দরজার বাইরের দিকে খাঁজকাটা ছিল। বহু সংস্কারের পরেও সেগুলির চিহ্ন ধরা পড়ে। চারকোণে ৪টি অষ্টকোণাকৃতির মিনার (turret) আছে। এগুলির শীর্ষদেশে আছে ছোট গম্বুজ। মসজিদের ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে ৩টি মিহরাব আছে। ছাদের কার্নিশ ও প্যারাপেট সরল রেখায় নির্মিত। মসজিদের উপর ৩টি সুন্দর গম্বুজ আছে। গম্বুজের উপরিভাগ কলসাকারের 'ফিনিয়েল' দ্বারা অলঙ্কৃত। মসজিদের বাইরের দেয়াল বিশেষ করে পূর্ব দেয়াল বড় বড় প্যানেল দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল।

মসজিদে কোনো শিলালিপি পাওয়া যায়নি। তবে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় যে, এ মসজিদ নবাব মুর্শিদকুলী খানের সময়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে নির্মিত হয়েছিল।

অন্যান্য কীর্তি

কুষ্টিয়া জেলায় মোঘল আমলের শেষ দিকে নির্মিত আরও কয়েকটি কীর্তি আছে বলে জানা যায়। এগুলির মধ্যে চুয়াডাঙ্গার মসজিদ, চকহরিপুর মসজিদ, কুমারখালী প্রভতি উল্লেখযোগ্য।



শিলাইদহ রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি, কুষ্টিয়া

শিলাইদহ : সময়ের বিচারে খুব একটা প্রাচীনত্বের দাবিদার না হলেও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত শিলাইদহকে একটি বিশিষ্ট কীর্তি বলা যায় নিঃসন্দেহে। আদিতে এটি নাকি শেলি নামক জনৈক ইংরেজ সাহেবের ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে। পরে এই অঞ্চলে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের জমিদার প্রতিষ্ঠিত হলে এটি তাঁদের অধিকারে আসলে এটির অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয় এবং এর নাম হয় শিলাইদহ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক মূল্যবান সময় এখানে অতিবাহিত হয় এবং তাঁর বহু রচনা এ স্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এটি এখন একটি মিউজিয়াম এবং কবিগুরুর চিত্রকর্মসহ তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত অনেক বস্তু এই সুন্দর ইমারতটিতে আছে।

ঝিনাইদহ জেলা

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ

দিগনগর স্তূপ

ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ড থানার অধীনে দিগনগর নামক একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। এই গ্রামের একটি প্রাচীন জলাশয়ের তীরে একটি বিরাট ঢিবি আছে। ৫৫ মিটার × ৪৫ মিটার আয়তনের এই ঢিবির উচ্চতা বর্তমানে (১৯৭৪ খ্রিঃ) পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে ১ মিটারের বেশি নয়। এটি আগে আরও অনেক উঁচু ছিল। কিন্তু ঢিবির উপরিভাগ থেকে ইট-পাথর সরান এবং সেখানে চাষাবাদের ফলে এর উচ্চতা কমে গেছে। তবে ঢিবির ভিতরে প্রশস্ত ভিত্তি দেয়ালের অস্তিত্ব এখনও টিকে আছে। ঢিবির চারদিকে বর্তমানে কৃষিক্ষেত্র। কিন্তু সে সব স্থানেও প্রচুর প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ দেখা যায়। তাতে মনে হয় যে, এককালে এখানে বেশ কিছু ইমারতাদির অস্তিত্ব ছিল।

এ স্থানের কোনো সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। স্থানীয় জনপ্রবাদমতে অবশ্য ঢিবিটিকে শালিবাহন রাজার রাজবাড়ি বলে চিহ্নিত করা হয়। তিনি এস্থান থেকে যশোর পর্যন্ত কড়ি দিয়ে একটি রাজপথ নির্মাণ করেছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে। সেই রাজপথ এখনও 'কড়ির জাঙ্গাল' নামে জনশ্রুতিমূলে পরিচিত। এবং সেই জাঙ্গালের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ এখনও কোথাও কোথাও নযরে পড়ে। দিপল কুম্ভকার নামে পরিচিত এই শালিবাহন রাজা প্রথম জীবনে নাকি খুবই দরিদ্র ছিলেন এবং পরবর্তী কালে নাকি তিনি এক অস্বাভাবিক উপায়ে বিরাট ঐশ্বর্যের অধিকার হন এবং শেষ বয়সে তিনি নাকি প্রায় ২.৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত পায়রাদহ জলাশয়ে পরিবার-পরিজনসহ আত্মহত্যা করেন।

এখানে মুসলিম আমলের ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষ আছে বলে বলা হয়ে থাকে। তবে ঢিবি ও পার্শ্ববর্তী এলাকা দেখে মনে হয় যে, এগুলি প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের ধ্বংসাবশেষ।

মুসলিম আমল

শৈলকূপা মসজিদ ও মাযার

ঝিনাইদহ জেলা শহর থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে কুমার নদীর তীরে অবস্থিত শৈলকূপা মসজিদ দক্ষিণ বঙ্গে সুলতানী আমলের স্থাপত্য কীর্তির একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। মসজিদটি যেখানে অবস্থিত সে স্থানের নাম দরগাপাড়া। উত্তর-

দক্ষিণে লম্বা এ মসজিদের আয়তন (ভিতরের দিকে (৯.৫৪ মিটার × ৬.৩৬ মিটার) দেয়ালগুলি প্রায় ১.৬৬ মিটার প্রশস্ত। চারকোণে আছে ৪টি মিনার বা টারেট। এগুলি গোলাকার এবং বলয় আকারের স্ফীতরেখা (ব্যান্ড) দ্বারা অলঙ্কৃত। মিনারগুলি মসজিদের অনেক উপরে উঠে গেছে। এগুলির এই উঁচু রূপটি কি পরবর্তী কালের, না মসজিদ তৈরির সময়ের, তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে, এ ধরনের অতি উঁচু 'কর্নার টারেট' সাধারণত সুলতানী আমলের মসজিদে দেখা যায় না।

মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ২টি করে প্রবেশপথ আছে। পূর্ব দেয়ালের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উভয় পার্শ্বে ১টি করে সরু মিনার আছে এবং এগুলি কোণের মিনারের চেয়ে কিছু নিচু। মসজিদের কার্নিশগুলি ঈষৎ বাঁকান। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি মিহরাব। কেন্দ্রীয় মিহরাব পাশের দুটি থেকে আকারে বড়। মসজিদের ভিতরে ২টি প্রস্তরস্তম্ভ আছে। স্তম্ভ দুটি ১.৫১ মিটার উঁচু। এর পরে এগুলির উপরে আছে ইটের তৈরি খিলান। এ দুটি স্তম্ভ ও চারপাশের দেয়ালের উপর নির্মিত হয়েছে মসজিদের উপরে ৬টি গম্বুজ। এগুলি আকারে বেশ ছোট। মসজিদটি প্রধানত ইটের তৈরি।

এই মসজিদে এত মেরামত ও নূতন কাজ করা হয়েছে যে এর আদি রূপ কি ছিল, তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা মোটেই সহজ নয়। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ ও কোণের মিনার গুলি যে বহুলাংশে পরবর্তীকালের সৃষ্টি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এটি যে সুলতানী আমলের মসজিদ, তা সহজেই ধরা পড়ে।

মসজিদের পূর্ব দিকে অনুচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত আনুমানিক ১৩.৬৩ মিটার × ৯.০৫ মিটার আয়তনের একটি উন্মুক্ত স্থানে প্রাচীন আমলের একটি মাযার আছে। স্থানীয় লোকের মতে এটি শাহ্ মোহাম্মদ আরিফ-ই-রব্বানী ওরফে আরফ শাহ্‌র মাযার। তিনি সূতি নামক স্থানে ছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে। এই মাযারের কাছে আরও ৬ জন আউলিয়ার মাযার আছে।

মসজিদ বা মাযারে কোনো শিলালিপি নেই। জনশ্রুতিমূলে জানা যায় এবং মসজিদ নির্মাণের কায়দা কানুন দেখে অনুমান করা যায় যে, এটি সুলতানী আমলে নির্মিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে খান সাহেব আবদুল ওয়ালী যে সব তথ্য সংগ্রহ করে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন, তা নিম্নে তুলে ধরা হল।[১] আমরাও

১. "As to the origin of the Masjid (called in Imperial Farmans Masjid-i-Jamia or Cathedral mosque), it is stated that King Nasir Shah, son of Hussain Shah of Bengal, while travelling from Gaur on his way to Dacca came to Mauza Shailakupa. With Nasir Shah were Hazrat Maulana Muhammad Arab, a renowned Darvish and *Murshid* (spiritual guide) of the King; Hakim Khan, a Pathan, Saiyid Shah Abdul Qadir-i-Baghdadi, and a Fakir. The Maulana on seeing the village was very much delighted and said, 'I like this place, I will inhabit here.' The above mentioned three persons who were the disciples of the Maulana wished also to remain with their *murshid* at Shailakupa. Nasir Shah consented to this, and left his Wazir Shah Ali in the service of the *pir*. The king granted a few

স্থানীয়ভাবে এ মসজিদ সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি। খান সাহেব আবদুল ওয়ালী এই দরবেশের ডাক নাম 'আরব' শাহ্ ছিল বলে বলেছেন। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা সবাই এক বাক্যে বলেন যে, তাঁর নাম ছিল আরিফ শাহ্ বা আরফ শাহ্। সুলতান নসরত শাহ্ তাঁকে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলেন বলে সবাই একবাক্যে বলেন। তাঁর অসংখ্য কেরামতির কথাও এই অঞ্চলে সকলের কাছে শোনা যায়।

নলডাঙ্গার রাজবাড়ি ও মন্দির

ঝিনাইদহ থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দক্ষিণে ও ফটকি নদীর ডান তীরে অবস্থিত নলডাঙ্গাতে একটি প্রাচীন জমিদার বাড়ি আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিষ্ণুদাস হাজরা নামক এক ব্রাহ্মণ মোঘল সুবাদারের নিকট থেকে জমিদারি লাভ করেন এবং কালক্রমে তাঁরা 'রাজা' উপাধিতেও ভূষিত হন। রাজা ইন্দ্রনারায়ণ ছিলেন এ বংশের একজন প্রখ্যাত জমিদার।

পঞ্চরত্ন মন্দির

রাজা ইন্দ্রনারায়ণ একটি অতি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। বর্গাকারে নির্মিত এ মন্দিরের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য বাইরের দিকে ছিল ১২ মিটার। মন্দিরের গর্ভগৃহের উপরে ১টি এবং চারকোণে ৪টি চূড়া বা রত্ন ছিল বলে এ মন্দিরকে পঞ্চরত্ন মন্দির বলা হত। ইন্দ্রনারায়ণের নামানুসারে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের নামকরণ করা হয়েছিল 'ইন্দ্রেশ্বরী'। পরে এর নাম হয় সিদ্ধেশ্বরী। ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দের বেশ কিছুকাল আগে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরটি বর্তমানে খুবই জীর্ণ অবস্থায় আছে।

গুঞ্জানাথ শিবমন্দির

নবাব আলীবর্দি খানের রাজত্বকালে বর্গীদের ভয়ে বর্ধমানের মহারাজা চিত্রসেন নলডাঙ্গায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও নলডাঙ্গার জমিদারের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয় বলে কথিত আছে। নলডাঙ্গার জমিদার রাজা রঘুদেব তৈলকূপী নামক গ্রামে চিত্রসেনের জন্য পরিখা বেষ্টিত একটি আবাসবাটী নির্মাণ করে দেন বলেও বলা হয়ে থাকে। চিত্রসেন এখানে 'গুঞ্জানাথ' নামে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন বলেও জনশ্রুতি আছে।

যে মন্দিরে শিবলিঙ্গটি প্রতিষ্ঠিত হয়; তা গুঞ্জানাথ শিবমন্দির নামে পরিচিত। বর্গাকারে নির্মিত এ মন্দিরের প্রত্যেক বাহু বাইরের দিকে ৭.২৭ মিটার লম্বা। মন্দিরের গর্ভগৃহের চারদিকে ছিল ১.৬৬ মিটার প্রশস্ত টানা বারান্দা। পূর্বমুখী এ মন্দিরের সামনের দিকে ছিল অর্ধবৃত্তাকার খিলানের সাহায্যে নির্মিত ৩টি প্রবেশপথ (arches)। মন্দিরের নামানুসারে এ স্থানের নাম হয় গুঞ্জানগর। মন্দিরটি বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

---

bighas of *Lakhiraj lands and was pleased to call the mauza Nasirpur after his own name."*—Journal of the Asiatic society of Bengal 1901, pp. 15-28. *Khan Saheb Abdul Wali.*

বারবাজারের কীর্তিসমূহের ভূমি নকশা

বার বাজারের কীর্তিসমূহ

বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ গ্রন্থের প্রথম প্রকাশের সময় (১৯৮৪ খ্রিঃ) সমগ্র বার বাজারের কোথাও কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন কার্য করা হয়নি। তদুপরি বেড়দিঘিও চারপাশের কীর্তির প্রচুর ধ্বংসাবশেষ, রেললাইনের পশ্চিমে অসংখ্য ঢিবি, বিভিন্ন ঢিবিতে প্রাচীন প্রস্তরস্তম্ভ দেখে আমাদের ধারণা হয়েছিল যে, বারবাজারের বেশিরভাগ কীর্তি ছিল হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের। আলোচ্যগ্রন্থে এখানকার কীর্তিগুলিকে সে যুগের বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিল। এ গ্রন্থ প্রকাশের পর বিংশ শতাব্দীর নব্বই-এর দশকে প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর কর্তৃক বারবাজারে প্রচুর উৎখনন কার্য করা হয়েছে এবং অসংখ্য মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এগুলি সবই মুসলিম আমলের। একমাত্র বেড় দিঘি ও পাশ্ববর্তী এলাকায় খননকার্য করা না গেলেও সেখানে মুসলিম আমলের তিনিটি পাকা কবর আছে। এসব কারণে বারবাজারের কীর্তিগুলিকে মুসলিম আমলের বলেই ধরা হল।

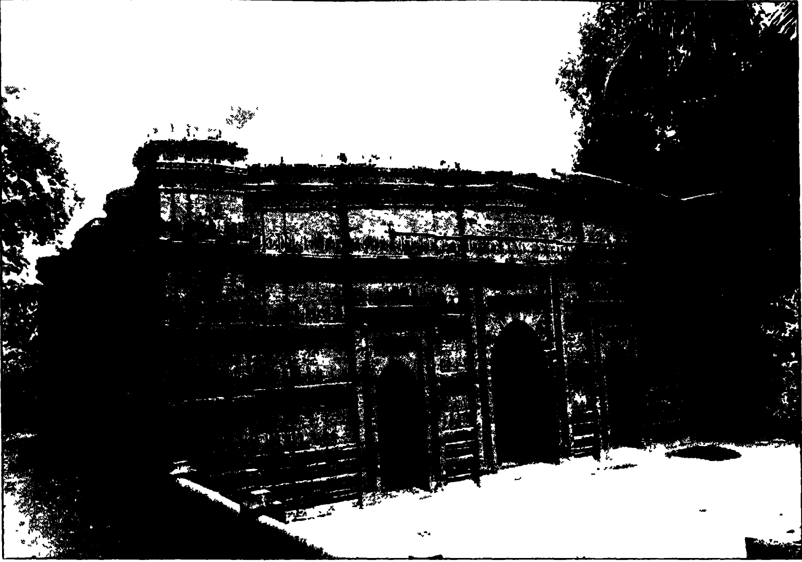
গোরাই মসজিদ

শাহি মহলের পুবে অবস্থিত পাকা সড়ক ও রেললাইন থেকে প্রায় ৮০০ মিটার পশ্চিমে অবস্থিত গোড়াই মসজিদকে আমরা যখন ১৯৭৪ সালে দেখি তখন এটি ছিল একটি এক গম্বুজের মসজিদ। পরে মসজিদের সামনের দিকে (পূর্ব দেয়ালের সামনে) প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর কর্তৃক তখন সেখানে উৎখনন কাজ করার ফলে মাটির নিচে কিছু স্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করা হয়েছিল। এসব ধ্বংসাবশেষ দেখে স্পষ্টতই ধারণা হয় যে, মসজিদের সামনে একটি বারান্দা ছিল এবং তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তবে সেই বারান্দার ছাদের উপর কি ধরনের আচ্ছাদন ছিল—সেখানে কি পটুয়াখালির মসজিদবাড়ি মসজিদের মতো 'ভোল্টেড ছাদ' (vaulted roof) ছিল, না দিনাজপুরের সুরামসজদিদের মতো তিনটি ছোট গম্বুজ ছিল—সেই প্রশ্নের সমাধান কেউ করতে পারেন নি এবং কোনোদিন সে প্রশ্নের সমাধান হবে বলেও মনে হয় না। তবে এটি যে এক গম্বুজের মসজিদ ছিল না তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মসজিদ থেকে প্রায় ৩০ গজ পূর্বদিকে প্রায় ৪/৫ বিঘা আয়তনের একটি প্রাচীন জলাশয় আছে। নাম গোরাই পুকুর বা গোড়াপুকুর।

বর্গাকারে নির্মিত এ মসজিদের প্রত্যেক বাহু বাইরের দিকে প্রায় '৩০ ফুট' ও ভিতরের দিকে '২০ ফুট' লম্বা। দেয়ালগুলি '৫ ফুট' প্রশস্ত। চারকোণে ৪টি সুন্দর অষ্টকোণাকৃতির মিনার (turret) আছে। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে খিলানযুক্ত প্রবেশপথ ছিল। পশ্চিম দেয়ালে ছিল দরজা বরাবর ৩টি মিহ্‌রাব। কেন্দ্রীয় মিহরাব অপেক্ষাকৃত বড়। মিহরাবগুলিতে পোড়ামাটির ফরকে ফুল ও লতাপাতার অলঙ্করণ ছিল। এতদিন পরেও পোড়ামাটির চিত্রফলকগুলির শ্রী খুব একটা নষ্ট হয়নি। মসজিদের অভ্যন্তরে চার দেয়ালের কেন্দ্রস্থলে ও দেয়াল ঘেঁষে ৪টি পাথরের স্তম্ভ ছিল। এ চারটি স্তম্ভ ও চারপাশের দেয়ালের উপর মসজিদের একমাত্র গম্বুজ প্রতিষ্ঠিত। প্রায় অর্ধবত্তাকারে উপর করা পেয়ালার আকৃতিতে নির্মিত গম্বুজটি ছিল

দেখতে অত্যন্ত মনোরম। ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে গম্বুজের কেন্দ্রস্থলে দেড় থেকে দু'ফুট ব্যাসের একটি গোলাকার ছিদ্র ছিল। বাকি অংশ তখনও বেশ মজবুত ছিল।



১ গোড়ার মসজিদ, বারবাজার, ঝিনাইদহ, যশোর। সংস্কারের পরে

মসজিদের বাইরের দেয়ালে পোড়ামাটির সুন্দর চিত্রফলক ছিল। চারকোণের টারেটগুলিতেও এ ধরনের কাজ ছিল। অনিপুণ হস্তে পরবর্তীকালে এগুলিতে মেরামতের কাজ করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও পোড়ামাটির চিত্র ফলকগুলির সৌন্দর্যের আভাস পাওয়া যায়। মিনারগুলি বেশি উঁচু নয়। ছাদের সামান্য উপরে গিয়ে শেষ হয়েছে।

মসজিদের চারদিকে বেষ্টনী-প্রাচীর ছিল। আজ তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সংলগ্ন গোরাই পুকুরের পশ্চিম পাড়ে একটি বাঁধান ঘাট ছিল বলে জানা যায়। অতি জীর্ণ হলেও মসজিদে তখনও নামাজ পড়া হত। মসজিদে কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি।

এ মসজিদ খান-ই-জাহান কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল বলে প্রবল জনশ্রুতি আছে। এ সম্পর্কে কিছু পরে এই নিবন্ধের শেষের দিকে আলোচনা আছে।

মসজিদটিকে হাল আমলে প্রায় নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে।

পীরের মাযার

গোরাই মসর্জিদ থেকে প্রায় ১০৪ মিটার উত্তরে এবং রাস্তার উত্তর পার্শ্বে প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ একটি ছোট অনুচ্চ ঢিবি আছে। লোকে বলে পীরের মাযার। কোন্ পীরের মাযার, তা কেউ বলতে পারে না। এটি কোনো ছোট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও হতে পারে। ইটগুলি খুবই প্রাচীন এবং মুসলমান আমলের বলে মনে হয় না। তবে সমগ্র বারবাজারে এপর্যন্ত কোনো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়নি বলে এখানে একটি মন্দিরের অবস্থান খুব সম্ভাব্য ঘটনা বলে মনে হয় না।

গলাকাটির দিঘি ও ছয়গম্বুজ মসজিদ

গোরাই মসজিদ থেকে প্রায় ২০০ মিটার উত্তরে একটি মাঝারি আকারের জলাশয় আছে। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ জলাশয়ের আয়তন প্রায় ৫ বিঘা। দিঘির প্রায় লাগোয়া দক্ষিণে প্রত্যেক বাহু প্রায় ৭.৫০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ২.৫০ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট একটি ঢিবি ছিল এবং সেই ঢিবিটি প্রাচীন ইট-পাথরের ভগ্নাংশ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। ঢিবির কেন্দ্রস্থানে ছিল কালপাথরে নির্মিত দুটি প্রস্তরস্তম্ভ। প্রস্তর স্তম্ভ দুটি একে অন্য থেকে প্রায় ৩.৫ মিটারে দূরে দূরে অবস্থিত ছিল। মাথা বের করা স্তম্ভ দুটির মাথায় ছিদ্র দেখে ধারণা হয়েছিল যে, এ দুটি স্তম্ভের উপরে আরও পাথর সংযোজিত ছিল। ঢিবি ও ঢিবির স্তম্ভদুটি দেখে আমাদের ধারণা হয়েছিল যে, ঢিবিতে একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছিল এবং 'বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে সেই মর্মেই আমরা বর্ণনা দিয়েছিলাম।

বিংশ শতাব্দীর নব্বই-এর দশকে প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর এখানে উৎখনন কাজ করে একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছে। যদিও উক্ত দফতর কর্তৃক কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়নি আমরা ১৯৯৬ সালে সরেযমিনে তদন্ত করে এখানে সেই ধ্বংসাবশেষ এবং সেখানে নতুন করে নির্মিত একটি ছয়গম্বুজ মসজিদের প্রশংসনীয় নির্মাণ কার্য দেখে আমরা আনন্দিত হয়েছি। প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ ও মসজিদের সাবেক দুটি স্তম্ভের (যে দুটিকে আমরা মন্দিরের স্তম্ভ বলে ভুলধারণা করেছিলাম) উপর মসজিদটি নতুনকরে নির্মিত হয়েছে।

উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ মসজিদের আয়তন ছিল ৬.৩৬ মিটার × ৫.৪৫ মিটার এবং মসজিদের দেয়ালের প্রশস্ততা ছিল ১.৫১ (প্রায় ৫')। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ২টি করে প্রবেশপথ ছিল। মসজিদের ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে ছিল ৩টি মিহরাব এবং সেগুলিতে টেরাকোটার অলঙ্করণ ছিল এবং এখনও আছে। মসজিদের চারকোণের স্তম্ভগুলিকে (turret) নতুন করে সংযোজন করা হয়েছে।

মসজিদের 'গলাকাটি' (অর্থাৎ গলাকর্তন করা) নামটি বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। খুব সম্ভব মানুষকে হত্যা করার সঙ্গে এ নামের সম্পর্ক ছিল। এতে মনে হয় যে, এখানে যে প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ মন্দিরটি ছিল সেটি ছিল (খুব সম্ভব কোনো কালীমন্দির) নরবলির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল বলে ঢিবির এই বিচিত্র নামকরণ হয়েছিল। এবং সেই মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেলে খুব সম্ভব সেখানে একটি ছয়গম্বুজ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।

চেরাগদানি মসজিদ ও জলাশয়

প্রায় এক একর ভূমি জুড়ে একটি প্রাচীন জলাশয় আছে, নাম চেরাগদানি দিঘি। গলাকাটি মসজিদ থেকে প্রায় ২০০ মিটার উত্তর-পশ্চিমে সাদিকপুর মৌজায় এ জলাশয়

জলাশয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ ছিল। আমরা যখন ১৯৭৪ সালে এই ধ্বংসাবশেষ প্রথম বারের মতো দেখি তখন বর্গাকারে নির্মিত মসজিদের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ১০ মিটার। মসজিদের দেয়ালগুলির যে

অতি সামান্য অংশ টিকে ছিল তা ছিল প্রায় ১.৩১ মিটার (প্রায় ৪ ফুট) প্রশস্ত। মসজিদের চারকোণে ছয় কোণাকারে নির্মিত চারটি মিনার (turret) ছিল। এগুলি মাটি থেকে প্রায় ২ মিটার উঁচু ছিল।

মসজিদের পুব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশপথ ছিল। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে ছিল ৩টি মিহ্‌রাব। মসজিদের দেয়ালগুলি মাটির উপরে ১ মিটারের বেশি উঁচু ছিল না। সেই দেয়ালকে নতুন করে নির্মাণ করে স্থানীয় লোকেরা এখানে একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করেছেন উপরে টিনের আচ্ছাদন দিয়ে। এখন সেখানে রীতিমত নামাজ পড়া হয়। মসজিদের বাইরে দক্ষিণ-পূব কোণে ধ্বংসপ্রাপ্ত দুটি পাকা কবরের অস্তিত্ব দেখা যায়।

স্থানীয় জনসাধারণের নিকট থেকে জানা যায় যে, দুই পঙ্‌ক্তির একটি শিলালিপি চেরাগদানি মসজিদ নিকটবর্তী একটি নিচু টিবিতে প্রোথিত অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়েছিল। শিলালিপির পাঠ থেকে জানা যায় যে, সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ্‌র রাজত্বকালে ৯২৫ হিজরী (১৫১৯ খ্রিঃ) সনে এ অঞ্চলের উযির হিসাবে নিযুক্ত মাহমুদ নামক এক ব্যক্তি মসজিদটি নির্মাণ করেন। স্থানীয় লোকের কাছে আরও জানা যায় যে, শিলালিপির পাথরটি চেরাগদানী মসজিদের এবং মসজিদটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তা মসজিদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে অন্য সূত্রে জানা যায় যে, শিলালিপিটি এখানকার নয়। এটি অন্য স্থানে পাওয়া যাওয়ার পর এখানে আনা হয়েছিল।

এ সম্বন্ধে আরও জানা যায় যে, চেরাগদানি দিঘির পশ্চিম পাড়ে একটি নিচু টিবিতে কাল পাথরে নির্মিত একটি প্রস্তরস্তম্ভ প্রোথিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এ পাথরে কিছু লেখা লিপিকৃত আছে বলে বলা হয়। এ স্তম্ভ থেকে প্রায় ৭০ মিটার দক্ষিণ সাদিকপুর মৌজায় প্রায় একই রকমের আর একটি স্তম্ভ দেখা যায় এবং উভয় স্তম্ভ কোনো প্রাক-মুসলিম আমলের কীর্তির মধ্যে ছিল বলে ধারণা করা হয়।

জোড়বাঙলা মসজিদ

গলাকাটি মসজিদ থেকে সামান্য দূরে পুর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত রাস্তার লাগোয়া উত্তরে একটি অতিক্ষুদ্র ও গভীর এবং শুষ্ক পুকুর আছে। এই পুকুরের দক্ষিণে এবং রাস্তার লাগোয়া দক্ষিণে পাশাপাশি অবস্থানরত দুটি মোটামুটি উঁচু টিবি ছিল। এ দুটি টিবিকে আমরা 'বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ' গ্রন্থে মন্দির বলে সন্দেহ করেছিলাম যদিও স্থানীয় জনমত অনুসারে দুটি টিবি জোড় বাঙলা মসজিদ বলে পরিচিত ছিল।

বিংশ শতাব্দীর আশির দশকের শেষ দিকে প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর কর্তৃক উৎখনন কার্য করার পরে এখানে একটি ছোট একগম্বুজ মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। মসজিদটির উপরের দিকে লিন্টেলের উপরিভাগ পর্যন্ত অংশ বিলুপ্ত ছিল। বর্গাকারে নির্মিত এ মসজিদের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ছিল ৫.৪৫ মিটার। মসজিদের পূর্বদিকের দেয়ালে ছিল একটি মাত্র প্রবেশপথ এবং ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে ছিল একটিমাত্র মিহ্‌রাব এবং তা ছিল পূর্বদিকের দরোজা বরাবর। ফল ও লতাপাতার অনুকৃতিবিশিষ্ট টেরাকোটা অলঙ্করণযুক্ত ইট এখানে পাওয়া যায়। গম্বুজসহ মসজিদের

হারিয়ে যাওয়া উপরিভাগ প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর কর্তৃক নতুন করে স্থাপিত হয়েছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদের দক্ষিণ দিকে বেশ কিছু মানুষের হাড় মাটির নিচে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। সেগুলিকে নতুন করে মাটির নিচে যথাযথভাবে কবর দেওয়া হয়েছে মসজিদের কাছেই।

মসজিদের কাছে অবস্থিত অন্য টিবিতে আর একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। খুব সম্ভব সেটি ছিল একটি হুযরাখানা এবং এ কারণেই বোধ হয় এ ধ্বংসাবশেষটিকে জোড় বাংলা মসজিদ বলা হত। সংস্কারকৃত মসজিদটি এখন নামাজের জন্য যথারীতি ব্যবহার করা হচ্ছে।

উপরে উল্লিখিত শুষ্ক পুকুরে আরবি ভাষার একটি ইষ্টকলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু লিপির পাঠ অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর।

পীরপুকুর পনের গম্বুজ মসজিদ

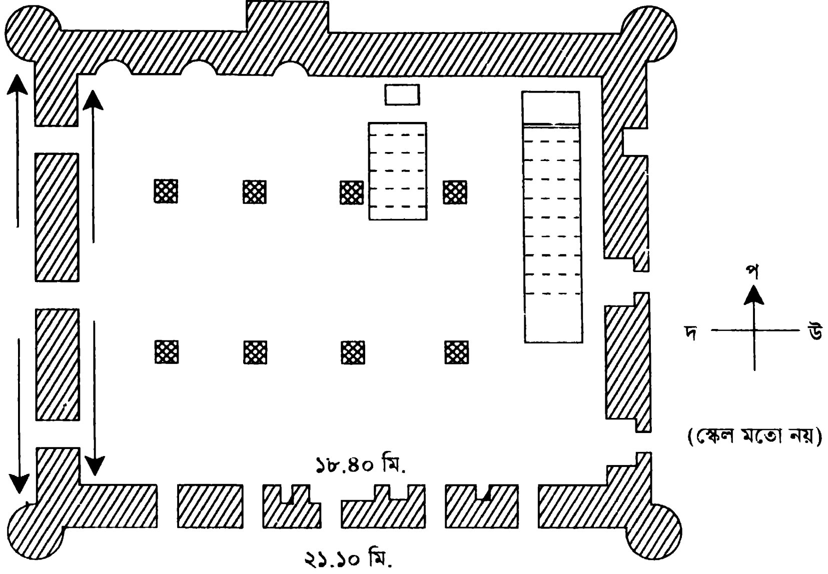
বারবাজার ইউনিয়নের বেলাট-দৌলতপুর মৌজায় ও গোরাই মসজিদ (পূর্বে উল্লিখিত গোরাই মসজিদ দ্র.) থেকে কয়েকশ মিটার দূরে প্রত্নতত্ত্ব দফতর কর্তৃক একটি পনের গম্বুজ মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে বিংশ শতাব্দীর আশির দশকের শেষদিকে। মসজিদের নাম পীরপুকুর মসজিদ। মসজিদটি পীরপুকুর নামক একটি প্রাচীন জলাশয়ের পাড়ে অবস্থিত।

উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ মসজিদের বাইরের দিকের মাপ ২১.১০ মিটার × ১৩.৫৫ মিটার এবং ভিতরের দিকের মাপ ১৮.৪০ মিটার × ১০.৮৫মিটার। মসজিদের দেয়ালগুলি ছিল প্রায় ১.৩৫ মিটার প্রশস্ত এবং মাটির উপর থেকে গড়ে ১.৭০ মিটার পর্যন্ত টিকে ছিল প্রত্যেক দিকেই। মসজিদের পুব দেয়ালে প্রায় সম আয়তনবিশিষ্ট পাঁচটি প্রবেশপথ ছিল এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে প্রায় সম আয়তনের তিনটি করে জানালা ছিল এবং জানালায় 'গ্রিল'-এর ব্যবস্থা ছিল।

মসজিদের অভ্যন্তরে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা প্রত্যেক সারিতে ৪ টি করে দুই সারিতে মোট ৮টি ইষ্টকনির্মিত স্তম্ভ ছিল। এই ৮টি স্তম্ভ মসজিদের অভ্যন্তর ভাগকে ৩টি 'আইল' (isle) ও ৫টি 'বে' (bay)-তে বিভক্ত করেছিল এবং এদের দ্বারা সৃষ্ট ১৫ টি বর্গক্ষেত্রের (squares) উপরে মসজিদের ছাদে ছিল ১৫ টি গম্বুজ। হারিয়ে যাওয়া আদি গম্বুজগুলির বর্ণনা দেওয়া এখন আর সম্ভব নয়। ইষ্টক নির্মিত স্তম্ভগুলির হারিয়ে যাওয়া উপরিভাগের বর্ণনা দেওয়াও সম্ভব নয়।

পশ্চিম দেয়ালের টিকে থাকা অংশ দেখে বোঝা যায় যে, অপেক্ষাকৃত বড় কেন্দ্রীয় মিহরাবসহ সে দেয়ালে তিনটি মিহরাব আছে এবং কেন্দ্রীয় মিহরাবের উত্তরে যেখানে একটি মিহরাব থাকার কথা সেখানকার দেয়াল অবিকৃত অবস্থায় রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবের লাগোয়া উত্তর দিকে ১.৮ মিটার × ৩০ সে. মি. আয়তনের ইষ্টকনির্মিত একটি মিম্বর ছিল। তাতে নিচু ধাপ বিশিষ্ট ৮টি সিঁড়ি ছিল। গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ বা সুলতানি আমলের অন্যান্য বড় মসজিদের মতো আলোচ্য মসজিদের ভিতরে উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি ক্ষুদ্র 'ভোল্টেড' (Vaulted) দ্বিতল কক্ষ ছিল এবং এর

আয়তন ছিল ৩.৮৫ মিটার × ৩.৮ মিটার। সেই দ্বিতল কক্ষে ওঠার জন্য পূর্বদিক থেকে ১০ টি ধাপ বিশিষ্ট একটি সিঁড়ি ছিল। এই বিশেষ কক্ষটি খুব সম্ভবত স্থানীয় শাসনকর্তার নামাজ পড়ার জন্য নির্মিত হয়েছিল এবং কোনো কোনো পণ্ডিত কর্তৃক বর্ণিত মহিলাদের নামাজ পড়ার জন্য নয়।



পীরপুকুরের ভূমি নকশা

মসজিদটি সম্পূর্ণরূপে ইট দ্বারা নির্মিত ছিল এবং কোনো পাথরের ব্যবহার সেখানে চোখে পড়ে না।

এ মসজিদে ব্যবহৃত ইটের আয়তন ছিল ১৫ সে.মি. × ১৫ সে.মি. × ৪ সে.মি. (প্রায় ৬″ × ৬″ × ১$\frac{১}{২}$) ও ১৮ সে.মি. × ১৮ সে.মি. × ৫ সে.মি. (প্রায় ৭″ × ৭″ × ২″) আয়তন বিশিষ্ট ছিল। মসজিদের কোণে নির্মিত স্তম্ভগুলির (turrets) ভিত্তিদেশ গোলাকার এবং উপরের অংশ অষ্টকোণাকৃতির ছিল। মসজিদের অভ্যন্তরের স্তম্ভগুলি মহাস্থানগড়ের মানকালির ধাপে নির্মিত মসজিদের মতো চার কোণাকারে নির্মিত ও কোণাকারে (faceted corners) নির্মিত ছিল।

মসজিদের কোনো লিপি পাওয়া যায় নি। তবে স্থাপত্যকৌশল দেখে ধারণা করা যায় যে, সুলতানি আমলের শেষভাগে এটি নির্মিত হয়েছিল।

পীরপুকুর জলাশয়

প্রায় ৪ একর আয়তনের পীরপুকুর নামে পরিচিত জলাশয়টি মসজিদের প্রায় লাগোয়া পুব দিকে অবস্থিত। বারবাজার অঞ্চলে এটিই নাকি সবচেয়ে গভীর পুকুর। মসজিদের অস্তিত্ব থেকে সহজেই ধারণা করা যায় যে, এই জলাশয় মসজিদ নির্মাণের সময়ই খনিত হয়েছিল।

সাতগাছিয়া আদিনা মসজিদ

বারবাজার রেলস্টেশন থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে সাতগাছিয়া মৌজায় অবস্থিত আদিনা পুকুরের দক্ষিণ তীরে সাতগাছিয়া আদিনা মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় এবং একটি পাকা সড়ক দিয়ে বারবাজার থেকে সেখানে যাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্বের বিচারে অত্যন্ত মূল্যবান এই ধ্বংসাবশেষ আজ (২০০০ খ্রিঃ) থেকে মাত্র কয়েক বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছে। ফারসি 'আদিনা' শব্দের অর্থ শুক্রবার।

এখানে বহুকাল ধরে বিরাট আকারের একটি উঁচু ঢিবি ছিল। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের শেষভাগে স্থানীয় লোকেরা এখানে একটি বিরাট মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। তারা ঢিবির উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রথমে খড় দিয়ে চালা ঘর এবং কিছুদিন পরে টালির ছাদ নির্মাণ করে সেখানে নামাজ পড়তে শুরু করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ইতিহাস ও কালচার বিষয়ের তদানীন্তন সহকারি অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ আবদুল বারি ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে মসজিদটি পরিদর্শন করে বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।[১]

এরপরে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর বেশ দেরিতে হলেও ১৯৭৭-৭৮ খ্রিস্টাব্দে ঢিবিটির দায়িত্ব গ্রহণ করে ১৯৮৯-৯০ সালে সেখানে উৎখনন কার্য পরিচালনা করে। তারা কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ না করলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর হাবিবা খাতুন ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতরের তদানীন্তন কর্মকর্তা ডক্টর খোন্দকার আলমগির ইতিহাস পরিষদের 'ইতিহাস' পত্রিকায় ১৯৯১-৯২ সালে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।[১]

উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এ মসজিদের বাইরের দিকের আয়তন ছিল ২৪.২৫ মিটার × ১৮.৫৫ মিটার। পূর্ব দেয়ালে প্রায় একই মাপের ৭টি প্রবেশপথ ছিল। দক্ষিণ দেয়ালে ৫টি ও উত্তর দেয়ালে ৩টি প্রবেশপথ ছিল। পশ্চিম দেয়ালের কেন্দ্রীয় মিহরাবের লাগোয়া উত্তর দিকে একটি প্রবেশপথ ছিল। উত্তর দেয়ালের পশ্চিম ভাগে যেখানে ২টি প্রবেশপথ থাকার কথা সেখানে দুটি বন্ধ কুলুঙ্গি ছিল। প্রবেশপথগুলির প্রশস্ততা ছিল ১.৩৫ মিটার।

মসজিদের চারকোণে ছিল ৪টি স্তম্ভ (turrets)। স্তম্ভগুলির টিকে থাকা অংশ দেখে বোঝা যায় যে, এগুলি ছিল সম্পূর্ণরূপে ইটের তৈরি এবং দেখতে গোলাকার, পাশের দেয়ালসহ কোণের স্তম্ভগলি সব পড়ে গেছে। এখন (১৯৮৯-৯০ খ্রিঃ) টিকে থাকা দেয়ালের উচ্চতা ১.৬ মিটার থেকে ১.৮৯ মিটার। দেয়ালগুলি ছিল ১.৬ মিটার প্রশস্ত।

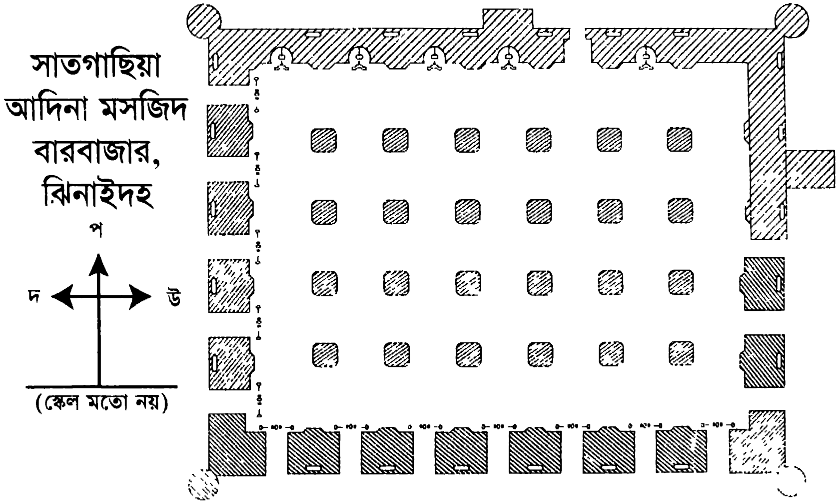
মসজিদের অভ্যন্তরে ২৪টি স্তম্ভ ছিল এবং এগুলি সবই ছিল ইষ্টকনির্মিত। এগুলি উত্তর-দক্ষিণে ৪ সারিতে দণ্ডায়মান ছিল এবং প্রত্যেক সারিতে ছিল ৬টি করে স্তম্ভ।

১. Md Abdul Bari : The Masjid of Satgachhia, a recently discovered Jami' Mosque—Journal of the Varendra Research Museum, vol 7 (1981-82) pp. 184-90.

১. ডক্টর হাবিবা খাতুন ও ডক্টর খোন্দকার আলমগীর : সাতগাছিয়া মসজিদ, 'ইতিহাস' (ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা), পঞ্চবিংশতি বর্ষ-প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা—১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, ১২৮-৪২ পৃ.।

অভ্যন্তরের এই ২৪টি স্তম্ভ ছাড়াও মসজিদের ভিতরে চার দেয়ালে প্রায় ২০টি সংযুক্ত স্তম্ভ (engaged pilasters) ছিল, এগুলিও ছিল সব ইষ্টকনির্মিত। ভিতরের ২৪ টি স্তম্ভ মসজিদের অভ্যন্তর ভাগকে ৫টি 'আইল' (isle) ও ৭টি 'বে'-তে বিভক্ত করেছিল এবং এর ফলে মোট ৩৫ টি সম আয়তনের বর্গক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছিল মসজিদের অভ্যন্তরে। এই বর্গক্ষেত্রগুলির উপরে ছাদে নির্মিত হয়েছিল ৩৫ টি আচ্ছাদন। সংযুক্ত স্তম্ভগুলির মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে ছিল ৬টি করে এই উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ছিল ৪টি করে। এগুলির কোনটিই ১.৪৫ মিটারের বেশি টিকে নেই।

৩৫টি গম্বুজের সব ক'টাই ছিল খুব সম্ভব ছোট আকারের এবং বাগেরহাটে খান-ই-জাহানের কীর্তিগুলিতে নির্মিত গম্বুজগুলির মতো অর্ধবৃত্তাকারে নির্মিত এবং ছোট ও ক্ষুদ্রাকারের। এখানে কোনো চৌচালা গম্বুজ ছিল বলে মনে হয় না। মসজিদের কার্নিশের আকার সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলা না গেলেও সুলতানি আমলের অন্যান্য মসজিদের মতো এগুলি ছিল খুব সম্ভব বাঁকানো (curved)ভাবে নির্মিত।



পূর্বদেয়ালে অবস্থিত ৭টি প্রবেশপথ বরাবর মসজিদের অভ্যন্তরে পশ্চিম দেয়ালে ৭টি মিহ্রাব থাকার কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম দেয়ালে মোট ৫টি মিহ্রাব ছিল। কেন্দ্রীয় মিহ্রাব পর্যন্ত দক্ষিণ দিক থেকে মোট ৪টি মিহ্রাব ছিল। কেন্দ্রীয় মিহ্রাবের লাগোয়া উত্তরে যেখানে একটি মিহ্রাব থাকার কথা সেখানে পশ্চিম দেয়ালে ছিল একটি প্রবেশপথ। এই প্রবেশপথের লাগোয়া উত্তরে ছিল একটি মিহ্রাব। এর উত্তরে যেখানে আর একটি মিহ্রাব থাকার কথা সে স্থান ছিল সাদাসিধাভাবে রক্ষিত।

মিহ্রাবগুলির নিম্নাংশ ছাড়া বাকি অংশ সব বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার ফলে মিহ্রাবগুলির অলঙ্করণ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছুই বলা সম্ভব নয়। তবে খননের পরে মিহ্রাবগুলির বিশেষ করে কেন্দ্রীয় মিহ্রাবের নিম্নাংশ এবং মসজিদের অভ্যন্তরে মেঝেতে পড়ে থাকা টেরাকোটার চিত্রফলক ও অলঙ্কৃত ইট দেখে ধারণা করা যায় যে, মিহ্রাবগুলি বিশেষ করে কেন্দ্রীয় মিহ্রাবে যথেষ্ট অলঙ্করণ ছিল। মিহ্রাবগুলি 'আর্চের'

(arches) সাহায্যে নির্মিত হয়েছিল এবং আর্চগুলি চৌকোণাকারের একক স্তম্ভ থেকে নির্গত হয়েছিল। তবে যতটুকু মনে হয়, বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদের মিহ্‌রাবের অলঙ্করণের চেয়ে আলোচ্য মসজিদের মিহরাবের অলঙ্করণ ছিল অনেকটা নিকৃষ্ট ধরনের। মসজিদের সামনের দেয়াল (facade) খুব সম্ভব অলঙ্কৃত ছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় উৎখননের পর মসজিদের সামনে পড়ে থাকা প্রায় ৬০০ খণ্ড টেরাকোটা চিত্রফলক ও অলঙ্কৃত ইট দেখে। তবে এই বিরাট মসজিদের তুলনায় এ সংখ্যা খুবই অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয় এবং এগুলির গুণগত মানও বেশ নিকৃষ্ট ধরনের বলে দেখা গেছে।

স্তম্ভ থেকে স্তম্ভ পর্যন্ত বাইরের দিকে পশ্চিম দেয়ালের দৈর্ঘ্য ছিল ২৪.২৫ মিটার। এর কেন্দ্রস্থলে কেন্দ্রীয় মিহরাবের পিছনে বাইরের দিকে উত্তর-দক্ষিণে ১.৮৮ মিটার দীর্ঘ ও পূর্ব-পশ্চিমে .৯২ মিটার প্রশস্ত একটি নিচু প্লাটফর্ম ছিল। পশ্চিম দেয়ালের বাইরের দিকে মোট ৮টি অপ্রশস্ত কুলঙ্গি ছিল। পশ্চিম দেয়ালের মতো পূর্ব দেয়ালের দৈর্ঘ্যও ছিল ২৪.২৫ মিটার এবং সে দেয়ালেও একই ধরনের ৮টি অপ্রশস্ত কুলঙ্গি ছিল। স্তম্ভগুলি বাদ দিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য ছিল ১৭.২১ মিটার পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালের মতো এগুলির প্রত্যেকটিতে ৬টি করে অপ্রশস্ত কুলঙ্গি ছিল। এ সব কুলঙ্গি ছিল খুব সম্ভব মসজিদের বাইরের দেয়ালের অলঙ্করণের জন্য।

মসজিদের কোণে অবস্থিত ৪টি স্তম্ভের নিম্নদেশ মাত্র খননের পরে পাওয়া গেছে। এগুলি ছিল গোলাকার। খান-ই-জাহান কর্তৃক বাগেরহাটে নির্মিত স্তম্ভগুলির মতো গোলাকার স্তম্ভগুলিতে স্ফীতকায় রেখার অলঙ্করণ ছিল বলে দেখা যায়। উৎখননের পর একটি স্তম্ভের ব্যাস ১.১৩ মিটার ছিল বলে দেখা গেছে। তাতে মনে হয় যে, স্তম্ভগুলি বেশ বড় আকৃতির ছিল

আদি মসজিদ নির্মাণের পরবর্তীকালে এক পর্যায়ে আদি মেঝের উপরে ৩টি করে ইট স্থাপন করে মেঝেকে আরও উঁচু করা হয়েছিল বলে দেখা যায় উৎখননের পরে। মসজিদটি সম্পূর্ণরূপে ইষ্টক নির্মিত ছিল। ইটগুলি ছিল বিভিন্ন মাপের এবং এগুলি ২৬.৫ সে.মি. × ২২.৫ সে.মি. × ২.৫ সে.মি., ২৪ সে.মি. × ১৯ সে.মি. × ৫½ সে.মি., ২১ সে.মি. × ১৭ সে.মি. × ৫ সে.মি., ২৬ সে.মি. × ১৭ সে.মি. × ৪.৫ সে.মি. ১৫.৫ সে.মি. × ১২ সে.মি. × ৫ সে.মি., ১৫ সে.মি. × ১১ সে.মি. × ৫ সে.মি., ১৪ সে.মি. × ১১ সে.মি. × ৩ সে.মি. ইত্যাদি মাপের ছিল।

২.২০ মিটার × ১.৮০ মিটার আয়তন ও মাত্র ২৩ সে.মি. উচ্চতা বিশিষ্ট এবং উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ ইষ্টক নির্মিত একটি ক্ষুদ্র প্ল্যাটফরম ছিল। এর উপরিভাগ বেশ মসৃণ ছিল। এটি উত্তর দেয়ালের বাইরের দিকে ছিল এবং যেখানে পূর্ব দিক থেকে আগত চতুর্থ প্রবেশ পথটি থাকার কথা সেখানে দেয়ালের বাইরের দিকে সংযোজিত ছিল। এটি কী উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল তা জানা যায়নি।

পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ (অবশ্যই মুসলিম আমলের কীর্তি), মাঝারি ধরনের একটি পুকুর মসজিদের প্রায় সংলগ্ন উত্তর দিকে ছিল। পুকুরের দক্ষিণ পাড়ের মাঝামাঝি স্থানে একটি বাঁধান ঘাট ছিল। এটি যে মসজিদ ব্যবহারকারীদের জন্য নির্মিত হয়েছিল তাতে বোধ হয় কোনো সন্দেহ নেই। পুকুরের পূর্ব পাড়ে আর একটি বাঁধান ঘাট ছিল এবং তা স্থানীয় জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য ছিল বলে মনে হয়।

মসজিদের লাগোয়া পশ্চিমদিকের ভূমি ছিল অপেক্ষাকৃত উঁচু ও মোটামুটি বড় আয়তনের। স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকে জানা গেছে যে, এখানে অনেক বাড়িঘরের ধ্বংসাবশেষ ছিল এবং তাদের মতে এখানেই ছিল স্থানীয় শাসনকর্তার নিবাস। বিবরণটি অগ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। মসজিদের পূর্ব দিকের ভূমি বিস্তীর্ণ ও উঁচু এবং সেখানে জনসাধারণের বসতি ছিল বলে মনে হয়। মসজিদের দক্ষিণ দিকের স্থান অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমি।

মসজিদের কোনো শিলালিপি অথবা মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কিত অন্য কোনো দলিল পাওয়া যায়নি। তবে মসজিদ নির্মাণের স্থাপত্য-কৌশল দেখে সহজেই ধারণা করা যায় যে, এটি সুলতানি আমলে নির্মিত হয়েছিল। মসজিদের কোণের গোলাকার স্তম্ভ, কেন্দ্রীয় মিহরাবের কাছে পিছনের দেয়ালে একটি প্রবেশপথের অস্তিত্ব, টেরাকোটা চিত্রফলকের কিছু কিছু সামঞ্জস্য ও অন্যান্য অনেক কারণে ধারণা হয় যে, বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ ও অন্যান্য মসজিদের স্থাপত্য কৌশল ও আলোচ্য মসজিদের স্থাপত্য কৌশলে যথেষ্ট পরিমাণে সাদৃশ্য যে ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু আলোচ্য মসজিদটি বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ ও অন্যান্য মসজিদের পরে বা আগে নির্মিত হয়েছিল কিনা তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। তবে বারবাজারের সুবৃহৎ মনোহর মসজিদ, পীর পুকুর মসজিদ, গলাকাটি মসজিদ, গোরাই মসজিদ ও অন্যান্য মসজিদের অষ্টকোণাকৃতির কোণের স্তম্ভ ও অন্যান্য স্থাপত্য কৌশল দেখে ধারণা করা যায় যে, এগুলি বাগেরহাটের মসজিদগুলির পরবর্তী কালে নির্মিত।

এই এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন একটি ধারণা দেখা যায় যে, সুলতান হোসেন শাহ্‌র উজির জনৈক মোহাম্মদ কর্তৃক এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এ ব্যক্তির একটি শিলালিপি যে চেরাগদানি মসজিদের নিকট পাওয়া গিয়েছিল সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে (চেরাগদানি মসজিদ দ্র.)। অবশ্য এই শিলালিপির প্রাপ্তিস্থান নিয়ে যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে সে সম্বন্ধে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও নিশ্চয় করে বলার মতো কোনো সাক্ষ্য আমাদের হাতে নেই তবে সবদিক বিচার করে ধারণা করা যায় যে, আলোচ্য মসজিদ ও বারবাজারের অন্যান্য কীর্তি সুলতানি আমলে ও খান-ই-জাহানের পরেই খুব সম্ভব নির্মিত হয়েছিল।

মনোহর মসজিদ

গোরাই মসজিদ (গোরাই মসজিদ দ্র.) থেকে প্রায় ১৫০ মিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় দুই একর আয়তনের একটি প্রাচীন জলাশয় আছে। মোটামুটি বর্গাকৃতির বলে মনে হলেও জলাশয়টি পূর্ব-পশ্চিমে কিছুটা দীর্ঘ। জলাশয়ের চারপাশের ভূমি জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে বহুকাল ধরে পতিত অবস্থায় পড়েছিল বলে ১৯৭৪ সালে যখন আমরা বারবাজারের কীর্তিগুলির জরিপকাজ (exploration) করি তখন এ কীর্তিটি আমাদের চোখে পড়েনি। ইতোমধ্যে পুকুরের পশ্চিম পাড়ে কিছু কিছু বসতি স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু পুকুরের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়ের ভূমি জঙ্গলাকীর্ণ নিচু ঢিবি হিসাবে পতিত অবস্থায়ই পড়েছিল। ধীরে ধীরে ঢিবির জঙ্গল পরিষ্কৃত হলে স্থানীয় জনসাধারণ সেখানে

ঢিবির মধ্যে অসংখ্য প্রাচীন ইট, ইটের ভগ্নাংশ, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ, খোয়া (mortars) ইত্যাদি প্রচুর প্রত্নবস্তুর সন্ধান পান। তারা এ ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়ে বিষয়টা প্রত্নতত্ত্ব অদিফতরের গোচরে আনয়ন করেন।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর আংশিক উৎখননের পরে এখানে একটি ৩৫ গম্বুজ মসজিদের ভূমি-পরিকল্পনা আবিষ্কার করে একটি প্রশংনীয় কাজ করেছে। মসজিদটি খুব সম্ভব সুলতানি আমলের। প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর এ পর্যন্ত (২০০০ খ্রিঃ) কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ না করলেও সরেযমিনে তদন্ত করে ও অন্যান্য সূত্র থেকে আমরা মসজিদ সম্বন্ধে যে সব তথ্য পেয়েছি সেগুলি নিম্নে তুলে ধরা হল। জলাশয়ের নাম মনোহর দিঘি এবং এ নামানুসারেই নাম না জানা এ মসজিদের নামকরণ করা হয়েছে মনোহর মসজিদ।

মনোহর মসজিদের বাইরের দিকে অতিরিক্ত ধ্বংসস্তূপের অবস্থানের কারণে সেদিকের পরিমাপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এ মসজিদের অভ্যন্তরীণ পরিমাপ ২২.৬৭ মিটার × ১৬.১০ মিটার এবং প্রাচীর গুলির প্রশস্ততা আনুমানিক ১.৬৫ মিটার। খননের পরে মসজিদের দেয়ালগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি বলে মসজিদের বিভিন্ন প্রবেশপথ সম্বন্ধে সঠিক বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে মসজিদের ভিতরে যে ২৪টি স্তম্ভ পাওয়া গেছে সেগুলির সাহায্যে মসজিদের অনেক বর্ণনা দেওয়া সম্ভবপর বলে মনে হয়। স্তম্ভগুলি সবই ইষ্টকনির্মিত ও বর্গাকারের এবং সাতগাছিয়া মসজিদের মতো স্তম্ভগুলি উপরের দিকে সরু (tapering) ও এগুলির কোণ কর্তিত (champhered) নয়। এগুলি উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ ৪ সারিতে দণ্ডায়মান ছিল এবং প্রত্যেক সারিতে ৬টি করে ছিল। এই ২৪ টি স্তম্ভ মসজিদের অভ্যন্তর ভাগকে পাঁচটি 'আইল' '(isle) ও সাতটি 'বে' (bay)-তে বিভক্ত করে ছিল। এগুলি দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল প্রায় সম আয়তনের ৩৫টি অপেক্ষাকৃত ছোট বর্গক্ষেত্র। বর্গক্ষেত্রগুলির উপরে যে ৩৫ টি গম্বুজ ছিল তা বলাই বাহুল্য। গম্বুজগুলি সম্বন্ধে পরে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

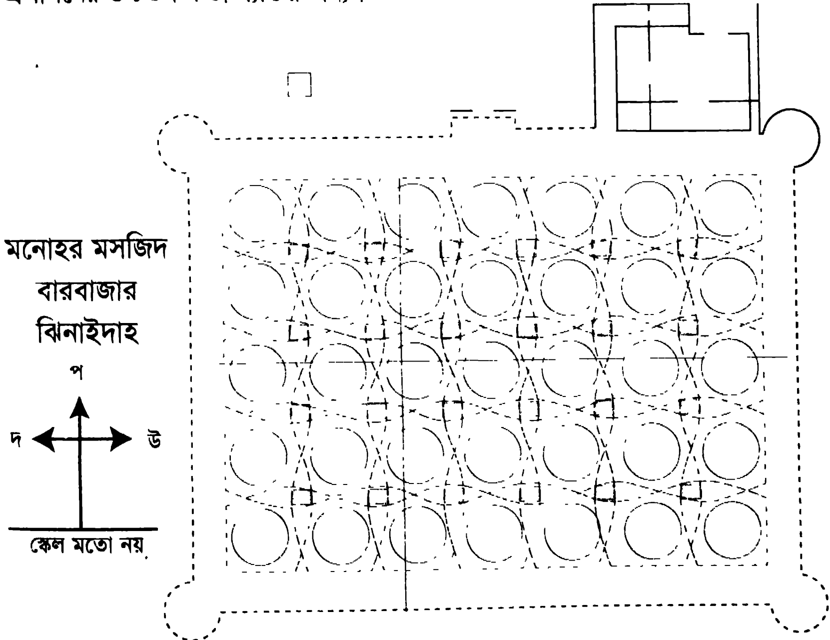
উপরে উল্লিখিত স্তম্ভগুলি থেকে সহজেই ধারণা করা যায় যে, মসজিদের সামনের দেয়ালে ৭টি ও দক্ষিণ দেয়ালে ৫টি প্রবেশপথ ছিল। উত্তর দেয়ালে ক'টি প্রবেশপথ ছিল তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও সাতগাছিয়া মসজিদের মতো সেখানেও বোধ হয় ৩টি কি বড়জোর ৪টি প্রবেশপথ ছিল। উৎখননের পরে মসজিদের উত্তর-পশ্চিম কোণে যে বিভাজন দেয়াল আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে সহজেই ধারণা করা যায় যে, সেখানে দোতলায় একটি ছোট প্রকোষ্ঠ ছিল এবং তা ছিল খুব সম্ভব স্থানীয় প্রশাসনিক প্রধান কর্মকর্তার জন্য নির্দিষ্ট। মসজিদের পশ্চিম দেয়াল পুরাপুরি পাওয়া যায়নি বলে সেখানে মিহরাবের সংখ্যা কত ছিল তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে অনুমান করা যেতে পারে যে, বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ বা সাতগাছিয়া মসজিদের মতো কেন্দ্রীয় মিহরাবের লাগোয়া উত্তরদিকে খুব সম্ভব মসজিদের একটি পশ্চাদ্দার ছিল। সেক্ষেত্রে মসজিদের মিহরাবের সংখ্যা সাতের চেয়ে কম ছিল এবং দ্বিতল প্রকোষ্ঠটির কারণে মিহরাবের সংখ্যা ৬-এরও কম থাকা মোটেই বিচিত্র ছিল না।

২৪ স্তম্ভের অবস্থিতির কারণে মসজিদে যে ৩৫ টি বর্গক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলির উপরে যে ৩৫টি আচ্ছাদনের অস্তিত্ব ছিল তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ

নেই। তবু আচ্ছাদনগুলির স্বরূপ কী ছিল সে সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছুই বলা সম্ভব নয়। তবে সুলতানি আমলে নির্মিত মসজিদগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে ধরনের আচ্ছাদন দেখা যায় আলোচ্য ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ছিল বলে মনে হয় না। সুলতানি আমলের টিকে থাকা একমাত্র গোরাই মসজিদের গম্বুজের মত আলোচ্য মসজিদের গম্বুজ ছিল কিনা তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও প্রায় অনুরূপ আকৃতির অথচ খর্বাকৃতির অর্ধবৃত্তাকারের গম্বুজের অস্তিত্ব বোধ হয় আলোচ্য মসজিদে ছিল। এর বেশি কিছু বলা বোধ হয় সঙ্গত নয়।

মনোহর মসজিদের চারকোণে ৪টি বিরাট আকারের মিনার বা বুরুজ ছিল। তবে উত্তর-পশ্চিম কোণ ও দক্ষিণ-পূর্ব কোণের বুরুজ দুটি ছাড়া অন্য দুটি বুরুজের অস্তিত্ব দেখা যায় না। যে দুটি বুরুজের নিম্নাংশ এখন (১৯৯৬ খ্রিঃ) পর্যন্ত টিকে আছে সেগুলি সেখানে বৃত্তাকারে নির্মিত। তবে এগুলির উপরের অংশ বৃত্তাকার কি অষ্টকোণাকারে নির্মিত ছিল তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয় তথ্যের অভাবে।

মনোহর মসজিদের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি বিভাজন দ্বারা পৃথকীকৃত যে চারটি বর্গাকার অংশের ধ্বংসাবশেষ এখনও (১৯৯৬ খ্রিঃ) পরিদৃষ্ট হয় তাতে ধারণা করা যায় যে, এখানে মসজিদের দ্বিতলে একটি ক্ষুদ্র কক্ষ ছিল এবং তা ছিল খুব সম্ভব স্থানীয় প্রশাসনের উচ্চতম কর্তা ব্যক্তির জন্য।



মনোহর মসজিদের মূল কক্ষের বাইরে উত্তর-পশ্চিম কোণে অথচ মসজিদ সংলগ্ন একটি স্বতন্ত্র কক্ষের অস্তিত্ব দেখা যায় এবং সেই কক্ষের দেয়ালের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ এখনও (১৯৯৬ খ্রিঃ) টিকে আছে। মনোহর মসজিদের ধ্বংসাবশেষের

মধ্যে সেই ক্ষুদ্র কক্ষের পূর্বদিকের দেয়াল ও মুল মসজিদের পশ্চিম দিকের দেয়ালের কিছু অংশের অভিন্নতা দেখে অতিসহজেই বোঝা যায় যে, মসজিদ নির্মাণের সময়েই এই কক্ষটিও নির্মিত হয়েছিল। এই কক্ষটির প্রবেশপথ ছিল পশ্চিম দিকে। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে এটি ছিল মসজিদের ইমামের বাসস্থানের জন্য। এই ধারণা অমূলক নাও হতে পারে। মসজিদের একটি ভূমি পরিকল্পনা তুলে ধরা হল।

মসজিদের দেয়ালের বাইরের দিকে কোনো অলঙ্করণ ছিল কিনা তা বলা খুব সহজ নয়। তবে উৎখননের পর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে অনেক টেরাকোটা চিত্রফলক ও অলঙ্কৃত ইটের অস্তিত্ব দেখে ধারণা করা যায় যে, মসজিদের বাইরের দেয়ালে কিছু কিছু অলঙ্করণ ছিল।

মসজিদে কোনো শিলালিপি বা নির্মাণ সংক্রান্ত অন্য কোনো দলিল পাওয়া যায়নি বলে মসজিদটি কবে নির্মিত হয়েছিল তা নির্দিষ্ট করে বলা সহজ নয়। তবে মসজিদের নির্মাণ কৌশল ও এখানে ব্যবহৃত মাল মসলা দেখে ধারণা করা যায় যে, এটি সুলতানি আমলে বিশেষ করে সেই আমলের শেষদিকে নির্মিত হয়েছিল।

বারবাজারের অন্যান্য কীর্তি

শুকুর মল্লিকের এক গম্বুজ মসজিদ

উপরে উল্লিখিত পীরপুকুর থেকে আনুমানিক ২৫০ মিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ভৈরব নদীর বাম (উত্তর) তীরে হাসিলবাগ মৌজায় শুকুরমল্লিক নামক এক গম্বুজ মসজিদ অবস্থিত বর্গাকারে নির্মিত এই মসজিদের ধ্বংসাবশেষ মাটির উপরে খুব বেশি টিকে নেই এখন (১৯৯৬ খ্রিঃ)। তবে মসজিদের প্রত্যেক বাহু যে বাইরের দিকে ৬.০৬ মিটার দীর্ঘ ছিল তা সহজেই বোঝা যায়। দেয়ালের প্রশস্ততা ছিল প্রায় ১.৫১ মিটার এবং মাটির সামান্য উপর থেকেই তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। দেয়ালের অবশিষ্ট অংশ ইট হরণকারীদের দৌরাত্ম্যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

মসজিদের উপরে একটি মাত্র গম্বুজ ছিল। চারকোণে ছিল ৪টি মিনার (turret)। মিনারসহ গম্বুজটি বর্তমানে (১৯৯৬ খ্রিঃ) বিলুপ্ত। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে মসজিদের ধ্বংসাবশেষটি নির্ণয় করে প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর একটি ভাল কাজ করেছে।

নুনগোলা মসজিদ

মিঠাপুকুরিয়া মৌজার দক্ষিণাংশে রানীমাতার দিঘি নামক প্রাচীন দিঘি থেকে প্রায় ২০০ মিটার দূরে ও নুনগোলা নামক মাঝারি আকারের একটি প্রাচীন জলাশয়ের পশ্চিম তীরে নুনগোলা দিঘি অবস্থিত।

উপরে উল্লিখিত শুকুর মল্লিকের মসজিদ থেকে এই মসজিদের আয়তন কিছুটা ছোট ছিল এবং এ মসজিদের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৫.৪৫ মিটার। মসজিদের চার দেয়াল, চারকোণের বুরুজের ও উপরের গম্বুজসহ বিলুপ্ত হয়ে গেছে ইট হরণকারীদের দৌরাত্ম্যে। চারদিকের দেয়াল ও বুরুজের কিছু কিছু অংশ মাত্র বর্তমানে

(১৯৯৬ খ্রিঃ) টিকে আছে। খুব সম্ভব মসজিদটি সুলতানি আমলের শেষ দিকে নির্মিত হয়েছিল।

পাঠাগার মসজিদ

রানীমাতার দিঘি নামক প্রাচীন জলাশয়ের প্রায় ২০০ মিটার উত্তর-পশ্চিমে এবং বারবাজারে অবস্থিত সি এন্ড বি রাস্তা থেকে প্রায় ১০০ মিটার পশ্চিমে একটি প্রাচীন জলাশয় ছিল এবং জলাশয়ের তীরে বেশ কয়েকটি প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ছিল। সে সব ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটিকে পাঠাগার বলা হত স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক। অসংখ্য ধ্বংসাবশেষ বহনকারী শাহীমহল নামক একটি প্রাচীন স্থানের অংশ বিশেষ ছিল এই পাঠাগারের ধ্বংসাবশেষ। সওদাগরের দিঘিও এ স্থানের নিকটবর্তী। সেই প্রাচীন জলাশয়ের পশ্চিম তীরে পাঠাগার মসজিদ নামে অভিহিত একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে হাল আমলে প্রত্নতত্ত্ব দফতর কর্তৃক।

এই এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৬.০৬ মিটার। কিন্তু মসজিদের চারকোণের চারটি স্তম্ভ (turret) সহ দেয়ালগুলি এবং উপরে অবস্থিত গম্বুজটিও বিলুপ্ত হয়ে গেছে অনেক আগে। ঐ ধ্বংসাবশেষের ইটগুলি দেখে সহজেই বোঝা যায় যে, এগুলি সবই সুলতানি আমলের।

অন্যান্য মসজিদ

বারবাজার এলাকায় পর্যবেক্ষণের (exploration) পরে আরও বেশ কয়েকটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির অস্তিত্বের কথা আগে জানা ছিল না। এগুলি হচ্ছে (১) সাতগাছিয়া মৌজার কোটালি মসজিদ (২) ভৈরব নদীর তীরে সাদিপুর মৌজার নামহীন (unidentified) সমাধি (কোটালি মসজিদের দক্ষিণে অবস্থিত), (৩) বেলাট-দৌলতপুর মৌজার সোনাইদর মসজিদ (৪) চেরাগদানি মসজিদের দক্ষিণে অবস্থিত সাদিপুর মৌজার অজানা মসজিদ (৫) হাসিলবাগ মৌজার হাসিলবাগ মসজিদ, বেলাট-দৌলতপুর মৌজার (৬) সওদাগরের মসজিদ ও অন্যান্য আরও অনেক মসজিদ।

মাযারসমূহ

বারবাজারের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি মাযারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ বহনকারী একটি ছোট ঢিবিকে আমরা আমাদের 'বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে মন্দির বলে পরিচিত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পরবর্তীকালে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রত্নতত্ত্ব দফতর এটিকে একটি মাযারের ধ্বংসাবশেষ বলে চিহ্নিত করেছে (৩১৫ পৃ.)।

১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে উৎখননের পরে ২১ টি পাকা কবর আবিষ্কার করেছে প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর। এগুলির মধ্যে দীর্ঘতম কবরটি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তরনির্মিত ছিল। খুব সম্ভবত এই অসাধারণ কবরটি ছিল এখানকার সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকতা বা এ ধরনের

কোনো বিশেষ ব্যক্তির। ধ্বংসপ্রাপ্ত পাকা কবরগুলি উৎখননের পরে সেখানে নারী ও শিশুদের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে দৃঢ়বিশ্বাস যে, কোনো সন্ত জাতীয় ব্যক্তি (দরবেশ)কে এ স্থানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। এ স্থানটি ছিল খুব সম্ভব এখানকার (বার বাজারের) প্রধান প্রশাসনিক ব্যক্তির পারিবারিক কবরস্থান।

চেরাগদানি মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এবং মসজিদের অব্যবহিত বাইরে—দুটি প্রকাণ্ড পাকা সমাধি (এ সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে) আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু কবরগুলি কাদের তা সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

এখানকার প্রধান প্রধান মসজিদের বাইরে অনেক কবর—এবং সেগুলির অধিকাংশই পাকা কবর—আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু সেগুলি সনাক্ত করা যায় নি। এ গুলি ছাড়াও, বারবাজারের সর্বত্র অসংখ্য এলোমেলোভাবে পড়ে থাকা কবর আবিষ্কৃত হয়েছে। তাতে মনে হয় যে, বারবাজারের সর্বত্র যেখানে-সেখানে মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়েছিল কোনো এক সময়ে এবং এ স্থানে এক সময়ে কোন মহামারি ঘটার কারণে বোধ হয় এমনটি ঘটেছিল। জনসাধারণের বিশ্বাস, একারণেই হয়ত এ স্থান এক সময়ে পরিত্যক্ত হয়েছিল।

শাহিমহল

রানীমাতার দিঘি ও সওদাগরের দিঘির উত্তরে ও বারবাজারে সি এন্ড বি পাকা সড়কের পশ্চিমে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অসংখ্য পাকা ইমারতের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান ছিল এবং যে স্থানে এসব ধ্বংসাবশেষ ছিল তা আয়তনে দুই বর্গ কিলোমিটারের কম হবেনা। বর্তমানে সেই শাহিমহলের পূর্বাংশে বাজার, বিদ্যালয়সমূহ, অফিস গৃহাদি, বাসগৃহসমূহ ইত্যাদি ইত্যাদি নির্মিত হয়েছে। এ অঞ্চল এখনও (১৯৯৬ খ্রিঃ) শাহিমহল নামে পরিচিত। এস্থানের পশ্চিম ভাগে ছিল অসংখ্য নিচু ঢিবি এবং সেগুলিতে প্রাচীন ইট, ইটের টুকরা, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ পাথরের টুকরা ইত্যাদি জাতীয় প্রত্নবস্তু প্রচুর সংখ্যায় বিদ্যমান ছিল। বারবাজার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অসংখ্য পাকা বাড়িঘর এখানকার ইট দিয়ে নির্মিত হয়েছে। আমরা যখন ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে বারবাজারে প্রথম আসি তখন আমরা নিজের চোখে দেখেছি যে, শাহিমহল থেকে লোকজন মাটি খুঁড়ে ইট সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিনা বাধায়।

খুব সম্ভব অতীতে শাহিমহলে অসংখ্য পাকা ইমারতাদির অস্তিত্ব ছিল। খুব সম্ভব বারবাজারের স্থানীয় প্রশাসক, তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাঁদের অফিস গৃহ ইত্যাদি ইত্যাদি শাহি মহলে ছিল। কালক্রমে পরিত্যক্ত এসব ইমারত ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে হতে বিভিন্ন ঢিবিতে পরিণত হয়।

জলাশয়াদি

বারবাজারে যে ১২৬ টি প্রাচীন জলাশয়াদির অস্তিত্ব এক কালে ছিল সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এখানে প্রধান প্রধান জলাশয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে তুলে ধরা হল।

রানীমাতার দিঘি

যশোহর-ঝিনাইদহ পাকা সড়কের প্রায় লাগোয়া পশ্চিমে এবং বারবাজার-সাতগাছিয়া পাকা রাস্তার প্রায় লাগোয়া দক্ষিণে প্রায় ১১ একর (৩৩ বিঘা) আয়তনের এই প্রকাণ্ড জলাশয় অবস্থিত। দিঘিটি পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ এবং এটিকে হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের জলাশয় বলে অভিহিত করার মধ্যে যে ভুল আছে তাতে বোধ হয় কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কারণ হিন্দু বা বৌদ্ধরা পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ কোনো জলাশয়ের পানি যে পান করতেন না, তা ঐতিহাসিক সত্য। সে কারণে তারা উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ জলাশয় খনন করতেন। মুসলমানেরা সাধারণত পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ জলাশয় খনন করতেন। অবশ্য অনেক সময় তারাও উত্তর-দক্ষিণ দীর্ঘ জলাশয় খনন করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

আলোচ্য রানীমাতার দিঘিটি হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের জলাশয় ছিল না। এটি খুব সম্ভব মুসলিম আমলে খনিত হয়েছিল।

সওদাগরের দিঘি

উপরে উল্লিখিত রানীমাতার দিঘি থেকে আনুমানিক ১০০ মিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ১২ একর (৩৬ বিঘা) বারবাজার-সাতগাছিয়া পাকা সড়ক এ জলাশয়ের প্রায় লাগোয়া উত্তর দিক দিয়ে চলে গেছে। এ দিঘির প্রায় লাগোয়া উত্তরেই ছিল একটি শূন্য ময়দান। সেখানে গরু-মহিষের একটি প্রকাণ্ড বাজার বসত। এস্থান ছিল শাহিমহলেরই অংশবিশেষ।

এ জলাশয়ের পাড়গুলিতে অসংখ্য ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ঢিবি রূপে বিদ্যমান ছিল। এগুলি ছিল মসজিদ ও মাযারের ধ্বংসাবশেষ। এ দিঘির পশ্চিম পাড়ে একটি বড় ধরনের ঢিবি ছিল এবং সেখানকার প্রাচীন কীর্তিটি সওদাগরের মসজিদ বলে পরিচিত।

জনশ্রুতিমতে বাঙলার জনপ্রিয় লোক কাহিনী চাঁদ সওদাগর ও মনসাদেবীর লোককাহিনীর নায়ক চাঁদ সওদাগর এ দিঘি খনন করেছিলেন। কিন্তু এই জনশ্রুতির পিছনে কোন সত্য নেই। চাঁদ সওদাগরের মতো এটিও একটি অলীক কাহিনী। খুব সম্ভব মুসলিম আমলে শাহি মহলের জল প্রাপ্তির সুবিধার জন্য এই বিরাট জলাশয় খনিত হয়েছিল। অথবা এটি হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের একটি প্রাচীন জলাশয়ও হতে পারে।

অন্যান্য জলাশয়

বারবাজারে আরও অসংখ্য জলাশয় আছে এবং সে গুলির বর্ণনা বারবাজারের কীর্তিগুলির বর্ণনা দেওয়ার সময়েই দেওয়া হয়েছে।

মন্দিরাদি

আমরা যখন ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে বারবাজারে প্রথমে আসি তখন বিভিন্ন প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অনেক প্রস্তর খণ্ড, অসংখ্য প্রাচীন ইট, প্রাচীন ইটের টুকরা ইত্যাদি ইত্যাদি দেখে মনে করেছিলাম যে, এস্থানে হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের অনেক মন্দিরাদির

ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর কর্তৃক ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত (এবং এর পরেও) বারবাজারের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ব্যাপক উৎখনন কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে। কিন্তু এসব ব্যাপক উৎখননের পরেও হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনো মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ এ পর্যন্ত (২০০০ খ্রিঃ) আবিষ্কৃত হয়নি। এখানে ব্যাপক খননকার্যের (১৯৮৩-৯৬ খ্রিঃ) পরে একটিও হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়নি। আবিষ্কৃত হয়নি হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের অন্য কোনো অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষও। বলা বাহুল্য এখানে যে সব-স্থানে উৎখনন কার্য করা হয়েছে সেগুলির সব ক'টাতেই ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ইমারতাদিই পাওয়া গেছে।

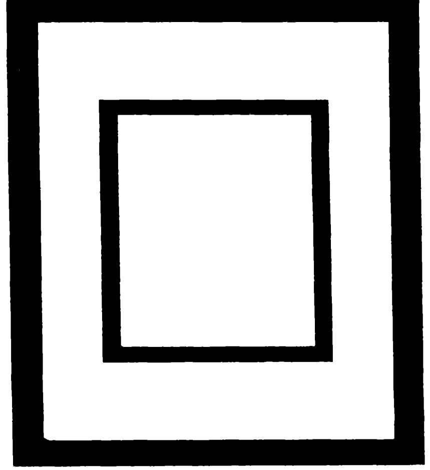
তবে হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু দ্রব্যাদি উৎখনন কার্য ছাড়াও বারবাজারে পাওয়া গেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হিন্দু-বৌদ্ধ মন্দিরে ব্যবহৃত স্তম্ভ, প্রস্তরখণ্ড (slab), লিন্টেল ইত্যাদি প্রাচীন পুকুরের পাড় ও অন্যান্য স্থানে পাওয়া গেছে। এগুলি যে ইসলাম ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত ইমারতাদির ছিল না তাতে সন্দেহ নেই। বারবাজারের পূর্বভাগে অবস্থিত বেড়দিঘির পশ্চিম ও দক্ষিণ পাড়, শ্রী রামবাজার দিঘির পূর্ব ও দক্ষিণ পাড় এবং তথাকথিত গাযী কালু ও চম্পাবতীর কবরগুলির পার্শ্বস্থ ভূমিতে অসংখ্য প্রত্নকীর্তির ধ্বংসাবশেষ লুক্কায়িত আছে। এগুলি সবই প্রাক মুসলিম যুগের কীর্তি বলে আমাদের বিশ্বাস। সে সব স্থানে এ পর্যন্ত কোনো উৎখনন কার্য করা হয়নি। যদি করা হয় তবে সে সব স্থানে হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের অট্টালিকাদির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। যতটুকু মনে হয়, বেড় দিঘি ও তার চারপাশের ভূমিতেই ছিল খুব সম্ভবত প্রাক-মুসলিম আমলের নৃপতিদের বাসস্থান ও অন্যান্য অট্টালিকা, আর রেল লাইনের পশ্চিমে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল প্রজা সাধারণের বসতি। সেখানে কিছু কিছু দিঘি-পুষ্করিণি ও দেবালয়াদি ছিল। মুসলিম আমলে সে স্থানেই খুব সম্ভব শাহি মহলকে কেন্দ্র করে মুসলিম বসতি গড়ে উঠেছিল এবং সেই সঙ্গে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য মুসলিম ইমারত। উৎ খননের পরে আমরা সেগুলির সন্ধানই পেয়েছি।

শ্রীরাম রাজার দিঘি

পাকা সড়ক ও রেল লাইনের পূর্ব দিকে বাদুড়গাছা মৌজায় কয়েকটি প্রাচীন কীর্তির চিহ্ন দেখা যায়। রেল লাইন অতিক্রম করার পরই পরপর কয়েকটি প্রাচীন জলাশয় চোখে পড়ে। পাঁচপীরের দিঘি আলোখাঁর দিঘি, হাঁসপুকুর প্রভৃতি বিভিন্ন নামে এগুলি পরিচিত। এগুলি পার হয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে কিছু দূর গেলেই একটি উন্মুক্ত স্থানে একটি জলাশয় দেখা যায়। এটির নাম শ্রীরাম রাজার দিঘি। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এ দিঘির আয়তন আনুমানিক ১৬০ মিটার × ১০৫ মিটার। প্রশস্ত পাড় গুলি এখনও প্রায় ৪.৫ মিটার উঁচু। পূর্ব ও দক্ষিণ পাড়ে এককালে বাঁধান ঘাট ছিল। দিঘির পশ্চিম ও উত্তর দিকে নিম্নভূমি। দক্ষিণ দিকে প্রশস্ত উঁচু ভূমি। পূর্ব পাড়ের প্রায় ২০০ মিটার × ১০০ মিটার আয়তনের উঁচু ভূমি বর্তমানে চাষের জমি হলেও এককালে যে সেখানে ইমারতাদির অস্তিত্ব ছিল, তা এখানকার ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশই প্রমাণ করে।

বেড় দিঘি

উপরে উল্লিখিত উঁচু ভূমির লাগ পূর্ব দিকে একটি বিচিত্র ধরনের জলাশয় আছে। আনুমানিক ৩৫০ মিটার × ৩৫০ মিটার আয়তনের এই জলাশয়ের কেন্দ্রস্থলে দ্বীপাকারে নির্মিত একটি উঁচু ভূমি আছে। উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ এই দ্বীপাকার ভূমির আয়তন আনুমানিক ৯০ মিটার × ৭৫ মিটার। বাঁশবন ও অন্যান্য গাছ-গাছড়া দ্বারা এস্থান এখন জঙ্গলাকীর্ণ। কোন বেষ্টক প্রাচীর বা কোনো ইমারতের ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে সেখানে নেই। তবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ সেখানে আছে। চারদিকের জল রাশিকে যদি পরিখা বলা যায় তবে সেগুলি ১৫০ মিটারের কম প্রশস্ত হবেনা। এগুলিকে বর্তমানে মাছের চাষ হয়। মাঝখানের দ্বীপাকার ভূমিটি এখন (১৯৭৫ খ্রিঃ) পরিত্যক্ত অবস্থায়ই পড়ে আছে।



বেড় দিঘি

গাযী কালু ও চম্পাবতীর কবর

বেড়দিঘি নামে পরিচিত উপরে উল্লিখিত জলাশয়ের উত্তর ও পূর্ব পাড়ে তেমন কিছুই নেই। উত্তর পাড়ের উত্তর দিকেই ভৈরব নদীর প্রাচীন খাত। পশ্চিম পাড়ের কথা আগেই বলা হয়েছে। দক্ষিণ পাড়ের উঁচু ভূমি প্রায় ৭৫ মিটার প্রশস্ত। দক্ষিণ পাড়ের প্রায় কেন্দ্র স্থলে পাশাপাশি অবস্থানরত ৩টি প্রাচীন কবর আছে। কবর তিনটি আয়তনে বেশ বড়। কবরগুলিতে কোনো শিলালিপি নেই। তবে এগুলি যে তিন জন বিশিষ্ট লোকের সমাধি, তাতে সন্দেহ নেই।

কবরগুলিকে হাল আমলে সংস্কার করে গাযী, কালু ও চম্পাবতীর কবর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে আরবী অক্ষরে সিমেন্ট পলস্তরার উপরে নাম খোদিত করে। কেন্দ্রীয় ও অপেক্ষাকৃত বড় কবরটিকে গাযীর, পশ্চিম দিকেরটিকে কালুর ও পূর্ব দিকেরটিকে চম্পাবতীর কবর বলে অভিহিত করা হয়েছে। এগুলির প্রায় লাগোয়া পশ্চিম-দক্ষিণে একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে। বৃক্ষের তলদেশে একটি পাকা কূপ আছে বলে দাবি করা হয়। গাছের গোড়ায়, মাটির নিচে কিছু প্রাচীন ইট ও ইটের ফাঁকে গুহার মত একটি শূন্য স্থান নযরে পড়ে। একটি কূপ না আরও একটি পাকা কবরের গহ্বর, তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন।

এখানে নাকি আগে প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রে গাযীর ভক্ত ব্যাঘ্রকুলের আগমন ঘটত, এখন নাকি আর তা হয় না। কারণ, জঙ্গলের অভাবে ব্যাঘ্রদের আবাসভূমির নাকি

অভাব ঘটেছে। গাযী পীরের সঙ্গে সংযুক্ত করে এ স্থানের মাহাত্ম্য প্রাচারের কোনো ত্রুটি নেই। একটি অতিজীর্ণ কুটিরে ততোধিক জীর্ণ অবস্থায় একজন ক্ষীণদেহী খাদিম তাঁর অস্তিত্বকে কোন রকমে টিকিয়ে রেখেছেন। গাযীর নামে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই কিছু কিছু লোকের আগমন এখানে ঘটলেও অর্থাগমের অপ্রতুলতা জীর্ণতাকে রোধ করতে সমর্থ হয়নি।

বার বাজারের ইতিহাস

অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র ও জনাব এ. এফ. এম. আবদুল জলীলসহ্ অনেক পণ্ডিতই বারবাজারের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনেক কথাই বলে গেছেন। কেউ কেউ এটিকে প্রাচীন সমতট রাজ্যের রাজধানী বলেও আখ্যায়িত করতে চেয়েছেন। আবার কেউ কেউ 'পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সি' ('Periplus of the Erithrean Sea') গ্রন্থে বর্ণিত গন্ডরিডই বা গঙ্গরিড-এ (Gandaridaya or Gangariday) রাজ্যের রাজধানী এ স্থানে ছিল বলেও উল্লেখ করে গেছেন। কিন্তু উচ্ছ্বাস যত প্রবলই হোক না কেন, তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে কেউ কোনো প্রমাণই দিতে সমর্থ হননি। বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর হাল আমলে (১৯৮৩-৯৬ খ্রিঃ) বারবাজারের পশ্চিমাংশে মোটামুটি ব্যাপক উৎখনন কার্য সম্পন্ন করেছে। কিন্তু এত বড় উৎখনন কার্যের পরেও তারা যে প্রাক-মুসলিম আমলের কোনো কীর্তির ধ্বংসাবশেষেই আবিষ্কার করতে পারেনি এবং উদঘাটিত কীর্তি সমূহের সব ক'টা ধ্বংসাবশেষই যে মুসলিম আমলের কীর্তি সে কথা পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা সমূহে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ফলে প্রাক-মুসলিম আমলের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে এ স্থানের সম্পৃক্ততা এখন পর্যন্ত অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। বেড় দিঘি অঞ্চলে উৎখনন কার্য চালালে হয়ত প্রাক-মুসলিম যুগের কীর্তির সম্বন্ধে কিছু ধারণা জন্মাবার সামগ্রী পাওয়া যেতে পারে। তবে সে প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা মুসলিম আমলের ইতিহাস উদঘাটনেই আত্ম নিয়োগ করতে পারি।

সুলতানি আমলেই যে বারবাজার মুসলিম শক্তির অধিকারে এসেছিল সে প্রমাণ আমরা পেয়ে গেছি এখানে আবিষ্কৃত সুলতানি আমলের অসংখ্য কীর্তির ধ্বংসাবশেষ থেকেই। কিন্তু সুলতানি আমলের ঠিক কোন্ সময়ে এ স্থানে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এ সম্বন্ধে কোনো সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। জোড়বাংলা মসজিদ সংলগ্ন পুকুরে যে ইষ্টকলিপি পাওয়া গেছে (জোড় বাংলা মসজিদ দ্র.) তার পাঠে 'সুলতান মাহমুদ ইবনে হোসেন শাহ' হিজরী ৮০০' আছে বলে জনাব নাসির হেলাল 'সীমান্ত' নামক পুস্তিকায় বলেছেন এবং সেই পুস্তিকাতে লিপিটির একটি ফটোকপিও প্রকাশ করেছেন। এ লিপিটির পাঠ মোটেই সন্দেহাতীত নয়। কারণ, হিজরী ৮০০ সালের সমসাময়িক কাল হল ১৩৯৬-৯৭ খ্রিস্টাব্দ। তখন বাঙলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন ইলিয়াস শাহ্র পুত্র সুলতান সেকান্দর শাহ্র (১৩৫৭-৯১ খ্রিঃ) পুত্র সুবিখ্যাত সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন আযম শাহ (১৩৮৯-১৪১১ খ্রিঃ)। অতএব তিনি ইষ্টকলিপির হোসেন শাহ্র পুত্র মাহমুদ শাহ্ হতে পারেন না। বাঙলার ইতিহাসে একজন হোসেন শাহই (সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ্) ছিলেন এবং তাঁর রাজত্বকাল ছিল ১৪৯৩-

১৫১৯ খ্রিঃ। মাহমুদ (সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্, ১৫৩৩-৩৮ খ্রিঃ) নামক তাঁর এক পুত্রও ছিলেন। অতএব ১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দের সুলতান মাহমুদ আলাউদ-দীন হোসেন শাহ্‌র পুত্র হতে পারেন না। বাঙলার ইতিহাসে হোসেন শাহ্‌র পুত্র সুলতান মাহমুদ নামক আর কোনো ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই। এই ইষ্টকলিপির তারিখ যদি মাহ্মুদ শাহ্ হোসেন শাহ্‌র আমলের হত তবে তা গ্রহণযোগ্য হলেও বারবাজারে মুসলিম অধিকার সম্বন্ধে যে সমস্যা আছে তার সমাধান হয় না। হোসেন শাহ্ বা তাঁর পুত্রদের আমলে যে বারবাজার মুসলমানের অধিকার ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এতে আমাদেরও কোনো সন্দেহ নেই।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সোহ্‌রাব উদ্-দীন যে শিলালিপিটির কথা উল্লেখ করেছেন[১] (চেরাগদানি মসজিদ দ্র.) তাতে বলা হয়েছে যে, ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান হোসেন শাহ্‌র রাজত্বকালে মোহাম্মদ নামক জনৈক উযীর একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এ শিলালিপিও বারবাজারে প্রথম মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার সমস্যা সমাধান করে না। এ সমস্যার সমাধান করে না বাগেরহাটের খান-ই-জাহানের সমাধির ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দের সমাধি-লিপিও। পটুয়াখালি জেলার মীর্যাগঞ্জ মসজিদের সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ্‌র ১৪৬৫ খ্রিস্টাব্দের শিলালিপিও এ ব্যাপারে আমাদেরকে সাহায্য করে না।

কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে দিল্লীর সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন বলবনের রাজত্বকালে (১২৬৫-৯৭ খ্রিঃ) বাঙলায় তাঁর বিদ্রোহী শাসনকর্তা মুঘিস-উদ-দীন তুঘরিল কর্তৃক দক্ষিণবঙ্গ অধিকৃত হয়েছিল। মুঘিস-উদ-দীন ১২৮১ খ্রিস্টাব্দের দিকে বলবনের ভয়ে তাঁর দুর্ভেদ্য নরকিলা দুর্গ থেকে জাজনগরের দিকে পলায়নের সময় দক্ষিণ বঙ্গের উত্তরাঞ্চল (কুষ্টিয়া জেলা) দিয়ে পলায়ন করলেও দক্ষিণবঙ্গ তাঁর অধিকারে এসেছিল এমন কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ প্রামাণ্য ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় না। রাঢ় অঞ্চলে যে মুসলিম অধিকার ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে প্রমাণ পাওয়া যায় হুগলি-পাণ্ডুয়ার বিরাট মসজিদ ও ত্রিবেণীতে বিখ্যাত সমরনায়ক জাফর খান গাযীর বিভিন্ন কীর্তিকলাপ থেকেও। রাঢ় অঞ্চলের নিকটবর্তী ভাগীরথীর অপর তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ২৪ পরগণা জেলার কিছু কিছু স্থানে যে ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রত্নপ্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ত্রিবেণীর নিকটবর্তী ২৪ পরগণা জেলার সীমাবদ্ধ স্থানে সে সময়ে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও ২৪ পরগনা জেলার অন্যান্য ও এ জেলার বাইরে ও দক্ষিণ বঙ্গের অন্যান্য স্থানে যে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে প্রমাণ প্রামাণ্য ইতিহাসে নেই। দক্ষিণ বঙ্গের অন্যান্য স্থানে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে আরও অনেক সময় লেগেছিল বলে প্রামাণ্য ইতিহাস বলে।

খুব সম্ভব দক্ষিণ বঙ্গে প্রথম মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাজা গণেশ-তনয় ধর্মান্তরিত মুসলিম নৃপতি জালাল-উদ-দীন মোহাম্মদ শাহ্ ওরকে যদুর রাজত্বকালে

১. অধ্যাপক মোহাম্মদ সোহরাব উদ-দীন : Journal of the Vaendra Research Museum, Vol. IV, PP. 75-75, 1975-76.

(১৪১৭-৩২ খ্রিঃ)। খুব সম্ভবত তিনিই বাগেরহাটের সুবিখ্যাত দরবেশ-সৈনিক উলুঘ খান-ই-জাহানকে (মৃত্যু ১৪৫৯ খ্রিঃ) প্রচুর সৈন্য ও অপরিমেয় শাসন ক্ষমতা দিয়ে দক্ষিণ বঙ্গে পাঠিয়েছিলেন সেখানে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ইসলাম প্রচারের জন্য। উভয় কাজেই খান-ই জাহান যে সফলকাম হয়েছিলেন প্রামাণ্য ইতিহাসই তা প্রমাণ করে। দক্ষিণবঙ্গে বিশেষ করে খুলনা-যশোহর অঞ্চলে খান-ই-জাহান কর্তৃক সুবিশাল ষাটগম্বুজ মসজিদসহ অসংখ্য মুসলিমকীর্তি নির্মাণ (বৃহত্তর খুলনা জেলা দ্র.), অসংখ্য বিরাট বিরাট দিঘি খনন ও অনেক পাকা সড়ক নির্মাণ এ ধারণার পিছনে সমর্থন যোগায়। জালাল উদ-দীন মোহাম্মদ শাহ্‌র পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সুলতান নাসির-উদ্-দীন মাহমুদ শাহ্‌ও (১৪৩৬-৫৯ খ্রিঃ) খুব সম্ভব খান-ই-জাহানকে একই ধরনের স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন ইসলাম প্রচার ও রাজ্যশাসনের ব্যাপারে। খান-ই-জাহান কোনো স্বাধীন নৃপতি ছিলেন না। তিনি বিশাল এলাকায় মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা করে সেখানে স্বাধীন নরপতির মতো কার্য করলেও তিনি কোনো মুদ্রা প্রচলন করেন নি বরং অতীব নিষ্ঠার সঙ্গে ইসলাম প্রচার ও প্রজা পালনের কাজ করে গেছেন। সে সময়ের বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাস খুব পরিষ্কার না হলেও অসাধারণ ক্ষমতা না থাকলে তিনি যে তাঁর কার্যে অসাধারণ সাফল্য লাভ করতে পারতেন না তা বলাই বাহুল্য।

খান-ই-জাহানের যশোহর-খুলনা অঞ্চলে অভিযান সম্বন্ধে নানা রকম গালগল্প থাকলেও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস যে খুব একটা নেই তা বলাই বাহুল্য। সতীশচন্দ্র মিত্র যশোহর-খুলনার ইতিহাস গ্রন্থে এই অভিযান সম্পর্কে যে সব কথা বলে গেছেন তার কোনটাই প্রামাণ্য ইতিহাস নয়, সবই-গালগল্প বলে ধরা যায়। তবে গৌড় থেকে খান-ই-জাহান যে খুলনা বিভাগের উত্তরাঞ্চল হয়ে দক্ষিণ দিকে গিয়েছিলেন তা অতি সহজেই ধারণা করা যায়। সেক্ষেত্রে তিনি যে বারবাজার হয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন তাও সহজেই অনুমেয়। বারবাজারে খুব সম্ভব তখন কোনো অমুসলিম নৃপতি ছিলেন। সেই রাজার রাজবাড়ি ছিল খুব সম্ভব বেড়দিঘি এলাকায়। খুব বড় না হলেও সেখানে যে দুই বাহিনীর মধ্যে একটি যুদ্ধ হয়েছিল তাও অনুমেয়। সেই যুদ্ধে মুসলিম শক্তি বিজয়ী হলেও তাদের অন্তত তিনজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি যে নিহত হয়েছিলেন বেড় দিঘির দক্ষিণে তিনটি পাকা সমাধির অস্তিত্বই তা প্রমাণ করে। এ তিনটি কবরকে অনেক পরবর্তীকালে তথাকথিত গাযী, কালু ও চম্পাবতীর মাযার বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। খুব সম্ভব বিজয়ী মুসলিম বাহিনী রাজার বাড়ি অধিকার করে সেখানেই তিনজন সেনাপতির মৃতদেহ সমাহিত করেছিল।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে গাযী কাহিনীর উদ্ভটতা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। সেকান্দর বাহশাহর পুত্র গাযী বা বরখান গাযী নামক কোনো ব্যক্তির সন্ধান বাঙলার প্রামাণ্য ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সুলতান ইলিয়াস শাহ্‌র পুত্র সুলতান সেকান্দর শাহ্ (১৩৫৭-৯১ খ্রিঃ) অথবা এ নামের বাঙলার অন্য কোনো নৃপতির গাযী নামক কোনো পুত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। কাল্পনিক গাযী পীর বা বরখান গাযীর ঐতিহ্য (tradition) গড়ে উঠেছে ত্রিবেণীর বিখ্যাত বীর জাফর খান গাযী থেকে। তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চল জয় করে ত্রিবেণীর বিখ্যাত মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে। বরখান গাযীর কাল্পনিক ট্রাডিশন গড়ে উঠেছিল আরও অনেক পরে। আরও অনেক পরে সুন্দরবন অঞ্চলের প্রাচীন জনপ্রিয় অথচ কাল্পনিক ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়ের মুসলিম প্রতিমূর্তি (counterpart) হিসাবে গড়ে উঠেছিল এ গাযী পীরের ট্র্যাডিশন।

মুসলিম সমাজে কাল্পনিক গাযী পীরের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল ষোড়শ শতাব্দীর শেষ অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এবং কালক্রমে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকই গাযী পীরকে পূজা করতে থাকেন এবং এই ট্রাডিশন চলমান। দক্ষিণ রায়ের ঐতিহ্য খুবই প্রাচীন। অথচ গাযী পীরের ঐতিহ্য অনেক পরবর্তীকালের হলেও বেশ ব্যাপক। এ সমস্ত প্রসঙ্গ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে 'গাজী-কালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান' নামক একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে গ্রন্থকারকর্তৃক বিশদভাবে আলোচনা করেছে এবং গাযী পীরের ট্রাডিশন যে কাল্পনিক তা প্রমাণ করার চেষ্টা সেখানে করা হয়েছে।

গাযীপীরের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে বারবাজারের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যেতে পারে। বারবাজারের কীর্তিগুলিকে সরেযমিনে দেখার পর এ সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে, এগুলি খান-ই-জাহানের সময়ে নির্মিত হয়নি। বারবাজারের ধ্বংসাবশেষগুলি দেখে আরও মেনে নিতে হয় যে, মোঘল আমলের কোনো কীর্তির ধ্বংসাবশেষ এখানে নেই। এতে ধরে নিতেই হয় যে, মোঘল আমলে এ স্থানের অবস্থা মোটেই সমৃদ্ধিশালী ছিল না। যে কোনো কারণেই হোক খুব সম্ভব এস্থানে মোঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই এ স্থান পরিত্যক্ত হয়েছিল।

খুব সম্ভবত ভৈরব নদী নাব্যতা হারাবার পরেই এক সময়ের সমৃদ্ধিশালী স্থান বারবাজার তার সমৃদ্ধি হারিয়ে ফেলে এবং ভৈরব মরা নদীতে পরিণত হলে এ স্থানের চরম দুর্দশা ঘটে। কিন্তু এই পরিণতির পূর্বে এস্থান যে অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ও ঘনবসতিপূর্ণ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় এস্থানে অসংখ্য প্রত্নকীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখেই। প্রায় ২০ থেকে ২৫ বর্গ কিলোমিটার স্থান জুড়ে এখানে নির্মিত হয়েছিল অসংখ্য প্রাচীন কীর্তি। মসজিদ ছাড়া অন্যান্য কীর্তির ধ্বংসাবশেষ না পাওয়া গেলেও খুব সহজেই ধারণা করা যায় যে, বারবাজারে বিশেষ করে শাহী মহলে আরও অনেক অন্য ধরনের কীর্তিও ছিল। এ স্থানের সব কীর্তির ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি—কোনোদিন হবে কিনা তাতে প্রচুর সন্দেহ আছে। তবে ২টি ৩৫ গম্বুজ মসজিদ, ১টি ১৫ গম্বুজ মসজিদ, ১টি ৬ গম্বুজ মসজিদ, ১টি ৪ গম্বুজ মসজিদ ও অসংখ্য এক গম্বুজের মসজিদ যেখানে ছিল সেখানে হাজার হাজার নয়, কয়েক লক্ষ লোকের বসতি যে ছিল তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। এসব মসজিদ যে এস্থানের প্রয়োজন মিটানোর জন্য নির্মিত হয়েছিল তাতেও কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

অথচ এতগুলি মসজিদ কেন ধ্বংসপ্রাপ্ত হল এবং জনবহুল একটি বিরাট এলাকা কেন পরিত্যক্ত হয়ে অরণ্যে পরিণত হল, সে সম্বন্ধে কোনো সন্তোষজনক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। বারবাজার অঞ্চলের কোনো কোনো লোকের বিশ্বাস, মোঘল আমলের কোনো অমুসলিম সুবাদার কর্তৃক এসব কীর্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল। এর চেয়ে হাস্যকর ও অগ্রহণযোগ্য প্রস্তাব আর কিছুই হতে পারে না। সুবাদার অমুসলিম

হলেও রাজ্যটা ছিল মুসলিম মোঘল সম্রাট । সেখানে এ ধরনের অবিশ্বাস্য ঘটনা কিছুতেই ঘটতে পারে না।

এসব গাঁজাখুরি গল্প বাদ দিয়ে বারবাজার ধ্বংসের অন্য ও যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজতে হবে। ভৈরব নদীর নাব্যতা হারানোর ফলে এ স্থানের সমৃদ্ধিতে বাধা পড়েছিল তা অনুমান করা যায়। তবে এরপরেও শহরটি যে কোনো না কোনো প্রকারে টিকে ছিল সেধারণাও যুক্তিসঙ্গত। তবে এখানে যে মহামারি হয়ে হাজার হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছিলেন সে কথাও এখানকার লোকমুখে শোনা যায়। আর এর সমর্থনে একটি অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় বারবাজারের প্রায় সর্বত্র মাটির নিচে অসংখ্য নরকঙ্কাল এলোমেলোভাবে প্রোথিত অবস্থায় দেখে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহামারির অবস্থা এক সময়ে এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল যে, মৃতদেহ যেখানে-সেখানে পুঁতে রাখা হয়েছিল। আর এই অবস্থার ফলে এখানকার জীবিত অধিবাসীরা বোধ হয় প্রাণভয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। ফলে পরিত্যক্ত এ নগরী জনশূন্য ও জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়েছিল এবং ইমারতগুলি সব ভেঙ্গে পড়েছিল এবং অনেক পরে বারবাজারের ধারে কাছে নতুন করে জনবসতি গড়ে উঠলে তারা ইটগুলি সব সরিয়ে নিয়েছিলেন।

সতীশ বাবু আর আবদুল জলিল সাহেব বারবাজারের জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থার কথা বলেছেন। এমনকি আমরা যখন এ স্থান ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম দেখি তখনও বারবাজার ছিল সম্পূর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ। বর্তমানে উৎখননের পর এত সব প্রত্নকীর্তি উদ্ধারের পরও বারবাজারের লোক বসতির খুব একটা উন্নতি ঘটেনি।

মাগুরা জেলা

মুসলিম আমল

মোহাম্মদপুরের কীর্তি

মাগুরা থেকে প্রায় ২৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মধুমতী (স্থানীয় নাম এলেংখালী) নদীর তীরে অবস্থিত মোহাম্মদপুর সপ্তদশ-অষ্টদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত জমিদার রাজা সীতারাম রায়ের কীর্তি সমূহের জন্য বিখ্যাত। এস্থানে খুব সম্ভব প্রাচীন কালেও একটি জনপদের অস্তিত্ব ছিল। সে সময়ের বিশেষ কোনো কীর্তির চিহ্ন পাওয়া না গেলেও এখানে প্রাচীন গুপ্ত যুগের মুদ্রা পাওয়া গেছে।

বর্তমান কালে এস্থান রাজা সীতারাম রায়ের কীর্তির জন্যই বিখ্যাত। মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারের একজন আমলা ছিলেন তাঁর পিতা। নিজের প্রতিভা বলে সীতারাম নবাব সরকার থেকে প্রথমে জমিদারি ও পরে রাজা উপাধি লাভ করেন। তিনি শক্তি সঞ্চয় করে পার্শ্ববর্তী জমিদারের রাজ্য অধিকার করেন এবং নবাব সরকারে দেয় রাজস্ব বন্ধ করে দিয়ে স্বাধীন নৃপতির মতো ব্যবহার করতে শুরু করেন। নবাবের ফৌজদার মীর আবু তোরাব তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসে পরাজিত ও নিহত হন। নবাব মুর্শিদ কুলি খান তখন বখ্‌শ্‌ আলী খাঁর নেতৃত্বে উপযুক্ত সৈন্য পাঠিয়ে সীতারামকে পরাজিত, বন্দী ও নিহত করেন। এ ঘটনা ঘটে ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে। সীতারাম মোহাম্মদপুরে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ, রাজপ্রাসাদ, অসংখ্য মন্দির ও অন্যান্য ইমারতাদি নির্মাণ এবং বেশ কয়েকটি দিঘি খনন করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে নাটোরের জমিদার এ স্থানের অধিকারী হন এবং এখানে কিছু কীর্তি স্থাপন করেন।

মোহাম্মদপুর দুর্গ

প্রায় বর্গাকারে নির্মিত এ দুর্গে প্রত্যেক বাহু ১.৫ কিলোমিটারে চেয়ে কিছু বেশি দীর্ঘ ছিল। চারদিকে ছিল মাটির তৈরি উঁচু প্রাচীর, প্রাচীরের বাইরে ছিল প্রশস্ত ও গভীর পরিখা। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ছিল দুর্গের প্রধান প্রবেশপথ। পূর্ব ও উত্তর দিকের পরিখা প্রায় মজে গেছে। কিন্তু দক্ষিণ দিকের পরিখাটি এখনও তার অতীত গৌরবের চিহ্ন বহন করে আসছে। এটি ছিল খুবই প্রশস্ত এবং ১.৫ কিলোমিটারের চেয়েও দীর্ঘ এ পরিখা দেখতে ছিল প্রায় নদীর মতো। পশ্চিম দিকের পরিখাটিও ছিল বেশ বড়। সেটির চিহ্ন এখনও টিকে আছে। বর্তমানে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ মাত্র টিকে আছে।

দুর্গের বাইরে দক্ষিণ দিকে প্রায় ৭৫০ মিটার দূরে পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ একটি বিরাট মাটির প্রাচীর ছিল। বাইরের গড় নামে পরিচিত এই প্রাচীর ১.৫ কিলোমিটারের চেয়েও

বেশি লম্বা ছিল। এই প্রাচীরের বাইরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সীতারাম কর্তৃক খনিত বিখ্যাত রামসাগর দিঘি অবস্থিত।

দুর্গের অভ্যন্তরে ছিল রাজপ্রাসাদ, বিলাসগৃহ, কোষাগার, মালখানা, তোষাখানা, নওবতখানা, গোলাঘর, কারাগার, দশভূজার মন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির, জোড়বাঙলা কৃষ্ণমন্দির, শিবমন্দির, দোলমঞ্চ প্রভৃতি ইমারত ও বেশ কয়েকটি জলাশয়। পার্শ্ববর্তী কানাইনগর, মথুরানগর, শ্যামনগর প্রভৃতি গ্রামেও সীতারাম অনেক কীর্তি স্থাপন করেন। প্রায় সব কীর্তিই বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। পরবর্তী কালে নাটোরের জমিদার রামচন্দ্র কর্তৃক নির্মিত প্রাসাদ ও পদ্মপুকুর দুর্গের অভ্যন্তরেই অবস্থিত ছিল। পদ্মপুকুর এখনও টিকে আছে।

রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য ইমারত

দুর্গের উত্তর-পশ্চিম কোণ ঘেঁষে লক্ষ্মীনারায়ণ পুকুরের পশ্চিম পাড়ে রাজা সীতারাম তাঁর প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। এটি ছিল বড় ধরনের একটি অট্টালিকা। কিন্তু বর্তমানে এটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে বলে এর কোন বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। প্রাসাদের সামান্য পশ্চিমে ছিল তাঁর বিলাসগৃহ এবং দক্ষিণ পূর্ব দিকে জোড়বাঙলা কৃষ্ণমন্দিরের পূর্ব-দক্ষিণে ছিল নহবত খানা। তাঁর কোষাগার ও মালখানা ছিল অনেক পূর্বদিকে একটি সংরক্ষিত স্থানে। তাঁর গোলাঘর ছিল অনেক দক্ষিণে।

রাজপ্রাসাদের চারদিকে ছিল অনেক মন্দির। এ গুলির মধ্যে দশভূজার মন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির, শিবমন্দির, ও জোড়বাঙলা মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোষাগারের অনেক পূর্বে ছিল সুবিখ্যাত দোলমঞ্চ মন্দির।

রামসাগর ও অন্যান্য জলাশয়

মোহাম্মদপুরে অনেক জলাশয় আছে। এগুলির মধ্যে রামসাগর, সুখসাগর, কৃষ্ণসাগর, পদ্মপুকুর ইত্যাদি দিঘি উল্লেখযোগ্য। দুর্গ তোরণের পূর্ব দিকে বাইরের গড়েরও পূর্বে রামসাগর অবস্থিত। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এই বিরাট জলাশয়ের শুধু জল ভাগের আয়তনই ৭৫০ মিটার × ২৮০ মিটার। পাড়সহ এর আয়তন প্রায় ৬৭ একর। দিঘির পানি অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সুপেয়। সীতারাম নিজের নামানুসারে দিঘির রাখেন রামসাগর।

সুখসাগর

রামসাগরের কিছু পশ্চিমে এই জলাশয় অবস্থিত। বর্গাকারে নির্মিত এ দিঘির জল ভাগের আয়তন ১১৩.৬৯ মিটার × ১১৩.৫৯ মিটার। দিঘির মাঝখানে একটি দ্বীপ আছে। এ দ্বীপে একাধিক তল বিশিষ্ট একটি ইমারত ছিল। সীতারাম এখানে গ্রীষ্মকালে বাস করতেন। রাজ প্রাসাদের বাইরে এটি ছিল তাঁর বিলাসগৃহ এবং এখানে তিনি আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাতেন। এটি এখন বিলুপ্ত।

লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির

দুর্গের ভিতরে সীতারামের প্রাসাদের কিছু দক্ষিণে এই বিচিত্র মন্দির অবস্থিত ছিল। অষ্ট কোণাকৃতির এই মন্দিরের উপরে ফ্লাট ধরনের (vaulted) ছাদ ছিল। মন্দিরটি খুব বড় ছিল না। এ মন্দির তথা মোহাম্মদপুর সম্পর্কে একটি মুখরোচক গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি নিম্নরূপ :

সীতারামের রাজধানী তখন ভূষণায়। তিনি বর্তমান মোহাম্মদপুরে রাজধানী স্থানান্তরের মানসে ঘোড়ায় চড়ে এস্থান দেখতে এলে একস্থানে তাঁর ঘোড়ার পা মাটির নিচে দেবে গিয়ে আটকে যায়। অনেক চেষ্টার পরেও ঘোড়া পা তুলতে না পারলে স্থানটি খনন করা হয় এবং তাতে দেখা যায় যে ভূগর্ভস্থ একটি প্রাচীন মন্দিরের চূড়ায় ঘোড়ার পা আটকে আছে।

সেই দেবমন্দিরের ভিতরে নাকি ছিল লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ। সীতারাম সে স্থানেই তাঁর দুর্গ ও বাসস্থান নির্মাণ করেন এবং প্রাচীন মন্দিরের স্থানে একটি অষ্ট কোণাকৃতির লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির নির্মাণ করেন। এবং সেখানে প্রাচীন বিগ্রহটি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির গাত্রে যে লিপি ছিল, তা থেকে জানা যায় যে এটি ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরটি বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

জোড়বাঙলা মন্দির ও দশভূজার মন্দির

লক্ষ্মীনারায়ণ পুকুর সীতারামের প্রাসাদের পূর্ব দিকে অবস্থিত। এই বৃহৎ জলাশয়ের দক্ষিণ পাড়ে দশভূজার মন্দির অবস্থিত ছিল। মন্দির গাত্রে যে লিপি ছিল, তা থেকে জানা যায় যে ১৬২১ শকাব্দে (১৬৯৯-১৭০০ খ্রিঃ) এটি নির্মিত হয়েছিল। দশভূজা মন্দিরের কিছু পূর্ব দিকে ছিল শ্রীকৃষ্ণের জোড় বাঙলা মন্দির। দুটি দোচালা ঘরের পাকা ছাদের সংযোজনে সৃষ্ট ছিল এ মন্দিরের পাকা ছাদ। এ ধরনের জোড়বাঙলা মন্দিরের বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্ত সপ্তদশ-অষ্টদশ শতাব্দীতে দেখা যায়। এ মন্দিরটি নির্মাণের সঠিক সন-তারিখ পাওয়া যায়নি। খুব সম্ভব এটি এ স্থানের অন্যান্য মন্দিরের সমসাময়িক। মন্দির দুটি বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

দোলমঞ্চ

মোহাম্মদপুর দুর্গনগরীর উত্তর-পূর্ব কোণের দিকে এবং দুর্গ তোরণের কাছে পরবর্তীকালে নাটোরের মহারাজা রামচন্দ্র কর্তৃক খনিত পদ্মদিঘির প্রায় ৫০০ মিটার উত্তরে একটি বিরাট দোলমঞ্চ রাজা সীতারাম কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। বর্গাকারে নির্মিত নিচের প্রকাণ্ড বেদির উপরে ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় বেদি। তৃতীয় বেদির উপরে ছিল দোলমঞ্চের চূড়া। মোঘল ও হিন্দু স্থাপত্যের সমন্বয়ে গঠিত মঞ্চের চূড়াটি গম্বুজাকারের হলেও চতুষ্কোণ ও কিছুটা দীর্ঘাকৃতির ছিল। এখানেই হোলি উৎসবের সময়ে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপন করা হত। দোলমঞ্চটির কিছু ধ্বংসাবশেষ এখনও টিকে আছে।

রাজা রামচন্দ্রের বাড়ি ও পদ্মপুকুর

সীতারামের পতনের পরে এ স্থান নাটোর রাজের জমিদারিতে পরিণত হয়। নাটোরের রাজা রামচন্দ্র মোহাম্মদপুর দুর্গ তোরণের কিছু উত্তরে পদ্মপুকুর নামক একটি বৃহৎ জলাশয় খনন করেন। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ দিঘির পশ্চিম তীরে তিনি একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। পদ্মপুকুর এখনও টিকে আছে। কিন্তু রাজবাড়ি এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

পঞ্চরত্ন মন্দির ও কৃষ্ণসাগর

সুখসাগরের পশ্চিমে এবং বাইরের গড়েরও পশ্চিমে অবস্থিত কানাইনগর গ্রামে সীতারাম কৃষ্ণসাগর নামক একটি জলাশয় খনন করেন। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ দিঘির আয়তন ছিল ৩০৩.০৩ মিটার × ১০৬.০৬ মিটার।

কৃষ্ণসাগর দিঘির পাড়েই সীতারাম একটি পঞ্চরত্ন মন্দির নির্মাণ করেন। পূর্বমুখী এ মন্দিরের আয়তন ও উচ্চতা (১০ বর্গমিটার) সীতারাম কর্তৃক নির্মিত অন্যান্য মন্দিরের চেয়ে বেশি ছিল। পূর্ব দিকে ছিল অর্ধবৃত্তাকারের খিলানের সাহায্যে নির্মিত ৩টি প্রবেশপথ (arches)। এর পরেই ছিল বারান্দা এবং বারান্দার পরেই ছিল মন্দিরের গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহের উপরে ১টি এবং মন্দিরের চার কোণে ৪টি চূড়া বা রত্ন ছিল বলে এ মন্দিরের নাম ছিল পঞ্চরত্ন মন্দির। গর্ভগৃহের উপরে অবস্থিত চূড়াটি ছিল খুবই উঁচু। গর্ভগৃহে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মন্দিরের দেয়াল বিশেষ করে পূর্ব দেয়াল নানা মূর্তির সাহায্যে অলঙ্কৃত ছিল। এ গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতি মূর্তি। মন্দিরটি বর্তমানে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

রায়নগরের মঠ

মাগুরা শহর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে রায়নগর নামক স্থানে একটি সুন্দর মঠ ছিল। বর্গাকারে নির্মিত মঠের নিম্নদেশে বাইরের মাপ ছিল ৬.৯৯ মিটার × ৬.৯৯ মিটার এবং ভিতরের মাপ ছিল ৪.০৯ মিটার × ৪.০৯ মিটার এবং দেয়ালগুলি ছিল ১.৩৯ মিটার প্রশস্ত। ভিতরের কক্ষের উচ্চতা ছিল প্রায় ৮ মিটার। এর পরে ইমারতটি ক্রমশ সরু হয়ে মঠের আকারে উপরে উঠেছিল এবং এর উচ্চতা ছিল প্রায় ১২.১২ মিটার। মঠের ভগ্ন ইষ্টক লিপির পাঠ যা পাওয়া গিয়েছিল তা নিম্নরূপ :

"শাকে ব্যোমামৃতকর—শর—ক্ষৌণি সংপাদিতে হস্মিণ
প্রাসাদোহয়ং ব্যরচি মহতা বিশ্ব নাথাত্মজেন।"

অর্থাৎ, ব্যোম (০), অমৃতকর (চন্দ্র=১) শর (৫) ও ক্ষৌণি (১) অঙ্কস্য বামাগতিতে ১৫১০ শকাব্দে (১৫৮৮ খ্রিঃ) বিশ্বনাথের পুত্র কোনো ভক্ত কর্তৃক এ প্রাসাদ বা মঠ নির্মিত হয়েছিল।

মঠের গায়ে অতি সুন্দর পোড়ামাটির চিত্রফলকের অলঙ্করণ ছিল। পদ্মফুল, লতাপাতা, বিভিন্ন মূর্তি ইত্যাদির অলঙ্করণ এতে ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই মঠের দক্ষিণ ও পূর্ব দেয়াল ধসে পড়েছিল। বর্তমানে মঠটি ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে নির্মিত এই সুন্দর অলঙ্করণযুক্ত মঠটি বোধ হয় বঙ্গের প্রাচীনতম মঠগুলির মধ্যে অন্যতম।

সত্রাজিৎপুর মদনমোহন মন্দির

মাগুরা জেলার সত্রাজিৎপুর গ্রামে মদনমোহন মন্দির নামে পরিচিত একটি প্রাচীন মন্দির আছে। ১৬৯৩ সালে নির্মিত বর্গাকার এ মন্দিরের প্রত্যেক বাহুছিল প্রায় ৪.৫৭ মিটার ১৪.৭৫ ফুট দীর্ঘ।

নান্দিয়ালা মদন মোহন মন্দির : মাগুরা জেলার এ মন্দির ১৭৩৩ সালে নির্মিত এবং বর্গাকারে নির্মিত এর প্রত্যেক বাহু ছিল ৩.৯৩ মিটার (১৩ ফুট) দীর্ঘ। সামনের দেয়ালে ছিল টেরাকোটা শিল্পের অলঙ্করণ।

ভূষণা দুর্গ

মাগুরা জেলার অন্তর্গত ও জেলা সদর থেকে অনেক দুরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এবং ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারি থানা থেকে কয়েক কিলোমিটার উত্তরে মোঘল আমলের একটি মাটির দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এটিকে ভূষণার দুর্গ বলা হয়।

যশোহর জেলা

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ

মুড়লীকসবা

বর্তমান যশোর শহরের উত্তরাংশ এককালে মুড়লীকসবা নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন ভৈরব নদীর তীরবর্তী এস্থানের কাছেই ছিল বগচর নামক আর একটি প্রাচীন স্থান। তখন যশোর (যশোহর) শহরের নামকরণ হয়নি। সুলতানী আমলে বর্তমান যশোর শহর এলাকার বেশি ভাগ মুড়লী কসবা নামে পরিচিত ছিল। মাত্র ব্রিটিশ আমলে এসব স্থান যশোহর নাম ধারণ করে।

মুড়লী বেশ প্রাচীন স্থান। প্রাচীন কালে এস্থান চার-পাঁচ মাইল ব্যাপী বিস্তৃত ছিল বলে জানা যায়। পালপাড়া, বামনপাড়া, পুরাতন কসবা, মুড়লী এবং তার উত্তর-পূর্বদিকে প্রায় ৪ কিলোমিটার পর্যন্ত মুড়লী নগরী বিস্তৃত ছিল। স্যার কানিংহ্যাম অনুমান করেন যে, প্রাচীন সমতট রাজ্যের রাজধানী ছিল এই মুড়লীতে। এ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলা না গেলেও এস্থান যে অত্যন্ত প্রাচীন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এস্থানে অনেক বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল বলেও কেউ কেউ অনুমান করেন। থাকা বিচিত্র নয়। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র মিত্র বলেন,

"কার্ব্বালা পুকুরের সন্নিকটে পশ্চিমে যে বিস্তৃত উচ্চ ইষ্টক-বেদীকে বেহরাম বা বরোণ সাহের সমাধি বলা হয়, উহা একটি প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ বলিয়া অনুমান করি। বেদীটি দোল মঞ্চের মত, উহা ইদ্‌গা নহে, এমন সমাধি দরগাও অন্য কোথাও দেখি নাই। মঞ্চটি ২৪ফুট × ৮ ফুট, নিম্নের বেদিটী এখনও ৪/৫ ফুট উচ্চ আছে। উহা প্রাচীরে ঘেরা ছিল। দোল মঞ্চ হইলে সেরূপ প্রাচীর থাকেনা। নিম্ন বেদির উপর তাকে আরও তিনটি বেদী আছে। উহা একটি প্রাচীন কালের ছোট খাট বৌদ্ধ স্তূপ হওয়া বিচিত্র নহে। বেদীর দক্ষিণ ধারে যে সুন্দর পাকা কবর আছে, তাহাই বেহরাম সাহের কবর হইতে পারে।"

খনন না করে এ সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছুই বলা যায় না। তবে এই এলাকাতেই যে প্রাচীন হিন্দু মন্দিরাদির অস্তিত্ব ছিল, সে প্রমাণ পাওয়া গেছে। বহু বছর আগে যশোর শহরের উত্তর-পশ্চিম কোণে নলডাঙ্গার জমিদার বাড়ির কাছে 'পদ্ম পুকুর' নামক একটি জলাশয় খনন করার সময় বেশ কয়েক খণ্ড পাথর মাটির নিচে পাওয়া যায়। রাজমহলের কাল পাথরের এই স্তম্ভগুলির আয়তন ছিল প্রায় '৬´ × ১´ - ১´´ × ৯।' পাথরগুলিতে লক্ষ্মী, বিদ্যাধর গঙ্গা প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ ছিল। এগুলি কোনো ধ্বংসপ্রাপ্ত বিষ্ণু মন্দিরের সদর দরজার ' ফ্রেম' ছিল বলে ধারণা হয়। ১৩২৯ বঙ্গাব্দে উপরোক্ত পদ্ম

পুকুরের অনতিদূরে বামনপাড়া বলে কথিত স্থানে একটি ইট খোলায় তিন হাত মাটির নিচে একটি বিরাট বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হয়। '৫-৯˝ × ২-৯˝' আয়তনের কষ্টি পাথরে উৎকীর্ণ এই মূর্তিটি ভাস্কর্য শিল্পের এক অপরূপ নিদর্শন। মূর্তির নিচে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বিভাবে শায়িত দুটি নরকঙ্কাল ছিল বলে সতীশবাবু উল্লেখ করেছেন।[১] এ সম্পর্কে তিনি নানা রকম উদ্ভট 'থিওরী'ও দিয়েছেন। সেগুলি উল্লেখের দাবি বঞ্চিত বলে এখানে তুলে ধরা হলনা। তবে পূর্বোক্ত প্রস্তর খণ্ডসমূহ এবং এই মূর্তিটির আবিষ্কারে সহজেই ধারণা করা যায় যে, মুড়লী এলাকায় এককালে একটি বিরাট বিষ্ণুমন্দির ছিল। এই অঞ্চলে আরও অনেক ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল।

মুড়লী অঞ্চলে আরও অনেক প্রাচীন মন্দিরাদির অস্তিত্ব ছিল। এমন একটি মন্দিরের কথা সতীশবাবু বলেছেন। তিনি বলেন, "প্রাচীন কালে এখানে এক সন্ন্যাসীর প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ি ছিল। এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের কোটরে সেই মন্দিরের প্রাচীরগুলি দেখা যায়। চাঁচড়া রাজের উদার ব্যবস্থায় এখানে পূজাদির বিশেষ আয়োজন ছিল। কালে তাহা নষ্ট হইয়াছে। কালীর হস্তপদহীন দেহ পিণ্ডটি আছে, কিন্তু শায়িত শিবমূর্তির প্রায় সম্পূর্ণই আছে। এখনও সেখানে প্রতি অমাবস্যায় পূজা হয়।..এখানে কোন বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল বলে আমাদের বিশ্বাস।"[২]

শেখহাটি

যশোর শহর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বদিকে এবং সিঙ্গিয়া রেল স্টেশন থেকে প্রায় ৩ মাইল পূর্বদিকে শেখহাটি-জগন্নাথপুর নামক একটি প্রাচীন স্থান আছে। পূর্বে ভৈরব নদী এই দুই গ্রামের দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত হত। বর্তমানে (১৯৭৫ খ্রিঃ) নদী বহুবার গতি পরিবর্তনের পর দুই গ্রামের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গ্রাম দুটিকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। পূর্বে গ্রাম দুটি পরস্পর সংলগ্ন ছিল এবং সমগ্র এলাকায় প্রায় ২০ বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে একটি প্রকাণ্ড নগরী ছিল এবং সেই নগরী চারভাগে বিভক্ত ছিল বলে ধারণা হয়। এসব স্থানের নিকটবর্তী দেয়াপাড়া নামক স্থানকে এখনও নগর-দেয়াপাড়া বলা হয়ে থাকে।

সেই চারটি বিভাগের অস্তিত্ব বর্তমান কালেও ধরা পড়ে। উত্তর দিকে বহির্ভাগ (বর্তমান বাহির ভাগ) পূর্বদিকে দেবভাগ, দক্ষিণ দিকে তর্পণ ভাগ (বর্তমান তপন ভাগ) ও পশ্চিম দিকে প্রেম ভাগ (বর্তমানে পমভাগ) গ্রামগুলি পূর্বে একই নগরীর অংশ বিশেষ ছিল বলে পণ্ডিতদের ধারণা। এ সমস্ত গ্রামে অনেক প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

তপনভাগ গ্রামে একটি প্রাচীন জলাশয় আছে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ দিঘির আয়তন প্রায় ৩০৩ মিটার × ১৮১ মিটার। পার্শ্ববর্তী গ্রামের নাম দিঘিরপাড়। এ গ্রামে বহু প্রাচীনকাল থেকেই অসংখ্য ব্রাহ্মণ পরিবারের নিবাস ছিল। পূর্বদিকের দেবভাগ গ্রামে বিজয়তলা বলে একটি প্রাচীন স্থান আছে। জনপ্রবাদ মতে এস্থানে সেনবংশীয়

১. যশোহর খুলনার ইতিহাস ২৫৫ পৃ.।—শ্রী শতীশ চন্দ্র মিত্র।
২. প্রাগুক্ত ২০৯ পৃ.।

নৃপতি বিজয়সেনের বাড়ি ছিল বলে বলা হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা যায় না। তবে এ স্থানে অসংখ্য প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছিল। এ সমস্ত ধ্বংসাবশেষের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষকে মহারাজা বিজয়সেনের সঙ্গে জনশ্রুতিমূলে সংযুক্ত করা হয়। এ স্থানের চারদিকে অসংখ্য অচেনা বৃক্ষ ছিল বলে সতীশ চন্দ্র মিত্র 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থে (২৪১-৪২ পৃ.) বলেছেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে শেখ হাটিতে একটি অপূর্ব ভুবনেশ্বরী মূর্তি আবিষ্কৃত হয় একটি প্রাচীন জলাশয় খননের সময়। মূর্তিটির মস্তকের মুকুট, কর্ণের কুণ্ডল, কণ্ঠের হার, বুকের কাঁচুলি, পীনপয়োধরের উপর প্রলম্বিত রত্নমালা, উন্মুক্ত নাভি, নিচে রত্নকাঞ্চী, বঙ্কিম কটিদেশ, হস্তে কেয়ূর মালা, পায়ে মঞ্জরি ইত্যাদি অপূর্ব কারুকার্য ও শিল্প চাতুর্য ছিল। এ স্থানে মূর্তিটির পূজার জন্য ভুবনেশ্বরী মন্দির নামক একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয় সে সময়েই। সেই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ কিছুকাল আগে পর্যন্ত শেখহাটিতে টিকে ছিল। মূর্তিটি সেনযুগের তো বটেই, এর আগেরও হতে পারে।

শেখহাটিতে প্রাচীন হিন্দু যুগের আরও অনেক মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে ছোট বড় ২টি গণেশ মূর্তি, কয়েকটি বাসুদেব মূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি বাসুদেব মূর্তি ও গণেশ মূর্তি দুটি নড়াইলের জমিদার বাড়িতে রক্ষিত ছিল। এখন সেগুলির কোনো পাত্তা পাওয়া যায় না। উপরে উল্লিখিত মূর্তি ছাড়া আরও অসংখ্য হিন্দু দেবদেবীর প্রাচীন মূর্তি শেখহাটিতে আবিষ্কৃত হয়েছে বলে সতীশ বাবু উল্লেখ করেছেন (যশোহর-খুলনার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড ২৪৫ পৃ.)। আরও বহুমূর্তি অনাবিষ্কৃত অবস্থায় এ স্থানে ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

সতীশ বাবুর মতে এ স্থানের পূর্ব নাম ছিল শঙ্খহাটি এবং এখানেই ছিল সেন নৃপতিদের প্রাদেশিক রাজধানী। তাঁর মতে মহারাজা লক্ষ্মণসেন নদীয়া থেকে পালিয়ে এসে এখানেই বসবাস করতেন এবং মীনহাজ বর্ণিত 'সনকনাত' (sanknat) এবং শেখহাটি (শঙ্খহাটি) এক ও অভিন্ন স্থান এবং শঙ্খ হাটির প্রকৃত নাম ছিল শঙ্খহট্ট। এ সম্বন্ধে সঠিকভাবেই কিছুই বলা যায় না।[১] তবে প্রাচীন হিন্দু বিশেষ করে সেন যুগে এ স্থানে যে একটি সমৃদ্ধিশালী ও বিরাট নগরীর অস্তিত্ব ছিল, তাতে বোধ হয় কোন সন্দেহ নেই।

ভরতভায়না

দৌলতপুর থেকে প্রায় ২১ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে, দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়কের প্রায় ১কিলোমিটার দক্ষিণে, বুড়ীভদ্র নদীর ডানতীরে এবং নদী থেকে প্রায় ৪০০ মিটার পশ্চিমে 'ভরতভায়না' নামক একটি বিরাট ঢিবি আছে। এ সম্পর্কে 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থে (২১১ পৃ.) বাবু সতীশ চন্দ্র মিত্র ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে বলেন, "ইহা এখনও ৫০ ফুট উচ্চ আছে, লোকে বলে উহা পূর্বে আরও উচ্চ ছিল, কিন্তু একবার ভূমিকম্পে অনেকটা বসিয়া গিয়াছে। স্তূপটি গোলাকার, উহার পরিধি পাদদেশে ৯০০ ফুটেরও অধিক হইবে। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও পূর্ব্ব দিক দিয়া নদী প্রবাহিত, অন্য তিন দিকে

---

১. সকনাত বা সনকনাত সম্পর্কে তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থ (২৬ পৃ. ২ পাদটিকা, অনুবাদ ও সম্পাদনা আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া) দ্র.।

গড়খাই ছিল, তাহার চিহ্ন আছে। দক্ষিণ দিকে নদীর নিকটে একটি পুকুরের খাত দেখিতে পাওয়া যায়। স্তূপটি সম্পূর্ণ ইষ্টকরাশিতে পরিপূর্ণ। পাদদেশে খনন করিয়া প্রাচীরের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছিল।"

এর কিছুকাল আগে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তদানীন্তন তত্ত্বাবধায়ক (Superintendent) মিঃ কে. এন. দীক্ষিত এ স্থান পরিদর্শন করে যে বর্ণনা দেন, তা থেকে জানা যায় যে, প্রায় ২৫০/২৭৫ মিটার বেড় ও ১০/১২ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট একটি বিরাট স্তূপ ছিল এটি। তিনি সেখানে .৪৬ মিটার × .৩৪.০৭ মিটার মাপের কিছু কিছু ইট দেখে অনুমান করেন যে, এখানকার ইমারতটি গুপ্ত যুগের ছিল এবং এটি ছিল একটি বৌদ্ধ সংঘারাম।[১]

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে আমরা যখন ঢিবিটিকে শেষ বারের মতো দেখি তখনও এর বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তখনও এটি প্রায় ৯ মিটার উঁচু এবং এর বেড় ছিল প্রায় ২১২ মিটার। তবে ঢিবির চারদিকের ভূমি প্রায় সমতল হয়ে গেছে এবং তৃণাচ্ছাদিত সে স্থানেও মাটির নিচে প্রচুর ইট দেখা যায়। সে স্থানটিকে ঢিবির অংশ হিসাবে ধরলে এর পরিধি হবে প্রায় ৪২৪ মিটার।

এই ঢিবির পূর্ব দিকও ৫০০ মিটার দূর দিয়ে ভদ্রা নদী এখনও প্রবাহিত। দক্ষিণ দিক দিয়েও এককালে নদীটি প্রবাহিত ছিল। তবে নদী এখন সেখানে নেই। পশ্চিম ও উত্তর দিকে বেশ কিছু দূরে দূরে প্রশস্ত পরিখার চিহ্ন আজও বিদ্যমান। ঢিবির শীর্ষদেশে দাঁড়ালে অতি সহজেই বোঝা যায় যে, নদী ও পরিখা বেষ্টিত এস্থানের প্রায় কেন্দ্রস্থলে স্তূপটি অবস্থিত।

পূর্বদিকের প্রায় সমগ্র এলাকা এখন চাষের জমি। সেখানে কোন ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষ এখন আর টিকে নেই। কিন্তু সমগ্র স্থান জুড়ে অসংখ্য প্রাচীন ইট ও

১. "**The Stupa mound at Bharat Bhayna :** This monument is situated on the southern bank of the Bhadra river in the water-logged tract of land to the west of Khulna, at a distance of abot 13 miles from Daulatpur on the Satkhira-Daulatpur Road. It still stands to a height of about 40' to 45' above the level of surrounding lands though the local people say that before the earthquake of 1897, it was still higher. It is fairly circular in shape, its circumference at the base being about 800 to 900 feet. It is full of bricks of large size, many of which have been removed by the inhabitants of neighbouring villages. A modern temple close to the mound is reported to be built almost wholly with the materials vandalized from the mound. Some of the bricks here measure 16" × 13" × 3", which bespeaks a high antiquity of the stupa. Comparing with this the dimensions of bricks of known periods found in the excavations at Saheth-Maheth, it can be safely surmised that the stupa at Bharat Bhayna dates back at least from the Gupta period, roughly the fifth century A.D. It is probale that this was one of the 30 Sangharamas mentioned by Hieun Tsang as existing in his time in the Samatata country in which modern Khulna must have been comprised at the time."

—Report of K.N. Dikasit, যশোহর-খুলনার ইতিহাস, সতীশ চন্দ্র মিত্র, পরিশিষ্ট খ।

মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ এখনও (১৯৭৫ খ্রিঃ) দেখা যায়। এতে ধারণা হয় যে, এককালে সেখানে বহু ইমারতাদির অস্তিত্ব ছিল।

ঢিবির দক্ষিণ দিকে আছে একটি বিরাট বটগাছ। বটগাছের কাছেই আছে মজে যাওয়া একটি ছোট জলাশয়ের চিহ্ন। জলাশয়ের কাছে মাটির নিচে ইট পাওয়া যায়। এর দক্ষিণে বর্তমানে চাষের ভূমি। খুব সম্ভব নদীটি আগে এর কিছু দক্ষিণেই ছিল। ঢিবির পশ্চিম ও উত্তর দিকে কিছু বসতি ছিল। খুব সম্ভব সেই বসতিও অনেক পরবর্তীকালে গড়ে উঠেছিল। এখন এসব স্থান জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়েছে। লোকে বলে যে, সে সমস্ত স্থানেও নাকি কিছু কিছু প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ পাওয়া যায়, তবে খুব বেশি নয়। এখানে পোড়ামাটির চিত্রফলক পাওয়া যায় বলে জনাব আবদুল জলিল 'সুন্দর বনের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে (৩য় খণ্ড, ৫১৯ পৃ.) উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "এই স্থানে এখনও ঢিবির মধ্যে খোঁজ করিলে বহু মৃত্তিকা নির্মিত মূর্তি পাওয়া যায়। এই রূপ একটি পোড়ামাটির মূর্তি ভরতভায়না হইতে জনৈক অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি আমাকে আনিয়া দিয়াছিলেন।"

বহু অনুসন্ধান করেও পোড়ামাটির কোনো চিত্রফলক আমরা পাইনি। জনাব আবদুল জলিল এ সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মিঃ দীক্ষিতের অনুমানের সমর্থন এতে পাওয়া যায়। তবে ঢিবিটি বিগত ৫০ বছর যাবত যে অবস্থায় আছে, সেটিই যদি তার আদি রূপের ভগ্নাবশেষ হয়, তবে এটিকে কোনো বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ বলে মেনে নেওয়া খুব কঠিন বলে মনে হয়। বিহারে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য যে সব আবাস কক্ষ থাকে, সেগুলি সাধারণত এত উঁচু কোথাও দেখা যায় না। পাশাপাশি অবস্থানরত অনেক কক্ষের অস্তিত্ব প্রাচীন বিহারগুলিতে দেখা যায়। সেগুলি একাধিক তলবিশিষ্ট হলেও এ রকম সরু ও উঁচু শীর্ষ বিশিষ্ট হয় না।

উঁচু কেন্দ্রীয় মন্দির (central shrine) বা কোন সুউচ্চ ও বিরাট স্তূপের ধ্বংসাবশেষ এ ধরনের ঢিবিতে হয়। এটি যদি কোন বৌদ্ধ বিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হয়ে থাকে, তবে বিহারটি ছিল তার চার পাশে। এবং সেই বিহার যে একটি অতি বিরাট আয়তনের অট্টালিকা ছিল, তা সহজেই ধারণা করা যায়। সে ক্ষেত্রে সেই বিহারটি সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বলা যেতে পারে। তবে যতটুকু ধারণা হয়, এখানে বোধ হয় কোনো দুর্গাকারে নির্মিত বিহার ছিল না। এ ঢিবির ধারে কাছে কোথাও হয়ত একটি বিহার ছিল। অথবা এটি ছিল একটি সুবৃহৎ বৌদ্ধ স্তূপ বা মন্দির জাতীয় কোনো ইমারত।

১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর কর্তৃক এখানে উৎখননকার্য করা হয়। এ সম্বন্ধে জনাব মোশাররফ হোসেন বলেন, "এ ঢিবিতে আংশিক খনন পরিচালনা করার ফলে মহাস্থানগড়ের নিকটবর্তী গোকুল মেড় ও ভারতের উত্তর প্রদেশের অহিচ্ছত্রে প্রাপ্ত ইমারতের কাঠামোর অনুরূপ একটি কাঠামো উন্মোচিত হয়েছে। বর্তমানে অক্ষত কাঠামোর অংশ বিশেষ দেখে মনে হয়, বিলুপ্ত ইমারতটি একটি সুউচ্চ ইটের মঞ্চ। এই মঞ্চের শিরোদেশে ভূমি থেকে ১১.৮৮ মিটার উচ্চতায় একটি চতুষ্কোণাকার ইমারত তৈরি হয়েছিল। মঞ্চ তৈরির জন্য প্রথমে পরস্পর ভেদকারী কতগুলো সমান্তরাল দেয়াল

নির্মিত হয়েছিল। ফলে মঞ্চটির মধ্যে কতকগুলো আবদ্ধ প্রকোষ্ঠ তৈরি হয়েছিল। পরে শক্ত ধরনের মাটি দিয়ে এই প্রকোষ্ঠগুলো ভরাট করে দেওয়া হয়েছিল। খননের পরে ৪০ টি প্রকোষ্ঠ অনাবৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এদের সংখ্যা আরও বহুগুণ বেশি। আকার ও আয়তনে এদের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই। এদের মধ্যে পূর্ণভাবে উন্মোচিত ৮টি প্রকোষ্ঠের পরিমাপ ২.১৮ মিটার × ১.৪৮ মিটার, ২.২৮ মিটার × ১.২১ মিটার, ২.১৬ মিটার × ১.৪৬ মিটার, ২ মিটার × ২.১০ মিটার × ২.২৭ মিটার × ১.১৪ মিটার, ১.৪১ মিটার × ১,৪১ মিটার, ২.৬৩ মিটার × ১.৩৫ মিটার এবং ১.১২ মিটার × ২.১৯ মিটার।

"মঞ্চের শিরোদেশে অবস্থিত মূল ইমারতটির মাত্র কয়েক স্তর ইট বর্তমানে কোন কোন স্থানে মূল অবস্থায় বিদ্যমান আছে। ফলে কেবল এটুকু অনুমান করা সম্ভব যে এর ভিত্তির দেয়ালগুলো ৭১ সে. মি. চওড়া ছিল। এছাড়া অন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত। তবে এর বাইরের দিকের পরিমাপ ১১.৩০ মিটার × ১১.৩০ মিটার। এটা পরস্পর ৪টি আবদ্ধ প্রকোষ্ঠের সমন্বয়ে গঠিত। দেয়ালগুলি ২.৮০ মিঃ চওড়া। এ ছাড়াও এর চারপাশে আরও কিছু দেয়ালের অংশবিশেষ বর্ণনার অযোগ্য অবস্থায় অনাবৃত হয়েছে। তবে এগুলো মূল নির্মাণ সময়কালের পরবর্তীকালে নির্মিত বলে অনুমিত হয়েছে। ইমারতটি সর্বোতভাবে কাদা ও ইট দিয়ে তৈরি। ইটগুলোর পরিমাণ ৩৪ সে. মি. × ২৩ সে. মি. × ৫ সে. মি., ৩৪.৫ সে. মি. × ২২ সে. মি. × ৫.৫ সে. মি., ৩৪ সে. মি. × ২৩ সে. মি. × ৬ সে. মি., ৩৫ সে. মি. × ২৬ সে. মি. × ৫.৫ সে. মি., ৩৫.৫ সে. মি. × ২৩.৫ সে. মি. × ৫.৫ সে. মি., ৩৫ সে. মি. × ২৪ সে. মি. × ৫ সে. মি., ৩৬ সে. মি. × ২৩.৫ সে. মি. × ৬ সে. মি. এবং ৩৬.৫ সে. মি. × ২৩ সে. মি. × ৫.৫ সে. মি.।

"ভরতভায়না ঢিবির সর্বোচ্চ স্থান থেকে সর্বমোট ৬.৬৫ মিঃ গভীরতা পর্যন্ত খনন পরিচলিত হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র দুটি স্তরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেছে। স্তর (১) এর উপ-স্তর এবং স্তর (২) এর আটটি উপ-স্তর রয়েছে। এছাড়া স্থাপতি্ক ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও একটি মূল নির্মাণ ও একটি পুনঃ নির্মাণ সময়কালের ইঙ্গিত বজায় রয়েছে। যেহেতু ঢিবির উপরাংশ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত এবং খনন অকর্ষিত মাটি পর্যন্ত পরিচালিত হয়নি সেহেতু প্রত্ন স্থলটির প্রকৃত স্তরবিন্যাস সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়নি। অপরদিকে অনাবৃত প্রত্নবস্তুর মধ্যে রয়েছে কেবল বারটি নিদর্শন। এদের মধ্যে মানুষের মূর্তিখচিত পোড়ামাটির ফলকের ভাঙ্গা টুকরা, অলঙ্কৃত ইট, খোলামকুচি ও মৃন্ময় তৈল প্রদীপ অন্তর্ভুক্ত। ইটের আকৃতি, প্রত্নবস্তুসমূহের সাধারণ শৈলী ও ইমারতের স্থাপত্যিক বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে ভরতভায়নায় অনাবৃতকৃত নিদর্শনটিকে আনুমানিক খ্রিস্টিয় সাত-আট শতকের নিদর্শন হিসাবে গণ্য করা যায়।[১]

এরপর ভরতভায়না ঢিবিতে আরও কিছু উৎখনন করা হয়েছে এবং তলদেশে ক্রুশাকারে নির্মিত ভিত্তি অনাবৃত হয়েছে। এতে ধারণা হয় যে, সুউচ্চ ইমারতটি ক্রুশাকারে নির্মিত হয়েছিল। এতে আরও দেখা যাচ্ছে যে, অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে

১. মোঃ মোশাররফ হোসেন : প্রত্নতত্ত্ব-উদ্ভব ও বিকাশ, ২১৬-২১৭ পৃ:

নির্মিত শালবন ও পাহাড়পুর বিহারের ক্রুশাকারে নির্মিত কেন্দ্রীয় মন্দিরগুলির পরিকল্পনা বহু পূর্বে (পঞ্চম শতাব্দীতে) নির্মিত ভরতবায়না ইমারতের ভিত্তির অনুসরণেই হয়েছিল। সেখানকার একটি ভূমি-নকশা নিচে প্রদত্ত হল।



ভরত ভায়না, যশোর

গৌরীঘোনা

ভরতভায়না থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণে গৌরীঘোনা নামক একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। এ গ্রামে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ এককালে ছিল। বর্তমানে (১৯৭৫ খ্রিঃ) গ্রামের এখানে-সেখানে প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। স্থানীয় লোকেরা এ স্থানকে ভরত রাজার বাড়ি বলে সনাক্ত করেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত যশোহর-খুলনার ইতিহাস গ্রন্থে (প্রথম খণ্ড, ২১২ পৃ.) বাবু সতীশ চন্দ্র মিত্র এ স্থান সম্বন্ধে বলেন, "পার্শ্ববর্তী গোরীঘোনা গ্রামে ভরত রাজার বাড়ির ভগ্নাবশেষ আছে। ঐখানে ২খানি সুন্দর প্রস্তর সুদূর অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে। একখানি পাথর ২-২´ × ১-৬½´ এবং উচ্চতা ১ফুট, উহা কোন প্রস্তরস্তম্ভের পাদপীঠ হইতে পারে। পাথরখানি গয়ার পাথরের মত কৃষ্ণবর্ণ। অন্য পাথরখানি একটি প্রস্তরনির্মিত কুমীরের নিম্নাংশের একাংশ বা সম্মুখ ভাগ। ইহা ৫-৬´´ × ১-৫´´ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ১ ফুট হইবে। কুমীর যখন সম্পূর্ণ ছিল, তখন তাহার পরিমাণ আনুমানিক "১৫ × ১-৫´´ এবং উচ্চতা প্রায় ২ফুট ছিল। ইহা কোন সিঁড়ির পার্শ্বে বা তোরণ প্রাচীরের উপরিভাগে বসান থাকিতে পারে। সে বাড়ি কি প্রকাণ্ড রাজার বাড়ি ছিল তাহা হইতে সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। এই রাজবাটীর সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণে নদী ও অন্য তিনদিকে গড়খাই

ছিল, তাহার খাতের চিহ্ন আছে। ভরতের দেউলের অর্ধ মাইল দক্ষিণে কাশিমপুর গ্রামে ডালিঝাড়া বলিয়া একটি স্থান আছে। ইহাও একটি ভগ্নস্তূপ। এখানে ভরত রাজার প্রধান কর্মচারীর বাড়ি থাকিতে পারে।"

পাদটীকায় তিনি আরও বলেন, "বুড়ীভদ্র নদীর একটি সুন্দর বাঁকের মুখে গৌরীঘোনা গ্রামে রূপচাঁদ কুণ্ডুর বাড়ির পশ্চিম গায়ে ভরতরাজার বাড়ি ছিল। বিস্তৃত স্থানে সর্বত্র ইষ্টকখণ্ড বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এখান হইতে ইট লইয়া নিকটবর্তী লোকেরা বাড়িতে প্রাচীরাদি নির্মাণ করিয়াছেন। কিছুকাল পূর্বে গৌরঘোনা গ্রামের নীলকুঠি ও মীর্জানগরের জনৈক ব্যবসায়ী কর্তৃক এই স্থান হইতে ইট লইয়া নির্মিত হয়।"

ভরতভায়না স্তূপ ও আশেপাশের ধ্বংসাবশেষগুলি দেখে ধারণা হয় যে, বহু প্রাচীন কালে এ স্থানে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল। গৌরীঘোনা গ্রামের ধ্বংসাবশেষগুলিও ছিল খুব সম্ভব কোন বৌদ্ধবিহার বা স্তূপের সঙ্গে সম্পৃক্ত, কোনো রাজবাড়ি খুব সম্ভব এটি ছিল না। নিম্নবঙ্গে সমুদ্রের কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত এ সব কীর্তি কত প্রাচীন, খনন না করে সে সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছু বলা কঠিন। তবে ২৪ পরগনা জেলার চন্দ্রকেতুগড়ে ও বেড়াচাম্পায় খননের ফলে মৌর্য যুগের বহু কীর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। ভরতভায়না থেকে সে সব স্থানের দূরত্ব ৬৪ কিলোমিটারের বেশি নয়। ভরতভায়না, আগ্রা-কপিলমুনি, আমাদি প্রভৃতি স্থানের ধ্বংসাবশেষগুলিও সে কালের এবং সে সব কীর্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া বিচিত্র নয়।

মুসলিম আমল

চাঁচড়ার রাজবাড়ি ও মন্দিরসমূহ

যশোহর শহরের উপকণ্ঠে এবং শহর থেকে ১.৫ কিলোমিটার দক্ষিণে চাঁচড়ার রাজবাড়ি অবস্থিত। রাজা প্রতাপাদিত্যের পর পরই এই জমিদার বংশ খ্যাত হয়ে ওঠে এবং রাজা উপাধি লাভ করে। রাজবাড়িতে বহু অট্টালিকা ও মন্দিরাদি নির্মিত হয়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত মন্দির ও ইমারতাদি প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবার পথে। মন্দিরগুলির মধ্যে দশমহাবিদ্যা মন্দির, শিবমন্দির ও শ্যামা রায়ের জোড় বাঙলা মন্দির উল্লেখযোগ্য।



চাচড়া শিব মন্দির, যশোর

শিবমন্দির

মন্দিরটি পূর্বমুখী। মন্দিরের সামনেই আছে শিবসাগর নামক একটি বিরাট

জলাশয়। এক চূড়া বা রত্ন বিশিষ্ট ৯.৫ মিটার × ৮.১৩ মিটার নির্মিত এই ছোট মন্দিরের সামনের দেয়ালে অতি সুন্দর কারুকার্য ছিল। মন্দির গাত্রে যে শিলালিপি ছিল তার পাঠ নিম্নরূপ :

"শাকে নাগ শশাঙ্কর্তুস্মরে প্রাসাদ উত্তমঃ।
শ্রী মনোহর রায়েন নিরমায়ি পিনাকিনে ॥"

অর্থাৎ নাগ (৮), শশাঙ্ক (১), ঋতু (৬) ও স্মর (কামদেব=১) অঙ্কের বামাগতিতে ১৬১৮ শকাব্দে (১৬৯৬ খ্রিঃ) শ্রী মনোহর রায় এ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।

দশ মহাবিদ্যা মন্দির

প্রায় সমতল ছাদ (vaulted roof) বিশিষ্ট এ মন্দিরে গণেশ, সরস্বতী, কমলা, অন্নপূর্ণা, ভুবনেশ্বরী, জগদ্বাত্রী, ষোড়শী, মহাদেব, কালী, তারা, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলা, মাতঙ্গী, ভৈরব ও ধূমাবতী প্রভৃতি দশ মহাবিদ্যার মূর্তি ছিল। এই মন্দিরের সঠিক নির্মাণ কাল জানা যায়নি। তবে এ মন্দির সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

দোচালা মন্দির

চাঁচড়ার এই দোচালা মন্দিরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্যামারায়ের এই মন্দির খুব সম্ভব শিবমন্দিরের সমসাময়িক।

চাঁচড়ার মন্দিরগুলি সংস্কারের অভাবে জীর্ণ হয়ে পড়েছে।

শুভরাড়া মসজিদ

অভয়নগর থানার অধীনে, থানা থেকে কয়েক কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এবং ধূলগ্রাম থেকে মাইল পাঁচেক উত্তরে ভৈরব নদীর তীরে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আছে। বর্গাকারে নির্মিত এই ছোট মসজিদের প্রত্যেক বাহু বাইরের দিকে ৮.৭৩ মিটার ও ভিতরের দিকে ৫.১ মিটার লম্বা ছিল। চারকোণে ৪টি মিনার বা টারেট ছিল। দেয়ালগুলি প্রায় ১.৬৬ মিটার প্রশস্ত। উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশপথ আছে। পত্রাকারের খিলানের সাহায্যে প্রবেশপথগুলি নির্মিত এবং ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ১টি মাত্র মিহরাব। মসজিদের কার্নিশ বাঁকানভাবে নির্মিত। উপরে আছে ১টি মাত্র গম্বুজ। উল্টান পেয়ালাকারে নির্মিত এ গম্বুজ খান-ই-জাহানী স্থাপত্যের নিদর্শন বহন করে।

মসজিদের গায়ে কোন শিলালিপি নেই। তবে মসজিদের গঠনপদ্ধতি ও স্থাপত্য কৌশল দেখে মনে হয় যে এ মসজিদ খান-ই-জাহানের আমলে নির্মিত হয়েছিল। স্থানীয় প্রবল জনপ্রবাদ মতে জানা যায় যে, খান-ই-জাহান বারবাজার থেকে মুড়লি কসবা হয়ে পয়োগ্রাম কসবা গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে বাগেরহাট। পয়োগ্রাম কসবা যাওয়ার পথে তিনি শুভরাঢ়া গ্রামে থেকে এখানে একটি ছোট মসজিদ নির্মাণ

করেছিলেন। এ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছুই বলা যায় না। এ মসজিদ তাঁর কোনো সহচর কর্তৃকও নির্মিত হয়ে থাকতে পারে।

বিদ্যানন্দকাটি

যশোর থেকে প্রায় ৩৮ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং কেশবপুর থানা থেকে আনুমানিক ৬ কিলোমিটার পশ্চিমে বিদ্যানন্দ কাটি নামক একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। এ গ্রামের মধ্যে একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। দুর্গপ্রাচীরের কিছু কিছু অংশ এখনও টিকে আছে। আর আছে প্রাচীন ইটের কয়েকটি স্তূপ। স্তূপের ইটগুলি বেশ প্রাচীন। এগুলি সুলতানী আমলের, না প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের, তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও যতটুকু ধারণা হয়, তাতে এ গুলিকে প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের বলেই মনে হয়। দুর্গটি যে প্রাক-মুসলিম আমলের তাতে, বোধ হয় কোন সন্দেহ নেই :

প্রবল জনশ্রুতিমূলে জানা যায় যে, বাগেরহাটের বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক খান-ই-জাহান সুন্দরবনে যাওয়ার পথে এ স্থানে এসেছিলেন। এখানে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি বিরাট জলাশয় আছে। দিঘির আয়তন ৭১৪.৫৪ মিটার × ৩০৯.৬৯ মিটার। প্রশস্ত পাড়গুলি বেশ উঁচু। এটিকে খান-ই-জাহানের দিঘি বলা হয়ে থাকে। তবে এ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছুই বলা যায় না।

প্রতি বছর দিঘির দক্ষিণ পাড়ে দোল পূজার দিন খান-ই-জাহানের স্মৃতিকে উদ্দেশ্য করে একটি মেলা বসে। "খাঁজাহান এতদঞ্চলের লোকের নিকট পীর বা দেবতার মত সম্মানিত হন। লোকের গাভী দুগ্ধবতী হইলে প্রথম দুগ্ধ তাঁহার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া যায়। এক সময় এমন ছিল যে, স্থানীয় লোকে কোন ইমারত নির্মাণ করিবার পূর্বে খাঁজাহানের স্মৃতি স্থানের উপর একখানি ইট না লাগাইয়া কার্যারম্ভ করিত না।"[১]

বিদ্যানন্দকাটিতে খান-ই-জাহানের আমলে কোনো কীর্তি ছিল কিনা, তা সঠিকভাবে বলা যায় না। থাকলেও একমাত্র দিঘি ছাড়া সেখানকার আর কোনো কীর্তি বর্তমানে টিকে নেই। বিদ্যানন্দকাটি গ্রামের পাশেই মীর্যানগর গ্রাম। সেখানে মোঘল আমলের অনেক কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আছে (মীর্যা নগর দ্র.)। মীর্যানগর অঞ্চলে খান-ই-জাহানের আমলে খনিত অনেক জলাশয় আছে।

মীর্যানগরের কীর্তি

কেশবপুর থানার অন্তর্গত এবং থানা থেকে প্রায় ৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত মীর্যানগর ছিল মোঘল আমলের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। এখানে সেই আমলের অসংখ্য কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আছে। ত্রিমোহিনীর নিকটবর্তী এ স্থানে ছিল মোঘল ফৌজদারের আবাসবাটী। শাহ্ শুজা' যখন বাঙলার সুবাদার (১৬৩৯-৬০ খ্রিঃ) তখন তাঁর শ্যালকপুত্র সফশি খান ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে যশোরের (বর্তমান যশোর নয়, প্রতাপাদিত্যের যশোর) ফৌজদার নিযুক্ত হন। তিনি আলোচ্য মীর্যানগরে বহু ইমারত

১. সতীশ চন্দ্র মিত্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ৩২১-৩২২ পৃ.।

নির্মাণ করেন। তাঁর পরেও অনেক ফৌজদার এখানে বসবাস করেন এবং ইমারতাদি নির্মাণ করেন।

এ স্থানের ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কে মিঃ ওয়েস্টল্যাণ্ডের (Mr. J. Westland) বর্ণনা থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে, ত্রিমোহিনী থেকে এক কিলোমিটার দূরে একটি প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আছে। ইমারতটি বর্গাকারে নির্মিত ২টি অঙ্গনে (courtyard) বিভক্ত ছিল এবং মাঝখানে ছিল একটি উঁচু প্রাচীর। উত্তর দিকের অঙ্গনের উত্তর দিকে এবং দক্ষিণ দিকের অঙ্গনের দাক্ষিণ দিকে অনুরূপ উঁচু দেয়াল ছিল। উভয় অঙ্গনের পূর্ব ভাগে দুই সারি বাসগৃহ ছিল এবং এগুলি ছিল খুব সম্ভব অনুচরদের (retainers) আবাসস্থল। এ গুলির ভিতর দিয়েই ছিল অঙ্গনের প্রবেশপথ। উত্তর দিকের অঙ্গনের উত্তর ভাগে ছিল ৩ গম্বুজ বিশিষ্ট একটি ইমারত এবং সেটিই ছিল প্রকৃত বাসগৃহ। ইমারতটি জীর্ণ হলেও গম্বুজগুলি টিকে আছে।[১]

এখানে ওয়েস্টল্যাণ্ড সাহেব ভুল করেছিলেন। ৩ গম্বুজ বিশিষ্ট ইমারতটি কোনো আবাসগৃহ ছিল না, এটি ছিল একটি মসজিদ। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এই মসজিদের ভিতরের আয়তন ছিল ১৫.১৫ মিটার × ৪.২৪ মিটার, দেয়ালগুলি ছিল প্রায় ১.২১ মিটার প্রশস্ত। মাটি থেকে গম্বুজের উচ্চতা ছিল ৬.২ মিটার। পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশপথ ছিল। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে ছিল ৩টি মিহরাব। মসজিদের সামনে ছিল একটি চৌবাচ্চা। মসজিদ প্রাঙ্গণে কয়েকটি পাকা কবর ছিল। প্রাচীর ঘেরা দক্ষিণ দিকের অঙ্গনটিতে ছিল একাট কবরস্থান। সেখানে বেশ কয়েকটি পাকা কবর ছিল। বর্তমানে মসজিদের কোনোচিহ্নও দেখা যায় না।

অভয়নগরের রাজবাড়ি ও মন্দিরসমূহ

খুলনা-যশোর জেলাদ্বয়ের সীমান্তবর্তী পয়োগ্রামকসবা নামক স্থানের কয়েক কিলোমিটার উত্তরে অভয়নগর অবস্থিত। চাঁচড়া রাজপরিবারের অভয়া নাম্নী জনৈক বিধবা রাজকন্যার নামানুসারে এ স্থানের নামকরণ হয়েছিল বলে কথিত হয়। এখানে একটি রাজবাড়ি ও ১১টি মন্দির নির্মিত হয়েছিল। প্রাচীরবেষ্টিত এক বিস্তীর্ণ স্থানে রাজবাড়ি ও

১. "Here lies the remains of an old palace half a mile from Trimohini along the road which now connects that place with Keshabpur. The building is composed of two square courtyards separated by a high wall and on the north of the northern square and on the south of the southern one there are similar high walls. On the eastern side of both the squares is a double row of little arched dwellings, which seem rather to be built in the inside of a massive wall than to be constructed with referenence to convenience of dwelling. These were apparently retiners' houses and the only entrance to the courtyard is through them.

"On the northern side of the northern square is a three domed structure, which was the residence proper. The masonry is dillapidiated but the domed roof still remains ..."—Ancient Monuments of East Pakistan. p. 69 by Dr. S.M. Hasan.

মন্দিরগুলির অবস্থান ছিল। রাজবাড়ি ও ১০ টি মন্দির প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পূর্ব ভিটিতে অবস্থিত এখানকার সবচেয়ে বড় মন্দিরটি কিছুকাল আগেও অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় টিকে ছিল। সব ক'টি মন্দির মিলিয়ে চকমিলানভাবে নির্মিত হয়েছিল।

এই মন্দিরের আয়তন ছিল ৭.৫৭ মিটার × ৬.৭৩ মিটার। দেয়ালগুলি ছিল ১.০১ মিটার প্রশস্ত। সামনের দিকে ছিল প্রশস্ত বারান্দা। অর্ধবৃত্তাকারের খিলান ও ২টি স্তম্ভের সাহায্যে নির্মিত ৩টি প্রবেশ পথ (arches) ছিল সামনের বারান্দায়। বারান্দার পরেই ছিল মন্দিরের গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহের দু'ধারে অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে ছিল ১.১৬ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট অপরিসর বারান্দা। মন্দিরের সামনের দেয়াল অতি সুন্দর পোড়ামাটির চিত্রফলক দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। অষ্টদশ শতাব্দীর এ মন্দির এখন বিলুপ্তপ্রায়।

ধূলগ্রামের মন্দিরসমূহ

ভৈরবনদীর বামতীরে এবং অভয়নগর থানার অধীনে এবং থানা থেকে কয়েক কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত ধূলগ্রামে এক কালে ভৈরব নদীর তীরে ১২টি মধ্যযুগীয় মন্দির ছিল। কয়েকটি মন্দির ভৈরবের ভাঙনে বিলীন হয়ে গেছে। বাকি মন্দিরগুলি সংস্কারের অভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এ গুলির মধ্যে কৃষ্ণমন্দির নামে অভিহিত একটি দোচালা মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। ৭.১২ মিটার × ৬.৪৬ মিটার আয়তন বিশিষ্ট এ মন্দিরের সামনের দিকে ৩.৪৮ মিটার × ১.২৬ মিটার আয়তন বিশিষ্ট একটি বারান্দা ছিল। উপরে ছিল দোচালা ঘরের মতো বাঁকান পাকা ছাদ। মন্দির গাত্রে যে লিপি ছিল, তা থেকে জানা যায় যে মন্দিরটি ১৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। এখানকার দেওয়ান বাটিতে দোচালা ঘরের চালের আকারে নির্মিত একটি তোরণ দ্বার ছিল।

নড়াইল জেলা

মুসলিম আমল

রায়গ্রাম জোড়বাঙলা মন্দির

মোহাম্মদপুর থেকে প্রায় ২৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং নড়াইল জেলার লোহাগড়া থেকে ৮ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে নবগঙ্গা নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত রায়গ্রাম নামক স্থানে একটি জোড়বাঙলা মন্দির ছিল। সীতারামের জোড়বাঙলা মন্দিরের অনুকরণে নির্মিত এ মন্দিরের পাকা ছাদ ২টি দোচালা ঘরের পাকা ছাদের সংযোগে নির্মিত হয়েছিল। প্রত্যেক দোচালা ঘরের আয়তন (বাইরের দিকে) ছিল ৮.৮৪ মিটার × ৩.৭৮ মিটার। তাতে মন্দিরের মোট আয়তন ছিল ৮.৪৮ মিটার × ৬.৯৯ মিটার। মন্দিরের সামনের দিকে ছিল অর্ধ বৃত্তাকারের খিলানের সাহায্যে নির্মিত ৩টি প্রবেশপথ (arches)। এর পরেই ছিল বারান্দা এবং বারান্দার পরে ছিল গর্ভগৃহ। মন্দির গাত্রের শিলালিপিটি নিম্নরূপ :

> "ষষ্ঠ বেদাঙ্গ চন্দ্রাম শাকে শ্রী শঙ্করালয়।
> অকারি শঙ্করাখ্যেন ঘোষে নাপি সুভক্তিতঃ।"

অর্থাৎ ষষ্ঠ (৬), বেদ (৪), অঙ্গ (৬) ও চন্দ্র (১) অঙ্কস্য বামা গতিতে ১৬৪৬ শকাব্দে (১৭২৪ খ্রিঃ, ১১৩১ বঙ্গাব্দে) রাম শঙ্কর কর্তৃক এ মন্দির নির্মিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন রাজা সীতারামের বিখ্যাত সেনাপতি মেনাহাতীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এখানে একটি শিবমন্দিরও ছিল। উভয় মন্দিরই এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

রায়নগরের মঠ

মাগুরা শহর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে রায় নগর নামক স্থানে একটি সুন্দর মঠ ছিল। বর্গাকারে নির্মিত মঠের নিম্নদেশে বাইরের মাপ ছিল ৬.৯৯ মিটার × ৬.৯৯ মিটার এবং ভিতরের মাপ ছিল ৪.০৯ মিটার × ৪.০৯ মিটার এবং দেয়ালগুলি ছিল ১.৩৯ মিটার প্রশস্ত। ভিতরের কক্ষের উচ্চতা ছিল প্রায় ৮ মিটার। এর পরে ইমারতটি ক্রমশ সরু হয়ে মঠের আকারে উপরে উঠেছিল এবং এর উচ্চতা ছিল প্রায় ১২.১২ মিটার। মঠের ভগ্ন ইষ্টক লিপির পাঠ যা পাওয়া গিয়েছিল তা নিম্নরূপ :

> "শাকে ব্যোমামৃতকর—শর—ক্ষৌণি সংপাদিতে হস্মিণ
> প্রাসাদোহয়ং ব্যরচি মহতা বিশ্ব নাথাত্মজেন।"

অর্থাৎ, ব্যোম (০), অমৃতকর (চন্দ্র=১) শর (৫) ও ক্ষৌণি (১) অঙ্কস্য বামাগতিতে ১৫১০ শকাব্দে (১৫৮৮ খ্রিঃ) বিশ্বনাথের পুত্র কোনো ভক্ত কর্তৃক এ প্রাসাদ বা মঠ নির্মিত হয়েছিল।

মঠের গায়ে অতি সুন্দর পোড়ামাটির চিত্রফলকের অলঙ্করণ ছিল। পদ্মফুল, লতাপাতা, বিভিন্ন মূর্তি ইত্যাদির অলঙ্করণ এতে ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই মঠের দক্ষিণ ও পূর্ব দেয়াল ধসে পড়েছিল। বর্তমানে মঠটি ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে নির্মিত এই সুন্দর অলঙ্করণযুক্ত মঠটি বোধ হয় বঙ্গের প্রাচীনতম মঠগুলির মধ্যে অন্যতম।

মকিমপুর মঠ

নড়াইল জেলার পূর্ব সীমানায় অবস্থিত মকিমপুর (ইটনার নিকটবর্তী) গ্রামে একটি প্রাচীন মঠ ছিল বলে অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র মিত্র যশোহর-খুলনা জেলার ইতিহাস গ্রন্থে (দ্বিতীয় খণ্ড) উল্লেখ করেছেন। এই মঠ ছিল দক্ষিণমুখী এবং বর্গাকারে নির্মিত এ মঠের আয়তন বাইরের দিকে ছিল ৬.৩৬মিটার × ৬.৩৬ মিটার এবং ভিতরের দিকে ছিল ৩.৯ মিটার × ৩.৯ মিটার। মঠের দেয়ালগুলি ছিল ১.২ মিটার প্রশস্ত। এটি কিছু দূর পর্যন্ত বর্গাকারে উঠে পরে মঠের আকারে ক্রমশ: সরু হয়ে উঠেছিল। মঠের উচ্চতা ছিল ৯.০৯ মিটার। এর গায়ে অতি সুন্দর কারুকার্য ছিল। মঠের গায়ে যে লিপি ছিল তার পাঠ নিম্নরূপ :

"শূন্য বেদে শরেন্দৌ চ শাকে মকর গে—রবৌ
সপ্ত দশোত্তরে সম্মিতে চ জগদ্‌গুরু—
শ্রীজানে: পরিতোষায় শ্রীঘোষ দুহির্তুমঠঃ।

অর্থাৎ শূন্য (০), বেদ (৪), শর (৫), ও ইন্দু (১) এবং সপ্তদশোত্তর বেদে = ১৭+৪=২১ তারিখে অঙ্কস্য বামাগতিতে ১৫৪০ শকাব্দে (১৬১৮ খ্রিঃ) এ মঠ নির্মিত হয়েছিল। এটিকে ঘোষদুহিতার মঠ বা ইটনার মঠও বলা হত। মঠটি হাল আমলে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

নড়াইল জেলার লক্ষ্মীপাশা উপজেলার অধীনে লোহাগড়া গ্রামে আঠার শতকের প্রথমভাগে নির্মিত একটি জোড়বাংলা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। বর্গাকারে নির্মিত এ মন্দিরের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ছিল ৫.১৫ মিটার (১৭´) দীর্ঘ। মন্দিরের সম্মুখ প্রাচীরে প্রচুর টেরাকোটার অলঙ্করণ ছিল।

শালনগর জোড়বাংলা মন্দির

নড়াইল জেলার লক্ষ্মীপাশা উপজেলার অধীনস্থ শালনগর গ্রামে একটি জোড়বাংলা মন্দির প্রায় ভগ্নাবস্থায় এখনও টিকে আছে। কিঞ্চিৎ আয়তাকারে নির্মিত এ মন্দিরের আয়তন ছিল প্রায় ৭.৭৭ মিটার × ৭ মিটার। লোহাগড়া মন্দিরের মতো এটিও আঠার শতকের প্রথম দিকে নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরের ফাসাদে প্রচুর টেরাকোটা অলঙ্কণের নিদর্শন আছে।

আছে। এখানে নাকি বিভিন্ন স্থান থেকে পাথর এনে জড়ো করা হত। এখানে একটি প্রস্তরখণ্ড মাটিতে প্রোথিত আছে। প্রস্তর খণ্ডের আনুমানিক ১.৩৪ মিটার মাত্র মাটির উপরে আছে। এই উপরের অংশে অষ্টভুজা একটি মহিষমর্দিনী মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। মূর্তিটি বেশ প্রাচীন।

মুসলিম আমল

সূচনা

যশোহর-খুলনার ইতিহাসে বিশেষ করে মুসলিম আমলের ইতিহাসে প্রমাণভিত্তিক কোনো রাজপুরুষের নাম করতে গেলে খান-ই-জাহানের নাম সর্বপ্রথমে উল্লেখ করতে হয়।[১] এর পরে এ অঞ্চলের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট, তাঁরা হচ্ছেন রাজা বসন্ত রায়, রাজা বিক্রমাদিত্য (শ্রীহরি) ও তাঁর পুত্র রাজা প্রতাপাদিত্য। এর অর্থ এই নয় যে, খান-ই-জাহান-প্রতাপাদিত্যদের পূর্বে এ অঞ্চলে সভ্যতা বিস্তার লাভ করেনি অথবা অন্য কোনো রাজা বা রাজপুরুষের আবির্ভাব ঘটেনি। প্রকৃতপক্ষে যশোহ-খুলনা অঞ্চলে যে সমস্ত প্রত্নকীর্তির চিহ্ন পাওয়া গেছে, তাতে ধারণা করতে অসুবিধা হয় না যে, বাঙলার সভ্যতার ইতিহাসের প্রাচীনতম পর্যায়ে এ স্থানে বহু সমৃদ্ধ জনপদের অস্তিত্ব ছিল। এ অঞ্চল ছিল প্রাচীন গঙ্গা বা গঙ্গারিডই রাজ্যেরই একটি বিশেষ অংশ। নব্যপ্রস্তর যুগের কথা সঠিকভাবে বলা যায় না যথাযথ অনুসন্ধান ও প্রমাণের অভাবে। তবে পার্শ্ববর্তী ২৪ পরগনা জেলার চন্দ্রকেতুগড়-হরিনারায়ণপুর প্রভৃতি অঞ্চলে মৌর্য ও পরবর্তী যুগের যে-সমস্ত নির্দশন পাওয়া গেছে, তাতে ধারণা করা যায় যে, বেশ কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত সমৃদ্ধ জনপদের অস্তিত্ব ছিল। এ অঞ্চল ছিল প্রাচীন গঙ্গা বা গঙ্গারিডই রাজ্যেরই একটি বিশেষ অংশ। নব্যপ্রস্তর যুগের কথা সঠিকভাবে বলা যায় না যথাযথ অনুসন্ধান ও প্রমাণের অভাবে। তবে পার্শ্ববর্তী ২৪ পরগনা জেলার চন্দ্রকেতুগড়-হরিণারায়ণপুর প্রভৃতি অঞ্চলে মৌর্য ও পরবর্তী যুগের যে-সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গেছে, তাতে ধারণা ধারণা করা যায় যে, বেশ কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত যশোর-খুলনা অঞ্চলেও গড়ে উঠেছিল অনুরূপ কীর্তিসহ অনেক জনপদ। গুপ্তযুগে যে এ অঞ্চলে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী একাধিক জনপদের অস্তিত্ব ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভরতভায়না, কপিলমুনি-আগ্রা, বারবাজার, বাগেরহাট, আম্মাদি প্রভৃতি স্থানে যে-সমস্ত ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, সেগুলি অত্যন্ত প্রাচীন। এ সমস্ত স্থান এবং এ অঞ্চলের আরও অনেক স্থানের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই সত্য কিন্তু এ সমস্ত স্থানের সঠিক কাল নির্ণয়ের ব্যাপারে আজ পর্যন্ত কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণও পাওয়া যায়নি।

---

১. খান-ই-জাহানের প্রকৃত নাম কি ছিল, তা জানা যায় না। তাঁর কবরের শিলা লিপিতে তাঁকে 'উলুঘ খান-ই-জাহান' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এটি কোনো নাম নয়, এটি একটি উপাধি এবং এর অর্থ হচ্ছে পৃথিবীর মহান খান। কিন্তু তিনি সর্বত্রই খান জাহান আলী খান ওরফে খাঞ্জালী খান সংক্ষেপে খাঞ্জালী বলে পরিচিত। শিলালিপিতে উলুঘ খান-ই-জাহানের পরে 'আলায়হে' অর্থাৎ 'উপর' শব্দটি আছে। খুব সম্ভব এ শব্দ থেকেই তাঁর আলী নাম এসেছে ভুলক্রমে।

পালযুগে খুব সম্ভব এ অঞ্চল তাঁদের অধিকারভুক্ত ছিল। কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে এ অঞ্চলের কোন নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায়নি। এ অঞ্চল যে সেনদের অধিকারে ছিল, সে সম্পর্কে লিপি প্রমাণ পাওয়া গেছে।

মুসলিম আমলের ইতিহাসে দেখা যায় যে, ফতেহাবাদ অর্থাৎ বর্তমান ফরিদপুর অঞ্চলে খান-ই-জাহানের বেশ কিছু কাল আগে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এমন কি ত্রয়োদশ শতাব্দীর চতুর্থপাদে বাঙলার বিদ্রোহী সুলতান মুঘীস-উদ্-দীন তোঘরীলের দুর্ভেদ্য 'নারিকেলা' (Lorical) দুর্গ এ জেলায় ছিল বলে জানা যায়। বলবনের ভয়ে তোঘরীলের জাজনগরে পালিয়ে যাবার পথটিও খুব সম্ভব নদীয়া (বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার) মধ্যে দিয়ে ছিল। অথচ যশোর-খুলনার ব্যাপারে দেখা যায় যে, খান-ই-জাহানের আগে এ অঞ্চলে আদৌ মুসলমানদের আগমন ঘটেছিল কিনা, সে সম্পর্কে ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরব। পরের ইতিহাস অবশ্য মোটামুটিভাবে বেশ পরিষ্কার।

খলিফাতাবাদের কীর্তিসমূহ

খান-ই-জাহান এ অঞ্চলে কবে এসেছিলেন সে সম্পর্কে কোনো সঠিক তথ্য আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তাঁর মাযারে শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি ৮৬৩ হিজরী (১৪৫৯ খ্রিঃ) সনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এর উপরে নির্ভর করেই এ অঞ্চলে তাঁর আগমন সম্পর্কে মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে। তিনি এ অঞ্চলে যে সমস্ত কীর্তি রেখে গেছেন, সে গুলি সমাপ্ত করতে যে সুদীর্ঘ কাল ব্যয়িত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। প্রবল জনপ্রবাদ মতে তিনি এ অঞ্চলে ৩৬০ টি দিঘি খনন, ৩৬০ টি মসজিদ ও অসংখ্য পাকা সড়ক নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর সব ক'টি মসজিদ বর্তমানে টিকে নেই। যেগুলি টিকে আছে এবং যেগুলি বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে সে গুলির সংখ্যা ৩৬০ নয়। তবে ৩৬০ টি না হলেও তিনি যে যশোর-খুলনার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অসংখ্য পাকা মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, সে সম্পর্কে প্রমাণের অভাব নেই।

দিঘিগুলির মধ্যে অনেকগুলিই বিভিন্ন অবস্থায় এখনও টিকে আছে। ৩৬০ টি না হলেও অসংখ্য দিঘি যে তিনি খনন করিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। পাকা সড়কগুলির বেশির ভাগই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তবে কিছু কিছু সড়কের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন টিকে রয়েছে। সেগুলিও সংখ্যায় খুব কম নয়।

এত সব কাজ করতে যে সুদীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য। সে হিসাবে এ অঞ্চলে তাঁর অবস্থানকাল আনুমানিক ৪০ বছর ছিল বলে ধরে নিলে খুব অসঙ্গত হবে বলে মনে হয় না। অন্ততপক্ষে ৩০ বছর যে ছিল, তাতে কোন সন্দেহই থাকতে পারেনা। অন্য সব কীর্তির কথা বাদ দিলেও একমাত্র ষাটগম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করতেই কমপক্ষে ১০ থেকে ১৫ বছর সময় লাগার কথা। বাকি কীর্তিগুলি নির্মাণ করতে ২০ থেকে ২৫ বছরের কম সময় লাগার কথা নয়। তাঁর মৃত্যুকাল (১৪৫৯ খ্রিঃ) থেকে হিসাব করলে এ অঞ্চলে তাঁর আগমন পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের শেষ দিকে ঘটেছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। তখন রাজা গণেশের পুত্র জালাল-উদ্-দীন মোহাম্মদ

শাহ্ (যদু) গৌড়ের সুলতান ... ইসলাম ধর্মে নবদীক্ষিত এই নরপতি নবদীক্ষিত মুসলিমের উদ্দীপনা (The zeal of a new Muslim convert) নিয়ে খান-ই-জাহানকে তখন পর্যন্ত অনধিকৃত দক্ষিণবঙ্গ অধিকার ও সেখানে ইসলাম ধর্ম প্রচার করার জন্য প্রচুর সৈন্য-সামন্ত ও অর্থ দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি সেখানে সুদীর্ঘকাল অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে কাজ করে সুলতান নাসির উদ্-দীন মাহমুদ শাহ্‌র রাজত্বকালে (মৃত্যু ৮৬৪ হি—১৪৫৯ খ্রিঃ) কি তাঁর সামান্য পরে মারা যান।

খান-ই-জাহান কোনো স্বাধীন সুলতান হিসাবে এ অঞ্চল শাসন করেননি। তিনি স্বনামে কোনো মুদ্রা বা খুৎবা প্রচলন করেছিলেন, এমন কোনো প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তাঁর অভিধা ছিল উলুঘ খান-ই-জাহান (পৃথিবীর মহান খান), সুলতান নয়। তিনি তাঁর শাসন কেন্দ্রের নাম দিয়েছিলেন খলিফাতাবাদ অর্থাৎ প্রতিনিধির আবাসস্থল। এসব প্রমাণের পরে তাঁকে কোন মতেই স্বাধীন সুলতান বলে ধরে নেওয়া যায় না।



খানজাহান সমাধি সৌধ, বাগেরহাট

তিনি কার খলিফা বা প্রতিনিধি ছিলেন? এ প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক ও সর্বজন গৃহীত সমাধান আজও হয়নি। স্থানীয় প্রবল জনপ্রবাদ মতে তিনি ছিলেন দিল্লীর সম্রাটের প্রতিনিধি। শ্রীসতীশ মিত্র 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' নামক গ্রন্থে ও জনাব আবদুল জলীল 'সুন্দর বনের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে জোর গলায় এর পিছনে সমর্থন দান করেছেন। আবার কেউ কেউ তাঁকে গৌড়ের সুলতানের প্রতিনিধি বলে মনে করেছেন।

রাজা গণেশের বংশধরদের রাজত্বের শেষে যখন সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্‌কে গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয় (১৪৩৬ খ্রিঃ), তার বহু আগে থেকেই দিল্লীর সঙ্গে গৌড়ের কোনো সম্পর্কই ছিল না। বাঙলার সুলতান তখন স্বাধীন ও সার্বভৌম। পশ্চিমে বিহার ও উড়িষ্যার সীমান্ত থেকে আরম্ভ করে পূর্বে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল গৌড়ের স্বাধীন সুলতানদের অধিকারে। তখন দিল্লীর বাদশাহ্‌র কোনো আধিপত্য এ অঞ্চলে নেই। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ফখর-উদ-দীন মোবারক শাহ্‌র রাজত্বকাল থেকেই বাঙলার এই স্বাধীনতা চলে আসছে। এই অবস্থায় দিল্লীর বাদশাহ্‌র কোনো প্রতিনিধি সৈন্য-সামন্ত সহ বাঙলার দক্ষিণাঞ্চলে এসে তাঁর প্রতিনিধি বা খলিফা হিসাবে শাসন ব্যবস্থা চালাবেন, তা কল্পনাও করা যায় না। দিল্লী বা সে রাজ্যের কোনো

অঞ্চল থেকে বাংলাদেশে আগমনের একমাত্র পথ ছিল রাজমহলের নিকট দিয়ে। গৌড়ের সুলতান তখন এত দুর্বল ছিলেন না যে, তিনি বিনা বাধায় দিল্লীর প্রতিনিধিকে সৈন্য-সামন্ত সহ তাঁর রাজ্যের একটি বিরাট অংশ অধিকার করতে দেবেন। এমনটি যদি হত, তবে দিল্লীর বাদশাহ্‌র পক্ষে সমগ্র বাঙলা অধিকার করার ক্ষেত্রেও কোন বাধা থাকার কথা নয়।

কিন্তু তা হয়নি। সুলতান সেকান্দর শাহ্‌র (১৩৫৭-৯১ খ্রিঃ) সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঙলা অধিকারে অকৃতকার্য হয়ে দিল্লীশ্বর ফিরোজ তোঘলক এ রাজ্য অধিকারের আশা ত্যাগ করে চলে গেলেন। এর পরে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের আগে আর কোনো দিল্লীর সুলতান বাঙলার প্রতি সক্রিয় লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে সমর্থ হননি।

এ সমস্ত কারণে খান-ই-জাহানকে দিল্লীর বাদশার প্রতিনিধি হিসাবে ধরা যেতে পারেনা। তিনি ছিলেন খুব সম্ভব প্রথমে জালাল-উদ-দীন মোহাম্মদ শাহ্‌র প্রতিনিধি (১৪১৭-৩২ খ্রিঃ)। এই জালাল-উদ-দীনের সময় থেকে শুরু করে নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্‌র রাজত্বকালের একদম শেষ পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল ধরে তিনি যশোহর-খুলনা অঞ্চলে অবস্থানরত ছিলেন।

তিনি কোথা থেকে এসেছিলেন, তা জানা যায়নি। তবে তাঁর কীর্তিগুলির মধ্যে তোঘলকী স্থাপত্যের প্রভাব দেখে ধারণা করা যেতে পারে যে, দিল্লীর সঙ্গে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। অথবা এমনও হতে পারে যে, তাঁর স্থপতিদের মধ্যে দিল্লী অঞ্চলের স্থাপত্যের সঙ্গে পরিচিত শিল্পীও ছিলেন। তিনি যশোরের বারবাজার থেকে দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং পথে পাকা-সড়ক, পাকা মসজিদ নির্মাণ ও বড় বড় জলাশয় খনন করে অগ্রসর হতেন বলে জানা যায়। তিনি বাগেরহাটে এসে আস্তানা গাড়েন এবং সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

খান-ই-জাহানের মাযার

বাগের হাটের সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুর দিঘি বা খাঞ্জালী দিঘির উত্তর তীরে একটি প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে এ সমাধিসৌধ অবস্থিত। এখানে খান-ই-জাহান চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। খান-ই-জাহানের জীবিত কালেই খুব সম্ভব তিনি এ মাযার ইমারত নির্মাণ করেন এবং মৃত্যুর পূর্বে তিনি এখানে বেশ কিছুকাল ধরে বসবাস করেছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে এবং তা বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা বলেই মনে হয়। মাযারের চারদিকে যে অনুচ্চ বেষ্টক প্রাচীর আছে, তার বাইরে আরও একটি বেষ্টনী-প্রাচীর ছিল এবং পূর্বদিকের প্রাচীরে ছিল নগর থেকে মাযারে প্রবেশ করার তোরণদ্বার। এখন সে প্রাচীর নেই তবে তোরণের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ এখনও টিকে আছে। বর্তমানে যে অভ্যন্তরীণ বেষ্টক প্রাচীর আছে, তার চারকোণে দেয়াল সমান উঁচু ৪টি স্তম্ভ আছে। দক্ষিণ দেয়ালের মাঝামাঝি অংশে এবং দিঘির পাকা ঘাটের কিছু উত্তরে মাযারে প্রবেশ করার তোরণ। প্রাচীর ঘেরা স্থানের প্রায় মাঝামাঝি অংশে মাযার ইমারতটি অবস্থিত।

বর্গাকারে নির্মিত এ সমাধিসৌধের প্রত্যেক বাহু প্রায় ১৪.১৫ মিটার লম্বা। চার কোণে ৪টি গোলাকার মিনার বা টারেট আছে। টারেটগুলি বলয়াকারের স্ফীত রেখা

'fine bands of moulding' দ্বারা অলঙ্কৃত। টারেটগুলির উপরের অংশ ছাদ থেকে বেশি উঁচু নয়। এগুলির শীর্ষদেশ ক্ষুদ্রাকৃতির গম্বুজ দ্বারা সুশোভিত। ইমারতের দেয়ালগুলি মাটি থেকে উপরে ০.৯ মিটার পর্যন্ত প্রস্তর নির্মিত। ৬০ সে.মি. × ৩০ সে.মি. × ২৩ সেন্টিমিটার আয়তনের পাথরগুলি প্রায় সম আয়তনের। পাথরের গাঁথুনি এখন পর্যন্ত প্রায় অটুট অবস্থায় আছে। এর পরে আছে ইটের গাঁথুনি। দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম প্রাচীরে আছে একটি করে প্রবেশপথ। উত্তর দেয়ালে কোন প্রবেশপথ নেই। পত্রাকৃতির খিলানযুক্ত দরজাগুলি ২.০১ মিটার উঁচু। দেয়ালগুলি ২.৪ মিটার প্রশস্ত। বাইরের দিকে চতুষ্কোণাকৃতির হলেও অভ্যন্তর ভাগে এই ইমারতটি দেখতে প্রায় অষ্টকোণাকৃতির। প্রাচীরগুলি প্রায় ৭.২৭ মিটার উপরে ওঠার পরে সেখান থেকে ইমারতের গোলাকার গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। গম্বুজের উপরিভাগে নানারকম কারুকার্য ছিল বলে জানা যায়। এখন কোনো কারুকার্য নেই। তবে গম্বুজের উপরের জমাট এত শক্ত ও সুন্দর যে, এখন পর্যন্ত তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য মেরামত ছাড়াই গম্বুজটি অত্যন্ত সুন্দর রূপ নিয়ে বছরের ৫৫০ বেশি সময় ধরে টিকে আছে। মাটি থেকে গম্বুজের চূড়া পর্যন্ত ইমারতের উচ্চতা ১৪.২৪ মিটার। [খান-ই-জাহানের মাযারের রঙিন ছবি-১৩]

সমাধি-গৃহের মেঝেটি মীনা করা ইট (glazed tile) দ্বারা আবৃত ছিল।[১] বর্তমানে (১৯৭৫ খ্রিঃ) এগুলির কোনো চিহ্নও নেই। ইমারতের কেন্দ্রস্থলে খান-ই-জাহানের সমাধি। মেঝের উপরে প্রায় ৪.২৪ মিটার × ২.৪২ মিটার আয়তনের একটি ইষ্টক নির্মিত বেদী। বেদীটি মীনা করা টালি (glazed tiles) দ্বারা সুশোভিত ছিল। বর্তমানে সেগুলি নেই। এই বেদীর উপরে ৬ খণ্ড কাল পাথরে তৈরি একটি তাক। এই তাকের উপরে ৪ খণ্ড কাল পাথরে তৈরি আর একটি তাক। এর উপরে সমাধির সর্বোচ্চ অংশ ১.৮১ মিটার দীর্ঘ এক খণ্ড অর্ধ গোলাকৃতির কাল পাথর দ্বারা আবৃত। শীর্ষদেশের এ পাথর ও নিচের দুই তাকের পাথরের উপর আরবী ও ফারসী ভাষায় অতি সুন্দরভাবে বিভিন্ন লিপি উৎকীর্ণ আছে। লিপিগুলিতে আছে বিভিন্ন কলেমা, আল্লাহ্‌র ৯৯ নাম, চার খলিফার নাম, কোরান শরীফের আয়াত, ফারসী কবিতা, খান-ই-জাহানের মৃত্যু ও দাফনের তারিখ ইত্যাদি, ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে ২টি শিলালিপিতে খান-ই-জাহানের

১. সমাধিসৌধের বর্ণনা দিতে গিয়ে বাগেরহাট মহকুমার তদানীন্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট গৌরদাস বসাক (Mr. Gourdas Bysak) ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে বলেন (Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol XXX VI, pl. I. 1867, p. 130), "The steps round the grave are inlaid with encaustic tiles of various colours, the richness of which has withstood the wear and tear of four hundred years without any serious damage. Some of the tiles are hexagons, 4 inches across, while others are squares of $6\frac{1}{2}$" each side. The substance of the latter is a white stone ware, and the enamelling on it is of a character which makes me suspect these tiles to have been imported from China. The former are of red earth, and the glazing and designs on them are of inferior execution. Their counterparts are commonly met with in Pathan buildings in Gaur and elsewhere."

মৃত্যু, দাফন ইত্যাদির তারিখ আছে (Vide Inscriptions of Bengal, Vol, IV, pp. 65-67, Mvi S. Ahmad)। প্রথম শিলালিপির বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ :

"আল্লাহ্‌র দুর্বলভৃত্য, বিশ্ব প্রভুর কৃপাভিখারী, নবীদের নেতার (হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফার) বংশধরদের প্রেমিক, সত্যনিষ্ঠ আলেমদের প্রতি একনিষ্ঠ, কাফের ও অবিশ্বাসীদের ঘৃণাকারী, ইসলাম ও মুসলমানের সহায়ক উলুঘ (মহান) খান-ই-জাহান—তাঁর উপর উল্লাহর কৃপা ও ক্ষমা বর্ষিত হোক!—এ পৃথিবীর বাসস্থান ছেড়ে চিরদিনের বাসস্থানে চলে গেছেন যিলহজ্জ্ব মাসের ২৬ তারিখ বুধবারে এবং ঐ মাসের ২৭ তারিখ বৃহস্পতিবার তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় [এবং তা ঘটে] ৮৬৩ [হিজরী] সনে (২৬শে অক্টোবর ১৪৫৯ খ্রিঃ)।"

দ্বিতীয় শিলালিপির অনুবাদ নিম্নরূপ :

> "খান-উল-আ'যম (মহান খান) খান-ই-জাহানের এই পবিত্র সমাধি বেহেশতের উদ্যানের অংশ বিশেষ। [আল্লাহ্‌র] রহমত ও করুণাময় দৃষ্টি তাঁর উপর পতিত হোক! ৮৬৩ [হিজরী] সনের ২৬ শে যিলহজ্জ্ব, [তারিখ] এটি লিপিবদ্ধ হয়েছে (২৫ শে অক্টোবর ১৪৫৯ খ্রিঃ)।"

অন্যান্য শিলালিপির মধ্যে একটি ফারসী কবিতা উল্লেখের দাবি রাখে। এর বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ :

> "হে বন্ধুগন, স্মরণ রেখো, মৃত্যু অনিবার্য!
> কাননে কন্টক আছে, মৃত্যু অনিবার্য, মৃত্যু অনিবার্য!
> সকল সৃষ্টির প্রবল শত্রু মৃত্যু এবং [সে আছে দৃঢ়] প্রত্যয় নিয়ে;
> [সে] অন্য শত্রুদের মত-নয়, মৃত্যু অনিবার্য, মৃত্যু অনিবার্য।"

মাযারটি যে খান-ই-জাহান নিজে নির্মাণ করেছিলেন এবং শেষজীবনে যে তিনি এতে বাস করতেন, সেকথা আগেই বলা হয়েছে (পরে বাবুর্চি খানাও দ্র.)। কবর ও শিলালিপিগুলিও খুব সম্ভব তিনি জীবিত কালেই তৈরি করে গিয়েছিলেন। শুধু মৃত্যু ও দাফনের তারিখগুলি খুব সম্ভব তাঁর মৃত্যুর পরে লিপিকৃত হয়েছিল।

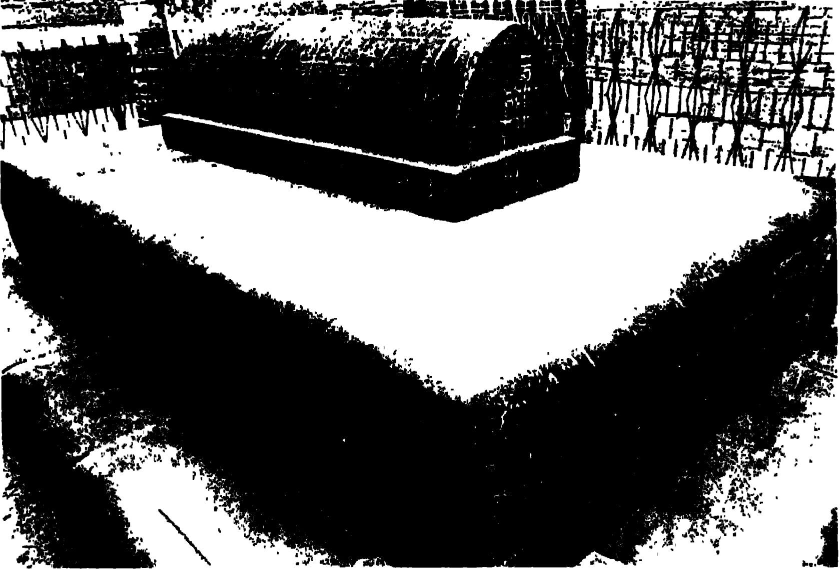
পীর আলী মোহাম্মদ তাহেরের সমাধি

খান-ই-জাহানের মাযারের পশ্চিম দরজা থেকে কয়েক গজ পশ্চিমে কৃষ্ণ প্রস্তরনির্মিত একটি সমাধি দেখা যায়। খান-ই-জাহানের সমাধির মত এটিও প্রস্তরনির্মিত এবং '১২ × ৭ ফুট' আয়তনের বেদীর উপরে ৩ স্তবকে নির্মিত। উন্মুক্ত স্থানে অবস্থিত এ সমাধির শিলালিপিতে যে পাঠ আছে, তার বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ : "এই স্থান স্বর্গীয় কাননের অংশবিশেষ এবং ইহা এক বিশেষ বন্ধুর সমাধি, তাঁহার নাম মোহাম্মদ তাহের, আরিখ ৮৬৩ জিলহজ্জ্ (১৪৫৯ খ্রী:)"।[১]

তাঁর পূর্ব পরিচয় সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায়নি। অধ্যাপক সতীশ মিত্র তাঁকে বেশ হেয় চোখেই দেখেছেন এবং তিনি তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "তাঁহার পূর্বে কি নাম ছিল, জানি না, জানিয়াও বিশেষ কাজ নাই, এখন তাঁহার নাম হইল মোহাম্মদ

১. যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৩৬৮ পৃ:। শ্রীসতীশ চন্দ্র মিত্র।

তাহের।"[১] জনাব আবদুল জলীল তাঁর সম্পর্কে বলেন, "বহুদিন অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিয়াছি যে এই ব্রাহ্মণ সন্তানের পূর্ব নাম ছিল গোবিন্দলাল রায়। তিনি গোবিন্দ ঠাকুর নামেই পরিচিত ছিলেন। ইনি খান জাহানের বিশেষ প্রিয়পাত্র ও অমাত্য ছিলেন।"[২] জনাব আবদুল জলীল কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করে এই তথ্য পরিবেশন করেছেন, তা উল্লেখ করেননি। তবে আলী মোহাম্মদ তাহের যে আগে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পরে মুসলিম হয়েছিলেন, একথা সর্বত্রই শোনা যায়। তিনি যে খান-ই-জাহানের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন, তা বোঝা যায় খান-ই-জাহানের সমাধি ভবনের পাশেই তাঁর সমাধি এবং তাঁর কবরের উপর খান-ই-জাহানের করা শিলালিপিটি দেখে।



আলী মোহাম্মদ তাহেরের সমাধি

এ সমাধি সম্পর্কে অধ্যাপক সতীশ মিত্র বলেন, "মহম্মদ তাহের এখানে মারা যান নাই, এখানে মাত্র তাঁহার একটি শূন্যগর্ভ সমাধিবেদী গাঁথা রহিয়াছে। ... বন্ধুর সমৃতি চিহ্ন রাখা কর্তব্য এই বুদ্ধিতে খাঁ জাহান মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সেই একই জেলহজ্জ মাসে মহম্মদ তাহেরের জন্য এই সমৃতি স্তম্ভ গঠিত করিয়া রাখিয়া যান। সমাধির উপরিভাগটি প্রায় খাঁ জাহানের সমাধির ন্যায়, তবে ইহার ভিতরে কিছুই নাই, সিঁড়ি দিয়া তন্মধ্যে অবতরণ করা যায়।"[৩] নেহায়েত অজ্ঞতাবশতই যে সতীশ বাবু এ মন্তব্য করেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কবরের নিচে এ ধরনের সুড়ঙ্গ পথের বহু দৃষ্টান্ত এই উপমহাদেশে আছে।

---

১. প্রাগুক্ত ৩৩৩ পৃ:।
২. সুন্দর বনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১১৮ পৃ:। এ, এফ, এম, আবদুল জলীল।
৩. যশোহর খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২৬৮ পৃ:। সতীশ চন্দ্র মিত্র।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন সুপারিনটেনডেন্ট ডক্টর আবদুল গফুর এই কবর সম্পর্কে গ্রন্থকারকে একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছেন। অনেক বছর আগে কার্যোপলক্ষে তিনি সুড়ঙ্গপথে আলী মোহাম্মদ তাহেরের সমাধির নিচে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি সেখানে কয়েকটি শিলালিপি দেখেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস লিপি গুলিতে খান-ই-জাহান ও মোহাম্মদ তাহের সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য আছে। তিনি আরও জানান যে, বর্তমানে নিচের সুড়ঙ্গ মাটি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং লিপিগুলি উদ্ধার করতে গেলে কবরের পার্শ্ব দেশ খনন করা আবশ্যক। কিন্তু খাদিমগণের তাতে প্রবল আপত্তি আছে। ফলে অনুসন্ধান কাজ ব্যাহত হয়ে আছে। ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে খাদিমদের অনুমতি নিয়ে আমরা এ স্থান খনন করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সময়ের অল্পতার জন্য করতে পারিনি। প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর একাজটি করলে ভাল হয়।

এক গম্বুজ মসজিদ

পীর আলী মোহাম্মদ তাহেরের সমাধির কিছু পশ্চিমে, পশ্চিম দিকের বেষ্টনী-প্রাচীরের বাইরে একটি সুন্দর মসজিদ আছে। বর্গাকারে নির্মিত এই মসজিদের প্রত্যেক বাহু ১২.১২ মিটার। প্রাচীর গুলি ২.১২ মিটার প্রশস্ত। পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে দরজা আছে। পূর্ব দেয়ালের কেন্দ্রীয় দরজাটি অপেক্ষাকৃত বড়। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি মিহরাব। উপরে একটি মাত্র গম্বুজ। অতি বিরাট এই গম্বুজ ভূমি থেকে ১০.৯ মিটার উঁচু এবং তলদেশে এর ব্যাস প্রায় ৭.৮৭ মিটার।

শেষ জীবনে খান-ই-জাহান যখন মাযারে বাস করতেন, তখন তিনি এ মসজিদে নামাজ আদায় করতেন। মাযার থেকে আসার জন্য মাযারের পশ্চিম বেষ্টনী-প্রাচীরে মসজিদ বরাবর একটি দরজা আছে। বাবু সতীশ চন্দ্র মিত্র এটিকে রন্ধনশালা বা বাবুর্চিখানা বলেছেন।[১] একটি জ্বলজ্যান্ত মসজিদকে তিনি কলমের জোরে বাবুর্চিখানা বানিয়ে ফেলেছেন।

বাবুর্চি খানা

খান-ই-জাহানের মাযারের পূর্ব দিকে অভ্যন্তরীণ বেষ্টক প্রাচীরের বাইরে ও বাইরের বেষ্টক প্রাচীরের ভিতরে ও কাছাকাছি স্থানে,একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এই ইমারতটি এমনভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে যে এর সঠিক আকার নির্ধারণ করা কঠিন। তবে দেয়াল ও ভিত্তির কিছু কিছু অংশ যা নযরে পড়ে, তা থেকে বোঝা যায় যে, উত্তর-দক্ষিণে লম্বা আয়তাকারে নির্মিত একটি ছোট ইমারত এখানে ছিল। এর ছাদ ছিল খানিকটা চৌচালা ঘরের ছাদের মত। এটি ছিল খুব সম্ভব খান-ই-জাহানের বাবুর্চিখানা। এই বাবুর্চিখানার উত্তরেই ছিল শহর থেকে মাযারে প্রবেশ করার সদর তোরণ।

শেষ জীবনে খান-ই-জাহান যখন মাযারে বাস করতেন, তখন তিনি প্রত্যহ গরীব-দুঃখীদের ভোজন করাতেন। ভোজ্য দ্রব্য রান্না হত এই বাবুর্চিখানায়।

১. সতীশ চন্দ্র মিত্র যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৩৬৮ পৃ.

ঠাকুর দিঘি বা খাঞ্জালীর দিঘি

খান-ই-জাহানের মাযারের দক্ষিণে অবস্থিত বেষ্টক প্রাচীরের প্রায় লাগোয়া দক্ষিণে এই বিরাট জলাশয় অবস্থিত। আনুমানিক ১২০ বিঘা ভূমি জুড়ে এই বিরাট জলাশয়ের অবস্থান। অতি প্রশস্ত পাড়গুলি পাহাড়ের মতো উঁচু। প্রত্যেক পাড়ের মাঝখানে একটি করে প্রশস্ত পাকা ঘাট ছিল। সংস্কারের অভাবে ঘাটগুলি সব নষ্ট হয়ে গেছে। এক মাত্র মাযারের সামনের ঘাটটি সংস্কারের ফলে এখনও ভাল অবস্থায় টিকে আছে। এ ঘাট প্রায় ১৮.১৮ মিটার চওড়া এতে ৩৮ টি সিঁড়ি আছে। কিঞ্চিৎ উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ জলাশয়ের আয়তন প্রায় ৪২৬.৭০ মিটার × ৩৬৫.৭৪ মিটার।

এ দিঘি খননের সঠিক তারিখ জানা যায়নি। ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে দিঘিটি খনন করা হয়েছিল বলে কেউ কেউ ধারণা করে থাকেন। দিঘির নাম নিয়ে নানা রকম গল্প শোনা যায়। একমতে দিঘি খনন করার সময় মাটির নিচে একটি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যায় বলে দিঘির নাম হয় ঠাকুর দিঘি।[১] আর একমতে খান-ই-জাহান হিন্দুদের নিকট ঠাকুর হিসাবে পূজিত হতেন বলে তাঁর এ দিঘির নাম হয় ঠাকুরদিঘি। আবার কেউ কেউ বলেন যে, খান-ই-জাহানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু মোহাম্মদ তাহের আগে ব্রাহ্মণ ঠাকুর ছিলেন বলে খান-ই-জাহান বন্ধুর স্মৃতি রক্ষার্থে দিঘির নাম করেন ঠাকুরদিঘি। এর কোনটিই বোধ হয় সত্য নয়। খান-ই-জাহান খুব সম্ভব দিঘির কোনো নাম করণ করে যাননি। দিঘি থেকে বুদ্ধ মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল বলে খুব সম্ভব পরবর্তীকালে লোকেরা এটিকে ঠাকুর দিঘি বলে অভিহিত করেন।

পূর্বে দিঘিতে অনেক কুমির ছিল। লোকে বলে যে, খান-ই-জাহান শখ করে 'কালাপাহাড়' ও 'ধলাপাহাড়' নামক দুটি কুমির দিঘিতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। বর্তমান কুমির গুলি নাকি তাদেরই বংশধর। দিঘির নির্জন পূর্ব ও দক্ষিণ পাড়ে কুমিরগুলি ডিম পাড়ত। বর্তমানে সে এলাকার ধারেকাছে কিছু বসতি গড়ে ওঠার ফলে কুমিরগুলির ডিম পাড়ার ব্যাঘাত হচ্ছে। তাই কুমিরের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে বলে মাযারের খাদিমগণ বলেন। লোকেরা হাঁস, মুরগি, ছাগল ইত্যাদি প্রাণী এবং খই, চিড়া, বাতাসা ইত্যাদি নিরামিষ দ্রব্য মানত করে কুমিরগুলিকে খেতে দেন। কুমিরগুলি নাকি মানুষ খায়না। কিন্তু একথা সত্য নয়। তবে দিঘিতে স্নানরত মানুষকে এর আক্রমণ করেছে, এমন ঘটনা শোনা যায় না। বেশ কিছু কাল আগে কুমিরগুলি মানুষ খায়না এই সরল

১. '৪২ ইঞ্চি × ২০.৫০ ইঞ্চি' আয়তনের একখণ্ড কৃষ্ণ প্রস্তরনির্মিত ভূমিস্পর্শ মুদ্রার এই বুদ্ধ মূর্তিটি ভাস্কর্য-শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। এ মূর্তির আবিষ্কার ও স্থানান্তর সম্পর্কে নানারকম মুখরোচক গল্প প্রচলিত আছে। মূর্তিটি জলাশয়ের ঠিক কোন্ স্থানে পাওয়া গিয়েছিল, তা জানা যায়নি। তবে জলাশয় খনন করতে গিয়ে যে মাটির নিচে এটি আবিষ্কৃত হয়, তা সকলেই বলে থাকেন। খান-ই-জাহান নাকি এ মূর্তিটি মহেশচন্দ্র ব্রহ্মচারী নামক একজন ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন। তিনি বাগেরহাটের ৪মাইল দূরে একস্থানে এটিকে প্রতিষ্ঠিত করে শিব বলে পূজা করতে থাকেন। এর জন্য নাকি ৩৬০ বিঘা জমি লাখেরাজ ছিল এবং সেই জমি নাকি খান-ই-জাহানেরই দেওয়া। পুরুষানুক্রমে মূর্তিটি যেখানে শিব হিসাবে পূজিত হয়ে আসছিল সে স্থানের নাম হয় শিববাটী। বছর কয়েক আগে মূর্তিটিকে ঢাকার কমলাপুর বৌদ্ধ বিহারে আনয়ন করা হয়েছে এবং এটি বর্তমানে সেখানেই আছে।—গ্রন্থকার

বিশ্বাসে এক দম্পতি তাদের প্রথম সন্তানকে ঘাটের পানিতে রেখে, আয় আয় বলে কুমিরকে ডাক দেয়। একটি কুমির এসে ছোঁ মেরে শিশুটিকে নিয়ে গিলে ফেলে। এর পরে কেউ আর এ ধরনের কাজ করে না।

দিঘিতে অনেক দামদল গজিয়েছে এবং আশু সংস্কার না করলে দিঘিটি দামদলে সম্পূর্ণ রূপে আবৃত হয়ে যাবে। দিঘির পানি অত্যন্ত স্বচ্ছ। এ দিঘির পানি সর্বরোগ নিরাময় করে বলে লোকদের বিশ্বাস। দিঘিরপাড়ে প্রতি বছর চৈত্রমাসে খাঞ্জালীর মেলা নামক একটি বিরাট মেলা বসে।

নয়গম্বুজ মসজিদ

ঠাকুরদিঘির পশ্চিম পাড়ের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত এই মসজিদ দীর্ঘ দিন ধরে অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় পড়েছিল। চারদিক জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। কয়েক বছর আগে প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর সংস্কার করে মসজিদটিকে প্রায় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে (restored) এনেছে। ষাটগম্বুজ মসজিদ ছাড়া এতবড় ও এমন সুন্দর মসজিদ বর্তমানে বাগেরহাট অঞ্চলে আর দেখা যায় না।



▲ নয় গম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট

বর্গাকারে নির্মিত এ মসজিদ প্রত্যেক বাহু আনুমানিক ১৫.০৭ মিটার লম্বা। পূর্ব দেয়ালে আছে ৩টি প্রবেশপথ। উত্তর এবং দক্ষিণ দেয়ালেও আছে ৩টি করে প্রবেশ পথ। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি সুন্দর মিহরাব। দেয়ালগুলি ২.৫৭ মিটার প্রশস্ত। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগে ৪টি পাথরের স্তম্ভ আছে। স্তম্ভগুলি ৩.৩৫ মিটার উঁচু। এই ৪টি স্তম্ভ ও চারপাশের দেয়ালের উপর মসজিদের ৯টি গম্বুজ প্রতিষ্ঠিত। গম্বুজগুলি দেখতে অতি মনোরম।

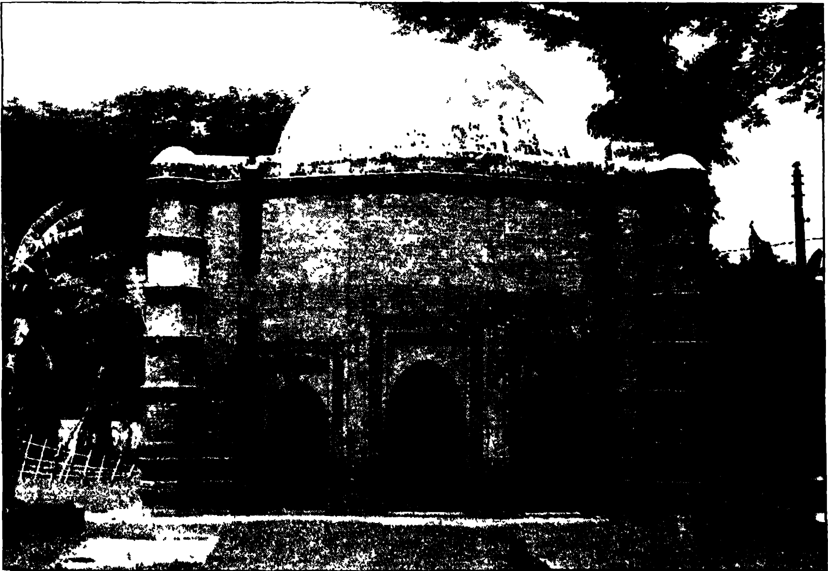
কলামগুলি অষ্টকোণাকারে উপরে উঠে ১৬ কোণে বিভক্ত। প্রস্তর নির্মিত কলামগুলি প্রতিটি দেয়ালে সংলগ্ন। প্রস্তর স্তম্ভ থেকে সরাসরি গম্বুজের পাতা উঠে গেছে। কোনার টাওয়ার গোল।

মসজিদের চারদিকে অনেক জায়গা জুড়ে বেষ্টক প্রাচীর ছিল। সেই দেয়াল এখন ভেঙ্গে পড়েছে কিন্তু তার চিহ্ন আছে। মসজিদ অঙ্গনে আরও কিছু ইমারত ছিল বলে ধারণা হয়। অঙ্গনের বাইরেই একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আছে। মসজিদের উত্তরে বর্তমানে খানই-জাহানের মাযারের খাদিমদের বসতবাটী।

মসজিদে কোনো শিলালিপি নেই। এ মসজিদ খান-ই-জাহান নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায় এবং মসজিদের গঠনপ্রণালী এবং স্থাপত্য কৌশলও তা প্রমাণ করে।

জিন্দাপীরের মাযার ও মসজিদ

খান-ই-জাহানের মাযার থেকে প্রায় ৫০০ মিটার উত্তর-পশ্চিমে একটি প্রাচীর ঘেরা স্থান আছে। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা এই আয়তাকার স্থানের আয়তন ১০৬.৬ মিটার × ১০০ মিটার। এখানে নূতন-পুরাতন, কাঁচা-পাকা অনেক কবর আছে। এখানকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বস্তুটি হচ্ছে জিন্দাপীরের মাযার বলে অভিহিত একটি সমাধি-ভবনের ধ্বংসাবশেষ। বর্গাকারে নির্মিত এ মাযারের প্রত্যেক বাহু ছিল ৬.০৬ মিটার দীর্ঘ। দেয়ালগুলি ছিল ১.৫ মিটার প্রশস্ত। উপরে ছিল একটি মাত্র গম্বুজ। বর্তমানে দেয়ালের ঊর্ধ্বাংশ ও গম্বুজ টিকে নেই। উত্তর দেয়ালের অনেক খানি এখনও টিকে আছে। ইমারতের মধ্যভাগে আছে জিন্দাপীরের পাকা কবরটি। এই কবরের প্রতি লোকের খুব শ্রদ্ধাভক্তি দেখা যায়।

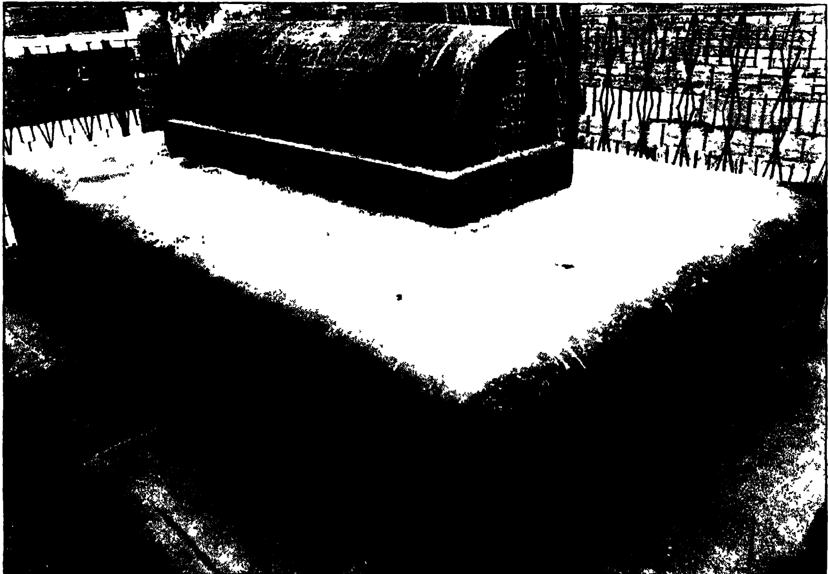


▲ জিন্দা পীরের মসজিদ

মাযারের উত্তর দিকে রাস্তার ধারে ও বেষ্টক প্রাচীরের ভিতরে বেশ কয়েকটি প্রাচীন পাকা কবর এক সারিতে ছিল। কবরগুলি প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলে সংস্কার করে নূতন করে গঠন করা হয়েছে। মাযারের পশ্চিমেও ৪টি পুরাতন কবর নূতন করে নির্মাণ করা হয়েছে।

জিন্দাপীরের মসজিদ ও মাযার

জিন্দাপীরের মাযার থেকে প্রায় ২০ মিটার উত্তর-পশ্চিমে প্রাচীর বেষ্টিত স্থানের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি ছোট সুন্দর মসজিদ আছে। বর্গাকারে নির্মিত মসজিদের প্রত্যেক বাহু প্রায় ৪.৬৭ মিটার লম্বা। দেয়ালগুলি ১.২১ মিটার পুরু। অভ্যন্তরের মাপ ৫ মিটার × ৫ মিটার। উপরে আছে একটি মাত্র গম্বুজ। গম্বুজের বেশির ভাগ ধ্বংসে পড়েছে। আর কিছুদিন পরে সম্পূর্ণ গম্বুজ ধসে্ পড়বে। পূর্ব দেয়ালে আছে তিনটি দরজা ও পশ্চিম দেয়ালে আছে তিনটি মিহরাব। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে দরজা। মসজিদে অষ্টকোণাকৃতি ৪টি মিনার আছে এবং তা বলয়-সমৃদ্ধ। আগে মসজিদের দেয়ালে সুন্দর পোড়ামাটির চিত্রফলক ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে। মসজিদের গম্বুজ খান-ই-জাহানী স্টাইলে নির্মিত নয়। দেয়ালে পোড়ামাটির চিত্র ফলকের অবস্থানও খান-ই-জাহানী স্টাইলের পরিচয় প্রদান করে না। খুব সম্ভব এই সমজিদ পরবর্তীকালের এবং হোসেন শাহ বা তাঁর পুত্র নুসরত শাহ্র আমলে নির্মিত হয়েছিল। মসজিদের স্থাপত্য কৌশল দেখেও তা মনে হয়।



পীর আলীর মাজার, বাগেরহাট

জিন্দাপীরের প্রকৃত নাম নিয়ে কিছু মতভেদ আছে। জনশ্রুতি মূলে তার নাম ছিল আহমদ খাঁ। মিঃ ওমালীর মতে তাঁর নাম ছিল আহমদ আলী। জনাব আবদুল জলীলের মতো তাঁর নাম ছিল সৈয়দ আহমদ শাহ্ ওরফে জিন্দাপীর। তিনি একজন অতি পূত চরিত্রের দরবেশ ছিলেন বলে জানা যায়।

মাযারের পশ্চিম পার্শ্বে এক গম্বুজবিশিষ্ট একটি ছোট হুযরা বা ইবাদতখানা আছে। মাযারের উত্তর পাশে আছে একটি পাকা কবর। সেটি তাঁর পুত্রের কবর বলে চিহ্নিত করা হয়।



▲ রেজাখোদা মসজিদ, বাগেরহাট

রেযা খান বা রেযা খোদা মসজিদ

জিন্দাপীরের মাযারের প্রায় ১৫০ মিটার পশ্চিমে একটি মাঝারি আকারের মজে যাওয়া পুকুরের পশ্চিম পাড়ে একটি মাঝারি আকারের মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আছে। মসজিদের লাগোয়া পূর্বদিক দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি রাস্তা আছে। রাস্তার সঙ্গেই আছে একটি বিরাট তোরণের ধ্বংসাবশেষ। প্রায় ৪.৩ মিটার উঁচু ছিল এই প্রবেশপথ। দু'পাশে ছিল উঁচু ও বিরাট বিরাট স্তম্ভ। এই প্রবেশপথ দিয়ে মসজিদে ঢুকতে হত। ১৪.৬ মিটার × ১২.১ মিটার আয়তনবিশিষ্ট মসজিদের এখন বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নেই। ২টি পাথরের স্তম্ভের নিম্নাংশ মাটিতে পাড়ে আছে। ১.৭৮ মিটার পুরু দেয়ালের কিছু কিছু অংশ এখানে-ওখানে এখনও দেখা যায়। এতে মনে হয় যে-মসজিদের ৩টি প্রবেশপথ ও ৩টি মিহরাব ছিল। উপরে ৬টি গম্বুজ ও ৪টি অষ্টকোনাকার মিনার ছিল বলে ধারণা হয়। দেয়ালগুলি ছিল প্রায় ১.৮১ মিটার পুরু।

সঠিকভাবে কিছু বলা না গেলেও এ মসজিদ খান-ই-জাহানী স্টাইলে নির্মিত ছিল না বলে ধারণা হয়। খুব সম্ভব এ মসজিদ হোসেন শাহ্ বা নুসরত শাহ্র আমলে নির্মিত হয়েছিল।

ষাটগম্বুজ মসজিদ

খান-ই-জাহানের মাযার থেকে প্রায় ২.২ কিলোমিটার পশ্চিম-পশ্চিম-উত্তরে ঘোড়া দিঘির পূর্বতীরে সুন্দরঘোনা মৌজায় অবস্থিত ষাট গম্বুজ মসজিদ এক অতি বিশাল কীর্তি। বাংলাদেশের প্রাচীন আমলের মসজিদগুলির মধ্যে এটি বৃহত্তম। অবিভক্ত বাঙলায় আদিনা মসজিদ ও বড় সোনামসজিদের পরেই ছিল এর স্থান।

উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ মসজিদের আয়তন বাইরের দিকে ৪৮ মিটার × ৩২.৫০ মিটার এবং ভিতরের আয়তন ৪৩.৪ মিটার × ২৬.৮১ মিটার। ইষ্টক নির্মিত দেয়ালগুলি প্রায় ২.৮ মিটার প্রশস্ত। চারকোণে আছে ৪টি বিরাট আকারের মিনার বা টাওয়ার। গোলাকার মিনারগুলি দু'ধাপে (stage) নির্মিত এবং ক্রমশ সামান্য সরু (tapering) হয়ে উপরে উঠেছে। মসজিদের ছাদের কিছু উপর পর্যন্ত আছে একটি ধাপ। সেখানে মিনারের গায়ে দুটি গোলাকার ও উদগত বলয় (band) আছে। এ ছাড়া মিনারের গায়ে আর কোনো কারুকার্য বা অলঙ্করণ নেই। এর পরে দ্বিতীয় ধাপে মিনারগুলি ছাদের ৩.৪৩ মিটার উপরে উঠেছে এবং এগুলি একই রকমের অলঙ্করণ দ্বারা শোভিত। শীর্ষদেশে আছে গম্বুজ। সামনের দুটি স্তম্ভ মিনার হিসাবে ব্যবহৃত হত এবং এগুলির ভিতর দিয়ে উপরে যাওয়ার জন্য ঘোরানো সিঁড়িপথ আছে। এ দুটি মিনারের গম্বুজের নিচে খিলানের সাহায্যে নির্মিত একটি করে কক্ষ আছে। কক্ষ দুটির একটির নাম রওশনকোঠা ও অপরটির নাম আন্ধার কোঠা। এই মিনার দুটি আজান দিবার জন্য ব্যবহৃত হত। মসজিদের সমগ্র সম্মুখ ভাগে ঈষৎ বাঁকান কার্নিশ ও ব্যাটলম্যান্ট ছাড়া আর কোনো অলঙ্করণ নেই। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উপরে ত্রিভুজাকারের একটি 'পেডিম্যান্ট' (pediment) আছে। গ্রীক স্থাপত্যে এ ধরনের নিদর্শন দেখা যায়।

মসজিদের পূর্ব দেয়ালে আছে ১১টি প্রবেশপথ। পত্রাকারের খিলান দ্বারা দরজাগুলি নির্মিত। কেন্দ্রীয় দরজাটি ২.৯৮ মিটার প্রশস্ত। পাশের দরজাগুলি ১.৮৭ মিটার থেকে ১.৫ মিটার পর্যন্ত প্রশস্ত। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ৭টি করে দরজা আছে। এগুলি বাইরের দিকে ১.১ এবং ভিতরের দিকে ১.৮৬ মিটার করে প্রশস্ত। পূর্ব দেয়ালের কেন্দ্রীয় দরজার উপরে যে 'পেডিম্যান্ট'-এর কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে সেখান থেকে কার্নিশ দু'দিকে ক্রমশ ঢালু হয়ে দু'দিকের কোণের মিনারে গিয়ে মিশেছে। অন্য তিন দিকেও কার্নিশের এই বাঁকান ভাব দেখা যায়। মসজিদের দরজাগুলি সবই খোলা। এগুলির মধ্যে কপাটের ব্যবস্থা ছিল বলে মনে হয় না।

পশ্চিম দেয়ালে ১০টি মিহরাব আছে। সেখানে ১১টি মিহরাব থাকার কথা। কেন্দ্রীয় মিহরাবের উত্তরে যেখানে একটি মিহরাব থাকার কথা, সেখানে ১টি ছোট দরজা আছে। এটি বোধ হয় সাধারণত বন্ধ থাকত এবং বিশেষ প্রয়োজনে খোলা হত। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি পাথরের তৈরি এবং আকারে বেশ বড়। এতে পাথরের উপর সুন্দর

অলঙ্করণ ছিল। সেসব কারুকার্যের কিছু নিদর্শন এখনও টিকে আছে। বাকি ৯টি মিহরাবে খুব বেশি না হলেও কিছু কিছু কারুকার্য ছিল।



ষাট গম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট, খুলনা

মসজিদের অভ্যন্তর ভাগ পূর্ব-পশ্চিমে সাত ভাগ ও উত্তর-দক্ষিণে এগার ভাগে বিভক্ত। বিভাগগুলির কেন্দ্রস্থলে পরস্পর ৩.৯৩ মিটার দূরে দূরে সর্ব মোট ৬০ স্তম্ভ আছে। অবশ্য কেন্দ্রীয় দরজা ও কেন্দ্রীয় মিহরাবের মধ্যবর্তী স্তম্ভগুলির (উত্তর-দক্ষিণে) পারস্পরিক দূরত্ব ৫ মিটার। স্তম্ভগুলি সব পাথরের তৈরি। তৃতীয় সারির ২টি অষ্টম সারির ২টি ও একাদশ সারির ১টি স্তম্ভের পাথর চারদিকে ইট দ্বারা আবৃত। স্তম্ভগুলি প্রায় ৩.২৯ মিটার উঁচু। এই ৬০টি পাথরে তৈরি স্তম্ভ ও চারপাশের ইটের তৈরি দেয়ালের উপর মসজিদের ৭৭টি গম্বুজ নির্মিত। [ষাটগম্বুজ মসজিদের ভিতরের রঙিন ছবি-১৫]

কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ ও কেন্দ্রীয় মিহরাবের মধ্যবর্তী স্থানের উপরে যে ৭টি আচ্ছাদন আছে, সেগুলি বাংলাদেশের চৌচালা ঘরের চালের আকারে নির্মিত। এগুলির তলদেশ বর্গাকৃতির এবং প্রত্যেক বাহু প্রায় ৪.৮৫ মিটার লম্বা। এই ৭টি আচ্ছাদনের দু'পাশে ৩৫টি করে যে ৭০টি গম্বুজ আছে সেগুলি অর্ধ গোলাকার। এই গম্বুজগুলির ব্যাস ৩.৮৬ মিটার। এই চৌচালা ধরনের আচ্ছাদন পরবর্তীকালে নির্মিত দরসবাড়ি মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ এবং আরও অনেক ইমারতে দেখা যায়।

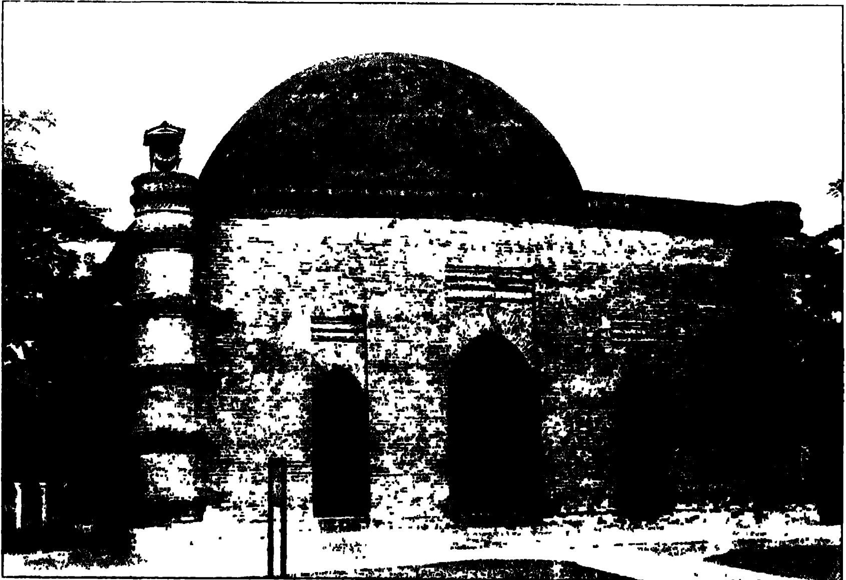
মসজিদের উপরে ৭৭টি এবং চার কোণে ৪টি, এইমোট ৮১ টি গম্বুজ থাকা সত্ত্বেও এই মসজিদকে কেন ষাট গম্বুজ মসজিদ বলা হয়ে থাকে, তার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। কেউ কেউ অনুমান করেন যে, মসজিদের অভ্যন্তরে যে ৬০টি স্তম্ভ

আছে, তা থেকেই ষাট গম্বুজ নামের উৎপত্তি। আবার কেউ বলেন যে, মসজিদের উপর 'সাত' সারি গম্বুজ থাকার দরুণ 'সাত' থেকে 'ষাট' গম্বুজ নামকরণ হয়েছে। এ সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা কঠিন।

মসজিদের বাইরে এক বিরাট এলাকা জুড়ে একটি বেষ্টক প্রাচীর ছিল। এবং পূর্বদিকে ছিল মসজিদের প্রধান প্রবেশতোরণ। তোরণের দু'পাশে ছিল দুটি কক্ষ। কক্ষ দুটি ও বেষ্টক প্রাচীর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শুধু প্রবেশতোরণটি কোনো মতে টিকে আছে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর কর্তৃক সংরক্ষিত এ মসজিদের চারধারে কাঁটা তারের বেড়া আছে। মসজিদের কাছে একটি ছোট রেষ্টহাউস নির্মাণ করা হয়েছে হাল আমলে।

এই মসজিদ খান-ই-জাহান তাঁর দরবারকক্ষ হিসাবে ব্যবহার করতেন বলে প্রবল জনশ্রুতি আছে। এটি যে একটি মসজিদ ছিল, তাতে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। তবে প্রয়োজনবোধে খান-ই-জাহান হয়ত এটিকে দরবারগৃহ হিসাবে ব্যবহার করতেন। পশ্চিম দেয়ালে কেন্দ্রীয় মিহরাবের উত্তর দিকে যে-দরজাটি আছে, তা এ ধারণার পিছনে সমর্থন যোগায়।

মসজিদে কোনো শিলালিপি নেই। খান-ই-জাহান কর্তৃক নির্মিত কোনো ইমারতেই নির্মাতার পরিচয়জ্ঞাপক কোনো শিলালিপি নেই। তাঁর মাযারের শিলালিপিগুলিতেও মাযার নির্মাতার নাম নেই। খান-ই-জাহানের মাযার এবং তাঁর নির্মিত অন্যান্য ইমারতের গঠনপ্রণালী ও স্থাপত্যকৌশল দেখে পণ্ডিতেরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, এই বিরাট কীর্তি খান-ই-জাহান ছাড়া আর কেউ নির্মাণ করেননি।



▲ সিঙ্গার মসজিদ, বাগেরহাট

সিঙ্গড়া মসজিদ

ষাট গম্বুজ মসজিদ থেকে প্রায় ২৭৫ মিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সুন্দরঘোনা গ্রামে সিঙ্গরা মসজিদ নামে একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। বর্গাকারে নির্মিত এ মসজিদের প্রত্যেক বাহু বাইরের দিকে ১২.২ মিটার ও ভিতরের দিকে প্রায় ১০ মিটার এবং ইষ্টকনির্মিত প্রাচীরগুলি প্রায় ২.১২ মিটার প্রশস্ত। চারকোণে ৪টি মিনার বা টারেট আছে। সেগুলির নিম্নাংশ প্রায় নষ্ট হয়ে যাবার পথে। উপরের অংশ এবং ক্ষুদ্র গম্বুজগুলি এখনও টিকে আছে। পূর্ব দেয়ালে আছে ৩টি প্রবেশপথ। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ বরাবর পশ্চিম দেয়ালে আছে একটি অলঙ্কৃত মিহরাব। এই মিহরাবের উভয় পার্শ্বে পূর্ব দেয়ালের প্রবেশপথ দুটির বরাবর পশ্চিম দেয়ালে ২টি কুলঙ্গি (niche) আছে। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে আছে ১টি করে প্রবেশপথ। এ দরজা দুটির দু'পাশে প্রত্যেক দেয়ালেই আছে দুটি করে কুলঙ্গি। মসজিদের উপরে আছে বিরাট আকারের একটি উঁচু গম্বুজ। গম্বুজের উপর অনেক গাছ জন্মেছে। মসজিদটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল। বাইরের সীমানা প্রাচীর এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হাল আমলে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক এর মেরামত কাজ হয়েছে বলে জানা গেছে। এটি যে খান-ই-জাহানের আর একটি বিরাট কীর্তি, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ঘোড়াদিঘি

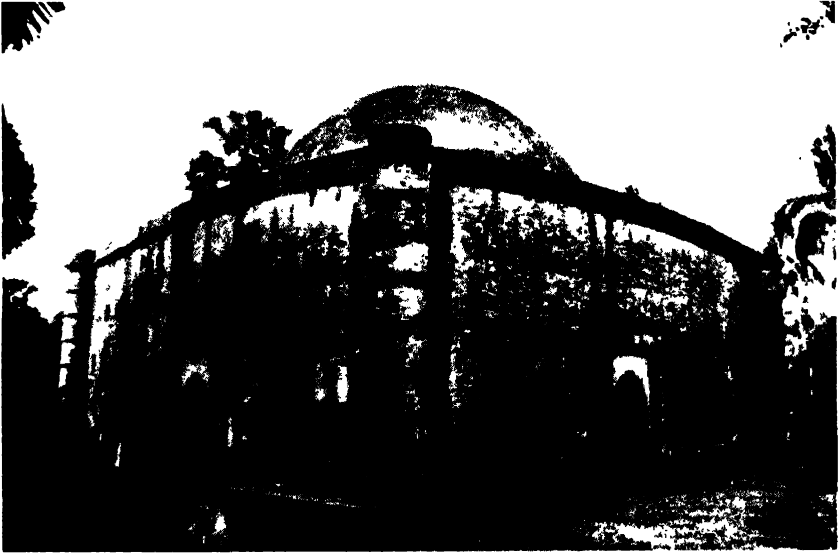
ষাটগম্বুজ মসজিদের লাগোয়া পশ্চিমে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি রাস্তা। রাস্তার পশ্চিম দিকে যে বিরাট জলাশয় আছে, তার নাম ঘোড়াদিঘি। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা এ দিঘির আয়তন প্রায় ৬০০মিটার × ৩৬৩ মিটার। বাগেরহাট এলাকায় খান-ই-জাহান সর্ব প্রথম এদিঘি খনন করেছিলেন বলে প্রবল জনপ্রবাদ আছে। এককালে এ দিঘি খুবই গভীর ছিল। কোনো কোনো স্থানে এর গভীরতা প্রায় ৭.৫ মিটার ছিল বলে জানা যায়। বর্তমানে জলাশয়টি স্থানে স্থানে অগভীর হয়ে পড়েছে। তবে এতে এখনও বারমাস পানি থাকে এবং দিঘির পানি খুব স্বচ্ছ ও সুপেয়। দিঘি থেকে বাগেরহাট শহরে জল সরবরাহ করা হত বলে জানা যায়। পূর্বপাড়ে একটি পাকাঘাটের ধ্বংসাবশেষ আছে। এটি খুব সম্ভব খান-ই-জাহানের আমলে নির্মিত ঘাটেরই ধ্বংসাবশেষ।

দিঘির পাড়গুলি মোটেই উঁচু নয়। এত বড় দিঘির মাটি কোথায় ফেলা হয়েছিল, তা গবেষণার বিষয়। খুব সম্ভব দিঘির মাটি ষাটগম্বুজ মসজিদ যেখানে নির্মিত হয়েছিল সেখানে ফেলা হয়েছিল এবং দিঘির পাড় উঁচু না করে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য নিচু স্থানে ফেলা হয়েছিল।

এ দিঘির নামকরণ সম্পর্কে নানা রকম গল্প প্রচলিত আছে। একমতে একটি ঘোড়া যতদুর দৌড়াতে পেরেছিল, ততটুকু স্থান জুড়ে এ দিঘি খনিত হয়েছিল বলে এর নাম ঘোড়াদিঘি। দ্বিতীয় মতে দিঘি খনন করার পর খান-ই-জাহান ঘোড়ায় চড়ে দিঘি প্রদক্ষিণ করেছিলেন বলে এর নাম ঘোড়াদিঘি। তৃতীয় মতে এখানে খান-ই-জাহানের সৈন্যদলের আস্তানা ছিল এবং এখানে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ ও ঘোড়দৌড় হত বলে এর নাম ঘোড়াদিঘি। কোনটা ঠিক অথবা কোনটাই ঠিক কিনা তা বলা কঠিন।

বিবি বেগিনীর মসজিদ

ঘোড়াদিঘির পশ্চিম পাড় থেকে প্রায় ২৭৬ মিটার পশ্চিমে অবস্থিত এই এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ খান-ই-জাহানের আর এক বিরাট কীর্তি। বর্গাকারে নির্মিত এ মসজিদের প্রত্যেক বাহু বাইরের দিক থেকে ১৪.২ মিটার এবং ভিতরের দিকে ১৪.২ মিটার। দেয়ালগুলি খান-ই-জাহানী আমলের ইটের তৈরি ও প্রায় ৩.১ মিটার প্রশস্ত। চারকোণে আছে ৪টি গোলাকার মিনার বা টারেট। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ৩টি প্রবেশ পথ। পত্রাকারে নির্মিত খিলানের সাহায্যে দরজাগুলি নির্মিত। দরজা বরাবর পশ্চিমে দেয়ালে আছে ৩টি মিহরাব। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশপথ। মসজিদের উপরে যে অর্ধ গোলাকার ও উঁচু গম্বুজটি আছে, তা সত্যই বিরাট এবং দেখতে বড়ই মনোরম। নিম্নাংশে গম্বুজের ব্যাস প্রায় ৯.০৯ মিটার। এত বড় গম্বুজ সচরাচর দেখা যায় না।



বিবি বেগেনী মসজিদ, বাগেরহাট, খুলনা

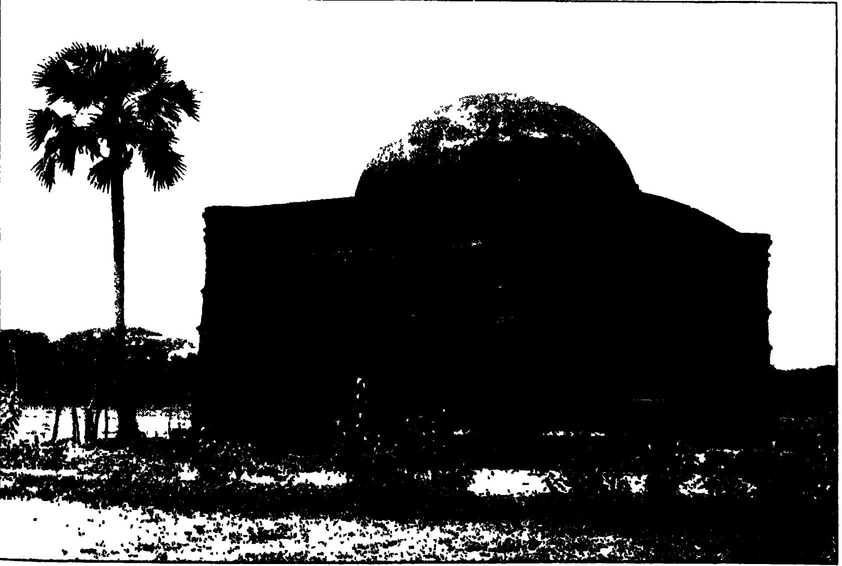
চারদিকে বেষ্টনী-প্রাচীর ছিল। বেষ্টনী-প্রাচীরের বাইরে উত্তর-পূর্ব কোণে বেশ কয়েকটি পাকা কবর ছিল। এগুলি এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এগুলির মধ্যে বিবি বেগিনীর কবর ছিল কিনা কেউ বলতে পারেন না। এই মসজিদকে কেন বিবি বেগিনীর মসজিদ বলা হয়, তাও জানা যায় না।

খান-ই-জাহানের আমলের এই মসজিদটি বহু কাল ধরে জীর্ণ ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল। বর্তমানে এটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতরের রক্ষণাবেক্ষণে এসে তার পূর্ব শ্রী কিছুটা ফিরে পেয়েছে।

চুনাখোলা মসজিদ

বিবি বেগিনী মসজিদ থেকে প্রায় ৪৭০ মিটার উত্তর-পশ্চিমে চুনাখোলা গ্রামে একটি মাঠের মধ্যে এই প্রাচীন মসজিদটি অবস্থিত। চারদিকে চাষের জমির মাঝখানে লোকালয়ের বাইরে এই ভগ্ন মসজিদের অস্তিত্ব যেন নিঃসঙ্গতার বেদনার প্রতীক। এককালে খুব সম্ভব ধারে কাছে বসতি ছিল। এখন লোকালয় বেশ দূরে। মসজিদটিও বেশ জীর্ণ অবস্থায় আছে এবং স্থানীয় লোকেরা এটিকে বর্তমানে (১৯৭৫ খ্রিঃ) মাঠের গরু-বাছুরের আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহার করে আসছেন।

বর্গাকারে নির্মিত এ মসজিদের প্রত্যেক বাহু বাইরের দিকে থেকে প্রায় ১২.০৯ মিটার এবং ভিতরের দিক থেকে প্রায় ৭.৫৭ মিটার লম্বা। দেয়াল গুলি ১.৩ মিটার প্রশস্ত। চারকোণে ৪টি গোলাকার মিনার বা টারেট আছে। পূর্ব দেয়ালে আছে ৩টি প্রবেশপথ, মধ্যেরটি অপেক্ষাকৃত বড়। প্রবেশপথগুলির বরাবর পশ্চিম দেয়ালে ৩টি মিহরাব আছে। মিহরাবগুলির নিচের অংশ মাটির নিচে দেবে গেছে। ভূমিকম্পে বা অন্য কোনো কারণে মসজিদটি নিচের দিকে দেবে যাবার ফলে মিহরাবগুলির এ অবস্থা হয়েছে কিনা সঠিক বলা যাচ্ছে না। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে আছে একটি করে প্রবেশপথ। এগুলির পাশে দুটি করে প্রদীপ-কুলঙ্গি আছে। সূক্ষ্মাগ্র খিলানের উপর বর্শা ফলকের প্যাটার্নসহ সুন্দর খিলান দ্বারা প্রবেশপথগুলি নির্মিত। খান-ই-জাহানী স্থাপত্য শিল্পের এটি একটি বৈশিষ্ট্য।



চুনাখোলা মসজিদ, বাগেরহাট

উপরের একমাত্র গম্বুজটি আকারে ছিল বেশ বড়। উল্টান পেয়ালাকারে নির্মিত এই গম্বুজের ব্যাস ছিল প্রায় ৭.৫৭ মিটার। গম্বুজের শীর্ষদেশের বেশ কিছু অংশ পড়ে

গেলেও এই গম্বুজটি নূতন করে নির্মাণ করে এই মূল্যবান প্রত্নকীর্তিটিকে রক্ষা করা যায়। প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর এটিকে ইতোমধ্যে সংস্কার করেছে বলে জানা গেছে।

খান-ই-জাহানের বসতবাটী

ষাটগম্বুজ মসজিদ থেকে আনুমানিক ১.৫ কিলোমিটার উত্তরে ভৈরব নদীর একটি মরে যাওয়া খাতের দক্ষিণ তীরে খান-ই-জাহানের বসতবাটীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ষাট গম্বুজ মসজিদ থেকে উত্তর দিকে যে রাস্তা চলে গেছে, সে রাস্তা থেকে যেখানে বাগেরহাট সড়ক পূর্বদিকে বের হয়েছে, সেই মোড়ের একটু দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এই ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। এ বাড়ির পরিধি কতটুকু ছিল, তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। বাড়ি বলতে এখন (১৯৭৫ খ্রিঃ) কিছুই নেই। আছে শুধু ইট-পাথরের ধ্বংসস্তূপ। ইটগুলিও বেশির ভাগ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। পড়ে আছে শুধু অজস্র ইটের টুকরা আর বেশ কয়েকটি বড় বড় পাথরের টুকরা। এগুলি ছিল খুব সম্ভব কোনো ইমারতের স্তম্ভ। চারদিকে ঝাড়-জঙ্গল গজিয়ে উঠেছে। সেই ঝাড়-জঙ্গলের ভিতর কয়েকটি কুঁড়ে ঘরে কিছু কিছু লোক বাস করেন।

বসতবাটীর পূর্বদিকে বিষপুকুর বা বিচপুকুর নামক একটি প্রায় মজে যাওয়া মাঝারি আকারের পুকুরের অস্তিত্ব দেখা যায়। পুকুরের পূর্বদিকে পরপর বেশ কয়েকটি বেষ্টনী-প্রাচীর ও সংলগ্ন পরিখার চিহ্ন দেখা যায়। স্থানীয় জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, খান-ই-জাহানের বাড়ির চারদিকে পর পর পরিখা বেষ্টিত সাতটি বেষ্টনী-প্রাচীর ছিল। সাতটি না হলেও বেশ কয়েকটি প্রাচীরের চিহ্ন এখানে ওখানে আজও দেখা যায়। এমনকি তাঁর বাড়ির উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে যে আধুনিক রাস্তাটি বাগেরহাট পর্যন্ত চলে গেছে, সে রাস্তার বাইরে ভৈরবের প্রাচীন খাতের কাছেও একটি বেষ্টনী প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

খান-ই-জাহানের আবাসবাটী এলাকায় প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে দুটি মসজিদ ছিল বলে জানা যায়। একটির নাম ছিল সোনা মসজিদ। এখন মসজিদ দুটির কোনো চিহ্ন নেই।

সম্প্রতি খান-ই-জাহানের আবাসবাটীর ধ্বংসাবশেষ থেকে ঘটনাক্রমে বেশ কয়েকটি মূল্যবান তৈজসপত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির মধ্যে আছে বেশ উৎকৃষ্ট মানের কয়েকটি নানা রঙের চীনামাটির পাত্র (glazed potteries)। এধরনের চীনা মাটির পাত্র চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে সুলতানী আমলে প্রচলিত ছিল। উৎকৃষ্ট মানের পাত্রগুলি দেখে ধারণা হয় যে, ব্যবহারকারীর রুচিবোধ ছিল উন্নত মানের। খান-ই-জাহানের বাড়ি এলাকায় মাটি খুঁড়তে গিয়ে একব্যক্তি ঘটনাক্রমে এগুলি আবিষ্কার করেন ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে। বর্তমানে এগুলি প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতরের হেফাযতে আছে বলে জানা গেছে।

দীদার খাঁর মসজিদ

খান-ই-জাহানের আবাসবাটীর দক্ষিণ ও পূর্বদিকে বেশ কয়েকটি মসজিদ ছিল। এগুলি এখন টিকে নেই। এগুলির মধ্যে দীদার খাঁর মসজিদ ছিল বেশ উল্লেখযোগ্য। বর্গাকারে নির্মিত এ মসজিদের প্রত্যেক বাহু ছিল বাইরের দিকে ১৬.৯৬ মিটার। দেয়ালগুলি ছিল

২.১২ মিটার প্রশস্ত। পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর দিকে ছিল ৩টি করে প্রবেশপথ এবং পশ্চিম দেয়ালে ছিল ৩টি মিহরাব। ৪টি প্রস্তর স্তম্ভ ছিল ভিতরে। এই স্তম্ভ ও চারপাশের দেয়ালের উপর মসজিদের ৯টি গম্বুজ অবস্থিত ছিল। কেন্দ্রীয় বড় গম্বুজটির ব্যাস ছিল ৪.২৪ মিটার। অপর গম্বুজগুলির ব্যাস ছিল ৩.৭৮ মিটার।

সতীশ বাবু রচিত ও ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' নামক গ্রন্থে (৩৫৬ পৃ.) এ মসজিদের বর্ণনা পাওয়া যায়। বর্তমানে এ মসজিদের কোনো অস্তিত্ব নেই। খুব সম্ভব সে সময়ে মসজিদটি টিকে ছিল।

রণবিজয়পুর মসজিদ

খান-ই-জাহানের বাড়ি থেকে প্রায় ২কিলোমিটার পূর্বদিকে রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে রণবিজয়পুর গ্রামে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য মসজিদ আছে। বর্গাকারে নির্মিত এ মসজিদের প্রত্যেক বাহু বাইরের দিকে ১৬.৯৬ মিটার ও ভিতরের দিকে ১০.৯ মিটার। ইস্টক নির্মিত প্রাচীরগুলি প্রায় ৩ মিটার প্রশস্ত। চারকোণে ৪টি গোলাকার মিনার বা টারেট আছে। পূর্ব দেয়ালে আছে ৩টি দরজা। পত্রাকৃতির খিলানের সাহায্যে প্রবেশ পথগুলি নির্মিত। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ৩টি করে প্রবেশপথ। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি অলঙ্কৃত মিহরাব। মসজিদের উপরে আছে একটি বিরাট গম্বুজ। উল্টান পেয়ালা আকারে নির্মিত এই বিরাট ও উঁচু গম্বুজ একটি দর্শনীয় বস্তু। নিচের দিকে (base) গম্বুজের ব্যাস ১০.৯ মিটার। এত বড় গম্বুজওয়ালা মসজিদ বাংলাদেশে আর কোথাও নেই। মাটি থেকে গম্বুজের চূড়ার উচ্চতা মাপা হয়নি। তবে ১৩.৬৩ মিটারে কম হবে বলে মনে হয় না।



রণবিজয়পুর মসজিদ, বাগেরহাট, খুলনা

মসজিদটি পরিত্যক্ত ও জীর্ণ অবস্থায় বহুকাল ধরে পড়েছিল। সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর এটিকে সংরক্ষণ ও সংস্কার করে একটি কাজের মতো কাজ করেছে।

মসজিদের কোনো নাম নেই। রণবিজয়পুর গ্রামে অবস্থিত বলে এটিকে সাধারণত রণবিজয়পুর মসজিদ বলা হয়ে থাকে। এই মসজিদ যে খান-ই-জাহানের আমলে তৈরি হয়েছিল, মসজিদের গঠন প্রণালী ও স্থাপত্য কৌশলই তা প্রমাণ করে।

দশগম্বুজ মসজিদ

রণবিজয়পুর মসজিদ থেকে প্রায় এক মাইল পূর্বদিকে বাগেরহাট শহরে যাবার পথে পাকা সড়কের উত্তর পাশে কৃষ্ণনগর গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ মসজিদের আয়তন ভিতরের দিকে ১৮.১৮ মিটার × ৬.০৬ মিটার। ইষ্টক নির্মিত প্রাচীরগুলি ১.৮১ মিটার প্রশস্ত। পূর্ব দেয়ালে আছে ৫টি প্রবেশপথ ও এগুলির বরাবর ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ৫ টি মিহরাব। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে আছে ২টি করে দরজা। মসজিদের উপরে ২ সারিতে ১০ টি গম্বুজ আছে। গম্বুজগুলি আকারের ছোট এবং তলদেশে এগুলির ব্যাস মাত্র ৩.৬৩ মিটার।

এ মসজিদের অবস্থা অত্যন্ত জীর্ণ হয়ে পড়েছিল। কিছুকাল আগে স্থানীয় অধিবাসীদের প্রচেষ্টায় মসজিদের আমূল সংস্কার করা হয়েছে এবং সংস্কারের ফলে এটি প্রায় আধুনিক মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছে। বলে না দিলে এটি যে প্রায় ৫০০ বছরের একটি প্রাচীন মসজিদ তা বোঝা কঠিন।

মসজিদটির গঠনপ্রণালী ও স্থাপত্যকৌশল দেখে মনে হয় এটি খান-ই-জাহানের আমলে নির্মিত নয়। স্থানীয় জনপ্রবাদ মতে সুলতান হোসেন শাহ্‌র আমলে এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।

বাগেরহাটের অন্যান্য কীর্তি

উপরে বাগেরহাটের যে সমস্ত কীর্তির কথা বলা হয়েছে, সেগুলি ছাড়া আরও অসংখ্য কীর্তির ধ্বংসাবশেষ বাগেরহাট শহর ও শহরের আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে ছিল এবং এখনও কিছু কিছু আছে। এগুলি দেখে অতি সহজেই বোঝা যায় পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ৫ মাইল ও উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৪ মাইল, এই মোট প্রায় ২০ বর্গমাইল স্থান জুড়ে একটি বিরাট জনপদ গড়ে উঠেছিল খান-ই-জাহানের আমলে। প্রাচীন কীর্তিগুলির মধ্যে মসজিদ ও জলাশয়ের সংখ্যা খুব বেশি। আবাসবাটীর সংখ্যা নগণ্য বললেও চলে। অসংখ্য জলাশয় ও মসজিদ দেখে মনে হয় যে, এ শহরে অসংখ্য লোকের বসতি ছিল। নইলে এতগুলি মসজিদ নির্মাণের কোন প্রয়োজন ছিল না।

খলিফাতাবাদ নাম ছিল এ শহরের। খান-ই-জাহান যে এ নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁর পরে সুলতান হোসেন শাহ্ ও তাঁর পুত্রদ্বয় নসরত শাহ ও মাহ্‌মুদ শাহ্‌র আমলেও এ নগরীর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। এর পরে মোঘল আমলেও খুব সম্ভব এ স্থানের প্রভাব কিছুটা টিকে ছিল। মোঘল আমল থেকেই খুব সম্ভব এ স্থানের প্রতিপত্তি কমতে থাকে এবং পরে এ স্থানটি প্রায় পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে।

প্রাচীন কীর্তিগুলির মধ্যে অনেকগুলি একদম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কতগুলি কীর্তির স্থানে ইট-পাথর পড়ে আছে। সতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর খুলনার ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখিত ও বর্ণিত অনেক প্রাচীন কীর্তি বর্তমানে আর নাই। সে সমস্ত হারিয়ে যাওয়া কীর্তির মধ্যে কোতোয়ালী চৌতারা, চিল্লাখানা ও চিল্লাখানার আশে পাশে ৩টি মসজিদ, খান-ই-জাহানের বাড়ির অঙ্গনে অবস্থিত সোনা মসজিদ ও আর একটি মসজিদ, সুন্দর ঘোনা মসজিদ, দীদার খা মসজিদের পশ্চিমে অবস্থিত দুটি মসজিদ, আনার খাঁ মসজিদ ও দিঘি, গঙ্গা খাঁ মসজিদ ও দিঘি, দরিয়া খাঁ মসজিদ ও দিঘি, আহম্মদ খাঁ মসজিদ, কাটানী মসজিদ, পচা দিঘি, হাবসী খাঁ মসজিদ, এখতিয়ার খাঁর দিঘি ও মসজিদ, বুড়া খাঁ দিঘি, মিঠাপুকুর ইত্যাদি কীর্তিগুলির নাম করা যেতে পারে। কয়েক বছর আগে বাগেরহাটের একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে একটি পাকা দোচালা ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি একটি মূল্যবান আবিষ্কার। এর গঠনকৌশল দেখে এর নির্মাণ কাল নির্ধারণ করতে পারলে সময় নির্দেশক কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

সাবেক ডাঙ্গা দোচালা ইমারত

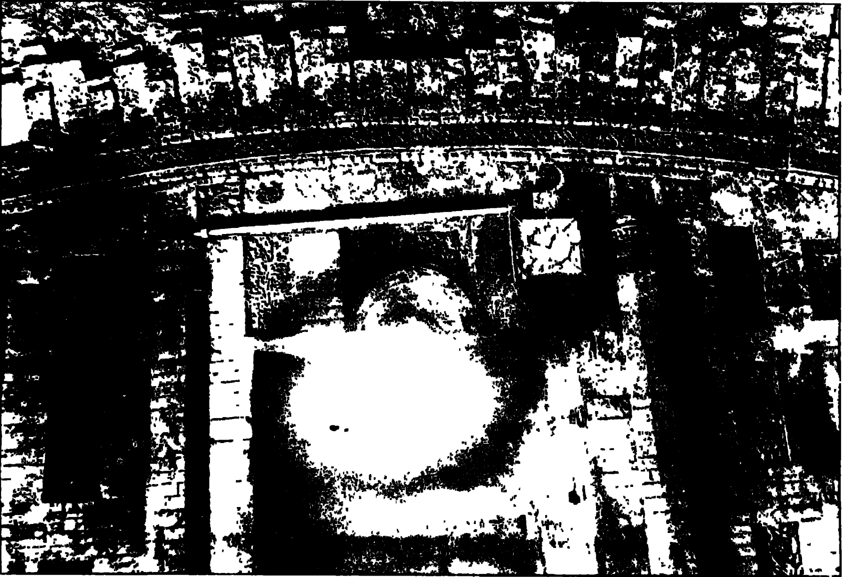
বাগেরহাট শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার উত্তর-উত্তর-পুবে একটি বিচিত্র ধরনের ইমরাত আছে। এই দোচালা ইমারতের আযতন ৪.৫৪ মিটার × ৯.০৯ মিটার। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এই ইমারতে একটি মাত্র প্রবেশ পথ ছিল এবং তা ছিল দক্ষিণ দেয়ালে। এই ইমারতের ভিতরে কোতাবেদী বা মিহরাবের অস্তিত্ব ছিল না।



▲ সাবেক ডাঙ্গা মনুমেন্ট, বাগেরহাট

ইমারতের দেয়ালের উপরে ছিল বিভিন্ন জীবজন্তু ও প্রাণী জগতের চিত্তাকর্ষক টেরাকোটা ফলক এবং এসব ফলকে শৃগালসহ বিভিন্ন প্রাণীর মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। আর আছে বিভিন্ন ফুল, লতাপাতা শোভিত টেরাকোটা ফলক।

ইমারতটিকে হাল আমলে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং পুব দেয়ালে একটি প্রবেশ পথ ও ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে একটি মিহরাব নির্মাণ করে। জীবজন্তুর টেরাকোটা ফলকে অশঙ্কৃত ইমরাত যে একটি হিন্দুদের ইমরাত ছিল তা কোনো সন্দেহ নেই। এটি কোনো কালেই মসজিদ ছিল না।



সাবেক ডাঙ্গা মনুমেন্টের ভিতরের দৃশ্য

মুলঘরের জোড়বাঙলা মন্দির

বাগেরহাটের উত্তর-দিকে, ফকিরহাট থানা ও রেলস্টেশন থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার পূর্ব দিকে এবং কোদলামঠ থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম দিকের মূলঘর গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দির ছিল বলে সতীশ চন্দ্র মিত্র উল্লেখ করে গেছেন।

এটি ছিল একটি জোড়বাঙলা মন্দির। পশ্চিম মুখী এ মন্দিরের আয়তন ছিল ৭.৫ মিটার × ৭.৫ মিটার এবং দুটি দোচালা ঘরের পাকা ছাদের সংযুক্তিকরণে এর ছাদ নির্মিত ছিল। সেই ছাদের উচ্চতা ছিল ৪.৮২ মিটার। মন্দিরের সামনে ছিল ৫.৪৫ মিটার × ২.৪৭ মিটার আয়তনের খোলা বারান্দা।

মন্দিরে যে লিপি ছিল, তা থেকে জানা যায় যে এটি ১৫৯৩ শকাব্দে (১৬৭১ খ্রিঃ) নির্মিত হয়েছিল।

চকশ্রী মসজিদ

রামপাল উপজেলার অধীনে ও সদর থেকে ১০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে এবং বাগেরহাট থেকে প্রায় ৯.৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে চকশ্রী নামক গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। বর্গাকারে নির্মিত মসজিদের আয়তন বাইরের দিকে ৬.৬৬ মিটার × ৬.৬৬ মিটার এবং ভিতরের দিকে ৪.৫৪ মিটার × ৪.৫৪ মিটার। দেয়ালগুলি ১ মিটার প্রশস্ত। পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং দক্ষিণ ও উত্তর দেয়ালে ১টি করে প্রবেশপথ আছে। চার কোণে ৪টি মিনার বা টারেট আছে। এ গুলির প্রত্যেকটি ৪মিটার করে উঁচু। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি মিহরাব। অর্ধবৃত্তাকারের খিলানের সাহায্যে নির্মিত প্রবেশপথগুলির উপরিভাগে খাঁজকাটা আছে। উপরে আছে ১টি মাত্র গম্বুজ। কার্নিস ও প্যারাপেট সরল রেখায় নির্মিত। সামনের দেয়ালে সুন্দর প্যানেলিং-এর অলঙ্করণ আছে।

নবাব মুর্শিদ কুলী খানের আমলে জনৈক বদন হাওলাদারের পুত্র শেখ কালাই এ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা গেছে।

কোদলা বা অযোধ্যার মঠ

বাগেরহাট থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার উত্তরে ও যাত্রাপুর রেলস্টেশন থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার পূর্ব দিকে ভৈরব নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত কোদলা গ্রামে অবস্থিত এই মঠের নাম কোদলা মঠ। এটিকে অযোধ্যার মঠও বলা হয়ে থাকে। তলদেশে বর্গাকারে নির্মিত এ মঠের প্রত্যেক বাহু বাইরের দিকে ৮.৩৯ মিটার দীর্ঘ। ভিতরের প্রকোষ্ঠের মাপ ৩.১৪ মিটার × ৩.১৪ মিটার ১৪ সে.মি. × ৭ সে.মি. × ৪ সে. মি. আয়তনের ইষ্টক নির্মিত প্রাচীরগুলি '৮ফুট ৭½ ইঞ্চি' প্রশস্ত। মঠে ব্যবহৃত পালিশ করা লাল ইটগুলি অতি উঁচু মানের। [বাগেরহাটের কোদলা মঠের রঙিন ছবি-১৭]

মঠের দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব দেয়ালে আছে ১টি করে ক্ষুদ্র প্রবেশপথ। পত্রাকারের খিলানের সাহায্যে নির্মিত প্রবেশপথগুলির উপরের অংশ খাঁজ কাটা (cusped)। আয়তাকার উঁচু ফ্রেমের মধ্যে প্রবেশপথগুলি নির্মিত।

দক্ষিণ দিকে এর প্রধান প্রবেশ পথ। মঠের বর্তমান উচ্চতা ১৯.৫৪ মিটার। ক্রমশ সামান্য সরু হয়ে মঠের শিখর উপরের দিকে উঠে গেছে এবং এই উপরে ওঠার মধ্যে যে মৃদু বাঁক (gentle curve) আছে, তা মঠের সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করেছে। মৌলিক চতুষ্কোণ আকৃতি বজায় থাকা সত্ত্বেও মঠ যতই উপরে উঠেছে, ততই কিছুটা গোলাকার রূপ ধারণ করেছে। শীর্ষদেশ ফ্ল্যাট হলেও তাতে একটি কমনীয় গাম্ভীর্য আছে। মঠের অভ্যন্তর ভাগ ৩.৬ মিটার কি ৪.৩ মিটার পর্যন্ত লম্বা গম্বুজের ফাঁকা তলদেশের আকারে উপরে উঠে গিয়ে শেষ হয়েছে। এর পরেও মঠের অভ্যন্তরে ফাঁকা স্থান আছে বলে কেউ কেউ অনুমান করেন। কিন্তু তা বোধ হয় ঠিক নয়।

এ মঠের বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু হচ্ছে এর বাইরের অলঙ্করণ। উড়িষ্যা অঞ্চলে খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত যে 'রেখা' স্টাইলে মন্দির নির্মাণপদ্ধতি দেখা যায়, তার প্রভাব এই মঠে আছে বলে ধারণা হয়। সুউচ্চ শিখর কিছুটা সরু আকার ধারণ করে

উপরে উঠেছে। সেই সঙ্গে রেখা স্টাইলে মঠের গাত্রদেশে অলঙ্করণ করা হয়েছে। এই মঠের তলদেশ থেকে শীর্ষভাগ পর্যন্ত আনুভূমিক সমান্তরাল রেখা (horizontal line) একের পর এক প্রায় ২৮ সে. মি. দূরে দূরে সারা মঠকে ঘিরে রেখেছে। আবার মঠের প্রত্যেক কোণ থেকে সমান্তরাল ৪টি করে উল্লম্ব রেখা (vertical line) সম দূরত্বে আনুভূমিক সমান্তরাল রেখা গুলিকে অতিক্রম (cross) করে প্যানেলের মত ছোট ছোট আয়তক্ষেত্রের সৃষ্টি করেছে। এই ৪টি উল্লম্ব রেখা প্রবেশপথের ফ্রেমের পাশেই শেষ হয়েছে। মধ্যবর্তী স্থানে অর্থাৎ দরজার ফ্রেমের উপরিভাগ থেকে শীর্ষ দেশ পর্যন্ত শুধু আনুভূমিক সমান্তরাল রেখা আছে।

এই মঠের শিল্প কলার উন্নত মানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ডক্টর সৈয়দ মাহ্‌মুদুল হাসান।[১]

মঠের গায়ে দুই পঙ্‌ক্তির একটি খোদিত লিপি আছে। প্রথম পঙ্‌ক্তির মাত্র একটি শব্দ ছাড়া বাকি শব্দগুলি সব নষ্ট হয়ে গেছে। সেই শব্দসহ লিপির দ্বিতীয় পঙক্তির পাঠ নিম্নরূপ :

"... ... ... শর্মনা।
উদ্দিশ্য তারকং (ব্রহ্ম) [প্রসা] দোহয়ং বিনির্মিত ॥"

এই খণ্ডিত লিপির সঠিক পাঠ উদ্ধার করা সম্ভব নয়। তবে যতদূর মনে হয় তারকের (ব্রহ্ম) প্রসাদ লাভের উদ্দেশ্যে এই মঠ খুব সম্ভব একজন ব্রাহ্মণ (শর্মনা) কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল।

এই মঠ কবে নির্মিত হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে মঠের গঠন প্রণালী দেখে ধারণা হয় এটি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নির্মিত হয়েছিল।

মহেশ্বরপাশা জোড় বাংলা মন্দির

দৌলতপুর থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে এবং রেল লাইন থেকে পশ্চিম দিকে মহেশ্বরপাশা নামক গ্রামে একটি জোড়বাংলা মন্দির আছে। মন্দিরটি খুব বড় নয়।

---

১. "The chief merit of the *Kodla Math* is its fine brick carvings. The front side must have been originally decorated with singularly ornate designs in bricks. But the best specimens are to be seen now in the northern facade, where the central band of the rectangular frame with a false doorway has some delicate floral designs in moulded brick work. Cusped decorative arches, ornamental bands divided into small squares filled with rosettes, perforated brick designs, medillions and neatly patterned tympanum are some of the finest ornamental devices attempted at this building. In its finest brick carving tradition the 16th century *Math* is certainly a precursor of similar brick temples and *Maths* of the 17th and 18th centuries."—Ancient Monuments of East Pakistan, P. 177 by Dr. S. M. Hasan.

পাবনা শহরের জোড়বাঙলা মন্দিরের মতো (পাবনা জোড়বাংলা মন্দির দ্র.) এই মন্দিরের পাকা ছাদ দুটি দোচালা ঘরের চালকে সংযুক্ত করে নির্মাণ করা হয়েছে। মন্দিরের গাত্র নানা রকম অলঙ্করণ দ্বারা সুশোভিত।

মন্দিরে যে উৎকীর্ণ লিপি আছে তা থেকে জানা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে গোপীনাথ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন।

ফকিরহাট মসজিদ

ফকিরহাট থানার নিকট একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ ছিল বলে সতীশচন্দ্র মিত্র যশোহর-খুলনার ইতিহাস গ্রন্থে (১ম খণ্ড, ৩৪৫ পৃ., পাদটীকা) বলেছেন। তিনি বলেন, "ফকিরহাট থানার নিকটে একটি অতি পুরাতন মসজিদের ভগ্নাবশেষ আছে, উহাকে দরবারি মসজিদ বলে। যে ফকিরের নামে ফকিরহাট হইয়াছে, সে ফকির খাঁ জাহানের শিষ্য আউলিয়া এবং মসজিদ রচয়িতা কিনা জানি না। পরপারে মূলঘর গ্রামের 'জেন্দার আলি' নামক খাল তাঁহার অনুচর জেন্দাপীরের নামযুক্ত হইতে পারে। পার্শ্ববর্তী সৈয়দ মহল্যা ও কামটা গ্রামে খাঞ্জালী দীঘি আছে।"

খুলনা জেলা

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ

আগ্রা-কপিলমুনি

খুলনা শহর থেকে প্রায় ৩২ কিলোমিটার পশ্চিমে ও ভরতভায়না থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে কপোতাক্ষ নদীর বাম (পূর্ব) তীরে অবস্থিত আগ্রা-কপিলমুনি খুবই প্রাচীন স্থান। এখানে প্রাচীন কীর্তির অনেক ধ্বংসাবশেষ আছে। আগ্রা ও কপিলমুনি দুটি পাশাপাশি গ্রাম। এই উভয় গ্রামেই প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষরূপে অনেক ঢিবি দেখা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে শুধু এ দুটি গ্রামেই নয়, উত্তরে তালা থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে চাঁদখালী পর্যন্ত প্রায় ২২ কিলোমিটার লম্বা এলাকায় স্থানে স্থানে এ ধরনের ঢিবি ছিল। এ সম্পর্কে বাবু সতীশ চন্দ্র মিত্র বলেন, "বর্তমান যশোহর নগরী হইতে আরম্ভ করিয়া কপোতাক্ষের পূর্বকূল দিয়া দক্ষিণে চাঁদখালী পর্যন্ত গেলে, অনেক স্থানে পুরাবাটীর ভগ্নাবশেষের স্তূপ পাওয়া যায়। ঝাপার কাছে, তালার নিকটবর্তী আগরঝাড়ায় ও কপিলমুনির সান্নিধ্যে আগ্রা নামক গ্রামে অনেকগুলি স্তূপ আছে: আগরঝাড়ার দক্ষিণে শ্রীপদগুহা গ্রাম। ঐ স্থানে হাড়ুদহ ও শ্রীপদদহ পুষ্করিণী বৌদ্ধ সম্বন্ধের সন্দেহ জন্মায়। নিকটবর্তী আটারই ও বারুইহাটি গ্রামে কতকগুলি ইষ্টক গৃহের ভগ্নাবশেষ আছে। কপিলমুনির বাজার হইতে ১মাইল উত্তর-পূর্ব কোণে আগ্রা গ্রাম। এখানে প্রধানত তিনটি ঢিবি আছে, তন্মধ্যে ২টি বড় ও একটি ছোট। ... সমস্ত আগ্রা গ্রামটিই একটা ভগ্নাবশেষ। গ্রামের যেখানে খনন করা যায়, সেখানেই ইষ্টক বাহির হয়। গ্রামের মধ্যে একটি রাস্তা গিয়াছে, উহা পূর্বে সম্পূর্ণ পাকা রাস্তা ছিল, অনেক স্থানে তাহার নিদর্শন আছে। গ্রাম মধ্যে সকল স্থানেই গর্ত খনন করিতে হইলে ইট বাহির হয়। হা'জোর পুকুর নামে একটি অতি প্রাচীন বাঁধা ঘাটওয়ালা পুকুর আছে। ওয়েস্টল্যাণ্ড সাহেব এখানকার একটি স্তূপ খনন করাইয়াছিলেন; উহার গর্তের মধ্যে অবতরণ করিলে প্রাচীর ও জানালার ভগ্নাবশেষ সুস্পষ্ট দেখা গিয়াছিল। আগ্রার উত্তরে কাশিমনগর গ্রামে ২টি স্তূপ আছে। উহার একটি এখনও যোগি পাড়ার মধ্যস্থানে।"[১] উপরে উল্লিখিত একটি ঢিবিতে খননের ফলে একটি প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছিল বলে জেলার প্রথম গেজেটিয়ারে উল্লিখিত আছে।

কপিলমুনি গ্রামে একটি প্রাচীন কালীমন্দির ছিল বলে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সে মন্দিরের কোনো অস্তিত্ব এখন নেই। কপোতাক্ষ নদীর তীরে "একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল বেষ্টন করিয়া একটি বিস্তৃত ইষ্টকস্তূপ মুনির আশ্রম নির্দেশ করে। কপিলের কালীমূর্তি ও

১. শ্রী সতীশ চন্দ্র মিত্র যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২০৯ পৃ.।

মন্দির সম্ভবত বৌদ্ধ আমলেও ছিল, বৌদ্ধ যুগের কোন কোন নিদর্শন এখনও কপিলমুনিতে আছে।"[১] বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে এ গ্রামে একটি পুকুর খনন করতে গিয়ে "১৭/১৮ হাত মাটির নিম্নে ৪টি প্রস্তরমূর্তি পাওয়া যায়।" "তন্মধ্যে দুইটি এক্ষণে নিকটবর্তী প্রতাপকাটি গ্রামে রসিকলাল হালদার মহাশয়ের বাড়িতে পূজিত হইতেছেন। এই দুইটি বৌদ্ধ মূর্তি, কিন্তু এক্ষণে বিষ্ণু ও ব্রহ্মা বলিয়া পূজিত হন।"[২]

জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে এ স্থানের নামকরণ কপিল নামক একজন মুনির সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে সতীশ বাবু বলেছেন। তাঁর মতে তিনি ছিলেন মহাভারতে উল্লিখিত পৌণ্ড্র বাসুদেবের কনিষ্ঠ (বৈমাত্রেয়) ভ্রাতা এবং তাঁর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে কপিলমুনি এখানে এসে আশ্রম নির্মাণ করেন। পৌণ্ড্র বাসুদেব আদৌ ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা, তাতে প্রচুর সন্দেহ আছে। সেক্ষেত্রে এই কপিলমুনির ঐতিহাসিকতাও প্রমাণ সাপেক্ষ।

অতি প্রাচীনকালে এই অঞ্চলে যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রস্থল গড়ে উঠেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কালক্রমে প্রাকৃতিক ও অন্যান্য কারণে খুব সম্ভব এ স্থান পরিত্যক্ত হয়। অনেক পরবর্তী কালে বুদ্ধদেবের জন্মস্থান কপিলাবস্তু নাম থেকে খুব সম্ভব কপিলমুনির ট্র্যাডিশন গড়ে উঠেছিল। আবার এমনও হতে পারে যে, কপিল নামক কোনো সাধুসন্ন্যাসীর আস্তানা হয়ত এখানে ছিল। কিন্তু তিনি পৌণ্ড্র বাসুদেবের ভ্রাতা ছিলেন, তা কল্পনাপ্রসূত বলেই মনে হয়। খুব সম্ভব ভরতভায়না, আগ্রা কপিল মুনি, আমাদি প্রভৃতি স্থান এক কালে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল।

মুসলিম আমল

মসজিদকুড় মসজিদ

গ্রামের নাম আমাদি। কপোতাক্ষ নদী এ গ্রাম ও মসজিদের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত। খুলনা শহর থেকে প্রায় ৪৮ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম সাতক্ষীরা জেলা শহর থেকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব এবং আগ্রা-কপিল-মুনি থেকে প্রায় ২৪ কিলোমিটার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত এ স্থান। খান-ই-জাহানের সময়ে মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। কালক্রমে এ স্থান পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে এবং মসজিদটি আংশিকভাবে মাটি চাপা পড়ে। পরবর্তীকালে এ স্থানে যখন নতুন করে আবাদ শুরু হয়, তখন জঙ্গল কেটে, মাটি খুঁড়ে মসজিদটিকে নতুন করে আবিস্কার করা হয়। এ স্থানের নূতন নামকরণ হয় মসজিদকুড় বলে। মসজিদের নাম হয় মসজিদকুড় মসজিদ।

অঞ্চলের এক অবিস্মরণীয় কীর্তি এই মসজিদ। বর্গাকারে নির্মিত এই । প্রত্যেক বাহু বাইরের দিকে ১৬.৬৬ মিটার ও ভিতরের দিকে ১২.১২ মিটার। দেয়ালগুলি ইটের তৈরি এবং প্রায় ২.১১ মিটার চওড়া। মসজিদের দক্ষিণ, পূর্ব ও উত্তর দিকে আছে ৩টি করে প্রবেশপথ। প্রত্যেক দেয়ালের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ পাশের দুটি থেকে বড়। প্রবেশপথগুলি পত্রাকারের খিলানের সাহায্যে নির্মিত। বিরাট আকারের

১. প্রাগুক্ত, ১৬২ পৃ.।
২. প্রাগুক্ত, ৮৬ পৃ.।

তুলনায় প্রবেশ পথগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি অলঙ্কৃত মিহরাব।



মসজিদকুর মসজিদ, খুলনা

মসজিদের চারকোণে ৪টি গোলাকার মিনার বা টারেট আছে। বিরাট আকারের মিনারগুলি ছাদের কার্নিশের উপরে উঠেনি। এগুলিকে ৪টি গোলাকার ও উদগত ব্যাণ্ড (band) বা স্ফীত রেখা দ্বারাা অলঙ্কৃত করা হয়েছে। মসজিদের বাইরের দেয়াল দক্ষিণ, পূর্ব ও উত্তর দিকে পোড়ামাটির চিত্রফলক দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। খিলান ও কার্নিসের উপরেও অনুরূপ অলঙ্করণের কাজ ছিল। এ গুলির মধ্যে ছিল পদ্মফুল, মালা, বিলম্বিত রজ্জু ও ঘন্টা (hanging chain and bell motif) ইত্যাদির প্রতিকৃতি।

মসজিদের অভ্যন্তরে আছে ৪টি প্রস্তরস্তম্ভ। ইটের তৈরি ভিত্তিবেদীর উপরে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক স্তম্ভ ২টি করে পাথরের সাহায্যে নির্মিত। প্রাথর দুটি ভিন্ন মাপ ও ভিন্ন জাতের। উচ্চতার সমতা রক্ষার জন্য নিচে ইটের তৈরি ভিত্তিবেদী কমবেশি উঁচু করে নির্মিত। এই ৪টি প্রস্তর স্তম্ভ ও চারিদিকের দেয়ালের উপর খিলানের সাহায্যে নির্মিত হয়েছে মসজিদের ৯টি গম্বুজ। ভিতরের খিলান ও গম্বুজগুলির নির্মাণ-কৌশল খুবই উঁচু মানের। কেন্দ্রীয় গম্বুজটি অন্যগুলির চেয়ে আকারে কিছুটা বড়।

মসজিদের প্রায় লাগোয়া পশ্চিম দিকে আছে কপোতাক্ষ নদী। দক্ষিণ দিকে বর্তমানে যে খাল দেখা যায়, সেটি একটি পরিখা ছিল বলে অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র মিত্র বলেছেন (যশোহর-খুলনার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ৩২৫ পৃ.)। অন্য দুই দিকেও পরিখা ছিল। একটি মসজিদের চারদিকে এমন শক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কেন ছিল, তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। খুব সম্ভব ধনরত্ন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অন্য কোনো ইমারতের অস্তিত্ব এখানে ছিল। এতকাল পরে সেই ইমারতটি বোধ হয় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

এই মসজিদে কোনো শিলালিপি পাওয়া যায়নি, ছিল বলেও জানা যায় না। বাগেরহাটের সুবিখ্যাত ষাটগম্বুজ ও নয়গম্বুজে মসজিদের সঙ্গে আলোচ্য মসজিদের গঠণপ্রণালী ও স্থাপত্যকৌশলের যথেষ্ট একাত্মতা আছে। এ কারণে পণ্ডিতেরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, এই মসজিদ অপর দুটি মসজিদের সমসাময়িক এবং খান-ই-জাহান কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। স্যার ওয়েস্টল্যান্ড (Sir J. Westland) একথা জোর দিয়েই বলে গেছেন।[১]

স্থানীয় জনপ্রবাদের উপর ভিত্তি করে বুড়াখাঁ ও তাঁর পুত্র ফতেখাঁকে মসজিদের নির্মাতা বলে ধরা হয়। তাঁরা উভয়েই ছিলেন খান-ই-জাহানের সহচর। খান-ই-জাহান সম্পর্কে যে প্রবল জনশ্রুতি চলে আসছে, তাতে জানা যায় যে, বারবাজার (ঝিনাইদহ জেলার বারবাজার দ্র.) থেকে সদলবলে মুড়লী (যশোর) পর্যন্ত এসে তিনি নিজে একদল সঙ্গী নিয়ে বাগেরহাটের দিকে যান এবং তাঁর বিশ্বস্ত সহচর বুড়াখাঁর নেতৃত্বে আর একটি দলকে মসজিদকুড়, বেদকাশী প্রভৃতি অঞ্চলের দিকে প্রেরণ করেন। যাবার পথে তারাও খান-ই-জাহানের নির্দেশ ও দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পথিমধ্যে স্থানে স্থানে জলাশয় খনন এবং রাস্তা ও মসজিদ নির্মাণ করেন।

বুড়া খাঁ ও ফতেহ খাঁ দক্ষিণে বেদকাশী পর্যন্ত গিয়েছিলেন বলে জানা যায়। তবে তাঁদের স্থায়ী বসতি আমাদি গ্রামে ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে তাঁদের দুজনেরই পাকা কবর ছিল বলে সতীশ চন্দ্র মিত্র 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থে (৩২৫ পৃ.) উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "আমাদি গ্রামে পশ্চিম দিকে নদীর কূলে বুড়া খাঁ ও ফতে খাঁ উভয়ের কবর ছিল। অল্পদিন হইল বুড়া খাঁর কবর ভাঙ্গিয়া নদীতে পড়িয়া গিয়াছে, এখনও একটি গোলকচাঁপা ফুলের গাছতলায় ফতে খাঁর সমাধির ভগ্নাবশেষ আছে। এখনও বহু হিন্দু মুসলমানে এই সমাধিস্থানে মানসা করে এবং তাহার চিহ্ন স্বরূপ ফুলের গাছটির গাত্রে ইষ্টকখণ্ডসমূহ ঝুলাইয়া রাখিয়া যায়।

"বুড়া খাঁ যে শুধু ধর্মপ্রচারের জন্য এখানে ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার প্রধান কাজ ছিল রাজ্যশাসন ও জমিপত্তন। তাঁহার সমাধিস্থানের অনতিদূরে তাঁহার গড় বেষ্টিত কাছারি বাড়ি ছিল; এখন গড়ের এবং বাড়ির ভগ্নাংশের নানা চিহ্ন আছে। দুই দিকে নদী ও অপর দুই দিকে খনিত খালে পরিখার কার্য করিয়াছিল।"

বুড়া খাঁর বসতবাটী বলে কথিত স্থানে 'কালিকা দিঘি' নামে একটি অতি বিরাট জলাশয় আছে। এর আয়তন প্রায় ৩৫ একর। একমতে এই জলাশয় ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী নামক এক রাজার এবং অন্যমতে বুড়া খাঁ-ফতে খাঁর কীর্তি বলে ধরা হয়। শেষোক্ত

---

১. "The building thus found proclaims at the first glance that it owes its origin to the same hand which built the *Sath Gambuz*. The principle of the structure is the same, only instead of a breadth of eleven domes and a depth of seven, we have here a breadth and depth of three domes only, or nine in all. There are the same massive walls, for they are about six feet thick ..."

—A report on the District of Jessore (Calcutta 1871), pp. 20-21
by Sir James Westland.

মতটিই সত্য বলে মনে হয়। চৌধুরী উপাধিধারী রাজা ইন্দ্রনারায়ণকে মোঘল আমলের আগের লোক বলে ধরা যায় না। অথচ দিঘিটি যে মোঘল আমলের বহু পূর্বে সুলতানী আমলে খনিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। খুব সম্ভব এই প্রাচীন জলাশয়টিকে পরবর্তী কালে তিনি নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছিলেন। বুড়া খাঁ দক্ষিণাঞ্চলে খান-ই-জাহানের প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যশাসন ও ধর্মপ্রচার করতেন বলে জানা যায়।

পয়োগ্রাম-কসবা মসজিদের ধ্বংসাবশেষ

খান-ই-জাহান পয়োগ্রাম-কসবাতে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এ স্থান যশোহর শহর থেকে প্রায় ৩২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। তিনি এখানে অনেক জলাশয় খনন করেছিলেন এবং অনেক মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, সেই সঙ্গে অনেক পাকা সড়কও। পাকা সড়কের চিহ্ন এখনও কিছু কিছু দেখা যায়। মসজিদগুলির মধ্যে একটিও টিকে নেই। তবে একটি বিরাট মসজিদের ধ্বংসাবশেষ ঢিবিরূপে এখনও বিদ্যমান।

এই ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কে সতীশ চন্দ্র মিত্র (যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৩৩০ পৃ.) বলেন,

"উক্ত বড় রাস্তা নদীর নিকটবর্তী হইয়া যেখানে ঘুরিয়া পূর্বমুখে পয়োগ্রামের দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেখানেই উহার বামভাগে নদীর খুব সন্নিকটে একটি প্রকাণ্ড উচ্চ ঢিপি কোন পূর্ব্ব কীর্তির সাক্ষীর মত দাঁড়াইয়া আছে। ঢিপিটি ৩০ ফুট, উহা পার্শ্ববতী জমি হইতে ৮ ফুট উচ্চ। এখানে বাগেরহাটের ষাটগম্বুজের মত কোন বৃহৎ নামাজের স্থান বা দরবার গৃহ ছিল। শুনিয়াছি নিকটবর্তী মধ্যপুর গ্রামে শ্রীধরপুরের ঈশ্বরচন্দ্র বসু মহাশয় নীলের কুঠি করিবার জন্য এই বিরাট ভগ্নগৃহ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিলুপ্ত করিয়াছিলেন। এই ঢিবির উপর ৩২´ × ১৭´ স্থানে ১ ফুট উচ্চ করিয়া একটি পাকা বেদী করিয়া উহার পশ্চিম দিকে একটি আধুনিক ইদগা স্থানীয় লোকে নির্মাণ করিয়া লইয়াছে। নিকটবর্তী বহু সংখ্যক লোকেরা প্রধান প্রধান জুম্মা নামাজের উৎসবে এই স্থানে উপাসনা করিয়া থাকেন। এই ইদগার নিকটে একখানি অতি সুন্দর কষ্টিপাথর (slate) আছে, উহার পরিমাণ ৩´ × ১´ × ৮´´। ঢিবির নিম্নে আর একখানি রাজমহল বা চট্টগ্রামের পাথর আছে। এই পাথর ঠিক গম্বুজের পাথরের মত। এ পাথর খানি ১´-৮´´ × ১´-৮´´ × ৯´´ ইঞ্চি। ...

পয়োগ্রাম কসবা এক সময়ে সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। ... ।"

দক্ষিণ ডিহি পয়োগ্রাম-কসবারই একাংশ। সেখানে খান-ই-জাহানের সময়ে নির্মিত একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ কিছুকাল আগে পর্যন্ত টিকে ছিল। সে সময়ে সেখানে একটি কালীবাড়িও নির্মিত হয়েছিল।

সেনহাটির মন্দির

খুলনা শহরের ৮কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত সেনহাটি একটি অতি প্রাচীন গ্রাম। এ গ্রামে অনেক প্রাচীন জলাশয় আছে। এ গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দিরের অস্তিত্ব জীর্ণ

অবস্থায় টিকে আছে। এটি একটি দোচালা কালীমন্দির। ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে রাজা শ্রীকান্ত রায় এ মন্দিরটি নির্মাণ করেন ছিলেন।

বেদকাশী

মসজিদকুড় থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দক্ষিণে কপোতাক্ষ ও শাকবাড়িয়া নদীদ্বয়ের বাঁকদ্বারা সৃষ্ট ২১১ নম্বর লাট নামে পরিচিত যে দ্বীপাকারের বৃহৎ অঞ্চলটি আছে, তার প্রায় কেন্দ্রস্থলে শাকবাড়িয়া নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত বেদকাশী একটি প্রাচীন স্থান। এই স্থান সম্পর্কে সতীশ বাবু 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' নামক গ্রন্থে (প্রথম খণ্ড, ৭৮-৯০ পৃ.) বলেন,

"এখানে একটি সুবিস্তৃত দীঘি আছে। দীঘিটি পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ; দৈর্ঘ্যে ৭০০ হাত ও প্রস্থে ৪০০ হাতের অধিক হইবে। দীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি ইটেগাঁথা মঞ্চে কালীর স্থান আছে এবং তাহার পার্শ্বে খালাস খাঁ পীরের আস্তানা। এজন্য জলাশয়টির নাম হইয়াছে, 'কালী-খালাস খাঁ' দীঘি। সম্ভবত পাঠান আমলে খালাস খাঁ নামে জনৈক সাধু বা পীর এখানে আসিয়া ধর্মপ্রচার করেন এবং দীঘি তিনি খনন করেন। মোঘল আমলে বা প্রতাপাদিত্যের সময়ে এখানে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। দীঘিটির জল খুব ভাল, ইহার উপরে এমন দামদল জন্মিয়াছে যে শীতকালে মানুষ স্বচ্ছন্দে উহার উপর দিয়া চলিয়া বেড়াইতে পারে। দীঘির উত্তর-পূর্ব কোণে কিছুদূরে একটি প্রকাণ্ড বাটীর ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। এখনও উহার বেষ্টন প্রাচীরের কতকাংশ এবং ৭০/৮০ বিঘা জমি বেষ্টন করিয়া এক গড়খাই বর্তমান আছে। ইহা খালাস খাঁর দুর্গ কিংবা প্রতাপাদিত্যের দুর্গ তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। ... এই বেদকাশীতেও শিবমন্দির হইয়াছিল, তাহাতে শিলালিপি ছিল। সে মন্দির এক্ষণে নাই, আছে কেবল তাহার ৬/৭টি সুন্দর প্রস্তর স্তম্ভ। উহা দেখিবার জিনিস, খুলনা জেলার একটি পরম গৌরবের সামগ্রী; কিন্তু স্তম্ভসমূহ কোন্ যুগে কোথা হইতে কে আনিয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই।"

বেদকাশীতে লোনা দিঘি, রত্নদিঘি ও দুই সতীনের দিঘি নামে আরও ৩টি জলাশয় আছে। জলাশয়, মন্দিরের ধবংসাবশেষ, আবাসবাটী ও দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি দেখে ধারণা হয় যে এককালে এখানে একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল।

শেখেরটেক ও শিবসামন্দির

শিবসানদী থেকে যেখানে শেখেরখাল ও কালীরখাল নির্গত হয়েছে, সেখানে ২৩৩ নম্বর লাটের অন্তর্গত শেখের টেক নামক স্থানে প্রাচীন ইমারতাদির বহু ধ্বংসাবশেষ নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে কিন্তু সেখানে নদীর ভিতরেও প্রাচীন ইটের ভগ্নাংশ প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। এখানে দ্বিতল ইমারতের অস্তিত্বও ছিল। সুন্দরবনের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এ স্থানকে শেখের বাড়ি বলা হয়ে থাকে। এ স্থান সম্পর্কে সতীশ চন্দ্র মিত্র যে বর্ণনা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ :[১]

১. যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৮০-৮১ পৃ.। শ্রী সতিশ চন্দ্র মিত্র।

"সেখেরখালের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডান দিকে চতুর্থ পাশাখালির পার্শ্বে একস্থলে ইস্টক-গৃহের ভগ্নাবশেষ ও কয়েকটি গাবগাছ দেখা যায়। তথা হইতে উঠিয়া বনের মধ্যে প্রায় এক মাইল গেলে, একটি দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণত বাওয়ালীরা ইহাকে 'বড়বাড়ি' বলে। সম্ভবত ইহাই মহারাজ প্রতাপাদিত্যের শিবসা দুর্গ। দুর্গের অনেক স্থানে উচ্চ প্রাচীর এখনও বর্তমান। ... এই দুর্গের উত্তর-পূর্ব বা ঈশান কোণে একটি শিব মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। সেখান হইতে দক্ষিণ-পূর্ব মুখে অগ্রসর হইলে যেখানে-সেখানে পুকুর ও পরে ২/৩ টি ইষ্টকবাড়ি ও অসংখ্য বসতিভিটা পাওয়া যায়। বাড়িগুলির মাটির ঢিবি শত শত গাব গাছে ঢাকা রহিয়াছে। তথা হইতে বাহির হইলে, একটু অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গায় একটি সুন্দর মন্দির দৃষ্টিপথবর্তী হয়। সুন্দরবনের ভীষণ অরণ্যানীর মধ্যে বিবিধ কারুকার্যখচিত এবং অভগ্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান এমন মন্দির আর দেখি নাই।

"ইহার খিলানগুলি গোল নহে, পরন্ত মুসলমান-স্থাপত্যানুগত খিলানের মত ত্রিকোণ। ... মন্দিরের অন্যান্য প্রকৃতি দেখিলে ইহা যে মোগল আমলে কোনো হিন্দু কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা সহজ হয়।

"... যদিও মন্দিরে গুম্বজছাদ আছে, কিন্তু চূড়া নাই, কারণ শীর্ষদেশ জঙ্গল সমাকীর্ণ হইয়াছে, তবু ইহা মসজিদ নহে, ইহা স্থির। মন্দিরের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে দরজা আছে, পূর্ব ও উত্তরে কোন দরজা নাই। ... মন্দিরে কোন দেববিগ্রহ নাই, তবুও অনুমান করা যায় যে, প্রতাপাদিত্য তাঁহার দুর্গের সন্নিকটে এই কালিকা দেবীর মন্দির নির্মাণ করেন। ...

"এই মন্দিরটি সুন্দরবনের একটি প্রধান স্থাপত্য-নিদর্শন। ইহার ভিতরের মাপ ১০′-৬″ × ১০′-৬ বাহিরে ২১″-৩″ × ২১-৩″; ভিত্তি ৫′-৩″। ভিতরের উচ্চতা ২৫′-৬″। মন্দিরে পশ্চিমে ও দক্ষিণে দরজা আছে। পশ্চিম দ্বার ৫′-৪″ × ২″-৬″, উপরে খিলানের উচ্চতা ১′-৮″; দক্ষিণ দ্বার ৫′-৬″ × ২′-৬″, খিলানের উচ্চতা ১′-৯″; উত্তরের দিকে ভিতরে ৪ ফুট উচ্চ স্থানে একটি কুলুঙ্গ বা সংবদ্ধ জানালা আছে, উহার মাপ ৩′ × ২′ এবং খিলানের উচ্চতা ১′-৬″। পূর্বদিকে এরূপ কোন কুলুঙ্গ বা জানালার খাত নাই। মন্দিরের বাহিরের ইষ্টকে, দেয়ালের কার্ণিসে নানা কারুকার্য আছে। উত্তর দিকে দেওয়ালে ইষ্টকদ্বারা এক প্রকার জাল বা ঝাপ্‌রী প্রস্তুত করা আছে।"

সাতক্ষীরা জেলা

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ

সাঁইহাটি

সাতক্ষীরা জেলা শহর থেকে নদীপথে প্রায় ৩২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বদিকে আশাশুনি থানা অবস্থিত। থানার পশ্চিম দিকে গুতিয়াখালী নদী। এই নদীর পশ্চিম তীরে সাঁইহাটি নামক একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। সেই জঙ্গলাকীর্ণ গ্রামের ভিতর অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ ছিল। এ স্থান সম্পর্কে সতীশবাবু বলেন "এ স্থান পূর্বে ভীষণ জঙ্গলাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সম্প্রতি আবাদ হইয়াছে। জঙ্গলের পূর্ব হইতে এখানে অনেকগুলি মন্দির ছিল; তন্মধ্যে তিনটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। ইহার মধ্যে পূর্ব-প্রান্তে যেটি-তাহাই দণ্ডায়মান আছে। উহা নানা কারুকার্যে খচিত সুন্দর মন্দির। সাঁইহাটি গ্রামের মধ্যে এক অংশের নাম উজিরপুর। সেখানে এখনও একটি প্রকাণ্ড ইষ্টকস্তূপ উজিরের বাড়ি বলিয়া খ্যাত।"[১]

মুসলিম আমল

গোপালপুরের মসজিদ ও মেহেরপুরের মাযার

এই দুটি কীর্তি সম্পর্কে অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র মিত্র 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থে (প্রথম খণ্ড, ৩২৬ পৃ.) বলেন, "ত্রিমোহিনীর সন্নিকটে ... গোপালপুরে নদীর ধারে একটি সুন্দর খাঞ্জালী মসজিদ এখনও বর্তমান রহিয়াছে। এখানে নদীর পাড়ের উপর মাটি ফেলিয়া উচ্চ করিয়া তাহার উপর মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। গোপালপুর হইতে দক্ষিণ দিকে কপোতক্ষের কূল দিয়া অগ্রসর হইলে, মেহেরপুরে পীর মেদ্দিন বা মেহের উদ্দিনের সমাধি মন্দির দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এই মসজিদটি খুব ছোট, বাহিরে ১৬´ – ৩´´ × ১৬´ – ৩´´ চারকোণে চারটি গাত্রলগ্ন মিনার, একটি মাত্র দরজা (৫ × ২-২´´), উহার পার্শ্বে উপরিভাগে কারুকার্য্য করা ইষ্টক আছে। মসজিদের সম্মুখে একটি বেদী, পরে চারপাশে প্রাচীর বেষ্টিত। ... বাহিরে পীর সাহেবের সর্প ও হাতীর গোরস্থান আছে; উহাও ইষ্টকের বেদী দ্বারা চিহ্নিত। উত্তর দিকে পাকা ইন্দারা ও কুয়া আছে।"

সতীশ বাবু ভুল করে এটিকে মসজিদ বলেছেন। আদতে এটি একটি মাযার।

ডামরেলীর নবরত্ন মন্দির

মুকুন্দপুরের সামান্য দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ডামরেলী পরগনার মোস্তফাপুর গ্রামে ইচ্ছামতী-কালিন্দী নদীর পূর্বতীরে রাজা বিক্রমাদিত্য একটি উল্লেখযোগ্য মন্দির নির্মাণ করেন। এটি ডামরেলীর নবরত্ন মন্দির নামে খ্যাত।

---

১. শ্রী সতীশ চন্দ্র মিত্র, যশোহর খুলনার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ৮৬-৮৭ পৃ.।

বর্গাকারে নির্মিত পশ্চিমমুখী এই মন্দিরের দৈর্ঘ্য বাইরের দিকে প্রতিবাহু ১০.৯ মিটার। মন্দিরে একটি গর্ভগৃহ ছিল এবং বর্গাকারে নির্মিত এই গর্ভগৃহের আয়তন বাইরের দিকে ৪.১০ মিটার × ৪.১০ মিটার। এই কক্ষের বাইরে চারকোণে ৪টি কক্ষ ছিল। মন্দিরের বাইরের দেয়ালে পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে অর্ধবৃত্তাকারের খিলানের সাহায্যে নির্মিত প্রবেশপথ (arches) ছিল। উত্তর দেয়ালে কোনো প্রবেশপথ ছিল না। গর্ভগৃহের পশ্চিম ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশপথ ছিল, কিন্তু পূর্ব ও উত্তর দেয়ালে কোনো প্রবেশপথ ছিল না। গর্ভগৃহের দক্ষিণ দেয়ালে নানা ফুল ও একটি বড় গরুড় মূর্তির উপর রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি অঙ্কিত ছিল। পশ্চিম দেয়াল ধনুকধারী বীর, হস্তীপৃষ্ঠে যুদ্ধে যাত্রা, অশ্বারোহী সৈন্য, দশ অবতার প্রভৃতির প্রতিকৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল।

গর্ভগৃহের উপরে একটি বড় গম্বুজ এবং অলিন্দের চারকোণেও ৪টি চূড়া বা রত্ন ছিল। এতে দেখা যাচ্ছে যে, মন্দিরের চূড়া বা রত্নের সংখ্যা ছিল নয়টি। একারণে এটিকে নবরত্ন মন্দির বলা হত। বর্তমানে মন্দিরের কোনো রত্ন টিকে নেই। শুধু কেন্দ্রীয় গম্বুজের ধ্বংসাবশেষ অতি জীর্ণ অবস্থায় কোন রকমে টিকে আছে।

গর্ভগৃহের পশ্চিম দেয়ালে দরজার উপরে একটি ইষ্টকলিপি ছিল। লিপির পাঠ নিম্নরূপ :

> "শাকে বেদ সমাযুক্তে বিন্দু বাণেন্দু সংমিতে।
> মঠো হয়ং স্বর্গ সোপানং শ্রীকৃষ্ণেন কৃতঃ স্বয়ং ॥১৫০৪"

অনুবাদ : ইন্দু (১) বাণ (৫), বিন্দু (০) ও বেদ (৪) অঙ্কস্য বামা গতিতে ১৫০৪ শকাব্দ হয়। লিপির নিম্নভাগে এটি সংখ্যায়ও দেওয়া আছে। লিপির পাঠ দাঁড়ায় : এই স্বর্গসোপান তুল্য মঠ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ১৫০৪ শকাব্দে (১৫৮২ খ্রিঃ) নির্মাণ করেন।[১] শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্থে সতীশ চন্দ্র মিত্র বলেন যে মহারাজ বিক্রমাদিত্য কৃষ্ণভাবে এমন বিভোর হয়ে এ মন্দির নির্মাণ করেন যে, তিনি এ মন্দির শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নির্মাণ করেন বলে মনে করেন। কিছুটা কষ্টকল্পিত হলেও সতীশবাবুর মন্তব্য গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হয়। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানীতে এ মন্দির তিনি বা তাঁর ভ্রাতা রাজা বসন্ত রায় নির্মাণ করেছিলেন, এধারণা যুক্তিসহ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এসে যে এ মন্দির নির্মাণ করেননি, এ সম্পর্কে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

সতীশবাবুর মতে এ মন্দিরে কোনো বিগ্রহ ছিল না এবং এটি ছিল প্রাচীন কালের রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাগৃহের মতো একটি নবরত্ন সভাগৃহ বা সমাজমন্দির। এই অভিমত গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। ১০.৪ মিটার × ১০.৪ মিটার আয়তনের এ মন্দিরের গর্ভগৃহটির বাইরের দিকের আয়তন ছিল ৪.৩ মিটার × ৪.৩ মিটার এবং অভ্যন্তরীণ আয়তন ছিল আনুমানিক ১.৮২ মিটার × ১.৮২ মিটার। এই অতি ক্ষুদ্র কক্ষ সভাগৃহ রূপে ব্যবহৃত হতে পারেনা। এর উত্তর এবং পূর্ব দিকও বন্ধ ছিল। এতে ধারণা হয় যে, এটি মন্দির জাতীয় কোনো ইমারতই ছিল, সভাগৃহ জাতীয় কোনো ইমারত নয়। ইষ্টকলিপিতে এটিকে উঁচু মঠ বলা হয়েছে, কোনো সভাগৃহ বলা হয়নি। কোন্

১. যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড ৯৪ পৃ.।—সতীশ চন্দ্র মিত্র।

বিশেষ বিগ্রহের মন্দির এটি ছিল, সে সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা না গেলেও এই মঠ যে কোন সভা বা দরবার গৃহ ছিল না, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

ঈশ্বরীপুর-ধূমঘাট ও পার্শ্ববর্তী এলাকার কীর্তি

সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার অধীনে এবং উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দক্ষিণে যমুনা ও ইছামতির মিলিত স্রোত যেখানে কদমতলী নাম ধারণ করে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত, ঈশ্বরীপুর-ধূমঘাট অঞ্চল তার পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল। নদী এখন অনেক দূরে সরে গেছে। এ স্থান সম্পর্কে বাবু সতীশ চন্দ্র মিত্র বলেন, "যমুনা ও ইচ্ছামতীর মধ্যস্থলে ১৬৫ নং লাটে ধূমঘাট। ইহাতে ১০/১৫ মাইল ব্যাপিয়া সর্বত্র নানাবিধ কীর্তিকলাপের চিহ্ন আছে। ইহার উত্তর প্রান্তে যশোহর নগর, দুর্গ ও যঁশোরেশ্বীর মন্দির এবং দক্ষিণ প্রান্তে ধূমঘাট দুর্গ ছিল। মধ্যবর্তী সমস্ত ভূভাগে এক বিপুল নগরীর ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই রাজধানীর উপনগর পূর্ব দিকে বর্তমান তেরকাঠির জঙ্গল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।"[১]

বাঙলার শেষ স্বাধীন পাঠান সুলতান দাউদ কররানীর একজন পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন শ্রীহরি নামক একজন কায়স্থ। দাউদ যখন মোঘল আক্রমণে বিপর্যস্ত, সে সময়ে (১৫৭৫ খ্রিঃ) শ্রীহরি ও তাঁর ভ্রাতা বসন্তরায় তাঁদের নিজস্ব ও সুলতানের ধনরত্নসহ পালিয়ে এসে সুন্দরবনের এই দুর্গম গভীর জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীহরি বিক্রমাদিত্য নাম ধারণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র প্রতাপাদিত্য সিংহাসনে আরোহন করেন। অসংখ্য নদীনালা ও খাল-বিল পরিবেষ্টিত এবং সভ্য জগত থেকে বহু দূরে অবস্থিত এই জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে বিক্রমাদিত্য ও প্রতাপাদিত্য কিছু কাল নির্বিঘ্নেই রাজত্ব করেন। সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চলে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উত্তর দিকে বর্তমান যশোহর অঞ্চলেও তাঁদের রাজ্যসীমা বর্ধিত হয়। কিন্তু কিছুকাল পরেই মোঘল সম্রাট আকবরের সেনাবাহিনীর সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের সংঘর্ষ বাধে। প্রতাপ নানা কৌশলে এসব সংঘর্ষ এড়িয়ে রাজত্ব করতে থাকেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের প্রথম দিকেই বিরোধ চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। ইসলাম খান তখন বাঙলার সুবাদার। তিনি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা এনায়েত খানের নেতৃত্বে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দের দিকে প্রতাপের বিরুদ্ধে এক বিপুল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। প্রতাপের জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়াদিত্য ঈশ্বরীপুরের উত্তর-পূর্বদিকে সালকা নামক স্থানে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করে মোঘল বাহিনীকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। ঈশ্বরীপুরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ধূমঘাটের দুর্ভেদ্য দুর্গে প্রতাপ নিজে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কয়েকজন পাঠান সেনাপতিও তাঁর অধীনে কার্যরত ছিলেন।

যুদ্ধে পরাজিত হয়ে উদয় পালিয়ে যান। মোঘল বাহিনী ধূমঘাট আক্রমণ করলে প্রতাপ আত্মসমর্পণ করেন। তাঁকে বন্দী করে ঢাকায় রাখা হয়। তাঁর শেষ জীবন সম্বন্ধে

১. শ্রী সতীশ চন্দ্র মিত্রঃ যশোহর খুলনার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ৭৫ পৃ.।

কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে জনশ্রুতিমূলে জানা যায় যে, তাঁকে দিল্লী নিয়ে যাবার পথে তিনি বারাণসীতে প্রাণত্যাগ করেন।

বিক্রমাদিত্য, বসন্তরায় ও প্রতাপাদিত্য সুন্দরবন অঞ্চলে বহু মন্দির, দুর্গ ও প্রাসাদ নির্মাণ এবং অসংখ্য জলাশয় খনন করেন। সে সব কীর্তির কিছু ধ্বংসাবশেষ এ অঞ্চলে আজও দেখা যায়। বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় প্রথমে মুকুন্দপুরে একটি দুর্গ নির্মাণ ও রাজধানী স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে মুকুন্দপুর থেকে প্রায় ১৪/১৫ কিলোমিটার দক্ষিণে ঈশ্বরীপুর-ধূমঘাটে প্রতাপের রাজধানী নির্মিত হয়।

যশোরেশ্বরী মন্দির ঈশ্বরীপুর*

মুকুন্দপুর থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দক্ষিণে ঈশ্বরীপুরে এ মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের উত্তর দিকে আছে পদ্মপুকুর নামক একটি জলাশয়। এই মন্দির ছিল একটি চকমিলান ইমারত। উত্তর দিকে মন্দিরের সদর দরজা। সদর দরজার দু'পাশে ছিল সারি সারি ঘর। পূর্ব ভিটিতে যশোরেশ্বরীর মন্দির। পশ্চিম ভিটিতে মন্দিরের সামনে আছে আর একটি তোরণ। তোরণের দু'পাশে ছিল কয়েকটি দ্বিতল আবাস কক্ষ। দক্ষিণ ভিটিতে ছিল সারি সারি পাকা ঘর। মন্দির বাড়ির পশ্চিম দিকে ছিল সদর পুকুর এবং পূর্ব দিকে ছিল খড়গ পুকুর। মন্দির বাড়ির উত্তর-পূর্ব অর্থাৎ ইশান কোণে চণ্ডভৈরবের ত্রিকোণ মন্দির। মন্দিরগুলি বর্তমানে অতি জীর্ণ অবস্থায় আছে।



যশোরেশ্বরী মন্দির, ঈশ্বরীপুর, খুলনা

* ধূমঘাট-ঈশ্বরীপুর অঞ্চলের কীর্তিগুলি গ্রন্থকারের পক্ষে দেখা সম্ভব হয়নি। এগুলির বর্ণনা 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' ও এ, এফ, এম. আবদুল জলীল প্রণীত 'সুন্দরবনের ইতিহাস' নামক গ্রন্থদ্বয় ও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতরের তদানীন্তন সুপারিনটেনডেন্ট জনাব আবদুল কাদিরও গ্রন্থকারকে এ ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছেন।

একখণ্ড কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত যশোরেশ্বরী মূর্তির মুখমণ্ডল ব্যতীত অন্য কোনো অবয়ব নেই। গণ্ডদেশের নিম্নবর্তী অংশ নিরেট পাথর। মূর্তিটির একমাত্র মুখমণ্ডলই অনাবৃত এবং এর নিচের অংশ বেশ কয়েক পরত বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত। মুখমণ্ডল ও প্রসারিত জিহ্বা দেখে অতি সহজেই ধরা যায় যে, এটি একটি কালীমূর্তি। জনশ্রুতি মূলে জানা যায় যে, মহারাজা প্রতাপাদিত্যের সময়ে এ স্থান আবাদ করার সময় মাটিতে অর্ধপ্রোথিত অবস্থায় মূর্তিটি আবিষ্কৃত হয়। এবং মাটি থেকে এটিকে উত্তোলন করা সম্ভব হয়নি বলে সেখানেই একটি মন্দির নির্মাণ করে মূর্তিটিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকালে। জনশ্রুতি মূলে এ সম্পর্কে আরও জানা যায় যে, অষ্টম শতাব্দীতে এখানে একটি মন্দির ছিল। প্রাকৃতিক কারণে সেটি ধ্বংস হয়ে গেলে এস্থান পরিত্যক্ত হয়, এবং অনাদি কাল থেকে অস্তিত্বশীল এ মূর্তিটিও লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। প্রতাপ এটিকে নূতন করে উদ্ধার ও প্রতিষ্ঠা করেন।

বিশ্বকোষে এ মূর্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটি একটি শিলাদেবী এবং আকবরের সেনাপতি মানসিংহ সেই মূর্তিটি অম্বরে নিয়ে যান এবং সেখানে মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে প্রতাপের খুল্লতাত ভ্রাতা কচু রায় (বসন্তরায়ের পুত্র) ঈশ্বরীপুরে বর্তমান মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত করেন।

এ সম্পর্কে সতীশ বাবু ভিন্নমত পোষণ করেন (যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৬৬-৭০ পৃ.)। তাঁর মতে অনাদি কাল থেকে এ মূর্তিটি এখানে আছে। অষ্টম শতাব্দীতে প্রাকৃতিক কারণে মূর্তিটি ভূগর্ভস্থিত হয়ে যায় এবং প্রতাপ সেটিকে উদ্ধার করে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সতীশ বাবু বলেন যে, মানসিংহ চাঁদরায়-কেদার রায়দের মূর্তি নিয়ে গিয়েছিলেন, যশোরেশ্বরী মূর্তি নয়। এ সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পক্ষে কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া কঠিন। যশোরেশ্বরী মূর্তি বলে কথিত একটি মূর্তি ঈশ্বরীপুরে আছে। অপরদিকে রাজা মানসিংহ কর্তৃক এ মূর্তি অম্বরে নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে জোর কিংবদন্তী আছে। বাঙলা থেকে নিয়ে যাওয়া একটি প্রস্তরমূর্তি আজও সেখানে আছে এবং সেই মূর্তিটি এখনও বাঙালি ব্রাহ্মণ দ্বারাই পূজিত হয় বলে জানা যায়। তবে সতীশ বাবুর উক্তি সমর্থনযোগ্য মনে হয় এ কারণে যে, মানসিংহ কোনোকালে প্রতাপের রাজধানী ঈশ্বরীপুরে গিয়েছিলেন, এমন কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদিও পরবর্তী কালের কোনো কোনো কাব্য গ্রন্থে এবং সতীশ বাবুর কাল্পনিক ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, মানসিংহ প্রতাপকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। অতএব মানসিংহ কর্তৃক যে-মূর্তিটি নেওয়া হয়েছিল, সেটি অন্য কোনো মূর্তি হতে পারে।

যশোরেশ্বরী মন্দিরের কাছে আর একটি মন্দিরে আর একটি মূর্তি ছিল। এটি একটি অসাধারণ গঙ্গামূর্তি। খুব সম্ভব এটি সেন আমলে নির্মিত হয়েছিল। এটি অন্নপূর্ণা মূর্তি হিসাবে পূজিত হত। বর্তমানে মূর্তিটি কোথায় আছে জানা নেই।

যশোরেশ্বরীর প্রাচীন মন্দিরের আদি স্বরূপ বর্তমানে খুঁজে পাওয়া কঠিন। বিভিন্ন সময়ে আমূল সংস্কারের ফলে প্রতাপের সময়ের মন্দিরের অস্তিত্ব হারিয়ে গেছে।

বারদুয়ারী

যশোরেশ্বরী মন্দিরের উত্তর দিকে পদ্মপুকুর। এই জলাশয়ের তীরেই বারদুয়ারী নামক একটি বিরাট অট্টালিকা ছিল। এটি ছিল প্রতাপাদিত্যের দরবারগৃহ। বারটি দ্বারবিশিষ্ট ছিল বলে এর নাম বারদুয়ারী নয়। এর দ্বারের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। একটি বিরাট অট্টালিকা হিসাবেই এটিকে সাধারণ ভাষায় বারদুয়ারী বলা হত। এটি বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

রাজবাড়ি

বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় প্রথমে মুকুন্দপুরে তাঁদের প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং সে স্থানের নাম হয় যশোহর। খুব সম্ভব তাঁরা গৌড়ের যশ হরণ করেছিলেন বলে এ নামকরণ করেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে প্রতাপাদিত্য ঈশ্বরীপুর-ধূমঘাটে রাজধানী স্থাপন করেন এবং মুকুন্দপুর পরিত্যক্ত হয়। ঈশ্বরীপুরের নামও যশোহর রাখা হয়। এখানে তিনি একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। তিনি এখানে একটি বিরাট দুর্গও নির্মাণ করেন। দুর্গের বাইরে পূর্ব দিকের পরিখার বাইরে পূর্ব দিকে এবং বারদুয়ারী থেকে কিছু উত্তরে অবস্থিত ছিল এই রাজবাড়ি।

রাজবাড়ির কোনো ধ্বংসাবশেষই বর্তমানে (১৯৭৫ খ্রিঃ) টিকে নেই। আছে শুধু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ। আর আছে কয়েকটি জলাশয় অতীত গৌরবের নীরব সাক্ষী হিসাবে।

দুর্গ

প্রায় বর্গাকারে নির্মিত এ দুর্গের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৩০৩ মিটার। দুর্গ এলাকার ভিতরে প্রায় ৭২ একর ভূমি আছে। দুর্গের চারদিকে ছিল মাটির তৈরি উঁচু প্রাচীর এবং প্রাচীরের বাইরে ছিল গভীর ও প্রশস্ত পরিখা। দুর্গ প্রাকারের স্থানে স্থানে ছিল কামান রাখার জন্য উঁচু বুরুজ। দুর্গ প্রাচীর গুলিতে বর্তমানে বাড়িঘর করা হয়েছে।

বর্তমানে সমুদয় দুর্গ এলাকা চাষের ভূমিতে পরিণত হয়েছে। উঁচু প্রাচীর ও দুর্গের ভিতরে নিম্নভূমি দেখে লোকমুখে এস্থানের নাম হয়েছে 'চাঁদ রায়ের দিঘি' বা 'দিঘির বিল'। দুর্গ এলাকার ভিতরে ১৬ টি জলাশয় ছিল।

গির্জা

ঈশ্বরীপুরের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি ধ্বংসস্তূপকে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত একটি গির্জার ধ্বংসাবশেষ বলে চিহ্নিত করা হয়। এ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলা না গেলেও সে সময়ে এখানে যে একটি গির্জা নির্মিত হয়েছিল, নানা সূত্রে তা জানা যায়।

টেঙ্গা মসজিদ

যশোরেশ্বরী মন্দিরের কিছু দক্ষিণ-পশ্চিমে হাম্মামখানা নামক একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আছে। এর কিছু দক্ষিণে একটি বিরাট মসজিদ আছে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা

এ মসজিদের আয়তন বাইরের দিকে ৪১.২১ মিটার × ১০ মিটার। দেয়ালগুলি প্রায় ২.১২ মিটার প্রশস্ত। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ৫টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশপথ আছে। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি ২.১৯ মিটার এবং অন্য গুলি ১.৮ মিটার করে প্রশস্ত ছিল। পত্রাকারের খিলানের সাহায্যে নির্মিত ছিল প্রবেশপথগুলি।

মসজিদের অভ্যন্তর ভাগ পাঁচভাগে (bays) বিভক্ত। কেন্দ্রীয় ভাগের ভিতরের আয়তন ছিল ৬.২৮ মিটার × ৬.২৮ মিটার। বর্গাকারে নির্মিত বাকি চারটি অংশ সম আয়তনের ছিল এবং এ গুলির প্রত্যেকটির আয়তন ছিল ৫.৭৫ মিটার × ৫.৭৫ মিটার। এই পাঁচটি অংশে প্রতিষ্ঠিত ছিল ৫টি মনোরম গম্বুজ। আদি গম্বুজগুলি দেখতে প্রায় খান-ই-জাহানী মসজিদের গম্বুজের মতো ছিল। মেঝে থেকে গম্বুজের উচ্চতা ছিল ১০.৭ মিটার।

মসজিদের মেঝে বর্তমানে মাটির নিচে প্রায় ০.৯ মিটার দেবে যাওয়া অবস্থায় আছে। এতে ধারণা করা যায় যে, মসজিদটি প্রায় ১.৭/১.৮ মিটার দেবে গেছে। মসজিদটি অতিশয় জীর্ণ অবস্থায় ছিল। গম্বুজগুলির অবস্থা ছিল খুবই কাহিল, এগুলি প্রায় ধসে পড়েছিল। দেয়ালগুলির বেশির ভাগ পড়ে গিয়েছিল। আদিতে খুব সুদৃঢ়ভাবে নির্মিত হয়েছিল বলে মসজিদটি কোনো রকমে খাড়া ছিল। কিন্তু এটি ছিল প্রায় পরিত্যক্ত।



১ টেঙ্গা মসজিদ, সাতক্ষীরা, খুলনা

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে মসজিদটির আমূল সংস্কার করা হয় এবং সংস্কারের পর থেকে এতে রীতিমত নামাজ পড়া হয় বলে 'সুন্দরবনের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে (২য় খণ্ড, ৪৮৯ পৃ.) জনাব, এ, এফ, এম, আবদুল জলীল উল্লেখ করেছেন। এ মসজিদ

সেকালের স্থাপত্য শিল্পের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বলে তিনি বলেন। ডক্টর আহমদ হাসান দানী এটিকে একটি ৩ গম্বুজের মসজিদ বলে অভিহিত করেছেন।[১] তাঁর এ বর্ণনা যে ভুল তাতে কোন সন্দেহ নেই। অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র মিত্র তাঁর রচিত যশোহর-খুলনার ইতিহাস গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এ মসজিদের যে বর্ণনা ও আলোক চিত্র দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় জীর্ণ মস্‌জিদটিতে ৫টি গম্বুজ ছিল এবং এর আয়তন ছিল ৪১.২১ মিটার × ১০ মিটার। জনাব আবদুল জলীলও একই বর্ণনা দিয়েছেন।

কবরস্থান

মসজিদের পূর্বদিকে প্রাচীর বেষ্টিত একটি চত্বর আছে। চত্বরের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের দৈর্ঘ্য ২৬.৩৩ মিটার করে এবং পূর্ব প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ৪১.২৫ মিটার। চত্বরের উত্তর ভাগে সারি সারি পাকা কবর আছে। এগুলি 'বার ওমরার কবর' নামে পরিচিত।

রাজা প্রতাপাদিত্য তাঁর মুসলিম সেনাপতি, আমির-ওমারা ও প্রজাদের নামাজ পড়ার সুবিধার জন্য এ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন বলে একটি জনপ্রবাদ আছে। মসজিদ অঙ্গনের পাকা কবরগুলি, সেই জনপ্রবাদ মতে, মোঘলদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত মুসলিম সেনাপতিদের। অন্যমতে প্রতাপাদিত্যের পতনের পরে এখানে মোঘল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে একজন মোঘল ফৌজদার এ স্থানে প্রশাসনিককার্যে নিয়োজিত হন। তিনি এ মসজিদ, নিকটস্থ হাম্মামখানা, বিবির আস্তানা ও অন্যান্য ইমারত নির্মাণ করেন। এ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলার মতো কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। তবে হাম্মামখানার অস্তিত্ব দেখে মনে হয় যে, মসজিদটিও বোধ হয় সে সময়েই নির্মিত হয়েছিল (নিচে হাম্মামখানা দ্র.)। এ মসজিদ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশক অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে নির্মিত বলে ধারণা হয়।[২]

বিবির আস্তানা

টেঙ্গা মসজিদের সামান্য উত্তরে একটি অষ্টকোণাকৃতির ছোট ইমারতের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এর উপরে ১টি গম্বুজ ছিল। তা এখন ধসে পড়েছে। এটি বিবির আস্তানা নামে পরিচিত। জনপ্রবাদ মতে জানা যায় যে, এই ইমারতটি মুসলিম মহিলাদের নামাজ পড়ার জন্য নির্মিত হয়েছিল। এ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছুই বলা যায় না।

হাম্মামখানা

যশোরেশ্বরী মন্দিরের কিছু দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এটি ছিল একটি হাম্মামখানা অর্থাৎ স্নানাগার সহ একটি বাসগৃহ। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা এই

---

১. *Muslim Architecture In Bengal, p.,250. Prof A. H. Dani.*

২. প্রত্নতত্ত্ব তদানীন্তন সুপারিনটেনডেনট জনাব আবদুল কাদিরের কাছ থেকে জানা গেছে যে, এ অধিদফতর কর্তৃক সংরক্ষিত এ মসজিদের সংস্কার করা হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, এর আগে স্থানীয় উদ্যোগে এতে মেরামত কাজ করা হয় এবং তাতে অজ্ঞতাবশতঃ আদি কাঠামোর (plan) অনেক রদবদল করা হয়েছে।

ইমারতের ৩টি কক্ষের ধ্বংসাবশেষের কিছু কিছু অংশমাত্র বর্তমানে টিকে আছে বলে এর সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। তবে ধ্বংসাবশেষ থেকে ইমারতের একটি মোটামুটি বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে।

ইমারতের সর্ব পশ্চিমের কক্ষটি ছিল বেশ বড়। এটি কী উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল, তা বর্তমান ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থা থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় কক্ষটিও অনুরূপ আয়তনের ছিল। এই কক্ষের কেন্দ্রস্থলে ছিল একটি বড় গম্বুজ। এই গম্বুজের চারকোণে ছিল ৪টি ছোট ছোট গম্বুজ। বড় গম্বুজের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে অর্ধ গম্বুজাকারে নির্মিত ছাদ ছিল বলে জানা যায়। এতে দেখা যায় যে কক্ষটি ৯ ভাগে বিভক্ত ছিল। পশ্চিম দেয়ালের মধ্যভাগে ছিল প্রবেশ পথ।

এ কক্ষের লাগোয়া পূর্বদিকের কক্ষের কেন্দ্রস্থলে ছিল পানি গরম করার ব্যবস্থা। সেই গরম পানি দু'পাশে অবস্থিত ২টি চৌবাচ্চায় সরবরাহ করার ব্যবস্থা ছিল। পানি গরম করার জন্য পূর্ব দিক থেকে মাটির নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ পথের অস্তিত্ব ছিল। এই কক্ষের দক্ষিণ দিকে আরও কিছু ইমারত ছিল। সেগুলি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে বলে এগুলি সম্পর্কে কিছুই বলা সম্ভব নয়।

অধ্যাপক সতীশ মিত্রের মত্যে এই ইমারতটি ছিল দ্বিতল। এর নিচে ছিল হাম্মামখানা এবং উপরে ছিল বাসগৃহ। প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতরের তদানীন্তন সুপারিনটেডেন্ট জনাব আব্দুল কাদির সরেযমিনে তদন্ত করে এটিকে একতল বিশিষ্ট ইমারত এবং শুধু হাম্মামখানা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি ছাদে গম্বুজ থাকার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে এটি দ্বিতল ইমারত হতে পারে না। কিন্তু তিনি এ ধ্বংসাবশেষ দেখেছেন আজ (১৯৮৩ খ্রিঃ) থেকে মাত্র কয়েক বছর আগে। আর সতীশ বাবু এটি দেখেছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। সে সময়ে ইমারতটির উপরের আরও কিছু অংশ হয়ত টিকে ছিল।

জাহাজঘাটা ও হাম্মামখানা

ঈশ্বরীপুর থেকে প্রায় ৫ মাইল উত্তরে ইছামতী ও যমুনা নদীর মিলিত স্রোত কদমতলী নদীর পূর্বতীরে জাহাজঘাটা নামক একটি প্রাচীন স্থান আছে। এখানে ১২৪.২৪ মিটার × ৬৩.৬৩ মিটার আয়তনবিশিষ্ট একটি স্থানে অনেক ইমারতের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। সমগ্র স্থান জুড়ে স্তূপীকৃত ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অসংখ্য ইটের অস্তিত্ব দেখা যায়। নদী তীরে আছে বেশ কয়েকটি বাঁধান ঘাটের ধ্বংসাবশেষ। এগুলি সাধারণ ও স্নানের ঘাট বলে মনে হয় না। এ স্থানে জাহাজ নির্মাণের কারখানা ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। খুব সম্ভব এখানে তৈরি জাহাজগুলিকে পানিতে নামাবার জন্য অবতরণ-ঘাট ছিল এ সমস্ত বাঁধান ঘাট এবং সে সব ঘাটের ধ্বংসাবশেষই এগুলি।

হাম্মামখানা

জাহাজঘাটাতে একটি হাম্মামখানার ধ্বংসাবশেষ এখনও (১৯৭৮ খ্রিঃ) টিকে আছে। এটি একটি বিচিত্র ইমারত এবং এ ধরনের ইমারত এ দেশে অতি অল্পই দেখা যায়।

প্রায় ৩০.০৩ মিটার দীর্ঘ এই ইমারতের প্রস্থ মাত্র ৬.৫১ মিটার। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এই ইমারতে মোট ৬টি কক্ষ আছে।

সর্বোত্তর কক্ষের আয়তন ৬.৫১ মিটার × ৬.২৪ মিটার। এই কক্ষের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। এটি খুব সম্ভব আমলা-পরিচারকদের ব্যবহারের জন্য নির্মিত হয়েছিল। উত্তর দিক থেকে দ্বিতীয় কক্ষের আয়তন ছিল ৬.৫১ মিটার × ৪.২৪ মিটার। এর উপরে ছিল ১টি গম্বুজ। এটি অফিস-কক্ষ ছিল বলে ধারণা করা হয়। তৃতীয় কক্ষটি ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট। এর আয়তন ছিল ৬.৫১ মিটার × ২.৮৭ মিটার। এর উপরে ২টি গম্বুজ ছিল। এটি মালখানা (store-room) ছিল বলে অনুমান করা হয়। এর পরের কক্ষটি ছিল বেশ বড়। ৬.৫১ মিটার × ৫.৯ মিটার আয়তনের এই কক্ষের উপর ১টি বড় গম্বুজ ছিল। এটি শয়ন কক্ষ ছিল বলে ধারণা করা হয়। এর পরের অর্থাৎ পঞ্চম কক্ষের আয়তন ৬.৫১মিটার × ৪.৮৪ মিটার। এই কক্ষের দু'ধারে ২টি বড় চৌবাচ্চা ছিল। অট্টালিকার দেয়াল সংলগ্ন প্রকাণ্ড ইঁদারা থেকে পানি তুলে চৌবাচ্চা পূর্ণ করা হত। এই কক্ষের উপরে ছিল একটি গম্বুজ। গম্বুজের উপরদেশে স্ফটিক বসান ছিল যাতে কক্ষে আলো প্রবেশ করতে পারে। এই কক্ষটিতেই ছিল হাম্মামখানা বা স্নানাগার। এর পরের অর্থাৎ সর্ব দক্ষিণের কক্ষটিতে ছিল একটি বিরাট পাকা কুয়া।



▲ জাহাজঘাটা, হাম্মামখানা, সাতক্ষীরা

এই বিচিত্র ইমারতের অস্তিত্ব এ স্থানের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। এ গৃহে যিনি বাস করতেন, তিনি যে একজন উঁচুপদস্থ ব্যক্তি ছিলেন এবং রাজকীয় হালে জীবন যাপন করতেন, এই অসাধারণ হাম্মামখানাই সে পরিচয় প্রদান করে। কেউ কেউ বলেন যে, প্রতাপাদিত্যের জাহাজ নির্মাণের কারখানা ছিল এখানে এবং তাঁর জাহাজ নির্মাণকর্তার

জন্য এই ইমারতটি নির্মিত হয়েছিল। খুব সম্ভব এ অঞ্চলে মোঘল অধিকার প্রতিষ্ঠার পরে এখানে জাহাজ নির্মাণের কারখানা গড়ে উঠেছিল এবং হাম্মামখানাটি কোনো মোঘল আমির বা ফৌজদারের জন্য নির্মিত হয়েছিল। এটি যে মোঘল আমলের ইমারত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মাতলা বা মৌতালা দুর্গ ও মসজিদ

দুর্গ : উত্তরে মাতলা বা মৌতালা এবং দক্ষিণে জাহাজঘাটা (উপরে জাহাজঘাটা দ্র.) এই দুই স্থানের অংশ বিশেষ নিয়ে একটি দুর্গের অস্তিত্ব ছিল। সেই দুর্গ বর্তমানে (১৯৭৮ খ্রিঃ) প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শুধু উত্তর দিকের পরিখাটি টিকে আছে। কিন্তু প্রাচীরের কোনো অস্তিত্ব নেই। এটি একটি বিরাট দুর্গ ছিল বলে জানা যায়। খুব সম্ভব রাজা প্রতাপাদিত্য এ দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন।

মসজিদ : দুর্গ এলাকার উত্তর-পূর্ব কোণে এবং উত্তর দিকের পরিখার দক্ষিণ পাশে মোঘল আমলের একটি মসজিদ আছে। বর্গাকারে নির্মিত মসজিদের আয়তন ৫.৯৩ মিটার × ৫.৯৩ মিটার, দেয়াল গুলি .৯৮ মিটার প্রশস্ত। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশপথ ছিল। উপরে ছিল ১টি মাত্র গম্বুজ। এস্থানের নাম নামাজ ঘর। খুব সম্ভব জাহাজঘাটার প্রশাসনিক কেন্দ্রের সঙ্গে এটি সম্পৃক্ত ছিল।

গোপালপুর মন্দির

ঈশ্বরীপুর থেকে ৫ কিলোমিটার উত্তরে যমুনা নদীর ডান তীরে গোপালপুর নামক গ্রামে একই স্থানে চার ভিটিতে ৪টি মন্দির ছিল। ৩টি মন্দির বহুকাল পূর্বেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। পূর্ব ভিটির মন্দিরটি অতি জীর্ণ অবস্থায় কিছুকাল আগে পর্যন্ত টিকে ছিল।

বর্গাকারে নির্মিত এই মন্দিরের আয়তন ছিল ৫ মিটার × ৫মিটার। দেয়াল গুলিছিল ২.৫ মিটার প্রশস্ত। এটি ছিল একটি দোতালা ইমারত এবং এর উচ্চতা ছিল ৯.০৯ মিটার। মন্দিরের পশ্চিম দেয়ালে ছিল সদর দরজা। দক্ষিণ ও পূর্ব দিকেও দরজা ছিল, কিন্তু উত্তর দিকে কোনো প্রবেশপথ ছিল না। মন্দিরের দেয়ালগুলি বিভিন্ন দেবদেবী প্রভৃতির প্রতিকৃতির সাহায্যে অলঙ্কৃত ছিল।

এটি ছিল একটি গোবিন্দমন্দির এবং বিগ্রহটি রাজা প্রতাপাদিত্য পুরী থেকে এনে এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে। উপরতলায় ছিল বিগ্রহের শয়ন কক্ষ এবং নিচতলায় ছিল পূজার ঘর। প্রায় ১০০ বছর পূর্বে বিগ্রহটি এখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয় এবং তা রায়পুরের এক ব্রাহ্মণ অধিকারীর (বংশানুক্রমে পুরোহিত) বাড়িতে ছিল বলে জানা যায়। প্রতি বছর দোল পূজার দিন নাকি বিগ্রহটি নূরনগর গ্রামে প্রতাপাদিত্যের বংশধরদের কাছে নিয়ে যাওয়া হত। বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। গোপালপুরের মন্দিরটি এখন অতি জীর্ণ অবস্থায় আছে।

মুকুন্দপুর দুর্গ ও রাজবাড়ি

কালীগঞ্জ থানা থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত মুকুন্দপুর নামক স্থানে বিক্রমাদিত্য (শ্রীহরি) ও বসন্তরায় যে প্রথম রাজধানী স্থাপন করেছিলেন, সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সে সময়ে নির্মিত একটি প্রকাণ্ড দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। প্রায় ১৫০ বিঘা ভূমি জুড়ে সেই দুর্গ নির্মিত হয়েছিল। চারদিকে ছিল মাটির তৈরি উঁচু প্রাচীর ও প্রাচীরের বাইরে ছিল প্রশস্ত ও গভীর পরিখা। দুর্গের অভ্যন্তরে ছিল রাজবাড়ি। বর্তমানে (১৯৮৩ খ্রিঃ) রাজবাড়ি ও দুর্গ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও সমগ্র দুর্গ এলাকায় আছে অসংখ্য ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ।

প্রতাপনগর ও অন্যান্য দুর্গ

কালীগঞ্জ থানা থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এবং ঈশ্বরীপুর থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার উত্তরে ইছামতীর শাখা খোলপেটুয়া নদীর পূর্ব তীরে প্রতাপনগর দুর্গ অবস্থিত। এটিও ছিল এক বিরাট দুর্গ। মাটির তৈরি উঁচু প্রাচীর এবং প্রশস্ত ও গভীর পরিখাবেষ্টিত এদুর্গের কোনো চিহ্ন বর্তমানে (১৯৮৩ খ্রিঃ) টিকে নেই। রাজা প্রতাপাদিত্য এদুর্গ নির্মাণ করে তাঁর নামানুসারে এর নামকরণ করেছিলেন প্রতাপনগর দুর্গ।

অন্যান্য দুর্গ

রাজা প্রতাপাদিত্য তাঁর রাজ্যে বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলে অনেক দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়। অধ্যাপক সতীশ মিত্রের (যশোহর-খুলনার ইতিহাস) তালিকা মতে উপরে উল্লিখিত দুর্গগুলি ছাড়াও প্রতাপাদিত্য রায়গড়, গড় কমলপুর, জগদ্দল, আড়াই বাঁকি, রায়মঙ্গল, সাগরদ্বীপ, মণিদুর্গ, চকশ্রী এবং সালকা প্রভৃতি স্থানেও নাকি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। এগুলির সব ক'টাই প্রতাপ কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল কিনা, তা সঠিকভাবে বলা যায় না। প্রতাপের পরে মোঘল আমলেও অনেক দুর্গ নির্মিত হয়েছিল মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে। উপরে উল্লিখিত দুর্গ গুলির মধ্যে মোঘল আমলের দুর্গও থাকতে পারে। তবে সালকা দুর্গ যে প্রতাপের ছিল, তা 'বাহারি স্তান-ই-গায়েবী' নামক গ্রন্থের উল্লেখ থেকে বোঝা যায়।

পরবাজপুর মসজিদ

মুকন্দপুর থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে যমুনা নদীর বামতীরে পরবাজপুর গ্রাম অবস্থিত। এখানে একটি বড় আকারের মসজিদ আছে। মসজিদটি বেশ প্রাচীন বলে ধারণা হয়।

পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা এ মসজিদের আয়তন (বাইরের দিকে) ১৫.৮৫ মিটার × ১২.০২ মিটার। দেয়াল গুলি ১.৭৪ মিটার থেকে ২.১২ মিটার প্রশস্ত। মসজিদটি অভ্যন্তরীণ কক্ষ ও বারান্দা, এই দুই ভাগে বিভক্ত। অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র মিত্র (যশোহর-খুলনার

ইতিহাস, ২য় খণ্ড) এ মসজিদের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় যে অভ্যন্তরীণ কক্ষের আয়তন (ভিতরের দিকে) ছিল ৬.৫৬ মিটার × ৬.৫৬ মিটার এবং দেয়ালগুলি ১.৭৪ মিটার × ২.১২ মিটার প্রশস্ত ছিল। এ মাপ অসামঞ্জস্যপূর্ণ। যদি উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দেয়াল দুটি ২.১২ মিটার করেও প্রশস্ত হয় তবে অভ্যন্তরীণ কক্ষের হবেন আয়ত ৭.৭৭ মিটার × ৭.৭৭ মিটার। বারান্দার অভ্যন্তরীণ মাপ ৭.৪৭ মিটার × ২.০৭ মিটার ছিল বলে তিনি বলেছেন। যদি পূর্ব, পশ্চিম ও মাঝের দেয়াল তিনটি ১.৭৪ মিটার করেও প্রশস্ত হয় তবে বারান্দার অভ্যন্তরীণ আয়তন হবে ৭.৭ মিটার × ২.৪ মিটার। অতএব সতীশ বাবু কর্তৃক প্রদত্ত মসজিদের ভিতরের আয়তন প্রমাদপূর্ণ বলে মনে হয়।

মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ২টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশপ্রথ আছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। এ বর্ণনাও প্রমাদপূর্ণ বলে মনে হয়। পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং বারান্দাসহ উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ২টি করে দরজা থাকার কথা। পূর্ব দেয়ালে ২ দরজা বিশিষ্ট মসজিদ এদেশে কোথাও দেখা যায় না। খুব সম্ভব দরজার হিসাবে তিনি ভুল করেছিলেন। বারান্দাসহ মসজিদের ছয় কোণে ৬টি মিনার বা টারেট আছে। প্রধান কক্ষের উপরে ১টি বড় গম্বুজ এবং বারান্দার উপরে ৩টি ছোট গম্বুজ আছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। বড় গম্বুজটি ৯.০৯ মিটার উঁচু এবং মেঝে মীনা করা ছিল বলে সতীশ বাবু বলেছেন।

মসজিদের কোনো শিলালিপি নেই। মসজিদে ব্যবহৃত ইট খান-ই-জাহানী মসজিদের ইটের মতো। তবে মসজিদটি খান-ই-জাহানের কালে নির্মিত বলে মনে হয় না। কারণ, তাঁর সময়ে নির্মিত কোনো মসজিদেই বারান্দা দেখা যায় না। মসজিদের গঠণপ্রণালী দেখে মনে হয় যে, এতে সুলতানী আমলের স্থাপত্য কৌশলের যথেষ্ট প্রভাব আছে। দিনাজপুরের সুরামসজিদ ও গৌড়ের খনিয়াদিঘি মসজিদের সঙ্গে এর একাত্মতা দেখা যায় এবং সেই সঙ্গে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দের নির্মিত আতিয়া মসজিদের সঙ্গেও। এ মসজিদ বিক্রমাদিত্যের (শ্রীহরি) রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল বলে প্রবল জনশ্রুতি আছে। তা যদি হয়ে থাকে তবে সুলতানী আমলের স্থাপত্য কৌশণের প্রভাবে এটি নির্মিত হয়েছিল বলে বলা যেতে পারে। এ অঞ্চলে হোসেন শাহও রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর আমলেও এ মসজিদ নির্মিত হয়ে থাকতে পারে এবং খুব সম্ভব মসজিদটি এসময়েই নির্মিত হয়েছিল।

লাবসা মায়িচম্পার দরগা

সাতক্ষীরা শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে বেতনা নদীর ডান তীরে লাবসা গ্রাম অবস্থিত। এ গ্রামে একটি প্রাচীন দরগা আছে, লোকে বলে 'মায়িচম্পার দরগা'। বর্গাকারে ও প্রশস্ত দেয়ালের সাহায্যে নির্মিত এই ইমারতের উপরে আছে একটি মাত্র গম্বুজ। গম্বুজটি আকারে বেশ বড়। ভিতরে আছে ১টি পাকা কবর। লোকে বলে মায়ি চম্পার কবর।

এই কবরের সঙ্গে গাযী, কালু ও চম্পাবতীর কাহিনীর নায়িকা মটুক রাজার কন্যা চম্পাবতীর ট্র্যাডিশন জড়িত আছে। আবার এই মায়িচম্পা বাগদাদের খলিফার কুমারী

কন্যা ছিলেন, তাও বলা হয়ে থাকে। খুব সম্ভব এখানে কোনো রাজপুরুষ বা দরবেশ সমাহিত আছেন। মায়িচম্পার কাহিনী নেহায়েতই গালগল্প মাত্র।

নোয়াপাড়া-মণিঘর

সাতক্ষীরা জেলার অন্তর্গত কালোরোয়া থানার অধীনে নোয়াপাড়া-মণিঘর গ্রামে একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ও অসংখ্য ছোট বড় প্রাচীন জলাশয় আছে। মাটির তৈরি দুর্গের প্রাচীরগুলির কিছু কিছু অংশ এখনও টিকে আছে। কিন্তু দুর্গের ভিতরে কোনো প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ নেই। সমগ্র দুর্গ এলাকা এখন শস্যক্ষেত্র। কিন্তু সর্বত্রই ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ দেখা যায়। প্রাচীন জলাশয়গুলি কোনো রাজা-মহারাজার কীর্তি বলে মনে হয়।

জনশ্রুতিমূলে জানা যায় যে, তিয়ার গোত্রীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের এক রাজার বাড়ি নাকি ছিল এখানে। তিনি নাকি এক সন্ন্যাসীকে বধ করে পরশপাথর লাভ করেন এবং তাঁর অভিশাপে নির্বংশ হন এবং 'বড় পুকুর' নামক দিঘির জলে ডুবে আত্মহত্যা করেন।

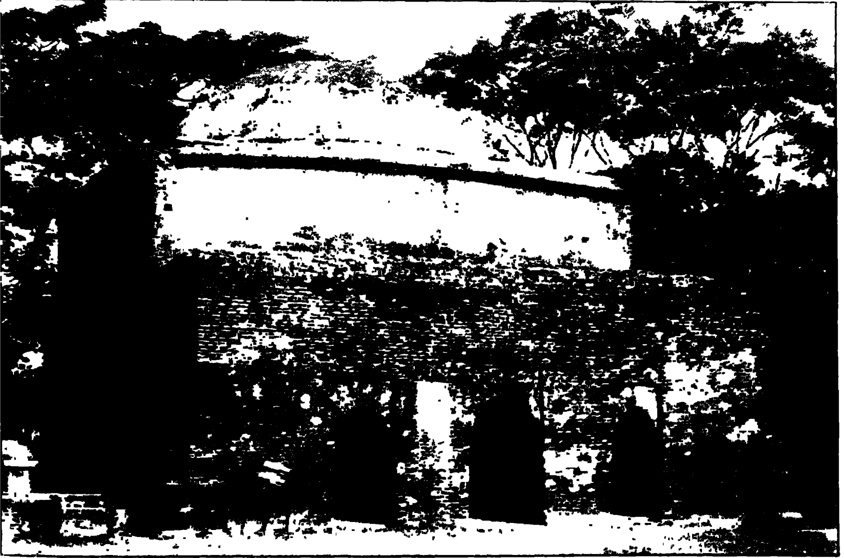
এ গ্রামকে গড়দনিও বলা হয়ে থাকে এবং যে স্থানে দুর্গটি আছে সে স্থানকে ধনমণিঘর বা ধনপতির দনা বলা হয়ে থাকে। এখানে গুপ্তধন লুক্কায়িত আছে বলে এ স্থানকে এ নামে অভিহিত করা হয়। জনপ্রবাদ থেকে জানা যায় যে এখানে অনেকে গুপ্তধন পেয়েছে এবং পাছে গুপ্তধন প্রাপ্তিকে কেন্দ্র করে বিবাদ হতে পারে, সে কারণে দু'জন লোক একসঙ্গে এখানে জমি চাষ করতেন না। এ গ্রামে ১২৬ টি প্রাচীন জলাশয় আছে বলে জানা যায়।

পটুয়াখালী জেলা

মুসলিম আমল

মসজিদবাড়ি মসজিদ

মীর্যাগঞ্জ থানার অধীনে এবং থানা সদর থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার দক্ষিণে বিঘাই নদীর শাখা আইলানদীর তীরে অবস্থিত মসজিদবাড়ি গ্রামে এই মসজিদ অবস্থিত। এই মসজিদটি এই গ্রামে আছে বলে এ স্থানের নামও মসজিদ বাড়ি হয়েছে। এটি একটি উল্লেখযোগ্য প্রাচীন কীর্তি।



▲ মসজিদবাড়ী মসজিদ, বরগুনা

পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ ও আয়তাকারে নির্মিত এই মসজিদের আয়তন বাইরের দিকে ১৪.৮৯ মিটার × ১১.৭৪ মিটার। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রাচীর দুটি ১.৯৯ মিটার করে প্রশস্ত এবং পূর্ব, পশ্চিম ও মাঝখানের প্রাচীরের প্রত্যেকটি ১.৯২ মিটার করে প্রশস্ত। মসজিদের চার কোণে ৪টি এবং বারান্দার দুই কোণে ২টি এই মোট ৬ টি মিনার বা টারেট ছিল। এগুলি অষ্টকোণাকারে নির্মিত ছিল। কেন্দ্রীয় মিহরাবের পিছনের প্রাচীর বাইরের দিকে বেশ উদগত। প্রধান কক্ষ ও বারান্দা এই দুই অংশে মসজিদটি বিভক্ত।

বর্গাকারে নির্মিত প্রধান কক্ষের ভিতরের আয়তন ৬.৮৪ মিটার × ৬.৮৪ মিটার। এই কক্ষের পূর্ব দিকে যে সরু বারান্দাটি আছে সেটির ভিতরের আয়তন ৬.৮৪ মিটার × ২.৮৯ মিটার। প্রধান কামরার উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দেয়ালে ৩টি করে প্রবেশপথ আছে। বারান্দার উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে এবং পূর্ব দেয়ালে ৩টি প্রবেশপথ আছে। পূর্ব ও মাঝের দেয়ালের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি ১.৫১ মিটার করে প্রশস্ত এবং পূর্ব ও মাঝের দেয়ালের বাকি প্রবেশপথ দুটি বাইরে দিকে ১.১৬ করে এবং ভিতরের দিকে ১.৪২ করে চওড়া। প্রধান কামরার উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ দুটি ১.৩৯ মিটার করে চওড়া এবং এদুটি দেয়ালের বাকি প্রবেশপথগুলির প্রত্যেকটি প্রায় ১.০৩ মিটার চওড়া। পত্রাকারের খিলানের সাহায্যে নির্মিত প্রবেশপথগুলি খর্বাকৃতির (dwarfish)। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি মিহ্‌রাব। কেন্দ্রীয় মিহ্‌রাবটি অন্য দুটির চেয়ে অনেক বড়। প্রধান কক্ষের উপরে আছে ১টি মাত্র গম্বুজ। উল্টান পেয়ালাকারে নির্মিত এই গম্বুজটি আকারে বিরাট এবং দেখতে মনোরম। গম্বুজের নিম্নদেশের ব্যাস প্রায় ৬.৩৩ মিটার। বারান্দার উপরে নির্মিত হয়েছে অনেকটা চৌচালা ঘরের চালের মতো ছাদ (vaulted roof)।

মসজিদে যে শিলালিপি আছে, তা থেকে জানা যায় যে, সুলতান রুকন উদ-দীন বারবক শাহ্‌র রাজত্বকালে (১৪৫৯-৭৬ খ্রিঃ) ... উদ-দীনের পুত্র খান-উল-মোয়ায্‌যম ওজিয়াল খান কর্তৃক ৮৭০ হিজরী (১৪৬৫ খ্রিঃ) সনে এই মসিজদ নির্মিত হয়েছিল।

সুন্দরবন অঞ্চলে অবস্থিত এই মসজিদ বহুকাল ধরে জঙ্গলাবৃত হয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল। কিন্তু মসজিদটি এত শক্তভাবে নির্মিত যে, এটি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়নি। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে মিঃ গোমেস (Mr. Gomes) নামক একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা কর্তৃক এই এলাকার জরিপকার্য করার সময় ঘটনাক্রমে আবিষ্কৃত হয়ে পড়ে। তিনি এই মসজিদটির একটি নকশা তৈরি করেন এবং মসজিদের শিলালিপিটিসহ তা বিভাগীয় কমিশনার মিঃ রেইলীর (Mr. G. H. Reily) নিকট প্রেরণ করেন ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে। একই বছর মিঃ রেইলী শিলালিপিটিসহ একটি পত্র এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্টের নিকট কলকাতায় প্রেরণ করেন। সেই পত্রটির অংশবিশেষ নিম্নে তুলে ধরা হল।[১] এর পরে তিনি আরও একটি পত্র তাঁর কাছে পাঠান

"I send with pleasure the deer and the stone. The latter was found on the north bank of the Slab River at an *abad* called 'Byang' in a *'Mat'* Or *Masjid*, which is in a tolerable state of preservation. The land round the 'Mat' is now clear. but the temple was found in the jungle when it was cut down, with the stone in it. There is no story or tradition attached to the 'Mat'—the generation that built it seems to have passed away, and the place to have run into jungle and remained covered with forest jungle for a great number of years. The principal room in the 'Mat' has an arched roof in good preservation, inside a regular dome. The mortar of the building is not *soorkie* or pounded bricks but sand and lime and very adhesive." —*Inscriptions of Bengal, Vol, IV, p.82 Mvi Shamsuddin Ahamad.*

এবং সেই সঙ্গে মসজিদের নকশাও। সেই পত্রটির অংশ বিশেষও নিম্নে তুলে ধরা হল।[২]

সুলতান রুকন-উদ্-দীন বারবকশাহ্‌র আমলে নির্মিত এ মসজিদ পটুয়াখালী অঞ্চলের প্রাচীনতম মুসলিম কীর্তি। এতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, এর আগে না হলেও অন্তত সে সময়ে পটুয়াখালী-বরিশাল অঞ্চলে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অনেক পরবর্তী কালে খুব সম্ভব মোঘল আমলের শেষের দিকে প্রাকৃতিক কারণে মসজিদ ও পার্শ্ববর্তী এলাকা পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেই অবস্থায়ই ছিল। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে একটি প্রাচীন কীর্তি হিসাবে এটি সংরক্ষিত হয়। হাল আমলে প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর কর্তৃক এর সংস্কার কার্য হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিবিচিনি মসজিদ

বেতাগী থানার অধীনে বিবিচিনি গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আছে। বেতাগী থানা থেকে এস্থান প্রায় ৬ কিলোমিটার উত্তরে। মসজিদটি এমনভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে যে, এর প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণ করা মোটেই সম্ভব নয়। তবে ইষ্টকনির্মিত একটি বড় আয়তনের উঁচু ভিত্তিবেদীর উপরে যে মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল, তা সহজেই বোঝা যায়। মসজিদের সামনের দেয়ালে খুব সম্ভব ৩টি প্রবেশপথ ছিল এবং খিলানের সাহায্যে এগুলি নির্মিত হয়েছিল।

নিয়ামত উল্লাহ্ নামক এক ব্যক্তি কর্তৃক মসজিদটি পার্শ্ববর্তী নিয়ামতী নামক গ্রাম স্থাপিত হয়েছিল বলে জানা যায়। তাঁর ভগ্নী বিবিচিনি এ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন বলে বলা হয় থাকে।

মসজিদের গায়ে কোনো শিলালিপি নেই। তবে মসজিদে ব্যবহৃত মোঘল আমলের পাতলা ইট এবং মসজিদ তৈরির কায়দা-কানুন দেখে মনে হয় যে এটি মোঘল আমলে নির্মিত হয়েছিল।

২. দ্বিতীয় পত্রটি ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ১০ই জুলাই তারিখে লিখিত এবং তা নিম্নরূপ :
'I send a sketch of the *Masjid* drawn by Mr.Gomes, who fortunately had a drawing of it in his field book. The accompanying extract from Lieutenant Hodge's map will show that the site of the *Masjid* is about 8 miles from Mirzagunj, the nearest decennially settled village. The lands about the *Masjid* at present are under cultivation, but there are still a few of the old forest trees standing, and Mr. Shaw's Resupmtion Decree, dated 1842, state that the lands were at times under dense Sundarban jungle. The jungle...about this parts is trees, not 'Nul' Jungle (Reed). There are two slabs of sand stone evidently used as steps, but bearing no inscription, The interior of the *Masjid* is ornamented with figures cut in bricks, and the dome is substantially built, and is about 30 feet high. There is a tank not far from the building, and I was told it was found when the jungle was cleared. Of Course there are a number of stories connected with the Masjid. One is that a holy Fakeer lived in it and tigers used to sweep the floor of the building clean with their tails every evening."—Ibid

শ্রীরামপুর মিঞাবাড়ি মসজিদ

পটুয়াখালী উপজেলার অধীনে এবং সদর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার উত্তরে শ্রীরামপুর গ্রামের মিঞা বাড়িতে একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। এক গম্বুজের এই মসজিদের চারকোণে ৪টি মিনার (turret) আছে। মসজিদের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দেয়ালে ১টি করে প্রবেশ পথ আছে। অর্ধগোলাকার খিলানের সাহায্যে নির্মিত হয়েছিল প্রবেশ পথগুলি। সামনের দেয়ালে প্যানেলিং-এর পরিবর্তে কুলঙ্গির কাজ ছিল। মসজিদটি অতি জীর্ণ অবস্থায় এখনও টিকে আছে। এটি খুব সম্ভব মোঘল আমলের শেষ দিকে নির্মিত হয়েছিল।



▲ মিঞা বাড়ী উত্তর কড়াপুর মসজিদ, বরিশাল

কমলাসাগর, কচুয়া

বাউফল থানার অধীনে তেঁতুলিয়া নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত কচুয়া গ্রাম একটি প্রাচীন স্থান। এখানে চন্দ্রদ্বীপের রাজাদের আদি নিবাসস্থল ছিল। মগদের অত্যাচারে অথবা তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গনের ফলে চন্দ্রদ্বীপের রাজারা এস্থান ত্যাগ করে মাধবপাশাতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন বলে স্থানীয় জনপ্রবাদ মতে জানা যায়। এখানে রাজাদের প্রাসাদ বা অন্যান্য কীর্তির ধ্বংসাবশেষের বিশেষ কোনো চিহ্ন বর্তমানে দেখা যায় না। তবে একটি বিরাট দিঘির অস্তিত্ব এখনও টিকে আছে। নাম কমলার দিঘি। এদিঘি নিয়ে একটি চমকপ্রদ গল্প বাকরগঞ্জ জেলা গেজিটিয়ারে বর্ণিত আছে।[১] দিঘি খনন করার পর

"There is an interesting tradition about this tank. According to the story, after the tank was dug, water would not come in. Kamala was warned in a dream that unless she walked across the tank, the water

সেখানে পানি না উঠলে স্বপ্নদিষ্ট হয়ে কমলারানী দিঘির ভিতরে প্রবেশ করলে তাতে পানি ওঠে এবং কমলারানীকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ কাহিনী থেকে আরও জানা যায় যে, কমলারানী প্রত্যহ প্রভাতে দিঘির ঘাটে এসে তাঁর স্তন্যপায়ী শিশুকন্যাকে দুধ খাইয়ে যেতেন। একদিন স্বামী তাঁকে ধরে রাখতে চেষ্টা করলে তিনি নিজেকে স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে দিঘির ভিতরে চলে যান এবং আর কোনো দিন তাঁকে দেখা যায়নি।

কালীশুঁড়ি গ্রামের মাযার

বাউফল থানার অধীনে কালীশুঁড়ি গ্রামে একটি প্রাচীন বটগাছের নিচে একটি প্রাচীন মাযার আছে। এটিকে সৈয়দ-উল-আরেফীন নামক একজন দরবেশের মাযার বলে চিহ্নিত করা হয় স্থানীয় প্রবল জনপ্রবাদ মতে। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে নাকি এখানে অনেক কেরামতি প্রদর্শন করেন।

মাযারটিকে কেন্দ্র করে এখানে প্রতি বছর শীতকালে একটি মেলা বসে।

would not come in. Kamala proceeded to do so, but had hardly reached the middle of the tank when the water rose up and closed round her and she remanied in their midst in the guise of a water lily.

"The tradition goes on to say that Kamala had an infant child and that when her husband saw the waters closing round her, he called to her to come out. She replied that she could not, and when asked who would nurse her child, she answered that if the child were placed every morning on the steps of the ghat, she would come and nurse her. The child was accordingly set down on the ghat every morning and Kamala rose out of the water and nursed it. The Raja being disconsolate at her loss, rosolved to bring her back. One day he hid himself near the ghat and attempted to seize Kamala as she was suckling the child. She escaped from his embrace and disappeared in the water never to emerge again,"—Bengal District Gazetteers—Bakarganj by J. C. Jack, 1918, pp. 146-47.

বরিশাল জেলা

মুসলিম আমল

বরিশাল জেলায় প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য প্রাচীন কীর্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। দশম-একাদশ শতাব্দীর সমতটের চন্দ্রবংশীয় নৃপতিদের অধীনে এ জেলায় অধিকাংশ অঞ্চল ছিল বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। কিন্তু সে যুগের কোনো প্রত্নকীর্তির চিহ্ন এ জেলায় দেখা যায় না। সেনযুগে এ জেলা যে তাঁদের অধিকারভুক্ত ছিল কেশব সেনের ইদিলপুর তাম্রলিপিই, তা প্রমাণ করে। কিন্তু সে যুগেরও কোনো প্রত্নকীর্তির চিহ্ন এ জেলায় পাওয়া যায় না।

ঝালকাঠি জেলার সদর থানার অধীনে পোনাবালিয়া গ্রামের পাশে শামরাইল নামক স্থানে একটি প্রাচীন শিবলিঙ্গ ছিল। এ স্থানকে হিন্দুরা বায়ান্ন পীঠের একটি বলে মনে করে এবং শিবচতুর্দশীর দিনে এখানে এককালে হাজার হাজার হিন্দুতীর্থ যাত্রীর সমাগম হত। কিন্তু এখানে যে মন্দিরটি ছিল, তা মুসলিম আমলের শেষভাগে নির্মিত হয়েছিল এবং এটি তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য মন্দির ছিল না।

বরিশাল জেলায় যে সব প্রত্নকীর্তি বা সেগুলির ধ্বংসাবশেষ আছে বা ছিল, সে সবই মুসলিম আমলের। নিচে উল্লেখযোগ্য কীর্তিগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হল।

মাধবপাশার কীর্তি

বরিশাল শহর থেকে প্রায় ১১ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত মাধবপাশা একটি প্রাচীন গ্রাম। এখানে বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের রাজাদের সর্বশেষ নিবাসস্থল ছিল। তাঁরা পটুয়াখালি জেলার বাউফল থানার কচুয়া থেকে মগ জলদস্যুদের ভয়ে অথবা নদীর ভাঙ্গনের ফলে এখানে চলে এসেছিলেন বলে জানা যায়। এখানে রাজাদের প্রাসাদ, মন্দির ইত্যাদি অনেক ধ্বংসাবশেষ আছে। কোনটিই তেমন উল্লেখযোগ্য নয় বলে মিঃ জে, সি, জ্যাক (Mr. J. C. Jack) বাখরগঞ্জ জেলার প্রথম গেজেটিয়ারে (১৫০ পৃ.) বলেছেন। তবে দুর্গাসাগর নামক একটি বিশাল জলাশয় উল্লেখযোগ্য বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। রাজা জয়নারায়ণের জননী দুর্গাদেবীর নামে এই জলাশয়ের নামকরণ হয়েছিল। নিকটস্থ একটি ছোট জলাশয় থেকে একটি পিতলের কামান ব্রিটিশ আমলে উদ্ধার করা হয় বলে সেই পুকুরের নাম কামানতোলা পুকুর হয় বলে তিনি বলেন। এখানে সপ্তদশ শতাব্দে নির্মিত ২টি পরিত্যক্ত মন্দির রয়েছে।

শিকারপুরের তারামন্দির

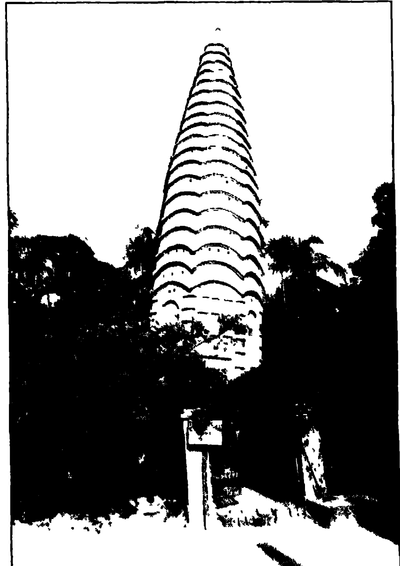
বরিশাল শহর থেকে ২০ কিলোমিটার উত্তরে এককালের সুগন্ধা নদীর তীরে অবস্থিত শিকারপুর নামক গ্রামে একটি তারামন্দির ছিল। মন্দিরটি অতি জীর্ণ অবস্থায় বহুদিন টিকে ছিল বলে মিঃ জ্যাক জেলা গেজেটিয়ারে (১৬১ পৃ.) বলেছেন। অতঃপর বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মন্দিরটিকে মেরামত করা হয় এবং ভগ্ন মূর্তিটির স্থলে একটি নতুন মূর্তি সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল বলে মিঃ জ্যাক বলেছেন। খুব সম্ভব মন্দিরটি মুসলিম আমলের কোনো এক সময়ে নির্মিত হয়েছিল।

রায়েরকাটি কালীমন্দির

পিরোজপুর সদর থানার অধীনে এবং জেলা শহর থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত রায়েরকাটিতে মোঘল আমলের একটি কালীমন্দির ছিল। মন্দির গাত্রে সংস্কৃত ভাষায় যে শিলালিপি ছিল, তা থেকে জানা যায় যে, রুদ্রনারায়ণ রায় নামক একজন জমিদার ১০৪০ বঙ্গাব্দে (১৬৪৩ খ্রিঃ) কালীমূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১১৪৪ বঙ্গাব্দে (১৭৩৭ খ্রিঃ) মন্দিরটি নির্মিত হয়।

মাহিলারা সরকারের মঠ

উজিরপুর উপজেলার অধীনে মাহিলারা গ্রামে একটি অতি সুন্দর মঠ আছে। সরকারের মঠ নামে পরিচিত এই শংকর মঠ শিখর-মন্দিরশিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন।



▲ মাহিলারা মঠ, বরিশাল

অষ্টকোণাকারে নির্মিত এ মঠের নিম্নদেশের প্রত্যেক বাহু ১.৯১ মিটার দীর্ঘ এবং আনুমানিক ৬.২ মিটার পর্যন্ত এবং তা। এর পরে ক্রমশ সরুমঠ অসংখ্য ধনুকাকারের কার্নিসের অলঙ্করণ শোভিত হয়ে উপরে শেষ হয়েছে। ভিতরে বর্গাকারে নির্মিত একটি ছোট কক্ষ আছে। দক্ষিণ দেয়ালে আছে এই কক্ষের একমাত্র প্রবেশপথ এবং পত্রাকারের খিলানের সাহায্যে এটি নির্মিত। প্রবেশ পথের উপরে বেশ কিছু অংশে প্যানেলের অলঙ্করণ আছে। এরকম প্যানেলিং-এর কারুকার্য মঠের অন্যান্য দিকেও আছে।

যেখানে মঠটি সরু হয়ে উপরের দিকে উঠেছে সেই অংশে আছে থাকে থাকে ধনুকাকৃতি রেখার অলঙ্করণ। এই

অলঙ্করণের কাজ এখনও দেখতে ভারী সুন্দর। এই মঠ প্রায় ২০.২১ মিটার উঁচু। এটি একদিকে কিছুটা হেলে গেছে।

মঠে কোনো খোদিত লিপি নেই, তবে এর গঠনকৌশল দেখে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে অষ্টদশ শতাব্দে নবাব আলীবর্দীর আমলে সরকার রূপরাম দাশগুপ্ত এটি নির্মাণ করেছিলেন।

কসবা মসজিদ

গৌরনদী থানার অন্তর্গত রামসিদ্ধি গ্রামে অবস্থিত এই প্রাচীন ইমারত কসবা মসজিদ নামে পরিচিত। যেখানে মসজিদটি অবস্থিত, সে স্থানের নাম কসবা। নামদৃষ্টে মনে হয় যে, এখানে এককালে শহর জাতীয় একটি জনপদের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু হালআমলে কোনো শহরের চিহ্ন সেখানে দেখা যায় না।

এই মসজিদ একটি বিরাট ইমারত। বর্গাকারে নির্মিত এ মসজিদের প্রত্যেক বাহু ছিল ১৬.৯৬ মিটার দীর্ঘ। এই মসজিদ বাগেরহাটের নয়গম্বুজ মসজিদ ও খুলনার মসজিদকুড় নয় গম্বুজ মসজিদের প্রায় সমান। এই মসজিদের প্রাচীরগুলিও সেই দুটি মসজিদের প্রাচীরের মতই প্রশস্ত।



▲ কসবা মসজিদ, বরিশাল

মসজিদের চারকোণে আছে ৪টি মিনার বা টারেট। এগুলি গোলাকার এবং নিচ থেকে উপর পর্যন্ত ৪টি বলয় আকারের ব্যাণ্ড বা স্ফীতরেখা দ্বারা অলঙ্কৃত। মিনারগুলি কার্নিসের উপরে ওঠেনি। কার্নিসগুলি ইষৎ বাঁকানভাবে নির্মিত।

মসজিদের সামনের দেয়ালে আছে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে আছে ১টি করে প্রবেশপথ। পত্রাকারের খিলানের সাহায্যে এগুলি নির্মিত। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে

আছে ৩টি মিহরাব। দেয়ালের বাইরের দিকে। এককালে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পোড়ামাটির চিত্রফলক দ্বারা অলঙ্কৃত প্রবেশপথগুলি খুব বড় নয়।

মসজিদের ভিতরে প্রস্তরনির্মিত ৪টি স্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভগুলিকে স্থানীয় অধিবাসীরা অতিশয় পবিত্র বলে মনে করেন এবং এগুলিতে তারা নানা রকম মানত করেন। দুটি স্তম্ভ থেকে ঘাম বের হয়। স্থানীয় লোকেরা রোগ নিরাময়ের জন্য সে ঘাম সংগ্রহ করে গায়ে মাখেন। ভক্তদের অনবরত আলিঙ্গনের কারণে স্তম্ভ দুটি আকারে সরু হয়ে গেছে বলে মিঃ জ্যাক বাখরগঞ্জ জেলা প্রথম গেজেটিয়ারে উল্লেখ করেছেন।[১]

এই ৪ টি স্তম্ভ ও চারপাশের দেয়ালের উপরে মসজিদের উপরে। ৯টি গম্বুজ আছে। গম্বুজ ও মসজিদের গঠনপ্রণালী বাগেরহাট ও খুলনা জেলায় যে ২টি নয় গম্বুজ মসজিদ আছে প্রায় ঠিক সেগুলির মতই।

মিঃ জ্যাক স্থানীয় জনশ্রুতির উপর ভিত্তি কবে এই মসজিদ যোড়শ শতাব্দীর সাবী খান নির্মাণ করেছিলেন বলে উক্তি করেছেন। অধ্যাপক আহমদ হাসান দানী এটিকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত এবং বাগেরহাটের সুবিখ্যাত খান-ই-জাহান-এর কীর্তিগুলির গঠনপ্রণালীর সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে বলে উক্তি করেছেন। তবে তিনি এটিকে একটি আয়তাকার (oblong) মসজিদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২] প্রকৃত পক্ষে আয়তাকার নয়, বর্গাকারে নির্মিত একটি মসজিদ এটি। ৯ গম্বুজের মসজিদ সাধারণত আয়তাকারের হয় না, বর্গাকারের হয়।

খান-ই-জাহানের আমলের কীর্তিগুলির সঙ্গে এই মসজিদের গঠনকৌশলের যথেষ্ট মিল দেখে এই মসজিদকে সেই সময়ের অথবা সামান্য কিছু পরবর্তী কালের বলে মনে হয়।

শিয়ালঘোনি মসজিদ

বাখরগঞ্জ থানার অধীনে শিয়ালঘোনি গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদ ছিল বলে মিঃ জ্যাক বাখরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ারে উল্লেখ করেছেন। এই মসজিদের গায়ে ফুল ও লতাপাতার সুন্দর অলঙ্করণ ছিল বলে তিনি সেখানে বলেছেন। জনৈক নুসরত গাজী কর্তৃক এই

---

১. "There is an old mosque in the village which is said to have been built by the famous Sabikhan. It is a more imposing building than that at Bibi Chini and has four stone pillars.Two of the pillars are slender and are said to have been worn away by the embraces of devotees."

২. "It contains a mosque situated on the western side of an ancient road said to have been constructed by Sabi khan in early 16th century. But this mosque resembles that at Masjidkur in all respects. This oblong building, having circular towers at the four corners, is roofed over with nine domes in three rows, resting below on stone pillars. Its affinity with Khan Jahan's buildings suggests that it was also erected during his time i.e. in the middle of the 15th century A.D." Muslim Architecture in Bengal. P. 148.—Prof. A.D. Dani.

মসজিদ নির্মিত হয়েছিল বলে তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায়। মসজিদের গায়ে একটি শিলালিপি ছিল এবং হারিয়ে গেছে বলে তিনি স্থানীয় লোকের কাছে শুনেছিলেন।

সুতালরি মসজিদ

ঝালকাটি জেলা শহর থেকে এক মাইল পূর্ব দিকে নলছিটি নদীর তীরে অবস্থিত সুতালরি গ্রামে মোঘল আমলের একটি মসজিদ ছিল। বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে মসজিদটি নদীতে ভেঙ্গে গেছে। মসজিদ গাত্রে ফারসী ভাষায় লিপিকৃত একটি শিলালিপি ছিল। তা থেকে জানা যায় যে সম্রাট মোহাম্মদ শাহর রাজত্ব কালে ১১৫১ হিঃ জনৈক গোলাম মোহাম্মদ এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। শিলালিপিটি (১৭৩৮-৩৯) ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত ছিল বলে মি জ্যাক বলেছেন।[১]

সুতালরি মঠ

সুতালরি গ্রামে একটি কারুকার্যময় মঠ আছে। অষ্টকোণাকারে নির্মিত এই মঠের নিম্নভাগে আছে অতি সুন্দর প্যানেলিং-এর কারুকার্য। আর উপরিভাগে আছে ধনুকাকৃতির রেখার কারুকার্য। মঠটির উপরের অংশ ভেঙ্গে গেছে। তা সত্ত্বেও এটি যখন (১৯৮২ খ্রিঃ) প্রায় ২১.২১ মিটার উঁচু।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সুতালরি গ্রামে দুর্গাগতি রায় নামক একজন লবণ প্রস্তুতকারী ছিলেন। তিনি ঢাকার নায়েব-ই-নাযিম থেকে লবণ প্রস্তুতের সনদ লাভ করে লবণ প্রস্তুত করে প্রভূত বিত্তের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর চিতাভস্মের উপরে এই মঠটি আজ থেকে (১৯৮৩ খ্রিঃ) প্রায় ২৫০ বছর পূর্বে নির্মিত হয়েছিল।[২]



সুতালরী মঠ, বরিশাল

১. "A stone slab attached to a mosque very recently swallowed up by the river (Nalchiti), contains inscriptions in Persian which indicate that in 1732—the date of construction of the mosque—the place (Sutalari) was a flourishing one. The slab is deposited at the Dacca Museum." Bengal District Gazetteers—Bakarganj—by J.C. Jack, 1918, p. 165.

২. "It was also the headquarters of a salt manufacturer, Durgagati Rai, who held a licenc for the manufacture of salt nearly 200 years ago from the

কমলাপুর মসজিদ

কসবা মসজিদের কিছু উত্তরে (কসবা মসজিদ দ্র.) কমলাপুর গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। মসজিদটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এবং এর চারকোণে ৪টি মিনার বা টারেট আছে। টারেটগুলিতে স্ফীতকায় রেখায় (band) অলঙ্করণ আছে। এ গুলি কার্নিসের উপরে উঠেনি। মসজিদের কার্নিসগুলি সরল রেখায় নির্মিত।

মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশপথ আছে। পত্রাকারের খিলানের সাহায্যে নির্মিত প্রবেশ পথগুলি আকারে বড় নয়। এগুলির উপরিভাগে খাঁজকাটা (cusped) আছে। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি মিহরাব। উপরে আছে ৩টি সুন্দর গম্বুজ। মাঝের গম্বুজটি অন্য দুটির চেয়ে আকারে বড়।

মসজিদটি কবে নির্মিত হয়েছিল, তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে এটি যে মোঘল আমলের (খুব সম্ভব শেষ দিকের) কীর্তি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।



▲ কমলাপুর মসজিদ, বরিশাল

কান্নাপুর মিঞা বাড়ি মসজিদ

অনেকটা মুসাখান মসজিদ বা বেগম বাজার মসজিদের মতো (ঢাকা শহরের মুসাখান মসজিদ ও কারতলব খান মসজিদ দ্র.) করে তৈরি এই মসজিদ একটি উঁচু ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে উপরে উল্লিখিত মসজিদ দুটির সঙ্গে এই মসজিদের কিছু পার্থক্য আছে। অন্য দুটির মতো এর উপরে ওঠার সিঁড়ি কোণের দিকে নয়, সামনের দিকের ঠিক মধ্যখানে।

Nawab Nazim of Dacca. There is a big monument, erecled over the ashes of Durgagati Raj, which exists upto this day."—Ibid.



উত্তর কড়াপুর মিঞাবাড়ী মসজিদ, বরিশাল

উপর তলায় মসজিদটি অবস্থিত। এর সামনের দেয়ালে ৩টি দরজা আছে ভিতরে আছে ৩টি মিহরাব। উপরে আছে ৩টি সুন্দর গম্বুজ। মাঝের গম্বুজটি আকারে বড়। এই মসজিদে অনেক মিনার বা টারেট আছে। সামনের দেয়ালে আছে ৪টি বড় মিনার এবং এগুলির ফাঁকে ফাঁকে আছে আরও ৬টি সরু মিনার। মসজিদটি দেখতে ভারী সুন্দর।

এই মসজিদ অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়।

শুজাবাদ দুর্গ

বরিশাল শহর থেকে আনুমানিক ৫মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ঝালকাটি জেলার নলছিটি উপজেলার অধীনে এবং নলছিটি নদীর উত্তর তীরে শুজা'বাদ নামক একটি ছোট গ্রাম আছে। সম্রাট শাহ্জাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান শাহ্ শুজা'র নামানুসারে এ স্থানের নামকরণ হয়েছিল। এই গ্রামে একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। মগ দস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে শাহ্ শুজা' বাঙলার সুবাদার থাকাকালীন (১৬৩৯-৬০ খ্রিঃ) এই দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন বলে ধারণা হয়।

মিঃ জ্যাক জেলা গেজেটিয়ারে (১৬১ পৃ.) যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা থেকে জানা যায় যে, দুর্গটি আয়তাকারে নির্মিত ছিল। চারদিকে ছিল মাটির তৈরি উঁচু বেষ্টনি প্রাচীর এবং চারকোণে ছিল ৪টি উঁচু ঢিবি (mound)। দুর্গের ভিতরে ছিল ৪টি ছোট জলাশয়। চারদিক থেকে ৪টি রাস্তা এসে দুর্গের কেন্দ্রস্থলে মিলিত হত। সেখানেই ছিল শাহ্শুজার নিবাসস্থল। দুর্গপ্রাচীরের বেশির ভাগ এখন ভেঙ্গে গেছে এবং পুকুর গুলি প্রায় মজে গেছে। দুর্গের বেশির ভাগ এলাকা জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়েছে।

কিন্তু হাল আমলে (১৯৭৮ খ্রিঃ) সরেযমিনে তদন্ত করে দেখা গেছে যে, দুর্গটি ছিল প্রায় বর্গাকারে নির্মিত। দুর্গের প্রত্যেক বাহু ছিল প্রায় ১২৩ মিটার লম্বা। দক্ষিণ বাহুর পূর্ব ভাগের কিছু অংশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং বর্তমানে যে অংশটুকু টিকে আছে, তার দৈর্ঘ্য ৯৩ মিটার। পূর্ব দেয়ালের উত্তর ভাগের সামান্য অংশ ছাড়া বাকি সবটুকু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। দক্ষিণ বাহু ১০.৯ মিটার ও উত্তর বাহু ৯.৩ মিটার প্রশস্ত ছিল। পূর্ব ও পশ্চিম বাহুর প্রশস্ততাও প্রায় অনুরূপ ধরনেরই ছিল।

দুর্গের মাঝখানে একটি অনুচ্চ ঢিবি আছে। এটিকে স্থানীয় লোকেরা দুর্গের বুরুজ বলে থাকে। উত্তর-দক্ষিণে ঈষৎ দীর্ঘ এই আয়তক্ষেত্রের আয়তন ১৫.৪৩ মিটার × ১৪.৫৪ মিটার। পশ্চিম দেয়াল থেকে এর দূরত্ব ২৯ মিটার এবং দক্ষিণ দেয়াল থেকে ১৮.১২ মিটার। দূর্গের দেয়ালগুলি বর্তমানে ১ মিটারের বেশি উঁচু নয়।

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, প্রাচীর সহ সমগ্র দুর্গের আয়তন ছিল ১১ একরের চেয়ে সামান্য বেশি। দুর্গের ভিতরে বর্তমানে কোন জলাশয়ের চিহ্ন নেই। খুব সম্ভব এতদিন পরে সেগুলি ভরাট হয়ে গেছে।

মিঃ জ্যাকের মতে সমগ্র শুজাবাদ মৌজার আয়তন ছিল ৭৭ একর এবং মগদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত পাঠান সৈনিকদের পরিবারকে সমস্ত ভূমি নিষ্কর হিসাবে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল।[১]

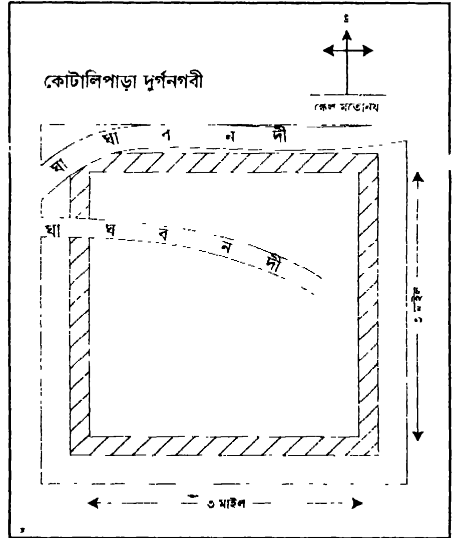
১. "In this village (Shujabad) there are remains of an old fort which appears to have been built by Shah Suja when he was Viceroy of Bengal and had to defend the country against the incursions of Burmese Maghs. The fort was rectangular and surrounded by an earthen wall with mound at each corner. Inside were four small tanks and in the centre of the inner space where the four roads met, was the prince's dwelling house. The greater part of the wall has fallen into the river, the tanks are nearly dried up and the greater portion of the grounds are covered with jungle. The area of the whole village is only 77 acres and there is a document in the collectorate record-room showing that it was given rent-free by Shah Suja to the families of some Pathans who had fallen in battle against the Maghs."—Bengal District Gazetteers—Bakarganj. by J. C. Jack, 1918. p. 161.

গোপালগঞ্জ জেলা

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ

কোটালিপাড়া দুর্গনগরী

গোপালগঞ্জ জেলার অধীনে এবং গোপালগঞ্জ শহর থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত কোটালিপাড়া উপজেলায় একটি অতি প্রাচীন দুর্গনগরীর ধ্বংসাবশেষ আছে। এই দুর্গনগরী ঘরঘরা বা ঘাঘর নদীর বাম তীরে অবস্থিত। নদীর একটি ছোট শাখা দুর্গনগরীর ভিতর দিয়েও প্রবাহিত আছে।



বর্গাকারে নির্মিত এই দুর্গের প্রত্যেক বাহু প্রায় ৫ কিলোমিটার দীর্ঘ। মাটির তৈরি চারদিকের দেয়াল ছিল পাহাড়ের মতো উঁচু। এখন (১৯৭৮ খ্রিঃ) দেয়ালের উচ্চতা অনেক কমে গেলেও তা পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে ৪ মিটার থেকে ৬ মিটার উঁচু। দেয়ালগুলি প্রায় ৬০ মিটার প্রশস্ত। তবে পশ্চিম দিকের দেয়াল প্রায় ৭৭ মিটার চওড়া। দেয়ালের বাইরেই ছিল প্রায় ৩০ মিটার চওড়া গভীর পরিখা। ঘরঘরা নদীর সঙ্গে সংযুক্ত পরিখাগুলি এক সময়ে নদীর চেয়েও গভীর ছিল এবং তাতে বারমাস নৌচলাচল সম্ভব ছিল।

বর্তমান কালে পরিখাগুলি প্রায় মজে গেছে। মজে যাওয়া অংশে এখন বোরো ধানের চাষ হয়। তবে পরিখার চিহ্ন এখনও বিলুপ্ত হয়নি। উত্তর দেয়ালের বাইরের দিকের পরিখা এখনও খালের আকারে টিকে আছে এবং তাতে জোয়ার-ভাটা খেলে। অন্য তিন দিকের পরিখাতে বর্তমানে বোরো ধানের আবাদ চলে।

দুর্গের প্রাচীরগুলি এখনও বেশ ভালভাবেই টিকে আছে। তবে আগের উচ্চতা নেই। বহুকাল ধরে চারদিকের প্রাচীর গুলিতে জনবসতি আছে। ফলে এগুলিকে দুর্গ প্রাচীর বলে সহজে চেনা যায় না। প্রায় ১৯ কিলোমিটার লম্বা দেয়ালগুলিতে শুধু গ্রামের পর গ্রামই দেখা যায়। সেখানে আছে ব্রিটিশ আমলের ইমারতাদি ও সেগুলির

ধ্বংসাবশেষ, হাল আমলের দালান কোঠা, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, বাড়িঘর, গাছ-গাছড়া, বাঁশঝাড় ইত্যাদি ইত্যাদি। দেশ বিভাগের আগে দুর্গের পাড়গুলিতে অসংখ্য দালান-কোঠা ছিল এবং সেগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটাই ছিল বিরাট আকারের এবং একাধিক তলবিশিষ্ট। বর্তমানে সে সব ইমারতের বেশিরভাগ ধ্বংস হয়ে গেছে এবং যাচ্ছে। সেগুলির স্থানে বিশেষ করে পশ্চিম পাড়ে অনেক সরকারি ইমারত গড়ে উঠেছে এবং উঠছে।

দুর্গনগরীর অভ্যন্তর ভাগের অবস্থা দেখে বেশ তাজ্জব হতে হয়। প্রায় সমগ্র দুর্গনগরীর ভিতরের অংশ এখন নিম্নভূমি, অধিকাংশ এলাকা জলাভূমি। কোনো কোনো অংশে চৈত্র-বৈশাখেও পানি থাকে। আগে এসব স্থান আরও গভীর ছিল বলে স্থানীয় বৃদ্ধ লোকদের কাছ থেকে জানা যায়। বর্তমানে পলি পড়ে দুর্গ নগরীর অধিকাংশ ভূমি বোরো ধান চাষের যোগ্য হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ নিম্নভূমিতে এখনও হালচাষ করা যায় না, করতে গেলে গরুর পা গভীর কাদায় দেবে যায়। কৃষকেরা কলা গাছ দিয়ে ঠেলে ঠেলে কোনো রকমে জলজ জঙ্গল সাফ করে বোরো ধানের চাষ করেন।

চারদিকের বিশেষ করে পশ্চিম দিকের প্রাচীরের ধারেকাছের জমি বর্তমানে এত নিচু নয়। সে সব অপেক্ষাকৃত উঁচু এলাকায় বেশ কয়েকটি গ্রামের অস্তিত্ব বহুকাল ধরে আছে। এগুলির মধ্যে উনশিয়া একটি উল্লেখযোগ্য গ্রাম। এ গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রখ্যাত কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯৪৭ খ্রিঃ ১৩ মে) ৫৯ বছর আগে প্রয়াত।

দুর্গনগরীর কোথাও তেমন কোনো প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় না। তবে বর্তমান হাসপাতাল এলাকার কিছু দক্ষিণে পশ্চিম প্রাচীরের পশ্চিম সীমানার পরিখার কাছাকাছি স্থানে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে একটি গর্ত খোঁড়ার সময় কিছু প্রাচীন ইট বের হয়ে পড়ে। ইটগুলি গুপ্ত যুগের বলে মনে হয়। তবে ইটের সংখ্যা খুব বেশি নয়। দুর্গের ভিতরে পশ্চিম দেয়ালের কাছাকাছি স্থানে এক পুকুরে একটি নাগকাষ্ঠ দেখা গেছে। নাগকাষ্ঠটি কয়েকশ' বছর আগেকার হতে পারে। এখানে কোনো খনন কার্য হয়নি। কাজেই খনন না করে এ স্থানের কোনো প্রাচীন কীর্তির অস্তিত্বের কথা কিছুই বলা যায় না।

কোটালিপাড়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ৫ খানা, বর্ধমান (ভারত) জেলায় মল্লসারুল গ্রামে ১ খানা ও বালেশ্বর জেলার (উড়িষ্যা, ভারত) জয়রাম পুরে প্রাপ্ত ১খানা, এই মোট ৭খানা তাম্রলিপি এবং কতগুলি মুদ্রা থেকে জানা যায় যে, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য, সমাচারদেব, পৃথুবীর ও সুধন্যাদিত্য নামক পাঁচজন পরাক্রমশালী নৃপতি কোটালিপাড়া থেকে আরম্ভ করে সুদূর উড়িষ্যা পর্যন্ত এক বিরাট ভূখণ্ডে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁদের মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি অভিধা এবং রাজ্যের বিস্তার দেখে অতি সহজেই ধারণা করা যায় যে, তাঁরা শুধু স্বাধীন সার্বভৌম নন, সম্রাট জাতীয় নৃপতি ছিলেন।

তাঁদের বিভিন্ন তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, বর্তমানে কোটালিপাড়া নামে পরিচিত দুর্গনগরীর নাম ছিল খুব সম্ভব চন্দ্রবর্মা কোট। চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত মহারাজ সিংহবর্মার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করে বাঙলা অধিকার

করেছিলেন। পণ্ডিতদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, চতুর্থ শতাব্দীর এই চন্দ্রবর্মার সঙ্গে আলোচ্য কোটালিপাড়া দুর্গ নগরী সম্পৃক্ত ছিল। এমতে চতুর্থ শতাব্দীর পরে কোটালিপাড়া দুর্গনগরী নির্মিত হয়নি।

এমত গ্রহণ করার পিছনে যথেষ্ট যুক্তিও আছে। কোটালিপাড়া ও পার্শ্ববর্তী গ্রামে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও স্কন্ধগুপ্তের বহু মুদ্রা পাওয়া গেছে। এতে ধারণা করা যায় যে, এ স্থান গুপ্ত সম্রাটদের রাজ্যভুক্ত ছিল এবং চন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করে তাঁরা এ স্থান অধিকার করেছিলেন। গুপ্তদের পরে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব প্রভৃতি নৃপতির অধিকারে এ স্থান ছিল। তাঁদের তাম্রশাসনগুলিতে চন্দ্রবর্মা কোটের উল্লেখ দেখা যায়। গোপচন্দ্রের পরে এ স্থানের আর কোনো উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না।

এখন প্রশ্ন জাগে, একটি বিলের চারদিকে এত বিরাট আকারের দুর্গপ্রাচীর ও পরিখা নির্মাণ করা হয়েছিল কেন? বর্তমান কালে বিল যে কিছুটা ভরাট হয়ে আসছে, সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। স্থানীয় বৃদ্ধলোকদের কাছ থেকে জানা গেছে যে, একশ বছর আগেও দুর্গের ভিতরের বিলে বারমাস নৌকা চলাচল করত এবং সেখানে চাষবাস করার কোনো প্রশ্নই উঠতনা। এত বড় একটি বিলের চারদিকে এত অর্থ ব্যয় করে পাহাড়ের মত উঁচু ও ৬০ থেকে ৭০ মিটার প্রশস্ত প্রাচীর নির্মাণ ও প্রাচীর সংলগ্ন ৩০ মিটার প্রশস্ত পরিখা খনন করার কি সার্থকতা ছিল, তা খুঁজে বের করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। ব্রিটিশ আমলে কোটালিপাড়াকে কেন্দ্র করে প্রায় ৮০ বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে ছিল বিল এলাকা এবং এই বিলের নাম ছিল কান্দিবিল। বর্তমান কালে কোটালিপাড়ার পার্শ্ববর্তী ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, বরিশাল জেলার পশ্চিম-উত্তরাঞ্চল, যশোহর জেলার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও খুলনা জেলার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এক বিরাট এলাকা নিয়ে এই নিম্নভূমি গঠিত। চৈত্রমাসেও এই এলাকার অনেক স্থানের পানি শুকায়না এবং এ সময়ে এই এলাকার অনেক উঁচু স্থানেও জোয়ারের পানি ওঠে।

এত বড় দুর্গনগরীতে অসংখ্য লোক-লশকর, হাতি-ঘোড়া ইত্যাদি থাকার কথা। সেই সঙ্গে এ দুর্গনগরীর চারদিকে ঘনবসতিও থাকার কথা। প্রয়োজনের সময়ে অসংখ্য নদীনালা বিল-ঝিল পরিবেষ্টিত এই নিম্নভূমি থেকে অন্যত্র যাতায়াত ছিল এক বিরাট সমস্যা। আর বাঙলায় অসংখ্য উঁচুভূমি ও শুষ্ক স্থান থাকতে চন্দ্রবর্মা, সমুদ্র গুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য, সমাচার দেবের মত নৃপতিরা কেন এই নিম্ন ভূমিতে প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপন করবেন, তাও এক বিরাট প্রশ্ন।

এই প্রশ্নের উত্তরে ডক্টর নলিনী কান্ত ভট্টশালী বলেছেন যে, এস্থান সে সময়ে নিম্নভূমি ছিল না, পরবর্তীকালে প্রাকৃতিক কারণে যথা ভূমিকম্পে জলাভূমিতে পরিণত হলে এ স্থান পরিত্যক্ত হয়।[১] এই মত খুবই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। আমরা এই

"There is ample evidence to prove that this part of the country suffered in remote antiquity from a general subsidence, due most probably to a great earthquake. This event can be dated on the evidence of the plates in the last quarter of the 6th century A.D. The vicinity of Chandra-Varman's

অঞ্চল পরিদর্শন করে যা দেখেছি, তাতে কিছুতেই ধারণা করা যায় না যে, বর্তমান অবস্থায় কোটালিপাড়াতে কোনো প্রশাসনিক কেন্দ্র বা দুর্গনগরী থাকার মত স্থান এটি ছিল। এ ধরনের আরও একটি দুর্গ (অনেক ছোট) দেখা যায় রংপুর জেলার সাতগড়াতে (সাতগড়া দ্র.)।

'কোট' অর্থাৎ 'চন্দ্রবর্মাকোর্ট' থেকে কোটালিপাড়া নামকরণ হয়েছিল বলে অনেকে বলে থাকেন। এ স্থানে অসংখ্য ব্রাহ্মণের বসতি ছিল এককালে। এঁদের মধ্যে বৈদিক ব্রাহ্মণের সংখ্যাই ছিল বেশি। ব্রিটিশ আমলে এই বৈদিক ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যই ছিল এখানে বেশি এবং তাঁদের অনেকেই ছিলেন জমিদার। অন্যান্য শ্রেণীর (রাঢ়ীয়, বরেন্দ্র প্রভৃতি) ব্রাহ্মণের অস্তিত্বও এখানে ছিল। কোটালিপাড়ায় একটি জনপ্রবাদ আছে, '২২০০ ব্রাহ্মণ ২৩০০ আড়া, তাই নিয়ে কোটালিপাড়া'। বর্তমানে অর্থাৎ দেশ বিভাগের পর থেকে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণ হিন্দুদের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত, প্রায় নেই বললেও চলে।

এই ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য অধিবাসীদের অনেকেরই বসতি ছিল দুর্গ প্রাচীরের উপরে। খুব সম্ভব প্রাকৃতিক কারণে দুর্গের অভ্যন্তর ভাগ নিম্নভূমিতে পরিণত হলে পরবর্তীকালে দুর্গ প্রাচীরে বসতি গড়ে উঠেছিল।

মুসলিম আমল

ননীক্ষীর প্রাচীন মন্দির ও উজানী গ্রাম

গোপালগঞ্জ জেলার মকসুদপুর থানার অন্তর্গত এবং থানা থেকে প্রায় ৮ মাইল দক্ষিণ-পূর্বদিকে এবং টেকেরহাট থেকে প্রায় ৫ মাইল পশ্চিম-উত্তর দিকে ননীক্ষীর নামক একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। এখানে একটি প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। মন্দিরে অনেক দেব-দেবীর মূর্তি ছিল। মন্দিরটি প্রায় ৫০০ বছর আগে নির্মিত হয়েছিল বলে স্থানীয় লোকেরা বলেন। এ সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছুই বলা সম্ভব নয়। কারণ মন্দিরের বিশেষ কিছুই এখন আর টিকে নেই। তবে এই মন্দির ৫০০ বছর আগের হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। ননীক্ষীরের পাশের গ্রামই প্রাচীন উজানী ছিল বলে জানা যায়। সে গ্রাম থেকে একটি অতি প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কার করা হয়েছিল বহুকাল আগে। মূর্তিটি এখন ঢাকা যাদুঘরে আছে। এটি পালযুগের তো বটেই, এর আগেরও হতে পারে।

fort began to be water-logged and unfit for habitation. The headquarters of the locality had to be moved north on more stable land and the people also migrated there."—Iconography of the Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca museum. p.2.—Dr. N.K. Bhattasali.

মাদারিপুর জেলা

মুসলিম আমল

পাতরাইল মসজিদ

গ্রামের নাম পাতরাইল। ভাঙ্গা থানার অধীনে এবং থানা থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে এবং শিবচর থানা থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে এস্থান অবস্থিত। এখানে একটি প্রাচীন জলাশয় আছে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ও আনুমানিক ৪২৬ মিটার x ৩০৩ মিটার আয়তন বিশিষ্ট এ জলাশয়কে স্থানীয় লোকেরা বলেন 'বড় দিঘি'।

দিঘির পশ্চিম পাড়ে অনুচ্চ প্রাচীর ঘেরা স্থানে সুলতানী আমলের একটি পাকা কবর আছে। লোকে বলেন মজলিস আউলিয়ার মাযার। মজলিস আউলিয়ার প্রকৃত নাম নাকি ছিল মজলিস আবদুল্লাহ খান। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরই মাযারের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। এখানে একখণ্ড কাল পাথর আছে। প্রতিদিন অসংখ্য লোক এ পাথরে দুধ ঢালেন তাদের মানত হাসিলের জন্য। প্রাচীরঘেরা মাযারের বাইরেও অনেক পাকা কবর আছে, এগুলির সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ। বেশির ভাগ কবরই প্রাচীন আমলের।



▲ পাতরাইল মসজিদ

মাযারের সামান্য উত্তর-পূর্ব দিকে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ এখনও টিকে আছে। লোকে বলে পাতরাইল মজলিস আউলিয়ার মসজিদ। এটি ছিল এক বিরাট ইমারত। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ মসজিদের বাইরের দিকের মাপ ছিল ২৫.৪৫ মিটার × ১২.৫৭ মিটার। ভিতরের দিকে ১২.২৮ মিটার × ৮.২৯ মিটার। চারকোণে ছিল ৪টি মিনার বা টারেট। অষ্টকোণাকৃতির মিনারগুলি মসজিদের ছাদের উপরে উঠেনি। এর কার্নিস ও প্যারাপেট ছিল বেশ বাঁকানভাবে (curved) নির্মিত। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ৫টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ২টি করে প্রবেশপথ ছিল। পত্রাকারের খিলানের সাহায্যে নির্মিত ছিল প্রবেশপথগুলি। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে ছিল ৫টি অলঙ্কৃত মিহরাব। মসজিদের দেয়ালগুলি ছিল প্রায় ২.১২ মিটার প্রশস্ত।

মসজিদের ভিতরে ছিল ৪টি প্রস্তরস্তম্ভ। অধ্যাপক দানীর মতে এগুলি ছিল ইষ্টক নির্মিত স্তম্ভ। এই ৪টি স্তম্ভ ও চারপাশের দেয়ালের উপর নির্মিত হয়েছিল উপরের ১০ টি গম্বুজ। এগুলি ছিল অর্ধগোলাকার। গম্বুজগুলি এখন (১৯৮৩ খ্রিঃ) আর টিকে নেই, বহু আগেই সেগুলি পড়ে গেছে। চারদিকের দেয়াল নড়বড়ে অবস্থায় এখনও দাঁড়িয়ে আছে। মসজিদের ভিতরে ও বাইরে পড়ে আছে অজস্র ইট ও পাথর।

এই মসজিদের সামনের দেয়ালের বাইরের দিকে (facade) এবং ভিতরে মিহরাবগুলিতে প্রচুর অলঙ্করণ ছিল পোড়ামাটির চিত্রফলকের সাহায্যে। চিত্রফলকগুলি ছিল অভিনব ধরনের। গতানুগতিকতার আশ্রয় না নিয়ে এগুলিতে স্থানীয় লতাপাতা ও ফুলের প্রতিকৃতির প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল।

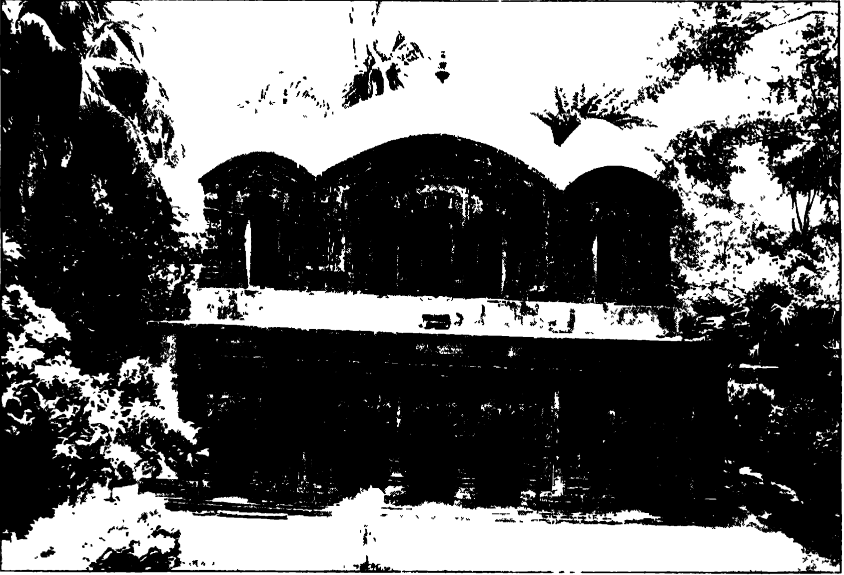
মসজিদে কোনো শিলালিপি পাওয়া যায়নি। স্থানীয় লোকেরা এটি মজলিস আউলিয়ার মসজিদ বলে অভিহিত করেন। মসজিদের গঠনপ্রণালী, কলাকৌশল ও অলঙ্করণের নমুনা দেখে পণ্ডিতেরা এটিকে আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ্‌র আমলের মসজিদ বলে মনে করেন।

মসজিদের উত্তর দিকে কয়েক বিঘা উঁচু ভূমি আছে। সেখানে বর্তমানে কোনো ইমারতের ধ্বংসাবশেষ নেই। কিন্তু মাটির নিচে প্রচুর ইট পাওয়া যায়। এস্থানে প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে এক বা একাধিক ইমারতের অস্তিত্ব ছিল বলে মনে হয়। কালক্রমে সেগুলি ধ্বংস হয়ে গেলে খুব সম্ভব সুলতানী আমলে এখানে একটি জনপদ গড়ে ওঠে এবং আলোচ্য মসজিদটিও নির্মিত হয়। মসজিদ ও মাযারে ব্যবহৃত পাথর খুব সম্ভব সেই সব ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের। সামনের দিঘিটিও খুব সম্ভব প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের। মসজিদটি পরে ১০ গম্বুজ মসজিদ হিসাবে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

খালিয়া জোড়বাঙলা মন্দির

রাজৈর থানার অন্তর্গত এবং থানা থেকে প্রায় প্রায় ৪ মাইল পশ্চিম এবং টেকের হাট থেকে প্রায় এক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল আয়তাকারে নির্মিত দ্বিতল বিশিষ্ট মন্দিরটি। নিচের তলে ৬টি কক্ষ এবং উপর তলায় আছে খোলা বারান্দা ছাড়া ৩টি কক্ষ। ধনুকাকৃতির খিলানের সাহায্যে নির্মিত নিচের তলার সামনের দেয়ালের যে ৫টি প্রবেশ পথ (porch) আছে সেগুলি আকারে বেশ বড় ছিল। উপরে ছোট গৃহের প্রত্যে

সামনের দেয়ালে আছে ১টি করে প্রবেশপথ। এই ৫টি প্রবেশ পথই অপেক্ষকৃত সরু। মন্দিরের উপরে যে ছাদ আছে তা অভিনব ধরনের।



▲ খালিয়া জোড়বাংলা মন্দির, ফরিদপুর

প্রধান গৃহের উপরের পাকা ছাঁদটি বাংলাদেশের দোচালা ঘরের চালের আকারে নির্মিত লম্বালম্বিভাবে। এই লম্বালম্বি ছাদের দু'পাশে আড়াআড়িভাবে নির্মিত হয়েছে আরও দুটি দোচালা ঘরের চালের মতো পাকা ছাদ। প্রধান কক্ষের পাশের দুটি ছোট কামরার উপর নির্মিত এই দুটি ছাদ আড়াআড়িভাবে নির্মিত। এতে দেখা যচ্ছে যে, ৩টি দোচালা ঘরের ছাদকে লম্বালম্বি ও আড়াআড়িভাবে যোগ করে এই মন্দিরের ছাদ নির্মাণ করা হয়েছে। গতানুগতিক জোড়বাঙলা ধরনের ছাদ নির্মাণ না করে এখানে নতুনত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং তাতে মন্দিরের সৌন্দর্য অসম্ভব রকমে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মন্দিরের দেয়ালে অতি সুন্দর পোড়ামাটির চিত্রফলক ছিল। তাতে রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদির কাহিনী তুলে ধরা হয়েছিল। সামনের দেয়ালে বিভিন্ন প্যানেলিং-এর অলঙ্করনের মধ্যে এসব চিত্রফলকগুলি ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের বিখ্যাত জমিদার রাজারাম রায় বাহু অর্থ ব্যয়ে এবং বহু যত্নে এই অপূর্ব মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর কর্তৃক সংরক্ষিত হলেও বহু দিনের সংস্কারের অভাবে মন্দিরটির অবস্থা বর্তমানে খুবই জীর্ণ।

ফতেহজংপুর তোরণ

মাদারীপুর জেলার নড়িয়া থানার অধীনে ফতেজঙপুর গ্রামে মোঘল আমলে নির্মিত একটি বিরাট তোরণের ধ্বংসাবশেষ আছে। সম্রাট আকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহ

বাঙলার বার ভূঁইয়াদের অন্যতম কেদার রায়কে পরাজিত করে এই বিজয়তোরণ নির্মাণ করেছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে। যুদ্ধে জয় লাভের কারণে তিনি এ স্থানকে ফতেজঙপুর নামকরণও নাকি করেছিলেন। বিরাট আকারের তোরণটি এখন অতি জীর্ণ অবস্থায় আছে।

বিজয় তোরণটি উত্তর-দক্ষিণে ৩মিটার লম্বা এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১.২৫ মিটার চওড়া। এর উচ্চতা ৩.৩৫ মিটার। তোরণটি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে এর মধ্যে কোন্ ধরনের খিলান ছিল তা পরিষ্কারভাবে বোঝা না গেলেও মোঘলদের রীতি অনুসারে এতে চারকেন্দ্রিক খিলান ছিল বলে ধারণা করা যায়। উত্তর ও দক্ষিণ উভয় পার্শ্ব থেকেই তোরণে ওঠার ব্যবস্থা যে ছিল তা এখনও বোঝা যায়।

এই বিজয় তোরণের প্রায় ১০ মিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে আয়তাকারে একটি নির্মিত জীর্ণ ইমারত আছে। এর বাইরের দিকের আয়তন প্রায় ৭.৩০ মিটার × ৩.২০ মিটার। ইমারতের উপরে ফ্ল্যাটভোল্টেড ছাদ ছিল। সেই ছাদ ও পশ্চিম দেয়ালের বেশির ভাগ এখন পড়ে গেছে। টিকে থাকা ক্ষতিগ্রস্ত অংশ দেখে বোঝা যায় যে, পশ্চিম দেয়ালে তিনটি খিলানবিশিষ্ট দরজা ছিল। এই ইমারতের দক্ষিণ দেয়ালের বাইরের দিকে একটি সিঁড়ি আছে। এ সিঁড়ির সাহায্যে ইমারতের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে ছাদে ওঠা যায়। এই সিঁড়ির নিচে একটি ছোট গোপন কক্ষ আছে এবং এর মাঝখানে আছে একটি সুগভীর সুড়ঙ্গ। এই গোপন কক্ষ খুব সম্ভব সামরিক অস্ত্রভাণ্ডার হিসাবে ব্যবহৃত হত। এখন ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করা যায় না।

এই ইমারত থেকে প্রায় ৫০ মিটার উত্তরে আর একটি ইমারত আছে এবং এর বাইরের দিকের আয়তন ছিল ৫.৩০মিঃ × ৪.৯০ মিটার। এর ছাদ ছিল ফ্লাট-ভোল্টেড। এই ইমারত বর্তমানে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত।

এই ইমারত থেকে প্রায় ৫০ মিটার উত্তরে আরও একটি ইমারত ছিল। প্রায় ভগ্ন প্রাপ্ত এই ইমারতের আয়তন ছিল ৫.৩০ মিটার × ৪.৯০ মিটার এবং উপরের ছাদ ছিল ফ্লাট ভল্টেড। এর দক্ষিণ দেয়ালের মাঝখানে একটি খিলানবিশিষ্ট দরজার অস্তিত্ব এখনও (২০০০ খ্রিঃ) দেখা যায়।

উপরে উল্লিখিত ইমারতের প্রায় ৬০ মিটার উত্তর পুবে একটি পুকুরের পাড়ে আর একটি ইমারত দেখা যায়। ক্ষতিগ্রস্ত এই ইমারতের আয়তন ছিল ৬.৫০ মিটার × ৩.৭০ মিটার এবং এর ছাদ ছিল ফ্লাট ভোল্টেড। এই ইমারতের পশ্চিম দেয়ালের মধ্যভাগে একটি খিলান বিশিষ্ট দরজা আছে। ইমারতের ছাদে বটগাছ ও অন্যান্য গাছ জন্মানোর ফলে বেশ কয়েকটি ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে।*

এই বিজয়তোরণ ও অন্যান্য ইমারতের বর্ণনার জন্য আমি প্রত্নতত্ত্ব দফতরের প্রাক্তন উপপরিচালক জনাব আবুল হাসেম মিঞার কাছে ঋণী।

ফরিদপুর জেলা

মুসলিম আমল

সাতৈর মসজিদ

বোয়ালমারি উপজেলা অধীনে, উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার উত্তরে এবং ফরিদপুর জেলা সদর থেকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত সাতৈর একটি প্রাচীন স্থান। এখানে প্রাচীন কালে একটি উল্লেখযোগ্য জনপদের অস্তিত্ব ছিল এবং প্রাচীন ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষের বেশ কিছু চিহ্ন এখানে দেখা যায়।

এখানে একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। বর্গাকারে নির্মিত এ মসজিদের প্রত্যেক বাহু বাইরের দিকে ১৮.৬৩ মিটার ও ভিতরের দিকে ১৬.৫১ মিটার লম্বা। দেয়ালগুলি প্রায় ২.১২ মিটার প্রশস্ত। মসজিদের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ৩টি করে প্রবেশপথ আছে এবং ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি মিহরাব। মসজিদের চারকোণে আছে ৪টি অষ্টকোণী মিনার বা টারেট (turret)।

মসজিদের ভিতরে আছে ৪টি প্রস্তরস্তম্ভ। এই স্তম্ভ ও চারপাশের দেয়ালের উপর নির্মিত হয়েছে উপরের ৯টি গম্বুজ।

সংস্কারের অভাবে মসজিদটি বহুকাল ধরে জীর্ণ অবস্থায় পড়েছিল। হাল আমলে এটিকে প্রায় নতূন করে নির্মাণ করা হয়েছে। তবে এর ভিতরের আদি রূপ এখনও নষ্ট হয়নি। বাইরের দিকে দেয়ালে, টারেটে এবং গম্বুজে অনেক নতুনত্বের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এগুলি দেখে এটিকে প্রাচীন মসজিদ বলে চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। এটি এ জেলার প্রাচীনতম মসজিদ বলে মনে হয়। খান-ই-জাহানের বাগের হাটের ও মসজিদ কুড়ের নয় গম্বুজ মসজিদ দুটি এবং বরিশাল জেলার কসবার নয় গম্বুজ মসজিদের সমসাময়িক বলে এটিকে মনে হয় এর গঠনকৌশল দেখে।

সমগ্র বাংলাদেশে সুলতানি আমলের যে চারটি নয়গম্বুজ মসজিদ এখন (২০০৬ খ্রিঃ) পর্যন্ত টিকে আছে সেগুলির মধ্যে এটি অন্যতম।

মধুখালী-গোপালপুর মন্দির

বোয়ালমারী থানার অধীনে মধুখালীতে (বর্তমানে থানা) একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। এককালে মন্দিরটি দেখতে ভারী সুন্দর ছিল। মন্দিরগাত্রে ছিল অতি মনোরম প্যানেলিং-এর কাজ। আর ছিল পোড়ামাটির অতি সুন্দর চিত্রফলক। মন্দিরটি কবে নির্মিত হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও এটি মোঘল আমলের শেষ দিকে নির্মিত হয়েছিল বলে ধারণা হয়। মন্দিরটি অতি জীর্ণ অবস্থায় এখনও কোনো রকমে টিকে আছে।

রাজবাড়ি জেলা

মুসলিম আমল

নলিয়া জোড়বাংলা মন্দির

রাজবাড়ি জেলার বালিয়াকান্দি থানার অধীন নলিয়া নামক একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। নলিয়া রেলস্টেশন থেকে প্রায় দেড় মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত এই গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। এটি ছিল একটি জোড়বাঙলা মন্দির এবং দুটি দোচালা ঘরের চালকে সংযুক্ত করে মন্দিরের পাকা ছাদ নির্মাণ করা হয়েছিল (পাবনা জোড় বাঙলা মন্দির দ্রঃ)। মন্দির গাত্রে অতি সুন্দর পোড়ামাটির চিত্রফলক ছিল। মোঘল আমলের শেষ দিকে নির্মিত মন্দিরটি সংস্কারের অভাবে বর্তমানে অতি জীর্ণ অবস্থায় আছে।

মথুরাপুর দেউল

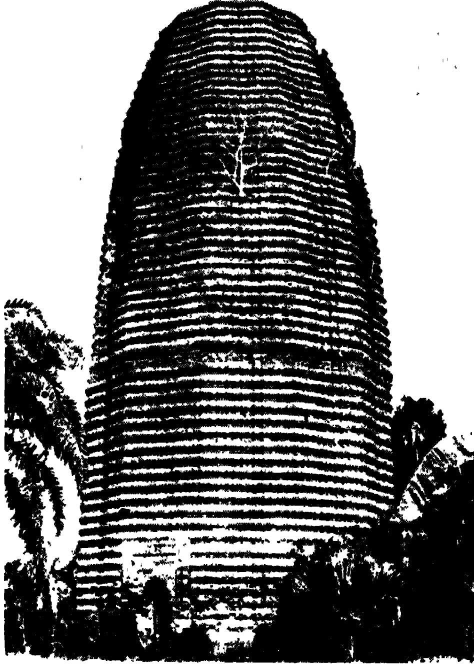
বালিয়াকান্দি থানার অধীনে থানা থেকে প্রায় ৭ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ফরিদপুর শহর থেকে প্রায় ২২ মাইল পশ্চিমে এবং মধুখালী থেকে মাইল দেড়েক উত্তরে মথুরাপুর গ্রামে একটি অপরূপ কীর্তি আছে। এটি মথুরাপুর দেউল বা মঠ নামে পরিচিত।

বারকোণ বিশিষ্ট এই মঠ এদেশের মন্দির শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। প্রায় ৩ মিটার পর্যন্ত সোজা উপর দিকে ওঠার পর মঠটি সামান্য সরু হয়ে উপরের দিকে উঠেছে। কিন্তু এর চূড়া এখন সমতল এবং মাটি থেকে এখনও প্রায় ২১.২ মিটার উঁচু। আগে এটি আরও উঁচু ছিল বলে জানা যায়।

মঠের ভিতরে আছে একটি ছোট কক্ষ। দক্ষিণ দেয়ালে আছে সেই কক্ষের একটি মাত্র প্রবেশপথ। অর্ধগোলাকার খিলানের সাহায্যে নির্মিত এই প্রবেশপথটি অপেক্ষাকৃত নিচু এবং এর উপরের অংশে খাঁজকাটা আছে। ভিতরের কক্ষে কোনো বিগ্রহ নেই, ছিল বলেও প্রমাণ পাওয়া যায় না। এটি কোনো মন্দির ছিল বলে মনে হয় না।

এই মঠ কে নির্মাণ করেছিলেন, সে সম্পর্কে কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। ফরিদপুর-যশোহর জেলার এই অঞ্চলে একটি জনপ্রবাদ আছে যে, রাজা প্রতাপাদিত্যকে যুদ্ধে পরাজিত করে সম্রাট আকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহ এই বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। মানসিংহের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের কোনো যুদ্ধ হয়েছিল এবং সেই যুদ্ধে মানসিংহ জয়লাভ করেছিলেন, এমন কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রামাণ্য ইতিহাসে পাওয়া যায় না। প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ হয়েছিল সুবাদার ইসলাম খানের আমলে সুবাদারের ভ্রাতা

এনায়েত খানের (গিয়াস খান) সঙ্গে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে এবং সেই যুদ্ধে প্রতাপ পরাজিত ও বন্দি হয়েছিলেন এবং দিল্লীতে তাঁকে নিয়ে যাবার কালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। রাজা মানসিংহ এর অনেক আগে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে বাঙলা ছেড়ে চলে যান এবং কিছুদিন পর তিনি মারা যান।



মথুরাপুর দেউল, ফরিদপুর

মানসিংহ কোনোদিন ফরিদপুর-যশোহরের এই অঞ্চলে এসেছিলেন বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পুত্র দুর্জন সিংহ যখন ভূষণা দুর্গ অধিকার করেন তখন মানসিংহ প্রথমে শেরপুর ও পরে ঘোড়াঘাটে ছিলেন। সে সময়ে বা মানসিংহের আমলে প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে মোঘলদের কোন যুদ্ধ হয় নি। কাজেই মানসিংহ এই কীর্তি স্থাপন করেছিলেন, একথা মেনে নেওয়া যায় না।

সপ্তদশ শতাব্দীতে সংগ্রামসিংহ নামক একজন ফৌজদার ভূষণাতে ছিলেন। তিনি বহুকাল ধরে এই অঞ্চলের ফৌজদার ছিলেন বলে জানা যায়। যশোর ফরিদপুরের আর একটি জনপ্রবাদ মতে এই সংগ্রামসিংহ মথুরাপুর দেউল নির্মাণ করেছিলেন।

এই অপূর্ব মঠটি সপ্তদশ শতাব্দীর বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ
মুন্সিগঞ্জ জেলা

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ

বিক্রমপুর

বিক্রমপুর একটি অতি প্রাচীন স্থান। আগের কথা সঠিকভাবে বলা না গেলেও চন্দ্র ও সেন বংশীয় নৃপতিদের রাজধানী বংশানুক্রমিকভাবে এখানে যে ছিল, সে সম্পর্কে যথেষ্ট প্রত্নপ্রমাণ আছে। চন্দ্রদের আগেও খুব সম্ভব এখানে বহু নৃপতির রাজধানী ছিল। সেনদের পরেও বেশ কয়েকজন হিন্দু নৃপতির রাজধানী এখানে ছিল বলে ধারণা হয়। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক এখানে সেন বংশীয় নৃপতিদের ছাড়া অন্য কোনো রাজা বা রাজবংশের তেমন কোনো কীর্তির ধ্বংসাবশেষ চিহ্নিত করা যায়নি। অবশ্য সমগ্র এলাকায় অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে এখানে-সেখানে অসংখ্য প্রাচীন ইট ও প্রাচীন মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ। সেগুলিই খুব সম্ভব বিভিন্ন রাজা ও রাজবংশের কীর্তির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন। এখানে অসংখ্য মূর্তিও পাওয়া গেছে। আর সারা বিক্রমপুরে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য প্রাচীন জলাশয়।

বিক্রমপুর বলতে বর্তমানে একটি বিরাট এলাকাকে বোঝায়। উত্তরে ধলেশ্বরী-কালিগঙ্গা নদী এবং দক্ষিণে পদ্মা নদী বেষ্টিত ভূ-ভাগের যে অংশ মুন্সীগঞ্জ জেলার অন্তর্গত তার প্রায় সবটাই বর্তমানে বিক্রমপুর নামে মোটামুটিভাবে পরিচিত। আগেকার দিনে বিক্রমপুরের আয়তন খুব সম্ভব আরও অনেক সংক্ষিপ্ত ছিল। সেই বিক্রমপুর ছিল খুব সম্ভব একটি অতি সমৃদ্ধিশালী জনপদ। এই নগরীর আয়তন এককালে ২৩ বর্গকিলোমিটার ছিল বলে ডক্টর ভট্টশালী অনুমান করেন এবং তাঁর মতে এই নগরীর উত্তর দিকে ছিল ইছামতী নদী। উত্তরদিকে বর্তমানে ইছামতী মরে গিয়ে ধলেশ্বরীর সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। এ নগরীর পূর্বদিকে ছিল ব্রহ্মপুত্র নদী, পশ্চিমে ছিল মীরকাদিম খাল ও দক্ষিণে ছিল মাকুহাটি খাল। প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন দেখে ধারণা হয় যে, মীরকাদিম খালের অনেক পশ্চিমে এ নগরীর পশ্চিম সীমানা প্রসারিত ছিল এবং তা ছিল খুব সম্ভব সেন আমলেও।

বল্লালবাড়ি

রামপাল দিঘির সামান্য উত্তরে বল্লালবাড়ি অবস্থিত। বর্তমানে নদী (ধলেশ্বরী) তীর থেকে এ স্থানের দূরত্ব আনুমানিক ২ কিলোমিটার। বর্গাকারে নির্মিত রাজবাড়ি এলাকার প্রত্যেক বাহু ছিল ২৭২.৭২ মিটার লম্বা। দুর্গের বাইরের দিকে ছিল প্রায় ৬০.৬ মিটার

প্রশস্ত পরিখা। বেষ্টনী-প্রাচীর ছিল কিনা, সে সম্পর্কে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। এবং বর্তমানে পরিখার চিহ্ন থাকলেও প্রাচীরের কোনো চিহ্নই টিকে নেই। পূর্বদিকে ছিল প্রবেশপথ। প্রায় ৯০.৯ মিটার প্রশস্ত উঁচু একটি রাস্তা দিয়ে রাজবাড়িতে প্রবেশ করা হত। এই উঁচু স্থানে রাজবাড়ির কর্মচারীদের আবাসবাটী ছিল বলে স্যার কানিংহ্যাম অনুমান করেন। পরিখা ইত্যাদিসহ রাজবাড়ির পরিধি ছিল প্রায় এক মাইল।

রাজবাড়ির ভিতরে কোনো ইমারতের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাননি বলে স্যার কানিংহ্যাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু টেইলার (Dr. Taylor) রাজবাড়ির ভিতরে ও বাইরে বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন বহনকারী অনেক ঢিবি দেখেছিলেন বলে স্যার কার্নিংহ্যাম উল্লেখ করেছেন।[১]

বর্তমানে (১৯৭৪ খ্রিঃ) বল্লাল বাড়ির পরিখার কিছু কিছু চিহ্ন দেখা গেলেও বাড়িটিতে কোনো প্রাচীন কীর্তির চিহ্ন নেই। সেখানে এখন চাষবাসের কাজ চলছে।

বল্লালবাড়ি থেকে প্রায় ৭০০ মিটার পশ্চিম দিকে বর্গাকারের একটি ছোট পুকুর আছে। এটি অগ্নিকুণ্ড নামেও পরিচিত। এখানেই নাকি রাজা বল্লাল সেন পরিবার-পরিজন সহ অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ ত্যাগ করেন। এই গল্পের পিছনে কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রাচীন জলাশয়

বিক্রমপুরে অসংখ্য প্রাচীন দিঘি-পুষ্করিণী আছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি জলাশয়ের তালিকা তুলে ধরা হল।[২]

দিঘি-পুষ্করিণী

১৮৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দের মানচিত্রে চিহ্নিত দিঘিগুলির মধ্যে আয়তনসহ নিম্নলিখিত কয়েকটি উল্লেখিত হল।

দিঘির নাম	আয়তন	অবস্থান
১। রামপাল দিঘি	৬৬৬.৬৬ মি. × ২৪৫.৫৪ মিঃ	বল্লাল বাড়ির সামান্য দক্ষিণে অবস্থিত।
২। দিওয়ার দিঘি	২৪২.৪২ মি. × ২১২.১৮ মিঃ	রামপাল দিঘি ও রাস্তার সামান্য পশ্চিমে অবস্থিত।
৩। সুখবাসপুর দিঘি	২৭২.৭২ মি. × ১৫১.৫১ মি.	রামপাল দিঘি থেকে প্রায় ৬৫০ মিঃ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

১. স্যার কানিংহ্যামের মতে প্রত্যেক বাহু ছিল ৭৫০ ফুট। তিনি এ সম্পর্কে বলেন, "The ruins of Ballal-bari consist of a large earthern fort about 750 feet square with a broad ditch of about 200 feet all round.—A. S. R. XV. pp. 132-3.
ভট্টশালী ১৮৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দের মানচিত্র মতে প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ৯০০ ফুট বলেছেন বলে তাঁর বর্ণনাই গ্রহণ করা হল।

২. —Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures, Dacca Museum, Plate LXXX and p. IX,—Dr. N. K. Bhattasali.

দিঘির নাম	আয়তন	অবস্থান
৪। ধামদহ দিঘি	৩৩৩.৩৩ মি. × ১৫১.৫১ মি.	রামপাল দিঘি থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত।
৫। মামাসার দিঘি	৪২৪.২৪ মি. × ১৮১.৮১ মি.	ধামদহ দিঘি থেকে প্রায় ৬৫০ মিটার দক্ষিণে অবস্থিত।
৬। ধামারণ দিঘি	৬০৬.০৬ মি. × ২৪২.৪২ মি.	পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ এ দিঘি মামাসার দিঘি থেকে প্রায় ৬৫০ মিটার দক্ষিণে অবস্থিত।
৭। নইয়ের দিঘি	৬০৬.০৬ মি. × ২১২.১২ মি.	রামপাল দিঘি থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দক্ষিণে রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত।
৮। সুয়াপাড়া দিঘি	২১২.১২ মি. × ১৫১.৫১ মি.	রামপাল দিঘি থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।
৯। টঙ্গিবাড়ি দিঘি	২১২.১২ মি. × ১৫১.৫১ মি.	সুয়াপাড়া থেকে প্রায় ১.৫০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত।
১০। মঘা দিঘি	২১২.১২ মি. × ২১২.১২ মি.	বর্গাকারের এ দিঘি রামপাল দিঘি থেকে প্রায় ২.৫০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে চরপাড়া গ্রামে অবস্থিত।
১১। শানের দিঘি	২১২.১২ মি. × ২১২.১২ মি.	বর্গাকারের এ দিঘি রামপাল দিঘির প্রায় ৫ কিলোমিটার দক্ষিণে চুরাইল গ্রামে অবস্থিত।

এগুলি ছাড়া রামপাল এলাকায় আরও অসংখ্য প্রাচীন দিঘি-পুষ্করিণী আছে। এগুলির মধ্যে ভগবান রায়ের দিঘি, বিশ্বেশ্বর দিঘি ও সাগর দিঘি উল্লেখযোগ্য। একমাত্র ধামারণ দিঘি ছাড়া বাকি সব ক'টা জলাশয় প্রাক-মুসলিম যুগের বলে ধারণা হয়। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ধামারণ দিঘি খুব সম্ভব মুসলিম আমলে খনিত হয়েছিল।

অন্যান্য কীর্তি

বিক্রমপুরে প্রাচীন যুগের আর কোনো কীর্তি টিকে নেই, এমনকি সে সব কীর্তির কোনো সুস্পষ্ট ধ্বংসাবশেষও নেই, তবে সমগ্র রামপাল অঞ্চল জুড়ে অসংখ্য 'দেউলের' ধ্বংসাবশেষ আছে। এ দেউলগুলি একটু বিচিত্র ধরনের। চারদিকের নিম্নভূমির মাঝখানে অতি উঁচু ভূমি দ্বারা গঠিত এ সমস্ত দেউলের চারদিকে গভীর ও প্রশস্ত পরিখা দেখা যায়। পরিখাবেষ্টিত উঁচু ভূমিতে অজস্র প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ দেখা যায়। কোনো কোনো স্থানে প্রাচীন ইমারতের ভিত্তিও আগে দেখা যেত। ডক্টর ভট্টশালী এই অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তিনি রামপাল ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মাত্র কয়েকটি গ্রামে এ ধরনের কমপক্ষে ৩০টি দেউল দেখেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।[১]

---

১. Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum. p. viii.—Dr. N.K. Bhattasali.

এ সমস্ত দেউল ও পার্শ্ববর্তী পরিখা থেকে অসংখ্য প্রস্তরমূর্তি, দারুমূর্তি এবং প্রস্তরস্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এ সমস্ত দেউলের মধ্যে একটির বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হল।

উত্তর কাযী কসবার দেউল

উত্তর কাযী কসবা গ্রামের অভ্যন্তরে এরকম একটি দেউল আছে। সমগ্র উঁচু ভূমির আয়তন হবে প্রায় ৫ একর। এই উঁচুভূমির প্রায় চার দিকে আছে গভীর পরিখা বা খাল। উঁচুভূমিতে বর্তমানে নানা রকম ফসলের চাষাবাদ হচ্ছে কিন্তু সমগ্র ভূমিতে এখনও প্রচুর ইট ও মৃৎপাত্রের অজস্র ভগ্নাংশ আছে। দেউলের উত্তর-পশ্চিমাংশে এখনও স্তূপীকৃত প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ একটি প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। খুব সম্ভব এখানে একটি সুবৃহৎ ইমারত ছিল।

এই দেউলের উত্তর-পূর্ব কোণে গভীর পরিখার মধ্যে একটি কাঠের মূর্তি ও মূর্তি উৎকীর্ণ একটি বিরাট কাঠের স্তম্ভ পাওয়া গেছে। প্রায় ১.৫১ মিঃ লম্বা কাঠের উপরে যে নারীমূর্তিটি উৎকীর্ণ আছে, তাতে অপরূপ শিল্প-নৈপুণ্য দেখা যায়। কাঠের স্তম্ভটি প্রায় ৪.২৪ মিঃ দীর্ঘ। এতে নানারকম মূর্তি, ফুল ও লতাপাতা উৎকীর্ণ আছে। পণ্ডিতদের ধারণা যে, এ দুটি কাষ্ঠফলক হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের। খুব সম্ভব দেউল বলে পরিচিত উঁচু ভূমিতে যে মন্দির ছিল, তাতে এ দুটি সংলগ্ন ছিল। কোনো কারণে এ দুটি বস্তু নালাতে মাটি চাপা পড়ে এবং সেই অবস্থায় শত শত বছর ধরে পড়ে থাকে। পার্শ্ববর্তী আর একটি নালাতে অনুরূপ আরও একটি কাঠের স্তম্ভ পাওয়া যায়। বর্তমানে এগুলি ঢাকা জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

এ ধরনের আরও অনেক দেউল রামপাল তথা বিক্রমপুর অঞ্চলে দেখা যায়। রামপালের কাছাকাছি সোনারং গ্রামে এরকম বহু দেউল আছে। সেখান থেকে অনেক মূর্তি পাওয়া গেছে, আর পাওয়া গেছে একটি অতি সুন্দর প্রস্তরস্তম্ভ। স্তম্ভটি প্রায় ৪.৫৪ মিটার উঁচু। এটি ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। রামপাল অঞ্চলে যে সমস্ত দেউল উঁচু মাটির ঢিবি হিসাবে এখনও টিকে আছে, সেগুলিতে মূল্যবান প্রত্নবস্তু পাওয়ার বিপুল সম্ভাবনা আছে।

উপসংহার

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, এককালে প্রায় ৩৭ বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে একটি বিরাট নগরীর অস্তিত্ব ছিল রামপাল ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহের সীমানার মধ্যে। খুব সম্ভব গুপ্তযুগ কি তারও আগে এ নগরী গড়ে ওঠে। তারপরে যুগে যুগে এ নগরীর শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে এবং বিভিন্ন রাজবংশ এ স্থানকে রাজধানী রূপে ব্যবহার করে। চন্দ্র ও সেনদের সময়ে বিশেষ করে সেনদের সময়ে এ নগরী খুব সম্ভব শ্রী মণ্ডিত এক বিরাট জনপদে রূপান্তরিত হয়। সেখানে রাজপ্রাসাদ ছাড়া আরও অসংখ্য ইমারত গড়ে ওঠে। সে সমস্ত কীর্তির ধ্বংসাবশেষ লুক্কায়িত আছে রামপালের মাটির নিচে, লুকিয়ে আছে চাষের জমির নিচে, নদীর চরে, নালার নিচে ও প্রাচীন জলাশয়গুলিতে। কাযী কসবা, আবদুল্লাহ্‌পুর,

মীরকাদিম, মানিকেশ্বর, পাইকপাড়া, খীলপাড়া, পানহাট্টা, আটপাড়া, সোনারং, আমতা, মরিআইল, টঙ্গীবাড়ি, শুয়াপাড়া, ধামারণ, মামাসার, চুড়াইন, নাহাপাড়া, চাপড়া, মহাকালী, কেওয়াড়, রামসিংহ, চারপাড়া, বিশিপাড়া, সাওপাড়া চাপাতুলী, বখোর, রঘুরামপুর, বসুপাড়া, পঞ্চশর, রামপাল প্রভৃতি গ্রামে এবং পার্শ্ববর্তী আরও অনেক গ্রাম জুড়ে অবস্থিত ছিল প্রাচীন বিক্রমপুর নগরী।

ধিপুর দেউল

ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মুন্সিগঞ্জ জেলার টঙ্গিবাড়ি উপজেলার ধিপুর গ্রামে পরীক্ষামূলক কিছু খননকার্য করে এখানে একটি দেউলের ধ্বংসাবশেষ মাটির নিচে আবিষ্কার করেন এবং তা থেকে তিনি জানতে পারেন যে, বর্গাকারে নির্মিত ৩টি অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ পাশাপাশি অবস্থায় অবস্থায় ছিল।[১]

মুসলিম আমল

বাবা আদম শহীদ মসজিদ, বিক্রমপুর

মীরকাদিম থেকে প্রায় ১.৫ কিলোমিটার দক্ষিণে ও বল্লালবাড়ি থেকে প্রায় ১.৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে এই মসজিদ অবস্থিত। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এই মসজিদের আয়তন ১৩.৩ মিটার × ১০.৯ মিটার। ইষ্টকনির্মিত এই মসজিদের প্রাচীরগুলি ১.৮ মিটার প্রশস্ত। চারকোণে ৪টি অষ্টকোণাকৃতির মিনার বা টারেট (turret) আছে। পূর্ব দেয়ালে ৩টি দরজা আছে। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ২টি করে দরজা থাকার কথা। দরজার পরিবর্তে সেখানে আছে গভীর কুলঙ্গি। পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি অলঙ্কৃত মিহরাব। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগে আছে গ্রানাইট পাথরে নির্মিত দুটি স্তম্ভ। স্তম্ব দুটি মেঝে থেকে ১.২৬ মিটার পর্যন্ত অষ্টকোণাকৃতির। এর পরে ষোলকোণাকৃতির। এ দুটি স্তম্ভ ও চারপাশের দেয়ালের উপর মসজিদের ৬টি গম্বুজ স্থাপিত। মিহরাবগুলি পোড়ামটির চিত্রফলক দ্বারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত ছিল। মসজিদে বহুবার সংস্কারকার্য করার পর অনেক অলঙ্করণ আর দেখা যায় না। তবে কেন্দ্রীয় মিহরাবে আদি অলঙ্করণের কিছু কিছু নিদর্শন এখনও আছে।

মসজিদের বাইরের দিক বিশেষ করে সামনের দেয়াল অতি সুন্দর পোড়ামাটির চিত্রফলক দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল, কিন্তু এখন সেগুলি আর টিকে নেই। তবে কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের দু'পাশে কিছু কিছু পোড়ামাটির চিত্রফলক এখনও দেখা যায়। মসজিদের কার্নিশগুলি দু'ধারে কিছু বাঁকান হয়ে নেমে গেছে। উপরের ৬টি গম্বুজের মধ্যে কয়েকটি গম্বুজ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেগুলি প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর নতুন করে নির্মাণ করেছে। মোটের উপর মসজিদটি দেখতে বড়ই সুন্দর ছিল।

---

১. Dr. NK. Bhattasali : Iconography of Buddhist and Brahmunical Sculptures in the Dhaka Muslims, p VII
"Foundation of three squre building lying side by side and a continuouns line of wall facing them were exposed." .i—Bhattasali, p-vii,

মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উপরে যে শিলালিপি ছিল, তা থেকে জানা যায় যে, সুলতান জালাল-উদ-দীন ফতেহ্ শাহ্র রাজত্বকালে মালিক-উল-মোয়ায্যম মালিক কাফুর কর্তৃক ৮৮৮ হিজরী (১৪৮৩ খ্রিঃ) সনে এই জামে' মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।

এই মসজিদের নিকট ৭.৫৭ মিটার বাহুবিশিষ্ট বর্গাকার আয়তনের একটি ইষ্টক নির্মিত প্লাটফরমের উপর বাবা আদমশহীদের মাযার বলে কথিত একটি পাকা সমাধি আছে।



▲ বাবা আদম মসজিদ, মুন্সিগঞ্জ

বাবাআদম শহীদের মসজিদ ও মাযার নিয়ে নানা রকম জনশ্রুতি প্রচিলত আছে। এই পরাক্রমশালী দরবেশ নাকি মহারাজ বল্লাল সেনের রাজত্বকালে (১১৫৮-৭৯ খ্রিঃ) বিক্রমপুরে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে আসেন। তাঁর জবাইকৃত গরুর মাংস চিল রাজবাড়িতে ফেলে দিলে গোবধ-বিরোধী রাজা ক্রোধান্বিত হয়ে সসৈন্যে ফকিরের বিরুদ্ধে অভিযানে আসেন এবং আসার সময় একটি কবুতর বুকের মধ্যে কাপড়ের নিচে করে নিয়ে আসেন। যদি তিনি যুদ্ধে পরাজিত হন তবে সেই কবুতর গিয়ে রাজবাড়িতে সংবাদ দেবে এবং পুরনারীরা ম্লেচ্ছদের হাত থেকে নিজেদের ইজ্জত বাঁচাবার জন্য রাজবাড়ির নিকটস্থ কুণ্ডের আগুনে আত্মাহুতি দেবেন। রাজা দরবেশের কাছে এসে দেখলেন তিনি গভীর তপস্যায় নিমগ্ন। তিনি তরবারির এক আঘাতে দরবেশের ভবলীলা সাঙ্গ করলেন এবং মনের আনন্দে নদীতে নামলেন দরবেশের রক্ত গা থেকে ধৌত করার জন্য। হঠাৎ কবুতরটি ছাড়া পেয়ে রাজবাড়িতে উড়ে গেল। রাজা কবুতরের পিছনে পিছনে সবেগে দৌড়িয়ে রাজবাড়িতে এসে দেখলেন তাঁর পরিবার-পরিজন সব কুণ্ডের অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়েছেন। মনের দুঃখে রাজাও তাঁদের অনুসরণ করলেন। সেখানে মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল।

প্রকৃত ইতিহাস এই যে, রাজা বল্লাল সেন ১১৭৯ খ্রিস্টাব্দে মারা গেলে তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেন ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিক্রমপুরে রাজত্ব করেন। এর পরে লক্ষ্মণসেনের এক পুত্র বিশ্বরূপসেন ১২২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এবং আর এক পুত্র কেশব সেন ১২২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিক্রমপুরে রাজত্ব করেছিলেন বলে তাম্রলিপির প্রমাণ পাওয়া যায়। লক্ষ্মণ সেন অবশ্য ১২০৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে গৌড়ের সিংহাসন হারিয়েছিলেন। কিন্তু ১২২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর ও তাঁর পুত্রদের রাজত্ব যে বিক্রমপুরে কায়েম ছিল, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ১২৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেনবংশীয় নৃপতিগণ বিক্রমপুরে রাজত্ব করেছিলেন বলে মীনহাজ 'তবকাত-ই-নাসিরী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এতসব নির্ভরযোগ্য প্রমাণের পর রাজা বল্লাল সেনের সময়ে বিক্রমপুরে বাবা আদমের আবির্ভাব ও বল্লাল সেনের মৃত্যুর ঘটনা কিছুতেই মেনে নেওয়া যেতে পারে না।

তা ছাড়া, সমগ্র বিষয়টাই প্রহেলিকাময় বলে মনে হয়। সামান্য একজন ফকিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে স্বয়ং রাজাকে যেতে হয়েছিল এবং তাঁর হাতে পরাজিত ও নিহত হবার আশঙ্কা ছিল, এ কাহিনীকে অবিশ্বাস্য ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। তদুপরি যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল রাজবাড়ি থেকে মাত্র দেড় কিলোমিটার দূরে। সেখান থেকে দৌড়িয়ে আসতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগার কথা। এত নিকটবর্তী স্থানে যুদ্ধ করতে গিয়ে রাজা কবুতর নিয়ে গিয়েছিলেন যুদ্ধের ফলাফল সেই কবুতরের মাধ্যমে রাজপুরীতে পাঠাবার জন্য। তা বিশ্বাসযোগ্য ঘটনাই বটে! এর পরে কবুতর ছাড়া পেলে সামান্য দেড় কিলোমিটার পথ পার হবার আগেই রাজপুরীর সব লোক ... ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন ওঠে তাঁর পরিবার-পরিজন সবই যদি অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে মরে গেলেন, তবে তাঁর পুত্রপৌত্ররা পরবর্তী সময়ে সুদীর্ঘ কাল ধরে রাজত্ব করলেন কী করে? ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পূর্বে ঢাকা তথা বাঙলায় কোনো মুসলিম অভিযান হয়েছিল, একথা প্রমাণ্য ইতিহাসে পাওয়া যায় না, কেচ্ছা-কাহিনীতে অবশ্য অনেক কথাই বলা হয়ে থাকে।

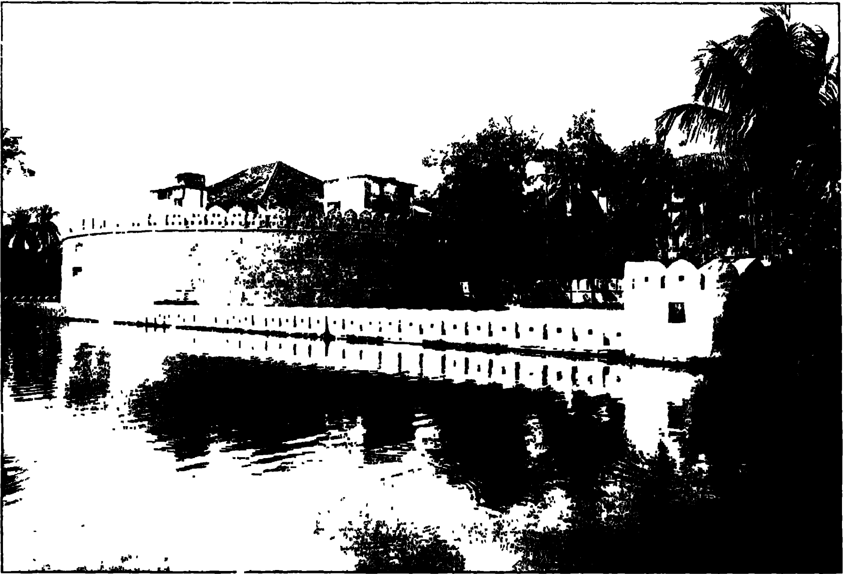
আলোচ্য মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল এই তথাকথিত ঘটনার ৩০০ বছরেরও অধিককাল পরে। মসজিদের শিলালিপিতে বাবা আদম শহীদের কোনো উল্লেখ নেই, উল্লেখ নেই কোনো মাযারেরও। শুধু জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে এই অবিশ্বাস্য ও গাঁজাখুরি গল্প যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এ ঘটনা দ্বিতীয় বল্লাল সেন নামক রাজার সময়ে ঘটেছিল বলেও বলা হয়ে থাকে। এটি ও একটি মনগড়া কাহিনী। কারণ, দ্বিতীয় বল্লাল সেন নামক কোনো রাজার সন্ধান এ দেশের প্রামাণ্য ইতিহাসে নেই, আছে কেচ্ছা-কাহিনীতে।

ইদ্রাকপুর দুর্গ

মুন্সীগঞ্জ শহরের উপরে এবং মরা ইছামতী নদীর তীরে ইদ্রাকপুর দুর্গ এখানকার ইছামতী নদী মরে গিয়ে বর্তমানে (১৯৮৩ খ্রিঃ) বালুচরে পরিণত হয়েছে এবং সেখানে শহর গড়ে উঠেছে।

এই দুর্গের একাংশ অনেককাল ধরে মুন্সীগঞ্জ মহকুমা প্রশাসকের সরকারি বাসস্থান এবং বাকি অংশ মুন্সীগঞ্জ জেলখানা হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। সোনাকান্দা দুর্গের চেয়ে আয়তনে কিছু ছোট এ দুর্গের প্রতিরক্ষা প্রাচীর বর্তমানে বেশ নিচু দেখায়। কোনো কোনো স্থানে দুর্গপ্রাচীরের উচ্চতা মাত্র ১.৪৩ মিটারের মতো। ইছামতী নদী মরে গিয়ে বালুচরে পরিণত হওয়ার ফলে এ রকমটি ঘটেছে।

দুর্গের পূর্বদেয়াল ঘেঁষে প্রায় কেন্দ্রস্থলে আছে গোলাকারে নির্মিত একটি বিরাট ড্রাম। প্রায় ৩০ মিটার ব্যাসবিশিষ্ট এই ড্রামের বাইরে আছে আর একটি অতিরিক্ত দেয়াল এবং তা বেশ উঁচু। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য খুব সম্ভব এই অতিরিক্ত প্রাচীরটি নির্মিত হয়েছিল। উঁচু ড্রামটি বুরুজ হিসাবে ব্যবহৃত হত এবং এখানেই বসানো থাকত দূরপাল্লার বড় বড় কামান। এই ড্রামের উপরেই মহকুমা প্রশাসকের বাসস্থান নির্মিত হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে এবং পরবর্তীকালেও বেশ কিছুকাল ধরে এটি এ কাজেই ব্যবহৃত হত।



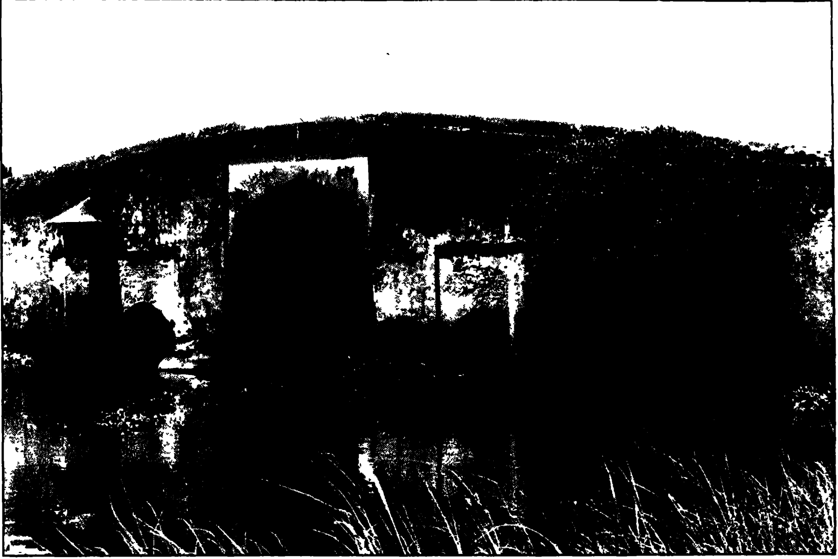
ঈদ্রাকপুর দুর্গ, মুন্সিগঞ্জ

এর সামনে অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম দিকে আছে একটি ছোট গোলাকার পুকুর। এই পুকুরই ছিল বিপদের সময় দুর্গের অধিবাসীদের জলপ্রাপ্তির একমাত্র উৎস। পুকুরের পরেই জেলখানা।

ইদ্রাকপুর দুর্গ নামে পরিচিত এই দুর্গ ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের দিকে বাঙলার সুবাদার মীরজুমলা কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। মগ দস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এ দুর্গটি নির্মিত হয়েছিল।

মীরকাদিম পুল

মুন্সীগঞ্জ শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে মীরকাদিম খালের উপরে অবস্থিত এই পাকা সেতুটিতে ৩টি খিলান ছিল। কেন্দ্রীয় খিলানটি ছিল ৪.২৪ মিটার প্রশস্ত এবং খালের তলদেশ থেকে এর উচ্চতা ছিল প্রায় ৮.৪৮ মিটার। পাশের দুটি খিলান ২.১৭ মিটার করে প্রশস্ত এবং ৫.১৫ মিটার করে উঁচু ছিল। খিলানের স্তম্ভগুলি ছিল ১.৮৭ মিটার করে পুরু। এই পুলের দৈর্ঘ্য ছিল ৫২.৪২ মিটার।



▲ মীর কাদিম পুল, মুন্সিগঞ্জ। সংস্কারের পরে

এই বিরাট সেতুটি মোগল আমলে নির্মিত হয়েছিল। পুলটিতে অনেক মেরামতের কাজ করা হয়েছে এবং এটি এখন একটি নতুন পুল বলে মনে হয়।

সেতুটিতে একটি শিলালিপি ছিল বলে জানা যায়। সেটি বর্তমানে সেখানে নেই। সেতুটিকে বর্তমানে প্রায় নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে।

কাযী কসবা মসজিদ

বল্লালবাড়ি থেকে মাইল খানেক দূরে কাযীকসবা গ্রামে এ মসজিদ অবস্থিত। মসজিদে বহু সংস্কার কার্য করা হয়েছে। ফলে এর প্রাচীনত্ব বহুলাংশে বিলুপ্ত হয়েছে।

উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এই মসজিদের আয়তন আনুমানিক ১০.৬ মিটার × ৪.৫৪ মিটার। দেয়ালগুলি প্রায় ১.৩১ মিটার প্রশস্ত। চারকোণে ৪টি মিনার বা টারেট আছে।

পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে আছে ১ টি করে প্রবেশপথ। এগুলি খিলানের সাহায্যে নির্মিত। পশ্চিম দেয়ালে আছে একটি মাত্র মিহরাব। দু'পাশে আরও ২টি মিহরাব ছিল, মেরামতের সময়ে খুব সম্ভব সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। উপরে আছে ৩টি গম্বুজ। কেন্দ্রীয় গম্বুজ অন্য দুটির চেয়ে বড়। মসজিদটি মোঘল আমলের শেষ দিকে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

মসজিদের কেন্দ্রীয় দরজার সামনে একখণ্ড লম্বা পাথর পড়েছিল (১৯৭৫ খ্রিঃ)। পাথরের উল্টা দিকে একটি মূর্তি উৎকীর্ণ ছিল। মূর্তিটি ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

নারায়ণগঞ্জ জেলা

মুসলিম আমল

সোনারগাঁও

ঢাকা শহর থেকে আনুমানিক ২৬ ও নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রায় ১১ কিলোমিটার পূর্বদিকে প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র (বর্তমানে মৃতপ্রায়) নদীর বাম তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত সোনার গাঁয়ের প্রাচীন নাম ছিল সুবর্ণগ্রাম। প্রাচীন কালের সুবর্ণগ্রাম একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল বলে নানা সূত্রে জানা যায়। আশরাফপুর তাম্রলিপিতে এক সুবর্ণগ্রামের উল্লেখ দেখা যায়। বর্তমান কালের সোনারগাঁও (সুবর্ণগ্রাম)-এর সঙ্গে সেই সুবর্ণগ্রামের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা, এ বিষয়ে পণ্ডিত মহল কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি।

বৌদ্ধ-হিন্দু যুগের কোনো প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ সোনারগাঁয়ে দেখা যায় না। তবে মোগরাপাড়ায় হযরত ইব্রাহীম দানিশমন্দের বলে কথিত মাযারের পূর্ব ও উত্তর দিকে যে উন্মুক্ত স্থান আছে, সেখানে একটি ও মাযার সংলগ্ন মসজিদের পশ্চিম দিকের পুকুরের উত্তর পাড়ে আর একটি পাথরের গৌরীপট্টের অবস্থান এবং খানকা শরীফের পুবে পুকুরের পাড়ে গ্রানাইট পাথরে নির্মিত স্তম্ভের অংশ বিশেষ দেখে ধারণা হয় যে, এ স্থানে প্রাচীন কালে হিন্দু মন্দিরাদির অস্তিত্ব ছিল। সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আ'যম শাহ্‌র মাযার বলে কথিত কালপাথরে তৈরি যে পাকা কবরটি আছে, তার লাগোয়া পশ্চিম পার্শ্বে যে তিনখণ্ড বেলেপাথর মাটিতে প্রেথিত আছে, সেগুলিও প্রাচীন বৌদ্ধ-হিন্দু যুগের কোনো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগৃহীত বলে মনে হয়। গোয়ালদিহি মসজিদের পাথরের স্তম্ভগুলি কোনো হিন্দুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল বলে স্যার কানিংহ্যাম অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১] এগুলি ছাড়া প্রাচীন বৌদ্ধ-হিন্দু যুগের আর তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো প্রত্নবস্তু বর্তমান কালে সোনার গাঁয়ে দেখা যায় না।

মুসলিম আমলে সোনার গাঁয়ের প্রথম উল্লেখ দেখা যায় জিয়া-উদ্-দীন বারনী রচিত 'তারিখ-ই-ফিরোয শাহী' নামক গ্রন্থে। ১২৮২ খ্রীস্টাব্দে সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন বলবন যখন তাঁর বিদ্রোহী সুবাদার মুঘীস-উদ্-দীন তোঘরীলকে দমন করতে আসেন, তখন সোনারগাঁয়ের রাজা দনুজ রায়ের সঙ্গে তাঁর একটি চুক্তি হয়েছিল বলে বারনীর গ্রন্থ থেকে জানা যায়। তাঁকে সোনারগাঁয়ের রায় বলে অভিহিত করা হলেও সোনারগাঁও

১. Archeological Survey of India Report, Vol XV. p. 143.—Sir A. Cunningham.

খুব সম্ভব তখন মুসলমানের অধিকারভুক্তই ছিল।[১] এরপরে এ স্থান সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় ইবনে বতুতার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে। তিনি আনুমানিক ১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে সোনারগাঁও থেকে জাহাজে চড়ে চীনের পথে জাভা গমন করেন। তখন ফখর-উদ্-দীন মোবারক শাহ্ (১৩৩৮-৫০ খ্রিঃ) সোনার গাঁয়ের সুলতান ছিলেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন আ'যম শাহ্ প্রথম জীবনে সোনার গাঁও থেকে রাজত্ব করেছিলেন বলে প্রমাণ আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চীন দেশীয় দূতগণ সোনার গাঁয়ে আগমন করেন এবং তাঁদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, প্রাচীর-বেষ্টিত এই নগরে জলাশয়, রাস্তাঘাট, বিপনীকেন্দ্র ইত্যাদির অস্তিত্ব ছিল। হোসেন শাহ্র আমলে সোনারগাঁয়ে একটি উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল।

ঈসা খাঁ মসনদ-ই-আলির রাজধানী সোঁনারগাঁয়ে ছিল বলে জানা যায়। ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে রাল্ফ্ফীচ (Ralf Fitch) নামক একজন ইউরোপীয় পর্যটক এস্থান পরিদর্শন করে বলেন যে, শ্রীপুর থেকে ৬ লীগ দুরবর্তী এস্থানে সবচেয়ে মুল্যবান ও সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হত এবং একালের সমুদয় নৃপতির মধ্যে প্রধান ছিলেন ঈসা খান। ঈসা খাঁর পরে এস্থান মোঘলদের অধিকারে আসে এবং সোনারগাঁয়ের পরিবর্তে ঢাকা বাঙলার রাজধানী হিসাবে গড়ে ওঠে। ফলে সোনারগাঁও ধীরে ধীরে শ্রীহীন হয়ে পড়ে। মোঘল ও ইংরেজ আমলে বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবার এস্থান ত্যাগ করে অন্যান্য স্থানে চলে যান। ইংরেজ আমলে এস্থানের হিন্দুরা ধনেমানে বিশেষ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁদের এ সময়ের অসংখ্য ইমারতের অস্তিত্ব সোনারগাঁয়ের সর্বত্র বিশেষ করে পানাম এলাকায় আজও দেখা যায়।

দমদমা

মোগরাপাড়া মাযার, মসজিদ, কবরস্থান, নহবতখানা প্রভৃতি কীর্তির চারদিক ঘিরে একটি বিরাট এলাকা নিয়ে যে প্রশস্ত পরিখার চিহ্ন দেখা যায়, সেই এলাকাকে দমদমা বলা হত। ফারসী 'দমদমা' শব্দের অর্থ ঢিবি, উঁচুস্থান, দুর্গ ('a mound, eminence, raised battery.')। এই দমদমার সঠিক পরিধি নির্ধারণ করা বর্তমানে খুব সহজ নয়। চারদিকে ঘন বসতি গড়ে ওঠার ফলে পরিখা অবলুপ্ত প্রায়। তবে বর্তমান মাযার, কবরস্থান, নহবতখানা ও মজসিদ যে-স্থানে অবস্থিত, সেটি যে দমদমার কেন্দ্রস্থান ছিল, তা হয়ত অনুমান করা যেতে পারে। দক্ষিণ দিকে অবস্থিত মেনীখালী নদী ছিল দমদমার দক্ষিণ সীমানা। সেদিকে কোনো পরিখা ছিল না। পূর্ব দিকে দমদমার সীমানা বর্তমান হাইস্কুলের পূর্বদিকে ছিল বলে ধারণা করা যায়। পশ্চিম দিকে মসজিদ থেকে প্রায় ৪০০ মিটার দূরে নাসির-উদ্-দীন মুনশি নামক এক ব্যক্তির মাযার বলে কথিত একটি পাকা কবরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এই কবরের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বেশ কয়েকটি ইমারত ছিল বলে এস্থানের ধ্বংসাবশেষগুলি প্রমাণ করে। দমদমার পশ্চিম পরিখা এই কবরের কিছু পশ্চিম দিক দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত ছিল বলে চিহ্ন পাওয়া যায়। উত্তর দিকের পরিখা ছিল মসজিদ ও মাযার এলাকার অনেক উত্তর দিক দিয়ে পূর্ব-

১. History of Bengal, Vol. II. p. 59.—Dacca University.

পশ্চিমে প্রসারিত। এ পরিখা খুব সম্ভব গিয়াস-উদ্-দীন আ'যম শাহ্‌র মাযারের উত্তর দিক দিয়ে প্রবাহিত খালের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল এবং এই খাল ছিল প্রায় ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত ব্রহ্মপুত্র নদীর সঙ্গে সংযুক্ত। সেই প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরেই অবস্থিত বিখ্যাত অষ্টমীস্নানের মেলার লাঙলবন্ধ ঘাট।

সোনারগাঁয়ের বেশির ভাগ পুরাকীর্তির চিহ্ন বর্তমান কালের দমদমার অভ্যন্তর ভাগেই দেখা যায়। সুলতান জালাল উদ্‌দীন ফতেহ শাহ্‌র মসজিদ, শাহ্ ইব্রাহীম দনিশমন্দ প্রমুখদের মাযার, মান্না শাহ্‌র মাযার, সংলগ্ন শাহী কবরখানা, নহবত খানা, টাঁকশাল, নাসির-উদ্-দীন মুন্‌শির মাযার ও মাযার সংলগ্ন অসংখ্য প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি ইত্যাদি বর্তমানে দমদমা এলাকার ভিতরেই অবস্থিত। আর সমগ্র এলাকা জুড়ে আছে মাটির নিচে অসংখ্য প্রাচীন ইট ও প্রাচীন আমলের ইমারতের ভিত্তিপ্রাচীর।

নওবত খানা

মোগরাপাড়া হাইস্কুলের সামান্য পশ্চিমে অবস্থিত মোগরাপাড়া বাজারের ভিতর দিয়ে কিছু উত্তর দিকে গেলেই প্রাচীন কালের ইটের তৈরি একটি প্রাচীর ও সেই প্রাচীরে একটি তোরণের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। প্রাচীরটি যে মুসলিম আমলের তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে ঠিক কবেকার তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। তোরণ থেকে প্রায় ৫ মিটার উত্তর উত্তর-পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র ইমারতের অস্তিত্ব দেখা যায়। এটিকে জন প্রবাদমতে নওবত বা নহবত খানা বলা হয়ে থাকে এবং অধ্যাপক আহমদ হাসান দানীও এমতের সমর্থক।

আমরা এই ইমারতটিকে খুব ভাল করে পর্যবেক্ষণ করেছি। এটি একটি ক্ষুদ্র ইমারত, আনুমানিক ৬.১৬ মিটার × ৩.৪৭ মিটার আয়তনের, দেয়াল প্রায় .৭৬ মিটার প্রশস্ত। এর উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে মাঝারি আকারের প্রবেশপথ আছে এবং পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে একটি করে অপরিসর জানালা আছে। মোঘল আমলের পাতলা ইটে তৈরি ইমারতটি খুব সম্ভব মোঘল আমলের শেষদিকে নির্মিত। ইমারতটিতে পরবর্তীকালে মেরামতের কাজ করা হয়েছিল বলে দেখা যায়। ফলে এটি এখনও (১৯৯৮ খ্রিঃ) টিকে আছে। তবে এই অতি সাধারণ ইমারতটির মধ্যে কোনো চাকচিক্য বা জাঁকজমকের চিহ্ন নেই।

এখানে বাদ্যযন্ত্রসহকারে সকাল-সন্ধ্যায় মোসাফিরদেরকে নিকটস্থ আশ্রয়ের সন্ধান দেওয়া হত বলে অধ্যাপক দানী উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য নওবত খানার (ঢাকা এশিয়াটিক সোসাইটির নওবত খানা দ্র.) তুলনায় এটি একটি অতি অকিঞ্চিৎকর ইমারত এবং এই একতল বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ইমারতে নওবত ছিল বলে মেনে নেওয়া যায় না। খুব সম্ভব এটি ছিল প্রহরীদের জন্য নির্মিত একটি কক্ষ।

খানকাহ্ ও কবরস্থান

তথাকথিত নওবতখানা থেকে প্রায় ২১ মিটার উত্তরে আছে একটি খানকাহ্ ও তদসংলগ্ন প্রাচীরঘেরা স্থানে উত্তর দেয়ালের সংলগ্ন পরপর ৪টি পাকা কবর। এই চারটি

পাকা কবরের উপর আছে একই রকমের ছাদবিশিষ্ট এবং প্রায় একই আয়তনের ৪টি সমাধিসৌধ। সৌধগুলি প্রায় একই মাপের এবং প্রত্যেকটির অভ্যন্তরীণ আয়তন আনুমানিক ২.৪২ মিটার × ২.৪২ মিটার। উপরে আছে চৌচালা ধরনের পাকা ছাদ, অনেকটা ঢাকা হাইকোর্টের মাযারে নির্মিত সাবেক ছাদের মতো। গঠনপ্রণালী ও স্থাপত্যকৌশল দেখে ধারণা হয় যে, এগুলি মোঘল আমলের শেষ দিকে নির্মিত হয়েছিল। স্যার আলেকজাণ্ডার ক্যানিংহ্যাম ১৮৮০ সালের দিকে এস্থান পরিদর্শন করেন। তিনি মাযারগুলিকে ঠিক বর্তমান অবস্থায় দেখেছিলেন কিনা, তা তাঁর বর্ণনা থেকে পরিষদ বোঝা যায় না।[১]

মাযার ইমারতগুলির পূর্বদিক দিয়ে প্রবেশ করতেই সামনেই যে মাযারটি পড়ে সেটিকে বর্তমানে ইবরাহীম দানিশমন্দের মাযার বলে অভিহিত করা হয়। খানকাহ্ শরীফের বর্তমান খাদিম মাতুমিত্রা, মাযারগুলি, এগুলির নামকরণ এবং সেই সঙ্গে সোনারগাঁয়ের অনেক কাহিনী বলে থাকেন। সৈয়দ মোহাম্মদ তাইফুর সর্ব পশ্চিমের কবরটিকে ইব্রাহীম দানিশমন্দ, এর পূর্ব দিকেরটিকে তাঁর বংশধর আহ্লে ইমাম, এর পরেরটিকে আহ্লে ইমামের পুত্র সৈয়দ মোহাম্মদ ইউসুফ এবং এর পরের অর্থাৎ সর্ব পূর্বদিকেরটিকে শেষোক্ত ব্যক্তির স্ত্রী আয়েশা বানুর মাযার বলে চিহ্নিত করেছেন।[২] কিন্তু তিনি তাঁর উক্তির পিছনে কোনো প্রমাণের কথা বলেননি। বর্তমান খাদিমও এই মতের সমর্থক এবং মাযারগুলিতে এ ধরনের সাইনবোর্ডও দিয়েছেন।

স্যার কানিংহ্যাম এ স্থানে সমাহিত প্রধান ব্যক্তির নাম শেখ মোহাম্মদ ইউসুফ এবং সেই সঙ্গে তাঁর পুত্র শেখ মাহ্মুদের নাম উল্লেখ করেছেন। ইবরাহীম দানিশমন্দ, তাঁর বংশধর আহ্লে ইমাম ও সৈয়দ ইউসুফের পত্নী আয়েশা বানুর কথা তিনি উল্লেখ করেননি। অধ্যাপক আহমদ হাসান দানীও তাঁকে সমর্থন করেছেন।[৩]

এই ৪টি সমাধিসৌধের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে অনেকগুলি পাকা কবর আছে এবং সেগুলির মধ্যে আছে বেশ কিছু প্রাচীন কবর।

প্রাচীন কবরস্থান

উপরে উল্লিখিত মাযার ইমারত ও খানকার পূর্বদিকে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি ছোট আকারের প্রাচীন পুকুর আছে। এই পুকুরের উত্তর ও পশ্চিম পাড় বেশ প্রশস্ত। এই উত্তর পাড়ের সর্বত্র ও পশ্চিম পাড়ের উত্তরাংশ জুড়ে অনুচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত একটি প্রাচীন কবরস্থান আছে এবং সেখানে বহু পাকা কবর আছে। পাকা কবরগুলির অধিকাংশই

---

১. "Close by, on the east and west, there are several other smaller mounds, but they are apparently the remains of separate buildings, not of a continuous line of ramparts. At a short distance, on the north, are the remains of the Khankah of Sheikh Muhammad Yosuf and the tombs of Yusuf and his son, Sheikh Mahmud," The Archaeological Survey of India Report XV, pp. 140-41 by Sir A. Cunningham.

২. Glimpses of old Dhaka, pp. 43-44 by S. M. Taifoor

৩. Muslim Architecture in Bengal, P. 235, Prof. A. H. Dani.

বেশ প্রাচীন। অনেক কবর সুলতানী আমলের বলে ধারণা হয়। পাকা কবরগুলির মধ্যে একটিকে 'মান্নাশাহ্ দরবেশ;'-এর মাযার বলে চিহ্নিত করা হয়। তিনি একজন কামেল পীর হিসাবে পরিচিত ছিলেন বলে ডক্টর ওয়াইজ (Dr. Wise)-এর বর্ণনায় পাওয়া যায়।[১] বর্তমানে এ মাযারের তেমন কোনো জৌলুস নেই। জনসাধারণ এই মাযার সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানেন না। ইবরাহীম দানিশমন্দের মাযারেই এখন ভক্তদের সমাগম ঘটে।

কবরস্থানে এক বা একাধিক সুলতানের মাযার আছে বলেও বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। তবে এগুলিকে চিহ্নিত করার কোনো উপায় নেই।

প্রাচীন মসজিদ

খানকা শরীফ ও সংলগ্ন মাযারগুলির উত্তর দিকে আছে একটি ছোট উন্মুক্ত আঙ্গিনা। এই আঙ্গিনার পশ্চিম ভাগে আছে একটি প্রাচীন মসজিদ। বর্গাকারে নির্মিত মসজিদটি খুব বড় নয়। এর উপরে আছে একটি মাত্র গম্বুজ। মসজিদের দেয়ালগুলি প্রায় ১.৮১ মিটার প্রশস্ত। মসজিদের চারকোণে ৪টি মিনার বা টারেট (turret) আছে।

সুলতান জালাল-উদ্-দীন ফতেহ্ শাহ্র রাজত্বকালে "প্রাসাদের বাইরে রাজকীয় পোশাকের তত্ত্বাবধায়ক, মোয়াযযমাবাদ বা মাহ্মুদাবাদ নামেও পরিচিত সেই (অঞ্চলের) প্রধান সেনাপতি ও উযীর এবং লাউর থানার সেনাপতি মালিক—উদ্-দীন সুলতানী কর্তৃক ৮৮৯ হিজরী (১৪৮৪ খ্রিঃ) সনে এই মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।"[২] মসজিদের এই শিলালিপিটি বর্তমানে পূর্ব দিকে অবস্থিত প্রাচীন কবরস্থানের পশ্চিম দেয়ালে লাগান আছে এবং মানত হাসিলের জন্য ভক্তরা এর উপর চুনের প্রলেপ দিতে দিতে লিপিটিকে এমন অবস্থায় এনেছেন যে, এর পাঠ উদ্ধার করা এখন অসম্ভব ব্যাপার।

বর্তমানে মসজিদের ভিতরে একটি শিলালিপি আছে। তা ১১১২ হিজারী (১৭০০ খ্রিঃ) সনের। এসময়ে মসজিদটিকে প্রায় নূতন করে নির্মাণ করা হয়। আদি পরিকল্পনা ও আদি প্রাচীরের উপরই মসজিদের এই নূতন নির্মাণকার্য করা হয়েছিল। তবে আদিতে প্রস্তরস্তম্ভের উপরে ছিল গম্বুজের ভার। প্রস্তরস্তম্ভগুলি রাখা হলেও এখন গম্বুজের ভার সেগুলিতে নেই। কার্নিশ আগের মতই বাঁকান অবস্থায় আছে।

উত্তর-দক্ষিণে আয়তাকার মসজিদের মাপ ১০.৫ মিটার × ৭.৫ মিটার। গম্বুজের সবপাশে ছাদ কিছুটা ঢালু।

---

১. "Every orthodox Muhammadan', says Dr. Wise, 'as he passes the tomb stops and mutters a prayer-' A lamp is lighted every night at his tomb, but no one knows anything about him."–Archaeological survey of India Reprot XV, pp. 140-41 by A Cunningham.

২. Inscriptions of Bengal, Vol, IV, P. 121 by Mvi. Shamsuddin Ahmad. স্যার কানিংহ্যাম মসজিদের শিলালিপির ব্লকম্যান কর্তৃক প্রদত্ত যে পাঠ উল্লেখ করেছেন, তাতে মসজিদ নির্মাতার নাম 'মালিক মুদ্দীন' (Malik Muddin) আছে।

দমদমা এলাকার অন্যান্য কীর্তি

উপরে উল্লিখিত মসজিদের পিছনদিকে সুলতানী আমলে ধনাগার ছিল বলে জনশ্রুতি আছে। বর্তমানে এটি একটি ছোট শূন্য উদ্যান। এই উদ্যানের উত্তর দিকে কয়েকটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। এগুলি মোঘল আমলে নির্মিত ইমারতের ধ্বংসাবশেষ। এর পূর্ব দিকেই আছে বর্তমান খাদিম পরিবারের বাড়িঘর। এগুলিও প্রাচীন ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

এসব ধ্বংসাবশেষের পশ্চিম দিকে কিছু কিছু ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আছে। এটিকে টাঁকশাল বলা হয়ে থাকে এবং এর মাটির নিচে এখনও অনেক কক্ষ আছে বলে স্থানীয় লোকেরা বলেন। এই ইমারতের বিশেষ কিছুই টিকে নেই। মাটির নিচের কক্ষগুলি পরীক্ষা করে দেখা এখন আর সম্ভব নয়। তবে বর্তমান খাদিম পরিবারের বাসার উত্তর-পশ্চিম প্রায় ৩০ মিটার নিচে আনুমানিক ৯ মিটার × ৫ মিটার আয়তনের একটি কক্ষ মাটির নিচে আছে। মোটামুটি ভালো অবস্থায় কক্ষটি টিকে আছে। এবং এর ভিতরে যাওয়ার জন্য সিঁড়ি আছে। দেখে মনে হয় যে, এটি আঠার শতকের আগের নয়।

এই এলাকায় একটি উঁচু ও বিরাট আকারের মাটির ঢিবি ছিল বলে স্যার কানিংহ্যাম-এর বর্ণনায় পাওয়া যায়। এটি প্রহরীদের পর্যবেক্ষণকেন্দ্র (look out tower) ছিল বলে তিনি অনুমান করেন। ডক্টর ওয়াইজ (Dr. Wise)-এর বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, এখানে একটি বিরাট তেঁতুল গাছ ছিল এবং মহরমের সময় এখানে তাজিয়া জমা করা হত। ঢিবি ও তেঁতুল গাছের কোন অস্তিত্ব বর্তমানে নেই।

সোনারগাঁও কলেজের পিছনের পাকা কবরসমূহ

সোনারগাঁও কলেজের পিছনে (উত্তর দিকে) প্রাচীরবেষ্টিত প্রায় আধ বিঘা ভূমির উপরে খুব সম্ভব সুলতানি আমলের ৩টি পাকা কবর দেখা যায়। এ স্থান মোগরাপাড়া খানকা শরীফ থেকে প্রায় ৫০০ মিটার পশ্চিমে অবস্থিত। মোগরাপাড়া থেকে আলাদাভাবে দেখানর জন্য এ স্থানকে ভুল করে দমদমা বলা হয়ে থাকে। প্রকৃত পক্ষে এ স্থান দমদমা বা প্রাচীন প্রাচীর বেষ্টিত নগরের অংশ বিশেষ ছিল এবং খানকা শরিফ কেন্দ্রিক মোগরা পাড়া ছিল সেই দমদমার কেন্দ্রবিন্দু। পাকা সমাধি তিনটি বেশ প্রাচীন মনে হয় এবং সুলতানি আমলের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত হয়েছিল বলে ধারণা হয়।

প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ

উপরে উল্লিখিত সমাধিগুলি থেকে প্রায় ৪০০ মিটার পশ্চিমে এখন যেখানে ড্রেনের পাশে একটি একগম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে সেখানে একটি সুবৃহৎ প্রাচীন মসজিদ ছিল বলে জানা যায় এবং বর্তমান মসজিদের ধারে কাছে যে সব ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় সেগুলি সেই প্রাচীন মসজিদের বলেই মনে হয়। সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদটি নয় গম্বুজ বিশিষ্ট ছিল বলে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সেই প্রাচীন মসজিদ এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়েছে।

ইউসুফগঞ্জ মসজিদ

সোনারগাঁও বাসস্ট্যান্ড থেকে প্রায় ৪০০ মিটার পশ্চিমে ও মোগরাপাড়া খানকা শরিফ থেকে প্রায় ৪০০ মিটার পুবে মেনিখালি নদীর উত্তর তীরে একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। মসজিদে পলেস্তরার কাজ, চুনকাম ও রঙকরাসহ পরবর্তীকালে অনেক নতুন কাজ করা হয়েছে। মসজিদের সামনের দিকে একটি নতুন বারান্দা নির্মাণ ও দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি সিঁড়ি নির্মাণ করা হলেও মসজিদের প্রাচীনত্ব বিনষ্ট করার মতো আর তেমন কোনো কাজ করা হয়নি। মসজিদের প্যারাপোটটি অবশ্য সোজাভাবে নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু প্যারাপেটের নিচে বাঁকানভাবে নির্মিত সুলতানি আমলের কর্ণিশ এখনও টিকে থেকে মসজিদের প্রাচীনত্ব ঘোষণা করছে। মসজিদের উপরে আছে একটি মাত্র গম্বুজ। সেটি বেশ বড় ও বেশ নিচুভাবে নির্মিত।

বর্গাকারে নির্মিত মসজিদের প্রত্যেক দেয়ালের দৈর্ঘ্য ভিতরের দিকে ৫.৪ মিটার এবং প্রাচীরের প্রশস্ততা প্রায় ১½ মিটার। মসজিদের সামনের দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১ টি করে প্রবেশ পথ আছে। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি মিহরাব।

খুব সম্ভব এ মসজিদ পঞ্চদশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের শেষ ভাগে অথবা আশির দশকের প্রথম দিকে নির্মিত হয়েছিল।

গিয়াস-উদ্-দীন আ'যম শাহ্‌র মাযার

মোগরাপাড়া খানকা শরীফ থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে একটি খালের দক্ষিণ পাড়ে কাল পাথরে তৈরি যে মাযার আছে, তা সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন আ'যম শাহ্‌র (১৩৮৯—১৪১১ খ্রিঃ) মাযার নামে পরিচিত। মোগরাপাড়া থেকে একটি অনুচ্চ গ্রাম্যপথ মাঠের উপর দিয়ে মাযার পর্যন্ত চলে গেছে।

যে খালের দক্ষিণ তীরে মাযারটি অবস্থিত, তা কৃত্রিম বলেই মনে হয়। এই খাল প্রায় ৩ কিলোমিটার পশ্চিম দিকে ব্রহ্মপুত্র (বর্তমানে মৃতপ্রায়) নদীর সঙ্গে সংযুক্ত। পূর্বদিকে দমদমার পরিখার সঙ্গে মিলিত হয়ে এই খাল খুব সম্ভব মোগরাপাড়া হাইস্কুলের পূর্বদিক দিয়ে দক্ষিণমুখী হয়ে মেনিখালী নদীতে গিয়ে পড়ত।

পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা আনুমানিক ৩১.৩ মিটার × ১২.১২ মিটার আয়তনের একখণ্ড ভূমির পশ্চিমাংশে মাযারটি অবস্থিত। এস্থান খুব সম্ভব মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়েছিল। এই স্থানের পূর্ব ও পশ্চিম দিকের নিম্নভূমি ও উত্তর দিকের খাল এই ধারণার পিছনে সমর্থন যোগায়। মোগরাপাড়া থেকে যে গ্রাম্য রাস্তা এসেছে, তা এস্থানের কাছে পশ্চিম দিকে মোড় নিয়ে এ স্থানকে উত্তর পাশে রেখে পশ্চিমে পাঁচপীরের দরগার দিকে চলে গেছে।

রাস্তার লাগোয়া দক্ষিণে আছে অতি ছোট ডোবার মতো ২টি গর্ত। খুব সম্ভব গর্ত দুটি পরবর্তীকালে খনিত হয়েছে। গর্ত দুটির লাগোয়া দক্ষিণে আছে একখণ্ড উঁচু ভূমি, আয়তনে প্রায় ১ একর। এই উঁচু ভূমির পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে নিম্নভূমি, তা বর্ষার

পানিতে ডুবে যায়। এই উঁচু ভূমিতে কোনো পাকা ইমারতের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন নেই। তবে এককালে এটি যে একটি বাস্তুভিটা ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে এককালে একটি জেলে পরিবার বাস করত বলে জানা যায়। তবে বর্তমানে বহু বছর ধরে এখানে চাষের কাজ হয়। এখন (১৯৯৬ খ্রিঃ) সেখানে একটি ছোট কারখানা গড়ে উঠেছে।

খালের পাড়ের ভূমিতে ২টি পাকা কবর আছে। পশ্চিম পাশের কবরটি সম্পূর্ণরূপে কাল পাথরে তৈরি। কবরটি প্রায় ৩.০৩ মিটার লম্বা, ১.৮ মিটার চওড়া ও প্রায় ০.৯ মিটার উঁচু। এর উপরে আছে একখণ্ড কালপাথর। এই অখণ্ড পাথর অর্ধ বৃত্তাকারে নির্মিত। প্রায় ২.১২ মিটার লম্বা এই পাথরের তলদেশ প্রায় .০৫ মিটার চওড়া ও এটি প্রায় ০.৪৫ মিটার উঁচু।



সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ-র মাজার, নারায়ণগঞ্জ

এই পাথরের নিচে কার্নিশের মধ্যে কিছু সুক্ষ্ম অলঙ্করণের কাজ আছে। পাণ্ডুয়াতে সিকান্দর শাহ্র মাযারে (আদিনা মসজিদের পিছনে) যে রকম কারুকার্য আছে, এগুলি অনেকটা সে রকমের। কার্নিশেব নিচে পূর্ব দেয়ালে আছে ৩টি প্যানেল। এই ৩টি প্যানেলের প্রত্যেকটিতে আছে ১টি করে খোদিত কুলঙ্গি (arched niche)। এই খাঁজকাটা কুলুঙ্গির ভিতরে আছে ২টি শিকল ঘেরা একটি ঝুলন্ত প্রদীপ। কুলঙ্গির শীর্ষদেশের দু'পাশে আছে ১টি করে 'রযেট'। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, এই অলঙ্করণ পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ ও সিকান্দর শাহ্র মাযারের অলঙ্করণের মতো এবং একারণে আলোচ্য মাযারটি সিকান্দর শাহ্র পুত্র গিয়াস উদ্-দীন আ'যম শাহ্র মাযার বলে তাঁরা মনে করেন।

মাযারের উপরে বর্তমানে কোনো ছাউনি বা আচ্ছাদন নেই। ডক্টর জেমস ওয়াইজ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে অধ্যাপক দানী বলেছেন যে, মাযারের চারদিকে পাথরের স্তম্ভের বেষ্টনী ছিল এবং উপরে ছিল একটি ছাউনি।[১] স্যার কানিংহ্যাম স্তম্ভসমন্বিত বেষ্টকপ্রাচীর ছিল বলে উল্লেখ করেছেন কিন্তু আচ্ছাদনের কথা বলেননি।[২] মাযারের প্রায় লাগোয়া পশ্চিম দিকে ৩ খণ্ড বেলেপাথর (sand-stone) মাটিতে প্রোথিত আছে। এগুলি বেষ্টক প্রাচীরের পাথর হতে পারে। মাযারের উত্তর দিকে আগে বেলে পাথরে তৈরি একটি 'চেরাগদানী' স্তম্ভ ছিল বলে ডক্টর দানী উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে (১৯৭২ খ্রিঃ) সেই স্তম্ভের কোনো অস্তিত্ব নেই।

মসৃণ কাল পাথরের এই সমাধি যে অতিশয় যত্ন ও আন্তরিকতা সহকারে এবং বহু অর্থব্যয়ে নির্মিত হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অথচ একটি অতি নির্জন স্থানে, গ্রাম্য পরিবেশে ও উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে কেন এই ব্যয়বহুল মাযার নির্মিত হয়েছিল, সেই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া কঠিন। ধারে কাছে তেমন কোনো বসতিও ছিল বলে ধারণা করা যায় না।

এই মাযার থেকে প্রায় ১২ মিটার পূর্ব দিকে একই আঙ্গিনায় আর একটি প্রাচীন কবর দেখা যায়। পুরাপুরি ইটের তৈরি এই কবর বর্তমানে অতি জীর্ণ অবস্থায় আছে। এটি এখন ছনঘাস ও দূর্বাদলে আচ্ছাদিত। কিন্তু কবরটি যে ৩ স্তবকে নির্মিত ও বেশ উঁচু ছিল, তা সহজেই বোঝা যায়। কবরের চারদিকে ছিল ইটের তৈরি বেষ্টনী-প্রাচীর এবং এর আয়তন (উত্তর-দক্ষিণে লম্বা) ছিল আনুমানিক ৩.৬৩ মিটার × ৩.১৩ মিটার। ভিত্তি (মাটির নিচে) ছাড়া বর্তমানে প্রাচীরের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কবরের উপরে কোনো আচ্ছাদন নেই, ছিল কিনা, বলা কঠিন। ইটের তৈরি হলেও এই কবরটি যে অতিশয় যত্নসহকারে ও বহু অর্থব্যয়ে নির্মিত হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কবর দুটির কোনটিতেই কোনও শিলালিপি নেই, ছিল বলেও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্থানীয় জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করে ডক্টর জেমস ওয়াইজ (Dr. James Wise) কাল পাথরে তৈরি কবরটিকে সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন আ'যম শাহ্‌র মাযার বলে সনাক্ত করেন। এবং এ মতই মোটামুটিভাবে গৃহীত হয়ে আসছে। গিয়াস-উদ্-দীন আ'যম শাহ্‌র পিতা সিকান্দর শাহ্‌র মাযারে যে অলঙ্করণ আছে, সেগুলির সঙ্গে এই মাযারের অলঙ্করণের সাদৃশ্য দেখে ডক্টর দানীও দুটি মাযারকে সমসাময়িক বলেছেন।

আমরা এ বিষয়ে স্থানীয় লোকের কাছে কিছু অনুসন্ধান করেছি। স্থানীয় লোকেরা কাল পাথরের মাযারটিকে 'কালাপীর' নামক এক পীরের মাযার বলে চিহ্নিত করেন এবং বহু নরনারীর আগমন ঘটে এই দরগাতে তাদের মানত হাসিলের উদ্দেশে। তাদের মতে এই কালাপীর ছিলেন সুলতান গিয়াস-উদ্-দীনের পীর এবং তাঁর মৃত্যুর আগে তিনি যে

---

১. "According to James Wise this was formerly surrounded by an enclosure of stone pillars which supported a canopy on the top." Mauslim Achitecture in Bengal, P. 73.—Dr. A.H. Dani.

২. "It has once been surrounded by a pillared enclosure, of which, many portions are still lying on the ground close by."–The Archaeological Survey of India Report Vol. XV. p. 140.—Sir A. Cunning am.

ইচ্ছা প্রকাশ করেন, সেই অনুসারে তাঁকে এই নির্জন স্থানে কবর দেওয়া হয় এবং সুলতান এই মাযার অনেক অর্থব্যয়ে নির্মাণ করে দেন। তাদের মতে পীরভক্ত সুলতানের ইচ্ছানুসারে মৃত্যুর পরে পীরের মাযারের কাছে তাঁকে দাফন করা হয়। স্থানীয় জনশ্রুতি থেকে আরও জানা যায় যে, দক্ষিণ দিকে যে ভিটাটি আছে সেখানেই নাকি পীরের আস্তানা ছিল।

এই কাহিনীর পিছনে কতখানি সত্য আছে, তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। তবে এই নির্জন মাঠের মধ্যে গিয়াস-উদ্-দীন আ'যম শাহ্‌র মাযার থাকার পিছনে একটি সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। তিনি আততায়ীর হস্তে নিহত হয়েছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে তিনি প্রাসাদ চক্রান্তে নিহত হয়েছিলেন এবং সেখানে সাময়িক বিদ্রোহও হয়ত হয়েছিল। তাই নিহত সুলতানের লাশ মোগরাপাড়ায় শাহী গোরস্থানে অথবা অন্য কোনো সম্মানজনক স্থানে দাফন না করে মাঠের মধ্যে এই নির্জন স্থানে হয়ত দাফন করা হয়েছিল। পরে তাঁর পুত্র সায়ফ-উদ্-দীন হামযা শাহ্ বিদ্রোহ দমন করে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অতি সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালে পিতার কবরের উপর এই মাযার নির্মাণ করেন। পাশের কবরটি সুলতানের পীরের, না অন্য কারোর তা সঠিকভাবে বলা যায় না। কারণ সুলতানের পীর মোযাফ্‌ফর শামস বলখী ৮০৩ হিজরী (১৪০০ খ্রিঃ) আরব দেশের এডেনে মারা যান। অতএব সোনার গাঁয়ে তাঁর কবর থাকতে পারেনা। সেক্ষেত্রেও মাযার সুলতানের অন্যকোন পীরের হতে পারে।

আলোচ্য মাযারটি সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন আ'যম শাহ্‌র বলেই বর্তমানে মোটামুটিভাবে স্বীকৃত এবং অধ্যাপক দানীর মতে বাংলাদেশে এটি প্রাচীনতন মুসলিম ।র্তি।[১]

পাঁচপীরের মাযার ও মসজিদ

সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন আ'যম শাহ্‌র মাযারের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়ে যে রাস্তাটি খালের দক্ষিণপাড় ঘেঁষে পশ্চিম দিকে চলে গেছে, সেটি ধরে প্রায় ৫০০ মিটার পশ্চিমদিকে গেলেই একটি মসজিদ পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকদের মতে এ মসজিদ নাকি ৭০০ বছর আগে নির্মিত হয়েছিল।

তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদের দেয়ালগুলি ১.০৬ মিটার চওড়া। মসজিদের গাঁথুনি চুন-সুরকির। মসজিদটিকে হাল আমলে প্রায় নূতন করে তৈরি করা হয়েছে। মসজিদের গঠনপ্রণালী দেখে অতি সহজেই বোঝা যায় যে, এ মসজিদ মোঘল আমলের একদম শেষ দিকে অথবা কোম্পানির আমলের প্রথম দিকে নির্মিত হয়েছিল। স্যার কানিংহ্যাম ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে এ মসজিদ দেখে বলেছিলেন যে, একটি অবহেলিত ছোট মসজিদ দ্রুত ধ্বংসের পথে চলেছে ('a small neglected brick mosque now fast hastening to ruin.')।

১. "This is the earliest existing Muslim monument in East Pakistan."—Muslim Architecture in Bengal, pp. 72-73. Prof.—A. H. Dani.

এই মসজিদের পিছনে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে, প্রত্যেক দিকে প্রায় ১৮.০১ মিটার লম্বা অনুচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত বর্গাকারের একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গন আছে। এই প্রাচীর বেষ্টিত স্থানের উত্তরভাগে একসঙ্গে লাগালাগি ৫টি পাকা কবর আছে। সমাধিগুলি একই ভিত্তিবেদীর (platform) উপর একই মাপে নির্মিত এবং মাটি থেকে এগুলি প্রায় ১.৩ মিটার উঁচু। সমগ্র প্লাটফর্মের চারদিকে ইটের তৈরি স্তম্ভ ছিল বলে স্যার কানিংহ্যাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বর্তমান কালে (১৯৭৫ খ্রিঃ) কোন স্তম্ভ আর টিকে নেই।

সমাধিগুলির মাঝামাঝি স্থানের উত্তরে উত্তরদেয়ালের কাছে ইটের তৈরি একটি অতি ক্ষুদ্র দোচালা ঘর আছে। এটিকে বাতিগৃহ (চেরাগদানী ঘর) বলা হয়ে থাকে। এতে বাতি রাখার জন্য কবুতরের খোপের মত ৫টি ছোট ছোট কক্ষ আছে। ঘরটির আয়তন ১.২১ × ০.৯ মিটার এবং উচ্চতা ১.৫ মিটারের বেশি নয়।

কবরগুলির গঠনকৌশল দেখে মনে হয় যে, এগুলি একই সময়ে নির্মিত হয়েছির এবং এগুলি মোঘল আমলের শেষ দিকের আগের নয়। অধ্যাপক দানীর মতে এগুলি সপ্তদশ শতাব্দীর আগে নির্মিত হতে পারে না।[১] সৈয়দ মোহাম্মদ তাইফুরের মতে মগ জলদস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় পাঁচ ভাই এক সঙ্গে নিহত হলে তাঁদেরকে এখানে কবর দেওয়া হয়েছিল বলে জনশ্রুতি আছে।[২]

কবরগুলি যে একসঙ্গে নির্মিত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাতে ধারণা করা যায় যে, কোনো যুদ্ধ বা অন্য কোনো দুর্ঘটনায় এক সঙ্গে নিহত ৫ জন লোককে একই সময় এখানে দাফন করা হয়েছিল সারিবদ্ধভাবে এবং পরে কবরগুলিকে একসঙ্গে এবং একইভাবে পাকা করা হয়েছিল। সেই যুদ্ধ বা দুর্ঘটনার কথা জানা যায়নি। তবে তাঁদের কবরের উপরে নির্মিত সমাধি ও প্রাচীরবেষ্টিত অঙ্গনটি দেখে সহজেই ধারণা করা যায় যে, এঁরা বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তাঁরা কে ছিলেন, তা সঠিকভাবে জানা যায়নি।

মোঘল আমলে সোনারগাঁয়ে একটি সরকার থাকলেও এ স্থানের প্রাধান্য আগের মত ছিল না। ঈসাখাঁর সঙ্গে মোঘলদের যুদ্ধ সোনারগাঁও অঞ্চলে হয়েছিল বলে জানা যায়। সেই যুদ্ধে শহীদ পাঁচজন দরবেশ-সৈনিকের লাশ এখানে দাফন করা হয়েছিল কিনা, তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। তবে এমনও হতে পারে যে, সুলতানী আমলের পাঁচবীর মোজাহীদের কবর এখানে ছিল। পরে মোঘল আমলে কবরগুলিকে নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছিল। আ'যমশাহ্‌র সমাধির নিকটবর্তী এই পাঁচপীরের মাযার তাঁর সময়ের, এমনকি তাঁর পূর্ববর্তী সময়েরও হতে পারে। তবে বর্তমানে যে-কবরগুলি আছে, সেগুলি যে মোঘল আমলের শেষদিকে নির্মিত হয়েছিল এবং ব্রিটিশ আমলে সংস্কার করা হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পাঁচপীর সম্পর্কে ঢাকা তথা পূর্ব বাংলার যে লোকগীতি আছে তা নিম্নরূপ :[৩]

১. Muslim Architecture in Bengal, P. 233, Prof A. H. Dani.
২. Glimpses of Old Dhaka, S. M. Taifoor.
৩. যতীন্দ্র মোহন রায় 'ঢাকার ইতিহাস', ১ম খন্ড, ৪২৪ পৃঃ।

"পোড়ারাজা গয়েস্‌দি তার বেটা সমস্‌দি
পুত্র তা'র সাই সেকেন্দর।
তার বেটা বরখান গাজী খোদাবন্দ মুলুকের রাজী
কলিযুগে যা'র অবসর;
বাদসাই ছিড়িল রঙ্গে কেবল ভাই কালুসঙ্গে
নিজ নামে হইল ফকির।"

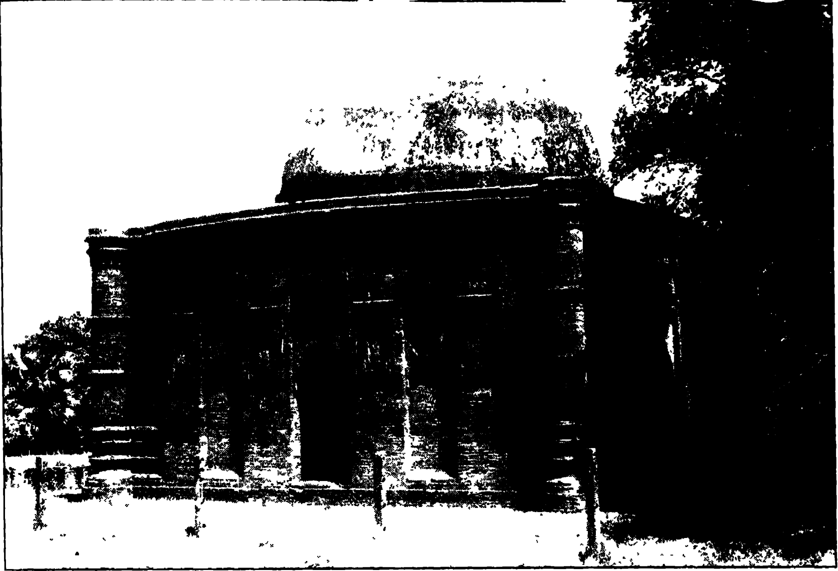
এখানে, গিয়াস-উদ্‌-দীন, তাঁর পুত্র শামস্‌-উদ্‌-দীন, তাঁর পুত্র সিকান্দর ও তাঁর পুত্রদ্বয় গাযী ও কালুর নাম পাওয়া যাচ্ছে। প্রথম তিনজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি (ইলিয়াস শাহী বংশের ৩ জন নৃপতি) হতে পারেন, কিন্তু পিতৃপরিচয় মিলেনা। বাকি দু'জন কাল্পনিক ব্যক্তি। এঁরা যে আলোচ্য পাঁচ পীরের মাযারের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

গোয়ালদি মসজিদ

মোগরাপাড়া-পানাম রাস্তা যেখানে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অতিক্রম করেছে, সেখান থেকে কিছুদূর উত্তর দিকে গেলেই সরকারবাড়ি (বর্তমানে লোকশিল্প যাদুঘর) রাস্তার ডান দিকে পড়ে। সেখান থেকে কিছু উত্তর দিকে গেলেই একটি গ্রাম্যপথ পশ্চিম-উত্তর দিকে চলে গেছে। এই রাস্তা ধরে প্রায় ১১৫০ মিটার উত্তর-পশ্চিম দিকে গেলেই রাস্তার বাম পাশে গোয়ালদিহি মৌজায় একটি প্রাচীন মসজিদ চোখে পড়ে।

বহুকাল ধরে সংস্কারের অভাবে মসজিদটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। অধ্যাপক দানী যখন ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের আগে মসজিদটিকে দেখেন, তখন এটি একটি ঢিবি আকারের ('a huge heap of earth') ছিল। আমরা যখন ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে মসজিদটিকে প্রথম দেখি, তখন সেখানে তেমন কোনো ঢিবি ছিল না। মসজিদের দেয়াল ও মিহরাবের কিছু অংশ তখনও টিকে ছিল। জেমস ওয়াইজ-এর বিবরণীকে ভিত্তি করে ডক্টর দানী মসজিদের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় যে, বর্গাকারে নির্মিত এ মসজিদের ভিতরের আয়তন ছিল ৫ মিটার × ৫ মিটার। মসজিদের উপরে ছিল ১টি মাত্র গম্বুজ। নির্মাণের সুবিধার জন্য চতুষ্কোণাকার মসজিদটি ভিতরের দিকে অষ্টকোণাকার করা হয়েছিল এবং প্রত্যেক কোণে ছিল খিলান। পশ্চিম দেয়ালে ছিল ৩টি মিহরাব। কাল পাথরে তৈরি কেন্দ্রীয় মিহরাবে অতি মনোরম কারুকার্য ছিল। পাশের মিহরাব দুটি ছিল ইটের তৈরি। পূর্ব দেয়ালের প্রবেশ পথগুলির পাশে বেলে পাথরের স্তম্ভ ছিল।[১]

১. "The interior of the mosque is 16.5 feet square. The four walls, as they ascend, give place to the eight walls of an octagon. At each corner are quarter domes or arches (i, e, squinch arch), and the dome rises from pendentives. As usual there are three mihrabs or arched recesses. The central one is formed of dark basaltic stones beautifully carved and ornamented with arabesque work. The two side ones are of brick, boldly cut and gracefully arranged."–Muslim Architecture in Bengal, P. 237—Prof. A. H. Dani.



: গোয়ালদিহা মসজিদ, সোনার গাঁ, নারায়ণগঞ্জ। সংস্কারের পরে

স্যার কানিংহ্যামও এ মসজিদের কিছু বর্ণনা রেখে গেছেন। তাঁর বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, বাইরের দিকে মসজিদের আয়তন ছিল ৭.৯২ মিটার × ৭.৯২ মিটার এবং দেয়ালগুরি ছিল প্রায় ১.৬১ মিটার প্রশস্ত। দেয়ালের উভয় দিকে ছিল অতি সুন্দর পোড়ামাটির চিত্রফলক। পূর্ব দেয়ালের ৩টি প্রবেশপথ ছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে অনুচ্চ প্রবেশপথ ছিল। পাশের মিহরাব দুটিতে মনোরম চিত্র ফলকের কাজ ছিল।[১] তিনি মসজিদের শিলালিপিটি উদ্ধার করেন এবং তা থেকে জানা যায় যে, সুলতান হোসেন শাহ্‌র রাজত্বকালে ৯২৫ হিজরী (১৫১৯ খ্রিঃ) সনে মোল্লা হিজবর-উদ্-দীন এ মসজিদ নির্মাণ করেন।

হাল আমলে প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর প্রর্কৃক মসজিদটিকে প্রায় নতুন করে নির্মাণ করে প্রায় আগের অবস্থায় (restored) আনা হয়েছে। উপরের ছবিটি বর্তমান কালের মসজিদের।

শাহ্ আব্দুল হামিদ মসজিদ

গোয়ালদিহি মসজিদের প্রায় ১৪৫ মিটার উত্তরে মোঘল আমলে নির্মিত একটি মসজিদ আছে। সম্রাট অওরঙযেবের রাজত্বকালে শাহ্ আব্দুল হামিদ নামক একব্যক্তি ১১১৬

১. "It is, however, very richly ornamented with carved bricks, both inside and out, in the style of the buildings of Gour and Pandua ... The whole building, however, is a very fine specimen of the ornamental brick work which prevailed in Bengal for several centuries of Muhammedan rule."— Archaeological Survey of India Report., XV, p. 143 by Sir A. Cunningham.

হিজরী (১৭০৫ খ্রিঃ) সনে এই একগম্বুজ মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। মজজিদের সামনের প্রবেশ পথের উপরে যে শিলালিপিটি আছে, তা থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

হাল আমলে এই মসজিদের অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং এটি যে মোঘল আমলের একটি মসজিদ, তা সহজে চেনার উপায় নেই। মসজিদের সামনের দিকে একটি পাকা বারান্দা সৃষ্টি করা হয়েছে।

মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, সংলগ্ন আঙ্গিনায় একটি পাকা কবর আছে। এটি খুব সম্ভব মসজিদ নির্মাতার কবর।

পানাম শহর ও পুল

সোনার গাঁও থেকে পানাম শহরের পশ্চিম পাশ দিয়ে উত্তর দিকে যাওয়ার পথে মোঘল আমলের একটি সুন্দর পাকা পুল আছে। গ্রাম্য রাস্তার উপর অবস্থিত এই সেতুটি ৩টি খিলানের (arches) উপর নির্মিত। এগুলির মধ্যে মাঝের খিলানটি অপেক্ষাকৃত উঁচু ও চওড়া এবং সেতুর নিচ দিয়ে নৌকা চলাচলের সুবিধার জন্য এটি নির্মিত হয়েছিল। এটি ৪.২৪ মিটার প্রশস্ত এবং তলদেশ থেকে এর উচ্চতা ছিল প্রায় ৮.৪৮ মিটার। পাশের দুটি খিলান ছিল ২.২৭ মিটার করে প্রশস্ত এবং ৪.২৪ মিটার করে উঁচু। মাঝের স্তম্ভগুলি ছিল ২.২১ মিটার করে পুরু। পুলের দৈর্ঘ্য ছিল ৫২.৬ মিটার। এ সেতু কে নির্মাণ করেছিলেন, তা জানা যায়নি। পানাম গ্রামে ঢোকার পথেই একটি ছোট খালের উপরে মোঘল আমলের আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট সেতু দেখা যায়। এই সেতুটি এখনও অটুট অবস্থায় আছে। এ সেতুও কে নির্মাণ করেছিলেন তা জানা যায় নি।



▲ পানাম সেতু, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ

সোনারগাঁও শহরের উত্তর পুর্ব কোণে ও পঙ্খিরাজ নামক একটি ছোট নদীর দক্ষিণ তীরে পরিখাবেষ্টিত একটি উপশহর গড়ে উঠেছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে। শহরে একটি মাত্র প্রধান সড়ক ছিল এবং এর দু'পাশে গড়ে উঠেছিল আকাশচুম্বি সব অট্টালিকা।

মোঘল আমলে নির্মিত সেতুটি খুবই জীর্ণ অবস্থায় ছিল। কয়েক বছর আগে প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর কর্তৃক সেতুটিকে সুন্দর করে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

কদমরসুল ও তোরণ-ইমারত (নবীগঞ্জ)

নারায়ণগঞ্জ শহরের বিপরীত দিকে ও শীতলক্ষ্যা নদীর বাম (পূর্ব) তীরে নবীগঞ্জে অবস্থিত কদমরসুল নামক স্থানে পাথরের উপর হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) পদচিহ্ন রক্ষিত আছে বলে বলা হয়ে থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে মীর্যানথন কর্তৃক রচিত 'বাহারিস্তান-ই-ঘায়েবী' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, বণিকেরা এই প্রস্তরখণ্ড আরব দেশ থেকে এনেছিলেন এবং মাসুমখান কাবুলী বহু টাকার বিনিময়ে তা বণিকদের নিকট থেকে ক্রয় করেন। মাসুমখান কাবুলী এখানে কোনো ইমারত নির্মাণ করেছিলেন কিনা, তা জানা যায় না, করে থাকলেও সেই ইমারত এখন আর টিকে নেই। তবে সৈয়দ মোহাম্মদ তাইফুর বলেন যে, ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে ঈসাখাঁর সেনাপতি মাসুম খান কাবুলী এখানে এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

নদীতীরে একটি 'দমদমা' অর্থাৎ দুর্গ বা উঁচু ভূমি ছিল বলে মীর্যানথনের বর্ণনায় পাওয়া যায়। এ স্থানকে রসুলপুর বা বলা হত বলে তিনি বলেছেন। একটি উঁচুভূমির উপরে বর্গাকারে নির্মিত একটি ছোট একতলা ইমারতে বর্তমানে পাথরটি রক্ষিত আছে। এই গৃহের পূর্বদিকে আছে একটি ছোট বারান্দা। এই গৃহ ও বারান্দা ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার বিখ্যাত জমিদার গোলাম নবী কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। এতে পরবর্তীকালে এত সংস্কারকার্য করা হয়েছে যে, এর আদিরূপ বের করা প্রায় অসম্ভব। হাল আমলে (১৯৭৫ খ্রিঃ) এটি বেশ জীর্ণ অবস্থায় আছে।

এই গৃহের দক্ষিণ দিকে একটি লঙ্গরখানা ছিল এবং উত্তর দিকে ছিল ঢাকার নায়েব-ই-নাযিম নবাব জসরত খান কর্তৃক নির্মিত একটি গৃহ। এর পূর্বদিকে ছিল একটি হুজরাখানা। এসব ইমারতের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়।



▲ কদম রসুল তোরণ, নারায়ণগঞ্জ

হালআমলে এখানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। সুলতান শাহ্‌শুজা' কদমরসুলের জন্য ৮০ বিঘা ভূমি দান করেছিলেন।[১]

এসব ইমারতের পশ্চিম দিকে নদীতীরে আছে একটি বিরাট দোতলা ইমারত। এটিকে কদম কদম রসুলের তোরণদ্বার (gateway) বলা হয়। অর্ধ বৃত্তাকারের বিরাট খিলানের সাহায্যে নির্মিত এই তোরণদ্বারের উপরে ও দু'পাশে আছে মোঘল স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত উঁচু ইমারতাদি। এই ইমারতটি ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে গোলাম নবীর পুত্র গোলাম মোহাম্মদ কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। এই তোরণদ্বারটিই বর্তমানে কদম রসুলের আকর্ষণীয় ইমারত।

বাবা সালেহ্‌র মসজিদ বা শাহী মসজিদ, বন্দর

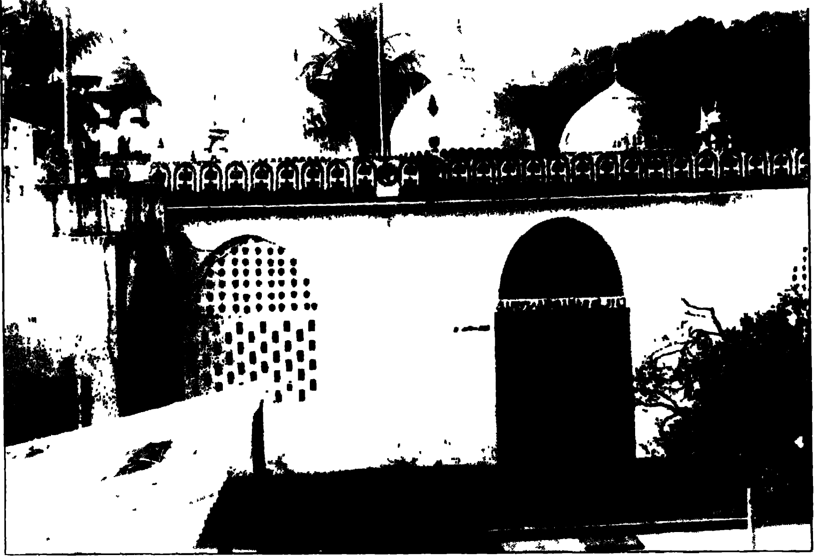
কদমরসুল থেকে প্রায় ১.৫ কিলোমিটার দক্ষিণে শীতলক্ষ্যা নদীর বামতীরে একটি বিরাট প্রাচীন মসজিদ আছে। এ স্থানের নাম বন্দর। সুলতানী ও মোঘল আমলে এ স্থান ছিল একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানকার এই মসজিদটি সুলতানী আমলের একটি বিশিষ্ট কীর্তি।

বর্গাকারে নির্মিত এই মসজিদের আয়তন বাইরের দিকে ১০ মিটার × ১০ মিটার। দেয়ালগুলি প্রায় ১.৮ মিটার প্রশস্ত। মসজিদের ভিতরে আছে একটি মাত্র কক্ষ এবং এই কক্ষের আয়তন ৬.৬৬ মিটার × ৬.৬৬ মিটার। মসজিদের চারকোণে ৪টি মিনার ব. টারেট আছে। অষ্টকোণাকারে নির্মিত এই মিনারগুলি কার্নিসের খুব উপরে ওঠেনি। উপরে আছে একটি মাত্র গম্বুজ এবং তা আকারে বিরাট ও দেখতে ভারী মনোরম। গম্বুজটি দেখতে অনেকটা বাগেরহাটের রণবিজয়পুর মসজিদের গম্বুজের মতো (রণবিজয়পুর মসজিদ দ্র.) তবে এত বিরাট নয়।

মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশপথ আছে। পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি মিহ্‌রাব। মিহ্‌রাবগুলিতে কাল পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। মসজিদের মেঝেতেও কাল পাথর আছে। সামনের দেয়ালে পোড়ামাটির চিত্রফলক ছিল। কিন্তু মসজিদটিতে পরবর্তীকালে এত সংস্কার করা হয়েছে যে, পোড়ামাটির কাজ এখন আর নেই বললেও চলে। এত সংস্কারের পরও মসজিদের প্রাচীনত্ব সহজেই ধরা পড়ে। মসজিদের কার্নিস বেশ বাঁকানভাবে তৈরি ছিল এবং এখনও তা চোখে পড়ে।

মসজিদের গায়ে যে শিলালিপি ছিল, তা থেকে জানা যায় যে, সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহ্‌মুদশাহ্‌র পুত্র সুলতান জালাল-উদ্‌-দীন ফতেহ্‌শাহ্‌র রাজত্বকালে ৮৮৬ হিজী (১৪৮২ খ্রিঃ) সনে মহান মালিক (মালিক-উল্‌-মোয়ায্‌যম) বাবা সালেহ্‌ কর্তৃক এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এটিকে বন্দর শাহী মসজিদও বলা হত।

১. Glimpses of Old Dhaka, p. 346.—S.M. Taifoor,



হাজী বাবা সালেহ মসজিদ, নারায়ণগঞ্জ

হাজী বাবা সালেহ্‌র মসজিদ ও মাযার

উপরে উল্লিখিত বন্দর মসজিদ থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার দক্ষিণে আর একটি প্রাচীন মসজিদ বন্দর এলাকায় ছিল। উপরে উল্লিখিত মসজিদ থেকে এ মসজিদটি আয়তনে একটু ছোট ছিল কিন্তু সেটির মত এটিও বর্গাকারেই নির্মিত ছিল (৪.৭ মিটার × ৪.৭ মিটার) এবং উপরে ছিল ১টি মাত্র গম্বুজ। দেয়াল ছিল ১.৬১ মিটার প্রশস্ত। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেই মসজিদটি অত্যন্ত জীর্ণ হয়ে পড়লে সেখানে সম্পূর্ণ একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। আমরা ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে তিন গম্বুজের এই নতুন মসজিদটিকে দেখেছি। সেটি দেখে প্রাচীন মসজিদ সম্বন্ধে কোনো ধারণা করা অসম্ভব।

প্রাচীন মসজিদের গায়ে যে শিলালিপি ছিল, তা থেকে জানা যায় যে, সুলতান হোসেন শাহ্‌র রাজত্বকালে মক্কা ও মদীনা যিয়ারতকারী ও নবীর খাদিম মহান ও উদার মালিক (আল মালিক-উল-মোয়ায্‌যম ওয়াল মোকার্‌রম) হাজী বাবা সালেহ্‌ কর্তৃক ৯১১ হিজরী (১৫০৪ খ্রিঃ) সনে এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।

এই শিলালিপির হাজী বাবা সালেহ্‌ ও পূর্বে উল্লিখিত বন্দর মসজিদের শিলালিপির বাবা সালেহ্‌ খুব সম্ভব এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দে যখন তিনি প্রথম মসজিদটি নির্মাণ করেন, তখন খুব সম্ভব তিনি 'হাজী' ছিলেন না। এর প্রায় ২৪ বছর পরে যখন তিনি আলোচ্য মসজিদটি নির্মান করেন, তখন তিনি হাজী হয়েছিলেন বলে মনে হয়। প্রথম শিলালিপিতে তাঁকে 'আল-মালিক-উল-মোয়ায্‌যম' এবং আলোচ্য লিপিতে 'আল্‌ মালিক-উল-মোয়ায্‌যম ওয়াল মোকার্‌রম' বলা হয়েছে। নাম ও অভিধার অভিন্নতা এখানেও দেখা যাচ্ছে। খুব সম্ভব তিনি ছিলেন এই এলাকার একজন উঁচু পদস্থ

সরকারি কর্মকর্তা। জালাল-উদ-দীন ফতেহ্ শাহ্র আমলের এই মালিক হোসেন শাহ্র আমলেও চাকুরিরত ছিলেন বলে দেখা যায়। তিনি ছিলেন খুব সম্ভব একজন অতি ধার্মিক লোক।

মাযার

উপরে উল্লিখিত মসজিদের সামান্য পূর্বদিকে একটি মাযার ইমারত ছিল। ভিতরে ছিল প্রস্তরনির্মিত একটি কবর। কবরটি এখনও আছে এবং কবরের উপরে আছে অতি মূল্যবান কাপড়ের গিলাফ। কিন্তু আদি মাযার ইমারতটি এখন আর নেই। মেরামতের অভাবে সেটি জীর্ণ হয়ে পড়লে সেখানে একটি নতুন ইমারত হাল আমলে তৈরি করা হয়েছে। আমরা ১৯৭৩ সালে সেই নতুন ইমারতটি দেখেছি। এটি দেখে প্রাচীন ইমারত সম্পর্কে কোনো ধারণা করা অসম্ভব। সেই প্রাচীন ইমারতের কোনো বর্ণনাও নেই।

মাযারের গায়ে একটি শিলালিপি ছিল। তা থেকে জানা যায় যে, এটি মক্কা, মদীনা ও নবীর পদচিহ্ন যিয়ারতকারী ও নবীর খাদিম হাজী বাবা সালেহ্র কবর ('রওযা') এবং তিনি ৯১২ হিজরী (১৫০৬ খ্রিঃ) সনের রবি-উল-আউয়াল মাসে প্রাণত্যাগ করেছিলেন।

এই শিলালিপির হাজী বাবা সালেহ্ এবং উপরে উল্লিখিত লিপি দুটির বাবা সালেহ যে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি, তাতে কোন সন্দেহ নেই; তিনি খুব সম্ভব মৃত্যুর পূর্বে এ মাযার ইমারতটি নির্মাণ করে গিয়েছিলেন এবং মৃত্যুর তারিখটি বোধ হয় পরে বসান হয়েছিল।

সোনাকান্দা দুর্গ

হাজী বাবা সালেহ্র মসজিদ ও মাযার থেকে প্রায় ১.৫ কিলোমিটার দক্ষিণে শীতলক্ষ্যা নদীর বামতীরে সোনাকান্দা দুর্গ অবস্থিত। এককালে ধলেশ্বরী, শীতলক্ষ্যা ও ব্রহ্মপুত্র নদী তিনটি এ স্থানের নিকটে মিলিত হত।

বর্তমানে ধলেশ্বরী আরও অনেক দক্ষিণে সরে গেছে এবং ব্রহ্মপুত্র নদী আরও অনেক পূর্বদিকে সরে গিয়ে মৃতপ্রায় হয়ে গেছে। আর শীতলক্ষ্যা নদীও অনেক পশ্চিমে সরে গেছে। [সোনাকান্দা দুর্গ-এর রঙিন ছবি-৩৪]

এ দুর্গ নিয়ে অনেক মুখরোচক কাহিনী শোনা যায়। একটি কাহিনী মতে ঈসা খান কেদার রায়ের বিধবা কন্যা সোনাবিবিকে জোর করে বিয়ে করে এ দুর্গে রাখার সময় তিনি কেঁদেছিলেন (কান্দা) বলে এ দুর্গের নাম হয় সোনাকান্দা। অন্য আর একটি কাহিনী মতে সোনা বিবি ঈসা খানের অনুপস্থিতিতে মোঘল আক্রমণ থেকে একাকী দুর্গ রক্ষা করতে অসমর্থ হয়ে কেঁদেছিলেন বলে এ দুর্গের নাম হয় সোনাকান্দা। এ ধরনের আরও অলীক কাহিনী শোনা যায়।

এ সমস্ত কাহিনীর মূলে যে কোনো সত্য নেই, তা বলাই বাহুল্য। আরাকানী (মগ) জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য মোঘল আমলে এ দুর্গ নির্মিত হয়েছিল ঢাকার

মোঘল সুবাদার কর্তৃক। তবে এ দুর্গ মীর জুমলা কর্তৃক, না তাঁর অনেক আগে নির্মিত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না।

আয়তাকারে নির্মিত এ দুর্গ পূর্ব-পশ্চিমে ৯০.৯ মিটার লম্বা ও উত্তর-দক্ষিণে ৬৩.০৩ মিটার চওড়া। ইটের তৈরি দুর্গের দেয়ালগুলি ১.০৬ মিটার পুরু ও ৩ মিটার উঁচু। দুর্গের পূর্বভাগ আয়তক্ষেত্রাকারে নির্মিত কিন্তু পশ্চিম ভাগ অর্ধ গোলাকার 'ড্রাম'-এর আকারে নির্মিত। এই অর্ধবৃত্তাকার অংশে একটি সুউচ্চ বেদী (platfrom) আছে। বেশ শক্তভাবে নির্মিত এই প্লাটফর্ম থেকে কামান দাগার ব্যবস্থা ছিল। বিশেষ করে দূরপাল্লার ভারী কামানগুলি এখান থেকেই দাগা হত। দুর্গের অন্যান্য দিক থেকেও কামান দাগার ব্যবস্থা ছিল।

দুর্গের ভিতরে কোনো ইমারতাদি ছিল বলে মনে হয় না। কারণ, কোনো ইমারতের অস্তিত্ব বা ধ্বংসাবশেষ এখানে নেই। তাতে মনে হয় যে, দুর্গের ভিতরে সৈনিক ও কর্মকর্তাদের বাসস্থানের জন্য তাঁবু বা সে জাতীয় সাময়িক আবাস গৃহের ব্যবস্থা ছিল।

দুর্গটি বহুকাল ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকার ফলে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর হাল আমলে এটিকে মোটামুটি সংস্কার করে প্রায় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছে।

হাজীগঞ্জ দুর্গ

নারায়ণগঞ্জ শহরের উত্তর-পূর্ব দিকে হাজীগঞ্জ এলাকায় মোঘল আমলের একটি দুর্গ আছে। পাঁচকোণাকারে নির্মিত এই দুর্গের বাহুগুলি এক মাপের নয়। তবে মোটামুটিভাবে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা এই দুর্গটির আয়তন আনুমানিক ৭৫.৭৫ মিটার × ৬০.৬ মিটার। দুর্গের কোণগুলি অর্ধবৃত্তাকারে নির্মিত। কোণগুলিতে কামান বসানোর জন্য বুরুজ (bastion) নির্মাণ করা হয়েছিল এবং সেগুলি মোটামুটি এখনও টিকে আছে। দুর্গের দেয়াল বেশ উঁচু এবং প্রায় ০.৯ মিটার পুরু।

বেষ্টনী-দেয়ালের স্থানে স্থানে কামান দাগার জন্য ছিদ্র (battlement) আছে। আর আছে দেয়ালের সঙ্গে লাগানভাবে তৈরি কয়েকটি উঁচু বেদী (platform)। দুর্গের এককোণে ইটের তৈরি বড় আকারের একটি চতুষ্কোণ বেদী (platform) আছে। দুর্গের ভিতরে কোনো ইমারতের ধ্বংসাবশেষ নেই, ছিল বলেও মনে হয় না। এতে ধারণা হয় যে, দুর্গটিতে নিয়মিতভাবে কেউ বসবাস করত না, করলেও সেখানে তাঁবুর ব্যবস্থা হয়ত ছিল।

এককালে শীতলক্ষ্যা নদী দুর্গের পাশ দিয়েই বয়ে যেত। নদী এখন বেশ দূরে সরে গেছে। আরাকানী (মগ) জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সপ্তদশ শতাব্দীতে এই দুর্গ নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। তবে দুর্গ নির্মাণের সঠিক তারিখ এবং এটির নির্মাতা কে ছিলেন, তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে এটি যে মোঘল আমলের কীর্তি, তাতে সন্দেহ নেই। দুর্গটি এখন মোটামুটি ভাল অবস্থায়ই আছে।



▲ হাজীগঞ্জ দুর্গ, নারায়ণগঞ্জ

হাজীগঞ্জ চার গম্বুজ মসজিদ

হাজীগঞ্জ দুর্গের উত্তর-উত্তর পুবে এবং এর বেশ কাছেই অবস্থিত এই সুন্দর মসজিদের খবর সুধী সমাজের কাছে মোটেই জানা ছিল না।[১] পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ ও আয়তাকারে নির্মিত এ মসজিদ কেন্দ্রীয় কক্ষ ও বারান্দা এ দুই ভাগে বিভক্ত এবং সমগ্র মসজিদের আয়তন ১৫.৭৫ মিটার × ১০.৯১ মিটার। বর্গাকারে নির্মিত প্রধান কক্ষের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য (ভিতরের দিকে) ৬.৬৬ মিটার এবং বারান্দার মাপ (ভিতরে দিকে) ৬.৬৬ মিটার × ২.৭২ মিটার। দেয়ালগুলি প্রায় ২.১২ মিঃ প্রশস্ত।

বারান্দা ও প্রধান কক্ষের পুব দেয়ালের প্রত্যেকটিতে খিলানের সাহায্যে নির্মিত ৩টি করে প্রবেশপথ আছে। বর্তমানে (১৯৯২ খ্রিঃ) প্রধান কক্ষ ও বারান্দার উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে খিলানের সাহায্যে নির্মিত ২টি করে প্রবেশপথ আছে। কিন্তু প্রধান কক্ষের এই প্রবেশপথের দু'পাশে দুটি করে কুলঙ্গি ছিল। আকারে প্রবেশপথের চেয়ে কিছুটা ছোট হলেও এগুলি ছিল বেশ গভীর। খুব সম্ভব আদিতে এ দুটি প্রবেশপথ হিসাবেই নির্মিত হয়েছিল এবং পরে কুলঙ্গিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। প্রধান কক্ষের পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি অলঙ্কৃত মিহরাব। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং এর অলঙ্করণও অধিক সুন্দর।

---

১. বেশ কয়েকবার প্রত্নকীর্তির সন্ধানে হাজীগঞ্জ এলাকার ঘোরাফেরা করলেও এ মসজিদটির সংবাদ আমি পাইনি। ফলে বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ গ্রন্থে এর বর্ণনা স্থান পায়নি। কয়েক বছর আগে প্রত্নতত্ত্ব দফতরের উপ-পরিচালক আবুল হাসেম মিঞা কীর্তিটি সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করেন। এবং আমি সেটিকে দেখতে যাই। আমি জনাব হাসেমের কাছে এজন্য

প্রধান কক্ষের চারকোণে ৪টি ও বারান্দার দুই কোণে ২টি ইষ্টকনির্মিত স্তম্ভছিল। স্তম্ভগুলি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও এগুলির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। মিহরাবের পিছনের দেয়ালে বাইরের দিকে প্রজেকশন ছিল। কেন্দ্রীয় মিহরাবের পিছনে তা টিকে থাকলেও অন্য দুটি মিহরাবের পিছনে তা প্রায় বিলুপ্ত।

মসজিদের কার্নিশ বাঁকানভাবে নির্মিত ছিল এবং অনেক মেরামতের পরেও সেই বাঁকান অংশ স্থানে স্থানে এখনও দেখা যায়। কোনো কোনো দিকের কার্নিশ অপরিকল্পিতভাবে মেরামতের কাজ করার ফলে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

প্রধান কক্ষের উপরে আছে একটি মাত্র গম্বুজ। এতে অনেক মেরামতের কাজ করা হলেও গম্বুজটি যে আদিতে অর্ধবৃত্তাকারে নির্মিত হয়েছিল তা সহজেই বোঝা যায়। বারান্দায় ছিল ৩টি ছোট ছোট গম্বুজ। সেগুলি নতুন করে পুনর্নির্মাণ করা হলেও আদি রূপের কিছুটা পরিচয় এরা এখনও (১৯৯৩ খ্রিঃ) বহন করে।

মসজিদে কোনো শিলালিপি নেই। নেই নির্মাণকালের অন্যকোনো প্রমাণও। তবে মসজিদটি যে সুলতানি আমলে বিশেষ করে হোসেন শাহী আমলে নির্মিত হয়েছিল তাতে বোধ হয় কোন সন্দেহ নেই।

বিবি মরিয়মের মসজিদ

হাজীগঞ্জ দুর্গের দক্ষিণে ও নারায়ণগঞ্জ শহরের উত্তরভাগে অবস্থিত এই মসজিদকে হাজীগঞ্জ বা বিবি মরিয়মের মসজিদ বলা হয়ে থাকে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এই মসজিদের আয়তন বাইরের দিকে ১৫.২৫ মিটার × ৬.৩৬ মিটার ও ভিতরের দিকে ১৩.১৩ মিটার × ৩.৪৮ মিটার। পশ্চিম ও পূর্ব দিকের প্রাচীর দুটি মোটামুটিভাবে ১.৫২ মিটার করে প্রশস্ত। পশ্চিম দেয়ালের পিছন দিকের কেন্দ্রস্থলে ৫.৭৫ মিটার × ০.৪৫ মিটার আয়তনের একটি উদগত অংশ আছে। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়াল দুটি মোটামুটি ০.৯ মিটার করে পুরু।

পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশপথ আছে। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি মিহরাব। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি পাশের দুটি থেকে আকারে বড়। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের প্রবেশপথ দুটি বাইরের দিকে সংকীর্ণ কিন্তু ভিতরের দিকে বেশ স্ফীত। মসজিদের চার কোণে ৪টি মিনার বা টারেট ছিল। সেগুলিকে প্রায় নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে এগুলির আদি রূপ কি ছিল, তা ধারণা করা কঠিন।

মসজিদের প্যারাপেট (parapet) ও কার্নিস সরল রেখায় নির্মিত। ছাদের উপরে আছে ৩টি গম্বুজ। কেন্দ্রীয় গম্বুজটি আকারে অন্য দুটির চেয়ে বড়। মসজিদের সামনে ১৫.১৫ মিটার × ৬.৩৬ মিটার আয়তন বিশিষ্ট একটি খোলা আঙ্গিনা ছিল। সেখানে হাল আমলে একটি নতুন বারান্দা নির্মাণ করা হয়েছে এবং তাতে মসজিদের সৌন্দর্য অনেক ব্যাহত হয়েছে। তা ছাড়া এই সুন্দর মসজিদে এলোপাথাড়িভাবে এমন সব মেরামতের কাজ করা হয়েছে যে, এর আদি রূপটি বের করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

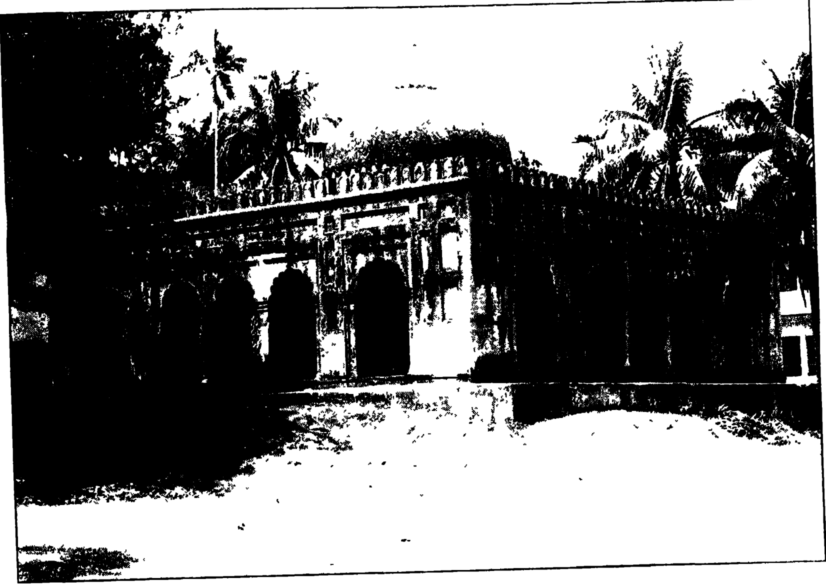


▲ বিবি মরিয়মের মসজিদ, নারায়ণগঞ্জ

বিবি মরিয়ামের মাযার

এক কালের একটি অতি উল্লেখযোগ্য কীর্তি ছিল বিবি মরিয়মের মাযার। প্রাচীর বেষ্টিত একটি স্থানের কেন্দ্রস্থলে ছিল মাযার। এর পুব পাশে ছিল প্রবেশপথ বিশিষ্ট ইমারত এবং পশ্চিম পাশে ছিল উপরে উল্লিখিত মসজিদ। প্রকৃতপক্ষে মাযারটিই ছিল এখানকার প্রধান আকর্ষণীয় কীর্তি। এ স্থানে প্রবেশের একমাত্র পথ ছিল পুব দিকের প্রধান তোরণ এবং সেখান থেকে একটি বাঁধান পথ মাযার হয়ে মসজিদ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

আমরা যখন ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে মাযারটি সর্বপ্রথমে দেখি তখন এটি ছিল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং এর সম্বন্ধে কোনো সঠিক ধারণা করা সম্ভব ছিল না। কেন্দ্রস্থলে ছিল বর্গাকারে নির্মিত একটি কেন্দ্রীয় কক্ষ এবং এর প্রত্যেক বাহু ছিল ভিতরের দিকে প্রায় ৩.৫০ মিটার দীর্ঘ। এ কক্ষের কেন্দ্রস্থলেই ছিল সমাধিটি এবং তা ছিল শ্বেতমর্মর পাথরে নির্মিত। ভগ্নাবস্থায় তা তখন পর্যন্ত টিকে ছিল। চারপাশের দেয়ালগুলি ২মিটার কি তার চেয়েও কম উঁচু ছিল। সমগ্র ইমারতে যে একটি মাত্র গম্বুজ ছিল তা ছিল এ কক্ষের উপরে। কিন্তু সেই আচ্ছাদন বহু আগেই পড়ে গিয়েছিল। এ কক্ষের চারদিকে ছিল টানা বারান্দা। পশ্চিম ও দক্ষিণ বারান্দায় কয়েকটি পাকা কবর আমাদের নযরে পড়েছিল। সব দিক থেকে বারান্দায় আসার প্রবেশপথ ছিল। বারান্দার উপরে খুব সম্ভব ভোল্টেড ছাদ ছিল। বারান্দার চারদিকেও ছিল আবার উন্মুক্ত বারান্দা। সেই বারান্দার শেষ প্রান্তে দেয়াল ছিল কিনা তা সঠিকভাবে স্মরণে আসেনা। প্রত্নতত্ত্ব দফতর বছর কয়েক আগে মাযারটিকে পুনর্নির্মাণ করেছে এবং উপরের ও নিচের নকশা তার উপর নির্ভর করে রচিত।



বিবি মরিয়মের মাজার, নারায়ণগঞ্জ

কন্দাকারে নির্মিত একটি গম্বুজ কেন্দ্রীয় কক্ষের উপরে নির্মিত হয়েছে নতুন করে। খুব সম্ভব এ ধরনের কোনো গম্বুজই এখানে ছিল। চারদিকের বারান্দার উপরে নির্মিত হয়েছে ভোল্টেড ছাদ। চারপাশের বারান্দায় নির্মিত হয়েছে খিলানের সাহায্যে নির্মিত পাঁচটি করে প্রবেশপথ এবং খুব সম্ভব এ ধরনের প্রবেশপথই বারান্দায় ছিল।

এখানে কে শায়িত আছেন তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। প্রবল জনশ্রুতি মতে বিবি মরিয়ম ছিলেন বাঙলার সুবিখ্যাত সুবাদার শায়েস্তা খানের কন্যা এবং শায়েস্তা খান তাঁর প্রিয় কন্যার মৃত্যুর পর এ সমাধি নির্মাণ করেছিলেন।

সৈয়দ মোহাম্মদ তাইফুরে মতে ঈসা খান মসনদ-ই-আলা তাঁর মৃত পত্নী মরিয়মের কবরের উপর এ সমাধিসৌধ নির্মাণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এটি সম্পূর্ণরূপে একটি মোঘল কীর্তি এবং ইসা খানের কীর্তি বলে এটিকে কিছুতেই ধরা যায় না।

তোরণ : আনুমানিক ৭.৫ মিটার × ৫মিটার আয়তন ও ৩ কক্ষবিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র ইমারত। কেন্দ্রীয় কক্ষটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং এটি খুব সম্ভব সমগ্র প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ পথ হিসাবে ব্যবহৃত হত। এর দু'পাশে যে দুটি ছোট কক্ষ আছে তা ছিল বোধ হয় প্রহরীদের জন্য। সমগ্র ইমারতটিকে নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে বর্তমান কালে।

মোয়াযযমপুর মসজিদ ও মাযার

ঢাকা-নরসিংদী সড়কে তারাবো পার হয়ে কয়েক মাইল গেলেই বড়পা নামক একটি গ্রাম পড়ে। সেখান থেকে আনুমানিক ৮ কিলোমিটার পূর্বদিকে মজমপুর নামক একটি

প্রাচীন গ্রাম আছে। এ স্থানই সুলতানী আমলের সুবিখ্যাত মোয়ায্যমাবাদ বা মোয়ায্যমপুর। সোনারগাঁও থেকে এই স্থান প্রায় ৮ কিলোমিটার উত্তর দিকে অবস্থিত। এই গ্রামে প্রাচীন কীর্তির অনেক ধ্বংসাবশেষ ছিল। কিন্তু বর্তমানে মাটির উপরে কোনো কীর্তির ধ্বংসাবশেষ টিকে নেই। মাটির নিচে গ্রামের সর্বত্র প্রাচীন কালের ইট পাওয়া যায়।

ঢাকা থেকে সোনারগাঁও যাওয়ার পথে কাঁচপুর ব্রিজের পরে দিওয়ানবাগ নামক যে এক গম্বুজ মসজিদ আছে তার লাগোয়া পুব পাশদিয়ে উত্তর-পুব দিকে যে সড়ক চলে গেছে সেটি ধরে বেশ কয়েক মাইল গেলেই মজমপুর অর্থাৎ মোয়ায্মেমাবাদ।

মসজিদ

এখানে সুলতানী আমলের একটি মসজিদ অনেক মেরামতের পর এখনও টিকে আছে। মসজিদটি দেখে মনে হয় যে, একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষের উপর নতুন করে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমান মসজিদের আয়তন প্রায় ১২.৯২ মিটার × ৯.৩ মিটার। এটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। মসজিদের উপরে ৬টি গম্বুজ আছে।

মসজিদের অভ্যন্তরের মাপ ৯.৩ মিটার × ৬.৮ মিটার। দেয়াল ১.৮ মিটার পুরু। পূর্বদেয়ালে ৩টি খিলানবিশিষ্ট দরজা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১ টি করে অনুরূপ দরজা আছে। পশ্চিম দেয়ালে কেন্দ্রীয় মিহরাব কষ্টিপাথরের এবং শিকল ও ঘন্টাসহ অন্যান্য কারুকার্যে শোভিত। ভিতরের ২টি স্তম্ভ এবং চার পাশের দেয়ালের উপর মসজিদের ৬টি গম্বুজ নির্মিত হয়েছে।

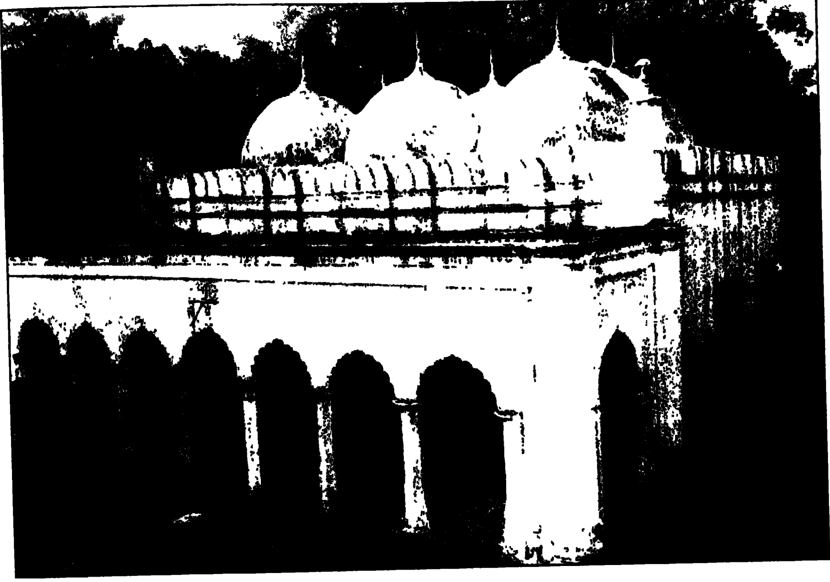
ইটের মাপ '৭″ × ৭″ × ১.৫″ ইঞ্চি'। কেন্দ্রীয় মিহ্রাবের পিছনের দেয়ালে যেসব পোড়ামাটির চিত্রফলক ছিল এখনও সেগুলির বেশির ভাগ আদি অবস্থায় টিকে আছে।

মসজিদের গায়ে একটি শিলালিপি ছিল। সেটি ভেঙ্গে খানখান হয়ে গিয়েছিল। সৈয়দ আওলাদ হোসেন এই ভগ্ন শিলালিপিটি পাঠ করে মসজিদটি রাজা গণেশ তনয় সুলতান জালাল-উদ্-দীন মোহাম্মদ শাহ্র (যদু) পুত্র শামস-উদ্-দীন আহ্মদ শাহ্র রাজত্ব কালে (১৪৩২—৩৬ খ্রিঃ) জনৈক ফিরোয খান কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল বলে বলেছেন।[১] লিপিটির পাঠে ৩টি নাম আছে। প্রথমটি মসনদশাহী আহমেদ শাহ্। অন্য ২টি নাম ফিরোজ খান এবং আলীমুসি সুলতান। শিলালিপির পাঠ যদি ঠিক হয় তবে মসজিদটি পনের শতকের দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মিত হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে।

সুলতানী আমলের বিভিন্ন শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, মোয়ায্যমাবাদ নামক একটি 'ইকলিম' ('ইকলিম-ই-মোয়ায্যমাবাদ') ছিল এবং সেটির প্রশাসনিক কেন্দ্রও যে মোয়ায্যমাবাদেই ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সুলতান সেকান্দর শাহ্র আমল (১৩৫৭-১৩৯১ খ্রি) থেকে আরম্ভ করে হোসেন শাহ্র আমল পর্যন্ত (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) বিভিন্ন সুলতান কর্তৃক মোয়ায্যমাবাদ টাঁকশাল থেকে মুদ্রা প্রচলনের দৃষ্টান্ত দেখে। এরপরে বোধ হয় এ স্থানের প্রাধান্য কমে গিয়েছিল। প্রাচীন মোয়াযযমাবাদ ও হাল আমলের মজমপুর অভিন্ন বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন।

---

১. Dacca, P. 263. –Prof. A. H. Dani.



মজমপুর মসজিদ, নারায়ণগঞ্জ। সংস্কারের পরে

মসজিদের দক্ষিণে শাহ্ লঙ্গর নামক এক দরবেশের মাযার আছে। এই দরবেশ সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে জনশ্রুতি আছে যে, তিনি ছিলেন বাগদাদের এক শাহ্জাদা। সংসারের প্রতি অনাসক্তিহেতু তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ করতে করতে এখানে এসে আস্তানা গাড়েন এবং এখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তাঁকে এখানে কবর দেওয়া হয়। তাঁর সমাধির কাছে আরও বেশ কয়েকটি পাকা কবর আছে। কার, তা জানা যায়নি। শাহ্ লঙ্গরের মাযারে বহু লোকের ভীড় হয়।

মসজিদ অঙ্গনের উত্তর-পূর্ব কোণে-একটি সুবৃহৎ পাকা-কূপ আছে। স্থানীয় অধিবাসীরা এ কূপের পানিকে আব-ই-জম্‌জম্-এর পানির সঙ্গে তুলনা করে থাকেন বোধ হয় আবেগের আতিশস্য।

দিওয়ানবাগ মসজিদ

শীতলক্ষ্যা ব্রীজ পার হয়ে সোনারগাঁয়ের পথে কিছু দূর অগ্রসর হলেই সড়কের উত্তর দিকে এবং সড়ক থেকে প্রায় ১৮০ মিটার উত্তরে একটি বিরাট আকারের এক গম্বুজের মসজিদ দেখা যায়।

গ্রামের নাম দিওয়ানবাগ। এখানে পরবর্তীকালে ঈসা খাঁ মসনদ-ই-আলার বংশধরদের আবাসবাটী ছিল বলে জানা যায়। গ্রামের পূর্বভাগে প্রায় উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে আছে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি বিরাট দিঘি। দিঘিটি এখন মজে গেছে। দিঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মসজিদটি অবস্থিত।

মসজিদটি বর্গাকারে নির্মিত। এর প্রত্যেক বাহু বাইরের দিকে আনুমানিক ৭ মিটার লম্বা। দেয়ালগুলি প্রায় ১.৫১ মিটার প্রশস্ত। চারকোণে ৪টি মিনার বা টারেট ছিল। মসজিদের উপরে আছে একটি মাত্র গম্বুজ। গম্বুজটি বেশ বড় এবং দেখতে ভারী মনোরম।



▲ দিওয়ানবাগ মসজিদ, নারায়ণগঞ্জ

খুবই প্রাচীন এই মসজিদটি সম্ভবত হোসেন শাহী আমলের। বড় গম্বুজের সম্মুখে সম্ভবত ৩টি ছোট গম্বুজ ছিল। যেগুলি এখন নেই।

মসজিদটি বহুকাল ধরে জীর্ণ অবস্থায় পড়েছিল। হাল আমলে এটিকে প্রায় নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে। তবু এটি যে একটি প্রাচীন মসজিদ, তা সহজেই বোঝা যায়। খনন করে দেখা গেছে যে বর্গাকার মসজিদের সামনে একটি বারান্দা ছিল। বারান্দার উপরেই খুব সম্ভব ৩টি ছোট গম্বুজ ছিল, হাজী গঞ্জের (নারায়ণগঞ্জ) চার গম্বুজ মসজিদের মতো।

এই মসজিদ কে নির্মাণ করেছিলেন, সে সম্বন্ধে কোনো সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। স্থানীয় লোকেরা বলেন যে, ঈসা খাঁর কীর্তি এটি। কিন্তু মসজিদের বয়স তদপেক্ষা অনেক প্রাচীন। এই মসজিদটি সুলতান হোসেন শাহী আমলে (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রিঃ) করা হয়েছিল বলে মনে হয়। মসজিদের পূর্ব দিকে দিঘির দক্ষিণ পাড়ে একটি প্রাচীন ইমারতের কিছু ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। মসজিদ থেকে প্রায় ১৮০ মিটার পশ্চিম দিকে আছে একটি ঢিবি। ঢিবির ভিতরে প্রচুর প্রাচীন ইট দেখে মনে হয় যে, এটি একটি প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ। এতে একটি গম্বুজ ছিল বলে মনে হয়।

বহুদিন ধরে সকলেরই ধারণা ছিল যে, এটি একটি একগম্বুজ মসজিদ। কিন্তু মসজিদের কাছে পড়ে থাকা বেশ কয়েকটি পাথরের স্তম্ভ দেখে ধারণা হয় যে, এগুলি খুব সম্ভব মসজিদেরই ব্যবহৃত স্তম্ভ। প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর কর্তৃক সামান্য খনন কার্য করা হয় মসজিদের সামনের দিকে। এর ফলে মসজিদের সামনে মাটির নিচে একটি কক্ষের ভিত্তিদেশ পাওয়া যায়। তাতে ধারণা করা যায় যে, মসজিদের সামনে বারান্দা জাতীয় একটি কক্ষের অস্তিত্ব ছিল।

তবে এই কক্ষটির ছাদ কি ধরনের ছিল তা জানার কোন উপায় নেই। কিন্তু যতটুকু মনে হয়, সেই বারান্দার ছাদে খুব সম্ভব নারায়ণগঞ্জের হাজীগঞ্জ চারগম্বুজ মসজিদের ছাদের মত তিনটি ছোট ছোট গম্বুজ ছিল। সে ক্ষেত্রে মসজিদটি যে সুলতানি আমলে নির্মিত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

নরসিংদী জেলা

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ

উয়ারী-বটেশ্বর

ঢাকা শহর থেকে প্রায় ৪৮ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বদিকে বেলাব থানার অন্তর্গত ও থানা সদর থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে উয়ারী ও বটেশ্বর নামক পাশাপাশি অবস্থানরত দুটি অতি প্রাচীন গ্রাম আছে। শিবপুর থানার অন্তর্গত ও থানা থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত প্রাচীন আশরাফপুর (আশরাফপুর দ্র.) থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার পূর্ব-পূর্ব-দক্ষিণে উয়ারী-বটেশ্বর অবস্থিত।

লালমাটিতে গঠিত গ্রাম দুটিকে ঠিক পাহাড় বলা চলেনা। তবে পার্শ্ববর্তী নিম্নাঞ্চল থেকে বেশ উঁচু গ্রাম দুটিকে পাহাড়ী টিলার মত দেখায়। দক্ষিণের নিম্নাঞ্চলের লোকেরা এ স্থানকে বলে পাহাড়ী অঞ্চল। এককালে প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদী গ্রাম দুটির পার্শ্ব দিগে প্রবাহিত ছিল। গ্রাম দুটির পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর দিকে যে নিম্ন বিলভূমি আছে, সেগুলি যে এককালে ব্রহ্মপুত্রের খাঁত ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। এককালে এবং তা খুব সম্ভব অনেক প্রাচীনকালে ব্রহ্মপুত্রের একটি বিরাট প্রবাহ এ স্থানের পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত ছিল। আশরাফপুরের কাছে দিয়ে এখনও আড়িয়ালখাঁ নামে যে মৃতপ্রায় প্রাচীন নদীটি বয়ে যাচ্ছে, তাও ছিল এককালে ব্রহ্মপুত্রেরই একটি বিরাট প্রবাহ। খুব সম্ভব আড়িয়াল খাঁর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল ব্রহ্মপুত্রের সেই লুপ্ত প্রবাহটি। আশরাফপুর ও উয়ারী-বটেশ্বরের মাঝামাঝি স্থানে 'কয়রা' নামক যে মৃত নদীটি আছে তা যে প্রাচীন লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র নদীর একটি বিশাল প্রবাহ ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

উয়ারী-বটেশ্বরে কোনো প্রাচীন ইমারতের তেমন কোনো ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন নেই। প্রাচীন ইষ্টকাদির বিশেষ কোনো অস্তিত্বও এখানে দেখা যায় না। গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আছে দু'দিকে দুটি মাটির প্রাচীর। লালমাটিতে গঠিত প্রাচীর দুটির এক একটি দৈর্ঘ্য প্রায় ১.৫০ কিলোমিটার। প্রাচীরের বাইরে পরিখার চিহ্ন এখনও দেখা যায়। কিন্তু দুটি প্রাচীরের সীমারেখা টেনে জ্যামিতিক আকারে কোনো দুর্গের অস্তিত্ব বের করা খুব সহজ নয়। খুব সম্ভব প্রাচীর দুটি কোন একক দুর্গের নয়, ভিন্ন ভিন্ন দুটি দুর্গের অথবা একটি বিরাট দুর্গ নগরীর।

উয়ারী-বটেশ্বর গ্রাম দুটি আয়তনে বিরাট। গ্রামের মধ্যে এখানে-ওখানে অনুচ্চ ঢিবি আছে। কিন্তু সেগুলির সব ক'টাতে খুব বেশি ইট-পাথর দেখা যায় না। কিন্তু সমগ্র

গ্রামাঞ্চল বিশেষ করে দুর্গ-ভূমিতে অজস্র মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ দেখা যায়। এগুলি যে বহু প্রাচীন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এ স্থানে বহু প্রাচীন ও অতি মূল্যবান অসংখ্য প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে এবং এখনও যাচ্ছে। এগুলির মধ্যে আছে ছাপযুক্ত মুদ্রা (Punch-marked coins)। এ জাতীয় অসংখ্য মুদ্রা অনেক কাল আগে থেকেই এখানে পাওয়া যাচ্ছে। মুদ্রাগুলি সাধারণত কোনো পাত্রে রক্ষিত অবস্থায় মাটির নিচে পাওয়া যায়। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে জানা যায় যে, বহুলোক এ ধরনের সঞ্চয়-পাত্রে রক্ষিত অনেক মুদ্রা—প্রায় কয়েক হাজার মুদ্রা—এখানে পেয়েছেন। এখানে প্রাপ্ত সব মুদ্রার সন্ধান পাওয়া যায়নি, তবে এখানকার অনেক মুদ্রা বর্তমানে ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এ ধরনের মুদ্রা মৌর্য যুগের পরে আর প্রচলিত ছিল না।

এখানে আরও পাওয়া গেছে অসংখ্য মূল্যবান পাথরের গুটিকা (beads of semi-precious stones)। এগুলি উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চলে এত বেশি আছে যে, অনেক সময় মোরগ-মুরগী জবাই করলে এদের পেটেও এগুলি পাওয়া যায়। বনে-জঙ্গলে মোরগ-মুরগী চরে বেড়াবার সময় ভুল করে এগুলি খেয়ে ফেলে এবং পরে জবাই করলে পেট থেকে বের হয়ে পড়ে। এ ধরনের পাথরের গুটিকাও মৌর্য যুগের পূর্বে প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। এর পরে এগুলি আর প্রচলিত ছিল না।



বড় আকৃতির মূল্যবান পাথরের মালা

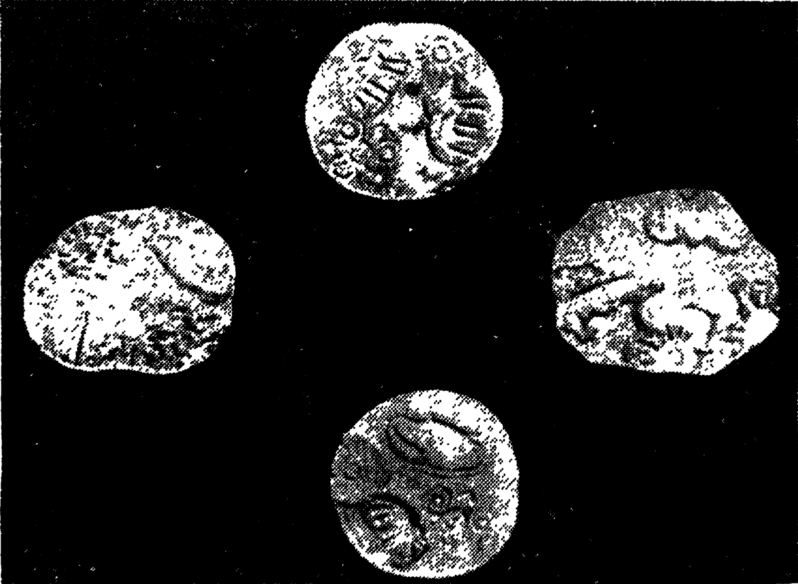
উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চলে আর এক জাতীয় অতি মূল্যবান বেশ কয়েকটি প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে। এগুলি হচ্ছে লোহার তৈরি হাতকুড়াল (hand-axe)। লোহার তৈরি হলেও এই হাত কুড়ালগুলি অত্যন্ত প্রাচীন। প্রস্তর যুগের শেষ দিকে এবং লৌহ যুগের

আদিতে এগুলি নির্মিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতদের ধারণা। খুব সম্ভব এখানে প্রাপ্ত মুদ্রা ও প্রস্তর গুটিকার চেয়েও বয়সে এগুলি অনেক প্রাচীন। এখান থেকে সংগৃহীত এ ধরনের ২৭টি হাতকুড়াল ঢাকা যাদুঘরে বর্তমানে রক্ষিত আছে বলে জানা গেছে এবং আরও অসংখ্য কুড়াল এখানে পাওয়া গেছে বলে জানা যায়।

উয়ারী-বটেশ্বর একটি অতি প্রাচীন স্থান। এখানকার বর্তমান অধিবাসীদের অবস্থান শ'দেড়েক বছরের বেশি নয়। এখানকার বেশির ভাগ অধিবাসী পাঠান উপাধিধারী। এরা মুর্শিদাবাদ অঞ্চল থেকে ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে এখানে এসেছিলেন বলে জানা যায়। এর আগে এ স্থান বহুকাল ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে অবশ্য জানা যায় যে, এক সময়ে কামরূপের কোনো রাজার প্রশাসনিক কেন্দ্র এখানে ছিল।

মৌর্য আমলের অসংখ্য মুদ্রা প্রাপ্তি প্রমাণ করে যে, এ স্থানে সে সময়ে একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। লোহার হাত কুড়াল প্রাপ্তি প্রমাণ বের করে যে, এরও আগে এখানে সভ্য মানুষের বসবাস ছিল। এ স্থানে তেমন কোনো খনন কার্য হয়নি। খনন কার্য করলে হয়ত এ স্থানের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা যেতে পারে।

বহুবছর আগে উয়ারী-বটেশ্বরের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী রচিত 'আইকনোগ্রাফি ...' (Iconography ...) গ্রন্থের মাধ্যমে। তার পরে বহুদিনের অধীর প্রতীক্ষার পরে অবশেষে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে আমরা সেখানে গিয়েছিলাম এ বিষয়ে সম্পৃক্ত কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে।



বিভিন্ন মুদ্রা

এই অঞ্চলের প্রত্নানিদর্শনকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরার ব্যাপারে নিবেদিত প্রাণ জনাব হানিফ পাঠান (বর্তমানে প্রয়াত) ও তাঁর সুযোগ্য জ্যেষ্ঠপুত্র হাবিব উল্লাহ

পাঠানের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ আমাদের হয়েছিল। তাঁদের প্রদত্ত মৌখিক তথ্যাদি এবং তাঁদের সংগ্রহশালার রক্ষিত অতি মূল্যবান প্রত্নবস্তু যা দেখেছিলাম তার উপর ভিত্তি করেই অত্র গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে এ স্থান সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পেশ করেছিলাম।

এরপরে বহুবছর পার হয়ে গেছে। বিলম্বে হলেও এ স্থানের প্রতি সুধীসমাজের দৃষ্টি পড়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্যদের সহযোগিতায় এখানে উৎখনন কাজ হাতে নিয়ে একটি প্রশংসনীয় কাজ করেছে।

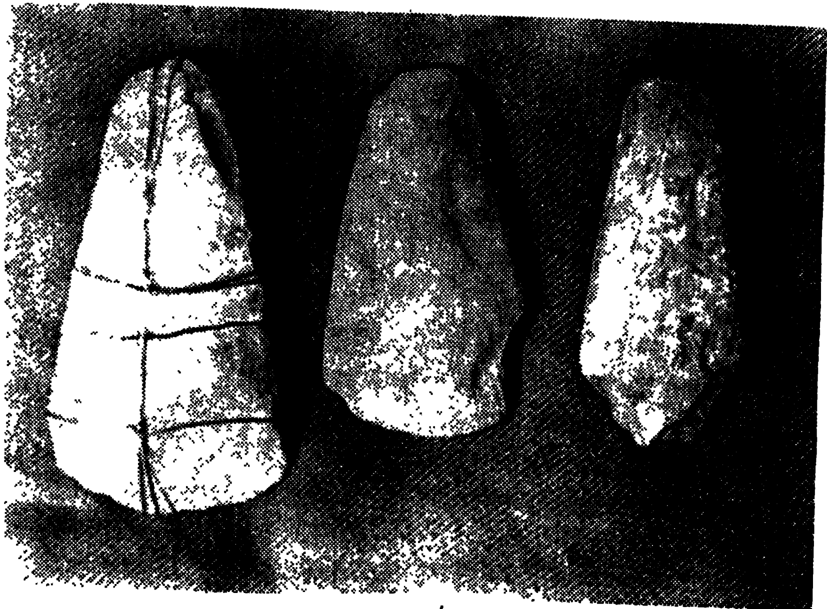
উৎখননের কাজ বেশ সীমাবদ্ধ এবং অসম্পূর্ণ হলেও তা অতি মূল্যবান ও ইঙ্গিতবহ প্রত্নবস্তুর সন্ধান দিয়েছে, সন্ধান দিয়েছে অকিঞ্চিৎকর হলেও চাঞ্চল্যকর কিছু স্থাপত্য নিদর্শনের ভগ্নাবশেষেরও। চুন-সুরকি দ্বারা নির্মিত ও প্রায় আড়াই হাজার বছরের আগেকার বলে দাবিকৃত একটি প্রাচীন পাকা সড়কের অংশবিশেষ অনাবৃত হওয়ার ফলে যথেষ্ট বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরনের বিতর্কের সমাধান যে বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে হাওয়া আবশ্যক তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

উৎখনন কাজ শুরু হওয়ার পরে আমরা উয়ারী-বটেশ্বরে বারকয়েক গিয়েছি এবং উৎখননের কাজ সরেযমিনে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেই সঙ্গে প্রয়াত জনাব হানীফ পাঠান কর্তৃক আরব্ধ এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্রদ্বয় জনাব হাবিব উল্লাহ পাঠান ও খলিল উল্লাহ পাঠান কর্তৃক সমৃদ্ধকৃত অতিমূল্যবান সংগ্রহশালাটিকে বারবার এবং ভাল করে দেখার সুযোগ পেয়েছি। উয়ারী-বটেশ্বরকে কেন্দ্র করে এক বিরাট অঞ্চল থেকে সংগৃহীত অসংখ্য ও অতি মূল্যবান প্রত্নবস্তু স্থান পেয়েছে এই অসাধারণ সংগ্রহশালায়।

এখানে সযত্নে রক্ষিত আছে প্রত্নবস্তুর যুগে নির্মিত বলে দাবিকৃত প্রস্তর নির্মিত হস্তকুঠার ও নব্যপ্রস্তর যুগের হস্তকুঠার। অশ্মীভূত কাষ্ঠখণ্ডসমূহ। আদি লৌহযুগে নির্মিত বিচিত্র ধরনের হাতকুড়াল, বর্শাফলক, প্রাক-মৌর্য ও মৌর্য যুগের ছাপাঙ্কিত মুদ্রা ও মূল্যবান পাথরের গুটিকা। এখানে আরও আছে প্রায় '১১″ × ৬″ × ২½″' আয়তনের অতি প্রাচীন ইট, অতি প্রাচীন মৃৎপাত্রের অসংখ্য ভগ্নাংশ এবং কিছু কিছু অভগ্ন মৃৎপাতও। মৃৎপাত্রের বয়স নির্ধারণ সহজ না হলেও এখানকার সংগ্রহটি যে অতিশয় প্রাচীন তাতে সন্দেহ নেই।

জনাব হাবিব উল্লাহ পাঠান ও খলিল উল্লাহ পাঠানের কাছে জানা গেছে যে, উপরে উল্লিখিত মাপ এবং অন্যান্য মাপের প্রাচীন ইট ও উয়ারী-বটেশ্বরে বিভিন্ন স্থানে মাটির নিচে পাওয়া যায় এবং আরও পাওয়া যায় এ ধরনের প্রাচীন ইট দ্বারা নির্মিত প্রাচীন ইমারতের প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষও।

এখানকার উৎখননের কাজ এখনও সীমাবদ্ধ ও প্রারম্ভিক অবস্থায় আছে। পরিকল্পিতভাবে এবং ব্যাপকভিত্তিতে উৎখনন কার্য পরিচালনা করলে এই অতিপ্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমিতে এমনসব বিস্ময়কর প্রত্নসম্পদকে অনাবৃত হতে পারে যাতে আমাদের দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে নতুন করে লেখার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।



পাথরের কুঠার

আশরাফপুর

ঢাকা শহর থেকে প্রায় ৫৬ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত শিবপুর থানার অন্তর্গত ও থানা থেকে প্রায় ৬-কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত আশরাফপুর একটি অতি প্রাচীন স্থান। শিবপুর থেকে আশরাফপুর হয়ে যে সড়কটি উত্তর-পূর্বদিকে চলে গেছে, সেই সড়ক থেকে প্রায় ২০০ মিটার পূর্বদিকে একটি প্রাচীন পুকুর আছে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এই পুকুরের আয়তন এক একরের মতো।

এই পুকুরের দক্ষিণ-পূর্বকোণের পাড়ের নিচে বহু বছর পূর্বে ২টি অতি মূল্যবান তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয়। আশরাফপুর তাম্রলিপি নামে পরিচিত লিপি দুটি সপ্তম শতাব্দীর সমতটের খড়্গ রাজবংশের। সেই সঙ্গে পাওয়া ব্রোঞ্জ নির্মিত স্তূপ প্রতিকৃতিও।

পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে এখন (১৯৭৫ খ্রিঃ) একজন মুসলিম ভদ্রলোকের বসতবাটী। এই বাড়ির নিচে একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ লুক্কায়িত আছে বলে ধারণা হয়। সেই ইমারতের উত্তর দেয়াল পুকুরের দক্ষিণ পাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পুকুরের দক্ষিণ পাড় ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে সেই দেয়ালের বেশ কিছু অংশ বের হয়ে পড়েছে। পুকুরে বাঁধান ঘাটের চিহ্নও পাওয়া যায়। বাড়ির অধিবাসীদের কাছ থেকে জানা যায় যে, এখানে মাটির নিচে প্রাচুর প্রাচীন ইট ও ইটের তৈরি ভিত্তিদেয়ালের অস্তিত্ব দেখা যায়।

মুসলিম আমল

আশরাফপুর মসজিদ

নরসিংদি জেলার শিবপুর থানার অন্তর্গত আশরাফপুর একটি প্রাচীন গ্রাম। এখানে যে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দির একটি তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে

(আশরাফপুর হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ দ্র.)। তাম্রলিপি প্রাপ্তির স্থান থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরে গ্রামের দক্ষিণভাগে একটি প্রাচীন মসজিদ ছিল। মসজিদটি সুলতান হোসেন শাহ্‌র পুত্র সুলতান নাসির-উদ্-দীন নুসরত শাহ্‌র রাজত্বকালে ৯৩০ হিজরী (১৫২৩-২৪ খ্রিঃ) সনে বাযু-র পৌত্র ও ... পুত্র খান-উল আ'যম ও খাকান-উল-মোয়ায্যম দিলওয়ার খান কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

মসজিদটি মেরামতের অভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে পড়ে এবং মসজিদটিকে সে অবস্থায় আমরা বিংশ শতাব্দির সত্তরের দশকে দেখতে পাই। ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদের শিলালিপি গ্রামের জনৈক আনসার খানের বাড়িতে রক্ষিত হয়। সেখান থেকে শিলালিপিটি ঢাকার জাতীয় যাদুঘরে এনে রক্ষিত হয়। বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদের স্থানে একটি মসজিদ নতুন করে নির্মিত হয়েছে।

ঢাকা জেলা

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ

সাভার

সাভার একটি প্রাচীন স্থান। ঢাকা শহর থেকে প্রায় ২৪ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে বংশাই (প্রাচীন বংশাবতী) নদীর বাম তীরে এই প্রাচীন স্থান অবস্থিত। ধলেশ্বরী নদী এ স্থানের কিছু দক্ষিণে বংশাই নদীর সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে। রাজা হরিশচন্দ্রের রাজধানী বলে কথিত এ স্থানে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ ছিল। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে এই অঞ্চলের প্রত্নকীর্তিগুলির জরিপ কার্য করেন এবং এখানে অনেক প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পান।

ডক্টর ভট্টশালী সাভারের প্রাচীন কীর্তিগুলির ধ্বংসাবশেষগুলি যে অবস্থায় দেখেছিলেন, এখন (১৯৮৩ খ্রিঃ) সেগুলি সেই অবস্থায় আর টিকে নেই। প্রকৃত পক্ষে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ বিভাগের পর থেকেই সাভার অঞ্চলে নূতন বসতি গড়ে ওঠার হিড়িক লেগে গেছে। ফলে প্রাচীন-কীর্তিগুলি খুঁজে বের করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাই ডক্টর ভট্টশালী যে বর্ণনা দিয়ে গেছেন, তা-ই আমরা তুলে ধরছি।[১] তিনি এখানকার

---

১. Sabhar "is a historical place, the traditional capital of Raja HarishChandra. It stands on the east bank of the Bansai which is a branch of the Brahmaputra and falls into Dhaleswari at a place to the south of Sabhar.

"The Bansai has still on its east bank, to the north of the present bazar, the ruins of Harish Chandra's fort called Harish Chandra's *Kotbari* in the map published by J. Rennell in 1780. The *Kotbari* is 720 feet long and 550 feet broad. The surrounding mud-wall is still at some places 25 feet high. The physical aspect of the place as well as of Rajasan and Majidpur localities, indicate that the places were full of civil, military and ecclaciastical editices, the unmistakable signs of a great age.

"The places are full of *dighis* or large tanks almost silted up numbering 50—the *sare bara ganda* of tradition. Some of them are of great interest, as for instance. the *Niramish* dighi, the fishless tank dug as the tradition has it, for the use of the Buddhist King"s mother. There appears to be a bed of a river known as *Baid* separating Rajasan (east) from Majidpur (west). At Majidpur, it is said, was the palace of Raja Harish Chandra. The ruins of the palace and a moat all round called *Katanga* and the *Sagar dighi* to the east of the palace, which still holds water in its bossom

কীর্তিগুলিকে প্রধানত ৩টি স্থানে দেখেছিলেন এবং সেগুলি হচ্ছে, (১) কোটবাড়ি, (২) রাজবাড়ি ও (৩) রাজাসন।

কোটবাড়ি

তদানীন্তন সাভার বাজারের উত্তরে বংশাই নদীর বামতীরে এই কীর্তিটি অবস্থিত ছিল। এখানে একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ছিল। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত মেজর রেনেলের (Major J. Rennell) মানচিত্রে এটিকে রাজা হরিশচন্দ্রের 'কোটবাড়ি' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আয়তাকারে নির্মিত এই দুর্গের আয়তন ছিল ২১৮.১৮ মিটার × ১৬৬.৬৬ মিটার। চারদিকে ছিল মাটির তৈরি উঁচু প্রাচীর। ডক্টর ভট্টশালী ১৯২১ সালে দুর্গপ্রাচীরের উচ্চতা কোনো কোনো স্থানে ৭.৪২ মিটার পর্যন্ত দেখেছিলেন। এই দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও কোনো কোনো স্থানে দেয়ালের কিছু কিছু অংশ দেখা যায়।

রাজবাড়ি

এ স্থানকে হরিশচন্দ্র রাজার ঢিবিও বলা হয়ে থাকে। সাভারের পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত বংশী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত কোটবাড়ি নামক প্রাচীন দুর্গ থেকে এ স্থান প্রায় দেড় কিলোমিটার পূর্ব দক্ষিণে এবং সাভার বাজার সংলগ্ন বাস স্ট্যান্ড থেকে আনুমানিক ৪০০ মিটার পুবে মজিদপুর গ্রমে অবস্থিত এ স্থান থেকে প্রায় ৫০০ মিটার পুবে রাজাসন (পরে দ্র.) নামক প্রাচীন স্থান অবস্থিত।[১] বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে

throughout the year are pointed out to this day as memorials to its lost greatness. Majidpur seems to be a modern name given to it by the Ghazis of Bhowal Pargana who ruled over this part of the country before the Moguls. It is also called by some *Majootpur* the place of hoarded wealth.
"Many things of historical interest have been, of late, discovered from a place at Rajasan. Recent discoveries of Buddha images on large bricks (now in the Dacca Museum) in different postures of contemplation from the place conclusively proves that Rajasan, the corrupted form of *Bajrasan*, the most important of the several *asans* of the Buddhist monks. It is said that Buddha himself obtained *Nirvana* while sitting In contemplation in such *asan*. The meaning being unintelligible to the people, they began to call it *Rajasan*, the seat of Raja Harish Chandra. The recent discoveries of so-called Rajasan bears testimony to the fact of the existence of a Buddhist monastery where monks like Srijnan Dipankar Atish had an opportunity for preparing themselves of their future vocation."—Dacca Review. Vol. XI, Nos, 2 & 3; May-june 1921, pp. 39—40.

১. "To the south of the old river lies the village of Rajasan where the villagers have been cultivating on the tops of mounds containing ruins. Only four low mounds are visible, the intervening ground having been

রাজাসন থেকে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু প্রত্নবস্তু ও গুপ্ত অনুকৃত আবিষ্কৃত হয়েছিল প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের পরে। বিশ শতকের আশির দশক থেকে নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত রাজবাড়ি ঢিবিতে কয়েক দফা উৎখনন কার্য চলে। ১৯৯০-৯১ সালের খননে প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতরের উপ পরিচালক মোশাররফ হোসেন নেতৃত্ব প্রদান করেন। এ ঢিবি সম্পর্কে তার প্রতিবেদনের কিছু অংশ নিচে তুলে ধরা হল।[১]

"প্রত্নতাত্ত্বিক খনন পরিচালনের ফলে হরিশচন্দ্র রাজার ঢিবিতে একটি মাঝারি আকারের নিবেদন স্তূপ এবং এর সংলগ্ন দক্ষিণে একটি বিহারের কাঠামো অনাবৃত হয়েছে। স্তূপটির কেবল মেধি ও অন্তের অংশবিশেষ বর্তমানে অক্ষত রয়েছে।

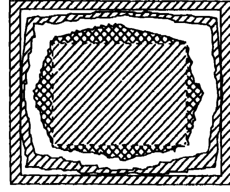
"এই অংশে তিনটি নির্মাণ সময়কালের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেছে। প্রথম সময়কালে মেধিটির পরিমাপ ২৬.২১ মিটার × ২৬.২১ মিটার ছিল। এর চারপাশে ৪.৪১ মিটার প্রশস্ত প্রদক্ষিণ পথ রয়েছে। সর্বোপরি রয়েছে ১.৩৭ মিটার চওড়া বেষ্টনি প্রাচীর। বর্গাকার মহাবেদীর প্রদক্ষিণ পথে প্রবেশের জন্য চারদিক থেকে চারটি আরোহণমঞ্চ ছিল বলেও ধ্বংসাবশেষ থেকে অনুমিত হয়েছে। দ্বিতীয় নির্মাণ সময়কালে স্তূপটিকে চারদিকে অতিরিক্ত ১.৮২ মিটার বর্ধিত করা হয়েছিল। ফলে প্রদক্ষিণ পথের প্রস্থ দাঁড়িয়েছিল মাত্র ১.২১ মিটার। এছাড়া এ নির্মাণে তিন দিকের আরোহণমঞ্চ অবলুপ্ত করে কেবল দক্ষিণ দিকে একটি মাত্র আরোহণ মঞ্চ সংরক্ষণ করা হয়েছিল। এরপর তৃতীয় নির্মাণ সময়কালে মেধি ও বহিঃপ্রাচীরকে 'এক বিংশতি রথ' মঞ্চের আকৃতি প্রদান করা হয়েছিল। এ ছাড়া এ নির্মাণ সময়কালের স্থাপত্যিক নিদর্শনের উপর ৬১ সে.মি. পুরো নিরেট পিন্ডাকার প্রলেপ আরোপ করে ইমারতটির স্থায়িত্ব বৃদ্ধির প্রচেষ্টা হয়েছিল।

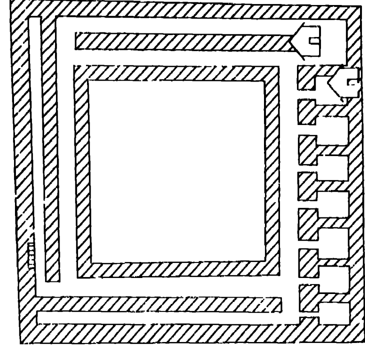
"স্তূপটির সংলগ্ন দক্ষিণাংশে রয়েছে ৫৫.৭৭ মিটার দৈর্ঘ্য (পূর্ব পশ্চিমে) এবং ৫৫.৪৭ মিটার প্রস্থ (উত্তর-দক্ষিণ) বিশিষ্ট একটি মাঝারি আকারের বিহার। এর উত্তর বাহু অনাবৃত করার ফলে স্তূপে যাতায়াতের উপযোগী একটি পরবর্তী কালীন প্রবেশপথ উন্মোচিত হয়েছে। অন্যদিকে দক্ষিণ বাহুর মধ্যবর্তী অংশের প্রায় সম্পূর্ণটাই ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় অনাবৃত হয়েছে। অবশিষ্ট অংশে প্রাপ্ত অক্ষত ধ্বংসাবশেষের সূত্র ধরে বলা যায় যে এ বিহারের চারটি বাহুর পশ্চাৎভাগে ছিল ৩.৬০ মিটার পুরু বেষ্টনি প্রাচীর। এই প্রাচীর ঠেস দিয়ে ভিতরের দিকে এক সারি ভিক্ষু কক্ষ ছিল। প্রতিটি কক্ষের গড় পরিমাপ ৩.৭১ মিটার × ৩.২৭ মিটার। এর প্রত্যেকটি একটি ১.৭০ মিটার প্রশস্ত

almost levelled by ploughing. Remains of plinths of four different buildings were uncovered in the excavation of these mounds. Owing to the lack of stone in the neighbourhood the architects probably employed terra-cotta as the material for various architectural members such as lintels and pillars...The jambs and lintels are impressed with a number of round seals, bearing figures of Buddha,"—Ancient Monuments of East Pakistan, p. 109.—Dr. S. M. Hasan.

১. মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন : প্রত্নতত্ত্ব উদ্ভব ও বিকাশ, ১৮৭-৮৯ পৃ:।

দরজা দিয়ে সম্মুখ ভাগের ২.১০ মিটার প্রশস্ত টানা বারান্দার দিকে উন্মুক্ত। প্রতিটি কক্ষের দুই পাশের বিভাজক দেয়াল গড়ে ১.৭০ মিটার থেকে ১.৯৬ মিটার এবং সম্মুখের দেয়াল ২.৩২ মিটার চওড়া। অপরদিকে টানা বারান্দায় ঠেস দেয়াল ১.২৫ মিটার চওড়া। বিহারের মেঝে ১০ সে.মি. থেকে ১৪ সে.মি. পুরু। এ মেঝে নিরেট পিন্ডারের ইটের গুড়া দিয়ে নির্মিত হয়েছিল। বিহারটির নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত ইটের পরিমাপ ৩৬.৮ সে.মি. × ২৫.৪ সে.মি. × ৪.৫ সে.মি. থেকে ২৫.৪ সে.মি. × ২৩ সে.মি. × ৫ সে.মি.। এগুলি গাঁথা হয়েছিল আঠালো কাদা দিয়ে। বিহারের ম্যধ্যবর্তী অংশে খোলা চত্বর রয়েছে।





হরিশ চন্দ্র রাজার প্রাসাদ বা ঢিবি, সাভার, ঢাকা

"হরিশচন্দ্র রাজার প্রাসাদ ঢিবিতে প্রাপ্ত বিহারটির মধ্যেও একাধিক পুনর্নির্মাণ এবং একাধিক মেঝের চিহ্ন পাওয়া গেছে। উল্লিখিত স্থাপত্য কীর্তিগুলির সাথে মোট চারটি স্তর জড়িয়ে আছে। সবেচেয়ে উপরের স্তরে একটি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্য মুদ্রার সন্ধান পাওয়া গেছে। হরিকেল শ্রেণীর মুদ্রার শৈলীমণ্ডিত এই মুদ্রাগুলি খ্রিস্টীয় সাত আট শতকের নিদর্শন বলে অনুমিত হয়েছে। এ ছাড়া এ বিহারের বর্জ ও জঞ্জাল থেকে কয়েকটি ব্রোঞ্জ নির্মিত ধ্যানী বুদ্ধ ও গোটা কয়েক তান্ত্রিক মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি খ্রিস্টীয় আট নয় শতকের শিল্প শৈলী বহন করছে। এর ফলে এ বিহারের সময় কালকে আনুমানিক খ্রিস্টিয় সাত-দশ শতকে ন্যস্ত করা যায়।"

রাজাসন

রাজ বাড়ির পূর্বদিকে ছিল রাজাসন। মাঝখানে ছিল বৈদ বা বাইদ (*baid*) বলে কথিত একটি নদীর খাত। এখানে ছিল অসংখ্য ঢিবি এবং এগুলিতে ছিল প্রচুর প্রাচীন ইট ও পাথর। এ সমস্ত ঢিবি ও আশে পাশের স্থান থেকে অসংখ্য পোড়ামাটির চিত্রফলক ও গুপ্ত মুদ্রার অনুকরণে নির্মিত বেশ কিছু মুদ্রাও পাওয়া যায়। এসব প্রত্নবস্তুর বেশ কিছু নিদর্শন ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত ছিল।

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে রাজাসনের একটি ঢিবিতে বেসরকারিভাবে উৎখনন কার্য চালান হলে পোড়ামাটির ফলকে বহুসংখ্যক বুদ্ধ ও অন্যান্য মূর্তি পাওয়া যায়। এর পরে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক খনন কার্য পরিচালনার ফলে এখানে অনেক ইমারতের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁদের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, প্রাচীন নদীর দক্ষিণ দিকে

রাজাসন গ্রাম অবস্থিত ছিল এবং প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষে পূর্ণ ঢিবিগুলিতে কৃষকেরা চাষবাসের কাজ করতেন। তখন পর্যন্ত মাত্র ৪ টি অনুচ্চ ঢিবি টিকে ছিল এবং এগুলির মধ্যবর্তী এলাকা চাষবাসের ফলে সমতল ভূমিতে পরিণত হয়েছিল। ঢিবিগুলি খনন করে ৪ টি ইমারতের ভিত্তিবেদী বের করা হয়। এই অঞ্চলে পাথরের অস্তিত্ব না থাকায় খুব সম্ভব 'লিনটেল' (lintel) এবং স্তম্ভগুলিতে পোড়ামাটির উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছিল।

খননের ফলে পোড়ামাটির ফলকে নির্মিত আরও অনেক বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হয়। গর্তগুলি ভর্তি করার সময় একটি মূল্যবান বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হয়। মূর্তির পাদদেশে 'ভগবতে বাসুদেব্যায়' কথা ক'টি খোদিত ছিল। এ স্থান সম্পর্কে ডক্টর ভট্টশালী বলেন যে এখানকার মূর্তি পাদমূলে উৎকীর্ণ লিপি, গুপ্তোত্তর কালের মুদ্রা এবং পাথরের অনুপস্থিতি প্রমাণ করে যে, এখানকার ধ্বংসাবশেষগুলি সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর।[১] অন্যত্র তিনি আবার বলেন যে প্রায় ১২০০ বছর আগে এখানে একটি নগরী ছিল।[২]

লালমাটিতে গঠিত ও একাধিক নদী পরিবেষ্টিত এই অঞ্চলে প্রাচীনকালে যে একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদের অস্তিত্ব ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেই জনপদে প্রশাসনিক এবং সেই সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্রও ছিল। ধর্মকেন্দ্রে অন্যান্য ইমারতের মধ্যে অন্তত একটি বৌদ্ধ বিহার যে ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আংশিক উৎখননের ফলে ইমারতাদির যে সব ভিত্তি প্রাচীর বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে সেগুলি ছিল খুব সম্ভব একটি বৌদ্ধ বিহারের। এখানকার রাজাসন নাম (রাজাসন<বাজাসন<বজ্রাসন) বজ্রাসন থেকে এসেছে, ডক্টর ভট্টশলীর এই অনুমান অত্যন্ত যুক্তিসহ বলে মনে হয়।

এ স্থানের কোনো সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। জনৈক রাজা হরিশচন্দ্রকে এ স্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়। রাজা হরিশচন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত বলে কথিত আরও বহুস্থান এদেশে আছে। কিন্তু এ নামের কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তির সন্ধান বাঙলার প্রামান্য ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

১৯১৮ সালের দিকে ও পরে এখানে ডক্টর নলিনী কান্ত ভট্টশালী ও অন্যান্য কর্তৃক দুই দফা প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বৌদ্ধধর্মীয় প্রত্নবস্তু ও গুপ্ত অনুকৃত মুদ্রা পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় বিচ্ছিন্ন ধরনের কিছু স্থাপত্যিক নিদর্শন। কিন্তু অত্যধিক ধ্বংসাবস্থার কারণে স্থাপত্য নিদর্শনগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও ব্যাপ্তি নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। তবে এখানে প্রাপ্ত পোড়ামাটির চিত্রফলক ও সারিবদ্ধ ধ্যানী বুদ্ধ মূর্তি দেখে ধারণা করা যায় যে, এগুলি একটি মহাযানী বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের স্মৃতি বহন করছে এবং সেসব প্রতিষ্ঠান খ্রিস্টীয় সাত থেকে দশ শতকের হতে পারে।

১. "These inscribed figures, the discovery of post-Gupta gold coins, the use of terra-cotta and total absence of stone, point to the 7th-8th century A.D. as the age of the ruins of Sabhar."—Ioconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in Dacca Museum p vii.

২. "Sabhar was a city, nearly 1200 years ago."—Ibid, p. XI.

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ ও মুসলিম আমল

ধামরাই

সাভারের উত্তর-পশ্চিমে বংশাই নদীর ডানতীরে এবং নয়ারহাট ব্রীজের পশ্চিম-উত্তরে ধামরাই নামক একটি প্রাচীন স্থান আছে। বৌদ্ধ 'ধর্মরাজিকা' শব্দ থেকে ধামরাই নামের উৎপত্তি বলে অনেকে অনুমান করেন। আবার কেউ কেউ বলেন যে, দামো ঘোষের 'দামো' ও তাঁর স্ত্রী 'রাই'-এর নাম থেকে দামোরাই এবং তা থেকে ধামরাই নামের উৎপত্তি। তবে এস্থানে যে বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র ছিল, তাতে বোধ হয় কোনো সন্দেহ নেই। পরে এখানে হিন্দু ও মুসলিম ধর্মকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।

এখানে হাজী-গাযীর মাযার প্রাঙ্গণের তোরণের দু'পাশে প্রায় এক মিটার উঁচু ও গ্রানাইট পাথরে তৈরি দুটি প্রস্তরস্তম্ভের অবস্থান নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, এখানে অন্তত গুপ্ত যুগেরও আগে এমন একটি প্রতিষ্ঠান ছিল যাব তোরণটি নির্মিত হয়েছিল গ্রানাইট পাথর দিয়ে। এই তোরণের সঙ্গে সঙ্গত কারণেই যুক্ত হয়ে আছে এখানে বৌদ্ধ ধর্মের ধর্ম বাজিচার ট্রাডিশন। সেই ট্রাডিশন থেকেই যে ধামরাই নামের উৎপত্তি তা অনুধাবন করতে অসুবিধা হয় না।

এখানে পাঁচপীরের মাযার আছে। এঁদের মধ্যে মীর সৈয়দ আলী তিরমিজীর কবর একটি আধুনিক কালের বর্গাকৃতির ইমারতের মধ্যে আছে। ইমারতের পশ্চিম দেয়ালে হোসেন শাহ্‌র আমলের একটি মসজিদের শিলালিপি (১৫১৬ খ্রি) আছে। মসজিদটি বর্তমানে টিকে নেই। এখানে ১৪৮২ খ্রিস্টাব্দে আখোন্দশীর নামক একজন নৌসেনাপতি একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন বলে আর একটি শিলালিপি থেকে জানা গেছে। এটি স্থানীয় একটি বাড়িতে আছে বলে ডক্টর দানী 'ঢাকা' (Dacca) নামক গ্রন্থে (২৬৬ পৃ.) উল্লেখ করেছেন।* দরগাটি এর আগেই এখানে ছিল বলে ডক্টর দানী অনুমান করেন। দরগার দক্ষিণে ৫টি পাকা কবর আছে। দুটি কবর একই বেদীতে অবস্থিত। এতে যে শিলালিপি আছে, তা থেকে জানা যায় যে, ১১৫৩ হিজরী (১৭৪০ খ্রিঃ) সনে আবদুর রসুল নামক এক ব্যক্তি এ মাযার নির্মাণ করেছিলেন।

এগুলির পরে উত্তর-পশ্চিম দিকে পাঁচপীরের মধ্যে হাজী ও গাযী নামক দু'জন পীরের মাযার আছে। বর্গাকারে নির্মিত এক গম্বুজবিশিষ্ট এই ছোট ইমারত ৯৫৫ হিজরী (১৫৪৮ খ্রিঃ) সনে নির্মিত হয়েছিল বলে মাযার সংলগ্ন শিলালিপি থেকে জানা যায়। বর্তমান মাযার ইমারত যে আধুনিক কালে নতুন করে করা হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। এরপরে আছে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের (১২৮৪ বঙ্গাব্দের) সৈয়দ আতাউর রহমান আলভীর মাযার। এর পরে আছে শাহ্ জঙ্গীপীর ও মীর মখদুম-এর মাযার।

এর পরে হিন্দু পল্লী। সেখানে আছে যশো-মাধবের মন্দির। মন্দির ও ভিতরের বিগ্রহ আধুনিক কালের। কিন্তু সম্রাট অওরঙযেবের সময় থেকে এই আকর্ষণীয় মন্দির ও বিগ্রহের ট্র্যাডিশন চলে আসছে। ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দে খানাজাত মোহাম্মদ মাযহার নামক জনৈক শাসনকর্তা এ মন্দিরের জন্য ৩১ বিঘা ভূমি দান করেছিলেন। এখানে দশ

---

* 'মিঞাবাড়ি' নামে সাইনবোর্ড দেওয়া একটি বাড়িতে অতি যত্নের সঙ্গে রক্ষিত শিলালিপিটি আমাদের দেখার সুযোগ হয়েছে বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে।—গ্রন্থকার

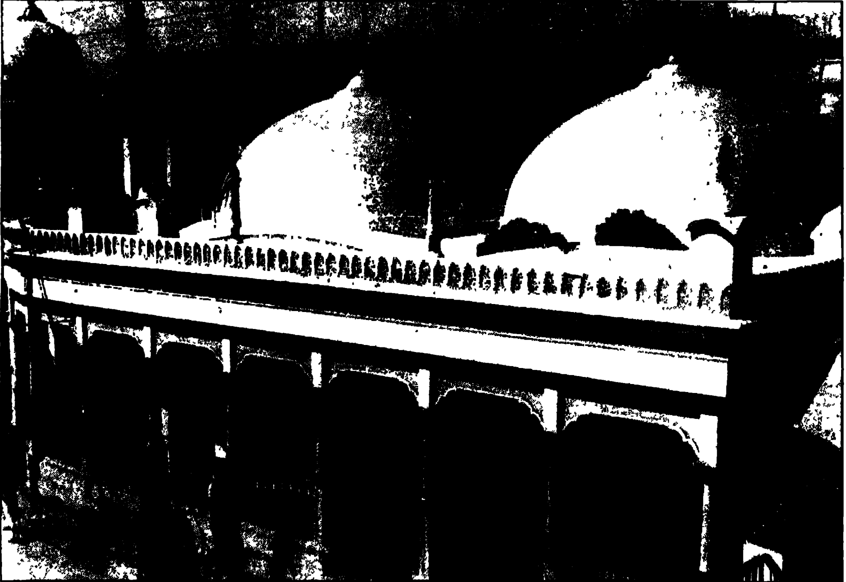
অবতারসহ একটি কাঠের বিষ্ণুমূর্তিও আছে। ধামরাইয়ের এককালের বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু ছিল ৩২ চাকার উপর প্রতিষ্ঠিত কাষ্ঠনির্মিত একটি রথ। এখানে রথযাত্রার সময় অসংখ্য লোকের সমাবেশ হত বহুকাল আগে থেকেই। ধামরাইয়ের রথের মেলা পূর্ববঙ্গে অত্যন্ত সুপরিচিত ছিল। হাল আমলেও তা বেশ ভাল ভাবেই জমে।

মুসলিম আমল

ঢাকা নগরের কীর্তি

বিনতবিবির মসজিদ

মোঘলদের আগমনের বহু আগে থেকেই যে ঢাকাতে একটি নগর ছিল, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তবে প্রাক-মোঘল আমলের খুব বেশি প্রাচীন কীর্তি বর্তমানে টিকে নেই। সে কালের যে-ইমারতটি আজও অনেক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত অবস্থায় টিকে আছে, তা হচ্ছে বিনতবিবির মসজিদ। ঢাকা নগরীর পূর্ব ভাগে নারিন্দা পুলের কাছে এ মসজিদ অবস্থিত। বর্গাকৃতির এ মসজিদের ভিতরের দিকের আয়তন ছিল ৩.৬৩ মিটার × ৩.৬৩ মিটার। মসজিদের দেয়ালগুলি ১.৮১ মিটার প্রশস্ত। চারকোণে আছে ৪টি অষ্টকোণাকৃতির মিনার বা টারেট। পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর দেয়ালে আছে ১টি করে প্রবেশ পথ। মসজিদের দেয়ালে কোনো পোড়ামাটির চিত্রফলক ছিল কিনা, তা বলা কঠিন। কারণ, বর্তমানে মসজিদের গায়ে যে পলেস্তরা আছে, আগে তা ছিল না। মসজিদের উপরে ছিল ১টি মাত্র গম্বুজ।



▲ বিনত বিবির মসজিদ, ঢাকা

হাল আমলে মসজিদের সঙ্গে আরও ১টি এক গম্বুজওয়ালা কক্ষ এবং পূর্ব দিকে একটি পাকা বারান্দা যোগ করা হয়েছে। তাছাড়া, এতে আরও অনেক নতুন কাজ হয়েছে। ফলে এটি যে একটি অতি পুরাতন মসজিদ, তা সহজে চেনার উপায় নেই।

মসজিদের গায়ে যে শিলালিপি আছে, তা থেকে জানা যায় যে, জনৈক মরহমতের কন্যা মোসাম্মৎ বখত বিনত ('মোসাম্মৎ বখত বিনত দোখতর-ই-মরহমত') নামক একজন মহিলা ৮৬১ হিজরী (১৪৫৬ খ্রিঃ) সনে এ মসজিদ নির্মাণ করেন। তখন বাঙলার সুলতান নাসির-উদ্-দীন মাহমুদ শাহ্‌র রাজত্বকাল। কিন্তু শিলালিপিতে কোনো সুলতানের নাম নেই। লিপিপ্রমাণে এটিই ঢাকার প্রাচীনতম মসজিদ।

নসওয়ালগলি তোরণ ও মসজিদ

ঢাকা কেন্দ্রীয় জেলখানার পশ্চিম দিকে প্রাচীন 'গিরদী-কিল্লা' এলাকায় নসওয়ালগলি নামক রাস্তায় একটি প্রাচীন তোরণ ও মসজিদ ছিল। বর্তমানে এ দুটি কীর্তির কোনও চিহ্ন নেই। মসজিদের গায়ে একটি শিলালিপি ছিল। ঢাকা জেলা প্রশাসকের অফিসে এটি রক্ষিত ছিল। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে মিঃ ব্লকম্যান কর্তৃক এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে মৌলভী শামস-উদ্-দীন এটি প্রকাশ করেন। লিপির বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ :

"মহান আল্লাহ্ বলেছেন, 'নিশ্চয়ই মসজিদ আল্লাহ্‌র সম্পত্তি, অতএব আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে অংশীদার করো না।' আল্লাহ্‌র খলিফা সুলতান নাসির-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ্-দীন আবুল মোযাফ্‌ফর মাহ্‌মুদ শাহ্‌র—মহান আল্লাহ্ তাঁর রাজ্য চিরস্থায়ী করুন!—রাজত্বকালে খাজা জাহান উপাধিধারী এক ব্যক্তি কর্তৃক—করুণাময় আল্লাহ তাঁকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করুন!—মোবারকাবাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ৮৬৩ হিজরী সনের ২০শে শা'বান (২৫শে জুন, ১৪৫৯ খ্রিঃ) এই তোরণ সুদৃঢ় ও নির্মাণ করা হয়। তাঁর উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক।"

শিলালিপির মোবারকাবাদের সঠিক পরিচয় জানা যায় না। তবে এ স্থানের নামকরণ সোনার গাঁয়ের সুলতান ফখর-উদ্-দীন মোবারক শাহ্‌র (১৩৩৮-৫০ খ্রিঃ) নামানুসারে হয়েছিল বলে ধারণা হয়। ঢাকা শহরের এ স্থান ছিল মোবারকাবাদের প্রত্যন্ত ('হদ্দ্-ই-মোবাকরাবাদ') অঞ্চল। পূর্বদিকে নারিন্দায় বিনত বিবির মসজিদ ও পশ্চিম দিকে আলোচ্য তোরণ ও মসজিদের অবস্থান নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, সুলতান নাসির-উদ্-দীন মাহ্‌মুদ শাহ্‌র আমলে ঢাকাতে একটি উল্লেখযোগ্য জনপদের অস্তিত্ব ছিল।

মোঘল আমলের কীর্তি

মোঘলদের পূর্বে ঢাকা শহরটি কত বড় ছিল এবং তার স্বরূপ কী ছিল, তা সঠিকভাবে জানার উপায় নেই। কারণ, উপরে উল্লিখিত দুটি কীর্তি ছাড়া প্রাক-মোঘল আমলের অন্য কোনো কীর্তির সন্ধান এখন আর পাওয়া যায় না। সেই শহরটি খুব সম্ভব খুব বড়

১. Inscriptions of Bengal, Vol. IV, pp. 62-64. Mvi Shamsuddin Ahmad.

ছিল না। সেই পুরাতন ছোট শহরটিকে একটি বিরাট নগরীতে রূপান্তরিত করার কৃতিত্ব ছিল মোঘলদের। মোঘলদের সময়ে ঢাকা নগরে অসংখ্য ইমারতাদি নির্মিত হয়।

এগুলির মধ্যে ছিল মসজিদ, মাযার, কাটরা, রাজপ্রাসাদ, দুর্গ, সেতু, মন্দির, গির্জা ইত্যাদি ইত্যাদি। সে সময়ের সব ক'টা কীর্তি বর্তমানে টিকে নেই। কয়েকটি কীর্তি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কতগুলি কীর্তি পরিবর্তিত অবস্থায় এখনও কোনো রকমে টিকে আছে। আর অনেক কীর্তি সংস্কারের পর এখনও ভাল অবস্থায়ই টিকে আছে।

নিচে ঢাকা শহরের কীর্তিগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হল। পাঠকের সুবিধার জন্য কীর্তিগুলিকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করে এগুলির বর্ণনা দেওয়া হল। এই বিভাগগুলি হচ্ছে, (১) লালবাগ এলাকা, (২) চকবাজার এলাকা, (৩) ধানমণ্ডী এলাকা, (৪) রমনা এলাকা ও (৫) ঢাকা শহরের অন্যান্য এলাকা।

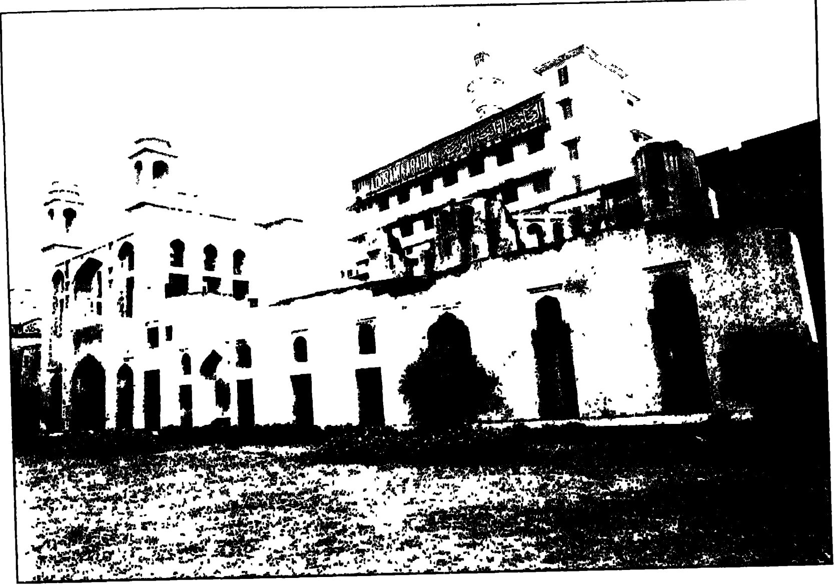
লালবাগ দুর্গ ও অন্যান্য কীর্তি

দুর্গ

লালবাগ দুর্গ নামে অধিক পরিচিত হলেও এ দুর্গের আদি ও পোশাকী নাম অওরঙাবাদ দুর্গ। ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট অওরঙযেবের পুত্র শাহ্জাদা আ'যম যখন বাঙ্লার সুবাদার হয়ে আসেন, তখন তিনি এ দুর্গের নির্মাণ কার্য আরম্ভ করেন বলে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু দুর্গ নির্মাণের কার্য সমাপ্ত করার আগেই মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য সম্রাট তাঁকে ডেকে নিয়ে যান এবং তাঁর আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব পড়ে তাঁর পরবর্তী সুবাদার নওয়াব শায়েস্তা খানের উপর। নবাব শায়েস্তা খান দুর্গে অনেক কাজ করলেও যে কোন কারণেই হোক এর নির্মাণকার্য সমাপ্ত করেননি বলে বলা হয়ে থাকে।[১] তিনি এখানে বসবাস করতেন বলেও বলা হয়ে থাকে।

১. এ প্রসঙ্গে **আজাদ আল হোসায়নী** : নওবাহার-ই-মুর্শিদ কুলী খানী, ১৩৫-১৩৭ পৃ:। আ.ক.মো. যাকারিয়া কর্তৃক অনূদিত ও বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'মোজাফ্ফর নামা ও নওবাহার-ই-মুর্শিদ কুলী খানী গ্রন্থ দ্র:।

এ ধরনের বক্তব্য মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। শাহজাদা আ'যম-১৬৭৮-৭৯ খ্রিস্টাব্দে সর্বসাকল্যে ১৫ মাস ঢাকায় ছিলেন। সেই স্বল্প সময়ে তিনি ঢাকাতে যে সব কাজ করেছিলেন সে সবের বিস্তারিত বর্ণনা প্রায় সমসাময়িককালে (১৭২৯ খ্রি:) আজাদ আল হোসায়নি কর্তৃক রচিত এবং উপরের উল্লিখিত 'নও বাহার-ই-ইমুর্শিদ কুলি খানি' গ্রন্থে আছে। সেখানে বলা আছে যে, ঢাকার বর্তমান কেন্দ্রীয় কারাগারের উত্তরভাগে অবস্থিত একটি বিল ভরাট করে তিনি জনসাধারণের জন্য একটি পাব্লিক হল নির্মাণ করেন। তিনি ঢাকা শহরের ইসলামপুর সড়ক পাকা করেন। রাজপথ দিয়ে চলাকালে তিনি এক বিবাহ অনুষ্ঠানে এক তোড়া মুদ্রা উপহার দেন। হাতিতে চড়ে মফস্বলে যাওয়ার কালে শাহ্জাদা চৌবাচ্চায় করে রঙিন মাছ নিয়ে যেতেন এবং শিবিরের সামনে সেই মাছের ঘোলা দেখতেন, এত সব সাধারণ ঘটনার বর্ণনা যেখানে আছে, লালবাগ দুর্গ ও দুর্গ মসজিদের মতো বিরাট কীর্তি নির্মাণের বর্ণনা সেখানে থাকবে না তা কল্পনাও করা যায় না। আর লালবাগ দুর্গের অসমাপ্ততার কথা যা বলা হয়েছে তাও ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে হালআমলে যে পূর্ণাঙ্গ উৎখনন কার্য করা হয়েছে তার

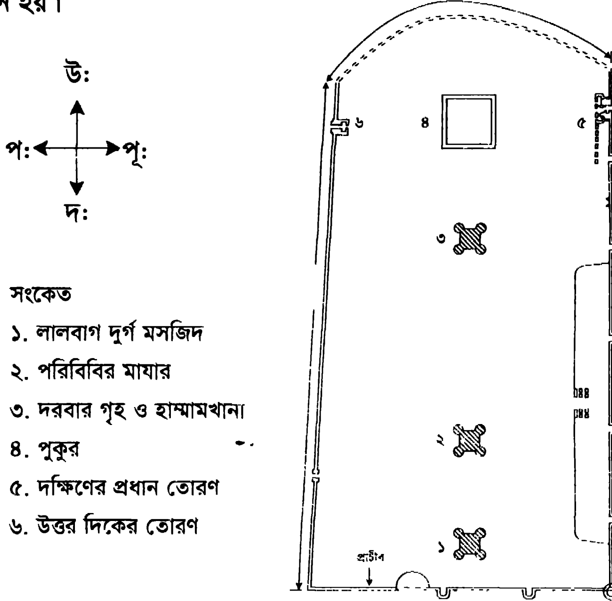


▲ দক্ষিণ তোরণ, লালবাগ দুর্গ, ঢাকা

পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা এ দুর্গের আয়তন ৬০৬.০৬ মিটার × ২৪২.৪২ মিটার। চারদিকে ইষ্টক নির্মিত উঁচু প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল এই দুর্গ। প্রায় ১.১৩ মিটার পুরু দেয়ালগুলির উচ্চতা উত্তর, পর্ব ও পশ্চিম দিকের কিছু অংশে প্রায় ৪.৫৪ মিটার। দক্ষিন দিকের দেয়ালে বেশ বৈচিত্র্য আছে। দক্ষিণ দেয়ালের পূর্বভাগে দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের কাছে প্রধান তোরণ অবস্থিত। দক্ষিণ দেয়ালে দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ পর্যন্ত পরপর ৫টি প্রায় অষ্টকোণাকারের বুরুজ (bastion) ছিল। কামান রাখা ও দাগার সুবিধার জন্য বুরুজগুলি নির্মিত হয়েছিল। পাশের সমতল ভূমি থেকে দক্ষিণ প্রাচীরের উচ্চতা প্রায় ৬.০৬ মিটার। দেয়ালের উপরের ১.২১ মিটার অংশ বাইরেব দিকে আস্তরের উপর মার্লন (merlon) নকশায় অলঙ্কৃত ছিল। এই ৬.০৬ মিটার উঁচু প্রাচীরের ১.২১ মিটার পিছনে ১.০৬ মিটার পুরু ও ৩.৬৩ মিটার উঁচু আর একটি প্রাচীর ছিল। সেই প্রাচীরের কিছু অংশ দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এখনও টিকে আছে। কোনো কোনো স্থানে, যেমন দক্ষিণ দেয়ালের পূর্বাংশে ও পশ্চিম দেয়ালের দক্ষিণাংশে এই অতিরিক্ত ৩.৬৩ মিটার উঁচু দেয়াল মূল প্রাচীর থেকেই সোজা উপরে উঠে আছে। কামান বসানোর জন্য যে-বুরুজগুলি নির্মিত হয়েছিল, সেগুলির নিচের অংশ প্রতিরক্ষা দেয়াল পর্যন্ত মাটি দিয়ে ভরাট করে দেওয়া হয়েছিল।

ভিত্তিতে। তাতে দেখা গেছে যে, ছাদের উপরে উদ্যান, দুর্গের ভিতরে পানির ফোযারা, হাম্মামখানা ইত্যাদি ইত্যাদিসহ এটি ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ দুর্গ এবং শায়েস্তাখানই ছিলেন এর নির্মাতা।—গ্রন্থকার

দক্ষিণ দিকের প্রতিরক্ষা দেয়ালকে অবলম্বন করে দুর্গের দক্ষিণ ভাগে বুরুজের নিচে ও অন্যান্য অংশে অনেকগুলি কক্ষ নির্মিত হয়েছিল। সংস্কারের অভাবে এসমস্ত কক্ষ নষ্ট হয়ে যায় এবং ইংরেজ আমলে এগুলি মাটি দিয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়। পশ্চিমদিক থেকে দ্বিতীয় বুরুজের কাছে মাটির নিচে একটি জটিল নকশার কক্ষ আবিষ্কৃত হয়েছিল। এ কক্ষ থেকে বাইরের দিকে যাবার কয়েকটি গেপান পথ বা সুড়ঙ্গের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়। সেটি এখন মাটি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই কক্ষটি সম্পর্কে অনেক অলীক কাহিনী শোনা যায়। কিন্তু সে সব কাহিনী ভিত্তিহীন বলেই মনে হয়।



লালবাগ দুর্গের ভূমি-পরিকল্পনা, ঢাকা

দক্ষিণ তোরণ

দুর্গের সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থাপত্য নিদর্শন হল এর দক্ষিণ-তোরণ। তিনতলবিশিষ্ট এ তোরণের উপরতলার কাজ কিছুটা অসমাপ্ত। "এর সম্মুখ ভাগের সুউচ্চ দুই দিক দুইটি সরু মিনার দ্বারা সুশোভিত। নিচের তলার তোরণপথের ছাদ আস্তরে তৈরি প্যানেল শোভিত একটি বৃহৎ অর্ধগম্বুজ। তোরণের সম্মুখের দুই পার্শ্ব তিন ধাপে উপরে উঠেছে। প্রথম-ধাপ একটি অর্ধ গম্বুজ ছাদবিশিষ্ট আস্তরে তৈরি প্যানেল অলংকৃত কুলঙ্গির মতো। পরবর্তী দুইটি ধাপ বাইরের দিকে প্রসারিত ত্রিকোণ জানালার মতো। নীচের অর্ধগম্বুজ থেকে উদ্‌গত অংশের উপর ভিত্তি করে তিনটি সরু পাথরের থাম সোজা উপরে প্রথমে দ্বিতল ও পরবর্তী পর্যায়ে ত্রিতল পর্যন্ত উঠেছে। থামের উপর পাথরের ব্রাকেট সংস্থাপন করে দোতলার সমতল ছাদ করা হয়েছে। কিন্তু তিনতলা অর্ধ গম্বুজাকার এবং এর প্রান্তগুলি বাইরের দিকে প্রক্ষিপ্ত। ফটকের সম্মুখ ও প্রবেশকক্ষের মধ্যবর্তী স্থানে আসল

তোরণটি পাথরের খিলানের উপর তৈরি। ছাদ চারদিক থেকে গম্বুজের মতো উপরে উন্নীত হলেও কেন্দ্রস্থল আয়তাকার। পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ প্রবেশকক্ষের দুই দিকে দইটি অর্ধগম্বুজকে ভিত্তি করে প্রবেশকক্ষের গম্বুজাকৃতি ছাদ তৈরি করা হয়েছে। 'গালিবকারী' গম্বুজ নামে পরিচিত এই ছাদও সুন্দরভাবে প্যানেল দ্বারা অলংসৃত। প্রবেশকক্ষের উত্তরের দুই পার্শ্বও তোরণের সম্মুখভাগের মত সুউচ্চ ও অনুরূপ। এই অংশে উদগত জানালা ও মিনার সংযোজন করা হয়নি তবে এর দুই পার্শ্ব খোলা মণ্ডপের মতো আরো উপরে বর্ধিত করে গম্বুজ দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে।"[১]

অন্যান্য তোরণ

দক্ষিণ তোরণের বরাবর উত্তর দেয়ালে একটি তোরণ আছে। এটি অপেক্ষাকৃত ছোট। এর আকৃতি ও নির্মাণকৌশল কিছুটা দক্ষিণ তোরণের মতই। কিন্তু এর কাজ শেষ করা হয়নি। এ তোরণ থেকে প্রায় ২৩৭ মিটার পশ্চিমে আর একটি তোরণের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু এটি অসমাপ্তভাবে পরিত্যক্ত হয়েছিল।

নিচের সমতল ভূমি থেকে দক্ষিণ প্রাচীরের উচ্চতা ছিল প্রায় ৬.০৬ মিটার। প্রাচীরের উপরের ১.২১ মিটার (৪´) অংশ বাইরের দিকে আস্তরের উপর মারলন (merlon) নকশায় অলঙ্কৃত ছিল। এই ৬.০৬ মিটার উঁচু প্রাচীরের ১.২১ মিটার পিছনে ১.০৬ মিটার পুরুত্ব ৩.৬৩ মিটার উঁচু আর একটি প্রাচীর ছিল। সেই প্রাচীরের কিছু অংশ এখনও (২০০০ খ্রিঃ) দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে টিকে আছে। কোনো কোনো স্থানে, যেমন দক্ষিণ প্রাচীরের পশ্চিমাংশে ও পশ্চিম দিকের প্রাচীরের দক্ষিণভাগে, এই অতিরিক্ত ৩.৬৩ মিটার উঁচু প্রাচীর মূল প্রাচীর থেকেই সোজা উপরে উঠে আছে। কামান বসানর সুবিধার জন্য যে সব বুরুজ নির্মিত হয়েছিল, সেগুলির নিচের অংশ প্রতিরক্ষা প্রাচীর পর্যন্ত মাটি দিয়ে ভরাট করে দেওয়া হয়েছিল।

দুর্গের দক্ষিণ দিকের প্রাচীরকে অবলম্বন করে দুর্গের দক্ষিণভাগে পশ্চিম দিকের বুরুজগুলির নিচেও সংশ্লিষ্ট উত্তরের অংশে অনেকগুলি কক্ষ নির্মিত হয়েছিল। সংস্কারের অভাবে এসব নষ্ট হয়ে যায়। তবে ১৯৩৯ সালেও আমরা সরেজমিনে তদন্ত করে কিছু কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত কক্ষের অস্বিত্ব দেখেছিলাম। কিন্তু বিষাক্ত গ্যাসের অস্তিত্বের কারণে সে সব কক্ষে প্রবেশ করা বিপজ্জনক ছিল বলে কেউ সেগুলির ভিতরে যেতেন না এবং সেখানে যাওয়াও নিষেধ ছিল। এরপরে কোনো একসময়ে কক্ষগুলি মাটি দিয়ে ভরাট করে দেওয়া হয়। তখন সমগ্র লালবাগ দুর্গে ছিল পুলিশ বিভাগের দফতর (১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে অনেক কষ্টে পুলিশ দফতরকে সেখান থেকে সরান হয়)।

এরপরে উপরে উল্লিখিত কক্ষগুলির স্থানে কিছু কিছু উৎখনন কার্য করার ফলে পশ্চিমদিক থেকে দ্বিতীয় বুরুজের কাছে মাটির নিচে একটি জটিল নকশার কক্ষ আবিষ্কৃত হয়েছিল। এই কক্ষ থেকে বাইরের দিকে যাওয়ার জন্য কয়েকটি গোপন পথ বা সুড়ঙ্গের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়। সেই কক্ষ ও গোপন পথ নিয়ে অনেক চমকপ্রদ

---

১. লালবাগ দুর্গ ও যাদুঘর পুস্তিকা।—এ, কে, এম, শামসুল আলম।

কাহিনী শোনা যায় এবং সেগুলি অলীক বলেই মনে হয়। সে সময়ে কক্ষগুলি মাটি দিয়ে ভরাট করে দেওয়া হয়।

সেই অবস্থায় দীর্ঘদিন থাকার পর বিংশ শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে সেই অংশে নতুন করে উৎখননকার্য করা হয়। তখন উপরে উল্লিখিত জটিল নকশার কক্ষ, সুড়ঙ্গপথ সহ আরও কিছু কিছু চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কৃত হয় এবং জানা যায় যে, দুর্গের লাগোয়া দক্ষিণে অবস্থিত বুড়িগঙ্গা নদী থেকে পার্শিয়ান হুইলের সাহায্যে পানি উত্তোলন করে তা পাইপের সাহায্যে সমগ্র দুর্গে সরবরাহ করা হত। দুর্গ এলাকায় উৎখনন করে আরও জানা যায় যে, সমগ্র দুর্গ এলাকায় মাটির নিচ দিয়ে 'সোয়ারেজ' ব্যবস্থাও ছিল। সোয়ারেজ ব্যবস্থা পুনরায় স্থাপন করা না গেলেও দুর্গ এলাকায় আগেকার দিনে পানি সরবরাহের মাধ্যমে যে ফোয়ারা ব্যবস্থা ছিল তা নতুন করে চালু করা হয়েছে। অবশ্য বর্তমান কালের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে বিদ্যুতের সাহায্যে পানি উত্তোলন করে, আগেকার দিনের মতো পার্শিয়ান হুইলের সাহায্যে নয়।

উদ্যান : দক্ষিণ দিকের প্রাচীরকে অবলম্বন করে দুর্গে যে সব কক্ষ নির্মিত হয়েছিল সেগুলির উপরে ছিল সুদৃঢ় ছাদ এবং বিরাট আয়তনের সেই ছাদের উপরে ছিল একটি উদ্যান। উৎখননের পরে সেই ছাদের যে সব অংশ আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, সেই ছাদ ছিল অতিশয় সুদৃঢ়।

পুকুর

দক্ষিণ ও উত্তর দেয়ালের মাঝামাঝি অংশে দুর্গের পূর্বদিকে ঘেঁষে একটি পুকুর আছে। বর্গাকারে নির্মিত এ জলাশয়ের প্রত্যেক বাহু ৭১.২১ মিটার দীর্ঘ এবং পাড়গুলি বাঁধান ছিল। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় নিহত এ দেশীয় সিপাহীদের লাশ পুকুরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল বলে জানা যায়। বিদ্রোহের পরে বহুকাল পর্যন্ত এ স্থান পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং মানুষ এই এলাকায় বাস করতে সাহস পেতেন না। লালবাগে পুলিশ থানা প্রতিষ্ঠিত হবার পর পুকুরটি নতুন করে খনন করা হয় এবং দক্ষিণ পাড়ে একটি আধুনিক ঘাট নির্মাণ করা হয়। দুর্গে পানি সরবরাহের জন্য এই সুন্দর জলাশয় খনিত হয়েছিল দুর্গ নির্মাণের সময়েই।

দরবরাগৃহ ও হাম্মাম খানা

পুকুরের ৩৯.৫ মিটার পশ্চিমে আয়তাকারে নির্মিত যে দোতলা ইমারতটি আছে, তার নিচের তলার আয়তন ৩২.৪৪ মিটার × ৬.১৮ মিটার। লালবাগ দুর্গে থানা থাকাকালীন এ গৃহের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর কর্তৃক এ গৃহটিকে যথাসম্ভব আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা (restored) হয়েছে।

নিচের তলার পূর্ব দেয়ালে ৭টি দরজা আছে। এ গৃহের নিচের তলার কেন্দ্রস্থলে ছিল হাম্মামখানা। হাম্মামখানাটিকে সংস্কার করে যতদূর সম্ভব আগের অবস্থায় আনা হয়েছে। উপর তলায় ছিল দরবারগৃহ।



হাম্মামখানা, লালবাগ দুর্গ, ঢাকা

শাহ্‌জাদা আ'যম এ গৃহ নির্মাণ করেছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে। তবে এ বর্ণনা ভিত্তিহীন, কারণ তিনি এতে বাস করেছিলেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বর্তমান জেলাখানায় যে-প্রাচীন দুর্গ ছিল, তিনি সেখানেই বাস করতেন বলে জানা যায়। এই দুর্গে নওয়াব শায়েস্তা খান কিছুকাল বাস করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

পরীবিবির মাযার

দরবারগৃহ থেকে ৮১.৩৩ মিটার পশ্চিমে অবস্থিত পরীবিবির মাযার বাংলাদেশের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও বিরল পুরাকীর্তি। এদেশে এই একটি মাত্র স্থাপত্য নিদর্শন আছে যেখানে বিভিন্ন প্রকারের দুষ্প্রাপ্য পাথরের ব্যবহার দেখা যায়। রাজমহল থেকে কাল পাথর, চুনার থেকে ধূসর বর্ণের বেলে পাথর ও জয়পুর থেকে শ্বেত বর্ণের মর্মর পাথর এনে এখানে লাগান হয়েছে। মুসলিম ও হিন্দুস্থাপত্যের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এই স্মৃতিসৌধ নির্মিত। [পরিবিবির মাযারের রঙিন ছবি-২০]

১৮.১৮ মিটার বাহুবিশিষ্ট, বর্গাকারে নির্মিত ও পাথরে-বাঁধান একটি অনুচ্চ বেদীর (platform) উপরে এই ইমারত নির্মিত। এর চারকোণে ৪টি অষ্টকোণাকৃতির মিনার বা টারেট আছে। মিনারগুলি প্যানেল দ্বারা অলঙ্কৃত। মিনারগুলি ছাদের অনেক উপরে উঠে গেছে এবং এগুলির শীর্ষদেশ নিরেট ছোট গম্বুজ দ্বারা সুশোভিত। মাযারের চারদিকেই ৩টি করে দরজা রয়েছে। কেন্দ্রীয় দরজা আকারে অপেক্ষাকৃত বড় ও অধিক আকর্ষণীয়। "একটি অর্ধগম্বুজের নীচে চারকেন্দ্রীয় খিলানের আকারে নির্মিত মধ্যবর্তী

দরজা পাশের দরজাগুলি থেকে আকারে বৃহৎ ও এর ঈষৎ উঁচু দুই পার্শ্ব খাঁজকাটা সরু মিনার দ্বারা বেষ্টিত।" দরজায় কাল পাথরের চৌকাঠ। পাশের দরজাগুলির উপরদিকে অর্ধগম্বুজের নিচে খিলানাকারে তৈরি জানালা রয়েছে। মিনারগুলির মতো সামনের দেয়ালও সামান্য অন্তপ্রবিষ্ট প্যানেল (panel) দ্বারা অলঙ্কৃত।

ভূমি পরিকল্পনায় এই ইমারতে কিছু নতুনত্ব আছে। এর অভ্যন্তর ভাগ ৯ ভাগে বিভক্ত। কেন্দ্রীয় কক্ষে পরীবিবির মাযার। বর্গাকারে নির্মিত এ কক্ষের প্রত্যেক বাহু ৫.৮২ মিটার লম্বা। এর চার কোণে যে বর্গাকৃতির ৪টি কক্ষ আছে এইগুলির প্রত্যেকটির বাহু ৩.৩ মিটার করে লম্বা। আয়তাকারে নির্মিত পাশের ৪টি কক্ষে প্রত্যেকটির আয়তন '২৪´-৮.৫´´ × ১০´ ৮.৫´´'।

কেন্দ্রীয় কক্ষের প্রবেশপথ বর্তমানে দক্ষিণ দেয়ালের কেন্দ্রীয় দরজাটি। আদিতে সমাধিকক্ষের চার দেয়ালে ৪টি প্রবেশপথ নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম দিকের প্রবেশপথগুলি পরে সাদা মারবেল পাথরের জালি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং এখনও সেই অবস্থায়ই আছে। বর্তমানে শুধু দক্ষিণ দেয়ালের দরজা দিয়েই কেন্দ্রিয়কক্ষে প্রবেশ করা যায়। এই দরজাতে চন্দন কাঠের পাল্লা আছে।

কেন্দ্রীয় অর্থাৎ মাযারকক্ষের দেয়ালগুলি ছাদ পর্যন্ত মর্মর পাথর দিয়ে আবৃত এবং মেঝে কাল পাথরের উপর সাদা মর্মর পাথরের ফুল ও লতাপাতার নকশা দ্বারা সুশোভিত। কবরটি কক্ষের কেন্দ্রস্থলে ৩ ধাপে নির্মিত। সাদা মর্মর পাথরে নির্মিত কবরের প্রত্যেক ধাপ .০৩ মিটার করে উঁচু। প্রত্যেক ধাপের পার্শ্বদেশ লতাপাতা ও ফুলের প্রতিকৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত। নিচের ধাপের আয়তন ২.১৪ মিটার × ১.০ মিটার এবং সর্বোচ্চ ধাপের আয়তন ১.৭৪ মিটার × .৪ মিটার।

এই সমাধিসৌধের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের কক্ষে মারবেল পাথরে তৈরি অপেক্ষাকৃত ছোট একটি কবর আছে। এটিকে নবাব শায়েস্তা খানের আর এক কন্যা শমশাদ বেগমের কবর বলে পরিচিত করা হয়। এই কক্ষসহ কেন্দ্রীয় কক্ষের পার্শ্ববর্তী অন্যান্য কক্ষের দেয়ালও কিছু উপর পর্যন্ত সাদা মর্মর পাথর দিয়ে আবৃত ছিল। কিন্তু সে সব অলংকণের আর বিশেষ কিছুই আজ অবশিষ্ট নেই।

ইমারতের ছাদ নির্মানের গঠনকৌশলে যথেষ্ট বৈচিত্র্য দেখা যায়। হিন্দু মন্দির স্থাপত্যের অনুসরণে একস্তর পাথরের উপর আর একস্তর পাথর বসিয়ে 'করবেল' (corbel) প্রণালীতে সর্বমোট ১৩টি স্তরে ইমারতের কেন্দ্রীয় কক্ষের ছাদ নির্মাণ করা হয়েছে। এর উপরে আছে অষ্টকোণাকৃতির পিরামিড আকারের ড্রামের (drum) উপরে নির্মিত একটি উঁচু ও কৃত্রিম গম্বুজ। ঈষৎ কন্দাকৃতিবিশিষ্ট তাম্রনির্মিত এই উঁচু গম্বুজ ইমারতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। আদিতে এই গম্বুজে সোনালী রঙ করা ছিল। এখন তা আর টিকে নেই।

পাশের কামরাগুলির ছাদও পাথরের সাহায্যে অনুরূপ করবেল পদ্ধতিতেই নির্মিত হয়েছে। তবে সেগুলিতে পাথরের তৈরি স্তরের সংখ্যা ৭ এবং উপরে গম্বুজের পরিবর্তে আছে প্রায় সমতল (flat) ছাদ।

অধ্যাপক আহমদ হাসান দানী এই ইমারতের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন যে, এই সৌধের পরিকল্পনা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ এবং অতীব যত্নসহকারে তা কার্যকর করে ইমারতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে।[১]

পরীবিবির পরিচয় নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। সাধারণত তিনি নবাব শায়েস্তা খানের অতি প্রিয় এক কন্যা বলেই পরিচিত। তাঁর সঙ্গে সম্রাট অওরঙযেবের তৃতীয় পুত্র শাহ্‌জাদা আ'যমের বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়েছিল বলে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা শহরে নাকি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন নবাব শায়েস্তা খান তাঁর প্রিয় কন্যার কবরের উপর এই মনোরম সৌধ নির্মাণ করেন।

সৈয়দ মোহাম্মদ তাইফুরের মতে গৌহাটির হিন্দু নৃপতি জয়ধজ্জরাবণ (Jaydhajnaravan)-এর ৯ বছর বয়সের কন্যা রমনীগভারো সুবাদার মীরজুমলা কর্তৃক সম্রাট আওরঙযেবের কাছে নীত হলে সম্রাট তাঁকে কন্যার মতো প্রতিপালন করেন এবং তাঁকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। তখন তাঁর নাম হয় ইরানদোখ্‌ত্‌। সাবালিকা হলে সম্রাট তাঁকে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা দেনমোহরের বিনিময়ে শাহ্‌জাদা আ'যমের (উপরে উল্লিখিত) সঙ্গে নিজে অভিভাবক সেজে বিয়ে দেন ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে। তিনি শাহ্‌জাদা আ'যমের সঙ্গে ঢাকাতে আসেন এবং হঠাৎ মারা যান। তিনি অত্যন্ত রূপবতী ও শাহ্‌জাদার অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত শাহ্‌জাদা বহু অর্থব্যয়ে এবং অশেষ যত্ন সহকারে তাঁর কবরের উপরে এই সুবিশাল সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। এ মতে কোণের কক্ষের ছোট কবরটি খুব সম্ভব তাঁদের শিশুকন্যার।[২]

পরীবিবির মাযারের পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালের বাইরের দিকে ২টি শিলালিপি ছিল বলে স্যার কানিংহ্যাম উল্লেখ করে গেছেন। একটি শিলালিপিতে ১০৯৫ হিজরী (১৬৮৩-৮৪ খ্রিঃ) সন উল্লিখিত ছিল বলে জানা যায়। সে ক্ষেত্রে এটি শাহ্‌জাদা আ'যম কর্তৃক নির্মিত হতে পারে না। কারণ, তিনি ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে চলে যান এবং এখানে আর ফিরে আসেননি।*

লালবাগ দুর্গ-মসজিদ

পরিবিবির মাযার থেকে ৩৯.৩ মিটার পশ্চিমে লালবাগ দুর্গের মসজিদ অবস্থিত। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এই মসজিদের আয়তন ১৯.১৯ মিটার × ৯.৮৪ মিটার এবং অপেক্ষাকৃত একটি উঁচু ভিত্তিভূমির পশ্চিমাংশে এর অবস্থান। মসজিদের চারকোণে ৪টি

১. "On the whole the building has been planned in a magnificent scale and every care has been taken to add a sense of grandeur and beauty to it."
—Prof. A.H. Dani : Muslim Architecture in Bengal, p. 215.

২. Glimpses of Old Dhaka, p. 198, note 2. –S.M. Taifoor.

* আসাম-বুরুঞ্জি থেকে প্রাপ্ত একটি নতুন তথ্য অনুসারে জানা যায় যে, শেষ বয়সে সুবাদার শায়েস্তা খান তাঁর নিজের জন্য একটি সমাধি নির্মাণ করেছিলেন। সেই সময়ে ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর অতি প্রিয় কন্যা পরীবিবির মৃত্যু ঘটে। তখন শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সুবাদা নিজের সেই সমাধি ভবনেই সেই কন্যাকে সমাধিস্থ করেন। এই মতই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। কারণ শাহ্‌জাদা আযমের মাত্র পনের মাস ঢাকাতে অবস্থান করার সময়ে তাঁর পক্ষে এই বিরাট ও কারুকার্যময় সৌধ নির্মাণ সম্ভব ছিল না।

অষ্টকোণাকৃতির মিনার বা টারেট (turret) আছে। এগুলি ছাদের অনেক উপরে উঠে গেছে। এবং এগুলির শীর্ষদেশ ইট-সুরকির তৈরি ছোট গম্বুজ দ্বারা সুশোভিত। মিনারগুলির গায়ে মনোরম প্যানেলিং-এর অলঙ্করণ আছে। পূর্ব দেয়ালে আছে ৩টি প্রবেশপথ। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ অপেক্ষাকৃত বড় এবং দুই পার্শ্বে কিছুটা বাইরের দিকে উদগত মিনার (pilaster) দ্বারা বেষ্টিত। অর্ধগম্বুজাকৃতির খাঁজকাটা খিলানের নিচে অবস্থিত এই প্রবেশপথ। পাশের দুটি প্রবেশপথ আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট হলেও অনুরূপভাবেই নির্মিত। প্রত্যেক দরজার উপরিভাগ ও পার্শ্বদেশ অসংখ্য আয়তাকার প্যানেল (panel) দ্বারা অলঙ্কৃত এবং এসব প্যানেল অন্তপ্রবিষ্ট। উপরের প্যারাপেট (parapet) ছিদ্রহীন মার্লন (merlon) দ্বারা সুশোভিত। পশ্চিম দেয়ালের মধ্যভাগ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মিহরাবের পিছন দিক (৭.১১মিটার) প্রায় .৪ মিটার বাইরের দিকে উদগত (offset)। [লালবাগ দুর্গ মসজিদের রঙির ছবি-১৯]

মসজিদের উপরে আছে ৩টি গম্বুজ। কেন্দ্রীয় গম্বুজ পাশের দুটি গম্বুজ থেকে আকারে বড়। গম্বুজগুলির নিচের অংশ অষ্টকোণাকৃতির ড্রামের আকারে নির্মিত এবং পাতানক্‌শা (basal leaf) দ্বারা অলঙ্কৃত। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগ সমান তিন ভাগে বিভক্ত হলেও দরজার উচ্চতা বরাবর চারদিকে অর্ধগম্বুজ স্থাপন করে দু'পাশের গম্বুজের অষ্টকোণাকৃতি ভিত্তিমূলের ব্যাস সংকীর্ণ করা হয়েছে। গম্বুজের চূড়া স্থূলভাবে নির্মিত। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি মিহরাব।

শাহ্‌জাদা আ'যম বাঙলার সুবাদার থাকাকালীন ১৬৭৮-৭৯ খ্রিস্টাব্দে এ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে।[১]

লালবাগ শাহী বা ফররুখসিয়ারের মসজিদ

লালবাগ দুর্গের দক্ষিণ তোরণ থেকে কিছু দক্ষিণে লালবাগ শাহী মসজিদ নামে বর্তমানে পরিচিত এই বিরাট মসজিদ অবস্থিত। বাঙলার সুবাদার শাহ্‌জাদা আযিম-উশ্‌-শানের পুত্র শাহ্‌জাদা (পরে সম্রাট) ফররুখসিয়ার যখন তাঁর পিতার পক্ষে বাঙলার সুবাদারি করেন, তখন তিনি এ মসজিদ নির্মাণ করেন। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ মসজিদের আয়তন ৪৯.৬৯ মিটার × ১৬.৩৬ মিটার। ঢাকার বৃহত্তম মসজিদগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। মসজিদের ছাদ প্রথমে কাঠের ছিল বলে জানা যায়। সেটি নষ্ট হয়ে গেলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ঢাকার তদানীন্তন নবাব খোওয়াজা আব্দুল গনি মসজিদের পাকা ছাদ নির্মাণ করে দেন। পরে এখানে একটি অভিনব ধরনের মিনার নির্মিত হয়। হাল আমলে মসজিদের অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং এটি একটি বহুতল বিশিষ্ট মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছে।

---

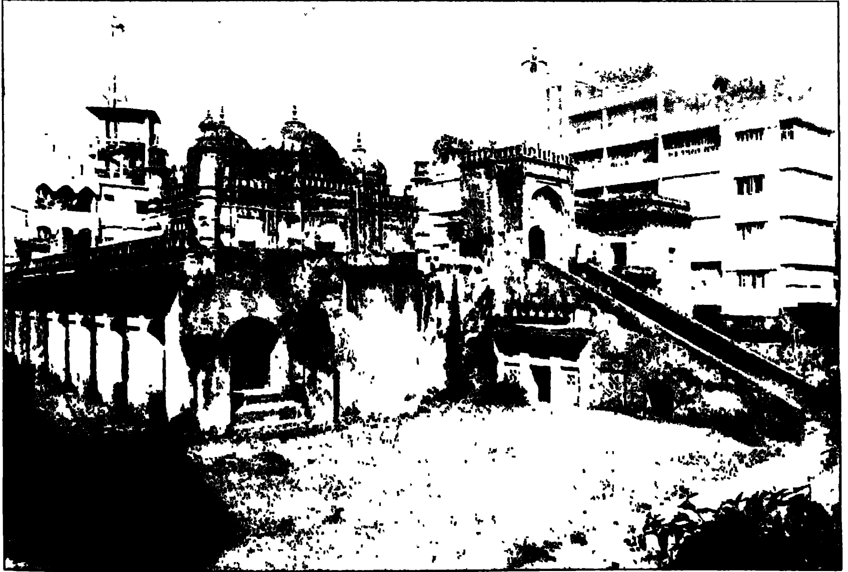
১ কিন্তু এর পিছনে কোনো সত্য আছে বলে প্রমাণ নেই। কারণ মসজিদের ভিতরে পলেস্তারার উপরে যে লিপিটি আছে তা থেকে জানা যায় যে, মসজিদটি ১০৫৯ হিজরী অর্থাৎ ১৬৬৪-৬৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। অতএব ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকাতে আগমন ও পরবর্তী ১৫ মাস ধরে সেখানে বসবাসকারী শাহজাদা আ'যম কর্তৃক এ মসজিদ নির্মিত হতে পারে না। কারণ-তিনি আর কোনোদিন ঢাকাতে ফিরে আসেননি। খুব সম্ভব সুবাদার শায়েস্তা খানই এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন এবং তিনিই ছিলেন এই দুর্গের নির্মাতাও।

খান মোহাম্মদ মিরধার মসজিদ ও মাদ্রাসা

লালবাগ দুর্গের পশ্চিম দিকে আতিসখানা মহল্লায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া একটি মাঝারি ধরনের মাঠ আছে। সেই মাঠের পশ্চিম প্রান্তদেশে আছে একটি ভিত্তিবেদী (platform)। এই ভিত্তিবেদীর আয়তন ৩৭.৮৭ মিটার × ৩৬.৩৬ মিটার এবং এর উচ্চতা ৫ মিটার। এতে বেশ কয়েকটি কক্ষ আছে এবং এগুলি খিলানের সাহায্যে নির্মিত (vaulted)।

এই প্লাটফর্মের উত্তর-পশ্চিম ভাগে মসজিদটি নির্মিত। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এই মসজিদের আয়তন ১৫.২৬ মিটার × ৭.৬৫ মিটার। মসজিদের চারকোণে আছে ৪টি মিনার বা টারেট। সেগুলি ছাদের অনেক উপরে উঠে চুন-সুরকির তৈরি নিরেট ছোট গম্বুজে (ribbed cupola) শেষ হয়েছে। পূর্বদেয়ালে আছে ৩টি প্রবেশপথ। এগুলির পাশে ছোট ছোট মিনার (minarets) আছে। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে আছে ১টি করে প্রবেশপথ। এগুলির পাশেও সরু মিনার আছে। পশ্চিম দেয়ালে মিহরাবগুলির পিছন দিকে উদ্‌গত (offset) স্থানের দু'পাশে সরু মিনার আছে।

মসজিদের বাইরের দেয়াল সুন্দর প্যানেল দ্বারা সুশোভিত। উপরে আছে ৩টি গম্বুজ, কেন্দ্রীয় গম্বুজটি অপর দুটি থেকে আকারে বড়। অষ্টকোণাকৃতির ড্রামের উপর গম্বুজগুলি স্থাপিত। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগ তিন অংশে বিভক্ত। পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি অলংকৃত মিহরাব।



খান মোহাম্মদ মৃধা মসজিদ, ঢাকা

এই মসজিদের উত্তর-পূর্ব দিকে একই ভিত্তিবেদীর উপরে দক্ষিণমুখী একটি ছোট ইমারত আছে। এতে ৩টি কক্ষ আছে। কেন্দ্রীয় কক্ষটি অপেক্ষাকৃত বড়। এর ছাদ

খিলানের সাহায্যে নির্মিত। এই ইমারতটি মাদ্রাসার জন্য নির্মিত হয়ে ছিল বলে পণ্ডিতদের ধারণা। তবে প্লাটফর্মের নিচের কক্ষগুলি আগে মাদ্রাসা হিসাবে ব্যবহার করা হত বলে জানা যায়। পরে এগুলি মিউনিসিপ্যালিটির গোশালা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। এখন এগুলিতে কিছু লোকজনের বসবাস দেখা যায়।

মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উপরে যে শিলালিপি আছে, তা থেকে জানা যায় যে, ঢাকা শহরের প্রধান কাযী ই'বাদউল্লাহ্‌র ইচ্ছার ('ইবাদ উল্লাহ্ কাযী কারদ্ আরশাদ') ভিত্তিতে খান মোহাম্মদ মির্‌ধা ১১১৬ (মতান্তরে ১১১৭ হিজরী ১৭০৪-১৭০৫ খ্রিঃ) সনে সম্রাট অওরঙযেবের রাজত্বকালে এ মসজিদ নির্মাণ করেন।

শিলালিপির পাঠ অনুসারে মসজিদ নির্মাতার নাম খান মোহাম্মদ, খান মোহাম্মদ মিরধা নয়। তবে নির্মাতার মিরধা নাম বরাবরই প্রচলিত।

মসজিদ নির্মাণের তারিখ সম্বন্ধে শিলালিপিতে আছে :

বেফিকিরে সালে তারিখানা চু রাফতাম নেদাই-হাতেফি আয ঘায়েব রওদাদ
সর-ই-কুফুর আয্ বেনায়েশ্ রাফ্‌ত যে তা'ত-ই-খানা এশ্ তারিখ ইজাদ
বরবাদ

অনুবাদ : এর নির্মাণকাল সম্পর্কে যখন আমি অগ্রসর হলাম (অর্থাৎ জানতে চাইলাম) তখন ঘায়েব অর্থাৎ অদৃশ্য থেকে এক দৈববাণী আসল, "এর নির্মাণ থেকে অর্থাৎ এর নির্মাণের কালে সার-ই-কুফুর অর্থাৎ বিধর্মীর মাথা ধ্বংস হল এবং এর নির্মাণ কাল হল 'তা'য়াত খানা আশ'।" ১১১৬ হিজরি (১৭০৪ – ০৫ খ্রিঃ) সন।

শিলালিপির পাঠে কুফুরি ধ্বংসের বর্ণনা দেখে মনে হয় এখানে কোনো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছিল এবং সেই ধ্বংসাবশেষের উপরে খুব সম্ভব মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল।

চকবাজার এলাকার কীর্তি

চকমসজিদ

চকবাজারের পশ্চিমাংশে বর্তমানে যে বিরাট মসজিদ দেখা যায়, তা আদিতে ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট একটি মসজিদ। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ও ৩ মিটার উঁচু একটি প্লাটফর্মের (platform) উপর নির্মিত এ মসজিদ আদিতে ছিল ১৬.০৬ মিটার × ৭.৭৭ মিটার আয়তনবিশিষ্ট। এই প্লাটফর্মের নিচে ছিল অনেকগুলি কক্ষ। সেগুলি দোকানের জন্য ভাড়া দেওয়া হত। উপরে ছিল ৩টি গম্বুজ। মসজিদের যে শিলালিপি[১] ছিল, তা থেকে জানা যায় যে, বাঙলার সুবাদার শায়েস্তা খান ১০৮৬ হিজরী (১৬৭৬ খ্রিঃ) সনে এ মসজিদ নির্মাণ করেন।[১]

---

১. "The rightly guided Amir-al-Umara Shaista khan built this mosque for the sake of God. I said to the seeker enquiring its date. God's building accomplished. Dated 1086 AH. (1675-76 AD)"
"শায়েস্তাহ্ রাহ্-ই-হক আমির-উল-ওমারা-আয্ সদক বেসায়ত্ মসজিদ-ই-রামযোদ্ধা তালের সে খরাদ চুন জোস্ত্ তারিখ-ই-বলা-গোফতম কেহ্ শুদ আয্ লুৎফ-ই-খোদা ফরযাদা।"
The original plan 94ft. by 80 ft–the mosque 50 ft by 25 ft and three domes—S.A. Husan–Antigila P. 14.

বর্তমান কালে মসজিদে এত সংস্কার সাধন করা হয়েছে যে, এর আদি রূপ সম্পর্কে কোনো ধারণা করাই কঠিন। মসজিদের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারণ করে মসজিদটিকে বর্তমানে ২৮.৪৮ মিটার × ২৪.২৪ মিটার আয়তনের করা হয়েছে। মসজিদে বেশ কয়েকটি অতিরিক্ত গম্বুজও নির্মাণ করা হয়েছে।

চুড়িহাট্টা মসজিদ

চকবাজারের পশ্চিম্ দিকে চুড়িহাট্টা নামক মহল্লায় এই মসজিদ অবস্থিত। মসজিদের উপরের ছাদ ছিল চৌচালা ঘরের মতো। পূর্ব দেয়ালে ছিল ৩টি দরজা। দরজাগুলি চার কোণোকৃতির খিলানের নিচে অবস্থিত ছিল। মসজিদের সম্মুখের দেয়াল ছিল প্যানেল দ্বারা অলঙ্কৃত। চারকাণো ৪টি মিনার এবং প্যারাপেট বন্ধ মার্লন দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। ভিতরে ছিল ৩টি মিহরাব। মিহরাবের উপরের অংশ ছিল প্যানেল দ্বারা শোভিত। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে আলো-বাতাসের জন্য একটি করে দরজা ছিল।

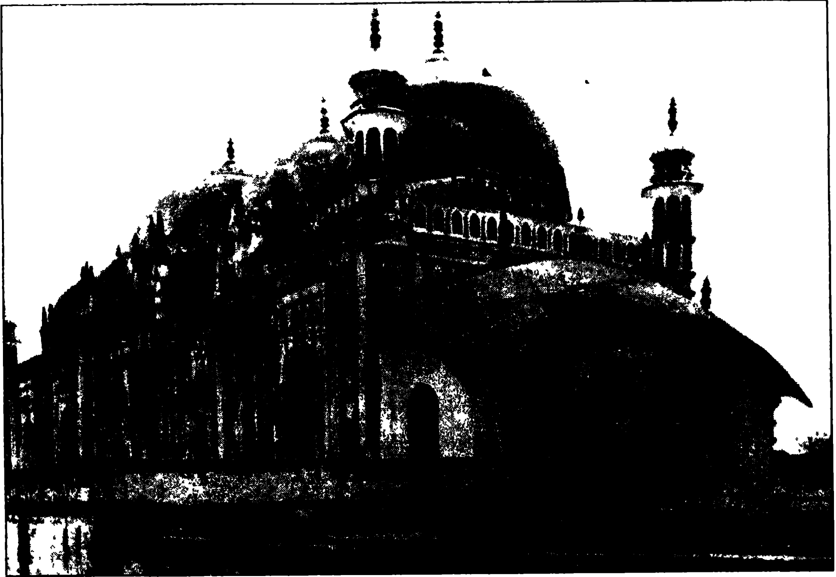
মসজিদে যে শিলালিপি ছিল, তা থেকে জানা যায় যে শাহ্ শুজা যখন বাঙ্লার সুবাদার, তখন মোহাম্মদ বেগ নামক তাঁর এক কর্মকর্তা ১০৬০ হিজরী সনে (১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে) এ মসজিদ নির্মাণ করেন। জনশ্রুতি মূলে জানা যায় যে, একটি হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর এ্ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। মসজিদে যে ফারসী শিলালিপি ছিল, তার পাঠ থেকে জানা যায় যে, এই জনশ্রুতির মূলে কিছু সত্য আছে।[১] দেশবিভাগের অনেক আগে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে মসজিদ অঙ্গনে মাটির নিচে প্রস্তরনির্মিত একটি বাসুদেব মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। এতেও জনপ্রবাদের সমর্থন পাওয়া যায়। হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত হলেও এই ইমারত যে মসজিদ হিসাবে নতুন করে নির্মিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বর্তমানে এ মসজিদের অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে এবং এটি এখন বহুতলবিশিষ্ট একটি আধুনিক ইমারতে রূপান্তরিত হয়েছে।

কারতলব খান বা বেগমবাজার মসজিদ

চকবাজারের পূর্বদিকে ও মৌলভীবাজারের উত্তরদিকে বেগমবাজার রাস্তার মোড়ে এই বিরাট মসজিদ অবস্থিত। একটি উঁচু প্ল্যাটফর্মের উপরে এই মসজিদ নির্মিত। প্ল্যাটফরমের নিচে দোকানের জন্য বেশ কয়েকটি কক্ষ আছে। পূর্বদিক দিয়ে মসজিদে ওঠার সিঁড়ি। পূর্বদেয়ালে আছে ৫টি প্রবেশপথ। প্রবেশপথগুলির পাশে আছে ছোট ছোট মিনার। মিনারগুলি প্যারাপেটের উপরে উঠে গেছে। চারকোণে যে ৪টি বড় মিনার আছে সেগুলিও ছাদের অনেক উপরে উঠে গেছে এবং এগুলির শীর্ষদেশ ছোট ছোট গম্বুজদ্বারা সুশোভিত মসজিদের উপরে আছে ৫টি গম্বুজ। মোঘল আমলে ঢাকায় নির্মিত মসজিদগুলি সাধারণত তিন গম্বুজবিশিষ্ট ছিল। এই মসজিদের বেলায় দেখা যায় যে, তিন গম্বুজের স্থলে এখানে ৫ গম্বুজের মসজিদ নির্মিত হয়েছে। পশ্চিম দেয়ালে ৫টি অলঙ্কৃত মিহরাব আছে।

---

১. Glimpses of Old Dhaka, p. 164.–S.M. Taifoor.



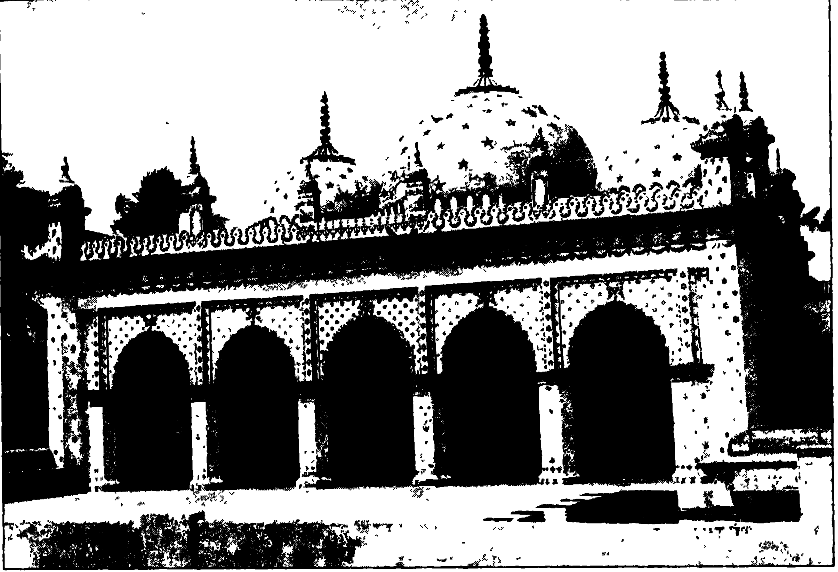
করতলব খান মসজিদ, বেগম বাজার, ঢাকা

এ মসজিদ সংলগ্ন একিট অভিনব ধরনের ইমারত আছে। উত্তর দেয়ালের সঙ্গে বাইরের দিকে দোচালা ঘরের আকারে তৈরি একটি কক্ষ আছে। চুন-সুরকি দ্বারা তৈরি এর ছাদ বাংলাদেশের ছনের তৈরি দোচালা ঘরের চালের মত। এটি খুব সম্ভব ইমামের বসবাসের জন্য নির্মিত হয়েছিল। মুর্শিদ কুলী খান ঢাকায় অবস্থান কালে (১৭০০-১৭০৪ খ্রিঃ) এ মসজিদ নির্মাণ করেন। তখন তাঁর নাম ছিল কারতলবখান।

তারা মসজিদ

আরমানিটোলা হাইস্কুলের কাছে অবস্থিত 'তারা' বা 'সিতারা' মসজিদ ঢাকা শহরের মসজিদগুলির মধ্যে সবচেয়ে কারুকার্যময়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মীর্যা গোলামপীর নামক ঢাকার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদের দক্ষিণদিকে ছিল একটি ছোট গোরস্থান এবং পশ্চিম দিকে ছিল লঙ্গরখানা। লঙ্গরখানায় তিনি গরীবদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করতেন। বর্তমানে সেখানে ঢাকা পৌরসভার অধীনে একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

অত্যন্ত সাদাসিধাভাবে ও মোঘল স্থাপত্যের প্রভাবে নির্মিত ৩ গম্বুজবিশিষ্ট এ মসজিদের ভিতরের আয়তন ছিল প্রায় ১০ মিটার × ৩.৬৩ মিটার। মসজিদের পিছন দেয়ালের সাদাসিধা কাজ এখনও নযরে পড়ে। চারকোণে ছির ৪টি মিনার। মিনারের শীর্ষদেশে ছিল ছোট গম্বুজ। পূর্বদেয়ালে ছিল ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ছিল ১টি করে দরজা। পশ্চিম দেয়ালে ছিল ৩টি মিহরাব।



তারা মসজিদ, ঢাকা

বর্তমানে মসজিদের অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। এবং তা ঘটেছে বিগত ৫০/৬০ বছরে, আলীজান ব্যাপারী নামক একজন ধনাঢ্য তামাক ব্যবসায়ীর বদৌলতে। তিনি মসজিদের পূর্বদিকে একটি বারান্দা নির্মাণ করেছেন এবং মসজিদের ভিতর ও বাইরের দিক অলঙ্কৃত করার জন্য ব্রিটেন এবং জাপান থেকে অসংখ্য অলঙ্কৃত চীনামাটির টাইল আমদানি করে মসজিদে লাগিয়েছেন। গম্বুজ ও বাইরের দেয়াল নানা বর্ণের চীনামাটির টুকরা সাদা পলেস্তরার উপর বসিয়ে সুশোভিত করা হয়েছে এবং অসংখ্য তারার প্রতিকৃতি সেখানে ফুটে উঠেছে। পূর্ব দেয়ালের উপরে কেন্দ্রস্থলে একটি অর্ধচন্দ্র ও তারার প্রতিকৃতি রঙবেরঙের চীনামাটির টুকরার সাহায্যে নির্মিত হয়েছে। মসজিদের ভিতরদেশও অতি সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত করা হয়েছে। আয়তাকারের নানাবর্ণের চীনামাটর টালিদ্বারা ভিতরের দেয়াল আবৃত করা হয়েছে। মিহরাব ও দরজার পার্শ্ববর্তী স্থানগুলি বিশেষভাবে অলঙ্কৃত। নবনির্মিত বারান্দার অভ্যন্তর ভাগও মসজিদের অভ্যন্তরভাগের ন্যায় এখন অলঙ্কৃত। মেঝেতে অতি সুন্দর মোজাইকের কাজ করা হয়েছে। মসজিদের ভিতর ও বাইরে যে অলঙ্করণের কাজ হয়েছে, তা সত্যই আকর্ষণীয়। মসজিদের দক্ষিণ দিকে আরও ২টি কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে এবং আগের মসজিদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অনুরূপ ভাবেই অলঙ্কৃত করা হয়েছে।

আরমানীটোলা মসজিদ

তারা মসজিদের কাছে শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী রোডে এই ছোট মসজিদ অবস্থিত। এ দর উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব কিছুই নেই। মসজিদে যে শিলালিপি আছে, তা থেকে

জানা যায় যে ১৭৩৫ খ্রিস্টাব্দে খানজানী নামক এক ব্যক্তির স্ত্রী মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন।

বড়কাটরা

চকবাজার ও বুড়ীগঙ্গা নদী, এই দুই-এর মাঝখানে অবস্থিত ছির বড় কাটরা। এককালে নদী বড়কাটরার দক্ষিণ সীমা ঘেঁষে প্রবাহিত হত। এখন নদী বেশ দক্ষিণে সরে গেছে এবং নদী ও কাটরার মধ্যবর্তী স্থানে বহু ইমারতাদি গড়ে উঠেছে।

শুধু বাইরে নয়, কাটরার ভিতরেও অসংখ্য ছোটবড় অবাঞ্ছিত ইমারতাদি গজিয়ে উঠেছে। আদিতে একটি চকমিলান ইমারত হিসাবে নির্মিত এই কাটরার বর্তমান অবস্থা থেকে এর আদিরূপ সম্পর্কে কোনো ধারণা করাই কঠিন। উত্তর ব্লক সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সেখানে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন ইমারত। পূর্ব ও পশ্চিম ব্লকে নতুন ও পুরাতন ইমারতের সংমিশ্রণ এমনভাবে হয়েছে যে, সেখানে কোনটা নতুন, কোনটা পুরাতন, তা নির্ধারণ করা কঠিন। ভিতরে যে, বিরাট উন্মুক্ত আঙ্গিনা ছিল তাতে গজিয়ে উঠেছে কাঁচা-পাকা, ছোটবড় সংখ্যাহীন গৃহ। কারখানা থেকে আরম্ভ করে দোকানদারি পর্যন্ত এমন কোনো কাজ নেই যা বর্তমানে বড়কাটরাতে না হয়। তবে দক্ষিণ দিকের ব্লকে একটি মাদ্রাসা (বড় কাটারা মাদ্রাসা) থাকায়, সে স্থানটি অনধিকার প্রবেশকারীদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে কোনো রকমে এবং মাদ্রাসার অধীনে বলে অট্টালিকার এই অংশটি আজও জীর্ণ অবস্থায় টিকে আছে।



বড় কাটারা, ঢাকা

আয়তাকারে নির্মিত এই চকমিলান অট্টালিকার দক্ষিণবাহু ছিল ৬৭.৮৯ মিটার দীর্ঘ। উত্তরবাহুও একই মাপের ছিল ধারণা করা যায়। পূর্ব ও পশ্চিম বাহুর দৈর্ঘ্য এখন নিরূপণ করা দুঃসাধ্য হলেও আদিতে ৬৯.৬৯ মিটার করে ছিল বলে জানা যায়। মাঝখানে ছিল এক বিরাট উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ (court-yard)।

দক্ষিণ ব্লকের কেন্দ্রস্থলে ছিল কাটরার প্রধান প্রবেশপথ। বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত এই তিনতলবিশিষ্ট সদর তোরণ ছিল অতি মনোমুগ্ধকর। অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে নির্মিত ও শাহী জাঁকজমকপূর্ণ এই তোরণ দক্ষিণে নদীর দিকে প্রায় ৭.৫৪ মিটার এবং পূর্ব পশ্চিমে প্রায় ১২.১২ মিটার প্রসারিত ছিল। এই প্রসারিত অংশে প্রবেশপথের

দু'পাশে ছিল দুটি প্রহরীকক্ষ। প্রহরীকক্ষ দুটির মধ্যবর্তী প্রবেশপথের আয়তন ছিল (পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা) ৫.৫৩ মিটার × ২.৯ মিটার। এই প্রবেশপথের পরে ছিল পর পর ৩টি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আয়তনের প্রবেশপথ। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা এগুলির আয়তন ছিল যথাক্রমে ২.৭২ মিটার × ০.৯ মিটার, ৩.৩ মিটার × ১.৮৯ মিটার, ২.৭২ মিটার × ২৯০ মিটার। এগুলির প্রত্যেকটি খিলানের সাহায্যে নির্মিত ছিল। কেন্দ্রীয়টির দু'পাশে ছিল খিলানযুক্ত অতি ক্ষুদ্র দুটি কক্ষ।

উপরে বর্ণিত ৪টি প্রবেশপথের পরেই ছিল অষ্টকোণাকৃতির একটি হল কামরা। এই কামরার ব্যাস ৮.৩ মিটার। এর উপরের ছাদ গম্বুজাকৃতির এবং তাতে পলেস্তারার উপর লতাপাতা ইত্যাদির পরিচ্ছন্ন অলঙ্করণ ছিল। এই হল কামরার মাঝামাঝি অংশের সোজা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ছিল পর পর ২টি করে কামরা এবং এ দুটি কামরার মধ্যে সংযোগকারী দরজা ছিল। এগুলির দক্ষিণ দিকে আড়াআড়িভাবে নির্মিত প্রত্যেক দিকে ২টি করে কামরা ছিল। এই কামরাগুলির বরাবার উত্তর দিকেও অনুরূপভাবে নির্মিত ২টি করে কামরা ছিল এবং উত্তর দিকের শেষ কামরা দুটি ছিল ত্রিভুজাকারে নির্মিত। হল কামরার দু'পাশের কামরাগুলি বিপরীত দিকে কামরার সঙ্গে জ্যামিতিক মাপে আড়াআড়িভাবে নির্মিত ছিল।

হলকামরার পরে (উত্তর দিকে) ছিল ২.৭২ মিটার × ১.৯৬ মিটার আয়তনের (পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা) একটি প্রবেশপথ এবং এর পরেই ছির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করার সর্বশেষ প্রবেশপথ এবং পূর্ব-পশ্চিম লম্বা এই প্রবেশপথের আয়তন ছিল ৬.২১ মিটার × ২.৮ মিটার। এর দু'পাশে খিলানযুক্ত ২টি ছোট কক্ষ ছিল। এই প্রবেশপথের দু'পাশে কাটরার ভিতর দিক থেকে দোতলা ও তিনতলায় ওঠার সিঁড়ি আছে।

দক্ষিণ দিকের প্রসারিত অংশ ছাড়া কাটরার এই অংশের আতয়ন ছিল প্রায় ১৮.১৮ মিটার × ১৩.২১ মিটার। উপরে দোতলায় এবং তিনতলায় ছিল বসবাসের কক্ষ। শুধু প্রবেশপথের উপরের অংশই ছিল তিনতল বিশিষ্ট। কাটরার বাকি অংশ ছিল দ্বিতল।

প্রবেশপথ এলাকার দু'পাশে নিচতলার প্রত্যেক ভাগে ৫টি করে বিরাট আকারের কক্ষ আছে। প্রত্যেক দিকের শেষ দুটি কক্ষ থেকে উত্তর ভাগে কিছু অংশ কেটে নিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ১টি করে আলাদা কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। দোতলায় নিচতলার মতই কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে এবং এগুলির সামনে আছে টানা বারান্দা।

দক্ষিণ ব্লকের দুই কোণে ২টি বিরাট 'টাওয়ার' (tower) আছে। অষ্টকোণাকারে নির্মিত এগুলির ভিতরদেশ ফাঁকা এবং ব্যাস ৩.২৮ মিটার। এখন মাদ্রাসার ছাত্রদের বসবাসের জন্য এই টাওয়ার দুটি ব্যবহৃত হচ্ছে।

কাটরার উত্তর ব্লকের মাঝখানেও প্রায় অনুরূপ ধরনের একটি প্রবেশপথ ছিল। কিন্তু সেটি এত জাঁকজমকপূর্ণ ও এতবড় ছিল বলে মনে হয় না। সেই তোরণটির কিছু অংশ অতি জীর্ণ অবস্থায় এখনও কোনোরকমে টিকে আছে। কাটরার পশ্চিম ও পূর্ব ব্লকের মাঝখানেও ১টি করে তোরণ ছিল বলে সৈয়দ মোহাম্মদ তাইফুর বলেছেন। কিন্তু সেগুলি বের করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। একমাত্র দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথ ছাড়া কাটরার বাকি অংশ ছিল দ্বিতল এবং সেখানে উপরে ও নিচে ছিল অসংখ্য বাসগৃহ।

দক্ষিণ ব্লকের সদর দরজার অষ্টকোণাকৃতির হলঘরের দেয়ালে একটি শিলালিপি ছিল। তাতে এই ইমারতের নির্মাতা আবুল কাসেম এই কাটরা সম্পর্কে অনেক প্রশংসাবাণী লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

এই শিলালিপি থেকে আরও জানা যায় যে, সুলতান শাহ্‌শুজার দিওয়ান এই আবুল কাসিম ১০৫২ হিজরী (১৬৪৪ খ্রিঃ) সনে শাহ্‌শুজার বাসস্থানের জন্য এই অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন। এই শিলালিপির মূল ফারসী পাঠ নিম্নে তুলে ধরা গেল না বলে দুঃখিত।[১]

দ্বিতীয় শিলালিপিটি ছিল কাটরার উত্তর তোরণদ্বারে।[২] এটি বর্তমানে হারিয়ে গেছে। সৈয়দ মোহাম্মদ তাইফুর রচিত গ্রন্থের ('Glimpses of Old Dhaka') ১৫৯ পৃষ্ঠায় লিপিটির একটি ফটোকপি আছে। ১০৫৫ হিজরী (১৬৪৫ খ্রিঃ) সনের এই লিপি থেকে জানা যায় যে, শাহ্‌শুজার কর্মকর্তা আবুল কাসিম ২২টি দোকানঘর সংবলিত এই পবিত্র ইমারত নির্মাণ করেছিলেন এবং এই দানপত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, এ সবের আয় থেকে এই ইমারতের মেরামতের ব্যয়ভার বহন করা হবে এবং গরীব-দুঃখীকে দান করা হবে। এতে আরও বলা হয়েছিল যে, কোনো [দানের] যোগ্য ব্যক্তি এখানে আগমন করলে তাঁর কাছ থেকে কোনো ভাড়া (rent) যেন না নেওয়া হয়। এসব পূণ্য কর্মফল সুলতান যাতে এ জগতে পান, তার জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কোনো কর্মচারী এর অন্যথা করলে হাশরের দিন তাকে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে। ইংরেজী অনুবাদ নিম্নে পাদটীকায় তুলে ধরা হল।[৩]

---

১. অধ্যাপক দানী এই লিপির যে ইংরেজী অনুবাদ তুলে ধরেছেন তা নিম্নরূপ ঃ
"To this lofty building which proppeth high heaven
By this slave Abul Qasim foundation was given.
What a building! It putteth high heaven to shame
A copy of Paradise ye might it name."
—Muslim Architecture in Bengal, p. 219.—Prof. A. H. Dani.

২. Glimpses of Old Dhaka, p. 160.—S.M. Taifoor.
Abul Qusim What a building, it puts high ... Shame; you may call it a copy on the garden of paradise. ...the great of the size of the sky thousands of firmaments are jelling. When I tried it find the your of its construction my mind becomes ... Then a voice from heaven whis pened to me. I am time's calamity it become secured 1053 A. H. (1643-44 Ad)."

৩. Dacca, p. 193 by Prof. A.H Dani.
"Sultan Shah Shuja Bahadur was famed for deeds of charity—Wherefore being hopeful of the mercy of God his slave Abul Qasim al-Husainia-Tabtaba, as-Simnai, built this sacred edifice endowing it with twenty-two shops attached to it, on the rightful and lawful condition that the officials in charge of the endowment should expend the income derived from them upon the repairs of the buildings and upon the poor, and that they should not take any rent from any desevring person alighting there in, so that the pious act may reflect upon the monarch in this world and they should not act otherwise, or else they would be called on theDay of Retribution. This inscription was composed by Sad-ud-Din Muhammad Sherazi, 1056 A.H. (A.D. 1644).

ছোটকাটরা

বড়কাটরা থেকে প্রায় ১৮০ মিটার পূর্বদিকে বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে ছোট কাটরা অবস্থিত। বড়কাটরার অনুকরণে এবং প্রায় একই উদ্দেশ্যে ছোটকাটরা নির্মিত হয়েছিল। আকারে এটি ছিল বড়কাটরা থেকে সামান্য ছোট।

দুর্গাকারে নির্মিত এই ইমারতের দক্ষিণ বাহু ছিল প্রায় নদীর তীর ঘেঁষে। এখন নদী ও ছোটকাটরার মাঝখানে বেশ কয়েকটি ইমারত গড়ে ওঠার ফলে কাটরার আগের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ব্যাহত হয়েছে। দক্ষিণবাহুর কেন্দ্রস্থলে ছিল এর প্রধান প্রবেশপথ। প্রায় বড়কাটরার মতো করেই এই প্রবেশদ্বার নির্মিত হয়েছিল। বিরাট আকারের প্রবেশ দ্বারের উপরের অংশ ছিল তিনতলবিশিষ্ট। দক্ষিণ বাহুর বাকি অংশ ছিল দ্বিতল। তোরণদ্বারের উপরের অংশে পরবর্তীকালে নতুনভাবে সংস্কার করার ফলে মোঘল স্থাপত্যনিদর্শন অনেকাংশে তিরোহিত হয়েছে। উত্তরদিকের তোরণটি ছিল দ্বিতল। এটি বর্তমানে অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় টিকে আছে। উত্তর তোরণের পূর্ব দিকের অংশ ও পূর্ব বাহুর সম্পূর্ণ অংশ এবং দক্ষিণ বাহুর পূর্বাংশ অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় এখনও টিকে আছে। উত্তর ও পূর্ব বাহু খুব সম্ভব একতলবিশিষ্ট ছিল। সেখানে একতলার ছাদের উপর দ্বিতল নির্মিত হয়েছিল, এমন কোনো চিহ্ন বর্তমানে পাওয়া যায় না।



▲ ছোট কাটরা, ঢাকা

ছোটকাটরার পশ্চিমাংশ খুঁজে বের করা কঠিন। সেখানে এত সব নতুন গৃহাদি নির্মিত হয়েছে যে, পুরাতন ইমারতের সন্ধান পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ভিতরে যে উন্মুক্ত উদ্যান ছিল, তাতে অসংখ্য দোকান-পাট, ঘরবাড়ি, গুদাম ইত্যাদি গড়ে উঠেছে এবং সেখানে হরেক রকমের ব্যবসাকেন্দ্রের অস্তিত্ব দেখা যায়।

১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দে বাঙলার সুবাদার শায়েস্তাখান তাঁর বসবাসের জন্য এই ইমারত নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি এই অট্টালিকায় বাস করেছিলেন কিনা, তা জানা যায়নি। তবে তাঁর ক্রমবর্ধমান পরিবারের সদস্যগণ এবং বিশেষ করে বিবি চম্পা নামক তাঁর এক স্ত্রী বা উপ-স্ত্রী এখানে বাস করতেন বলে জানা যায়। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র খোদাবন্দ খান ওরফে মীর্জা বাঙালি এখানে বসবাস করতেন এবং তাঁর বংশধরেরা বহুকাল ধরে এখানে ছিলেন বলে জানা যায়। বর্তমানে সম্পূর্ণ ইমারত ও আঙ্গিনা অনধিকার প্রবেশকারীদের দখলে আছে বলে জানা যায়।

বিবি চম্পার মাযার

ছোটকাটরার দক্ষিণ ও উত্তর তোরণ বরাবর যে রাস্তা ছিল, তার মাঝামাঝি অংশের পূর্বদিকে একটি মাযার ইমারত আছে। বর্গাকারে নির্মিত এই ইমারতের প্রত্যেক বাহু বাইরের দিকে ৭.২৭ মিটার লম্বা। ইষ্টকনির্মিত চারপাশের দেয়ালগুলির মধ্যবর্তী স্থানে আছে একটি করে প্রবেশপথ। দুই পাশে সরু মিনার দ্বারা দরজাগুলি সুশোভিত। উপরে আছে অষ্টকোণাকৃতির ড্রামের উপর একটি মাত্র গম্বুজ।

বিবি চম্পা নামক শায়েস্তাখানের এক পত্নী বা উপ-পত্নীর সমাধির উপর এই সৌধ নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। বর্তমানে সমাধিসৌধের চারদিকে অসংখ্য দোকান-পাট গড়ে উঠেছে এবং এগুলি অতিক্রম করে সমাধিসৌধ পর্যন্ত পৌঁছা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

শায়েস্তাখানের মসজিদ

মিটফোর্ড হাসপাতালের পিছনে বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে এই মসজিদ অবস্থিত। মসজিদে যে শিলালিপি ছিল, তা থেকে জানা যায় যে, নওয়াব শায়েস্তাখান এ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। মসজিদটি আগুনে পুড়ে গেলে ব্রিটিশ আমলে পূর্তবিভাগ এটির সংস্কার করে। ফলে এর প্রাচীন সৌন্দর্য অনেকাংশে লোপ পেয়েছে। ৩ গম্বুজ, ৩ দরজা ও ৩ মিহরাববিশিষ্ট এ মসজিদের চার কোণে ৪টি মিনার আছে। বর্তমানে মসজিদের আরও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং পূর্বদিকে একটি বারান্দা সংযোজিত হয়েছে।

দারোগা আমির-উদ্-দীনের মসজিদ ও মাযার

বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে বাদামতলী ঘাটের নিকট একটি প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে এই সুন্দর মসজিদটি অবস্থিত। ৩ গম্বুজ, ৩ দরজা ও ৩ মিহরাব বিশিষ্ট এ মসজিদের সম্মুখভাগ প্যানেল দ্বারা সুশোভিত। চারকোণে ৪টি মিনার বা টারেট এবং মসজিদের পিছন ও সামনের দিকে আরও কেয়কটি মিনার আছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর থানার অন্তর্গত রূপসদী গ্রামের দারোগা আমির-উদ্-দীন নামক এক ব্যক্তি এ মসজিদ নির্মাণ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে তিনি খুব সম্ভব পুলিশ বিভাগের দারোগা ছিলেন এবং

সেই সুযোগে অনেক অর্থ ও ভূসম্পত্তির অধিকারী হন। বহু অর্থ ব্যয় করে তিনি এই মসজিদ নির্মাণ করেন। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে মসজিদের পূর্বদিকের বারান্দাটি নির্মিত হয়। মসজিদ প্রাঙ্গণে বর্গাকারে নির্মিত ও এক গম্বুজবিশিষ্ট যে ছোট মাযারটি আছে, সেটি তাঁর সমাধির উপর নির্মিত।

ইসলাম খানের মসজিদ

ইসলামপুর রোডের নিকট প্রাক্তন আশিক জমাদার লেন অর্থাৎ বর্তমান সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেনে এই মসজিদ অবস্থিত। তিন গম্বুজবিশিষ্ট এ মসজিদের কেন্দ্রীয় গম্বুজটি পাশের দুটি গম্বুজ থেকে অনেক বড়। সাদাসিধাভাবে নির্মিত এই মসজিদের ভিতর ও বাইরের দিকে কোনো অলঙ্করণ নেই। হাল আমলে এ মসজিদের আমূল সংস্কার করা হয়েছে। স্থানীয় জনপ্রবাদ মতে, ঢাকার প্রথম মোঘল সুবাদার ইসলাম খান এ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। মসজিদের গঠনপ্রণালী এবং স্থাপত্যকৌশলও তা প্রমাণ করে।

নবরায় লেনের মসজিদ

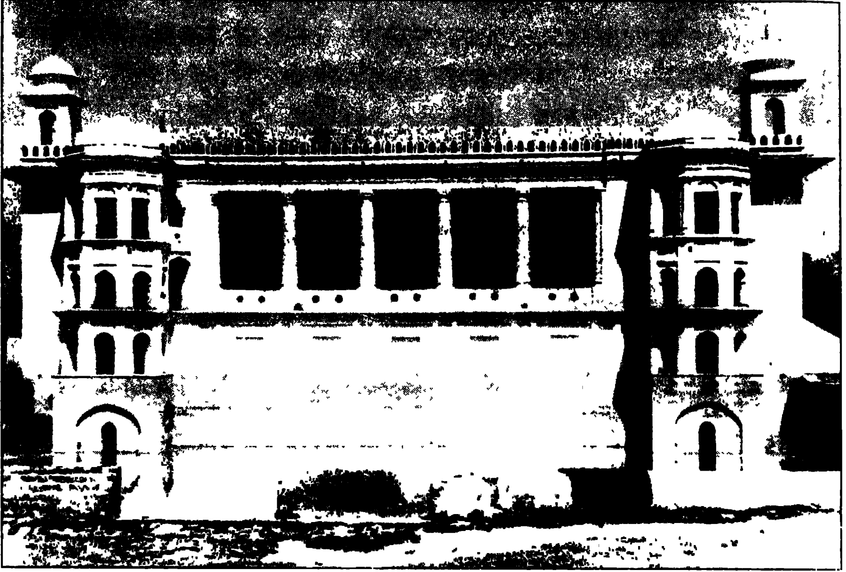
ইসলামপুর রোডের নিকটবর্তী নবরায় লেন নামক স্থানে এ মসজিদ অবস্থিত। একটি উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর এ মসজিদ নির্মিত। কাছেই একটি পাকা কূপ ছিল। পূর্ব দেয়ালে ৩টি দরজা ও পশ্চিম দেয়ালে ৩টি মিহরাব। মসজিদের সম্মুখ ভাগ প্যানেল দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। মিহরাবগুলিতে সুন্দর অলঙ্করণ ছিল। পরবর্তীকালে পূর্বদিকে একটি বারান্দা সংযোজিত হয়েছে। গঠনপ্রণালী ও স্থাপত্যকৌশল দেখে মনে হয় এ মসজিদ সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল।

হোসেনী দালান

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের দক্ষিণদিকে হোসেনী দালান রোডের উপর এই ইমারত অবস্থিত। এটি একটি দোতলা অট্টালিকা। এর আদিরূপ কি ছিল, সে সম্পর্কে কোনো সঠিক বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, বেশ কয়েকবার এর আমূল সংস্কার করা হয়েছে এবং বর্তমানে এটিকে একটি আধুনিক ধরনের ইমারতে পরিণত করা হয়েছে।

এটি শিয়া সম্প্রদায়ের ইমামবাড়া। প্রতি বছর মহা সমারোহে এখানে মহরম উৎসব পালন করা হয়। তখন শুধু শিয়া নয়, বহু সুন্নী মুসলমানও মহরম অনুষ্ঠান এবং মিছিলে অংশ গ্রহণ করেন।

এই ইমারতের নির্মাণকাল নিয়ে বিস্তর মতভেদ দেখা যায়। এই ইমারতের পূর্ব দেয়ালের বাইরের দিকে একটি ক্ষুদ্র শিলালিপি আছে। সেই লিপির পাঠ থেকে জানা যায় যে, হিজরি (১৬৪২ খ্রিঃ) সনে বাঙলার সুবাদার সুলতান শাহ্ শুজা'র নৌসেনাপতি মির মুরাদ এই ইমারত নির্মাণ করেছিলেন। এই শিলালিপিকে কোনো কোনো পণ্ডিত জাল মনে করেন। তাঁদের মতে মীর মুরাদ ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। অতএব তাঁর পক্ষে এর ৭৫ বছর পূর্বে এই ইমরত নির্মাণ করা সম্ভবপর ছিল না। অতএব এ শিলালিপি জাল।



হোসেনি দালান, ঢাকা

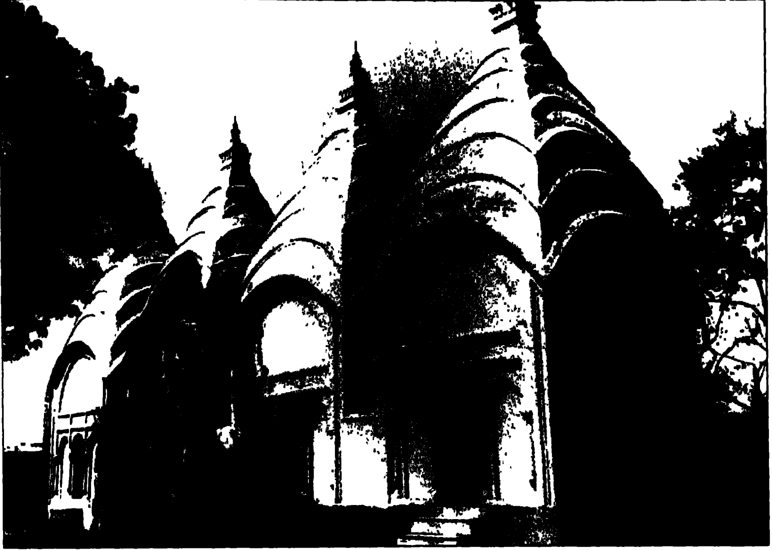
শিলালিপিটি আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি এবং তা জাল ছিল বলে কোনো মতেই ধরা যায় না। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে জনৈক মির মুরাদের মৃত্যু হতে পারে এবং তিনি একজন নৌসেনাপতিও হতে পারেন। কিন্তু তিনি যে ১৬৪২ সালের মির মুরাদ সেই প্রমাণ কোথায়? অতএব শিলালিপিটিকে এই কারণে কিছুতেই জাল বলা যেতে পারে না। খুব সম্ভব ১৬৪২ সালে মির মুরাদ এখানে ছোটখাট একটি ইমারত নির্মাণ করেছিলেন এবং পরে এই ইমারত বর্ধিত আকারে নির্মিত হয়েছিল।

জনপ্রবাদ মতে ঢাকার নায়েব-ই নাযিম নবাব জসরতখান (১৭৫৪-৮৯ খ্রিঃ) হোসেনিদালান নির্মাণ করেছিলেন। হোসেনি দালানের পুবদিকে ঢাকার নায়েব-ই-নাযিমদের কয়েকটি সমাধি ভগ্নাবস্থায় এখনও (১৯৯০ খ্রিঃ) দেখা যায়। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ভয়াবহ ভূমিকম্পে হোসেনি দালান ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে ঢাকার আহসান মঞ্জিলের নতুন নবাব খোশুয়াজা আহসান উল্লাহ্ এটিকে নতুন করে নির্মাণ করেন এবং বর্তমান ইমারতটি সেই সময়ের বলেই জানা যায়।

ঢাকেশ্বরী মন্দির

সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে আনুমানিক এক কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ঢাকেশ্বরী রোডের উত্তর পার্শ্বে একটি অনুচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে বেশ কয়েকটি মন্দির আছে। এগুলির মধ্যে পূর্বভাগে অবস্থিত মন্দিরটি ঢাকেশ্বরী মন্দির নামে পরিচিত। এখানকার মন্দিরগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। পূর্বভাগে প্রধান অর্থাৎ ঢাকেশ্বরী মন্দির ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ইমারত। প্রধান মন্দিরের বেশ পশ্চিম দিকে পূর্ব-পশ্চিমে এক সারিতে

পর পর ৪টি মন্দির আছে। এগুলি খুবই ছোট মন্দির। এগুলির পশ্চিম দিকে, প্রাচীরের বাইরে ছিল একটি প্রাচীন দিঘি।



▲ ঢাকেশ্বরী মন্দির, ঢাকা

পশ্চিম ভাগের এই ছোট মন্দিরগুলি প্রায় একই আয়তনের এবং প্রায় একই ধরনে নির্মিত। উঁচু ভিত্তিবেদীর (platform) উপর বর্গাকারে নির্মিত মন্দিরগুলি দরজার উপরে কিছু দূর উঠে ক্রমশ সরু হয়ে মঠের আকারে উপরে উঠেছে। সেখানে আছে অর্ধবৃত্তাকারে নির্মিত ক্রমহ্রস্বমান পর পর ৬টি স্তবক ('six receding tires of roof of Bengali type.)। শীর্ষদেশ (finial) পদ্মপাপড়ির উপর কলসে শেষ হয়েছে। বর্গাকারে নির্মিত নিম্নদেশে উত্তর দিক ছাড়া অন্য তিনদিকে খিলানের সাহায্যে নির্মিত সরু প্রবেশপথ আছে এবং প্রবেশপথের উপর দিক খাঁজকাটা (cusped)। এই ৪টি স্বতন্ত্র মন্দিরে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরগুলি খুব প্রাচীন বলে মনে হয় না, খুব সম্ভব মোঘল আমলের শেষদিকে নির্মিত।

এই মন্দিরগুলি থেকে কিছু পূর্ব দিকে প্রধান মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরের সামনে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে ছিল আধুনিককালে তৈরি মণ্ডপ। সেটি এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত। মণ্ডপের একাংশে ছিল পাঁঠাবলির স্থান। মণ্ডপের উত্তর দিকে আছে দক্ষিণমুখী ঢাকেশ্বরী মন্দির। তিন কক্ষ ও প্রধান কক্ষের সামনে বারান্দাবিশিষ্ট এই মন্দির। প্রধান কক্ষের দু'পাশে অন্য দুটি কক্ষ। প্রত্যেকটি কক্ষের সামনের দিকে আছে খিলানের সাহায্যে নির্মিত ১টি করে প্রবেশপথ।

বারান্দার উপরের ছাদ খিলানের সাহায্যে নির্মিত (vaulted roof)। মন্দিরের কামরাগুলির উপরে আছে পিরামিডের আকারে নির্মিত ৩টি শিখর (stepped pyramid)। প্রধান অর্থাৎ মাঝের কক্ষের শিখরটি অন্যগুলির চেয়ে অনেক উঁচু।

মন্দিরের এই ছাদ ৪টি ধাপে নির্মিত। ছাদের সর্বনিম্নাংশ অনেকটা বাংলাদেশের চৌচালা ঘরের চালের আকারে নির্মিত (Bengali domical roof) এবং পরের ৩টি ধাপ উত্তর ভারতের মন্দিরের আচ্ছাদনের আকারে ('North Indian canopies') নির্মিত। শীর্ষদেশ পদ্মফুলের মতো কাজ কবা লম্বা ডাঁটায় শেষ হয়েছে।

এই মন্দিরের স্থাপত্য-কৌশলে মোঘল আমলে নির্মিত মসজিদের যথেষ্ট প্রভাব আছে বলে ডক্টর দানী বলেছেন। তাঁর মতে মোঘল আমলের মসজিদের সঙ্গে এদিক দিয়ে কিছু পার্থক্য থাকলেও মুসলিম উপকরণ যথেষ্ট আছে।[১]

ঢাকেশ্বরী মন্দিরের নামকরণ ও নির্মাণকাল নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। কেউ কেউ বলেন যে, দ্বাদশ শতাব্দীর সেনবংশীয় নৃপতি বল্লালসেনের সময়ের এই মূর্তি 'ঢাকা' (আবৃত) অবস্থায় ছিল এবং তা উদ্ধার করে মহারাজা বল্লালসেন এটিকে প্রতিষ্ঠা করেন এবং তা থেকে 'ঢাকেশ্বরী' (ঢাকা + ঈশ্বরী) নামকরণ হয়। অন্যমতে সম্রাট আকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহ ঢাকায় অবস্থান কালে এই মন্দির নির্মাণ ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজা মানসিংহ একটি মন্দির নির্মাণ ও একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে থাকতে পারেন। কিন্তু সেই মন্দির ও সেই মূর্তি এখন আর টিকে নেই। মন্দিরে যে মূর্তিটি ছিল তা এখন আর নেই, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাসংগ্রামের সময় তা হারিয়ে গেছে। প্রায় সেই রকমই একটি মূর্তি সেখানে স্থাপন করা হয়েছে। তবে আদি মূর্তিটি দেখে ডক্টর নলিনীকান্ড ভট্টশালী বলেছিলেন যে, এটি বল্লাল সেনের সময়ের মূর্তি হতে পারে না।[২]

বর্তমানে যে মন্দিরটি আছে তা সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। এরপরে মন্দিরটিতে আমূল সংস্কারকার্য করা হয়েছে। এই মন্দির সম্পর্কে ব্রাডলি বার্ট বলেন যে এ মন্দির ২০০ বছরের এবং ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে একজন হিন্দু এজেন্ট এটি নির্মাণ করেছিলেন।[৩]

ধানমন্ডি এলাকার কীর্তি

মরিয়ম সালেহার মসজিদ

নিউ মার্কেটের পূর্বদিকে ও বলাকা সিনেমা হলের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এবং সামান্য দূরে এ মসজিদ অবস্থিত। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এই মসজিদের আয়তন (ভিতরের দিকে) ১১.৮১

১. "The plan of the temple with'its three-roomed bays and three pyramidal *Shikharas*, fronted by a verandah, strongly recalls the contemporary plan of the Mughal mosques, and though there are differences in detail, many of the Muslim elements can also be seen. The whole design of the temple gives a pleasing appearance."—Dacca, p. 181.—Prof A.H. Dani.

২. "Any one who has any acquaintance with images and who has carefully observed the image of Dhakeshwari will unhesitatingly declare that it can by no means be of the time of Ballal Sen."–Ibid, p. 14.

৩. "The present temple is only two hundred years old, and is said to have been built by a Hindu agent in the employ of the East India Company."—Romance of an Eastern Capital, p. 265, by Bradely-Bart.

মিটার × ৩.৯৮ মিটার। চুন-সুরকির গাঁথুনির সাহায্যে ইটের তৈরি এ মসজিদের দেয়ালগুলি আস্তর করা। পূর্ব দেয়ালে আছে ৩টি প্রবেশপথ। এগুলি অর্ধগম্বুজাকৃতির খিলানযুক্ত। সামনের দেয়াল প্যানেল দ্বারা অলঙ্কৃত ও কেন্দ্রীয় অংশ বাইরের দিকে কিছুটা উদ্‌গত। দরজা বরাবর ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি মিহ্‌রাব এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে দরজা আছে। চারকোণে ৪টি অষ্টকোণাকৃতির মিনার বা টারেট আছে। এগুলি কার্নিশের উপরে গোলাকার এবং শীর্ষদেশ ছোট গম্বুজ দ্বারা শোভিত। ছাদের উপরে আছে ৩টি গম্বুজ। কেন্দ্রীয় গম্বুজ অন্য দুটির চেয়ে বড়। হাল আমলে মসজিদের পূর্বদিকে একটি বারান্দা সংযোজন করা হয়েছে এবং এতে মসজিদের আদি সৌন্দর্য নষ্ট হয়েছে।

মসজিদের সঙ্গে একটি ছোট কবরস্থান আছে। এখানে অনেকগুলি পাকা কবর দেখা যায়। এগুলির মধ্যে খলিলুর রহমান ওরফে বাগুদিওয়ানের কবরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মসজিদের কেন্দ্রীয় দরজার উপরে যে শিলালিপি আছে, তা থেকে জানা যায় যে, বাগুদিওয়ানের পৌত্রী ও আবদুল্লাহ্‌র কন্যা বিবি মরিয়ম সালেহা ১১১৮ হিজরী (১৭০৬ খ্রিঃ) সনে এ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায়নি।

ধানমন্ডির প্রাচীন ঈদগাহ্

সাতমসজিদ সড়কের পূর্বপার্শ্বে এবং ধানমণ্ডীর পুরাতন ১৩ ও ১৪ এবং বর্তমান ৬এ ও ৭এ নম্বর রাস্তার মাঝখানে এই প্রাচীন ঈদগাহ্‌র ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। সাত মসজিদ রাস্তা দিয়ে যাবার সময় ঈদগাহ্‌র পশ্চিম দেয়ালের ভগ্নাবশেষ চোখে পড়ে। পার্শ্ববর্তী ভূমি থেকে প্রায় ১.৬১ মিটার উঁচু এই ঈদগাহ্‌র আদি আয়তন ছিল ৭৪.২৪ মিটার × ৪১.৫১ মিটার। উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের প্রাচীর ছিল ১.৮১ মিটার উঁচু। সে সব প্রাচীরের সামান্য ধ্বংসাবশেষ এখনও টিকে আছে। পশ্চিম দিকের দেয়াল ছিল ৪.৮৪ মিটার উঁচু। সেই দেয়ালের বেশ কিছু অংশ (প্রায় ৯.০৮ মিটার) এখনও বিদ্যমান। সেই দেয়ালের কেন্দ্রস্থলে ছিল খিলানের সাহায্যে নির্মিত একটি সুগভীর মিহরাব। এই মিহরাবের উভয় পার্শ্বে ছিল খাঁজকাটা ও ধনুকাকৃতির প্যানেল। এগুলির পরে ছিল উভয় দিকে ৩টি করে ছোট ও অগভীর মিহরাব। এই মিহরাবগুলির পরে প্রাচীরের অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। এই প্রাচীন ঈদগাহ্ এখন ঈদের নামাজের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু অনধিকারপ্রবেশকারীদের দৌরাত্ম্যে ঈদগাহ্‌র উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বদিকে অনেক কাঁচাঘর গড়ে উঠেছিল এবং উঠছে এবং ঈদগাহ্‌র সামান্য অংশই উন্মুক্ত ছিল।[১]

কেন্দ্রীয় মিহরাবের উপর যে শিলালিপি ছিল, তা থেকে জানা যায় যে, সুলতান শাহ্‌শুজা যখন বাঙলার সুবাদার, তখন তাঁর দেওয়ান মীর আবুল কাসেম ১০৫০ হিজরী (১৬৪০ খ্রিঃ) সনে এই ঈদগাহ্ নির্মাণ করেন।[২]

---

১. হালআমলে ইদগাহ্‌টির চারদিকে গড়ে উঠা অনধিকার প্রবেশকারীদের ঘরগুলি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তবে ঈদগাহ্‌র দক্ষিণ-পুবকোণে একটি নতুন মসজিদ গড়ে উঠেছে।

২. Dacca, p. 213.—Prof A.H. Dani.



▲ ধানমন্ডি ঈদগাঁ, ঢাকা। সংস্কারের পরে

দারাবেগমের মাযার

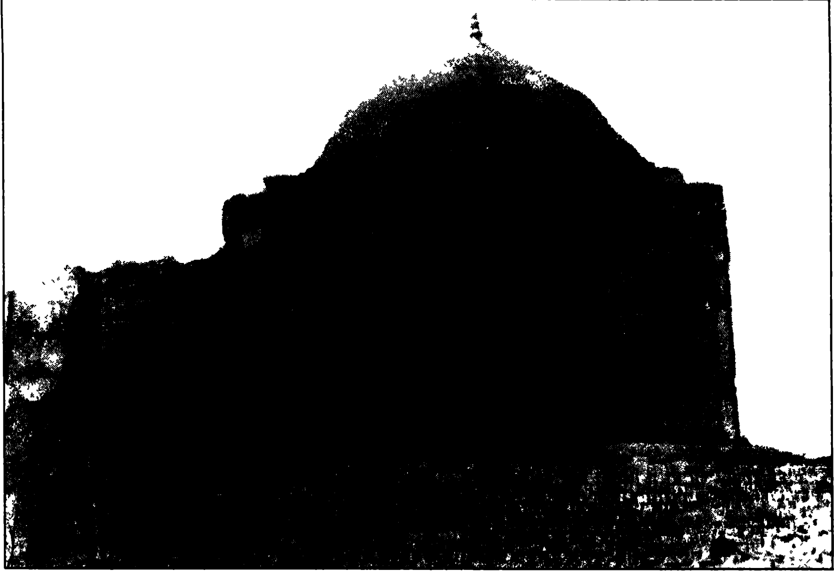
ধানমণ্ডী ঈদগাহ্ থেকে প্রায় ১.৫ কিলোমিটার উত্তরে মোহাম্মদপুর কলোনীর কাছে মাঝারি আকারের একটি সুন্দর জলাশয়ের পূর্বতীরে একটি উঁচু ভিত্তির উপরে এই ইমারত অবস্থিত। এই ইমারতের বেশ অভিনবত্ব আছে। প্রধান কক্ষ ও বারান্দা এই দুই ভাগে ইমারতটি বিভক্ত এটি। উত্তর দিকে অবস্থিত ও বর্গাকারে নির্মিত প্রধান কক্ষের প্রত্যেক বাহু ভিতর দিকে ৮.৪ মিটার লম্বা। উপরে আছে ৭.৫৭ মিটারেরও বেশি ব্যাসবিশিষ্ট একটি বিরাট গম্বুজ। বাগেরহাটের খান-ই-জাহানের এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদগুলি ছাড়া এতবড় গম্বুজ এদেশে সচরাচর দেখা যায় না।

দক্ষিণ দিকের বারান্দাসহ এই ইমারতের বাইরের দিকের আয়তন ১৮.৪ মিটার × ১২.৮ মিটার। প্রধান কক্ষের প্রাচীরগুলি ২.১৭ মিটার প্রশস্ত। বারান্দার দক্ষিণ প্রাচীর ১.৫৯ মিটার এবং পূর্ব ও পশ্চিম প্রাচীরের প্রত্যেকটি ১.৩ মিটার চওড়া। বারান্দার অভ্যন্তর ভাগের আয়তন (পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা) ১০.৬ মিটার × ৪.১০ মিটার। বারান্দার দক্ষিণ দেয়ালে ৩টি এবং পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে ১টি করে দরজা আছে। প্রধান কক্ষের পূর্ব ও উত্তর দেয়ালে একটি করে দরজা আছে।

বারান্দা ও প্রধান কক্ষের মধ্যবর্তী দেয়ালে ১টি দরজা আছে। প্রধান কক্ষের পশ্চিম দেয়ালে আছে একটি মিহরাব। মিহরাবের পিছনের ৪.১৯মিটার পরিমিত দেয়াল বাইরের দিকে সামান্য উদগত।

এটি কি মসজিদ না মাযার? এ নিয়ে যথেষ্ট মতানৈক্য দেখা যায়। ব্রিটিশ আমলে এই ইমারত জীর্ণ ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল। দেয়ালের আস্তর ছিল না এবং সমগ্র

ইমারতটি পড়ে পড়ে অবস্থায় ছিল। দেশ বিভাগের পরে স্থানীয় প্রচেষ্টায় এর আমুল সংস্কার করা হয়েছে এবং এটিকে একটি মসজিদ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর অঙ্গনে একটি মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়েছে।



▲ দারা বেগম মাজার/মসজিদ

ইমারতের ভিতরে কোনো কবরের অস্তিত্ব নেই। তাই এটিকে বর্তমানে মসজিদ মনে করা হচ্ছে। আগে এখানে একটি পাকা কবর ছিল বলে অনেকে বলে থাকেন। দক্ষিণদিকে বারান্দার অবস্থান দেখে সহজেই ধারণা করা যায় যে, এটি মসজিদ নয়, মাযার। কোনো মসজিদের বারান্দা দক্ষিণ দিকে থাকেনা, থাকে পূর্বদিকে। এখানে দক্ষিণ দিকের বারান্দা ছিল উত্তর দিকের সমাধি কক্ষের 'অ্যান্টি রুম' (ante-room) হিসাবে। আর বারান্দার পশ্চিম দেয়ালে কোনো মিহরাব নেই, আছে একটি দরজা। মিহরাব না থাকলেও মসজিদ হওয়ার পথে বাধা নেই। কিন্তু এ দেশের মসজিদের দরজা পশ্চিম দিকে সচরাচর থাকে না, থাকতে পারে না। ষাটগম্বুজ ও আদিনা মসজিদের মধ্যে পশ্চিম দিকে যে দরজাটি দেখা যায়, তা ব্যতিক্রম এবং তা অত্যন্ত বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে নির্মিত। দারাবেগমের ইমারত যদি প্রকৃতই মসজিদ হত, তবে বারান্দার পশ্চিম দেয়ালে দরজা থাকতনা। সমাধি কক্ষের পশ্চিম দেয়ালে মিহরাবের অবস্থান দেখে কেউ কেউ বলেন যে, মাযারে মিহরাব থাকে না। অতএব এটি মাযার নয়। এ দেশের বহু মাযারে মিহরাব দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাজশাহীর কুমারপুর মাযারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে মিহরাব আছে (কুমারপুর মাযার দ্র.)। ঢাকা শহরের সাতগম্বুজের নিকটবর্তী অজানা মাযারের পশ্চিম দেয়ালে মিহরাব ছিল।

এই ইমারত কবে নির্মিত হয়েছিল, তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। তবে গঠন-পদ্ধতি ও স্থাপত্যকৌশল দেখে মনে হয় এটি নবাব শায়েস্তাখানের আগে নির্মিত হয়েছিল। দারাবেগম কে ছিলেন, সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

আলাকুরির মসজিদ

দারাবেগমের মাযার থেকে প্রায় ৭০০ মিটার উত্তরে এবং সাতগম্বুজ মসজিদ থেকে কিছু উত্তর-পূর্বে, রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে একটি ছোট অথচ অতি সুন্দর মসজিদ আছে। প্রাক্তন কাটাজোর গ্রামে একটি উঁচু ভিত্তিভূমির পশ্চিমাংশে এ মসজিদ অবস্থিত। মসজিদের দক্ষিণে একটি পাকা কুয়া আছে। বর্গাকারে নির্মিত এই মসজিদের প্রত্যেক বাহু ভিতরের দিকে ৩.৭৮ মিটার লম্বা। চারকোণে ৪টি অষ্টকোণাকৃতির মিনার আছে। এগুলি অতি সুন্দর প্যানেল দ্বারা অলঙ্কৃত ও শীর্ষদেশ ছোট গম্বুজ দ্বারা সুশোভিত। মিনারগুলি কার্নিশের অনেক উপরে উঠে গেছে। মসজিদের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দেয়ালে আছে একটি করে প্রবেশপথ। অর্ধগম্বুজাকৃতির খিলান দ্বারা নির্মিত প্রবেশপথ বাইরের দিকে কিছুটা উদগত এবং দু'পাশে রয়েছে সরু মিনার। পূর্ব দেয়ালের অর্ধগম্বুজাকৃতির প্রবেশপথের উপরে একটি শিলালিপি ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শিলালিপিটি ভাওয়ালের জমিদার কর্তৃক স্থানান্তরিত হয়েছিল বলে জানা যায়।[১] কিন্তু শিলালিপিটি আর পাওয়া যায়নি। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি মিহরাব। কেন্দ্রীয় মিহরাবে সুন্দর অলঙ্করণ আছে। মসজিদের অভ্যন্তরভাগ দেখতে অতি সুন্দর। ভিতরে গম্বুজের নিচের অংশে মনোরম অলঙ্করণ আছে। উপরে একটি মাত্র গম্বুজ। গম্বুজটি দেখতে বেশ সুন্দর।



▲ আলাকুরি মসজিদ, ঢাকা

শিলালিপির অভাবে মসজিদের সঠিক নির্মাণকাল বলা কঠিন। তবে গঠন প্রণালী ও স্থাপত্যকৌশল দেখে ধারণা হয় যে, এই মসজিদ শায়েস্তাখানের আমলে নির্মিত হয়েছিল।

সাতগম্বুজ মসজিদ

আলাকুরির মসজিদ থেকে সামান্য উত্তর-পশ্চিমে রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে একটি বিলের একদম পূর্ব সীমান্তে এই মসজিদ অবস্থিত। এককালে মসজিদের পশ্চিম দেয়াল ঘেঁষে একটি নদী প্রবাহিত ছিল বলে ধারণা হয়। বর্তমানে নদী অনেক পশ্চিমে সরে গেছে

১. Dacca, p. 217.—Prof. A.H. Dani.

এবং সমগ্র এলাকা একটি নিচু বিলভূমিতে পরিণত হয়েছে। বর্ষাকালে যখন সারা অঞ্চল ডুবে যায়, তখন দূর থেকে সাদা মসজিদকে একটি শ্বেত কবুতরের মত দেখায়।

উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ মসজিদের আয়তন ১৭.৪৭ মিটার × ৮.১৮ মিটার। মসজিদের উপরে আছে ৩টি সুন্দর গম্বুজ। চারকোণে যেখানে ৪টি মিনার থাকার কথা সেখানে (প্রত্যেকটি ৩.৬৯ মিটার করে প্রশস্ত) ৪টি টাওয়ার আছে। দ্বিতলবিশিষ্ট টাওয়ারগুলির অভ্যন্তর ভাগ ফাঁকা। প্রত্যেক তলে ধনুকাকৃতির প্যানেল ও জানালা আছে। উপরে আছে মনোরম গম্বুজ। চারকোণের এই চারটি গম্বুজসহ মোট ৭টি গম্বুজ থাকার ফলে এই ইমারতকে সাতগম্বুজ মসজিদ বলা হয়ে থাকে। এ সাতগম্বুজ মসজিদ নাম থেকেই সংক্ষেপে সাত মসজিদ রোড নামকরণ হয়েছে।

মসজিদের পূর্ব দেয়ালে আছে ৩টি দরজা। খিলানযুক্ত প্রবেশপথের উপরেরভাগ খাঁজকাটা। কেন্দ্রীয় দরজা বাইরের দিকে কিছুটা উদ্‌গত এবং দু'পাশে আছে দুটি গোলাকার ও অলঙ্কৃত ছোট মিনার। অন্য দুটি দরজাও অনুরূপভাবে নির্মিত। আয়তাকার প্যানেল দ্বারা মসজিদের সমগ্র সম্মুখভাগ অত্যন্ত মনোরমভাবে অলঙ্কৃত। প্যানেলের উপরিভাগ ব্যাট্‌ল্‌ম্যান্ট দ্বারা শোভিত। অনুরূপ ব্যাট্‌ল্‌ম্যান্টের অলঙ্করণ কোণের টাওয়ারগুলির উভয়তলেই আছে। মসজিদের উপরে কেন্দ্রীয় গম্বুজটি অপেক্ষাকৃত বড়। গম্বুজের পাদদেশ মার্লন দ্বারা সুশোভিত ও শীর্ষদেশে আছে পদ্মফুলের ফাইনিয়েল (finial)। মসজিদের অভ্যন্তরে পশ্চিম দেয়ালে ৩টি অলঙ্কৃত মিহরাব আছে। [সাতগম্বুজ মসজিদের রঙিন ছবি-২১]

এ মসজিদের একটি বিশেষত্ব আছে যা সচরাচর অন্য কোনো মসজিদে দেখা যায় না। মসজিদের পিছন দিকে অর্থাৎ পশ্চিম দেয়ালের পশ্চিম দিকে ও উত্তর দেয়ালের উত্তর দিকে বারান্দা আছে। মসজিদের দক্ষিণ দেয়ালের দক্ষিণ দিক দিয়ে নির্মিত সরু পথ দিয়ে সে বারান্দায় যাওয়া যায়। খুব সম্ভব এক কালে মসজিদ ঘেঁষে প্রবাহিত নদীর দৃশ্য দেখার জন্য এই বারান্দা নির্মিত হয়েছিল। বারান্দা থেকে প্রায় ৩.৬৩ মিটার খাড়া দেয়াল নিচে চলে গেছে।

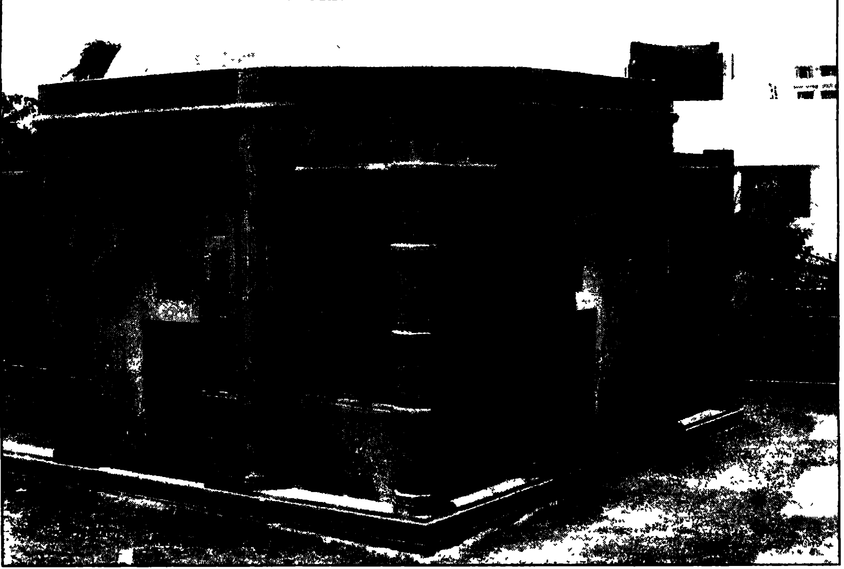
রাস্তা থেকে হাল আমলে নির্মিত একটি তোরণ পার হলে মসজিদের লম্বা চত্বর চোখে পড়ে। প্রবেশপথ থেকে প্রায় ৩০.৩ মিটার পশ্চিমে মসজিদটি অবস্থিত। এ চত্বর খুব সম্ভব আদিতে ফুলবাগানের জন্য নির্মিত হয়েছিল। চত্বরের উত্তর-পূর্বকোণে একটি ছোট গোরস্থান আছে।

জাফরাবাদ মৌজায় অবস্থিত সাতগম্বুজ মসজিদের কোনো শিলালিপি পাওয়া যায়নি। তবে গঠনপ্রণালী ও স্থাপত্যকৌশল দেখে সহজেই ধারণা হয় যে, মসজিদটি শায়েস্তাখানের আমলে নির্মিত হয়েছিল। ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দের দিকে মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল বলে অধ্যাপক দানী অনুমান করেন।

অজানা সমাধিসৌধ

সাতগম্বুজ মসজিদ থেকে প্রায় ৯০ মিটার পূর্ব-উত্তর দিকে একটি সমাধিসৌধ আছে। পার্শ্ববর্তী ভূমি থেকে বেশ উন্নত একটি ভূমিখণ্ডে অবস্থিত সৌধটির বর্তমান (১৯৭৩

খ্রিঃ) অবস্থা অতিশয় জীর্ণ। এর ছাদ ধসে পড়েছে, ধসে পড়েছে উত্তর দেওয়ালের বেশ কিছু অংশ। দক্ষিণ, পূর্ব ও উত্তর দেয়ালে যে ১টি করে দরজা আছে, সেগুলি হা করে অতীত গৌরবের সাক্ষ্য অতি দীনভাবে বহন করেছে। পশ্চিম দেয়ালে ছিল মিহরাব। সেটির অবস্থা আরও করুণ।



▲ অজানা সমাধি, ঢাকা। সংস্কারের পরে

বর্গাকারে নির্মিত এই ইমারতের প্রত্যেক বাহু বাইরের দিকে ছিল ৮.৮ মিটার লম্বা। দেয়ালগুলি ছিল বেশ পুরু। চারদেয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে অর্থাৎ দরজা ও মিহরাবের দু'পাশে দেওয়ালের অংশবিশেষ ভিতর ও বাইরের দিকে জামিতিক মাপে উদ্‌গত (offset) ছিল। দক্ষিণ দেয়ালে ছিল মাযারের একমাত্র প্রবেশপথ। প্রবেশপথে কাল পাথরের 'ফ্রেম' (চৌকাঠ) ছিল বলে জানা গেছে, কিন্তু এখন সেগুলি নেই। ধুনকাকৃতির খিলানযুক্ত প্রবেশ পথের উপরিভাগ ছিল খাঁজকাটা। দরজার পার্শ্ববর্তী দেয়াল ছিল বর্গাকৃতির প্যানেল দ্বারা অত্যন্ত মনোরমভাবে অলঙ্কৃত। পূর্ব ও উত্তর দিকের প্রবেশপথ দুটি সাদা মারবেল পাথরের জালি দ্বারা বন্ধ ছিল।[১] এখন সেইগুলি নেই। পশ্চিম দেয়ালে যে একটি মিহরাব ছিল, তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইমারতের উপরে ছিল চৌচালা ঘরের চালের মধ্যে পাকা ছাদ ছিল বলে মনে হয়। তা বর্তমানে (১৯৭৩ খ্রিঃ) নেই। কেউ কেউ বলেন যে, উপরে গম্বুজ ছিল। কিন্তু ইমারতের ধ্বংসাবশেষটি ভাল করে নিরীক্ষন করলে অতি সহজেই বোঝা যায় যে, সেখানে গম্বুজ নয়, চৌচালা ঘরের চালের মত ছাদ ছিল। হাল আমলে মাযারের যে সংস্করা করা হয়েছে তাতে ইমারতের উপরে একটি ভিন্ন ধরনের ছাদ ছিল বলে ধরা পড়েছে।

১. Muslim Architecture in Bengal, p. 209.—Prof. A. H. Dani.

সমাধিসৌধের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত পাকা কবরটি অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় এখনও টিকে আছে। কবরের উপর আছে তার চেয়ে জীর্ণ একটি কাপড়ের গিলাপ। এগুলির চেয়েও জীর্ণ অবস্থায় পশ্চিম দেশীয় একটি খাদিম পরিবার মাযারের তত্ত্বাবধানে এখনও (১৯৭৮খ্রিঃ) নিয়োজিত আছে। তাঁরা বলেন যে, এখানে এক বুযুর্গ্ পীর সাহেবের কবর আছে এবং তিনি জিন্দাপীর।

এটি বাঙলার সুবাদার নবাব শায়েস্তাখানের কোনো এক কন্যার মাযার বলে পণ্ডিতদের অভিমত। এ মাযার যে সাত গম্বুজ মসজিদের প্রায় সমসাময়িক, তাতে বোধ হয় কোন সন্দেহ নেই।*

রমনা এলাকার কীর্তি

হাজী খোওয়াজা শাহ্‌বাজের মসজিদ ও মাযার

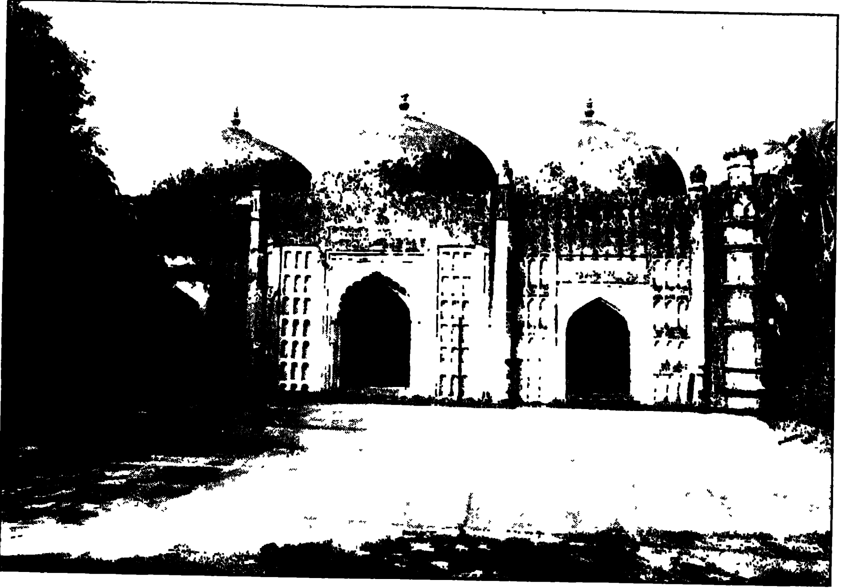
মসজিদ : সোহ্‌সরওয়ার্দি উদ্যানের দক্ষিণ-পশ্চিমে, শিশু একাডেমীর লাগোয়া উত্তরে এবং তিন নেতার মাযারের লাগোয়া পুবে অনুচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত একটি অঙ্গনে একটি মসজিদ ও একটি মাযার—এই দুটি প্রাচীন কীর্তি আছে। এই অঙ্গনের পূর্ব দেয়ালের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে আছে একটি তোরণ। মোঘল স্থাপত্যের অতি মনোরম নিদর্শন এই তোরণটি এখন বেশ জীর্ণ অবস্থায় থাকলেও প্রায় অটুট অবস্থায় বিদ্যমান।

প্রাচীরবেষ্টিত এই অঙ্গনের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি উঁচু ভূমির উপর মসজিদটি নির্মিত। উত্তর-দক্ষিণ লম্বা এই মসজিদের আয়তন ২২.৬ মিটার × ৭.৮১ মিটার। মসজিদের চারকোণে ৪টি অষ্টকোণাকৃতির মিনার বা টারেট আছে। এগুলি কার্নিশের অনেক উপরে উঠে নিরেট ছোট গম্বুজে শেষ হয়েছে। পূর্ব দেয়ালে আছে ৩টি প্রবেশপথ। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ বাইরের দিকে উদগতভাবে নির্মিত। পত্রাকারে নির্মিত খিলানে খাঁজকাটা আছে। দু'পাশে দুটি সরু মিনার কার্নিশের সামান্য উপরে উঠে শেষ হয়েছে। সামনের দেয়ালে কুলঙ্গির মতো করে নির্মিত স্থানে আগে সুন্দর প্যানেলিং-এর কাজ ছিল, এখন নেই। পাশের দুটি প্রবেশপথে অলঙ্করণের কাজ অত্যন্ত সীমিত। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে দরজা আছে। প্রত্যেক দরজার চৌকাঠ কালপাথরে নির্মিত। দরজাগুলির ভিতরের দিকে মেঝের কিছু অংশে কালপাথর বসান আছে। সামনের ভিত্তিদেয়ালের নিচের অংশে প্রায় ৪ ইঞ্চি পুরু অলঙ্কৃত কালপাথর বসান আছে। সামনের দু'ই কোণের মিনারের তলদেশ পর্যন্ত সেই কাল পাথর বসান আছে।

ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে ৩টি আকর্ষণীয় মিহরাব আছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবের অলঙ্করণ অত্যন্ত মনোরম। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগ অর্ধ গম্বুজাকারের খিলামের সাহায্যে তিন অংশে অতি সুন্দরভাবে বিভক্ত। এই তিন ভাগের উপরে আছে ৩টি মনোরম গম্বুজ।

---

* হাল আমলে মাযারের উপর নতুন করে একটি ছাদ নির্মাণ করা হয়েছে। সেটি মোটামুটি সমতল ধরনের হলেও চারচালা নয়, আট কোণে বিভক্ত ছিল সেই ছাদ এবং সেই ভাবেই সেটিকে নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে।



▲ হাজী খাজা শাহবাজ মসজিদ, ঢাকা

মাযার

মসজিদের আঙ্গিনায় এবং মসজিদ থেকে প্রায় ১৫ মিটার উত্তর-পূর্ব দিকে এক খণ্ড উঁচুভূমিতে একটি মাযার ইমারৃত অবস্থিত। বর্গাকারে নির্মিত এই ইমারতের প্রত্যেক বাহু বাইরের দিকে ৭.৮১ মিটার লম্বা। মাযার ইমারতের চারকোণে ৪টি অষ্টকোণাকৃতির মিনার বা টারেট আছে। এগুলিতে সুন্দর প্যানেলিং-এর অলঙ্করণ আছে এবং আছে নিরেট ছোট গম্বুজ (kiosk)। দক্ষিণ দেয়ালে ৩টি প্রবেশপথ ছিল। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি বাইরের দিকে প্রসারিত এবং সামনের দেয়াল প্যানেল দ্বারা অলঙ্কৃত। পাশের দুটি দরজা এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইমারতের ভিতরেও সুন্দর প্যানেলিং-এর অলঙ্করণ ছিল।

উপরে আছে একটি মনোরম গম্বুজ। দক্ষিণ দিকে ৩.৫৮ মিটার চওড়া একটি বারান্দা ছিল। বারান্দার ছাদ এখন ভেঙ্গে পড়েছে, পশ্চিম ও পূর্ব দিকের দেয়ালের কিছু অংশ এখনও টিকে আছে।

মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উপরে যে শিলালিপি আছে, তা থেকে জানা যায় যে, হাজী খোওয়াজা শাহ্বাজ নামক এক ধনাঢ্য বণিক ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। মাযারটিও তিনি নির্মাণ করেছিলেন বলে মনে হয় এবং তাঁর জীবদ্দশায়। মাযারে তাঁর পাকা কবর আছে।

হাইকোর্টের মাযার

পুরাতন হাইকোর্টের ইমারতের সামান্য পূর্বদিকে অবস্থিত এই মাযার বর্তমানে চিশ্‌তী বেহেশ্‌তীর মাযার নামে পরিচিত। এখানে প্রতিদিন বিশেষ করে বৃহস্পতিবারে হাজার হাজার লোকের ভিড় হয়।

একখণ্ড উঁচুভূমির উপর অবস্থিত বর্গাকারের এই ছোট মাযার ইমারত অত্যন্ত সাদাসিধাভাবে নির্মিত ছিল। দক্ষিণ দেয়ালে ছিল এর প্রধান প্রবেশপথ। পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালেও ছিল ১টি করে প্রবেশপথ। উত্তর দিকে কথা এখন সঠিকভাবে বলা যায় না। উপরে ছিল উত্তর ভারতীয় স্থাপত্যের অনুকরণে এবং অনেকটা বাংলাদেশের চৌচালা ঘরের চালের মতো করে নির্মিত কিন্তু উপরের অংশে কিছুটা চ্যাপটা ছাদ ('domical canopy of the North India type')। এই ক্ষুদ্র ইমারতের আর কোনো বিশেষত্ব ছিল না।



হাইকোর্টের মাযার ঢাকা

বহুকাল ধরে এই ইমারতটি জীর্ণ ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। এর দরজার পাল্লা ছিল না, দেয়াল ও ছাদে ফাটল ধরেছিল। ছাদের উপরে উত্তর দেয়ালের কাছাকাছি স্থানে গজিয়েছিল বটগাছ। ভিতরে একটি পাকা কবর অবশ্য ছিল। কিন্তু তা ভেঙ্গে দু'টুকরা হয়ে পড়েছিল। এখানে কেউ আসতেন না।*

---

* দেশবিভাগের আগে পুরাতন লাটভবন (পরে হাইকোর্ট বিল্ডিং ও বর্তমানে প্রতিরক্ষামন্ত্রণালয়ের দফতর) ছিল তদানীন্তন ঢাকা সরকারি ইনটারমিডিয়েট কলেজ। আমরা সেখানে ১৯৩৯-৪১ খ্রীস্টাব্দে অধ্যয়নরত ছিলাম। আমাদের টেনিসকোর্ট ছিল মাযারের লাগোয়া পশ্চিম পাশে। সে সময়ে মাযারটি অতি জীর্ণ ও পরিত্যক্ত (uncared for) অবস্থায় পড়েছিল যদিও মাযারের কেরামতির কথা লোক মুখে শোনা যেত। মাষারে শায়িত ব্যক্তির কেরামতির ফলে স্বয়ং লাটসাহেবও নাকি এস্থান ছেড়ে নতুন লাটভবনে যেতে বাধ্য হন। এরকম আরও কত গল্প লোকমুখে শোনা যেত। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে (তখনও শীতকাল) পুরাতন ঢাকা শহরের কয়েকজন বয়স্ক লোক এখানে ডেক-ডেকচি এনে 'সিন্নি' করেছিলেন। কিন্তু বিশেষ কোনো লোক সমাগম হয়নি এবং মাযারটিকে জমিয়ে তোলার তাদের এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এছাড়া এই দুই বছরের মধ্যে আমরা মাযারে কোনো লোককে আসতে দেখিনি। তবে রাস্তার বেওয়ারিশ প্রাণীদের সেখানে থাকতে দেখেছি।—গ্রন্থকার

হাল আমলে বিশেষ করে ১৯৪৭ সালের পর থেকে এই মাযারের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আদি মাযার ইমারতের দেয়ালগুলি অনেক উন্নত অবস্থায় এখনও টিকে আছে। কিন্তু আদি ইমারতটিকে কেন্দ্র করে এবং এর চারদিকে এক সুবিশাল ইমারত গড়ে উঠেছে। আদি ছাদের উপরদেশে নির্মাণ করা হয়েছে এক আকাশচুম্বী গম্বুজ। আগের চৌচালা ছাদটি অবশ্য এখন পর্যন্ত রক্ষিত আছে।

এই মাযারে কে শায়িত আছেন, সে সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে মীর্যা নথন নামক একজন প্রত্যক্ষদর্শী মোঘল সেনাপতি কর্তৃক রচিত 'বাহারিস্তান-ই-ঘায়েবী' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ঢাকার প্রথম মোঘল সুবাদার ইসলাম খান চিশ্‌তী এখানে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হলে তাঁকে 'বাগ-ই-শাহী' নামক স্থানে দাফন করা হয়।[১] 'মাসির-উল-'উমারা' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, পরে তাঁর মরদেহ ফতেপুর সিক্রিতে নিয়ে যাওয়া হয়।[২] সেখানে তাঁর কবরের উপর একটি স্মৃতি সৌধ নির্মিত হয়েছিল বলে জাহাঙ্গীরের আত্মচরিতে আছে এবং সেটি আজও টিকে আছে।[২]

বাগ-ই-শাহীর একাংশ ছিল ব্রিটিশ আমলের লাটভবনের প্রাচীর বেষ্টিত সমগ্র এলাকা। আলোচ্য মাযারটির অবস্থান প্রাক্তন বাগ-ই-শাহী এলাকায়। সৈয়দ মোহাম্মদ তাইফুরের মতে আলোচ্য মাযারটি সুবাদার ইসলাম খানের এবং পরে তাঁর লাশ ফতেপুরসিক্রিতে নিয়ে যাওয়া হয়।[৩] অধ্যাপক দানীও পরোক্ষভাবে এ মত সমর্থন করেন।[৪]

মাযারে বর্তমানে একটি আশ্চর্যজনক সাইনবোর্ড দেখা যায়। তাতে লেখা আছে, 'দরবার—শাহ্ খাজা শরফউদ্দীন ওরফে খাজা চিশতী শাহ্ বাবা ওলি-ই-বাঙ্গালা, ৯৯৮ হিজরী (১৫৮৯ খ্রিঃ)।' এ নাম কোথায় পাওয়া গেছে, সে সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারেন না। ১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা শহরে স্থায়ী মোঘল অধিকার ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। সে সময়ে চিশ্‌তী পদবীর কোনো ব্যক্তি ঢাকা শহরে ছিল বলেও জানা যায় না। ইসলাম খানের ভ্রাতা শুজাত খান চিশ্‌তী এই অঞ্চলে বাস করতেন ইসলাম খানের সময়ে ও তাঁর পরে। তাঁর নামানুসারে এস্থানের নাম হয় শুজাতপুর মৌজা। তিনি এখানেই মারা যান। কিন্তু তাঁর মাযারের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। আলোচ্য মাযারটি যে ইসলাম খান চিশতীর শূন্যগর্ভ মাযার তাতে বোধ হয় কোনো সন্দেহ নেই।

মুসাখাঁর মসজিদ

শহীদুল্লাহ্ হলের উত্তর-পশ্চিম কোণে সদর রাস্তার লাগোয়া পূর্বদিকে এই মসজিদ অবস্থিত। একটি উঁচু প্ল্যাটফরমের উপর নির্মিত (কারতলবখান ও খান মোহাম্মদ

১. বাহারিস্তান-ই-গায়েবী, বাংলা অনুবাদ, খালেকদাদ চৌধুরী, ১ম খণ্ড, ২৪৩ পৃ.।
২. Dacca, P. 173.—Prof. A.H. Dani.
৩. Glimpses of Old Dhaka, pp. 335-37. —S. M. Taifoor.
৪. "It may be that this was the place where originally Islam Khan's dead body was temporarily kept, and after it was carried away, the name Chisti Behisti lingered on in people's memory."—Dacca, p. 173. by prof. A. H. Dani.

মিরধার মসজিদ দ্র.) মসজিদের নিচের তলায় অর্থাৎ উপরে উল্লিখিত প্ল্যাটফরমে অতি প্রশস্ত দেয়ালবিশিষ্ট কয়েকটি কক্ষ আছে। উপরতলে তিন গম্বুজবিশিষ্ট এই মসজিদটি দেখতে প্রায় খোওয়াজা শাহ্‌বাজের মসজিদের মতো। তবে ঐ মসজিদের মতো এত কারুকার্যময় নয়। মসজিদের পূর্ব ও পশ্চিম প্রাচীর প্রায় ১.৮১ মিটার পুরু এবং উত্তর ও দক্ষিণ প্রাচীর মাত্র ১.২ মিটার করে পুরু। পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে দরজা আছে। পশ্চিম দেয়ালে ৩টি মিহরাব আছে। পূর্ব দিকে আছে একটি খোলা বারান্দা। দক্ষিণ-দিক দিয়ে মসজিদের উপরে ওঠার সিঁড়ি পথ।

এটি মুসাখানের মসজিদ নামে পরিচিত। কিন্তু এর স্থাপত্যকৌশল দেখে মনে হয় যে, এটি শায়েস্তা খানের আমলে বা তারপরে নির্মিত হয়েছিল। মুসাখান ছিলেন বাঙলার বিখ্যাত বার ভূইঞাদের নেতা ঈসা খান মসনদ-ই-আলার (মৃত্যু ১৫৯৯ খ্রিঃ) জ্যেষ্ঠ পুত্র। মুসা খান সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইসলাম খানের কাছে (অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহের পরে) আত্মসমর্পণ করেন। তাঁর পুত্র ছিলেন মাসুম খান এবং মাসুম খানের পুত্র ছিলেন দিওয়ান মনোয়ার খান। বর্তমান নাজিম-উদ্‌-দীন রোড, যা মুসা খান মসজিদের পাশ দিয়ে চলে গেছে, তা দিওয়ান মুসা খান রোড নামে পরিচিত ছিল। আর মনোয়ার খানের নামে পরিচিত ছিল নবাবপুরের নিকটবর্তী মনোয়ার খাঁ বাজার ও রোড।

খুব সম্ভব দিওয়ান মাসুম খাঁ বা তাঁর পুত্র মনোয়ার খাঁ এ মসজিদ নির্মাণ করেন এবং পিতা বা পিতামহের নামানুসারে মসজিদের নামকরণ করেন। মসজিদের উত্তর-পূর্ব কোণে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে দেওয়ান মুসা খাঁর পাকা কবর নিতান্ত অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে।

শিখমন্দির

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগারের পশ্চিম দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের পূর্ব-দক্ষিণে একটি শিখমন্দির আছে। এককালে এখানে একটি বিরাট আঙ্গিনার মধ্যে মন্দিরসহ আরও অনেক ইমারতাদি ছিল। বর্তমানে আঙ্গিনার আয়তন অত্যন্ত সঙ্কুচিত এবং মন্দির ছাড়া অন্যান্য ইমারত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। মন্দিরের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এ সমস্ত ইমারত বিভিন্ন সময়ে নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরসংলগ্ন ভূমির আয়তন নিয়ে মন্দির কর্তৃপক্ষ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কিছু বিরোধ ছিল এবং পরে মীমাংসা হয়েছিল বলে জানা গেছে।

মন্দিরটি বর্তমানে বেশ ভাল অবস্থায়ই টিকে আছে। বর্গাকারে নির্মিত এই মন্দিরের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য বাইরের দিকে প্রায় ৭.০৬ মিটার। পূর্বমুখী এ মন্দিরের পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম দেয়ালে ৫টি করে প্রবেশপথ আছে। দক্ষিণ দিকে কোনো প্রবেশপথ নেই। সে দিকে মন্দিরের সংলগ্ন একটি ছোট কক্ষ আছে।

বর্গাকারে নির্মিত কেন্দ্রীয় কক্ষের চারদিকে আছে বারান্দা। বারান্দার প্রত্যেক কোণে ১টি করে মোট ৪টি ছোট কক্ষ আছে। বারান্দাটি প্রায় ১.৮১ মিটার প্রশস্ত। বারান্দার পরেই মন্দিরের কেন্দ্রীয় কক্ষ। বর্গাকারে নির্মিত কেন্দ্রীয় কক্ষের প্রত্যেক বাহু

প্রায় ৪.৮০ মিটার দীর্ঘ। প্রত্যেক বাহুতে খিলানের সাহায্যে নির্মিত ৩টি করে প্রবেশ পথ। কেন্দ্রীয় কক্ষে একটি অনুচ্চ বেদীর উপর 'গ্রন্থ সাহেব' নামক একখানি বিরাট হস্তলিখিত গ্রন্থ খোলা অবস্থায় রক্ষিত আছে। এই গ্রন্থকেই প্রতিদিন পূজা করা হয়। গ্রন্থ থেকে কিছু পাঠ করলেই পূজার কাজ সারা হয়। মন্দিরটি এখনও চালু আছে এবং পাঞ্জাব (ভারত) থেকে প্রেরিত একজন পূজারী মন্দিরে নিয়োজিত আছেন। মন্দিরের বর্তমান ফ্ল্যাট ছাদ ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে পুনর্নির্মিত হয়েছে। মন্দিরের পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে একটি বিরাট পাকা কুয়া ও কয়েকটি পাকা সমাধি ছিল। এখন সেগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কুয়ার গায়ে একটি শিলালিপি ছিল। সেটিও এখন নেই।

আলমাস্‌ত্‌ সাহেব নামক একজন শিখগুরু সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে (১৬০৫-২৮ খ্রিঃ) এ মন্দির নির্মাণ করেন বলে কথিত হয়ে থাকে। সে সময়ের মন্দিরের কোনো চিহ্ন বর্তমানে নেই। বর্তমান মন্দির ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের।

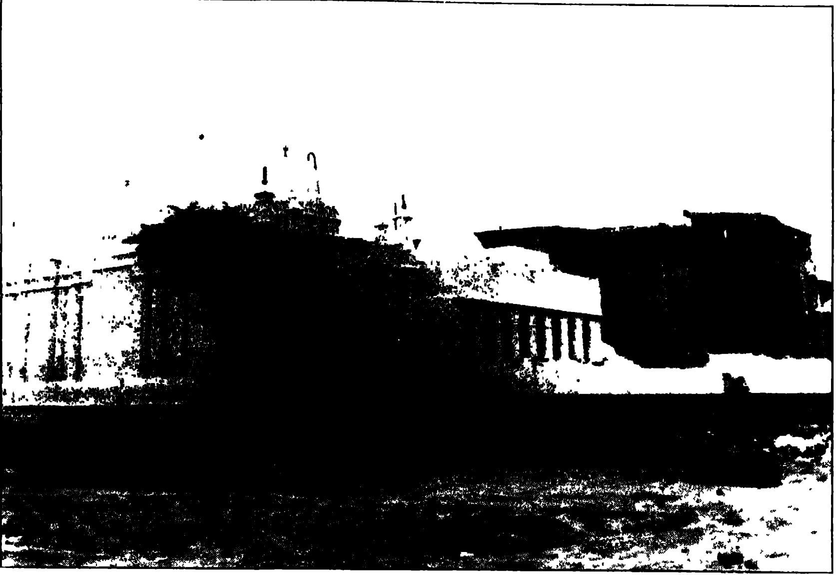
ঢাকার অন্যান্য এলাকার কীর্তি

খোওয়াজা আম্বর মসজিদ, তেজগাঁও

এয়ারপোর্ট রোডের পূর্বদিকে কারওয়ানবাজারে এই মসজিদ অবস্থিত। ইষ্টকনির্মিত একটি অনুচ্চ বেদীর (platform) উপরে এ মসজিদ নির্মিত। পূর্বদিকে একপ্রস্ত সিঁড়ি পার হলে একটি তোরণ পড়ে। ইষ্টকনির্মিত তোরণে আছে পাথরের চৌকাঠ (frame)। তোরণ পার হলেই মসজিদের প্রাচীরঘেরা অঙ্গন। অঙ্গনের পশ্চিম দিক ঘেঁষে মসজিদটি নির্মিত। আদিতে ৩ গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদের পূর্বদিকে ছিল ৩টি দরজা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ছিল ১টি করে দরজা। পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি মিহরাব। দরজাগুলিতে কালপাথরের চৌকাঠ। মিহ্‌রাবগুলি পাথরের এবং সেগুলিতে সুন্দর নকশার কারুকার্য আছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবের পাশে মিম্বর। সেটিও পাথরের তৈরি। মসজিদের চারকোণে ৪টি সুন্দর মিনার বা টারেট (turret) ছিল। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের পিছনে আছে এক ফালি সরু বারান্দা।

কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উপরে ছিল একটি শিলালিপি। শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে নওয়াব শায়েস্তা খানের প্রধান খোওয়াজা, খোওয়াজা আম্বর এ মসজিদ, মসজিদের অঙ্গনে একটি পাকা কুয়া ও মসজিদের কিছু দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি পাকা পুল নির্মাণ করেন।

এ মসজিদের হাল আমলে বহু নূতন কাজ করা হয়েছে। পূর্বদিকে ৩ গম্বুজ বিশিষ্ট একটি নূতন কক্ষ যোগ করা হয়েছে। তাতে মসজিদের আদি রূপ অনেকটা বিনষ্ট হলেও আদি মসজিদে মোঘল আমলের স্থাপত্যকৌশল ধরা পড়ে। মসজিদের উত্তরদিকে হাল আমলে নির্মিত একটি ছোট কক্ষে খাজা আম্বরের ইষ্টকনির্মিত সমাধি আছে। মসজিদে এখন আরও কাজ হয়েছে এবং হচ্ছে।



খোওয়াজা আম্বর মসজিদ, তেজগাঁ, ঢাকা

খোওয়াজা আম্বরের পুল

মসজিদের কিছু দক্ষিণ-পশ্চিমে এয়ারপোর্ট রোডের উপর চতুষ্কোণাকার খিলানবিশিষ্ট একটি পাকা পুল নির্মিত ছিল। হাল আমলে রাস্তাটি প্রশস্ত করার সময়ে এই পুল ভেঙ্গে নতুন পুল নির্মিত হয়েছে। খোওয়াজা আম্বর যে এ পুল নির্মাণ করেছিলেন, তা আগেই বলা হয়েছে।

তেজগাঁও গির্জা

খোওয়াজা আম্বর মসজিদ থেকে প্রায় ৭৫০ মিটার উত্তরে অবস্থিত এই গির্জা ঢাকা শহরের গির্জাগুলি মধ্যে প্রাচীনতম। পর্তুগীজ মিশনের এ গির্জা ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল বলে ডক্টর টেইলার (Dr.Taylor) অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অধ্যাপক দানী অনেক প্রমাণ দেখিয়ে বলেছেন যে এটি ১৬৭৭ খ্রাস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। এ গির্জায় বহু সংস্কার করা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে বলে এর আদিরূপ সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছুই বলা সম্ভব নয়।

নারিন্দা পুল

১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে হায়াত ব্যাপারী নামক একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি এক খিলানবিশিষ্ট একটি পাকা পুল নারিন্দাতে দোলাইখালের উপরে নির্মাণ করেন। 'তোয়া-রিখই-ই-ঢাকা' নামক গ্রন্থে জনাব রহমান আলী এ তথ্য প্রকাশ করেছেন।[১] কিছুকাল আগে পুলটি নস্ট হয়ে গেল এটিকে নতুন করে নির্মাণ করা হয়।

১. Ibid,p.205

হায়াত ব্যাপারীর মসজিদ

নারিন্দা পুলের কিছু দক্ষিণে এই পুরাতন মসজিদ অবস্থিত। নারিন্দা পুলের উত্তরে অবস্থিত বিনত বিবির মসজিদে (বিনত বিবির মসজিদ দ্র.) মতো এটিও ছিল এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। বর্গাকারে নির্মিত এ মসজিদ ১৬৪৪ খ্রীস্টাব্দে হায়াত ব্যাপারী কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল।[২] বর্তমানে এ মসজিদকে নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে।

জয়কালী মন্দির

ঠাটারী বাজারের পূর্ব প্রান্তে পুরাতন রেললাইনের লাগোয়া দক্ষিণে অবস্থিত একটি প্রাচীরঘেরা স্থানে দুটি মন্দির অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় টিকে আছে। একটি মন্দির উত্তর ভিটিতে দক্ষিণমুখী এবং অপর মন্দিরটি এর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পূর্বভিটিতে অবস্থিত।

পূর্বভিটির মন্দিরটি এক চূড়া বা রত্নবিশিষ্ট। এটি একটি ছোট মন্দির। এর গায়ে পলেস্তরার উপরে নানা মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। মন্দিরটি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে নির্মিত বলে মনে হয়।

উত্তর ভিটির মন্দিরটি আয়তনে একটু বড়। এর উপরে পাঁচটি চূড়া বা রত্ন আছে। এটিকে সে কারণে পঞ্চরত্ন মন্দির বলা যায়। মন্দিরটি মোঘল আমলের শেষ দিকে নির্মিত হয়েছিল বলে ধারণা হয়। মন্দিরে একটি কালীমূর্তি পূজিত হয়ে থাকে।

গোলাম মোহাম্মদ তোরণ

শেখ গোলাম মোহাম্মদ ছিলেন তদানীন্তন ত্রিপুরা জেলার টোরা পরগনার জমিদার গোলাম নবীর পুত্র ও ঢাকাস্থ পর্তুগীজ ফ্যাক্টরির এজেন্ট। তাঁরা উভয়েই কদমরসুল (কদমরসুল দ্র.) ইমারতে অনেক কাজ করেছিলেন। পিতার মৃতুর পরে গোলাম মোহাম্মদ সঙ্গতটোলায় অবস্থিত পর্তুগীজদের বাড়িটি কিনে নিয়ে সেখানে নতুন করে তাঁর বাসভবন ও তোরণদ্বার (gateway) নির্মাণ করেন।

লক্ষ্মীবাজার থেকে গলিপথে সঙ্গতটোলা গেলেই ইটের তৈরি একটি উঁচু তোরণদ্বার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ইমারতটি দোতলা এবং এর উপরের তলাতে এখন নূতন ইমারত তৈরি করা হয়েছে। নিচের তলে তোরণদ্বারটি পর পর তিনটি খিলানের সাহায্যে ছোট কাটরার প্রবেশপথের অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। চারদিকে গজিয়ে ওঠা নতুন ইমারতের মাঝখানে এই তোরণদ্বার আজও টিকে আছে। এই ইমারত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে নির্মিত হয়েছিল।

বিবিমেহের মসজিদ

গোলাম মোহাম্মদের তোরণদ্বার থেকে সামান্য দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বর্গাকারে নির্মিত একটি ছোট মসজিদ ছিল। এর উপরে ছিল একটি মাত্র গম্বুজ। সেটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে

---

২. Ibid, p. 221.—Prof. A. H. Dani.

এখন মসজিদে সমতল ছাদ তৈরি করা হয়েছে। মসজিদের গায়ে যে শিলালিপি আছে, তা থেকে জানা যায় যে, শেখ গোলাম মোহাম্মদের আত্মীয়া জনৈকা বিবিমেহের ১২৩০ হিজরী (১৮১৪ খ্রিঃ) সনে এই মসজিদ তৈরি করেছিলেন।

গুরু তেগবাহদুর সঙ্গত

সঙ্গতটোলা গলি ধরে আরও ১০০ মিটার এগিয়ে গেলে 'গুরু তেগবাহাদূরের সঙ্গত' সামনে পড়ে। এই প্রতিষ্ঠানের নাম থেকেই এই মহল্লার নাম সঙ্গতটোলা। বর্তমান সঙ্গতটি হাল আমলে (বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে) নির্মিত একটি ইমারতের দোতলায় অবস্থিত। প্রকৃত সঙ্গতটি এই ইমারতের পশ্চিম দিকে অবস্থিত এবং সেখানে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে নাকি শিখগুরু তেগবাহাদুর থাকতেন।

গুরু তেগবাহাদুর (গুরু গোবিন্দের পিতা) ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে ঢাকা এসেছিলেন এবং কিছুকাল এখানে অবস্থানরত ছিলেন। তাঁর হাতের কিছু চিঠি, ১৭৩২ খ্রিস্টাব্দে লিপিকৃত গ্রন্থ সাহেবের একটি অনুলিপি, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার আমলে একটি সুন্দর গ্রন্থসাহেব ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক মূল্যবান প্রত্নবস্তু এই সঙ্গতে আছে।

সিংটোলার সিতারাবেগম মসজিদ

তেগবাহাদুর সঙ্গত থেকে পূর্বদিকে কিছুদূরে চৌমোহনি পার হয়ে কিছু পূর্বদিকে গিয়ে দক্ষিণ দিকে মোড় নিলেই সিংটোলা সিতারাবেগম মসজিদ চোখে পড়ে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এই মসজিদের উপরে ৩টি গম্বুজ আছে। এটি একটি অতি সুন্দর মসজিদ এবং এর গায়ে অনেক কারুকার্য আছে। উপরে উল্লিখিত শেখ গোলাম মোহাম্মদের স্ত্রী সিতারা বেগম স্বামীর মৃত্যুর পরে ১২৩১ হিজরী (১৮১৯ খ্রিঃ) সনে এই মনোরম মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন তাঁর স্বামীর স্মৃতি রক্ষার্থে। মসজিদের গায়ে যে শিলালিপি আছে তা থেকে এতথ্য জানা যায়।

রাজাবাবুর প্রাসাদ ও লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির

লক্ষ্মীবাজার থেকে শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী গলি ধরে রাজাবাবুর বাড়িতে যাওয়া যায়। রাজাবাবুর প্রকৃত নাম কৃষ্ণপ্রসাদ। তাঁর পিতামহ ভিখনলাল পাণ্ডে নামক একজন গৌড়িয় ব্রাহ্মণ পাঞ্জাব থেকে ঢাকায় চলে আসেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দিওয়ানি দফতরে কাজ করেন। পলাশী যুদ্ধের সময়ে কোম্পানীকে যথেষ্ট সাহায্য করার কারণে তিনি ও তাঁর বংশধরগণ বংশানুক্রমে প্রভূত ভূসম্পত্তির অধিকারী হন এবং লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহের নামে একটি পেনসনও পান। তিনি তাঁর গৃহে লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজাবাবু ময়দানের এককোণে রাজাবাবুর দোতালা ইমারত অবস্থিত। নিচের তলে আছে দুটি কক্ষ এবং বিরাট আকারের প্রাচীরের উপরে ইমারতের দোতলাটি নির্মিত। হলঘরে ১২টি দরজা আছে বলে এটিকে বারদুয়ারী বলা হয়ে থাকে। এই ঘরের দেয়ালে

অতি সুন্দর কারুকার্য আছে। ঘরের মেঝে কাঠের তৈরি। এটিকে নাচঘর বলা হয়ে থাকে। এর উপরে হাল আমলে টিনের ছাদ লাগান হয়েছে। নাচঘরের সঙ্গেই আছে 'অন্তরাল' নামক একটি কক্ষ। সেখানে একটি অতি সুন্দর সিংহাসনের উপর লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্তি প্রয়োজনের সময়ে রাখা হয়। কাঠের উপর রূপার কাজ করা এই সিংহাসন দেখতে ভারী মনোরম।

এই ইমারত অষ্টাদশ শতাব্দীর।

জিঞ্জিরা প্রাসাদ ও হাম্মামখানা

বুড়িগঙ্গা নদীর দক্ষিণতীরে জিঞ্জিরা নামক স্থানে একটি বিরাট প্রাসাদ ওস্টে প্রাসাদে একটি হাম্মাদখানা ছিল। বর্তমানে (১৯৯৩ খ্রি)। ভগ্ন প্রাসাদের একটি জীর্ণ কক্ষ ও হাম্মানখানার পরিত্যাক্ত কূপ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। সমগ্র প্রাসাদ, হাম্মাম খানা ইত্যাদি এখন অনধিকার প্রবেশকারীদের অধিকারে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙলার সুবাদার ইবরাহিম খান (দ্বিতীয়) কর্তৃক এ প্রাসাদ, হাম্মাম খানা নির্মিত হয়েছিল। তখন বুড়িগঙ্গা নদীর উপরে একটি কাঠের সেতুও নির্মিত হয়েছিল।

মীরপুর মাযার

ঢাকা শহর থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম দিকে তুরাগ নদীর বাঁকে মীরপুরে অবস্থিত শাহ্ আলী বাগদাদীর মাযারকে মীরপুর মাযার বলা হয়ে থাকে।

শাহ্ আলী বাগদাদীর জীবন সম্পর্কে কোনো সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে প্রবল জনশ্রুতি আছে যে, তিনি ছিলেন বাগদাদের একজন শাহ্জাদা। তিনি সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ঘুরতে ঘুরতে প্রথমে ফরিদপুর জেলার গেরদা নামক স্থানে আসেন এবং সেখান থেকে মীরপুরে এসে আস্তানা গাড়েন। মতান্তরে তাঁর ভ্রাতা শাহ্ ওসমান রেযা গেরদাতে আস্তানা গাড়েন এবং শাহ্ আলী বাগদাদী মীরপুরে আসেন।

শাহ্ আলী বাগদাদী যখন মীরপুরে আসেন, তখন সেখানে সুলতানী আমলে নির্মিত একটি অতি জীর্ণ মসজিদ ছিল। সেই জীর্ণ মসজিদেই তিনি আস্তানা গাড়েন এবং বহুকাল পরে তিনি সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং সেখানেই তাঁকে কবর দেওয়া হয়। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে একটি অলৌকিক কাহিনী আছে।

তিনি যেখানে সমাহিত আছেন, সেই ইমারতটির গায়ে একটি শিলালিপি আছে। এই শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, সুলতান ইউসুফ শাহ্‌র রাজত্ব কালে ৮৮৫ হিজরী (১৪৮০ খ্রিঃ) সনে মহান আমির (খাকান-ই-মোয়ায্যেম) মালিক ... কর্তৃক এই মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে (১২২১ হিঃ) ঢাকার নায়েব-ই-নাযিম নবাব জেসারত খানের আমলে মগবাজারের শাহ্ সাহেব শাহ্ মোহাম্মদী এই ইমারতের আমূল সংস্কার করেন। ইমারতের গাত্রে ফারসি ভাষায় যে শিলালিপি আছে, তা থেকে এতথ্য জানা যায়।

বর্গাকারে নির্মিত এই ইমারতের বাইরের দিকের আয়তন ১০.৯ মিটার x ১০.৯ মিটার, দেয়ালগুলি প্রায় ২.৪২ মিটার চওড়া। উপরে আছে একটি বিরাট গম্বুজ। বহু মেরামতের পরেও এটি যে সুলতানী আমলের একটি মসজিদ, তা সহজেই বোঝা যায়।

মাযারের উত্তর পার্শ্বে একটি মসজিদ আছে। এ মসজিদ ঢাকার নবাব আবদুল গনি বা নবাব আহসান উল্লাহ্ নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়। এর পরে মাযারের চারদিকে অসংখ্য ইমারত নির্মিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এ মাযারে বহু লোকের ভিড় হয়।

টাঙ্গাইল জেলা

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ

টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর এলাকার লালমাটির পাহাড়ী অঞ্চলে প্রাক-মুসলিম যুগের অনেক প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। গভীর জঙ্গলে ঢাকা ছিল বলে এই অঞ্চলে এতদিন পর্যন্ত বিশেষ কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান কার্য চালান হয়নি। ফলে এখানে প্রাচীন আমলের কীর্তিগুলি অনাবিষ্কৃতই থেকে গেছে। এর উপর বর্তমান কালে চলছে সমুদয় এলাকা জুড়ে চাষ-আবাদের কাজ। ফলে এসমস্ত অনাবিষ্কৃত কীর্তি চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের কথা। আমরা মধুপুর অঞ্চলে প্রাচীন কীর্তির অনুসন্ধানে গিয়ে ছিলাম। ঘাটাইল থানা সদর থেকে পূর্বদিকে পাহাড়ে উঠে অনেক দূর দক্ষিণে দেখা গেল প্রায় সমতল পাহাড়ের উপর একটি ছোট গ্রাম। মাত্র কয়েকঘর অধিবাসী আছে সেখানে। লালমাটির পাহাড়ের উপর চাষাবাদ করা হয়েছে। কিন্তু প্রায় ২ বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে প্রায় সমগ্র চাষের ভূমিতে আছে অজস্র প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ। কোনো কোনো স্থানে অসংখ্য ইট জড়ো করে রাখা হয়েছে মাটির নিচ থেকে তুলে। এগুলি প্রাচীন যুগের ইট। পাহাড়ের নিচে পূর্বদিকের নিম্নভূমিতে একটি প্রাচীন পুকুর দেখা গেল। পুকুরটি প্রায় মজে গেছে। এর ভিতরে একটি গাছের কাণ্ড বহুকাল ধরে প্রোথিত আছে। অনেক চেষ্টা করেও কাঠটি তোলা সম্ভব হয়নি। এগুলিকে নাকি নাগকাষ্ঠ বলা হয়ে থাকে।

এস্থানে একটি প্রাচীন জনপদ ছিল। কে বা কারা এখানে ছিলেন বা কবে ছিলেন, সেকথা জানার কোন উপায় নেই। এস্থান বহুকাল ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল। তারফলে এখানে জঙ্গল গড়ে ওঠে। বর্তমানে আবার নূতন করে বসতি গড়ে উঠেছে। তবে ইটগুলি দেখে ধারণা হয় যে, এস্থানে প্রাক-মুসলিম যুগে একটি জনপদ ছিল। এধরনের বহু প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ মধুপুরগড় এলাকায় আছে বলে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে জানা যায় এবং আমরা নিজেরাও কিছু কিছু দেখেছি।

ঝরকা

ঝরকা এ ধরনেরই একটি অনাবিষ্কৃত প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ। ঘাটাইল থানা সদরের প্রায় ৩ কিলোমিটার পূর্বদিকে মধুপুর গড়ের পশ্চিমভাগের প্রায় নিম্নভূমিতে অবস্থিত এটি একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তির ধ্বংসাবশেষ। পাহাড়ের নিম্নদেশে অবস্থিত প্রায় ২

বিঘা পরিমিত ভূমির কেন্দ্রস্থলে এটি অবস্থিত। ইষ্টকনির্মিত এই ইমারতটির আদিরূপ কী ছিল, তা বলা কঠিন। তবে এটি আকারে খুব বড় ছিল না বলে মনে হয়।

এই কীর্তিটি যেখানে অবস্থিত সেই ভূমির পরিমাণ আধ বিঘার চেয়ে বেশি নয়। এর চারদিকে ছিল গভীর ও প্রশস্ত পরিখা। অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে একটি জলাশয়ের মাঝখানে দ্বীপাকারে অবস্থিত ছিল এই কীর্তিটি। এটি কী ছিল বলা কঠিন। লোকে বলে ঝরকা।

ইট দেখে মনে হয় এটি হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের একটি কীর্তির ধ্বংসাবশেষ।

রাজবাড়ি

এই ঝরকার উপরে উত্তরদিকে যে সমতল পাহাড়ী এলাকা আছে সেখানে প্রায় ১৫ একর ভূমি জুড়ে প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন আছে। কোনো ইমারতের ধ্বংসাবশেষ অবশ্য নেই। কিন্তু সমগ্র স্থান জুড়ে অসংখ্য প্রাচীন ইট ও প্রাচীন মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ দেখা যায়।

লোকে বলে হোড়রাজার বাড়ি।

আতিয়া

আতিয়া এখন একটি মসজিদের জন্য সুবিখ্যাত। কিন্তু হিন্দু-বৌদ্ধ যুগেও এখানে একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। এখানে বেশ কিছু প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। আতিয়া জামে মসজিদের (পরে আতিয়া মসজিদ দ্র.) লাগোয়া পিছনে মাঝারি আকারের উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি পুকুর আছে। পুকুরের পাড়ের সমুদয় ঢালুদেশ প্রাচীন কালের ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ দ্বারা আবৃত। পাড়ের উপর থেকে নিচে পর্যন্ত সর্বত্রই এগুলি বিদ্যমান। খুব সম্ভব এগুলি প্রাক-মুসলিম যুগের। পরবর্তীকালে এস্থান যখন পরিত্যক্ত হয় তখন বোধ হয় এখানে পুকুরটি খনন করা হয়েছিল। তা ছাড়া, আতিয়া অঞ্চলে হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের আরও কিছু কিছু কীর্তির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন দেখা যায়। আতিয়া থেকে প্রায় ১.৬ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণে হিঙ্গুপালের গড় নামক একটি বিরাট দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। এটি যে প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের, তাতে সন্দেহ নেই।

হোড় রাজার বাড়ি

ঘাটাইল থানা থেকে প্রায় ৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বদিকে একটি বিচিত্র ধরনের প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আছে। বর্গাকারের স্থানটির আয়তন হবে আনুমানিক ৩৭ মিটার × ৩৭ মিটার। এস্থানের তিনদিকে ছিল প্রায় ৩৭ মিটার প্রশস্ত গভীর পরিখা। পূর্বদিকে মাঝামাঝি স্থানে ছিল ১টি দিঘি, নাম হোড় দিঘি। উত্তর দিকের পরিখা দিঘির উত্তর পাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু দক্ষিণ দিকের পরিখা দিঘির দক্ষিণ পাড়ের অনেক আগেই শেষ হয়েছিল।

মাঝখানের ভূমিতে ছিল বেশ কয়েকটি পাকা ইমারত। এগুলির মধ্যে দক্ষিণ ভিটির ইমারতটি ছিল আয়তনে বেশ বড়। পূর্ব ও পশ্চিম ভিটির ইমারত দুটি ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট। উত্তর ভিটির ইমারতটি ছিল মাঝারি ধরনের। এর উত্তরে ছিল ১টি ছোট ইমারত।

বর্তমানে পরিখাগুলি প্রায় মজে গেছে। এই ইমারতগুলির ভিত্তি দেয়াল ছাড়া আর কিছুই টিকে নেই।

সাগরদিঘি ও গুপ্তবৃন্দাবন

ঘাটাইল উপজেলার অধীনে ও উপজেলা সদর থেকে প্রায় ২৪ মিটার পুব-দক্ষিণে মধুপুর বনাঞ্চলের অভ্যন্তরে সাগরদিঘি নামক একটি বিরাট প্রাচীন দিঘির অস্তিত্ব দেখা যায়। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এ দিঘির আয়তন প্রায় ৪০ একর। দিঘির পার বিশেষ করে পশ্চিম পাড় খুবই প্রশস্ত। পশ্চিম পাড় প্রায় ২০ মিটার প্রশস্ত। পশ্চিম পাড়ে প্রাচীর ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ প্রচুর সংখ্যায় দেখা যায় এবং স্থানে স্থানে প্রাচীন ইমারতের ভিত্তিও মাটির নিচে দেখা যায়।

দিঘির পশ্চিম পাড়ের প্রায় কেন্দ্রস্থলে দিঘি রক্ষণা-বেক্ষণ ও মাছ চাষের তদারকির জন্য একটি ছোট ইমারত নির্মিত হয়েছে। পশ্চিম পাড়ের ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীর ঘাটেই উপরে একটি নতুন ঘাট নির্মিত হয়েছে। উপরে উল্লিখিত আধুনিক কালের ইমারতটি যে প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত তা বলাই বাহুল্য। দিঘির ধারে কাছে বেশ কয়েকটি প্রাচীন ইমরত ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু সে সব ইমারতের অস্তিত্ব আজ (১৯৯৬ খ্রিঃ) আর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

সাগর দিঘি থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার পুবে বনাঞ্চলের ভিতরে গুপ্ত বৃন্দাবন নামে হিন্দু বৈষ্ণবদের একটি আখড়া আছে। এটি হিন্দুদের বিশেষ করে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি তীর্থস্থান ছিল এবং সেখানে বহুলোকের সমাগত হত। আজও সে স্থানের তীর্থ মহিমা আছে যদিও আগের তুলনায় সেখানে অতি অল্প লোকের সমাগম হয়ে থাকে।

এখানে প্রাচীন কালের কিছু ইমারতাদি ছিল। কিন্তু আজ (১৯৯৬ খ্রিঃ) সে সব ইমারতের অস্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া যায় না। খুব সম্ভব এখানে একটি বৌদ্ধধর্ম কেন্দ্র ছিল পরে তা হিন্দু বিশেষ করে বৈষ্ণব ধর্মকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

সাগরদিঘি ও গুপ্ত বৃন্দাবনের কোনো সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না যদিও এ ব্যাপারে বহু কিংবদন্তির অস্তিত্ব দেখা যায়। এসব প্রমাণহীন কিংবদন্তির উপর কোনো গুরুত্ব না দিয়ে বলা যায় যে, এ স্থান বেশ প্রাচীন এবং খুব সম্ভব পাক-মুসলিম আমলের।

বারতীর্থ ও অন্যান্য কীর্তি

মধুপুর উপজেলার শোলাকুড়ি ইউনিয়নে ও উপজেলা সাদর থেকে প্রায় ১১ কিলোমিটার উত্তরে মধুপুর বনাঞ্চলের প্রায় উত্তর প্রান্তে এ স্থান অবস্থিথ। এখানে বারতীর্থ নামক

একটি প্রাচীন জলাশয় আছে। প্রায় বর্গাকারের এ দিঘি উত্তর-দক্ষিণ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ। এ দিঘির পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ের প্রত্যেকটি প্রায় ১২০ মিটার করে দীর্ঘ। এই প্রাচীন জলাশয় প্রায় মজে গিয়েছিল এবং তাতে খুব একটা পানি থাকতনা বলে এটিকে পুনর্খনন করা হয়েছিল। তাতেও দিঘিটির অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয়েছিল বলে মনে হয় না। আমরা ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পুরা বর্ষাকালে দিঘিটি দেখেছিলাম। কিন্তু দিঘিতে পানির খুব প্রাচুর্য দেখা যায়নি। খবর নিয়ে জানা গেছে যে, দিঘিতে পানির প্রাচূর্য খুব না থাকলেও শুষ্ক মৌসুমে তা একেবারে শুকিয়ে যায় না।

এখানে প্রতি বছর বৈশাখ মাসের অমাবস্যার দিনে একটি বড় মেলা বসে এবং সেই মেলাতে বহুস্থান থেকে অসংখ্যা হিন্দুর আগমন ঘটে দিঘির পানিতে স্নান করে পুণ্য সঞ্চয়ের অভিলাষে। এখানে এই বিশেষ তিথিতে স্নান করলে বারটি তীর্থস্থানে স্থান করার পুন্য সঞ্চয় হয় বলে হিন্দুদের বিশ্বাস।

স্থানীয় জনশ্রুতিমূলে জানা যায় যে, খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে ভগদত্ত নামক এক নৃপতি এই জলাশয় খনন করিয়েছিলেন এবং উপমহাদেশের বারটি তীর্থস্থান থেকে পানি আনিয়ে দিঘিটি জলপূর্ণ করেছিলেন বলে এ দিঘির নাম 'বার তীর্থ'। ভিন্ন মতে ভগদত্ত নামক এ নৃপতি ছিলেন দশম একাদশ শতাব্দীর।

দিঘির পশ্চিমপাড়ের দক্ষিণভাগের চালুতে একটি পাকা কুয়া আছে। এইকুয়া নিয়ে অনেক অলীক কাহিনী প্রচলিত আছে। এবং এই কুয়ার পানিতে স্নান করলে অশেষ পুণ্য লাভ হয় বলে লোকের বিশ্বাস ছিল। তবে কুয়াটি দেখে মনে হয় যে, একাহিনীর পিছনে কোনো সত্য নেই। কুয়াটি দেখে সহজেই বোঝা যায় যে, এটি অপেক্ষাকৃত হাল খুব সম্ভব ব্রিটিশ আমলের দিকে নির্মিত হয়েছিল। প্রায় মজে যাওয়ার পানি পান করার ফলে তীর্থ যাত্রীরা কলেরায় আক্রান্ত হত বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়। সে কারণেই বোধ হয় দিঘির ঢালুদেশে বিশুদ্ধ পানি পাওয়ার জন্য কুয়াটি নির্মিত হয়েছিল। কুয়ার গঠনপ্রণালী ও ইট দেখে ব্রিটিশ আমলের বলে এটিকে চিহ্নিত করা যায়। কুয়াটি এখন মজে গেছে এবং এতে কোনো পানি পাওয়া যায় না।

দিঘির পাড় বিশেষ করে উত্তর পাড় বেশ প্রশস্ত। সেখানে খড়ের চালবিশিষ্ট গোটা দুই জীর্ণ মন্দির আছে এবং মাটির তৈরি কিছু মূর্তির পূজা সেখানে করা হয় স্থানীয় হিন্দু জনসাধারণ কর্তৃক। দিঘির ধারে কাছে বেশ কয়েকটি ঢিবি আছে। সেগুলির বর্ণনা নিচে তুলে ধরা হল।

প্রথম ঢিবি : বারতীর্থ দিঘির উত্তর-পুব কোণ থেকে একটি স্থানীয় রাস্তা পুবদিকে চলে গেছে। সেই রাস্তার প্রায় লাগোয়া দক্ষিণে এবং দিঘি থেকে প্রায় ২০০ মিটার পুবে প্রায় এক বিঘা ভূমির উপরে এর অবস্থান। ঢিবির উচ্চতম অংশ এখন (১৯৯৬ খ্রিঃ) প্রায ৫ মিটার উঁচু। প্রায় গোলাকার এ ঢিবির ব্যাস প্রায় ১৫ মিটার। ঢিবিতে প্রচুর প্রাচীন ইট ও ইটের ভগ্নাংশ দেখা যায় এবং প্রাচীন ইমারতের ভিত্তির চিহ্ন স্থানে স্থানে দেখা যায়। এখানকার ইটের আয়তন প্রাক-মুসলিম আমলের ইটের মতো। ঢিবির চারদিকে বর্তমানে চাষাবাদের কাজ করা হচ্ছে বলে এ প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের যথেষ্ট ক্ষতিহচ্ছে এবং ঢিবির আয়তন ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় ঢিবি : উপরে উল্লিখিত প্রথম ঢিবি থেকে প্রায় ১২৫ মিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং বারতীর্থ দিঘি থেকে প্রায় ১২৫ মিটার পুবে প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ একটি উঁচু ঢিবি ছিল। ইট হরণকারীদের দৌরাত্ম্যে ঢিবিটি এখন (১৯৯৬ খ্রিঃ) মাটির সঙ্গে মিশে গেছে প্রায়। এখানে প্রাপ্ত ইট উপরে উল্লিখিত প্রথম ঢিবির ইটের মতোই।

তৃতীয় ঢিবি : বারতীর্থ দিখি থেকে প্রায় ১৫০ মিটার পশ্চিমে একটি বড় আকারের ঢিবির অস্তিত্ব ছিল এবং এর আয়তন ও উচ্চতা প্রথম ঢিবির চেয়ে ও বেশি ছিল। কিন্তু ইট হরণকারীদের দৌরাত্ম্যে ঢিবিটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পথে। এখানে প্রাপ্ত ইটের আয়তন প্রায় প্রথম ঢিবির মতোই। স্থানীয় জনপ্রবাদ মতে এখানেই নাকি ছিল রাজবাড়ি।

ইছামতি দিঘি : উপরে উল্লিখিত প্রথম দিঘির উত্তরে এবং স্থানীয় রাস্তার বাঁকেই আছে ইছামতি নামক একটি মাঝারি আকারের প্রাচীন জলাশয়। এই ক্ষুদ্র জলাশয়ের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ৫০ মিটার। পাড়গুলি এখনও (১৯৯৬ খ্রিঃ) প্রায় ৩ মিটারেরও বেশি প্রশস্ত। দিঘিটি এখন প্রায় সঙ্গে গেছে।

সুতালরি দিঘি : মধুপুর উপজেলার শোলাকুড়ি ইউনিয়নে ও বারতীর্থ দিঘি থেকে প্রায় ৬০০ মিটার পুব-পুব-উত্তরে ও ইউনিয়ন পরিষদ অফিসের লাগোয়া উত্তরে একটি বিচিত্র ধরনের জলাশয় দেখা যায়। নাম সুতালরি দিঘি। সুতার মতো দীর্ঘ ও পাশে অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত বলে দিঘিটির স্থানীয় নাম সুতালরি (সুতা + লহর > লরি)।

উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ জলাশয়ের আয়তন হবে প্রায় ৬৯৭ মিটার × ১০৬ মিটার (২৩০০´ × ৩৫০´)। দিঘিটি বেশ প্রাচীন কিন্তু কত প্রাচীন তা বলার মতো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। দিঘিটি বেশ গভীর এবং তাতে প্রচুর পানি থাকে। দিঘিতে নিয়মিত মাছের চাষ হয় বলে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গ্রন্থকারকে জানান। দিঘির দক্ষিণপাড় বেশ প্রশস্ত এবং সেখানে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ অফিসসহ এজাতীয় আরও কয়েকটি অফিস গৃহ আছে। দিঘির অন্য তিন পাড়ে মোটামুটি ঘনবসতি দেখা যায়। পাড়ের অধিবাসীরাই সমবায় সমিতির মাধ্যমে দিঘিতে মাছের চাষ করেন।

বারতীর্থ অঞ্চলের ইতিহাস : বারতীর্থ দিঘি ও এখানকার অন্যান্য কীর্তির কোনো সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় শুধু জনশ্রুতিভিত্তিক কিংবদন্তি এবং জনৈক ভগদত্ত নামক নৃপতিকে কেন্দ্র করে যে কিংবদন্তি গড়ে উঠেছে সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু নবম, দশক বা একাদশ শতাব্দীর এ নামের কোনো নৃপতির কথা বাংলা বা আসামের প্রামান্য ইতিহাসে পাওয়া যায় না। অবশ্য ভগদত্ত নামের একজন নৃপত্তির উল্লেখ পুরাণ ও মহাভারতে দেখা যায়। কিন্তু মহাভারত ও পুরাণের সঠিক কাল নির্ণয় খুব সহজ নয় এবং সেগুলি যে ইতিহাস যুগের আগেকার তাতে বোধ হয় কোনো সন্দেহ নেই। সেই ভগদত্ত কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেও তিনি যে আলোচ্য কীর্তিগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত নন এবং হতে পারেন না তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার পূর্বে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা বহুকাল ধরে কামরূপের অধিকারে ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এসব কীর্তি কামরূপের কোনো এক বা একাধিক নৃপতির রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয় এবং পরে সেগুলি

কাল্পনিক কোনো ভগদত্ত নৃপতির নামের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছিল বলে ধারণা হয়। খুব সম্ভব বারতীর্থ অঞ্চলে একটি প্রশাসন কেন্দ্রও ছিল।

মুসলিম আমল

আতিয়া মসজিদ

টাঙ্গাইল শহর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে লৌহজঙ্গ নামক একটি মরা নদীর পূর্বতীরবর্তী একটি মনোরম স্থানে আতিয়া মসজিদ অবস্থিত। মসজিদের প্রায় লাগোয়া পশ্চিমদিকেই আছে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি মাঝারি আকারের পুকুর। এটি মসজিদ নির্মাণের আগে থেকেই এখানে ছিল বলে মনে হয়। কারণ, মসজিদ তৈরির পরে খনিত হলে এটি মসজিদের পিছনে না থেকে সামনের দিকেই থাকত।

পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা এই মসজিদের আয়তন বাইরের দিকে ২০.৯ মিটার × ১২.১২ মিটার।[১] মসজিদের দেয়ালগুলি ২.০১ মিটার প্রশস্ত। চারকোণে আছে ৪টি বিরাট আকারের অষ্টকোণাকৃতির মিনার বা টারেট। বলয়াকারের স্ফীতরেখার সাহায্যে অলঙ্কৃত মিনারগুলি ছাদের অনেক উপরে উঠে অলঙ্করণযুক্ত ছোট গম্বুজে শেষ হয়েছে।

প্রধান কক্ষ ও বারান্দা এই দুই ভাগে মসজিদটি বিভক্ত। প্রধান কক্ষ বর্গাকৃতির এবং ভিতরের দিকে এর প্রত্যেক বাহু ৭.৫৭ মিটার। এই কক্ষের উপরে আছে ১টি মাত্র গম্বুজ এবং তা বিরাট আকারের ও দেখতে ভারী সুন্দর। প্রধান কক্ষের পূর্বদিকে বারান্দার অবস্থান। বারান্দার উপরে আছে ৩টি গম্বুজ। এগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট।

পূর্ব দেয়ালে আছে ৩টি প্রবেশপথ। এগুলি প্রায় পত্রাকারের খিলানের সাহায্যে নির্মিত। পূর্ব দেয়ালের সম্মুখ ভাগ (facade) উপর ও নিচ এই দুই অংশে বিভক্ত। প্রবেশপথগুলির কয়েক ফুট উপর দিয়ে উওর-দক্ষিণে লম্বা একটি মোল্ডিং চলে গেছে। নিচের অংশ অর্থাৎ দরজাগুলির ধারে কাছের অংশ প্যানেল দ্বারা সুশোভিত।

কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উপরের অংশের নিম্নভাগে একটি শিলালিপি আছে। এই শিলালিপির স্থানটুকু ছাড়া উপরিভাগের সমুদয় অংশ আয়তাকারে নির্মিত প্যানেলিং দ্বারা অলঙ্কৃত। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়াল পূর্বে কি রকম ছিল,তা সঠিকভাবে বলা যায় না। কারণ, সেখানে প্রচুর সংস্কার-কার্য করা হয়েছে। এবং সমগ্র দেয়ালে নতুন করে পলেস্তারা দেওয়া হয়েছে। [আতিয়া মসজিদের রঙিন ছবি-২২]

সুলতানী আমলের মসজিদের মত পূর্ব দেয়ালের কার্নিশ ও প্যারাপেট বাঁকানভাবে নির্মিত। প্যারাপেটের উপরিভাগ ব্যাট্‌ল্‌ম্যান্ট দ্বারা সুশোভিত। মসজিদের দক্ষিণ

---

১. অধ্যাপক আহমদ হাসান দানীর বর্ণনানুসারে (Muslim Architecture in Bengal. p. 253.) মসজিদের এই আয়তন দেওয়া হয়েছে। আমি নিজে মসজিদটি মেপে দেখিনি। কিন্তু অধ্যাপক দানী প্রদত্ত মাপ বিভ্রান্তিকর বলে মনে হয়। মসজিদের বর্গাকারের অভ্যন্তরীণ কক্ষের ভিতরের মাপ ২৫´ × ২৫´ হলে এর বাইরের দিকের মাপ হবে ৪০´ × ৪০´ এবং এ মাপই আছে। সেক্ষেত্রে মসজিদের দৈর্ঘ্য ৫৯ ফুট হলে বারান্দার ভিতরের মাপ হবে ২৫ ফুট × ২১.৫ ফুট এবং বাবান্দার বাইরের মাপ হবে ৪০ ফুট × ২৯ ফুট। কিন্তু বারান্দাটি এত অর্থাৎ ২১.৫´ ফুট চওড়া নয়। এটি আরও সংকীর্ণ। খুব সম্ভব এটি ১১.৫ ফুট চওড়া। এবং এ মাপ মতে মসজিদের সঠিক আয়তন (বাইরের দিকে) খুব সম্ভব ৫৯ ফুট ×৪০ ফুট।

দেয়ালের কার্নিশ সংস্কারের পর সোজা করা হয়েছে। সুলতানী ও মোঘল আমলের স্থাপত্য শিল্পরীতির সুষম সমন্বয় এ মসজিদের মধ্যে দেখা যায়।

মসজিদের পূর্ব দিকে একটি উন্মুক্ত আঙ্গিনা আছে। এই আঙ্গিনার উত্তর-পূর্বকোণে একটি পাকা কবর আছে। সমাধির তলদেশে সুড়ঙ্গ আছে এবং সেখানে যাবার জন্য সিঁড়িপথ আছে।

মসজিদকে কেন্দ্র করে প্রায় এক ১.৫ বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন দেখা যায়। মোঘল আমলে আতিয়া ছিল একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র। ইংরেজ আমলেও এ স্থানে বেশ কিছুকাল ধরে টাঙ্গাইল মহকুমার শাসনকেন্দ্র ছিল। সুলতানী আমলেও এ স্থানের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল, প্রাধান্য ছিল এর আগে হিন্দু-বৌদ্ধ যুগেও।

মসজিদের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে ১০১৮ হিজরী (১৬০৮ খ্রিঃ) সনে বায়েজীদ খানপনীর পুত্র সায়িদ খানপনী এ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।[১] এ সম্পর্কে টাঙ্গাইল অঞ্চলে একটি মুখরোচক কাহিনী শোনা যায়। এতে বলা হয় যে, সোলায়মান কররানীর রাজত্বকালে (১৫৬৪-৭২ খ্রিঃ) তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়েজীদকে আতিয়া অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠান। সে সময়ে বায়েজীদ এক হিন্দু মেয়েকে বিবাহ করেন এবং তাঁদের যে-পুত্রটি হয় তাঁর নাম ছিল সায়িদ। পিতার মৃত্যুর পর বায়েজীদ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই আততায়ীর হস্তে নিহত হলে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দাউদ সিংহাসনের অধিকারী হন। বায়েজীদের হিন্দু স্ত্রী ও তাঁদের পুত্র সেখানেই থেকে যান।

কালক্রমে বায়েজীদের বালক পুত্র সায়িদ খান স্বীয় প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের ফলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং আতিয়া অঞ্চলের জায়গীর লাভে সমর্থ হন। তিনি নিজের পরিচয় গোপন করে রাখেন এবং এই মসজিদ নির্মাণ করেন। এটি যে একটি আষাঢ়ে গল্প তাতে সন্দেহ নেই।

সোলায়মান কররানী যখন ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে মারা যান তখন বায়েজীদ ছিলেন উড়িষ্যার শাসনকর্তা। তিনি আতিয়া তথা বাঙলার পূর্বাঞ্চলে কোনোদিন শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন, এমন কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। একজন হিন্দুরমণীর সঙ্গে তাঁর বিয়ের ব্যাপারটাও গুজবভিত্তিক, প্রমাণভিত্তিক নয়।

বায়েজিদ ছিলেন কররানী বংশীয় পাঠান সুলতান। তাঁর পিতা, ভ্রাতা ও এ বংশের সবাই কররানী উপাধি ব্যবহার করতেন। তাঁদের কেউ খানপনী উপাধি ব্যবহার করেছেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। হঠাৎ করে তাঁর পুত্রের সময়ে কররানী উপাধি খানপনীতে রূপান্তরিত হবে, তা বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা বলে মনে হয় না।

কেউ কেউ, বিশেষ করে এই ব্যাপারে যাঁদের কিছু স্বার্থ আছে, তাঁরা বলে থাকেন যে, মোঘল আমলে প্রাণের ভয়ে সায়িদ খান 'কররানী' উপাধি ত্যাগ করে সোলায়মান

১. এটি মসজিদের আদি শিলালিপি নয়। সেটি হারিয়ে গেলে মসজিদটি সংস্কারের সময় এই শিলালিপি মসজিদের গায়ে নতুন করে লাগান হয়েছিল।—গ্রন্থকার

কররানীর মাতৃকূলের পনী উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। সোলায়মান কররানীর মতো একজন বিখ্যাত নৃপতির বংশধরদের পরিচয় লুক্কায়িত থাকবে, তা বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা বলে মনে হয় না। তদুপরি দাউদ কররানীর মৃত্যুর (১৬৭৬ খ্রিঃ) ৩৩ বৎসর পরেও সুলতান বায়েজিদের পুত্র তাঁর প্রকৃত পরিচয় দেবেন না, তা বিশ্বাসযোগ্য ঘটনাই বটে!

মোঘলদের সঙ্গে যে যুদ্ধ, শত্রুতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন তিনি ছিলেন দাউদ কররানী, বায়েজীদ কররানী নন। তা ছাড়া, দাউদের প্ররোচনায়ই যে বায়েজীদ প্রাণ হারিয়েছিলেন, সে ব্যাপারে প্রমাণের অভাব নেই, তখনও ছিল না। এমতাবস্থায় বায়েজীদের পুত্র বা বংশধরগণের প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে মোঘলদের সঙ্গে হাত মেলাবারই কথা, মোঘলদের ভয়ে ভীত থাকার কথা নয়। মোঘলদের মিথ্যা ভয়ে আপনার রাজরক্তের পরিচয় গোপন করে রাখবেন এবং রেখেই চলবেন, তা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা বলে মনে হয় না। এই সায়িদ খানপনী এক ভিন্ন ব্যক্তি। তিনি বায়েজীদ কররানীর পুত্র, তা যুক্তির দিক থেকে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে আমরা কয়েকজন করটিয়ার খানপনি উপাধিধারী জমিদার বাড়ি থেকে একখণ্ড বড় বেলে পাথরে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি দ্বি-খণ্ডিত অবস্থায় ঢাকা (পরবর্তীকালে জাতীয়) জাদুঘরের জন্য সংগ্রহ করি এবং তা এখনও (২০০০ খ্রিঃ) সেখানেই আছে। ফারসি ভাষায় খোদিত লিপির পাঠ নিম্নরূপ :

উচ্চারণ : "দর উ'হদ্-ই-নূর-উদ্-দীন মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ্ গাযী
দর সনেহ্ ১০১৯ [হিজরী] মসজিদ-ই-সৈয়দ খানপনি বে তমাম শুদ—"

অনুবাদ : নূর-উদ-দীন মোহাম্মদ জাহাঙ্গির বাদশাহ গাযীর রাজত্বকালে ১০১৯ [হিজরী] সনে (১৯১০-১১ খ্রিঃ) সৈয়দ খানপনির মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।

এ তারিখে (১৬১০-১১ খ্রিঃ) নির্মিত কোনো মসজিদের সন্ধান সমগ্র টাঙ্গাইল অথবা পার্শ্ববর্তী জেলা সমূহের কোথাও পাওয়া যায়নি। আর আতিয়া মসজিদের হারিয়ে যাওয়া শিলালিপিটিও আজ (২০০০ খ্রিঃ) পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। আমাদের ধারণা উপরে উল্লিখিত শিলালিপিটি আতয়া মসজিদের হারিয়ে যাওয়া শিলালিপি এবং তা কোনো কারণে মসজিদ থেকে পড়ে গেলে তা মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা খানপনি জমিদার বাড়িতে রক্ষিত হয়েছিল এবং কোনো কারণে তা পাওয়া যায়নি বলে নতুন করে মসজিদের বর্তমান শিলালিপি স্থাপন করা হয়েছিল। দ্বিখণ্ডিত লিপিটিও এর পিছনে সমর্থন যোগায়।

অসমাপ্ত মসজিদ

আতিয়া জামে মসজিদ থেকে প্রায় ১৮০ মিটার উত্তর-পশ্চিমে একেবারে নদীর তীরে এক গম্বুজবিশিষ্ট ও বর্গাকারে নির্মিত একটি অসমাপ্ত ছোট মসজিদের অস্তিত্ব দেখা যায়। এ মসজিদ মোঘল আমলের শেষ দিকে অথবা কোম্পানীর রাজত্বের প্রথম দিকে নির্মিত হয়েছিল বলে মসজিদের স্থাপত্যনিদর্শন দেখে বোঝা যায়। এ মসজিদ একজন সওদাগর নির্মাণ করতে গিয়ে সমাপ্ত করতে পারেননি বলে জনপ্রবাদমতে জানা যায়।

শাহ্ বাবা কাশ্মিরীর মাযার ও মসজিদ

আতিয়া মসজিদ থেকে প্রায় ৭০০ মিটার উত্তর-পূর্বদিকে গ্রামের ভিতরে শাহ্ বাবা কাশ্মীরীর মাযার অবস্থিত। মাযার বলতে এখন যা আছে, তা আধুনিক কালের ইটের দেয়ালের উপর নির্মিত উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এক বিরাট চৌচালা টিনের ঘর। ঘরের ভিতরে আছে কয়েকটি প্রকোষ্ঠ। সর্ব উত্তরকক্ষে মাযার।

মাযার বলতে এখন যা আছে, তাতে প্রাচীনত্বের কোনো চিহ্নই অবশিষ্ট নেই। পাকা সমাধির সর্বাঙ্গে এবং মেঝেতে আধুনিক ধরনের লালচে রঙের মোজাইক এমনভাবে করা হয়েছে যে, আদি কবরটি কী রকম ছিল তো বোঝার কোনো উপায়ই নেই। তবে কবরের গায়ে উত্তর দিকে যে শিলালিপিটি আছে, তা থেকে মাযারের প্রাচীনত্ব জানা যায়।

শিলালিপির পাঠ থেকে জানা যায় যে, শাহ্ বাবা কাশ্মিরী ৯১৩ হিজরী সনের জমাদি-উস্-সানি মাসের ৭ তারিখ (১৪ অক্টোবর, ১৫০৭ খ্রিঃ) এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে অনন্তধামে চলে যান।

তাঁর সম্পর্কে আর কোনো তথ্যই পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে একজন বুযুর্গ্ দরবেশ ছিলেন, সে সম্পর্কে প্রবল জনশ্রুতি আছে। এখনও তাঁর মাযারে হাজার হাজার লোকের ভীড় হয়।

মসজিদ

মাযারকে কেন্দ্র করে চারদিকে-যে ভূমি আছে, তার আয়তন প্রায় এক একর। মাযার ঘরের দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রায় ১৬ মিটার দূরে একটি প্রাচীন মসজিদ ছিল। লোকে বলেন হোসেন শাহ্‌র মসজিদ। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে আমরা যখন এস্থান পরিদর্শন করি তখন মাযারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন অত্যুৎসাহী ব্যক্তির প্রচেষ্টায় এই মূল্যবান পূরাকীর্তিটিকে সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত অবস্থায় দেখতে পাই। পুরাতন জীর্ণ মসজিদের স্থানে তাঁরা একটি নূতন মসজিদ নির্মাণ করবেন, এই সদিচ্ছার বশবর্তী হয়ে তাঁরা এ মহৎ কাজটি করেছিলেন।

জনশ্রুতিমূলে জানা যায় যে, শাহ্ বাবা কাশ্মিরীর জন্য হোসেন শাহ্ এই বিলুপ্ত মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। এই কাহিনীর পিছনে জনশ্রুতি ছাড়া আর কোনো প্রমাণ নেই। মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার পর এখান থেকে যে ইট বের হয়েছে, সেগুলি বিভিন্ন মাপের। মোঘল আমলের ছোট পাতলা ইট থেকে আরম্ভ করে সুলতানী আমলের ইটের অস্তিত্বও এখানে দেখা যায়। শুধু ইট দেখে এ মসজিদের বয়স নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। সুলতানী আমলে নির্মিত হলেও পরবর্তীকালে মোঘল আমলে মসজিদ সংস্কার করার সময় মোঘল আমলের ইট ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে।

আমরা যখন ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে আতিয়া অঞ্চলে যাই তখন করটিয়ার খানপনী জমিদারদের হেফাজতে রক্ষিত ফারসী ভাষায় লিপিবদ্ধ একটি শিলালিপির সন্ধান পাই। তাঁদের সহযোগিতায় শিলালিপিটি ঢাকা যাদুঘরের জন্য সংগৃহীত হয়। শিলালিপিটি

আতিয়া অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছিল বলে তাঁদের কাছ থেকে জানা যায়। শিলালিপির পাঠ থেকে জানা যায় যে, ১৬১০-১১ খ্রিস্টাব্দে বায়েজীদ খানপনীর পুত্র সাইদ খানপনী একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এই মসজিদের কোনো চিহ্ন আতিয়া অঞ্চলে নেই, কোথাও ছিল বলেও কেউ বলতে পারেন না। মসজিদটি সম্পূর্ণরূপে গায়েব হয়ে গেছে অথচ তার আগে (১৬০৮ খ্রিঃ) নির্মিত আতিয়া জামে মসজিদ এখনও টিকে আছে। এ প্রসঙ্গে শাহ্ বাবা কাশ্মীরীর মাযার অঙ্গণে বিলুপ্ত মসজিদটি শিলালিপিতে বর্ণিত মসজিদ কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে দুটি বিষয় ভাববার আছে। একটি হল,হোসেন শাহ্ কর্তৃক নিমিত মসজিদে কোনো শিলালিপি পাওয়া যায়নি। অথচ হোসেন শাহ্‌র রাজত্বকালে নির্মিত শাহ্ বাবা কাশ্মীরীর মাযারে একটি শিলালিপি দেখা যায়। যদি হোসেন শাহ্ কর্তৃক আলোচ্য মসজিদাট নির্মিত হত, তবে মসজিদের গায়ে শিলালিপি থাকার পুরাপুরি সম্ভাবনা ছিল। বিশেষ করে মাযারের গায়ে শিলালিপি দেখা যাচ্ছে, তখন মসজিদের গায়ে তা না থাকার কোনো যুক্তি নেই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল বায়েজীদপুত্র সাইদ খানপনী কর্তৃক নির্মিত মসজিদটি গেল কোথায়? সমগ্র আতিয়া অঞ্চলে এমন কোনো ধবংসাবশেষ নেই, যেখানে এ মসজিদের অবস্থান ছিল বলে অনুমান করা যেত পারে। শুধু আলোচ্য ধবংসাবশেষটিই একমাত্র স্থান, যেখানে সে যুগের একটি মসজিদ অবস্থিত ছিল মসজিদে ব্যবহৃত ইটগুলির মধ্যেও সুলতানী এবং মোঘল আমলের ইটের নমুনা দেখা যায়। ১৬১০-১১ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলেও সুলতানী আমলের স্থাপত্যশিল্পের প্রভাব একদম লুপ্ত হয়ে যায়নি। আতিয়া মসজিদ, এগার সিন্দুরের সা'দী মসজিদ এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

এসব কারণেও প্রশ্ন উঠতে পারে, শাহ্ বাবা কাশ্মিরীর মাযার প্রাঙ্গণে অবস্থিত মসজিদটি (বর্তমানে বিলুপ্ত) ১৬১০-১১ খ্রিস্টাব্দে সাইদ খানপনী কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল কিনা।

সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন মাহ্মুদ শাহ্‌র মাযার

উপরে উল্লিখিত বিলুপ্ত মসজিদ থেকে প্রায় ৪৬ মিটার পূর্বদিকে একটি পাকা কবরের ধবংসাবশেষ আছে। লোকে বলেন সুলতানের মাযার। কোন্ সুলতান, তা কেউ সঠিকভাবে বলতে পারে না। তবে কেউ অনুমান করেন হোসেন শাহ্‌র পুত্র সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন মাহ্ মুদ শাহ্‌র মাযার এটি। এ সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছুই বলা যায় না।

পাকুল্লা মসজিদ

ঢাকা-টাঙ্গাইল পাকা সড়কের উপরে ও মীর্যাপুরের উত্তরে পাকুল্লা বলে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। পাকুল্লা বাজারের পশ্চিম দিকে একটি উল্লেখ্যযোগ্য মসজিদ আছে।

মসজিদের পরিকল্পনা একটু বিচিত্র ধরনের। মূল মসজিদের আয়তন আনুমানিক ২২ মিটার × ৯ মিটার। মসজিদের দেয়ালগুলি প্রায় ১.৫১ মিটার প্রশস্ত। উপরে ৩টি গম্বুজ আছে। গম্বুজগুলি বিরাট আকারের। মসজিদের সম্মুখ ভাগে পলেস্তারার উপরে আছে নানারকম কারুকার্য। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে আছে ৩টি প্রবেশপথ। অর্ধবৃত্তাকারে নির্মিত খিলানের সাহায্যে প্রবেশপথগুলি নির্মিত। পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি মিহরাব। কেন্দ্রীয় মিহরাব অপেক্ষাকৃত বড়।

মূল মসজিদের উভয় (উত্তর ও দক্ষিণ) প্রান্তে ৩.৬৩ মিটার প্রস্থ (উত্তর-দক্ষিণ) বিশিষ্ট একটি করে পাকা দোচালা ইমারত সংযোজিত আছে। এই ইমারত দুটির ছাদ বেগমবাজারের (কারতলব খাঁর) মসজিদ সংলগ্ন দোচালা ইমারতের ছাদের ন্যায়। এদুটি কক্ষের সঙ্গে মূল মসজিদের কোনো সংযোগ ভিতরের দিক থেকে নেই। এদুটি কক্ষ খুব সম্ভব ইবাদতের জন্য নির্মিত হয়নি, মাদ্রাসা বা ইমামের বসবাসের উদ্দেশ্যে এদুটি ইমারত নির্মিত হয়ে থাকবে বলে ধারণা হয়। বর্তমানে মসজিদটি অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় থাকলেও সেখানে রীতিমত নামাজ পড়া হয়। কিন্তু পাশের দুটি কক্ষ সংস্কারের অভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে।

মসজিদের সঠিক নির্মাণকাল জানা যায়নি। তবে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে যতটুকু খবর পাওয়া গেছে, তাতে জানা যায় যে ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। মসজিদটি অপেক্ষাকৃত হাল আমলের হলেও এতে মোঘল স্থাপত্যের যথেষ্ট প্রভাব আছে।

ধনবাড়ি মসজিদ ও অন্যান্য কীর্তি

মধুপুর উপজেলার অধীনে ও উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ধনবাড়ি গ্রামের জমিদার বাড়িতে মোঘলআমলের ৩ গম্বুজের একটি মসজিদ ছিল। জমিদার বাড়ির দক্ষিণাংশে ও বেষ্টক প্রাচীরের বাইরে মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদের সামনে আছে একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গন। প্রাঙ্গনের পরেই আছে অপেক্ষাকৃত হালআমলে নির্মিত সুদৃশ্য ও জাঁকজমকপূর্ণ বিরাট আকারের মিনার। মিনারের পরেই আছে মাঝারি আকারের একটি দিঘি। মসজিদের লাগোয়া উত্তরেই আছে জমিদার পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের পাকা সমাধি। মসজিদ ও এসব সমাধির উত্তরেই আছে বিরাট এলাকা জুড়ে প্রাচীরবেষ্টিত বিরাট জমিদার বাড়ি। মসজিদের পশ্চিমেও আছে জমিদার বাড়ির বিভিন্ন অট্টালিকা।

মোঘল আমলে নির্মিত তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের আদিরূপ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছুই বলা যায় না। কারণ এতে এতসব নতুন নতুন কাজের সংযোজন হয়েছে যে, মসজিদের আদি রূপটি অন্তর্হিত হয়ে গেছে। তবে আদি মসজিদের ছাদের উপরে ৩টি গম্বুজ, পুব দেয়ালে ৩টি প্রবেশপথ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশপথ এবং ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে ছিল ৩টি মিহরাব যে ছিল তা ধারণা করা যায় পরিবর্তিত অবস্থাতেও। আদি গম্বুজের উপরে অনেক প্রলেপ পড়লেও সেগুলি যে (bulbous) নির্মিত ছিল তা সহজেই বোঝা যায়।

বেশ কিছুকাল আগে আদি মসজিদের সামনে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট একটি বারান্দা নির্মাণ করা হয়েছিল। তাতে পুব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশ পথ আছে। এই নতুন সংযোজন যে আদি মসজিদের অঙ্গহানির কারণ হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই বারান্দার লাগোয়া পুবে আরও একটি বারান্দা নির্মাণ করা হয়েছে এবং তাও ৩ গম্বুজবিশিষ্ট। এরপরেও মজজিদে নতুন নতুন কাজের সংযোজন চলতেই আছে। মসজিদটি দেখে প্রথম দৃষ্টিতে কিছুতেই বলা সম্ভব নয় যে, এটি মোঘল আমলের একটি প্রাচীন কীর্তি।

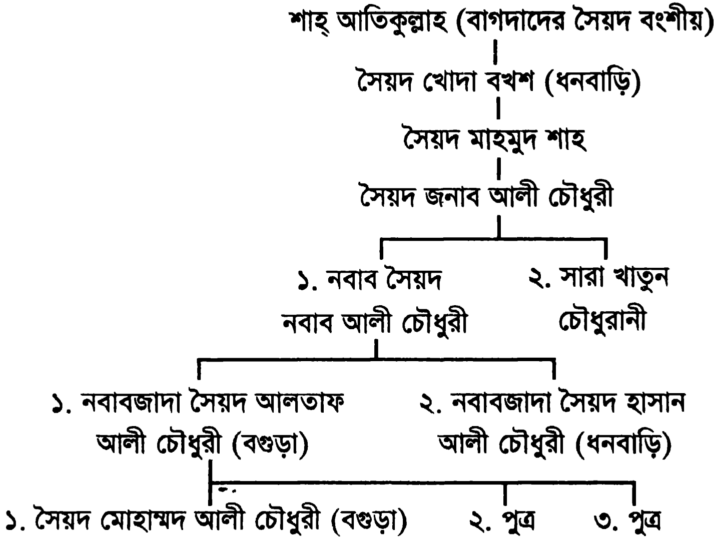
মসজিদের লাগোয়া দক্ষিণে আছে একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গন এবং এই প্রাঙ্গনের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ আছে একটি প্রাচীন কবরস্থান। পুব-পশ্চিমে লম্বা প্রায় অর্ধবিধা ভূমির উপরে অবস্থিত ও অনুচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত এই কবরস্থানে আছে প্রায় একই ধরনে নির্মিত ১৭টি পাকা সমাধি। সারিবদ্ধভাবে নির্মিত সমাধিগুলি একে অন্য থেকে কিছু দূরে দূরে অবস্থিত। সমাধিগুলিকে বেশ প্রাচীনই মনে হয়। তবে এগুলির নির্মাণকাল সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছুই বলা যায় না। কবরগুলি প্রায় একই রকমের দেখে মনে হয় যে, এগুলি একই সময়ে নির্মিত হয়ে থাকতে পারে। প্রকৃত ঘটনা বোধহয় তা নয়। খুব সম্ভব এটি ছিল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য রক্ষিত একটি কবরস্থান এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে সমধিস্থ করা হয়েছিল বোধ হয় এখানে। কবরগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়লে খুব সম্ভব একই সময়ে এগুলিকে একই ভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল।

ধনবাড়ির কোনো সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে প্রবল জনশ্রুতিমূলে জানা যায় যে, মুসলিম অধিকারের পূর্বে ধনপতি সিংহ নামক এক নৃপতি এখানে রাজত্ব করতেন। তারই নামানুসারে নাকি এস্থানের নাম হয় ধনবাড়ি। এস্থান কবে মুসলিম অধিকারে এসেছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে (১৬০৫-২৭ খ্রিঃ) প্রখ্যাত মোঘল সেনাপতি ইসফিনদিয়ার খান ও তাঁর ভাই মনোয়ার খান যে এস্থানের জমিদার ছিলেন তাতে বোধহয় কোনো সন্দেহ নেই। খুব সম্ভব ধনবাড়ির আদি মসজিদটি তাঁদের আমলেই নির্মিত হয়েছিল। খুব সম্ভব উপরে উল্লিখিত প্রাচীর বেষ্টিত প্রাচীন কবরস্থানটি তাদের সময়ের। সেখানে সে সময়ের অনেক ব্যক্তির কবর ছিল বলে ধারণা করা যায়।

এ বংশের শেষ জমিদার ছিলেন রাজা আলী খান। খুব সম্ভব তিনি ছিলেন ইসফিনদিয়ার খানের পৌত্র বা প্রপৌত্র। টাঙ্গাইল অঞ্চলের প্রবল জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, রাজা খান দুরারোগ্য কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে পড়েন। তখন তাঁর পীর নিজকন্যাকে তাঁর সঙ্গে বিবাহ দেন। রাজা আলী খান নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে তাঁর স্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও তাঁদের পালিত পুত্র সৈয়দ খোদা বখশ এই জমিদারির মালিক হন এবং তাঁর অধস্তন পুরুষ ছিলেন নবাব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুর।

তাঁর পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে বলা হয় যে, তাঁরা ছিলেন ইরাকের সৈয়দ বংশীয় এবং শাহ আতিকুল্লাহ নামক এক ব্যক্তি মোঘল আমলে বাগদাদ থেকে দিল্লীতে আসলে সম্রাট কর্তৃক পাবনা জেলার নাকশিধা নামক স্থানে জাগির প্রদান করা হলে তাঁর বংশধরগণ

সেখানে বসবাস করেন। পরবর্তীকালে তাঁর বংশধরগণ মানিকগঞ্জ জেলার হাসমেলাইন নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। তাঁরা ছিলেন বংশানুক্রমে ধনবাড়ি জমিদারদের পীর। নিঃসন্তান রাজা আলী খানের জমিদারির মালিক যে উপরে উল্লিখিত পীর বংশের শাহ খোদা বখ্‌শ্ হয়েছিলেন তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তাঁরা 'হাসমেলাইন খোন্দকার পরিবার' নামেই মানিকগঞ্জে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁদের বংশ তালিকা নিচে তুলে ধরা হল :



খামারপাড়া মসজিদ ও মাযারসমূহ

সাবেক পুখুরিয়া পরগনার অধীনে বর্তমানে গোপালপুর উপজেলার অন্তর্গত এবং উপজেলা সদর থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত খামারপাড়া ও পার্শ্ববর্তী বরসিলা ও আলমনগর বেশ প্রাচীন স্থান। এসব স্থানে অনেক প্রাচীন জলাশয় এবং অনেক প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন আছে। কিন্তু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এসমস্ত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত প্রাচীন কীর্তিগুলি ছাড়া অন্য কোনো কীর্তিকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। অসংখ্য নদী-নালা, বিল-বাওড় পরিবৃত এস্থান একসময়ে পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল বলে জানা যায়।

খামারপাড়াতে একটি প্রাচীন মসজিদ ও ১৯টি পাকা কবর আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে 'এক একর তের শতাংশ' ভূমি জুড়ে একটি প্রাচীন পুকুর আছে। পূর্বদিকে অবস্থিত এই পুকুরসহ পাঁচ একর চুয়াল্লিশ শতাংশ ভূমি 'জোত শাহ্ আলাউল হক ও মসজিদবাড়ি' হিসাবে ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে ব্রিটিশ' রেকর্ডে লাখেরাজ ভূমি হিসাবে উল্লিখিত আছে বলে কবি মুফাখখারুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন।[১] পুকুরের পশ্চিম পাড়ে

১. আলী মর্দান খালজীর জায়গীর—মুফাখ্‌খারুল ইসলাম, মাহেনও, চৈত্র ১৩৭১, ৭৭ পৃ.।

প্রায় ৪.৫/৫.৫ মিটার উঁচু একটি ঢিবি ছিল। জঙ্গলাকীর্ণ এ ঢিবি প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ ছিল। ঢিবির কিছু দক্ষিণে ২টি পাকা কবর তখনও মাটির উপরেই ছিল। ছই আকৃতির (barrel shaped) কবরটি ছিল ঢিবির মাঝামাঝি দক্ষিণ দিকে এবং পশ্চিম দিকে কিছু দূরে ছিল আরও একটি পাকা কবর। ছই আকৃতির কবরটি পরে শাহ্ আলাউল হকের মাযার বলে চিহ্নিত হয় এবং দ্বিতীয় কবরটি তাঁরই সমসাময়িক আর একজন পীরের বলে কথিত হয়। দুটি মাযারের প্রতি লোকের ভক্তি-বিশ্বাস বহুকাল আগে থেকেই চলে আসছিল। এদুটি কবর পরবর্তীকালের অর্থাৎ মোঘল আমলের বলে কবি মুফাখখারুল ইসলাম বলেন।

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে ঘটনাক্রমে মসজিদটি আবিষ্কৃত হয়ে পড়ে। উঁচু ঢিবির মাটি সরানোর কালে এই প্রাচীন মসজিদের সঙ্গে প্রায় লাগোয়া দক্ষিণে অবস্থিত ও সারিবদ্ধভাবে নির্মিত ১৯ টি পাকা কবরও আবিষ্কৃত হয়। উপরোক্ত আলাউল হকের কবরটি এই ১৯ টি পাকা কবরের মাঝামাঝি স্থানের সামান্য দক্ষিণে ও পশ্চিম দিকের কবরটি এগুলির ১ মিটার পশ্চিমে অবস্থানরত দেখা যায়।

বর্গাকারে নির্মিত এ মসজিদের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ভিতরের দিকে ছিল ৫.০২ মিটার, দেয়ালগুলি অত্যন্ত প্রশস্ত, প্রায় ১.৫ মিটার কি তারও বেশি। চারকোণে টারেট বা মিনার ছিল কিনা, বলা যায় না। কারণ, সেগুলি পাওয়া যায়নি। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে এবং পূর্ব দেয়ালে ৩টি প্রবেশপথ ছিল। আর ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে ছিল ৩টি মিহরাব। মসজিদের দেয়ালের বেশির ভাগ ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু দেয়াল যেখানে অভগ্ন, সেখানে পোড়ামাটির চিত্রফলক (terra-cotta plaques) সন্নিবেশিত ছিল। ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও অনেক পোড়ামাটির চিত্রফলক ও নকশা করা ইট পাওয়া গেছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি ছিল বেশ বড়। সেটি পোড়ামাটির চিত্রফলক দ্বারা অতি মনোরমভাবে অলঙ্কৃত ছিল। পাশের দুটি মিহরাবেও অনুরূপ অলঙ্করণ ছিল। মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের সামনে, মসজিদের ভিতরে একখণ্ড কালপাথর পাওয়া গেছে। কিন্তু তাতে বা অন্য কোথাও কোনো লিপির চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

মসজিদের গঠনপদ্ধতি ও শিল্পকৌশল দেখে মনে হয় যে, এটি সুলতানী আমলে নির্মিত হয়েছিল। এটি মাটি চাপা পড়ার কারণ বলতে গিয়ে কবি মুফাখ্খারুল ইসলাম বলেন ... "আর এসব এলাকায় সেইসব নদীর খাতে যমুনা নদী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সরিয়া আসিলে সমসময়ের প্লাবনে-ভূমিকম্পে স্থানটিতে মসজিদটির উপরে মাটির স্তর উঠিয়া পড়ায় আশপাশ লোক বসতির অযোগ্য বিবেচনায় এখানকার জীবিত বাসিন্দারা সকলেই অন্যত্র অন্তর্ধান করে।"[১]

মসজিদটি প্লাবনে বা ভূমিকম্পে মাটি চাপা পড়েছিল বলে মনে হয় না। সেক্ষেত্রে মোঘল আমলে (তাঁর মতে আকবরের সময়ে) নির্মিত শাহ আলাউল হক ও তাঁর সমসাময়িক মাযারটিও চাপা পড়ে যেত। এ মাযার দুটি আকবরের আমলে নির্মিত না হলেও এ দুটি নির্মাণের সময় অন্য কবরগুলি যে মাটিচাপা পড়েনি, কবর দুটির অবস্থানই তা প্রমাণ করে। খুব সম্ভব সুলতানী আমলে নির্মিত মসজিদটি কোনো কারণে

১. প্রাগুক্ত, ৭৯ পৃ.।

পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে এবং ক্রমাগত অব্যবহারের ফলে এবং মেরামতের অভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে ধূলাবালি জমে জমে মাটি চাপা পড়ে। পাশের কবরগুলিও এক অবস্থায় পতিত হয়। মোঘল আমলেও খুব সম্ভব মসজিদ ও মাযারগুলি মাটির উপরে ছিল। এবং মসজিদকে কেন্দ্র করেই খুব সম্ভব পরবর্তীকালের মাযার দুটিও গড়ে উঠেছিল।

কবি মুফাখ্‌খারুল ইসলাম এ মসজিদ ও মাযারগুলিকে আলীমর্দান খলজীর সময়ে নির্মিত হয়েছিল বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১] মসজিদটি গণেশতনয় জালাল-উদ্-দীন মোহাম্মদ শাহ্‌র আমলে নির্মিত হতে পারে বলেও তিনি বলেছেন। তাঁর প্রথম মত খুব গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। বখতিয়ার খলজী বা আলীমর্দান করতোয়া নদী অতিক্রম করে টাঙ্গাইল অঞ্চলে তাঁদের আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। এ মসজিদ জালাল-উদ্-দীন মোহাম্মদ শাহ্‌র আমলের হতে পারে। কারণ এর গঠনপদ্ধতি প্রায় একলাখী মাযারের অনুরূপ। তবে জালাল-উদ্-দীন মোহাম্মদ শাহ্‌র কোনো কীর্তি বাংলাদেশে টিকে নেই।

আইলাজোলার মসজিদ

মধুপুর থানা সদর থেকে প্রায় ৭ কিলোমিটার উত্তর, উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত বাহমনবাড়ি গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। বর্গাকারে নির্মিত এ মসজিদের প্রত্যেক বাহু ৭ মিটার দীর্ঘ। দেয়ালগুলি প্রায় ১.৭ মিটার প্রশস্ত। মসজিদের উপরে একটি মাত্র গম্বুজ। উলটানো পেয়ালাকারে নির্মিত গম্বুজটি এখনও বেশ ভালভাবেই টিকে আছে। বেশ সাদাসিধাভাবে নির্মিত এই মসজিদে বিশেষ কোনো অলঙ্করণ নেই। মসজিদটি সুলতানী আমলে নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। এস্থানে সুলতান নাসির-উদ-দীন নুসরত শাহ্‌র আমলের মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল বলে কবি মুফাখখারুল ইসলাম বলেছেন। তিনি বিশ্বস্তসূত্রে বিষয়টি অবগত হয়ে অনেক চেষ্টা করেও কোনও মুদ্রা সংগ্রহ করতে পারেননি। মসজিদটি বহুকাল ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকলেও এর বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি। মেরামতের পরে মসজিদটি আবার চালু হয়েছে। এই মসজিদ আইলা জেলার মসজিদ নামে পরিচিত।

নরিল্লা

মধুপুর উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৪ মাইল পশ্চিমে ধোপাখালী ইউনিয়নে নরিল্লা নামক একটি প্রাচীন স্থান আছে। নরিল্লা চণ্ডালপুর ও নরিল্লা রামকৃষ্ণপুর প্রভৃতি বিভিন্ন মৌজায় সমগ্র স্থানটি বিভক্ত। প্রায় ৫ বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে এখানে একটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ আছে। সমগ্র স্থান জুড়ে শতাধিক মন্দিরের (?) ধ্বংসাবশেষ ছিল বলে জানা যায়। এ সম্পর্কে সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রায় ৬০/৬৫ বছর আগে 'সৌরভ' নামক একটি মাসিক পত্রিকায় 'পশ্চিম ময়মনসিংহের উপেক্ষিত প্রাচীন ঐতিহাসিক সম্পদ—নরিল্লার

১. প্রাগুক্ত, ৭৭ পৃ.।

ধ্বংসাবশেষ' শীর্ষক প্রবন্ধে নিজের পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার কিয়দংশ নিম্নরূপ :[১]

"নরিল্লা ... নগরটি প্রায় ৩ মাইল বিস্তৃত ছিল। বহুসংখ্যক দেবালয়, অতিথিশালা এই স্থানের শোভা বর্ধন করিত। ... নরিল্লার পার্শ্ববর্তী গ্রামের শতবর্ষীয় একজন প্রাচীনের মুখে শুনিলাম—বাল্যকালে ভগ্ন ও অসম্পূর্ণ প্রায় শতাধিক মন্দির দেখিয়াছেন। এই বিস্তৃত নগরীর চতুর্দিকে তখনও শতাধিক দীঘি-পুষ্করিণী বিদ্যমান।

"জমীদারের নিকট হইতে জোত বন্দোবস্ত লইয়া যখন কৃষকগণ এই গ্রাম ধ্বংস করে তখন বহু সংখ্যক প্রাচীন মুদ্রা, সোনারূপার জিনিষ তাহারা পাইয়াছে। দুইটি মাত্র স্থানে প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তিচিহ্ন বর্তমান থাকিতে দেখিয়াছি।"

কবি মুফাখ্খারুল ইসলামের মতে এ স্থানে মুঘীস-উদ্-দীন তুঘরীলের (১২৬৫-৮১ খ্রিঃ) 'নরকিল্লা' দুর্গ অবস্থিত ছিল। তিনি এই ব্যাপারে অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন। কিন্তু জিয়া-উদ-দীন বারনীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এই অভিমত গ্রহণ করা কঠিন। নরকিলা না হলেও ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে এখানে মুসলিম শক্তির একটি প্রশাসনিক কেন্দ্রস্থল ছিল বলে মনে হয়। সতীশবাবু যেগুলিকে মন্দির বলেছেন সেগুলি খুব সম্ভব অন্য ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষ। কারণ, এস্থানে মুসলিম আমলের অসংখ্য মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছিল বলে জানা যায়।

জালাল মামুদের দিঘি

খামারপাড়া গ্রামের উত্তর পার্শ্বে একটি প্রাচীন দিঘি আছে। উত্তর-দক্ষিণ দীর্ঘ এ দিঘির আয়তন প্রায় ৭৩৮.৪০ মিটার × ৩৭০ মিটার। এটি জালাল মামুদের দিঘি নামে পরিচিত। খুব সম্ভব জালাল-উদ্-দীন মোহাম্মদ শাহ্র রাজত্বকালে এটি খনিত হয়েছিল বলে কবি মুফাখ্খারুল ইসলাম বলেন।[২]

---

১. প্রখ্যাত কবি ও ঐতিহাসিক মুফাখ্খারুল ইসলামের অপ্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে তাঁর অনুমতিক্রমে এ তথ্য সংগৃহীত।

২. প্রাগুক্ত. ৭৯ পৃ.।

শেরপুর জেলা

মুসলিম আমল

গড় জরিপা বা গড় দলিপা

শেরপুর জেলায় একটি মাত্র উল্লেখযোগ্য প্রাচীন কীর্তি আছে এবং তা হচ্ছে গড় জরিপা বা বড় দলিপা। শেরপুর সদর উপজেলা অন্তর্গত এবং থানা থেকে প্রায় ৯ কিলোমিটার পশ্চিম-উত্তর দিকে অবস্থিত গড় জরিপা নামক স্থানটিতে প্রাক মুসলিম ও মুসলিম এই উভয় যুগের কিছু কীর্তির অতি সামান্য ধ্বংসাবশেষ আছে।

এখানে এককালে একটি বিরাট দুর্গ বা কিল্লা ছিল বলে জানা যায়। সেই দুর্গে পর পর ৭টি প্রাচীর ছিল। মাটির তৈরি প্রাচীরের বাইরে ছিল প্রশস্ত ও গভীর পরিখা। দুর্গের ভিতরে দলীপ নামক এক কোচ বা গারো রাজার নিবাস ছিল বলে জনশ্রুতিমূলে জানা যায়। 'শেরপুর বিবরণ' নামক গ্রন্থে এই দুর্গ নির্মাণ সম্পর্কে অনেক কাহিনী আছে। কিন্তু দুর্গের আকার ও আয়তন সম্পর্কে বর্ণনা নেই।

স্থানীয় জনপ্রবাদমতে রাজা দলীপকে বিতাড়িত করে মুসলিমগণ এ স্থান অধিকার করে। এ মতে এ গড়ের প্রকৃত নাম নাকি ছিল গড় দলীপা এবং মুসলিম অধিকারের পর এর নাম হয় গড় জরিপা।

এখানে একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। শিলালিপিটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে এর সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধার করা যায়নি। যেটুকু উদ্ধার করা গেছে, তা থেকে জানা গেছে যে,, গৌড়ের সুলতান সায়ফ-উদ্-দীন দ্বিতীয় ফিরোজ শাহর রাজত্বকালে (১৪৮৬-৮৯ খ্রিঃ) এখানে খুব সম্ভব একটি মাযার (মকবেরাহ?) নির্মিত হয়েছিল।[১] জনশ্রুতি অবলম্বন করে মিঃ ব্লকম্যান (Mr. Blochman) এই মাযার নির্মাতার নাম 'মজলিস শামনা' বা হুমায়ুন শাহ্ ছিল বলে বলেছেন।

বর্তমানে গড় বা মাযারের কোন অস্তিত্ব নেই। থাকার মধ্যে আছে কয়েকটি মাটির ঢিবি। এগুলি বিলুপ্ত প্রাচীরগুলির ধ্বংসাবশেষ বলে ধরা যেতে পারে। তবে এই সামান্য কয়েকটি ঢিবির অস্তিত্ব থেকে ৭টি প্রাচীরের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণা করা যায় না। কারণ, ৭টি প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ তো দূরের কথা, এখানে ৭টি ঢিবিও বর্তমানে টিকে নেই। সমগ্র এলাকা জুড়ে এখন চাষের জমি।

মাযারটির কোনো চিহ্নও এখন আর টিকে নেই। তবে মাযার বলে কথিত একটি অনুচ্চ মাটির ঢিবিকে সেই মাযার বলে চিহ্নিত করা হয়। গ্রানাইট পাথরে উৎকীর্ণ শিলালিপিটি দুর্গের একটি প্রাচীর গাত্রে পাওয়া গিয়েছিল বলে জানা যায়।

---

১. Inscriptions of Bengal Vol, IV, pp. 134-37.—Mvi. Shamsuddin Ahmad. The

ময়মনসিংহ জেলা

মুসলিম আমল

বোকাইনগর কিল্লা, মাযার মসজিদ ও মন্দির

জনশ্রুতিমূলে জানা যায় যে, ময়মনসিংহ শহর থেকে সোজা প্রায় ১৮ কিলোমিটার পূর্বদিকে অবস্থিত বোকাইনগর নামক প্রাচীন স্থানে বোকাই নামক একজন কোচ বা গারো রাজা রাজত্ব করতেন এবং তাঁর নামানুসারে এ স্থানের নাম হয় বোকাইনগর। তিনি একাদশ শতাব্দীতে এখানে রাজত্ব করতেন বলে জনশ্রুতি আছে। এর পরে তাঁর বা তাঁর বংশধরদের ইতিহাস সম্পর্কে জনশ্রুতি মূলেও আর কিছু জানা যায় না।

সুলতানী আমলে খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে সুলতান সায়ফ-উদ-দীন দ্বিতীয় ফিরোজ শাহ্‌র আমলে (১৪৮৬-৮৯ খ্রিঃ) তাঁর প্রতিনিধি মজলিস খাঁ হুমায়ুন এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন বলে প্রবল জনশ্রুতি আছে, কিন্তু কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। এরপরে সম্রাট আকবরের সেনাবাহিনী কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে খোওয়াজা ওসমান ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে এ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং দুর্গটিকে প্রায় নতুন করে নির্মাণ করে এখানে সপরিবারে বসতি স্থাপন করেন। ১৬০৯ কি তার কিছু পরে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তিনি এ স্থান থেকে বিতাড়িত হয়ে শ্রীহট্টে চলে যান এবং এই দুর্গ মোঘলদের অধিকারে আসে।

আদিতে ব্রহ্মপুত্রের একটি প্রবাহ বা শাখা বালুয়া নদীর পূর্বতীরে এই দুর্গ অবস্থিত ছিল। সেই নদীর একটি ধারা দুর্গের ভিতর দিয়ে পশ্চিমদিক থেকে পূর্বদিকে প্রবাহিত ছিল এবং তা পূর্বদিকে আর একটি নদীতে গিয়ে পড়ত। এখন নদী মরে গেছে এবং দুর্গের ভিতরের নদীটি মরে গিয়ে মরা খালে পরিণত হয়েছে।

দুর্গটি ছিল পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় দেড় কিলোমিটার লম্বা এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৫০০ মিটার চওড়া। চারদিকে ছিল মাটির তৈরি উঁচু প্রাচীর। প্রাচীরের বাইরে ছিল গভীর ও প্রশস্ত পরিখা। তবে দুর্গের দক্ষিণদিকে পরিখার কোনো চিহ্ন এখন (১৯৮২ খ্রিঃ) দেখা যায় না। দক্ষিণ প্রাচীরের কিছু কিছু অংশ এখন টিকে আছে, টিকে আছে দক্ষিণ-পূর্ব কোণের একটি বুরুজের কিছু অংশ।

দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে ছিল খোওয়াজা ওসমানের বসতবাটী। কিন্তু বসতবাটীতে কোনো ইমারতের চিহ্ন দেখা যায় না। কাছেই আছে একটি প্রায় মজে যাওয়া পুকুর। আর মাটির নিচে কিছু কিছু ইটের ভগ্নাংশ পাওয়া যায়। প্রাসাদ জাতীয় তেমন কোনো ইমারত হয়ত নির্মাণ করা হয়নি, হলে ধ্বংসাবশেষ থাকার কথা।

মাযার

দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এবং দুর্গ এলাকার বাইরে একটি মাযার আছে। অনুচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত উত্তর-দক্ষিণে লম্বা প্রায় আধবিঘা ভূমির মাঝামাঝি স্থানে আছে মাযারটি। দক্ষিণ দেয়ালে আছে একটি তোরণ। এক কালে তোরণটি বেশ জাঁকজমকপূর্ণ ছিল বলে মনে হয়। এখন মেরামতের অভাবে জীর্ণ হয়ে পড়েছে। খোলা ময়দানে অবস্থিত মাযারটি ইটের তৈরি এবং তিন স্তবকে নির্মিত। মাযারের প্রতি স্থানীয় লোকের যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা আছে।

মাযারে শায়িত ব্যক্তির নাম নিযামশাহ্ ছিল বলে জনশ্রুতিমূলে জানা যায়। স্থানীয় জনশ্রুতিমূলে আরও জানা যায় যে, তিনি দিল্লীর প্রসিদ্ধ দরবেশ নিযাম-উদ্-দীন আউলিয়ার সমসাময়িক। মাযারে এবং বেষ্টক প্রাচীরে ব্যবহৃত ইটগুলি মোঘল আমলের নয়। এগুলি সুলতানী আমলের বিভিন্ন মাপ ও সাইজের ইট। এতে সহজেই ধারণা করা যায় যে, নিযাম শাহ্ সুলতানী আমলের লোক হতে পারেন। খুব সম্ভব খোওয়াজা ওসমানের অনেক আগে তিনি এখানে আস্তানা গেড়েছিলেন।

মসজিদ

মাযার থেকে প্রায় ২৫০ মিটার উত্তর দিকে সম্রাট অওরঙযেবের আমলে ১৭০৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত একটি একগম্বুজের মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আছে। মসজিদের দেয়ালগুলি এখনও টিকে আছে, কিন্তু গম্বুজ নেই। গম্বুজের পরিবর্তে আছে টিনের ছাপড়া চাল। বেশ কিছুকাল আগে এক জনরব ওঠে যে, মসজিদের ভিতরে গুপ্তধন আছে। তখন লোকে চুরি করে মসজিদটি ভাঙ্গতে শুরু করে। ফলে মসজিদের গম্বুজটি পড়ে যায়। তখন এর উপরে টিনের চাল দিয়ে লোকে নামাজ পড়তে থাকেন। মসজিদের গায়ে একটি শিলালিপি ছিল, তা হারিয়ে গেছে।

মন্দির

মাযার থেকে প্রায় ৩০০ মিটার পশ্চিম দিকে একটি প্রাচীন মন্দির জীর্ণ অবস্থায় এখনও টিকে আছে। প্রায় বিঘাখানেক উঁচুভূমি জুড়ে এই মন্দির ও অন্যান্য গৃহাদি অবস্থিত। এই ভূখণ্ডের লাগোয়া উত্তরদিকে আছে একটি ছোট পুকুর। এই পুকুরের দক্ষিণপাড়েই আছে অতি সুন্দরভাবে নির্মিত একটি টিনের ঘর। মন্দিরের চিরকুমার সেবাইতের জন্য নির্মিত এই গৃহটি বেশ কারুকার্যময় ছিল। এখন (১৯৮২ খ্রিঃ) ঘরটি বেশ জীর্ণ হয়ে পড়েছে। পূর্ব ও দক্ষিণ ভিটিতে বেশ কয়েকটি গৃহ ছিল। এখনও দুটি গৃহ জীর্ণ অবস্থায় টিকে আছে।

পশ্চিম ভিটিতে আছে পূর্বমুখী মন্দিরটি। এটি একটি ছোট পাকা মন্দির। মোঘল আমলের ছোট ছোট ইটের তৈরি এ মন্দিরে এত মেবামতের কাজ হয়েছে যে এর আদিরূপ কী ছিল, তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। তবে যতটুকু মনে হয় এটি ছিল সাদাসিধাভাবে তৈরি একটি ছোট মন্দির। বর্তমানে (১৯৮২ খ্রিঃ) এর উপরে আছে সমতল ছাদ এবং এই ছাদ যে পরবর্তীকালের, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মন্দিরের ভিতরে আছে শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তরমূর্তি। বিগ্রহের সেবায়েতকে চিরকুমার থাকতে হয়। মন্দির গাত্রে যে ইষ্টকলিপি আছে, তা থেকে জানা যায় যে মন্দিরটি ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে একজন হিন্দু জমিদার কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। মন্দির ও বিগ্রহের জন্য প্রচুর দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল।

কিল্লা তাজপুর

উপরে উল্লিখিত বোকাইনগর দুর্গ থেকে প্রায় ৮ মিটার উত্তর-পূর্বদিকে বালুয়া নদী যেখানে সুরিয়া নামে পরিচিত, সেখানে কিল্লাতাজপুর অবস্থিত। এই দুর্গের আয়তন ছিল প্রায় ৭২৭ মিটার × ৩৬৩ মিটার। চারদিকে ছিল মাটির তৈরি উঁচু প্রাচীর। প্রাচীরের উপরে স্থানে স্থানে বুরুজ ছিল। প্রাচীরের বাইরে ছিল প্রশস্ত ও গভীর পরিখা। সম্পূর্ণ দুর্গটি এখন আর টিকে নেই। স্থানে স্থানে মাটির প্রাচীরের কিছু কিছু অংশ এখনও কোনো রকমে টিকে আছে। প্রায় সমগ্র দুর্গ এলাকা বর্তমানে (১৯৮২ খ্রিঃ) চাষবাসের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এই দুর্গ কে নির্মাণ করেছিলেন এবং কবে তা নির্মিত হয়েছিল, তা সঠিকভাবে জানা যায় না। ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দের দিকে খোওয়াজা ওসমান যখন মোঘলদের আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে বোকাইনগর দুর্গ পরিত্যাগ করে যান তখন কিল্লা তাজপুর হয়ে তিনি শ্রীহট্টের দিকে পালিয়ে যান। সে সময়ে খোওয়াজা ওসমানের অধিকারে সে দুর্গটি ছিল। খোওয়াজা ওসমান এ দুর্গ নির্মাণ করেননি। এতে সহজেই বোঝা যায় যে, দুর্গটি অনেক আগে থেকেই সেখানে অস্তিত্বশীল ছিল। স্থানীয় প্রবল জনপ্রবাদ মতে জানা যায় যে, সুলতান সায়ফ্-উদ্-দীন দ্বিতীয় ফিরোজ শাহ্‌র আমলে (১৪৮৬-৮৯ খ্রিঃ) তাঁর সেনাপতি মজলিস খাঁ হুমায়ুন এ দুর্গটি নির্মাণ করেন কামরূপরাজের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা এবং তাঁর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য। এ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছুই বলা যায় না।

খোওয়াজা ওসমানের পতনের পরে দুর্গটি মোঘলদের অধিকারে আসে এবং এখানে মোঘল শাসনকেন্দ্র স্থাপিত হয়। সে সময়ে মোঘলদের অফিস-আদালত এবং কর্মচারীদের আবাসগৃহাদি দুর্গ এলাকা এবং দুর্গের দক্ষিণের পার্শ্ববর্তী এলাকায় গড়ে ওঠে। দুর্গ এলাকা এবং পার্শ্ববর্তী কুমড়ি, বীর আহমদপুর, মিঞা টোলা, শাহ্‌গঞ্জ প্রভৃতি স্থানে মোঘল আমলের কিছু কিছু কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। তবে এগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই নয়।

কিশোরগঞ্জ জেলা

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ

এগার সিন্ধুর দুর্গ

বৌদ্ধ-হিন্দু যুগ অথবা প্রাক-মুসলিম যুগের বিশেষ কোনো প্রাচীন কীর্তির চিহ্ন বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় দেখা যায় না। মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার পূর্বে এ জেলাতে খুব বেশি না হলেও কিছু কিছু প্রাচীন কীর্তির অস্তিত্ব যে ছিল, তা অনুমান করা যায়। এ জেলার অধিকাংশ অঞ্চল সে সময়ে কামরূপের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তাদের কিছু কিছু কীর্তির চিহ্ন ঢিবিরূপে হলেও টিকে থাকার কথা। খুব সম্ভব এই বিরাট অঞ্চলের শাসনকর্তাগণ বর্তমান টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর অঞ্চলের লালমাটিতে গঠিত উঁচু ভূমিতে তাঁদের প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। সেই অঞ্চলে বেশ কিছু প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় (টাঙ্গাইল জেলা দ্র.)।

বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া থানার এগারসিন্দুর নামক স্থানে প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের বেশ কিছু প্রাচীন কীর্তি ছিল বলে ধারণা হয়। সেখানে সেই যুগের একটি বিরাট দুর্গ ছিল। পরবর্তীকালে ঈসা খাঁ মসনদ-ই-আলা সেই দুর্গটিকে নতুন করে নির্মাণ করেন এবং কিছুকাল তিনি সেখানে অবস্থান করেছিলেন বলেও প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই দুর্গের অস্তিত্ব এখন আর টিকে নেই, শুধু পরিখার কিছু কিছু চিহ্ন এখনও দেখা যায়।

ভাটি অঞ্চলের অষ্টগ্রাম তখন এত নিম্ন ভূমি ছিল না। সেখানেও প্রাচীন যুগের কিছু কিছু কীর্তি ছিল বলে অনুমিত হয়। কিন্তু সেসব কীর্তি এখন আর টিকে নেই। তবে বেশ কয়েকটি প্রাচীন দীঘি-পুষ্করিণী অষ্টগ্রামে আছে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এসব দিঘির মধ্যে কয়েকটি খুবই প্রাচীন বলে মনে হয়। এগুলির মধ্যে অষ্টগ্রাম শহরের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত জীবদহ দিঘি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি একটি বিরাট দিঘি। দিঘিটি দামদলে ভরে গেছে এবং দামদলের উপরে গরু-মহিষ অনায়াসে বিচরণ করতে পারে। কিন্তু দামদলের নিচে আছে পানি। মাঘী পূর্ণিমার দিন দিঘিটি পানিতে ভরে যায় বলে স্থানীয় জনশ্রুতিমূলে জানা যায়।

করিমগঞ্জ থানার জঙ্গলবাড়ি দুর্গ এলাকাতে প্রাক-মুসলিম আমলের একটি দুর্গ ও একটি জনপদ ছিল বলে নানা সূত্রে জানা যায় (জঙ্গলবাড়ি দ্র.)।

বোকাইনগরে সে যুগে একটি দুর্গ ও জনপদ ছিল বলে নানা সূত্রে জানা যায়। কিন্তু সে যুগের কোন কীর্তির চিহ্ন সেখানে এখন পাওয়া যায় না (বোকাই নগর দ্র.)।

মদনপুরে মদনারাজা নামক এক রাজার রাজধানী ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু সে যুগের কোনো কীর্তির চিহ্ন সেখানে নেই (মদনপুর দরগা দ্র.)।

মুসলিম আমল

এগারসিন্দুর দুর্গ

কিশোরগঞ্জ জেলার অধীনে পাকুন্দিয়া থানার অন্তর্গত এগারসিন্দুর একটি প্রাচীন স্থান। এখানে বাঙলার বার ভূঁইয়াদের প্রধান ঈসাখাঁ মসনদ-ই-আলার একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। তিনি এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন বলে বলা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এখানে বৌদ্ধ-হিন্দু যুগেই একটি দুর্গের অবস্থান ছিল বলে জানা যায়। ঈসাখাঁ সেই দুর্গকে সংস্কার ও সুরক্ষিত করেছিলেন মাত্র। এ দুর্গের কোনো চিহ্ন বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যায় না। সমগ্র এলাকা জুড়ে এখন চাষাবাদের কাজ চলছে। দুর্গপ্রাচীর কেটে, পরিখাগুলি ভর্তি করে সেখানে ধানক্ষেত করা হয়েছে। তবে দুর্গএলাকা বলে চিহ্নিত স্থানটি দেখে মনে হয় যে, দুর্গের পশ্চিম দিকে ছিল প্রশস্ত পরিখা এবং উত্তর ও পূর্বদিকে ছিল শঙ্খ নদীর বাঁক দ্বারা সৃষ্ট স্বাভাবিক পরিখা। এখন এটিকে শঙ্খনদী বিল বলা হয়ে থাকে। দক্ষিণ দিকে ছিল বিশালকায়া ব্রহ্মপুত্র-শীতলক্ষ্যা নদী। নদীর অপর তীরেই ঢাকা জেলার শুরু। সমগ্র দুর্গ এলাকা ছিল বিশাল আকারের।

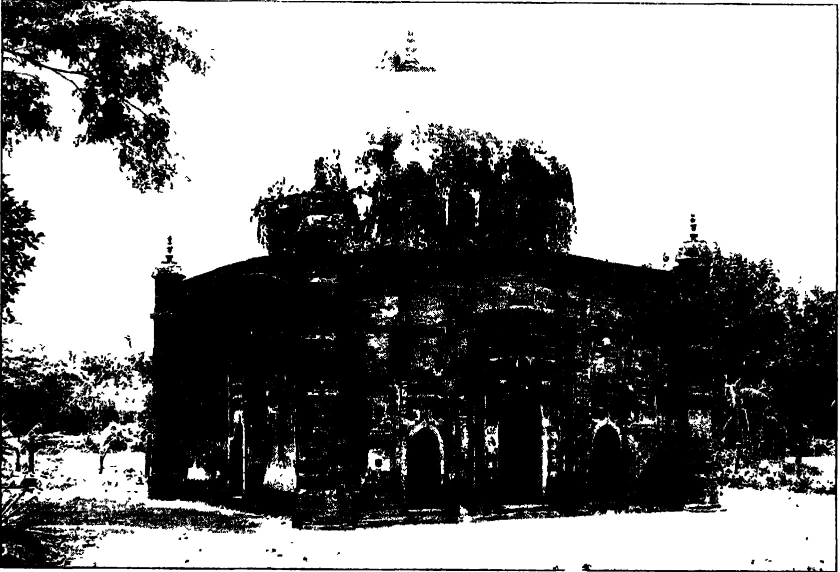
এ স্থান বেশ প্রাচীন। সমগ্র দুর্গ এলাকায় ছড়িয়ে আছে অসংখ্য প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ। মাঝে মাঝে দুই এক খণ্ড পাথরও দেখা যায়। এক খণ্ড পাথরকে নিয়ে সে অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে যে ভীতি মিশ্রিত শ্রদ্ধা আছে, তার উল্লেখ করেছেন ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী তাঁর 'কিংবদন্তীর বাংলা' নামক গ্রন্থে (৮৩-৮৪ পৃ.)। এখানে প্রাচীন যুগের যে সব পাথর ছিল, সেগুলির বেশির ভাগ ব্যবহার করা হয়েছে স্থানীয় শাহ মোহাম্মদ মসজিদের অঙ্গনে। এগুলি মুসলিম আমলের পাথর নয়। খুব সম্ভব প্রাক-মুসলিম আমলে এখানে মন্দিরাদির অস্তিত্ব ছিল। সেগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেলে অনেক পরবর্তীকালে পাথরগুলি মুসলিম ইমারতাদিতে ব্যবহার করা হয়।

এখানকার কোনো প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। দুর্গের ভিতর একটি বিরাট আকারের প্রাচীন জলাশয় আছে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ দিঘির পানি বেশ পরিষ্কার। লোকে বলে 'বেবুদ্ধা' রাজার দিঘি। দিঘির কাছেই নাকি ছিল রাজার বাড়ি। এই 'বেবুদ্ধা' নাম থেকে ধারণা হয় যে, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী কোনো নৃপতির নিবাস বা বিহার-মন্দিরাদির অবস্থান ছিল এখানে। এগারসিন্দুরের চাষের জমিতে যে সমস্ত ইটের টুকরা ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ছড়িয়ে আছে, সেগুলির বেশির ভাগও খুব সম্ভব প্রাক-মুসলিম যুগের।

ঈসাখাঁর পরেও এ স্থানের বেশ প্রাধান্য ছিল বলে মনে হয়। এখানে অবস্থিত মোঘল আমলে নির্মিত দুটি মসজিদ ও প্রায় চার মাইল দূরে অবস্থিত মসজিদপাড়া মসজিদ, এই অনুমানের পিছনে সমর্থন যোগায়। মসজিদগুলির নির্মাণ-কৌশলেও কিছু বিশেষত্ব দেখা যায়। মোঘল আমলে নির্মিত হলেও সুলতানী আমলের স্থাপত্যনিদর্শন ও কলা-কৌশলের যথেষ্ট প্রভাব এগুলির মধ্যে দেখা যায়।

সা'দী মসজিদ

সম্রাট শাহ্জাহানের রাজত্বকালে নির্মিত সা'দী মসজিদ কিশোরগঞ্জ জেলার একটি উল্লেখযোগ্য প্রাচীন কীর্তি। বর্গাকারে নির্মিত এ মসজিদের প্রত্যেক বাহু ৮.৪ মিটার দীর্ঘ। মসজিদের প্রত্যেক কোণে ১টি করে মোট ৪টি অষ্টকোণাকৃতির মিনার বা টারেট আছে। এগুলি প্যারাপেটের কিছু উপরে উঠে গেছে এবং শীর্ষদেশ ছোট গম্বুজ ও ফিনিয়েল (finial) দ্বারা শোভিত। ছাদের প্যারাপেট সরল রেখায় নির্মিত কিন্তু নিচের কার্ণিশ সুলতানী আমলের মসজিদের মতো বাঁকান। উপরের গম্বুজটি বিরাট আকারের কিন্তু খুব সুদৃশ্য নয়।



▲ সাদী মসজিদ, কিশোরগঞ্জ

পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশপথ আছে। পূর্বদেয়ালের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং বাইরের দিকে ঈষৎ উদগত। পত্রাকারের খিলানের বাইরের দিক সুন্দরভাবে খাঁজকাটা (cusped)। প্রবেশপথগুলির চারদিকে পোড়ামাটির চিত্রফলকের কাজ আছে। প্রধান দরজার দু'ধারে আছে লতাপাতা, ফুলের প্রতিকৃতি ইত্যাদির কাজ।

ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে ৩টি অলঙ্কৃত মিহরাব। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড়। এ মিহরাবে পোড়ামাটির চিত্রফলকের সাহায্যে যে অলঙ্করণের কাজ আছে, তা সাধারণত মোঘল আমলের কোনো মসজিদে দেখা যায় না। মিহরাবের আয়তাকার ফ্রেমটি উপরের দিকে কিছুটা বাঁকান। মিহরাবের তিনদিকে পোড়ামাটির ফলকচিত্রের সাহায্যে অতি সুন্দরভাবে লতাপাতার অলঙ্করণের কাজ করা আছে। পত্রাকারের খিলানটির বাইরের দিক সুন্দরভাবে খাঁজকাটা। উপরে দিকে আছে ফুলের প্রতিকৃতি।

খাঁজকাটা অংশের নিচের দিক সুন্দর প্যানেল দ্বারা অলঙ্কৃত। অন্য দুটি মিহরাবও বেশ সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত। এগুলিতে সুলতানী আমলের কারুকার্যের প্রভাব দেখা যায়। এতে মনে হয় যে, মোঘল আমলেও এ স্থানে সুলতানী আমলের স্থাপত্যকৌশল টিকে ছিল এবং পোড়ামাটির চিত্রফলক ব্যবহারের প্রথাও প্রচলিত ছিল।

মসজিদের প্রধান প্রবেশপথের উপরে পলেস্তরার উপরে যে লিপি আছে, তা থেকে জানা যায় সম্রাট শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে শেখ শিরুর পুত্র সা'দী ১০৬২ হিজরী (১৬৫২ খ্রিঃ) সনে এ মসজিদ নির্মাণ করেন।

শাহ্‌ মোহাম্মদের মসজিদ

এগার সিন্দুরে অবস্থিত দ্বিতীয় মসজিদটির নাম শাহ্‌ মোহাম্মদ মসজিদ। মসজিদের পূর্বদিকে আছে একটি জলাশয়। জলাশয়ের পশ্চিম পাড় ঘেঁষে মসজিদ অঙ্গনের পূর্ব-দিকের বেষ্টক প্রাচীর নির্মিত। একটি অনুচ্চ ভিত্তি বেদীর পশ্চিম দিক ঘেঁষে এ মসজিদ নির্মিত। মসজিদের চারদিকে আছে অনুচ্চ বেষ্টকপ্রাচীর। পূর্বদিকে একটি দোচালা পাকা ঘরের ভিতরে দিয়ে মসজিদপ্রাঙ্গণে ঢোকার পথ। মসজিদের সামনে প্রশস্ত অঙ্গন। আদিতে এই অঙ্গনটি পাথর দিয়ে বাঁধান ছিল।



শাহ মোহাম্মদ মসজিদ, কিশোরগঞ্জ

বর্গাকারে নির্মিত এ মসজিদের প্রত্যেক বাহু ৭.৬৯ মিটার দীর্ঘ। দেয়ালগুলি বেশ প্রশস্ত। চারকোণে ৪টি অষ্টকোণাকৃতির মিনার বা টারেট (turret) আছে। এগুলি মোল্ডিং (moulding) দ্বারা সুশোভিত। পূর্ব দেয়ালের ৩টি প্রবেশপথের মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং বাইরের দিকে কিছুটা উদগত। দু'পাশে আছে দুটি

সরু মিনার। কেন্দ্রীয় দরজার উপরে পোড়ামাটির চিত্রফলকের সুন্দর অলঙ্করণ আছে। পাশের দরজা দুটির বাইরের দিকে সুন্দর প্যানেলিং-এর কাজ আছে এবং দরজার উপরদিকে পোড়ামাটির চিত্রফলকের কাজও আছে। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে যে ৩টি মিহরাব আছে, সেগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং বিশেষভাবে অলঙ্কৃত। মিহরাবগুলি সুলতানী আমলের মতো চিত্রফলক দ্বারা অলঙ্কৃত। কার্নিশ ও প্যারাপেট বাঁকান নয়, সোজা। প্যারাপেটের উপরিভাগ ব্যাট্‌ল্‌ম্যান্ট দ্বারা সুশোভিত। মসজিদের উপরে একটি মাত্র গম্বুজ আছে। প্রায় সা'দী মসজিদের গম্বুজের আকারে নির্মিত হলেও এটি দেখতে অধিক মনোরম।

দোচালা ঘর

মসজিদের তোরণ হিসাবে নির্মিত উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এই দোচালা ঘরের আয়তন ৭.৫৬ × ৪.১৪ মিটার। ঘরের ঠিক মাঝখান দিয়ে প্রবেশপথ। পূর্ব দেয়াল দরজা ও জানালার আকারে নির্মিত কুলঙ্গি ও প্যানেল দ্বারা সুশোভিত। উপরের পাকা ছাদ ঠিক বাংলাদেশের দোচালা ঘরের মতো। এ ধরনের দোচালা ঘরের মধ্য দিয়ে প্রবেশপথের সৃষ্টি এক অভিনবত্বের সূচনা করেছে।

মসজিদ আঙ্গিনার একধারে বেশ কয়েকটি প্রাচীন পাকা কবর আছে। এগুলির মধ্যে নির্মাতা শাহ্ মোহাম্মদের কবরও আছে বলে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে জানা যায়।

মসজিদে একটি শিলালিপি ছিল। সেটি হারিয়ে যাওয়ার ফলে এ মসজিদ কবে নির্মিত হয়েছিল, তার সঠিক সন-তারিখ নিশ্চয় করে বলা কঠিন। অধ্যাপক দানীর মতে এ মসজিদ ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দের দিকে নির্মিত হয়েছিল। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে জানা যায় যে, শাহ মোহাম্মদ নামক একজন দরবেশ এ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।

মসজিদপাড়া মসজিদ

এগারসিন্দুর থেকে প্রায় ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে মসজিদপাড়া গ্রামে এ মসজিদ অবস্থিত। খুব সম্ভব মোঘল আমলে নির্মিত এই মসজিদের অবস্থান থেকেই গ্রামেরও নামকরণ হয়েছে।

বর্গাকারে নির্মিত এই মসজিদের প্রত্যেক বাহু বাইরের দিকে ৮.৭৬ মিটার লম্বা। মসজিদের চারকোণে ৪টি অষ্টকোণাকৃতির মিনার বা টারেট আছে। এগুলি ছাদের কিছু উপরে উঠে গিয়ে ছোট গম্বুজবিশিষ্ট চূড়াতে শেষ হয়েছে। পূর্ব দেয়ালে যে ৩টি প্রবেশপথ আছে, সেগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি অপেক্ষাকৃত বড়। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে আছে ১টি বড় প্রবেশপথ। পশ্চিম দেয়ালে ৩টি মিহরাবের মধ্যে কেন্দ্রীয় মিহরাব আকারে বড়। মসজিদের প্যারাপেট ও কার্নিশ সরল রেখায় নির্মিত। উপরে একটি মাত্র গম্বুজ। ফিনিয়েল শোভিত গম্বুজটি দেখতে বড়ই মনোরম। কেন্দ্রীয় দরজার চারদিকে লতাপাতার কাজ আছে। তদুপরি প্যানেলিং-এর কাজও আছে। অন্য দরজা

দুটির উপরিভাগ আয়তাকারের প্যানেলিং দ্বারা সুশোভিত। 'প্যারাপেট'-এর উপরিভাগ 'মারলন' দ্বারা অলঙ্কৃত। কেন্দ্রীয় মিহরাবের চারদিকে আছে লতাপাতার অতি সুন্দর অলঙ্করণ। এগুলির ফাঁকে ফাঁকে আছে 'রজেট'-এর প্রতিকৃতি। মসজিদটি ছোট হলেও দেখতে ভারী চমৎকার।



মসজিদ পাড়া মসজিদ, ময়মনসিংহ

মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের উপরে যে শিলালিপি আছে, তা থেকে জানা যায় যে, সম্রাট অওরঙযেবের রাজত্বকালে ১০৮০ হিজরী (১৬৬৯ খ্রিঃ) সনে এই মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।

গোরাই মসজিদ

এগার সিন্দুর থেকে সোজা ২৫.৬১ মিটার পূর্বদিকে এবং কটিয়াদি উপজেলা সদর থেকে কয়েক মাইল দূরে মোঘল আমলের একটি অতি সুন্দর মসজিদ আছে। গ্রামের নামানুসারে এর নাম গোরাই মসজিদ। বর্গাকারে নির্মিত ও এক গম্বুজবিশিষ্ট এই মসজিদ আকার ও আয়তনে প্রায় মসজিদপাড়া মসজিদের মতোই।

মসজিদের চারকোণে ৪টি অষ্টকোণাকৃতির মিনার বা টারেট আছে। এগুলি ছাদের অনেক উপরে উঠে ছোট গম্বুজে শেষ হয়েছে। পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশপথ আছে। পূর্ব দেয়ালের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ অপেক্ষাকৃত বড় এবং বাইরের দিকে সুষমভাবে প্রসারিত। প্রবেশপথগুলির পত্রাকারে নির্মিত খিলানগুলির উপরিভাগ খাঁজকাটা (cusped)। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উদগত অংশে অতি সুন্দর অলঙ্করণ আছে। উপরিভাগে আছে 'রজেট'-এর প্রতিকৃতি। সামনের দেয়ালের

(facade) বাকি অংশ আয়তাকারের প্যানেল দ্বারা সুশোভিত। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের বাইরের দিক আয়তাকার প্যানেল দ্বারা শোভিত।



গোরাই মসজিদ, ময়মনসিংহ

মসজিদের জোড়া কার্নিশ ও প্যারাপেট সরল রেখায় নির্মিত। প্যারাপেটের উপরিভাগ ব্যাট্‌লম্যান্ট দ্বারা অলঙ্কৃত। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথের উপরে কার্নিশের উপর থেকে ২টি করে সরু মিনার নির্মাণ কবা হয়েছে। ছাদের উপরে নির্মিত গম্বুজটি মনোমুগ্ধকর। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি মিহ্‌রাব। মাঝেরটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং মিহ্‌রাবগুলিতে অতি সুন্দর কারুকার্য আছে।

মসজিদে কোনো শিলালিপি পাওয়া যায়নি। অধ্যাপক দানীর মতে এই মসজিদ মোঘল আমলে ও ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দের দিকে নির্মিত হয়েছিল। গোরাই গ্রামে একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে।[১] তাতে জানা যায় যে, সুলতান বারবক শাহ্‌র রাজত্বকালে স্থানীয় শাসনকর্তা মজলিস-ই-আলী, কর্তৃক ৮৭১ হিজরী (১৪৬৭ খ্রিঃ) সনে একটি মসজিদ নির্মিত ও মসজিদের উপর পলেস্তারা ও রং ('plaster and guilding') করা হয়েছিল। বর্তমান মসজিদটি যে মোঘল আমলের তাতে কোন সন্দেহ নেই। খুব সম্ভব প্রাচীন মসজিদটিকেই মোঘল আমলে নূতন করে নির্মাণ করা হয়েছিল।

জাওয়ার মসজিদ

কিশোরগঞ্জের অধীনে তাড়াইল থানার অন্তর্গত জাওয়ার গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদ ছিল। ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে সুলতান হোসেন শাহ্‌র পুত্র গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্‌র

১. Inscriptions of Bengal, Vol. IV. p. 83-5.—Mvi Shamsuddin Ahmad.

আমলে নির্মিত এ মসজিদ ময়মনসিংহ জেলার প্রাচীনতম মসজিদগুলির অন্যতম ছিল। মসজিদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেলে জাওয়ার মৌজার নিকটবর্তী নুসরতগঞ্জ নামক স্থানে নির্মিত অনেক পরবর্তীকালের একটি মসজিদে শিলালিপিটি স্থাপন করা হয়। শিলালিপি পাঠে জানা যায় ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে (৯৪১ হিজরী) রাহাতের পুত্র খান-ই-মোয়ায্যম নূর খান এই 'মজবুত' মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।

অষ্টগ্রাম কুতবশাহ্ মসজিদ ও মাযার

ভাটি অঞ্চলের অষ্টগ্রাম একটি প্রাচীন স্থান। এখানে হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে একটি প্রাচীন জনপদ ছিল বলে ধারণা হয় (হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ দ্র.)। মোঘল আমলে অষ্টগ্রাম ও ঘাগরার দিওয়ানদেরও অনেক কীর্তি এ স্থানে ছিল। সে সব কীর্তির চিহ্ন এখন (১৯৬১ খ্রিঃ) আর টিকে নাই।

এখানে একটি প্রাচীন মসজিদ ও পাঁচপীরের মাযারসহ কয়েকটি দরগাহ্ আছে। কুতবশাহ্ নামক একজন দরবেশ এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন বলে প্রবল জনশ্রুতি আছে। সে কারণে এটি কুতবশাহ্ মসজিদ নামে খ্যাত।



▲ কুতুবশাহ মসজিদ, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ

উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এই মসজিদের আয়তন বাইরের দিকে প্রায় ১৪ মিটার × ৮ মিটার এবং ভিতরের দিকে প্রায় ১০.৯ মিটার × ৪.৮৪ মিটার। পূর্ব ও পশ্চিম দিকের দেয়ালগুলি প্রায় ১.৫১ মিটাব এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দেয়াল দুটি প্রায় ১.২ মিটার করে প্রশস্ত। চারকোণে ১.৪ মিটার আটকোণাকার মিনার বা টারেট আছে। এগুলি বলয়াকারের স্ফীতরেখা দ্বারা অলঙ্কৃত। মসজিদের কার্নিশগুলি বেশি রকমে বাঁকান।

সুলতানী আমলের মসজিদের কার্নিশে বাংলাদেশের দোচালা ঘরের 'মারুল'-এর মত যে স্বাভাবিক বাঁকান আকার আছে, এখানে তার মাত্রাধিক্য ঘটেছে বলে চোখে লাগে।

মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ২টি করে প্রবেশপথ আছে। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি মিহরাব। মসজিদের দেয়ালের বাইরের দিকে পোড়ামাটির চিত্রফলকের অলঙ্করণ ছিল। এখনও সেই সব চিত্রফলকের কিছু কিছু নমুনা দেখা যায়। সামনের দেয়ালে আছে প্যানেলিং-এর কারুকার্য। সেগুলির মধ্যে চিত্রফলকগুলি ছিল। প্রবেশপথগুলি অর্ধবৃত্তাকারের খিলানের সাহায্যে নির্মিত।

মসজিদের উপরে আছে ৫টি গম্বুজ। কেন্দ্রীয় গম্বুজটি আকারে অনেক বড়। এর চারপাশে অর্থাৎ মসজিদের চারকোণে আছে বাকি ৪টি গম্বুজ। এগুলি আকারে বেশ ছোট। গম্বুজগুলি দেখতে ভারী সুন্দর। মসজিদটি ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের দিকে বেশ জীর্ণ অবস্থায় ছিল। প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর কর্তৃক সংরক্ষিত এই প্রাচীন কীর্তিটিতে হাল আমলে কিছু মেরামতের কাজ হয়েছে বলে জানা গেছে।

মাযার

মসজিদের আনুমানিক ৭.০ মিটার দক্ষিণে ৫টি পাকা কবর এক সারিতে ছিল। এখন ৪টি কবর টিকে আছে। প্রথম কবরটি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও স্থানীয় লোকেরা পাঁচপীরের মাযার বলে পরিচিত ৫টি কবরেই মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখেন। এই কবরগুলি একটি অনুচ্চ বেদীর উপর নির্মিত। কবরগুলিতে পোড়ামাটির চিত্রফলকের অলঙ্করণ ছিল, এখনও কিছু কিছু নিদর্শন আছে। এই ৫টি কবর থেকে সামান্য দূরে একটি একক বাঁধান কবর আছে। স্থানীয় জনশ্রুতিমূলে এটিকে মসজিদ নির্মাতা কুতব শাহ্‌র কবর বলা হয়।

মসজিদ ও মাযারগুলিতে কোনো শিলালিপি নেই বলে এগুলির সঠিক নির্মাণ কাল সম্পর্কে নিশ্চয় কিছু বলা যায় না। মসজিদের গঠনপদ্ধতি ও নির্মাণকৌশলে সুলতানী আমলের মসজিদের যথেষ্ট প্রভাব থাকলেও মোঘল আমলের প্রভাবই বেশি। এসব কারণে অধ্যাপক দানী এই মসজিদ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে নির্মিত হয়েছিল বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

এসম্পর্কে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। সুলতানী আমলের যথেষ্ট প্রভাব থাকলেও এই মসজিদ যে মোঘল আমলে নির্মিত হয়েছিল, তাতে বোধ হয় কোনো সন্দেহ নেই। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই অঞ্চল যে হোসেন শাহ্‌র পুত্র গিয়াস-উদ্‌-দীন মাহমুদ শাহ্‌র রাজ্যভুক্ত ছিল, এখান থেকে মাত্র ৪০/৪৫ কিলোমিটার উত্তরদিকে অবস্থিত জাওয়ার শিলালিপিই তা প্রমাণ করে (জাওয়ার মসজিদ দ্র.)। এরপরে এই অঞ্চল পাঠান সম্রাট শের শাহ্‌র রাজ্যভুক্ত হয়। পাঠান রাজত্বের শেষে ঈসাখাঁ মসনদ-ই-আলা এই অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই অঞ্চলে মোঘল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় সুবাদার ইসলাম খানের আমলে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দের দিকে।

এতে দেখা যাচ্ছে যে, মোঘল অধিকারের পরে যদি এ মসজিদ নির্মিত হয়ে থাকে, তবে তা সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের আগে হতে পারেনা। আর ঈসাখানের আমলে

যদি এ মসজিদ নির্মিত হয়ে থাকে তবে তা ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে হতে পারে। তবে মোঘলবিদ্বেষী বারভুইএগ্রাদের নেতা ঈসা খানের আমলে নির্মিত মসজিদে এত মোঘল প্রভাব থাকার কথা নয়। এতে অতি সঙ্গত কারণেই ধারণা করা যায় যে, মসজিদটি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে নির্মিত হয়েছিল। খুব সম্ভব সেই অঞ্চলের স্থপতি ও প্রকৌশলীদের মধ্যে সুলতানী আমলের স্থাপত্যকৌশলের ধারাটি তখন পর্যন্ত কিছু পরিমাণে টিকে ছিল। তাই সুলতানী আমলের স্থাপত্যের প্রভাব এতে বিদ্যমান।

পাতোয়াইর মঠ বা মন্দির

কিশোরগঞ্জ শহর থেকে আনুমানিক ৮ কিলোমিটার উত্তরে ও নীলগঞ্জ রেলস্টেশন থেকে আনুমানিক ৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বদিক ফুলেশ্বরী নদীর তীরে পাতোয়াইর নামক একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। এই গ্রামে মোঘল আমলের শেষ দিকে নির্মিত একটি মনোরম মঠ বা মন্দির আছে।

অষ্টকোণাকারে নির্মিত এই ইমারতটি আনুমানিক ৮ মিটার পর্যন্ত সরলরেখায় নির্মিত। এর পরে এটি ক্রমশ সরু হয়ে সূক্ষ্মাগ্র চূড়ায় শেষ হয়েছে। কলসাকারের চূড়ার উপরে আছে সরু পদ্ম ডাঁটার আকারে নির্মিত 'ফাইনিয়েল'। নিচের সরল রেখায় নির্মিত অংশটি ৩ ধাপে নির্মিত। প্রত্যেক ধাপের চারদিকে অর্ধবৃত্তাকারের খিলানের সাহায্যে নির্মিত প্রশস্ত কুলঙ্গি আছে। এসব কুলঙ্গির ভিতরে দেয়ালের মধ্যে অসংখ্য পোড়ামাটির চিত্রফলকের অলঙ্করণ ছিল। একদম উপরের ধাপের কুলঙ্গিগুলিতে অলঙ্করণের কাজ ছিল অতি সুন্দর।

ইমারতের নিম্নদেশে যে ধাপটি আছে সেখানে একটি কক্ষ আছে। এই কক্ষের প্রবেশপথ প্রায় অর্ধবৃত্তাকারের খিলানের সাহায্যে নির্মিত। প্রবেশপথের উপরিভাগে খাঁজকাটা আছে। ইমারতটির উচ্চতা প্রায় ২৫ মিটার। এই উল্লেখযোগ্য কীর্তিটি বর্তমানে (১৯৮১ খ্রিঃ) অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় আছে।

মধ্যযুগের প্রখ্যাত কবি দ্বিজবংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতীও ছিলেন একজন বিখ্যাত কবি। তিনি বোধ হয় সমগ্র বাঙলার প্রথম বিখ্যাত মহিলা কবি। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন বলে জানা যায়। কবি চন্দ্রাবতী এই মঠ বা মন্দির নির্মাণ করেছিলেন বলে প্রবল জনশ্রুতি আছে, কিন্তু কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। এটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

জঙ্গলবাড়ি দূর্গ

কিশোরগঞ্জ জেলার অধীনে এবং করিমগঞ্জ থানার অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ি নামক স্থানে একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। প্রায় গোলাকারে নির্মিত এ দুর্গের বেষ্টক প্রাচীরের বিশেষ কোনো চিহ্ন বর্তমানে (১৯৬১ খ্রিঃ) টিকে নেই। কিন্তু দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর দিকে আছে গভীর ও প্রশস্ত পরিখা এবং পূর্বদিকে আছে একটি নদী।

স্থানীয় নাম নরসুন্দা। প্রকৃত পক্ষে তিনদিকে প্রশস্ত ও গভীর পরিখা খনন করে নদীর সঙ্গে সংযুক্ত করে দুর্গটিকে দ্বীপাকারে সৃষ্টি করা হয়েছিল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য এবং এখনও দুর্গটিকে দ্বীপের মতোই দেখায়। শীতকালেও নৌকা ছাড়া দুর্গ এলাকার ভিতরে যাওয়া যায় না। তিনদিকে যে পরিখা আছে, তা পূর্বদিকে যে ছোট নদীটি আছে সেটির মতই প্রশস্ত এবং গভীর। পরিখাগুলিকে ছোট নদী বলেই ভ্রম হয়।

দুর্গটি খুব বড় ছিল না। সমগ্র দুর্গ এলাকার আয়তন ৩০ থেকে ৩৫ একরের বেশি হবে না। বর্তমান কালে সেখানে কোনো ইমারতের অস্তিত্ব নেই। সমগ্র দুর্গ এলাকা জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়েছে। সেই সব জঙ্গল পরিষ্কার করে এখন সেখানে চাষাবাদের কাজ চলছে। কিন্তু সমগ্র স্থান জুড়ে আছে অসংখ্য ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ। আর আছে ছোট ছোট কয়েকটি অনুচ্চ ঢিবি। এগুলির ভিতরে প্রাচীন ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষ লুক্কায়িত আছে।

দুর্গ এলাকার বাইরে বিশেষ করে দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে সংখ্যাহীন মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ এবং সেই সঙ্গে আছে কিছু কিছু ইটের ভগ্নাংশও। মৃৎপাত্রের স্তূপীকৃত ভগ্নাংশ দেখে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে, এখানে হয়ত কোন কুমারপাড়া ছিল। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে এখানে ছিল একটি নগরীর অস্তিত্ব। বহুসংখ্যক লোক বাস করতেন সেই নগরে। তখনকার দিনে ধাতব তৈজসপত্রের তেমন প্রচলন ছিল না বলে বিভিন্ন ধরনের মৃৎপাত্রের ব্যবহার ছিল অত্যধিক। সেগুলির অজস্র ভগ্নাংশই এখন এই পরিত্যক্ত এলাকায় স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে।

এ দুর্গের আদি ইতিহাস সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে বাঙলার বার ভূইঞাদের নেতা ঈসাখাঁ মসনদ-ই-আলা (মৃত্যু ১৫৯৯ খ্রিঃ) যে এ দুর্গে বাস করতেন, এ সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য প্রমাণের অভাব নেই। প্রকৃতপক্ষে তাঁর বংশধরদের একটি শাখা সেখানে বহুকাল ধরে বসবাসরত আছে এবং এখনও তাঁদের বাড়িঘর দুর্গ এলাকার সামান্য দূরেই অবস্থিত। কিন্তু ঈসা খাঁ এ দুর্গের ভিতরে অনেক ইমারতাদি নির্মাণ এবং সমগ্র দুর্গকে অনেক আগে সুরক্ষিত করলেও তিনি এ দুর্গের আদি নির্মাতা ছিলেন না।

ঈসা খাঁর অনেক আগে থেকেই এ দুর্গের অস্তিত্ব ছিল। প্রবল জনপ্রবাদ মতে জানা যায় যে, ঈসা খাঁর আমলে লক্ষ্মণ হাজরা নামক একজন সামন্ত এ দুর্গের অধিকারী ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর চতুর্থপাদের প্রথম দিকে এগারসিন্দুরে সংঘটিত যুদ্ধে মোঘল সেনাপতি মানসিংহের নিকট পরাজিত হয়ে ঈসা খাঁ লক্ষ্মণ হাজরাকে বিতাড়িত করে এ দুর্গ অধিকার এবং সেখানে বসবাস করেন। এটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তবে লক্ষ্মণ হাজরা নিজেও এ দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন বলে মনে হয় না।

এ দুর্গ খুবই প্রাচীন। এই অঞ্চলে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই এ দুর্গের অস্তিত্ব ছিল বলে ধারণা হয়। দুর্গ এলাকার বাইরে ইট ও মৃৎপাত্রের যে-সব ভগ্নাংশের কথা আগে বলা হয়েছে, সেগুলি মুসলিম আমলের অনেক আগের বলে ধারণা হয়। খুব সম্ভব এ দুর্গকে কেন্দ্র করে এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সে সময়ে একটি সমৃদ্ধ জনপদের অস্তিত্ব ছিল।

নেত্রকোনা জেলা

মুসলিম আমল

মদনপুর দরগা

কেন্দুয়া থানার অন্তর্গত এবং থানা থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম দিকে এবং নেত্রকোনা শহর থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দক্ষিণে মদনপুর নামক গ্রামে শাহ সুলতান রুমী নামক একজন পীরের দরগা আছে। সাধারণভাবে নির্মিত এই দরগার বিশেষত্ব বা তেমন কোনো প্রাচীনত্বও নেই। কিন্তু দরগায় যিনি শায়িত আছেন, তাঁকে বাঙলার প্রাচীনতম মুসলিম ধর্মপ্রচারক বলে পরিচিত করা হয়। তিনি নাকি ৪০ জন সঙ্গীসহ ৪৪৫ হিজরী (১০৫৩ খ্রিঃ) সনে এখানে ইসলাম প্রচার করতে আসেন। মদনাকোচ বা মদনাগারো নামক একজন সামন্ত নৃপতি নাকি তাঁকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করতে চাইলে দরবেশ অম্লান বদনে সেই বিষপান করে জীবিত থেকে মদনা রাজাকে অভিভূত করে ফেলেন এবং রাজা ইসলাম গ্রহণ করেন। দরবেশ নাকি এখানেই থেকে যান এবং এখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হলে দরগাটি গড়ে ওঠে।

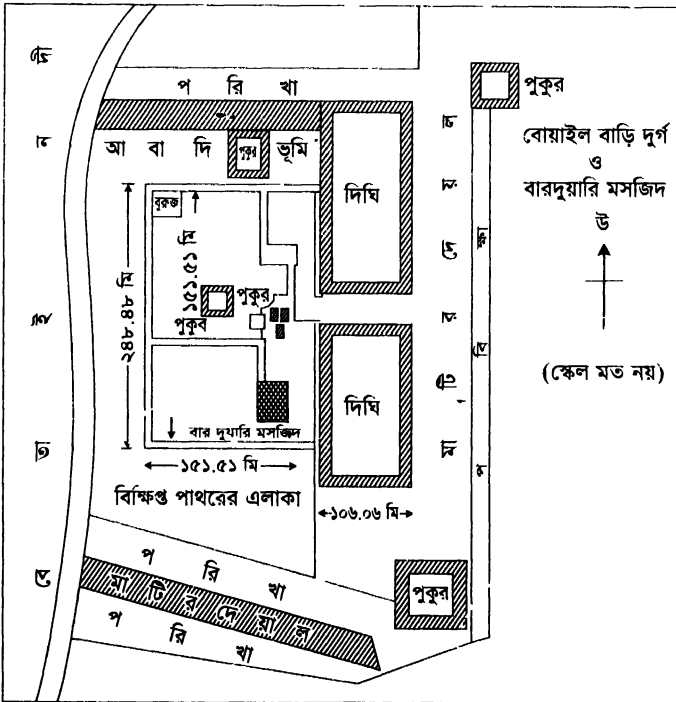
১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে সুলতান শাহ্‌শুজা কর্তৃক নাকি এই দরগার জন্য প্রচুর লাখেরাজ ভূমি দান করা হয় একটি ফারসী দলিলের মাধ্যমে। অতঃপর কোম্পানীর আমলে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে আর একটি ফারসী দলিলের মাধ্যমে সেই দানকে রক্ষা করা হয়। শাহ্‌শুজার দলিলে নাকি দরবেশের আগমন তারিখ উল্লিখিত আছে। বহু চেষ্টার পরেও সেই দলিলটি পাওয়া যায়নি। পেলেও অবস্থার বিশেষ কোনো উন্নতি হত বলে মনে হয় না। ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে শাহ্‌শুজা কোনো দলিল দিতে পারেন না, কারণ, এর এক বছর আগে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি চিরতরে আরাকানের দিকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। অতএব শুজা'র দলিল ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের কি তার আগের হতে পারে।

শাহ্‌শুজা' যদি দানপত্র করেও থাকেন, তবে তা ছিল দরবেশের তথাকথিত আগমনের তারিখের ৬০৮ বছর পরের ঘটনা। এতকাল পরে ইতিহাস কতটুকু অবিকৃত ছিল, তা বিচার্য বিষয়। ৬০৮ বছর পরে লিপিকৃত ইতিহাস এবং হাল আমলে সেই ঘটনার কথিত বা লিপিকৃত ইতিহাসের মধ্যে বিশেষ কোনো প্রভেদ, যুক্তির দিক থেকে থাকতে পারেনা। কারণ, উভয় ইতিহাসই জনশ্রুতিভিত্তিক। কাজেই শাহ্‌শুজার তথাকথিত দলিলে উল্লিখিত তারিখটি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর বঙ্গ বিজয়ের পূর্বে, এমনকি হযরত শাহ্ জালালের শ্রীহট্টে আগমনের আগে (১৩০৩ খ্রিঃ) এই অঞ্চলে কোনো ইসলাম ধর্মপ্রচারক এসেছিলেন বলে কোনো

নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। শাহ্ সুলতান রুমী ছিলেন খুব সম্ভব অনেক অনেক পরবর্তীকালের একজন ধর্মপ্রচারক।

রোয়াইলবাড়ি দুর্গ ও বারদুয়ারি মসজিদ

নেত্রকোণা জেলার অন্তর্গত কেন্দুয়া উপজেলার রোয়াইলবাড়ি গ্রামে এই প্রাচীন স্থান অবস্থিত। নান্দাইল চৌরাস্তা থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দক্ষিণ-পুবে, নান্দাইল-কেন্দুয়া পাকা সড়কের উপরে অবস্থিত সহিতপুর বাজার থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ-পশ্চিমে ও আঠারবাড়ি রেলস্টেশন থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার উত্তর-পুবে এ স্থান অবস্থিত। এখানে একটি প্রাচীন দুর্গ ও একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আছে। সেই ধ্বংসাবশেষের উপর বর্তমানে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। নাম রোয়াইলবাড়ি মাদ্রাসা। উত্তরদিক থেকে আগত এবং বর্তমানে মৃতপ্রায় বেতাই নদী এ স্থানের কিছু উত্তরে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে এবং পশ্চিমদিকের ধারাটি দুর্গের পশ্চিমদিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দুর্গের পশ্চিম পরিখারূপে অস্তিত্বশীল ছিল। দুর্গের অন্য তিনদিকে ছিল পরিখা। নদীর পূর্ব ধারাটি দুর্গের অনেক পুব দিক দিয়ে প্রবাহিত। আরবি রোয়াইল অর্থাৎ ক্ষুদ্র অশ্বারোহী বাহিনী ও বাংলা বাড়ি শব্দদুটির সমন্বয়ে গঠিত রোয়াইলবাড়ি শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র অশ্বারোহী বাহিনীর ছাউনি। খুব সম্ভব সুলতানি আমলে এখানে একটি দুর্গ ছিল।



রোয়াইবাড়ি দুর্গ ও বারদুয়ারী মসজিদ-এর ভূমি-নকশা

আয়তকারে অবস্থিত রোয়াইলবাড়ি প্রাচীন কীর্তির আয়তন প্রায় ৪৬ একর। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এ দুর্গের আয়তন ৫৩৩.৩৩ মিটার × ৩২৭.৫৭ মিটার। নিচে ভূমি নকশা প্রদত্ত হল।

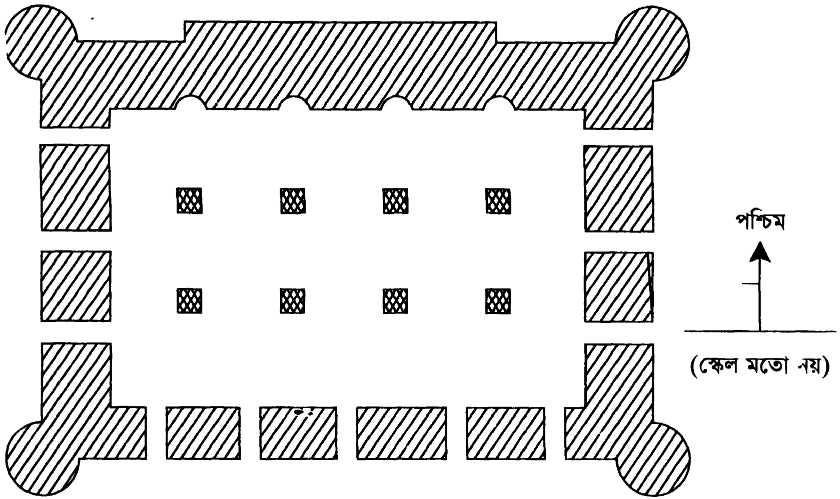
দুর্গের পশ্চিম দিকে যে বেতাই নদী পরিখা হিসাবে ব্যবহৃত তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এ নদীর থেকে পরিখা কেটে দুর্গের উত্তর ও দক্ষিণ দিক সুরক্ষিত করা হয়েছিল। দুর্গের পুবদিকে ছিল দুটি বিশাল আকারের দিঘি। দিঘির কিছু পুর্বে ছিল পরিখা। বেতাই নদী থেকে সেই পরিখাতে পানি সরবহারে ব্যবস্থা ছিল। দিঘি দুটির মাঝখানে দুর্গে প্রবেশের জন্য একটি প্রবেশপথ ছিল বলে ধারণা হয়। দুর্গের দক্ষিণ দিকে ছিল একটি পরিখা। সেই পরিখা সংলগ্ন ছিল একটি মাটির প্রাচীর। এই প্রাচীরের লাগোয়া দক্ষিণে ছিল আরও একটি পরিখা। মাটির প্রাচীর ও পরিখা বেষ্টিত এই দুর্গের ভিতরে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ ও ইষ্টকপ্রাচীর বেষ্টিত একটি অভ্যন্তরীণ দুর্গও ছিল। এই আয়তাকার দুর্গের প্রায় মধ্যভাগে পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ একটি ইষ্টকপ্রাচীর নির্মাণ করে দুর্গটিকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল।

বুরুজ ঢিবি : এই অভ্যন্তরীণ দুর্গের উত্তর-পশ্চিম কোণে আছে বুরুজ ঢিবি নামে পরিচিত এবং ৬.৬৬ মিটার উচ্চতা ও প্রায় ২৮ মিটার × ২০ মিটার আয়তন বিশিষ্ট একটি উঁচু ঢিবি ছিল। সেখানে উৎখনন কার্যের পর দেখা গেছে যে, আয়তাকারে নির্মিত একটি ইমারতের পশ্চিম ও দক্ষিণ দেয়াল ছিল ৫.১৫ মিটার করে প্রশস্ত এবং পূর্ব ও উত্তরের দেয়াল ছিল যথাক্রমে ৩.৬৩ মিটার ও ৪.৫৪ মিটার প্রশস্ত। এখানকার ইমারতটি অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায়। ইমারতের উপবিভাগে ২টি কক্ষের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রত্যেকটির আয়তন ছিল ৭.২৭ মিটার × ৩.০৩ মিটার। কক্ষ দুটির পশ্চিম ভাগে উপরে ওঠার জন্য একটি সিঁড়ি ছিল এবং তা সুরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ইমারত দুটির পূর্ব গাত্র থেকে ৩.৬৩ মিটার দূরত্বে ও সমান্তরাল রেখায় ২০.৯ মিটার দীর্ঘ ও .৪৫ মিটার প্রশস্ত একটি ইটের দেয়ালের ভিত্তিদেশ আবিষ্কৃত হয়েছে। সুলতানি আমলের এদেয়াল প্রাকমুসলিম আমলের একটি দেয়ালের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত হয়েছিল বলে দেখা যায়। এ দেয়ালের প্রায় ৫ মিটার দূরে উত্তর-দক্ষিণে আরও একটি দেয়াল নির্মিত হয়েছিল বলে দেখা যায়। তবে সে দেয়ালের মাত্র ২.৪২ মিটার পাওয়া গেছে। তা ছিল ১.০১ মিটার প্রশস্ত। বুরুজ ইমারতের উত্তরে প্রাক মুসলিম আমলের একটি প্রাচীরেরও অংশবিশেষও আবিষ্কৃত হয়েছে। আরও গভীর খনন কার্য চালালে সে যুগের আরও ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

বুরুজ ইমারত থেকে বেশ দক্ষিণে একটি ছোট পুকুর দেখা যায়। আপদকালে এ পুকুর পানীয় জলের জন্য ব্যবহৃত হত বলে মনে হয়। এ পুকুরের কিছু পুবে ও বারদুয়ারী মসজিদের কিছু উত্তরে একটি প্রাচীন ছোট কবরস্থান আছে। এখানে ইটের তৈরি একটি প্রাচীন পাকা কবর আছে। এটি স্থানীয়ভাবে নেয়ামত বিবির কবর বলে পরিচিত।

রোয়াইলবাড়ি দুর্গের দক্ষিণভাগে প্রাচীর বেষ্টিত একটি স্থানে একটি পনের গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে হাল আমলে প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর

কর্তৃক উৎখননের ফলে। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এ মসজিদের বাইরের দিকের আয়তন ছিল ২১.৭৫ মিটার × ১৭.২৫ মিটার। মসজিদের পুব দেয়ালে ছিল ৫টি প্রবেশপথ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ছিল ৩টি করে প্রবেশপথ। মসজিদের অভ্যন্তরে ৫টি মিহরাব থাকার কথা। কিন্তু সেখানে আছে ৪টি অলঙ্কৃত মিহযাব এবং সর্ব উত্তরের মিহরাবের স্থানে আছে অতিশয় অলঙ্কৃত একটি প্যানেল। মসজিদের চারকোণে ছিল ৪টি অষ্টকোণাকৃতির সংলগ্ন স্তম্ভ। মসজিদের কেন্দ্রীয় তিনটি মিহরাবের পশ্চাদেশের প্রাচীরে অফসেট ছিল।



রোয়াইলবাড়ি পনের গম্বুজ মসজিদের ভূমি নকশা।

মসজিদের অভ্যন্তরে প্রত্যেক সারিতে ৪টি করে দুই সারিতে ৮টি পাথরের স্তম্ভ ছিল। স্তম্ভগুলির ভিত্তিদেশ মাত্র টিকে আছে। বেলে প্বাথরে নির্মিত স্তম্ভগুলির পাথর পুরাতন কোনো অট্টালিকাতে ব্যবহৃত হয়েছিল বলে দেখা যায়। এই আটটি স্তম্ভ মসজিদের অভ্যন্তরভাগকে পূর্ব-পশ্চিম তিনটি 'আইল' ও উত্তর-দক্ষিণে পাঁচটি 'বে' (bay)-তে বিভক্ত করেছিল। তিনটি আইল ও পাঁচটি বে মসজিদের অভ্যন্তরভাগকে মোট পনেরটি সম আয়তনের অংশে বিভক্ত করেছিল এবং এগুলির উপরে ১৫টি আচ্ছাদন ছিল এবং বর্তমানে বিলুপ্ত আচ্ছাদনগুলি খুব সম্ভব গম্বুজ জাতীয় ছিল। মসজিদের দেয়াল সর্বোচ্চ ১.৭ মিটারের বেশি ছিল না। দেয়ালের স্থানে স্থানে ইষ্টক নির্মিত পিলেস্টার ছিল। মাটির নিচে দেয়ালের প্রশস্ততা ছিল ২.১০ মিটার এবং উপরে ছিল ১.৯৫ মিটার। পশ্চিম দেয়াল অবশ্য ২.৪০ মিটার প্রশস্ত ছিল।

বেলে পাথরে নির্মিত স্তম্ভগুলি ছাড়া সমুদয় মসজিদটি ছিল ইষ্টক নির্মিত এবং ইটের সাইজ ছিল ১৮ সেমি × ১৫.৫ সেমি × ৪.৫ সেমি থেকে ২২ সেমি × ১৫ সেমি × ৪.৫০ মিটার পর্যন্ত ছিল। মসজিদের গায়ে সুন্দর টেরাকোটার অলঙ্করণ ছিল।

মসজিদের ইট, অলঙ্করণ, নির্মাণকৌশল ইত্যাদি দেখে প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতরের উপপরিচালক এবং কীর্তিটির একজন বিশিষ্ট খননকারী জনাব মোশাররফ হোসেন বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, মসজিদটি চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানদের আমলে নির্মিত হয়েছিল। এটি একটি চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত। কারণ বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার এই অঞ্চলে ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দের আগে অর্থাৎ হোসেনশাহী সুলতানদের আগে এ অঞ্চলে মুসলিম অধিকারের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দের তারাইল উপজেলার জাওয়ার মজজিদের শিলালিপি ছিল এটি।

উপসংহার : এ স্থান অত্যন্ত প্রাচীন। হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে খুব সম্ভব সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে এখানে একটি দুর্গ ও সেই সঙ্গে একটি অট্টালিকা নির্মিত হয়েছিল। মসজিদে ব্যবহৃত বেলে পাথরের স্তম্ভগুলি খুব সম্ভবত সেই সব প্রাচীন কীর্তিটির। মসজিদের দক্ষিণে বেষ্টক প্রাচীরের বাইরে যে অসংখ্য বেলে পাথর পড়ে আছে সেগুলিও যে ঐ প্রাচীন কীর্তির সঙ্গে সমপৃক্ত ছিল তাতেও বোধহয় কোনো সন্দেহ নেই।

শ্রীহট্ট জেলা

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ

গড়দুয়ার ও রাজার মায়ের দিঘি

শ্রীহট্ট শহরের উত্তরাংশে অবস্থিত গড়দুয়ারকে সাধারণত একটি স্বাভাবিক পাহাড়ী টিলা বলে ধরা হয়। পূর্ব-পশ্চিমে আনুমানিক ৫৭০ মিটার দীর্ঘ ও উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৩৮০ মিটার প্রশস্ত এবং স্থানে স্থানে প্রায় ৫০ মিটার উঁচু এই টিলা শহরের প্রধান সড়কের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। টিলার অধিকাংশ স্থান জুড়ে হাল আমলে অনেক ক'টা পাকা ইমারত গড়ে উঠেছে। ফলে ফাঁকাস্থান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তবে টিলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে প্রায় ১ একর পরিমিত ভূমিতে এখনও (১৯৭৪) কোনো ঘরবাড়ি নির্মিত হয়নি বলে এখনও তা ফাঁকা।

আপাতদৃষ্টিতে এটি স্বাভাবিক পাহাড়ী টিলা বলে মনে হলেও এর মধ্যে এত প্রত্নবস্তু আছে যে এটিকে স্বাভাবিক টিলা বলে ধরা যায় না। এই টিলার মধ্যে বিস্তর প্রাচীন ইট ও প্রাচীন মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ (pot-sherds) দেখা যায়। টিলার উপরে কোনো প্রাচীন ইমারতের ভিত্তিদেয়াল উপরের দিকে দেখা যায় না। কিন্তু টিলার দক্ষিণ প্রান্তে ও দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বেশ কয়েকটি প্রাচীন ইষ্টকনির্মিত প্রাচীরের ভিত্তি বের হয়ে পড়েছে। শ্রীহট্টের বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রীকমলাকান্ত গুপ্ত ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে এগুলি গ্রন্থকারকে দেখিয়ে বলেছিলেন যে, কয়েক বছর আগে টিলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মাটি খুঁড়বার সময় ইটের তৈরি একটি বিরাট প্রাচীরের অংশবিশেষ বের হয়ে পড়েছিল। স্থানীয় লোকেরা বলেন যে, এ স্থানে মাটি খুঁড়তে গেলেই প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ বের হয়ে পড়ে।

এতে মনে হয় যে, এ স্থানে প্রাচীনকালে একটি বিরাট ইমারত অথবা অনেকগুলি ইমারতের অবস্থান ছিল। এস্থানের গড়দুয়ার নামটিও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এদেশে উঁচু বেষ্টক প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গ বা কিল্লাকে (fort) সাধারণত গড় বলা হয়। এই প্রাচীর মাটির অথবা ইষ্টক দ্বারা নির্মিত হত এবং প্রাচীরের সঙ্গেই থাকত প্রশস্ত ও গভীর পরিখা। সাধারণ দুটি দ্বার বা দুয়ার থাকত সেই দুর্গে। আলোচ্য টিলাতে কোনো গড় বা দুর্গ ছিল কিনা, সে সম্পর্কে খনন না করে নিশ্চয় করে কিছু বলা কঠিন। তবে এখানে যে-সমস্ত প্রত্নবস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে, তাতে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে মুসলিম আমলের আগে এখানে বেশ কয়েকটি ইমারতের অস্তিত্ব ছিল। দুর্গ হলেও এদেশে গতানুগতিক ধারায় নির্মিত পরিখা ও প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গ খুব সম্ভব এখানে ছিল না।

কারণ, চারদিকে বর্তমানে (১৯৭৪ খ্রিঃ) কোনো পরিখার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। উঁচু পাহাড়ী টিলাকে কেন্দ্র করে এখানে খুব সম্ভব একটি দুর্গ বা রাজবাড়ি নির্মিত হয়েছিল বলে ধারণা হয়।

দিঘি

গড়দুয়ারের সম্মুখে রাস্তার পূর্বদিকে একটি বিরাট প্রাচীন জলাশয়ের অস্তিত্ব এখনও দেখা যায়। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এ জলাশয়ের আয়তন প্রায় ৫০০ মিটার × ৩০০ মিটার। নাম রাজারমায়ের দিঘি। এ দিঘির পশ্চিম পাড় ঘেঁষে অবস্থিত গড়দুয়ার যে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল, তাতে বোধ হয় সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এই প্রাচীন জলাশয়টি কবে এবং কার দ্বারা খনন করা হয়েছিল, সে সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তবে এটি যে খুবই প্রাচীন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দিঘিটি এখন প্রায় মজে গেছে।

অন্যান্য কীর্তির ধ্বংসাবশেষ

শ্রীহট্ট শহরে প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের আর কোনো কীর্তির ধ্বংসাবশেষ টিকে নেই। তবে এ শহরের বিভিন্ন টিলাতে মুসলিম আমলের কীর্তির যেসব ধ্বংসাবশেষ আছে, সেগুলির নিচে যে প্রাচীন যুগের কীর্তি লুকিয়ে আছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পীর মহল্লার পাথরগুলি খুব সম্ভব হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে নির্মিত প্রাচীন ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষ। পীর শাহ্ জালালের মাযারের পাহাড়ে হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের ইমারতাদিতে ব্যবহৃত অনেক পাথর চারদিকে পড়ে আছে। ব্রিটিশ আমলে বিভিন্ন টিলাতে নির্মিত ইমারতাদির নিচে প্রাচীন ইমারতাদির ভিত্তি পাওয়া যায় এবং সেই সঙ্গে অনেক সময় মুদ্রাসহ অনেক প্রত্নবস্তুও পাওয়া যায়।

জয়ন্তীয়াপুর রাজবাড়ি ও প্রস্তরস্তম্ভ (Megaliths)

শ্রীহট্ট শহর থেকে প্রায় ৪১ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বদিকে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত জয়ন্তীয়াপুর একটি প্রাচীন স্থান। বহু প্রাচীন কাল থেকে এখানে একটি রাজবংশ রাজত্ব করেছিল বলে জানা যায়। এঁদের সম্পর্কে আগের দিকের কোনো সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় শুধু কিংবদন্তি। মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ও তিব্বতীয় মাতৃতান্ত্রিক প্রথার অনুসরণকারী এই রাজবংশ ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করত। অবশ্য ষোড়শ শতাব্দে কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে এঁদের স্বাধীনতা কিছুটা বিঘ্নিত হয়েছিল। এরপরে মোঘল আমলেও এই ক্ষুদ্র রাজ্য মোটামুটি স্বাধীনই ছিল। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে এই ক্ষুদ্র রাজ্য ব্রিটিশ সরকারের অধীনে আসে।

প্রাচীন রাজবাড়ির বিশেষ কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। এমনকি অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে নির্মিত রাজবাড়িটিও বর্তমানে (১৯৭৪ খ্রিঃ) ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এখানে বর্তমানে কেউ বসবাস করে না। একটি বিরাট এলাকা নিয়ে এই রাজবাড়ি অবস্থিত ছিল। আগে রাজবাড়িটি কী রকম ছিল, তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে

অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে নির্মিত বাড়িটি ছিল বাংলো ধরনের একটি বিরাট ঘর। পাকাভিত্তি, কাঠের বেড়া ও টিনের চালবিশিষ্ট ঘরটি ছিল অত্যন্ত কারুকার্যময়। খুব সম্ভব রাজাদের প্রাচীন পাকা মহল ধ্বংস হয়ে গেলে নতুন ধরনের এ সমস্ত ঘর নির্মিত হয়েছিল। বিরাট রাজবাড়ি এলাকার মধ্যে অসংখ্য ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। খুব সম্ভব সেগুলিতে ছিল প্রাচীন কালে নির্মিত মহলাদি।

রাজবাড়ির পশ্চিমভাগে ছিল মন্দিরাদি। মন্দিরগুলির প্রায় সব ক'টাই বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। শুধু একটি মন্দির এখনও কোনো রকমে টিকে আছে। একগম্বুজবিশিষ্ট এই ছোট মন্দির খুব প্রাচীন নয়, খুব সম্ভব দেড়শ-দু'শ বছর আগে নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরে বর্তমানে কোনো বিগ্রহ নেই।

রাজবাড়ি এলাকার বাইরে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি প্রাচীরবেষ্টিত কালীবাড়ি আছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে নির্মিত দক্ষিণমুখী এই কালীমন্দিরের উপরে টিনের চাল। বর্তমানে এখানে কোনো কালীর বিগ্রহ নেই। শূন্য মন্দিরটি একজন অনধিকার প্রবেশকারীর দখলে আছে। মন্দিরের সামনের অঙ্গনে আছে একটি পাকা বেদী। এখানেই নাকি ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে জয়ন্তীয়ার রাজা ৩ জন ব্রিটিশ নাগরিককে বলি দিয়েছিলেন এবং সেই অজুহাতে ব্রিটিশ রাজশক্তি জয়ন্তীয়া রাজ্য অধিকার করে রাজাকে মাসিক ৫০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করে। এখানে পূর্বে নরবলি হত বলে জানা যায়। তবে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের ঘটনাটি নাকি একটি বানোয়াট কাহিনী।

কালীমন্দির থেকে প্রায় ২০০ মিটার দক্ষিণে রাস্তার পূর্বপার্শ্বে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। জঙ্গলাবৃত এই মন্দিরটি এমনভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে যে, এর আদিরূপ কী রকম ছিল, তা অনুধাবন করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তবে এটি যে একটি অতি উঁচু মন্দির ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দেয়ালগুলি ছিল খুব প্রশস্ত। বড়দেউল নামে পরিচিত এ মন্দির বেশ প্রাচীন বলে মনে হয়।

মেগালিথ প্রস্তরস্তম্ভ

এই প্রস্তরস্তম্ভগুলি জয়ন্তীয়ার বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রত্নবস্তু। বিরাট এক এক খণ্ড পাথরকে পাথরের পায়ার উপর প্রতিষ্ঠিত করে বেদী হিসাবে স্থাপন করা হয়েছে। এই বেদীগুলি বিভিন্ন আকৃতির, কোনোটি বর্গাকার, কোনোটি অষ্টকোণাকৃতির আবার কোনটি প্রায় গোলাকার। সবচেয়ে বড় বেদীটির ব্যাস হবে প্রায় ৩.৩৯ মিটার। এগুলির পিছনে বেশ কয়েকটি প্রস্তরখণ্ড মাটিতে খাড়াভাবে প্রোথিত আছে। এগুলির উচ্চতাও এক মাপের নয়। সবচেয়ে উঁচু পাথরটি ৪.৫৪ মিটারে বেশি উঁচু নয়। এক একটি বেদীর পিছনে ৩ থেকে ৭টি পাথর প্রোথিত আছে। আগে নাকি আরও বেশি ছিল। বর্তমানে অনেক পাথর নষ্ট হয়ে গেছে।

রাজবাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে উঁচু বেষ্টক দেয়ালের বাইরে আছে গোটা কয়েক বেদী। এখানে রাজবাড়ির দেয়ালে বাইরের দিকে নানারকম চিত্র অঙ্কিত আছে। চিত্রগুলি বর্তমানে নষ্ট হয়ে গেলেও বোঝা যায় যে এগুলি সুন্দর চিত্র ছিল। এই বেদীগুলির সামান্য দক্ষিণ দিকে রাস্তার পূর্বপার্শ্বে আছে পর পর বেশ কয়েকটি বেদী।

সব ক'টা বেদীর পিছনের পাথরগুলি পূর্ণ সংখ্যায় বর্তমানে টিকে নেই। তবে কিছু কিছু পাথর খাড়া বা কাৎ অবস্থায় এখনও টিকে আছে। পাথরগুলি সব নিকটস্থ জয়ন্তীয়া পাহাড় থেকে সংগৃহীত বেলে পাথর। সর্বমোট ১০ টি বেদী ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে সেখানে দেখা গেছে।



▲ জয়ন্তিয়া মেগালিথিক স্টোন, সিলেট

রাজবাড়ি থেকে প্রায় ১৫০০ মিটার পশ্চিম-উত্তরে তামাবিল-জয়ন্তীয়া পাকা সড়কের উভয় পার্শ্বে আরও কয়েকটি বেদী আছে। এগুলিরও সব ক'টি খাড়া পাথর টিকে নেই। সেখানকার সবচেয়ে উঁচু পাথরের উচ্চতা প্রায় ৪.৮১ মিটার।

এসমস্ত পাথর সম্পর্কে দু'রকম কাহিনী পাওয়া যায়। একমতে (এবং তা স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে জানা গেছে) বলা হয় যে, বেদীর উপরে বসে বিভিন্ন রাজা বিচার করতেন। কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সবচেয়ে উঁচু পাথরটি ছিল রাজার আসনের পিছনে। বাকি পাথরগুলির এক একটি ছিল রাজ্যের বিভিন্ন দলপতির জন্য নির্দিষ্ট আসনের পিছনে স্থাপিত। বিভিন্ন রাজার জন্য বিভিন্ন বেদী নির্মিত হত। এবং সেখানে বসে রাজা তাঁর দলপতিদের সাহায্যে বিচার করতেন।

অন্যমতে মৃত ব্যক্তির আত্মার সদগতির জন্য এসমস্ত পাথর প্রতিষ্ঠিত করা হত। বিভিন্ন রাজা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুর পর প্রত্যেকের নামে এক একটি পাথর প্রতিষ্ঠিত করা হত এবং এতে মৃত ব্যক্তির আত্মা সদগতি লাভ করত।

এসম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা কঠিন। তবে বহু প্রাচীনকাল থেকে এ প্রথা প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। বেদীর পাথরগুলি বেশ মসৃণ এবং এগুলি বহু ব্যবহারের ফলে এই মসৃণতা লাভ করেছে বলে মনে হয়। পিছনের খাড়া পাথরগুলি বেশ অমসৃণ।

দরগা

পাথরগুলির দক্ষিণ-পশ্চিমে কিছু দূরে একটি ছোট মাযার আছে। ফতেহ্ খান পীরের বলে কথিত শাহ্ কাসিমের এই মাযার কবে নির্মিত হয়েছিল, তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। খুব সম্ভব মোঘল আমলের শেষ দিকে এটি নির্মিত হয়েছিল। মাযারের ধারেই অনুচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত একটি ছোট কবরখানা আছে। সেখানে আরও একটি মাযার আছে। এটি কার তা জানা যায়নি। এখানে একটি মসজিদ ছিল বলে স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে জানা যায়। মসজিদের কোনো চিহ্ন না থাকলেও ইটের ভগ্নাংশ এখানে-ওখানে দেখা যায়।

মুসলিম আমল

পীরমহল্লা

দরগামহল্লা অর্থাৎ শাহ্ জালালের দরগা থেকে আনুমানিক ৩ কিলোমিটার উত্তরে ও বড় রাস্তার পশ্চিমদিকে অবস্থিত পীরমহল্লা নামক স্থানকে প্রত্নতত্ত্বের দিক থেকে বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলা যেতে পারে। প্রায় এক বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে এখানে অসংখ্য প্রাচীন কবরের অস্তিত্ব নযরে পড়ে।

কবরগুলি যে অত্যন্ত প্রাচীন, তাতে সন্দেহ নেই। কবরের উপরে যে ইট ও পাথর পড়ে আছে, সেগুলি প্রাচীন বৌদ্ধ-হিন্দু যুগের বলে মনে হয়। কবরগুলির বৈশিষ্ট্য হল এই যে প্রত্যেকটি কবরের উপরে প্রচুর প্রাচীন ইট ও পাথর জড়ো করা আছে। অর্থাৎ কবরগুলি ইট-পাথর দ্বারা আবৃত কিন্তু কোন গাঁথুনি সেখানে নেই। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে পাকা কবরগুলি ভেঙ্গে গিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে ইট-পাথর কবরের উপর স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে। খবর নিয়ে জানা গেছে যে, আদতে কবরগুলিতে কোনো গাঁথুনির কাজ কোন কালেই করা হয়নি। শুধু কবরগুলির চিহ্ন রাখার জন্য এগুলিকে ইট-পাথর দ্বারা আবৃত করে রাখা হয়েছিল এবং প্রায় সে অবস্থায় কবরগুলি এখনও (১৯৭৪ খ্রিঃ) আছে।

বড় রাস্তা থেকে পশ্চিম দিকে ঢুকতেই যে সরু রাস্তাটি পড়ে, তা বন-জঙ্গল ও পাহাড়ী টিলার ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে পশ্চিম দিকে গিয়ে সমতল ভূমিতে পড়েছে। সেখানে রাস্তার উভয় পার্শ্বে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অসংখ্য কবর এককালে ছিল বলে জানা যায়। কালক্রমে ক্রমবর্ধমান মানুষের চাপে বহু কবর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং এখনও যাচ্ছে। তবে রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে প্রাচীরঘেরা যে বিস্তীর্ণ স্থান আছে, সেখানকার কবরগুলি এখনও নিরুপদ্রবেই টিকে আছে বলে বলা যেতে পারে।

এই প্রাচীর ঘেরা স্থানে, উত্তর দিকের সদর রাস্তা থেকে প্রায় ৭.৫ মিটার দক্ষিণে অনুচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত একটি প্রাচীন পাকা মাযার আছে। মাযারের গায়ে কোনো শিলালিপি নেই। তবে স্থানীয় জনপ্রবাদমতে, এই মাযার হযরত সৈয়দ শাহ্ আলীর। মাযারের প্রায় লাগোয়া পূর্বদিকে একটি প্রাচীন পাকা কুয়া আছে। এ কূপের পানি অত্যন্ত পবিত্র ও সর্বরোগ নিরাময়ক বলে প্রবল জনশ্রুতি ও বিশ্বাস আছে।

এই প্রাচীন কবরস্থান অতিক্রম করে আনুমানিক ১০০ মিটার পশ্চিম দিকে গেলেই একগম্বুজ বিশিষ্ট একটি ছোট মসজিদ দেখা যায়। প্রায় বিঘা দেড়েক ভূমি জুড়ে অবস্থিত উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ একটি প্রাচীন জলাশয়ের পশ্চিম পাড়ের উত্তরদিক ঘেঁষে (প্রায় উত্তর-পশ্চিম কোণে) এ মসজিদ অবস্থিত। পুকুরে কোনো বাঁধান ঘাট বর্তমানে নেই। তবে মসজিদের ঘাটে প্রচুর পাথর পড়ে আছে।

মসজিদের আয়তন (বাইরের দিকে) ৬.৬৬ মিটার × ৪.৩৪ মিটার। দেয়ালগুলি ১.২৫ মিটার প্রশস্ত। এ মসজিদ হাল আমলে অত্যন্ত আনাড়িভাবে নির্মিত। একটি অতি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষের উপর বর্তমান মসজিদটি নির্মিত হয়েছে। জনশ্রুতি মূলে জানা যায় যে, পীরমহল্লাতেই নাকি হযরত শাহ্‌জালাল সর্বপ্রথম আসেন এবং আস্তানা গাড়েন। তিনিই নাকি বর্তমান মসজিদের স্থানে আদি মসজিদটি নির্মাণ করেন। এখানে যে একটি প্রাচীন মসজিদ ছিল এবং তাতে যে একটি শিলালিপি ছিল, তা থেকে নাকি এসব তথ্য জানা গেছে। শিলালিপিটি হযরত শাহ্ জালালের দরগার পাশে একটি দেয়ালে স্থাপিত আছে বলে শ্রীকমলাকান্ত গুপ্ত 'জনশক্তি' নামক স্থানীয় পত্রিকায় ১৩৮১ সনের ১৭ই পৌষ তারিখে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। সেখানে ১১টি শিলালিপি আছে। সেগুলির মধ্যে কোনটি পীর মহল্লা মসজিদের শিলালিপি, তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি।

হযরত শাহ্‌জালাল নাকি পীরমহল্লাতেই বসবাস করতেন এবং মৃত্যুর কয়েক বছর আগে তিনি পীরমহল্লা ছেড়ে দরগামহল্লাতে চলে যান এবং সেখানেই তিনি মারা যান এবং তাঁকে বর্তমান মাযারে সমাধিস্থ করা হয়। এই জনপ্রবাদের প্রথম অংশে কতখানি সত্য আছে, তা বলা কঠিন। ইবনে বতুতা ১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং তাঁকে একটি পাহাড়ের গুহার মধ্যে বসবাস করতে দেখেছিলেন বলে তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে পাওয়া যায়। খুব সম্ভব বর্তমান দরগা মহল্লার পাহাড়ের কথাই ইবনে বতুতা বলেছেন। এর এক বছর পরে অর্থাৎ ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে হযরত শাহ জালাল মারা যান বলে তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায়।

পীরমহল্লার কবরগুলি দেখে ধারণা হয় যে, অনেকগুলি মৃতদেহ একই সময়ে অথবা কাছাকাছি সময়ে সেখানে দাফন করা হয়েছিল। ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দের শ্রীহট্ট অভিযানকালে রাজা গৌড়গোবিন্দের সঙ্গে সেকান্দর খাঁ গাযী ও হযরত শাহ্‌জালালের নেতৃত্বে মুসলিম সেনাবাহিনীর যে-যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে খুব সম্ভব অসংখ্য মুসলিম সৈন্য নিহত হয়েছিলেন। সেই নিহত সৈনিকদেরকে খুব সম্ভব পীরমহল্লাতে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। এবং আলোচ্য কবরগুলি খুব সম্ভব সেই সব কবর। শরিয়তের বিধান মতে মুসলমানের কবর পাকা করা নিষেধ। হযরত শাহ্ জালাল তা মানতেন এবং সেজন্য তাঁর নিজের কবরও পাকা নয় এবং সেখানে কোন সৌধও নেই। খুব সম্ভব তাঁর নির্দেশে পীর মহল্লার কবরগুলিও পাকা করা হয়নি এবং ধারেকাছে প্রাপ্ত হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের ইট-পাথর দ্বারা আবৃত করে কবরগুলিকে পরবর্তীকালের জন্য চিহ্নিত করে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

আদিনা মসজিদ

শ্রীহট্ট শহরের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে বড় রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত অনুচ্চ টিলার উপরে একটি প্রাচীন কবরস্থান আছে। কবরস্থানের ভিতর দিয়ে পশ্চিম দিকে যে রাস্তাটি চলে গেছে, তা ধরে প্রায় ১০ মিটার গেলে একটি বিরাট ইমারতের ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। অসংখ্য বড় বড় প্রস্তরখণ্ড সেখানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। এসমস্ত প্রস্তরখণ্ড, প্রাচীন ইট ও ইটের ভগ্নাংশ ছাড়া মাটির উপরে ইমারতের আর বিশেষ কোনো চিহ্ন নেই। কিন্তু মাটির নিচে বিরাট বিরাট প্রাচীরের ভিত্তি দেখা যায়। প্রাচীর তথা ইমারতটির দৈর্ঘ্য সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা কঠিন। কারণ, এই ধ্বংসাবশেষের দক্ষিণাংশে এখন বাড়িঘর তৈরি হয়ে গেছে। উত্তরাংশ এখনও (১৯৭৪ খ্রিঃ) খালি পড়ে আছে। এই দুই অংশ মিলিয়ে উত্তর-দক্ষিণে এস্থানের দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ১৫০ মিটার। এই সমগ্র স্থান জুড়ে এখানে-ওখানে ইটের তৈরি প্রাচীন দেয়ালের ভিত্তি দেখা যায়।



▲ হযরত শাহজালালের মাজার, সিলেট ,

স্থানীয় জনপ্রবাদ থেকে জানা যায় যে, এখানে এককালে একটি বিরাট মসজিদ ছিল। পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদের ১৫৬ মিটার × ৮০ মিটার) অনুকরণে নাকি নির্মিত ছিল এই বিরাট মসজিদ। আদিনা মসজিদ নামে পরিচিত এই বিরাট ইমারতের আয়তনও নাকি ছিল, পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদের আয়তনের কাছাকাছি। এ মসজিদে ১৬০ টি গম্বুজ ছিল বলে স্থানীয় জনশ্রুতিমূলে জানা যায়। মসজিদের আয়তন কী ছিল, তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। তবে ভিত্তিদেয়াল ও অন্যান্য ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন দেখে ধারণা হয় যে, মসজিদটি অতি বিরাট আকারের ছিল। সিলেট মুসলিম সাহিত্য সংসদের আঙ্গিনায় একটি বিরাট পাথরের উপর ফারসী ভাষায় উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি আছে।

এই শিলালিপিটি আদিনা মসজিদে ছিল বলে স্থানীয় জনশ্রুতি মূলে জানা যায়। অন্যমতে এটি ঈদগাহ্ মসজিদের শিলালিপি।

এই মসজিদের পূর্বদেয়াল থেকে আনুমানিক ১৫ মিটার পূর্বদিকে প্রাচীর বেষ্টিত একটি পাকা মাযার আছে। প্রায় ৪ মিটার × ৩.৩ মিটার আয়তনের প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত এই মাযার সম্পর্কে নানা প্রকার জনশ্রুতি শোনা যায়। সৈয়দ নাসির-উদ-দীন-এর মাযার বলে এটি কথিত হয়।

এই মাযারের লাগোয়া উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রায় ১৫ মিটার ব্যাসবিশিষ্ট ও প্রায় ১০ ফুট গভীর একটি গোলাকার গর্ত আছে। গর্তের মধ্যে প্রাচীন ইট ও পাথরের টুকরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। এখানে নাকি আবেহায়াত নামক একটি কূপ ছিল এবং কূপের পানি নাকি সর্বরোগ নিরাময়ক ছিল।

এই মসজিদের কোনো সঠিক ইতিহাস উদ্ধার করা যায়নি। যতদূর জানা যায়, তাতে মনে হয় যে, এটি মোঘল আমলে নির্মিত হয়েছিল।

হযরত শাহ্জালালের দরগাহ্ ও মসজিদ

প্রবেশপথ : পূর্বদিকের সদর রাস্তার পরেই ছিল মাযারের প্রবেশপথ। প্রবেশপথের উপরে নির্মিত ছিল এক গম্বুজবিশিষ্ট একটি সুন্দর অট্টালিকা। অট্টালিকার উপরতলায় ছিল নক্করখানা। মিঃ ওয়েলিস (Mr. Wellis) নামক একজন ইউরোপীয় ডিপুটি কমিশনার এটি নির্মাণ করেছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ভূমিকম্পে এই ইমারত ধ্বংস হয়ে গেছে।

লঙ্গরখানা : সদর তোরণ অতিক্রম করার পর উত্তরদিকে মাযারের লঙ্গরখানা চোখে পড়ে। এখানে হযরত শাহ্জালালের সময় থেকে দরিদ্রদের মধ্যে অন্ন বিতরণ করা হয়। অনান্য তৈজসপত্রের মধ্যে এখানে অতি বিরাট আকারের দুটি ডেকচি আছে। ডেকচি দুটিতে অস্পষ্ট ফারসী বা আরবী অক্ষরে কিছু কথা লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু এখন তা পড়া যায় না। খাদিমরা বলেন যে, এগুলি হযরত শাহ জালালের সময়ের। খুব সম্ভব এগুলি অনেক পরবর্তী কালের।

পুকুর ও গজার মাছ : লঙ্গরখানা থেকে সামান্য উত্তর-পশ্চিমে পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ একটি ছোট জলাশয় আছে। এখানে অসংখ্য বিরাট বিরাট গজার মাছ আছে। এগুলি সম্পর্কে নানা কাহিনী শোনা যায়। এগুলি নাকি হযরত শাহ্ জালালের পোষা মাছ। কেউ এগুলি ভয়ে খায়না। মাযার যিয়ারতকারীরা অনেকেই ভক্তিভরে মাছগুলিকে নানা খাদ্যদ্রব্য খেতে দেয়।

মসজিদ ও প্রবেশপথ : হযরত শাহ্জালালের মাযার একটি টিলার উপরে অবস্থিত। সদর প্রবেশপথ অতিক্রম করে লঙ্গরখানা ডান পাশে রেখে সমতল ভূমির একটি চত্বর পার হলে মাযারের পাহাড়ে ওঠার সিঁড়িপথ। সিঁড়িপথের ডান দিকে (উত্তর দিকে) সামান্য দূরে মহিলাদের জন্য নির্মিত ছোট একটি ইমারত। মহিলারা এখান থেকেই মাযার জিয়ারতের পর্ব সমাধা করেন। কারণ, হযরত শাহ্জালালের নির্দেশমতে কোনো মহিলা পাহাড়ের উপরে উঠে মাযার জিয়ারত করতে পারেন না।



▲ হযরত শাহজালালের মসজিদ, সিলেট

কয়েকপা সিঁড়িপথ পার হয়ে উপরে উঠলে বামদিকে (দক্ষিণ দিকে) একটি মসজিদ পাওয়া যায়। ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে শ্রীহট্টের ফৌজদার বাহ্‌রাম খান এ মসজিদ নির্মাণ করেন। ৩ গম্বুজ, তিন দরজা, ৩ মিহরাব ও ৪ কোণে ৪টি মিনারবিশিষ্ট এ মসজিদের এত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে যে এটিকে মোঘল আমলের মসজিদ বলে ধরাই যায় না। সেই ছোট মসজিদের স্থানে এখন বিরাট এক মসজিদ নির্মিত হয়েছে। তবু জুম্মার দিন স্থানের অভাব হয়।

বড় গম্বুজ : সিঁড়ি দিয়ে ওঠার পর সামনে পড়ে 'বড় গম্বুজ' নামক একটি মসজিদ জাতীয় ইমারত। বর্গাকারে নির্মিত এই ইমারতের উপরে একটি মাত্র গম্বুজ আছে। এর দেয়ালগুলি বেশ প্রশস্ত। চারকোণে ৪টি অষ্টকোণাকৃতির মিনার বা টারেট আছে। পূর্বদেয়ালে ৩টি দরজা, কেন্দ্রীয় দরজা অপেক্ষাকৃত বড়। পশ্চিম দেয়ালে কোনো মিহরাব নেই। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে কোনো দরজা নেই। কিন্তু পশ্চিম দেয়ালে একটি দরজা আছে। সেই দরজার ভিতর দিয়ে মাযারে যাওয়ার পথ। অধ্যাপক দানী এটিকে একটি মাযার বলে সন্দেহ করেছেন। কিন্তু এখানে কোনো কবর নেই, ছিল বলে কোনো প্রমাণও পাওয়া যায় না। ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে শ্রীহট্টের ফৌজদার ফরহাদ খান কর্তৃক নির্মিত এই ইমারতের কেন্দ্রীয় দরজার উপরে অবস্থিত শিলালিপির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি বলে এই ইমারতের প্রকৃত পরিচয় নির্ধারণ করা গেলনা। তবে মাযারে যাবার তোরণ হিসাবে এটি এখন ব্যবহৃত হচ্ছে। এবং শুক্রবার দিন এখানেও জুম্মার নামাজ পড়া হয়।

এই ইমারত পার হলেই প্রাচীরবেষ্টিত একটি ছোট আঙ্গিনা। আঙ্গিনার পশ্চিম দেয়ালে ৫টি ও বড় গম্বুজের পশ্চিম দেয়ালে (বাইরের দিকে) বেশ কয়েকটি শিলালিপি সন্নিবেশিত আছে। আরবী ও ফারসী ভাষায় লিপিকৃত শিলালিপিগুলি শ্রীহট্ট শহর ও জেলার বিভিন্ন মসজিদ-ইমারতের এবং এখানে এনে জড়ো করে রাখা হয়েছে।

মাযার : এই আঙ্গিনার উত্তর দিকে প্রাচীরঘেরা আর একটি ছোট আঙ্গিনা আছে। সেই আঙ্গিনার কেন্দ্রস্থলে হযরত শাহ্জালালের সমাধি। সমাধিটি কাঁচা অর্থাৎ মাটির তৈরি। অত্যধিক চুনের প্রলেপ দেওয়ার ফলে প্রথম দর্শনে পাকা কবর বলে ভ্রম হয়। মাযারের উপরে রেশমী কাপড়ের গিলাপ ও উপরে কাপড়ের চাঁদোয়া। মায়ারের পায়ের দিকে ও দক্ষিণ দেয়ালের বাইরে আছে বেশ কয়েকটি পাকা কবর। এগুলি হযরত শাহ্জালালের সঙ্গীদের কবর বলে কথিত হয়।

মাযারসংলগ্ন মসজিদ : মাযারের পশ্চিম দিকে আছে একটি ছোট মসজিদ। হযরত শাহ্জালাল এ মসজিদে নামাজ পড়তেন বলে খাদিমগণ বলেন। এর আদিরূপ কী ছিল, তা বলা কঠিন। সিলেটের ডিপুটি কমিশনার মিঃ ওয়েলিস (Mr. Wellis) এ মসিজদটি নতুন করে নির্মাণ করেন। এর আগে মোঘল আমলের একটি ছোট মসজিদ এখানে ছিল। এর আগে মসজিদের কী অবস্থা ছিল অথবা আদৌ এখানে কোনো মসজিদ ছিল কিনা, তা বলা কঠিন। ১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দে ইবনে বতুতা হযরত শাহ্ জালালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন বলে তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে পাওয়া যায়। তিনি হযরত শাহ্ জালাল সম্পর্কে অনেক কথা বলে গেছেন। তিনি তাঁকে একটি পর্বতগুহায় বসবাসরত অবস্থায় দেখেছিলেন বলে, তাঁর বর্ণনায় আছে। কোনো ইমারত বা মসজিদের কথা তিনি উল্লেখ করেননি। এতে মনে হয় যে, হযরত শাহ্জালাল বর্তমান মাযারের পাহাড়ে কোনো গুহায় খুব সম্ভব বাস করতেন। ইমারতাদি বোধ হয় তাঁর মৃত্যুর পরে নির্মিত হয়েছিল।

চশমা : শাহ্জালালের মাযারের পশ্চিম দিকে পাহাড়ের নিচে একটি ফোয়ারা (Water-spring) আছে। পীরসাহেব এর পানি ব্যবহার করতেন বলে জানা যায়। এখন এটি বাঁধান অবস্থায় আছে।

পাথর : মাযারের পাহাড়ে অনেক পাথর দেখা যায়। এগুলির মধ্যে খিলান, স্তম্ভ ইত্যাদি জাতীয় নানারকমের পাথর আছে। এগুলি খুব সম্ভব প্রাক-মুসলিম যুগের ইমারতাদির পাথর। এই পাহাড়ে খুব সম্ভব রাজা গৌড়-গৌবিন্দ ও তাঁর পূর্ববর্তীদের ইমারতাদি ছিল।

ইতিহাস : হযরত শাহ্জালাল ও তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে নানারকম কাহিনী শোনা যায়। সেগুলির মধ্যে নানা অলৌকিক কথা আছে। তাঁর সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায়নি। তবে সুলতান হোসেন শাহ্র আমলের একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, সুলতান ফিরোজ শাহ্ দেলভীর (দেহ্লবী?) রাজত্বকালে সেকান্দর খান গাযীর হস্তে 'আরসাহ্ শ্রীহট্ট শহরের' প্রথম মুসলিম অধিকার ৭০৩ হিজরী (১৩০৩ খ্রিঃ) সনে ঘটে। সেই শিলালিপির সর্বপ্রথমে আছে 'মোহাম্মদের পুত্র শেখ-উল-মোশায়েখ মখদুম শেখ জালাল মোজার্রেদ' কথা ক'টি।[১] ইবনে বতুতার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থেকে জানা

১. Inscriptions of Bengal. vol IV. p. 25.—Mvi. Shamsuddin Ahamad.

যায় যে, তিনি ১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দে কামরূপে (তখন শ্রীহট্ট কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল) শাহ্জালালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। পর বছর অর্থাৎ ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে হযরত শাহ্ জালাল মৃত্যুমুখে পতিত হন বলে জানা যায়।

হযরত শাহ জালাল ছিলেন একজন অতি পূত চরিত্রের মানুষ। তিনি চিরকুমার ছিলেন। তিনি ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দের শ্রীহট্ট অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে কাহিনী ছাড়া অন্য কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে তখনকার দিনে অনেক সৈনিক-দরবেশের (Saint-soldier) পরিচয় পাওয়া যায়। খুব সম্ভব তিনিও ছিলেন একজন দরবেশ-সৈনিক এবং শ্রীহট্ট অভিযানের একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। এর চেয়ে বেশি বলার মতো কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই, গালগল্প অবশ্য যথেষ্ট আছে।

শাহ্পরানের মাযার ও মসজিদ

শ্রীহট্ট শহর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার পূর্বদিকে এবং পাকাসড়ক থেকে আনুমানিক ৮০০ মিটার দক্ষিণে একটি টিলার উপর শাহপরানের মাযার অবস্থিত। টিলার দক্ষিণ দিকের পাকা সিঁড়ি বেয়ে কিছুদূর উঠলেই টিলার পূর্বদিকে ঘেঁষে অবস্থিত মাযারটি চোখে পড়ে। মাযারটি পাকা এবং বেশ উঁচু করে নির্মিত। মাযারের উপরে কোনো সৌধ বা ছাদ নেই। মূল্যবান বস্ত্রদ্বারা আবৃত মাযারের উপরে মূল্যবান কাপড়ের চাঁদোয়া। চারদিক অনুচ্চ ইটের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। অসংখ্য ভক্ত প্রতিদিন সেখানে ভিড় করে এ মাযার অত্যন্ত 'গরম' বলে স্থানীয় লোকের বিশ্বাস এবং সে কারণে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে যিয়ারতকারীরা সেখানে যাতায়াত করেন।

মাযার থেকে প্রায় ১০০ মিটার পশ্চিমে একটি টিলার উপরে এবং টিলার পশ্চিমপ্রান্ত ঘেঁষে একটি মসজিদ আছে। ৩ গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদের আয়তন (বাইরের দিকে) ১৯ মিটার × ৬ মিটার ফুট। দেয়ালগুলি প্রায় ১.৩ মিটার প্রশস্ত। মসজিদের সামনে ৪.৫ প্রশস্ত যে বারান্দা আছে, তা হাল আমলে সংযোজিত হয়েছে। বর্তমান মসজিদটি হাল আমলে পুনর্নির্মিত ও বর্ধিত হয়েছে। আদি মসজিদের আয়তন (ভিতরের দিকে) ছিল ১০.৯ মিটার × ৩.৬ মিটার। তাতেও ৩টি গম্বুজ ছিল। কেন্দ্রীয় বড় গম্বুজের দু'পাশে অবস্থিত গম্বুজ দুটি ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট। আদি মসজিদে ৩টি দরজা ছিল পূর্ব দেয়ালে এবং খুব সম্ভব ১টি করে দরজা ছিল উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে। দরজাগুলির বরাবর পশ্চিম দেয়ালে ৩টি মিহ্রাব ছিল। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি ছিল অপেক্ষাকৃত বড়। বর্তমানে আদি মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ৩.৬ মিটার করে বর্ধিত করা হয়েছে এবং পূর্বোক্ত বারান্দাটি সংযোজিত করা হয়েছে। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে যে সুন্দর প্যানেলিং ছিল তা অন্তর্হিত হয়েছে।

মসজিদের পূর্বদিকে প্রায় ১৬ মিটার দূরে একখণ্ড কাল পাথর অনাদৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এটি ছিল একটি আরবী বা ফারসী শিলালিপি। খুব সম্ভব এই মসজিদেরই। কিন্তু শিলালিপিটির অক্ষরগুলি একদম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অতি কষ্টে দু-একটি অক্ষর পড়া যায়। পুরাতন মসজিদের গঠন প্রণালী ও শিল্প-কৌশল দেখে মনে হয় এটি মোঘল আমলে নির্মিত হয়েছিল।

শেখ বোরহান-উদ্-দীনের মাযার

সিলেট শহর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার পূর্ব-পূর্ব-দক্ষিণে সুরমা নদীর উত্তর তীরে এবং নদী থেকে প্রায় ২৯৭ মিটার উত্তরে একটি নির্জন স্থানে একটি মাযার আছে। লোকে বলে শেখ বা সৈয়দ বোরহান-উদ-দীনের মাযার।

গ্রামের নাম টুলটিকর, প্রকাশ্যে কুলীঘাট। নদীর পাড় ঘেঁষে যে পাকা সড়ক পূর্বদিকে চলে গেছে, তা থেকে একটি গ্রাম্যপথ উত্তর দিকে চলে গেছে। সে পথের পশ্চিম পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে নির্মিত এ মাযার। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা প্রায় ৭ মিটার × ৫ মিটার আয়তনের অনুচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত একখণ্ড আয়তাকার উন্মুক্ত ভূমির প্রায় কেন্দ্রস্থলে এ মাযার অবস্থিত। উপরে চাঁদোয়া এবং পাকা কবরটি কাপড় দ্বারা অত্যন্ত সযত্নে আচ্ছাদিত।

পাশের রাস্তা থেকে প্রায় ১ মিটার উঁচু এ স্থান। মাযারের প্রাচীরসংলগ্ন ভূমিতে বিশেষ করে উত্তরদিকে মোঘল আমলের পাতলা ইট ও চুন-সুরকির গাঁথুনি দ্বারা নির্মিত কিছু কিছু ভিত্তিদেয়াল দেখা যায়। সেগুলিও খুব প্রাচীন বলে মনে হয় না। খুব সম্ভব মোঘল আমলের শেষ দিকের।

মাযারের পশ্চিম ও পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে প্রায় ২ একর পরিমিত ভূমি বিরান অবস্থায় পড়ে আছে। সেখানে মাটির উপরে প্রাচীনকালের বহু ইটের ভগ্নাংশ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখা যায়। কিন্তু ইমারতের ধ্বংসাবশেষ বা ভিত্তির চিহ্ন পাওয়া যায়নি। এ স্থান দেখে ধারণা হয় যে, এককালে এখানে এবং মাযারের স্থানে ইমারতাদির অস্তিত্ব ছিল। মাযারটি যেখানে অবস্থিত, সেখানে যে একটি ইমারত ছিল, তা বোঝা যায় সেখানে অবস্থিত প্রাচীরের ভিত্তি দেখেই।

খুব সম্ভব এখানে আগের দিনের একটি মাযার ছিল। সেটি নষ্ট হয়ে গেলে হাল আমলে বর্তমান মাযারটি নির্মিত হয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীদের মতে এ মাযার অত্যন্ত প্রাচীন, শ্রীহট্ট জেলার প্রাচীনতম মাযার। শ্রীহট্টের প্রথম মুসলমান যিনি নিজের ছেলের আকিকার জন্য গরু জবেহ্ করেছিলেন এবং সেই তথাকথিত অপরাধে শ্রীহট্টের রাজা গৌড়গোবিন্দ যাঁর পুত্রকে হত্যা করেছিলেন এবং যাঁর আমন্ত্রণে হযরত শাহ্জালাল তাঁর সঙ্গীসাথী নিয়ে শ্রীহট্ট অধিকারে এসেছিলেন, এ মাযার নাকি সেই স্বনামধন্য ব্যক্তি শেখ বা সৈয়দ বোরহান-উদ্-দীনের।

কিংবদন্তি ছাড়া বোরহান-উদ-দীন সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। শ্রীহট্টে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বলা যায় যে, গৌড়ের সুলতান শামস্-উদ-দীন ফিরোয শাহর আমলে ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে এ ঘটনা ঘটে। হযরত শাহ্ জালাল সেই অভিযানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় এবং তাঁরই সাধনায় ও চরিত্র-মাহাত্ম্যে সমগ্র জেলায় ইসলাম ধর্ম ব্যাপকভাকে প্রচলিত হয়। এর আগে অর্থাৎ শ্রীহট্টে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে কোনো মুসলমানের অধিবাস এখানে ছিল, এরকম ধারণা যুক্তির দিক থেকে আদৌ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারেনা।

আর যেখানে বোরহান-উদ-দীনের বসবাস ছিল বলে কথিত হয়, সেই টুলটিকর একটি সাধারণ গ্রাম। বরাবরই তা সেরকমই ছিল বলে মনে হয়। সেখানে তাঁর বসতি

থাকার অর্থ হচ্ছে যে, সেখানে আরও মুসলমানের অধিবাস ছিল। গোটা বাঙলা তখন নবাগত মুসলিম শক্তির অধিকারে। পার্শ্ববর্তী অমুসলিমদের রাজ্যে তখন মুসলিম-ভীতির অন্ত নেই। সেই অবস্থায় শ্রীহট্টে মুসলিম অধিকারের পূর্বে টুলটিকরের মতো একটি গ্রামে মুসলিম বসতি গড়ে ওঠার কাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা বলে ধরা যায় না। বোরহান-উদ্-দীন সেখানে একা ছিলেন বলেও মনে হয় না। তিনি পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করতেন। তা না হলে তাঁর নবজাত পুত্রের জন্য আকিকা করার প্রশ্ন ওঠেনা। শুধু একটি মুসলিম পরিবারের সেখানে অবস্থান সম্ভাব্য ঘটনা বলেও কিছুতেই ধরা যায় না। অন্য কথা বাদ দিলেও একটি গরু জবাই করার জন্যও বেশ কয়েকজন মুসলমানের প্রয়োজন ছিল।

এই গরু জবেহ্, চিলের সাহায্যে সেই জবেহ্ করা গরুর মাংস হিন্দু রাজার গৃহে প্রেরণ, তার ফলে হিন্দুরাজা কর্তৃক মুসলমানের উপর অত্যাচার এবং তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে মুসলিম রাজশক্তি কর্তৃক হিন্দুরাজার রাজ্য অধিকারসংক্রান্ত একই ধরনের কাহিনী বাঙলা মুলুকের অন্যত্রও প্রচলিত আছে। এ ধরনের কাহিনীর ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে যত কম কথা বলা যায় ততই ভাল। ইতিহাসের সঙ্গে এগুলির যে কোনো যোগসূত্র নেই, তা বলাই বাহুল্য।

১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীহট্টে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার আগে সেখানে কোনো মুসলমানের পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করার ঘটনা সম্ভাবনার দিক থেকে অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। খুব সম্ভব এই মাযার অনেক অনেক পরবর্তীকালের।

সা'দীপুর মসজিদ

টুলটিকর থেকে প্রায় ১৫০০ মিটার পশ্চিমে রাস্তার উত্তর পার্শ্বে সাদীপুর গ্রামে একটি তিন গম্বুজের মসজিদ আছে। আলুমাঝির মসজিদ নামে পরিচিত এ মসজিদ মোঘল আমলের একদম শেষভাগে নির্মিত হয়েছিল। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ৩টি দরজা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে দরজা। পশ্চিম দেয়ালে ৩টি মিহরাব। মসজিদের চারদিকে বেষ্টক প্রাচীর আছে। দেয়ালগুলি প্রায় সাড়ে তিন ফুট প্রশস্ত। মসজিদের পূর্বদিকে একটি ছোট পুকুর আছে। পুকুরের পশ্চিম পাড়ে আছে একটি বাঁধান ঘাট।

ডাক বাঙলা রোডের নবাবী আমলের মসজিদ

সিলেট শহরে ডাক বাংলা রোডে নদীর তীরে মোঘল আমলের একটি সুন্দর মসজিদ আছে। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এ মসজিদের আয়তন ১৫ মিটার × ৬.৮ মিটার। দেয়ালগুলি প্রায় ১.৮ ফুট প্রশস্ত। চারকোণে ৪টি অষ্টকোণাকৃতির মিনার বা টারেট আছে। পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশপথ। পশ্চিম দেয়ালে ৩টি সুন্দর মিহরাব আছে। উপরে আছে ৩টি অতি সুন্দর গম্বুজ। মসজিদের সম্মুখ দেয়ালে সুন্দর প্যানেলিং-এর কারুকার্য ছিল।

এ মসজিদ মোঘল আমলের শেষদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে জনৈক মোঘল ফৌজদার কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল বলে জানা গেছে।

হবিগঞ্জ জেলা

মুসলিম আমল

শঙ্করপাশা মসজিদ

১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীহট্ট অঞ্চলে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই সেখানে ব্যাপকভাবে ইসলাম ধর্ম প্রচলিত হয় এবং ধর্মবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেই অঞ্চলে সুলতানী আমলে অনেক মসজিদ নির্মিত হয়েছিল বলে লিপিপ্রমাণে জানা যায়। কিন্তু সেই আমলে নির্মিত বহু মসজিদের শিলালিপি পাওয়া গেলেও একটি ছাড়া সে যুগের অন্য কোনো মসজিদের অস্তিত্ব এ জেলায় দেখা যায় না। সে আমলের যে মসজিদটি এখনও টিকে আছে, তা হচ্ছে এই শঙ্করপাশা মসজিদ। শাহ্‌জীবাজার রেলস্টেশন থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম দিকে হবিগঞ্জ উপজেলার অধীনে শঙ্করপাশা নামক স্থানে এই প্রাচীন মসজিদ অবস্থিত।



শঙ্করপাশা মসজিদ, সিলেট (পূর্বের আলোকচিত্র)

পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা এ মসজিদের আয়তন বাইরের দিকে আনুমানিক ১৩.৬৯ মিটার × ৯.৪৯ মিটার। দেয়ালগুলি প্রায় ১.৭৬ মিটার প্রশস্ত। মসজিদের চারকোণে ৪টি ও

বারান্দার দুই কোণে ২টি অষ্টকোণাকৃতির মিনার বা টারেট (turret) আছে। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় মিহরাবের দু'ধারে পিছনের দেয়ালেও ২টি মিনার ছিল। মসজিদটি প্রধান কক্ষ ও বারান্দা এই দুই ভাগে বিভক্ত।

বর্গাকারে নির্মিত কেন্দ্রীয় কক্ষের ভিতরের আয়তন ৬.৪৭ মিটার × ৬.৪৭ মিটার। এ কক্ষের পূর্বদিকে অবস্থিত বারান্দার আয়তন প্রায় ৬.৪৭ মিটার × ১.৬১ মিটার। কেন্দ্রীয় কক্ষের উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দেয়ালে আছে ৩টি করে প্রবেশপথ। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথগুলি অপেক্ষাকৃত বড়। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি মিহরাব। বারান্দার পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশপথ আছে। প্রায় বর্গাকারের খিলানের সাহায্যে নির্মিত প্রবেশপথগুলির উপরিভাগে খাঁজকাটা আছে (cusped)। মসজিদের কেন্দ্রীয় কক্ষের উপরে ছিল ১টি বিরাট আকারের গম্বুজ। বারান্দার উপরে কি ধরনের ছাদ ছিল, তা জানা যায়নি। খুব সম্ভব সেখানে ছোট ছোট ৩টি গম্বুজ ছিল অথবা ছিল খিলানের সাহায্যে নির্মিত ' ভোল্টেড' ছাদ। উপরের গম্বুজ ইত্যাদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে হাল আমলে লোহার বর্গার উপরে সমগ্র মসজিদে সমতল ছাদ নির্মিত হয়েছে।

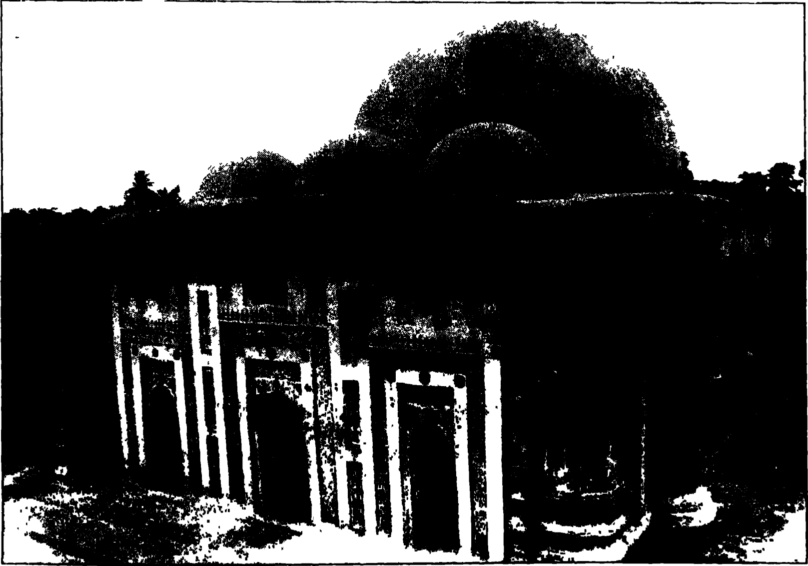
সেই সঙ্গে মসজিদের অনেক পরিবর্তনও করা হয়েছে। সুলতানী আমলের বাঁকানভাবে নির্মিত কার্নিশ ও প্যারাপেট এখন সরল রেখায় নূতন করে নির্মিত হয়েছে। তাতে মসজিদের আদি সৌন্দর্য অনেকাংশে বিনষ্ট হয়েছে। কোণের মিনারগুলিকেও ছাদের অনেক উপরে তোলা হয়েছে এবং তাতে মসজিদের আদি রূপটি অনেকাংশে ব্যাহত হয়েছে। মনে হয় গম্বুজ নির্মাণ করা যায়নি বলে মিনারগুলিকে উঁচু করা হয়েছে।

এতসব পরিবর্তনের পরেও মসজিদের আদি অলংকরণের বেশ কিছু নিদর্শন এখনও (১৯৮২ খ্রিঃ) মসজিদের গায়ে আছে। মিনারগুলি বলয়াকারের বিভিন্ন স্ফীতরেখা (band) দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। প্রত্যেক মিনারের একদম নিচের দিকে ছিল পর পর ৩টি স্ফীতরেখা। এরপরে কার্নিশ পর্যন্ত প্রায় সমদূরত্বে ৪টি স্ফীতরেখা ছিল। মসজিদের দেয়ালগুলির বাইরের দিকে পোড়ামাটির চিত্রফলকের সাহায্যে অতি মনোরম অলংকরণ ছিল। শুধু সম্মুখ দেয়ালেই (facade) নয়, দক্ষিণ উত্তর, এমনকি পশ্চিম দেয়ালেও অলংকরণ ছিল। উপর-নিচে লম্বা আয়তাকারে নির্মিত প্যানেলের মধ্যে এ সমস্ত অলংকরণ করা হয়েছিল।

পূর্ব দেয়ালে মিনার দুটির পাশে একের উপরে আর একটি করে পরপর ৩টি সরু ও আয়তাকারে নির্মিত প্যানেল আছে এবং দরজাগুলির উপরে আছে পাশাপাশি অবস্থান রত ২টি করে প্যানেল। কেন্দ্রীয় দরজার দু'পাশে নিচের দিকে আছে ২টি করে আয়তাকারে নির্মিত সরু প্যানেল এবং এগুলির উপরে আছে ১ টি করে বড় প্যানেল। দক্ষিণ ও উত্তর দেয়ালেও অনুরূপ প্যানেল ছিল এবং এগুলির ভিতরে পোড়ামাটির চিত্রফলকের সাহায্যে অলংকরণ করা হয়েছিল। তবে অলংকরণগুলির মধ্যে সুলতানী আমলে বিশেষ করে গৌড় অঞ্চলে প্রচলিত ঝুলন্ত শিকল ও ঘন্টার (the chain and bell motif) পরিবর্তে এখানে ঝুলন্ত বৃক্ষশাখা থেকে পত্র ও পুষ্পের প্রতিকৃতি অংকিত ছিল।

মিহরাবগুলির অলংকরণও ছিল অতি উঁচু মানের। পত্রাকারে নির্মিত মিহরাবগুলির উপরিভাগে খাঁজকাটা ছিল। মিহরাবের ফ্রেমের স্তম্ভগুলিতে লতার সাহায্যে অসংখ্য ছোট ছোট বর্গ ও আয়তক্ষেত্রের সৃষ্টি করে সেগুলির ভিতরে ৪ বা ৮ দল বিশিষ্ট পুষ্পের প্রতিকৃতি অংকিত করা হয়েছিল। মিহরাবের উপরিভাগ ও ভিতরে ছিল লতাপাতা ও পুষ্পের প্রতিকৃতি। পুষ্পের মধ্যে রজেটের প্রতিকৃতি খুবই উল্লেখযোগ্য। এমন সুন্দর ও ব্যাপকভাবে অলঙ্কৃত মসজিদ এদেশে খুব অল্প দেখা যায়। অনেক অলঙ্করণ নষ্ট হয়ে গেছে সত্য কিন্তু এখনও যা টিকে আছে, তাও অকিঞ্চিৎকর নয়।

মসজিদে কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। তবে মসজিদের গঠনপদ্ধতি ও শিল্পকৌশল দেখে পণ্ডিতেরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে এটি সুলতানী আমলে, খুব সম্ভব হোসেনশাহ্র রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল। এ ধরনের মসজিদের নমুনা দেখা যায় দিনাজপুরের সুরা মসজিদ (সুরা মসজিদ দ্র.), পটুয়াখালীর মসজিদবাড়ি মসজিদ (মসজিদবাড়ি মসজিদ দ্র.) ও গৌড়ের খনিয়া দিঘি মসজিদে (খনিয়া দিঘি মসজিদ দ্র.) এবং নারায়ণগঞ্জ হাজীগঞ্জ প্রভৃতি মসজিদে।*



▲ শংকর পাশা মসজিদ, হবিগঞ্জ, সিলেট

হাল আমলে মসজিদের উপরদেশে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সূরা মসজিদ ও অন্যান্য ৪ গম্বুজ মসজিদের মতো সেখানে একটি বড় গম্বুজ ও বারান্দায় ৩টি ছোট গম্বুজ স্থাপন করা হয়েছে।

* হাল আমলে মসজিদের কেন্দ্রীয় কক্ষের উপরে একটি বড় গম্বুজ এবং বারান্দায় ৩টি ছোট গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে এবং উপরে প্রদত্ত ছবিটি বর্তমান কালের মসজিদটি এই।—গ্রন্থকার।

সুনামগঞ্জ জেলা

বানিয়াচঙ মসজিদ

সুনামগঞ্জ জেলার অধীনস্থ বানিয়াচঙ খুবই প্রাচীন স্থান। মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে এই অঞ্চল হিন্দুদের অধিকারে ছিল। এ স্থান শাসনকারী হিন্দু নৃপতিদের উপাধি ছিল রাজা।

সেই বংশের শেষ হিন্দু রাজা মুসলিম রাজশক্তির নিকট পরাজিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও 'রাজা' উপাধি পরিত্যাগ করেননি এবং তাঁর বংশধরেরা আজ পর্যন্ত সেই পদবি ব্যবহার করে আসছেন বলে দেখা যায়।

বানিয়া চঙে মোঘল আমলের শেষ দিকের একটি মসজিদ আছে। তিন গম্বুজ, তিন দরজা ও তিন মিহ্‌রাব বিশিষ্ট মসজিদটি আজও টিকে আছে। তবে এতে অনেক সংস্কার করা হয়েছে।

মৌলভী বাজার জেলা

হিন্দু-বৌদ্ধযুগ

মৌলভীবাজার শহর থেকে প্রায় ৬ মাইল দূরে কালাপুর নামক স্থানে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর নৃপতি লোকনাথের বংশীয় কোনো নৃপতির ছিল বলে পণ্ডিতদের অভিমত।

মুসলিম আমল

মৌলভীবাজার শহরের নিকট আনুমানিক খ্রিস্টীয় পনের শতকের একটি মসজিদ ছিল। পরবর্তীকালে সেই মসজিদে অনেক মেরামত এবং সেই সঙ্গে অনেক নতুন কাজও করা হয়েছে। পরিবর্তিত অবস্থায় মসজিদটি এখনও টিকে আছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা

বৌদ্ধ-হিন্দুযুগ

বাঘাউরা-বিলকেন্দুআই

বাঘাউরা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত নবীনগর উপজেলার অধীনে বাঘাউরা নামক একটি প্রাচীন গ্রাম উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার পূর্ব-পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত। এর পার্শ্ববর্তী গ্রামের নাম সামন্তঘর। এটিও একটি প্রাচীন গ্রাম।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বাঘাউরা গ্রামের ভাণ্ডারবাড়িতে অবস্থিত একটি প্রাচীন জলাশয়ে পুনর্খনন কার্য করার কালে মাটির নিচ থেকে কালপাথরে নির্মিত শিলালিপিসহ একটি মূর্তি আবিষ্কৃত হয়। সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপির পাঠ থেকে জানা যায় যে, বিলকেন্দুআই গ্রামের অধিবাসী লোকনাথ নামক একজন পরমভক্ত বৈষ্ণব কর্তৃক এই বিষ্ণুমূর্তি নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় পাল বংশীয় নৃপতি মহীপালদেবের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে। রাজমহলের কালপাথরে নির্মিত মূর্তিটির উচ্চতা ছিল প্রায় ১.৫১ মিটার (প্রায় ৫ ফুট) এবং এটি এখন কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

বিলকেন্দুআই : বাঘাউরা থেকে কিছুদূরে অবস্থিত বিলকেন্দুআই নামক একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। সেখানকার একটি প্রাচীন মজে যাওয়া জলাশয়ের সঙ্গে সংযুক্ত একটি বিরাট আয়তনের উঁচুভূমি আছে। উঁচু ভূমিটি বর্তমান কালে (১৯৯০ খ্রিঃ) মুসলমানের কবরস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে বহুদিন আগে থেকে।

অত্যন্ত বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে যে, কবরের জন্য মাটি খননকালে এই উঁচু ভূমিতে প্রাচীন ইট, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার ইত্যাদি পাওয়া যেত। মাটি খননকালে একটি ইষ্টক প্রাচীরের অংশবিশেষও এখানে আবিষ্কৃত হয়েছিল। খুব সম্ভব এখানে প্রাচীন যুগের একটি বিরাট আকারের অট্টালিকা অথবা কয়েকটি ছোট ছোট অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ লুক্কায়িত ছিল। এই অট্টালিকাটি ছিল খুব সম্ভব একটি ছোট্ট বিহার অথবা কয়েকটি বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ।

যদিও নিশ্চয় করে বলা যায় না যে, এ দুটি স্থান বাঘাউরা ও বিলকেন্দুআই আলোচ্য শিলালিপিতে উল্লিখিত প্রাচীন স্থানদুটিই। তবে নাম সাদৃশ্যের এই অনুমান অতিশয় যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় বিশেষ করে শেষোক্ত গ্রামে প্রত্নবস্তুগুলি আবিষ্কারের পরে।

মূর্তির পাদলিপিতে উল্লিখিত রাজা মহীপাল ছিলেন খুবসম্ভব পাল নৃপতি দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭০-৭৫ খ্রিঃ) এবং তিনি খুব সম্ভব এ নামের প্রথম নৃপতি মহীপাল

(৯৮৮-১০৩৮ খ্রিঃ) ছিলেন না। কারণ, প্রথম মহীপাল যখন ৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পিতা দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সিংহাসনে আরোহণ করেন সমগ্র বাঙলা তখন পালনৃপতিদের রাজ্য সীমার বাইরে ছিল এবং পালদের সর্বপ্রথম উত্তরবঙ্গ অধিকারের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় প্রথম মহীপালের বিয়ালা তাম্রলিপিতে (জয়পুর হাট জেলার কালাই উপজেলা) তাঁর তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে। তদুপরি সেই সময়ে সমতটের রাজ্যের নৃপতি ছিলেন প্রবল প্রতাপান্বিত চন্দ্রবংশীয় নৃপতিরা। কাজেই সমতটের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বাঘাউরা-বিলকেন্দুআই সদ্য সিংহাসনে অধিকারপ্রাপ্ত মহীপালের পক্ষে পূর্ব অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর ছিল বলে মনে হয় না।

এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, সে সময়ে চন্দ্রবংশীয় প্রবল শক্তিমান নৃপতি কল্যাণ চন্দ্রকে ডিঙ্গিয়ে পালদের পক্ষে উপরে উল্লিখিত স্থান অধিকার করা মোটেই সম্ভব পর ছিল না। বিশেষ করে এখানে মনে রাখা আবশ্যক যে, চন্দ্রদের রাজধানী ছিল বিক্রমপুরে এবং সে স্থান থেকে বাঘাউরা-বিলকেন্দুআইয়ের দূরত্ব খুব বেশি ছিল না।

চম্পকনগর

চম্পকনগর নামক এ প্রাচীনস্থান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত আখাউড়া উপজেলার অধীনে ও উপজেলা সদর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। স্থানটি বাংলাদেশ-ভারতের প্রায় সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত। পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যের কাছাকাছি স্থানে অবিস্থত বেশ কয়েকটি টিবির অবস্থানের কারণেই এস্থানকে পাহাড়ি এলাকা বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে টিবিগুলির সব প্রাকৃতিক কারণে গঠিত নয়, প্রাচীন কীর্তির অনেক ধ্বংসাবশেষ টিবিতে রূপান্তরিত হওয়ার কারণে এগুলির বেশ কয়েকটি আদতে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট। এগুলির বেশিরভাগ টিবিতে প্রাচীন ইট, মৃতপাত্রের ভগ্নাংশ ইত্যাদি প্রত্নবস্তু প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান দেখা যায়।

এ স্থানের চম্পকনগর নাম বেশ কৌতূহলোদ্দীপক এবং এটি বাংলাদেশের অতি জনপ্রিয় অথচ কাল্পনিক লোকগাথা বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের কাহিনীর সঙ্গে জড়িত বলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যদিও প্রকৃত ইতিহাসের সঙ্গে এ নামকরণের কোনো সম্পর্কই বিবেচনা করা যায় না।

আমাদের যতটুকু মনে হয়, সুদূর অতীতের কোনো রাজবংশের রাজধানীর সঙ্গে এ স্থানের ইতিহাস সম্পর্কিত। সপ্তম খ্রিস্টাব্দে বৃহত্তর উত্তর কুমিলা জেলায়, বৃহত্তর দক্ষিণ শ্রীহট্ট জেলায় এবং ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তরাংশ জুড়ে লোকনাথের রাজবংশ নামে এক সামন্ত রাজবংশের সন্ধান পাওয়া যায়। এ রাজবংশের প্রথম (লোকনাথের) তাম্রলিপিটি পাওয়া যায় বৃহত্ত কুমিল্লা জেলার কোনো স্থানে, কিন্তু কোন্ স্থানে তা জানা যায়নি। আর এ বংশের দ্বিতীয় ও এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত শেষ তাম্রলিপিটি পাওয়া যায় মৌলভীবাজার জেলার কালাপুর নামক প্রাচীন স্থানে। উভয় তাম্রলিপিতে উল্লিখিত মন্দিরটি ছিল মৌলভীবাজার জেলার দক্ষিণভাগে অবস্থিত অটবীমণ্ডলে। আমাদের ধারণা, খুব সম্ভব এ রাজবংশের রাজধানী ছিল এই অটবী অঞ্চলের কিছু দক্ষিণে অবস্থিত আলোচ্য চম্পকনগরে।

নাটঘরের বিচিত্র শিবমূর্তি

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অধীনে নবীনগর উপজেলার পূর্বাঞ্চলে তিতাসনদীর তীরের নিম্নাঞ্চলে নাটঘর গ্রাম অবস্থিত। ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে গ্রামের চৌধুরী বাড়ির একটি মজে যাওয়া প্রাচীন জলাশয় পুনর্খনন কালে কাল প্রস্তরনির্মিত একটি অদ্ভুত শিবমূর্তি আবিষ্কৃত হয় মাটির নিচে। প্রায় ১.৫১ মিটার (প্রায় ৫ ফুট) উচ্চতা বিশিষ্ট নন্দীর উপরে স্থাপিত এ মূর্তির সম্মুখের দুহাত দিয়া মুখের মধ্যে একটি বাঁশরি ধৃত এবং মকর আকৃতির এ বাঁশরি মূর্তিটি শ্রীকৃষ্ণে মূর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এটিই এ শিবমূর্তির বিশেষত্ব। সামনের এ দুটি হাত ছাড়াও মূর্তির পিছনদিকের প্রত্যেক পাশে আরও পাঁচটি করে হাত আছে।

পিছনদিকের দুটি হাত দিয়ে মূর্তির মাথার উপর একটি মুকুট ধরা আছে। এর নিচের দুটি হাতে একটি ঝুলন্ত শিকলের মতো বস্তু ধরা আছে। ডানদিকের পিছনের তৃতীয় হাত দিয়ে ধ্যানীবুদ্ধের মতো ধর্মমুদ্রা ধৃত আছে। বাঁ দিকের পিছনের তৃতীয় হাতদিয়ে একটি গদা ধৃত আছে। ডানদিকের পিছনের চতুর্থ হাত দিয়ে একটি ত্রিশূল ধরা আছে। হিন্দু ধর্মমতে ত্রিশূল হচ্ছে পৃথিবীর সর্ব অকল্যাণ বিদূরক। পিছনের বাঁ দিকের চতুর্থ হাত খুব সম্ভবত দ্রুতগামী গদার অস্তিত্বের নির্দেশক। পিছনের ডানদিকের পঞ্চম হাতটিতে একটি ডুগডুগি ধরা আছে এবং হিন্দুদের বিশ্বাস এ ডুগডুগির নির্দেশক। পিছনের ডানদিকের পঞ্চম হাতটিতে একটি ডুগডুগি ধরা আছে এবং হিন্দুদের বিশ্বাস এ ডুগডুগির শব্দ সকল মানুষকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করে। পিছনদিকের পঞ্চম হাতে বিষ্ণুর সুঁদর্শনচক্র ধরা আছে বলে মনে হয়।

এ শিবমূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরি ও বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রের উপস্থিতি মূর্তিটির বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে এবং ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে এ ধরনের মূর্তি এই উপমহাদেশে অত্যন্ত বিরল এবং এটিকে প্রাক-বৌদ্ধ যুগের মূর্তি বলে মনে করা যেতে পারে। এ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলা না গেলেও মূর্তিটি যে হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের মূর্তিগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মূর্তিটি আবিষ্কারের পরে স্থানীয় হিন্দুরা নাটঘর গ্রামে একটি শিবমন্দির নির্মাণ করে মূর্তির পূজা আরম্ভ করেন। তখন থেকে এ স্থান একটি পূণ্য তীর্থভূমিতে পরিণত হয় এবং দূর দূরান্তর থেকে ধর্মপ্রাণ অসংখ্য হিন্দু এ মূর্তিকে দর্শন ও পূজা করার জন্য আগমন করেন শিবচতুর্দশী উপলক্ষে। আদি মন্দিরটি বহু সংস্কারের কারণে বর্তমান একটি নতুন মন্দির রূপে দেখা যায়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পূর্বে উল্লিখিত বাঘাউরা এ স্থান থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত এবং উভয় স্থানই বর্তমান কালে একই ধরনের নিম্নভূমিতে অবস্থিত। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ ধরনের বিরল প্রকৃতির মূর্তি প্রত্নতত্ত্বের দিক থেকে খুবই উল্লেখযোগ্য এবং বর্তমানের নিম্নভূমিতে এককালে উঁচু ভূমি ছিল সে সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল বলে ধারণা হয়।

দেবগ্রামের ধ্বংসাবশেষ

উপরে উল্লিখিত চম্পকনগরের মতো দেবগ্রামও আখাউরা উপজেলায় অবস্থিত এবং উপজেলা সদর থেকে কয়েক কিলোমিটার দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত উঁচু ভূমিতে এ স্থানের অবস্থান। এ স্থানে সুদূর অতীতে অসংখ্য ইমারতাদির অস্তিত্ব ছিল বলে ধারণা হয়। সেগুলি সবই বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং নতুন নতুন ইমারতাদি সেগুলির স্থান অধিকার করেছে। অনেকের ধারণা কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতির মতো এ স্থানেও বৌদ্ধ বিহার বৌদ্ধস্তূপ ও মন্দিরের মতো অনেক ইমারতাদি এখানে ছিল এবং সেগুলি বিলুপ্ত হয়ে গেলেও প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষ নানা স্থানে এখনও বিদ্যমান। এখানে তলাহীন (bottomless) একটি গুহা (cave)-র কথা বলা হয়ে থাকে। খুব সম্ভব একাধিক তলাবিশিষ্ট কোনো ইমারত এখানে প্রাচীন কালে ছিল এবং তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গভীর গর্ত সৃষ্টি করার ফলে এটিকে তলাহীন গর্ত (cave) বলা হয়ে থাকে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর কর্তৃক বৈজ্ঞানিক উপায়ে পর্যবেক্ষণ (exploration) ও উৎখনন কার্য চালালে হয়ত মূল্যবান তথ্যের সন্ধান এখানে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এ পর্যন্ত এধরনের কোনো কাজ এখানে করা হয়নি।

নামদৃষ্টে অষ্টম শতাব্দীর লালমাই-ময়নামতির সুবিখ্যাত বৌদ্ধ দেববংশীয় নৃপতিদের কীর্তিরাজির সঙ্গে সম্পৃক্ত করার প্রবণতা রোধ করা কিছুটা কঠিন হয়ে পড়ে। এ স্থানে পর্যবেক্ষণ এবং উৎখনন কার্য চালালে হয়ত চমকপ্রদ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যেতেও পারে।

সুলতানপুরের ধ্বংসাবশেষ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের প্রায় ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে সুলতানপুর নামক একটি প্রাচীন স্থান আছে। সুলতানপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের খেলার মাঠের দক্ষিণে একখণ্ড উঁচু ভূমিতে বেশ কয়েকটি প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব ছিল এবং সেখানে অতীতে বেশ কয়েকটি প্রাচীন অট্টালিকার ভিত্তিদেশও পরিলক্ষিত হত। এ প্রাচীন গ্রামে মাটি কাটার সময় অনেক প্রাচীন প্রস্তরমূর্তি, কিছু কিছু স্বর্ণমুদ্রা এবং আরও অনেক প্রত্নবস্তু পাওয়ার কথা বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায়। প্রত্নতত্ত্ব দফতর কর্তৃক অনুসন্ধান কার্য চালালে হয়তো এখানে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

কালীকচ্ছের নারায়ণ ও অন্যান্য মূর্তি

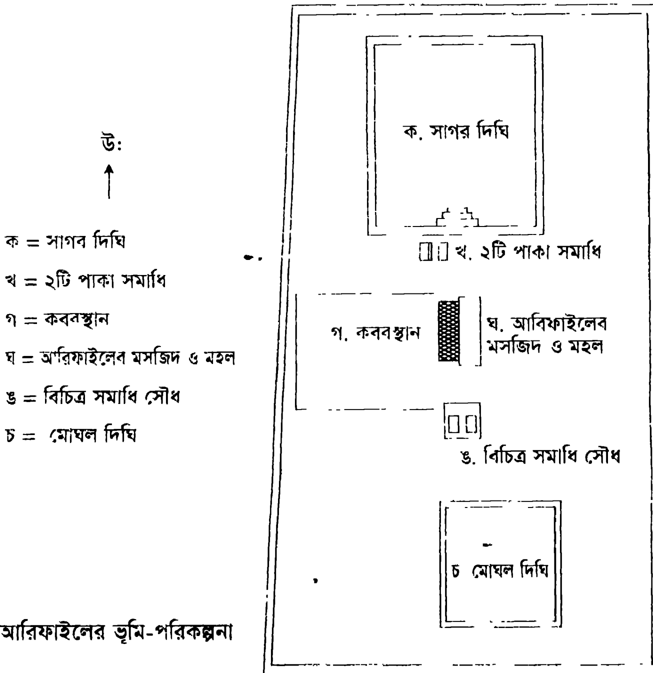
অনেক কারণে সরাইল উপজেলার কালীকাছ একটি সুবিখ্যাত গ্রাম। উপজেলা সদর থেকে এ স্থানের দূরত্ব খুব বেশি নয়। প্রায় পাঁচ মন (প্রায় ১৮৫ কিলোগ্রাম) ওজনের প্রস্তরনির্মিত একটি নারায়ণ (বিষ্ণু) মূর্তি এ গ্রামে আছে। বৃক্ষলতাশোভিত এ মূর্তির দু'পাশে আছে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মূর্তি।

সাম্প্রতিককালে একই গ্রাম থেকে প্রস্তরনির্মিত আর একটি নারায়ণমূর্তি চুরি হয়েছিল। এটি সীমান্তরক্ষী বি. ডি. আর ফৌজ কর্তৃক উদ্ধার করা হয়েছিল এবং মূর্তিটি স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাছে আছে বলে জানা গেছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে আরও অনেক প্রস্তরমূর্তি উদ্ধার করা হয়েছিল বলে জানা গেছে। কিন্তু সে সব মূর্তির কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না।

মুসলিম আমল

সূচনা ঃ এ স্থান সোনারগাঁয়ের বেশ নিকটবর্তী বলে অতি যুক্তিসঙ্গত কারণেই ধারণা করা যেতে পারে যে, সুলতানি আমলের বেশ কিছু প্রাচীন কীর্তির অবস্থান এ জেলায় ছিল। কারণ মুসলিম অধিকারের প্রায় প্রথম দিক থেকে মুসলিম নৃপতিরা সোনারগাঁয়ে রাজধানী স্থাপন করে বাঙলায় রাজত্ব করেছিলেন বলে দেখা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সুলতানি আমলের বিশেষ কোনো কীর্তি এ জেলায় পাওয়া যায়নি। যে সামান্য ক'টি মুসলিম আমলের কীর্তি এখানে পাওয়া গেছে সেগুলি সবই মোঘল আমলের এবং সেগুলি হচ্ছে (১) অরিফাইলের কীর্তি সমূহ, (২) সরাইলের জামি' মসজিদ, (৩) ভাদুঘর মসজিদ এবং কালভৈরবের মন্দির ও মূর্তি, (৪) হরষপুরের দুর্গ, হাম্মামখানা ও হাতির পুল, (৫) উলচাপাড়া মসজিদ ও (৬) ফান্দকের দোতলা মন্দির।



আরিফাইলের ভূমি-পরিকল্পনা

আরিফাইলের কীর্তিসমূহ[১]

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার অধীনে ও উপজেলা সদর থেকে প্রায় এক কিলোমিটার পশ্চিমে অপেক্ষাকৃত একটি নির্জন অথচ মনোরম পরিবেশে আরিফাইলের

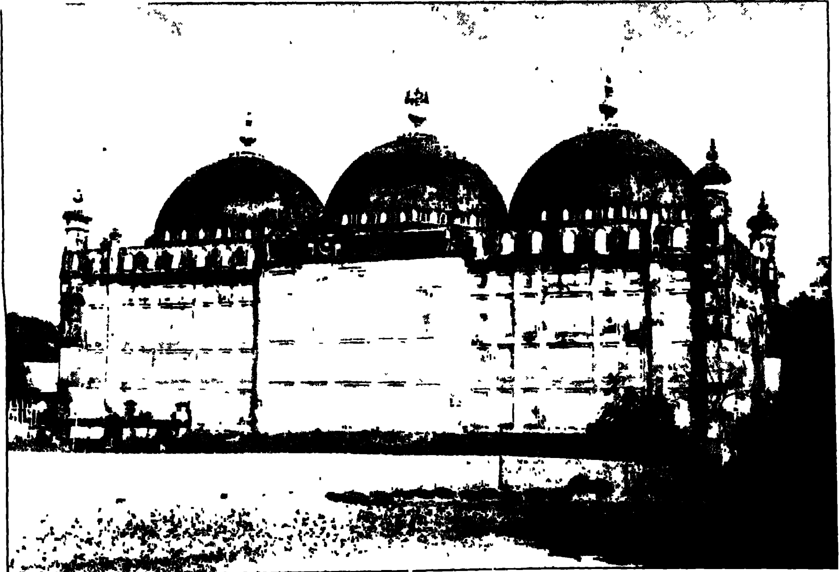
১. আমার অনুরোধে সরাইল-কুট্টাপাড়ার তরুণ ইঞ্জিনিয়ার জনাব জাহাঙ্গীর আজাদ আরিফাইলের কীর্তিগুলির পরিমিতি গ্রহণ করেন এবং এজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

কীর্তি সমূহ অবস্থিত। এগুলির মধ্যে আছে সাগরদিঘি ও মোঘল দিঘি নামক দুটি বড় বড় প্রাচীন জলাশয়, দুটি পাকা কবর, একটি বিরাট আকারের মসজিদ ও মসজিদের সামনে একটি সাহন। মসজিদের পিছনে একটি বড় আকারের কবরস্থান ও মসজিদের দক্ষিণে একটি বিচিত্র ধরনের সমাধিসৌধ। নিম্নে একটি স্ক্যাচ ম্যাপসহ কীর্তিগুলির মোটামুটি বর্ণনা তুলে ধরা হল।

সব ক'টা কীর্তি পনের একরেরও অধিক ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত

(ক) সাগরদিঘি ঃ আরিকাইলের কীর্তিগুলি সর্বোত্তরে এই প্রাচীন জলাশয় অবস্থিত। প্রায় বর্গাকারে গঠিত জলাশয়টি উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ লম্বা। সমগ্র জলাশয়ের আয়তন ৮.৪৮ (আট একর আটচল্লিশ শতাংশ) এবং এর পাড়গুলি বর্তমানে নেই। পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ে জনবসতি আছে। দক্ষিণ পাড়ের মাঝামাঝি স্থানে আছে একটি পাকা ঘাট।

(খ) পাকা ঘাটের কিঞ্চিৎ দক্ষিণ ও মসজিদের উত্তরে ছিল দুটি পাকা কবর। নূর আলী ও যোহর আলীর (নূরালি-জোরালি) কবর বলে পরিচিত এ দুটি পাকা সমাধিতে কারা শায়িত আছেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। এ সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তি থাকলেও কোনো সঠিক ইতিহাস নেই। পাকা কবরদুটির চারদিকে বর্তমানে (১৯৮৮ খ্রিঃ) বেষ্টক প্রাচীর দেখা গেলেও আগে তা ছিল না।



▲ আরিফাইল মসজিদ, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

(গ) আরিফাইলের মসজিদ নামে পরিচিত এটি একটি বিরাট প্রাচীন কীর্তি। এটি সুবৃহৎ সাগরদিঘি থেকে প্রায় ১৮.১৮ মিটার (প্রায় ৬০ ফুট) দক্ষিণে অবস্থিত। আয়তাকারে নির্মিত এই মসজিদের বাইরের দিকের আয়তন ২৫.১৫ মি × ১০.৩ মি

(৮৩´ × ৩৪´) এবং এর দেয়ালগুলি প্রায় ১.৬৬ মিঃ (৫´-৬´) প্রশস্ত। মসজিদের চারকোণে ৪টি অষ্টকোনাকারে নির্মিত মিনার আছে এবং এগুলি ছাদের অনেক উপরে উঠে ছোট গম্বুজে শেষ হয়েছে। এগুলির উভয় পার্শ্বেই একটি করে ক্ষুদ্রাকারের মিনার আছে। মসজিদের পুব দেয়ালে ৩টি বাঁকানোভাবে নির্মিত (arched) প্রবেশপথ আছে। এগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় দরজাটি অন্য দুটির চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড়। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালেও এ ধরনের দুটি প্রবেশপথ ছিল। সেগুলিকে পরবর্তীকালে কুলঙ্গিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে বলে দেখা যাচ্ছে। মসজিদের ভিতরের পশ্চিম দেয়ালে আছে তিনটি মিহরাব এবং কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অপর দুটি থেকে বড়।

মসজিদের অভ্যন্তর ভাগ তিন ভাগে (bay) বিভক্ত এবং প্রত্যেক ভাগের উপরেই আছে একটি করে গম্বুজ। গম্বুজগুলি কন্দাকারে (bulbous) নির্মিত এবং দেখতে বড় মনোরম। গম্বুজের পাদদেশে অলঙ্করণ আছে। মসজিদের প্যারাপেট সরলভাবে নির্মিত।

প্রাঙ্গণ ঃ মসজিদের সামনের (পুব) দিকে একটি পাকা চত্বর আছে। পশ্চিম দিক ছাড়া এটি অন্য তিন দিকে নিচু প্রাচীরদ্বারা পরিবেষ্টিত। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এই পাকা আঙ্গিনার আয়তন ২৬.০৬ মিটার × ১২.৮২ মিটার (৮৬ ×৪২ ৪´) এবং পূব দিকের বেষ্টক প্রাচীরের কেন্দ্রস্থলে একটি প্রবেশপথ আছে। এই পাকা অঙ্গনটি মসজিদ থেকে প্রায় .৯১ মিটার (প্রায় ৩ ফুট) বড়—এর প্রত্যেক দিক মসজিদ থেকে প্রত্যেক দিকের .৪৫ মিটার (১½´) বড়।

মসজিদে কোনো শিলালিপি বা অন্য কোনো সময় নির্দেশক দলিল নেই। তবে এটি আরিফাইলের মসজিদ নামে সুপরিচিত।

(ঘ) কবরস্থান ঃ মসজিদের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে বিশেষ করে পশ্চিম ও উত্তর দিকের উন্মুক্ত স্থানে আছে একটি কবরস্থান এবং সেখানে নতুন ও পুরাতন অনেক কবরের অস্তিত্ব দেখা যায়। যতদূর মনে হয় কবরস্থানটি বোধ হয় মসজিদ সৃষ্টির সময় থেকেই চলিত আছে।

সমাধিসৌধ ঃ আরিফাইলের মসজিদ থেকে ২৫.১৫ মিটার (৮৩) দক্ষিণে অবস্থিত এক গম্বুজের সমাধি সৌধটিতে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা—এ দু'জন অজানা ব্যক্তির সমাধি রয়েছে। প্রধান সমাধিসৌধটি বাইরের দিকে ৮.১৮ মিটার (২৭) বর্গাকারে নির্মিত এবং ইমারতের দেয়ালগুলি ১.৩৭ মিটার (৪-৬) প্রশস্ত। এই সমাধি সৌধের উত্তর ভাগে পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ ও ৭.২৭ মি × ৩.৪৮ মি. (২৪ × ১১.৫´) আয়তনের একটি ক্ষুদ্র দোচালা গৃহ সংযুক্ত আছে এবং এর দেয়ালগুলি প্রায় .৯ মি (প্রায় ৩) প্রশস্ত।

প্রকৃত সমাধিসৌধটিকে দোতলা ইমারত বলা যেতে পারে। ভল্টেড ছাদ দ্বারা নির্মিত এর নিচতলাটির উচ্চতা মাত্র ১.৮৫ মি. (৬)—এর দক্ষিণ দেয়ালে কোনো প্রবেশ পথ না থাকায় কক্ষটি কড়ই অন্ধকারময়। ভিতরে যে দুটি কবর আছে সেদুটি মাটিতে অবস্থিত এবং তা কোনোভাবে চিহ্নিত নয়।

সমাধিসৌধের উপর তলায় দক্ষিণ দেয়ালে একটি প্রবেশপথ ছিল। কিন্তু হাল আমলে তা গ্রিস দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বিধায় সেখান দিয়ে প্রবেশ করা আর সম্ভব নয়। দোচালা ঘরের দক্ষিণ দেয়ালে একটি প্রবেশপথ ছিল। কিন্তু তা গ্রিল দিয়ে বন্ধ করে দেওয়ার ফলে সেখান দিয়ে সমাধিসৌধে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। সেখানে প্রবেশের একমাত্র পথ আছে দোচালা কক্ষের পুব দেয়ালে যে প্রবেশ পথটি আছে তা দিয়ে। এক প্রস্ত সিঁড়ি অতিক্রম করার পর এ প্রবেশপথ দ্বারা দোচালা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করা যায় এবং সেই ঘরেরও আয়তন ৫.১৫ মি ×২.৫ মি (১৭´ × ৮´ – ৩´´) এবং তা পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা।

সমাধিসৌধ ও দোচালাঘরের সংযোগ-দেয়ালে তিনটি প্রবেশপথ আছে—কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি অন্য দুটির চেয়ে অধিক প্রশস্ত। এই প্রবেশপথ তিনটি দিয়ে সমাধি সৌধের দ্বিতীয় তলায় প্রবেশ করা যায় এবং তার পরিধি প্রত্যেক দিকে ৫.১৫ মিটার (১৭´)। এই কক্ষে পাশাপাশি অবস্থানরত দুটি পাকা সমাধি আছে। এ দুটি কৃত্রিম সমাধি তিনটি স্তবকে (step) নির্মিত। পশ্চিমদিকের কবরটি উচ্চতম অংশে অর্ধবৃত্তাকারের অংশবিশেষ দেখে এটিকে একজন পুরুষের এবং অপরটির সমতল উঁচু অংশ দেখে বোঝা যায় যে, এটি একজন মহিলার।

প্রধান সমাধিসৌধের চারকোণে চারটি অষ্টকোণাকারে নির্মিত মিনার (টারেট) আছে। ইমারতেরা উপরে আছে একটিমাত্র গম্বুজ এবং তা কন্দাকারে নির্মিত (bulbous)। গম্বুজের পাদদেশের অলঙ্করণ ও উপরের ফিনিয়েল (finial) খুবই মনোরম। সমাধিসৌধের দেয়ালের বাইরের দিকে সুন্দর প্যানেলিং-এর অলঙ্করণ ছিল। সেগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেলে ১৯৯২ সালে প্রত্নতত্ত্ব দফতরের সৌজন্যে সংস্কার করার ফলে তা আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এই সমাধিসৌধটি এখন প্রত্নতত্ত্ব দফতর কর্তৃক সংরক্ষিত করা হয়েছে।

সমাধিসৌধের সঙ্গে সংযুক্ত দোচালা ঘরটির অবস্থান বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। এটি বেশ একটি নিচু ধরনের ইমারত এবং সমাধিসৌধের ছাদ থেকে এটির উচ্চতা অনেক কম। আপাতত সমাধিসৌধে প্রবেশের জন্যই এর প্রয়োজনীয়তা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কেন এমন ধরনের একটি প্রবেশপথের জন্য ইমারতটি নির্মিত হয়েছিল তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

উপসংহার ঃ উপরে উল্লিখিত কীর্তিগুলির কোনোটিতেই যে কোনো লিপি বা পরিচয় প্রদানকারী অন্যকোনো দলিল নেই সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য স্থানীয় জনশ্রুতি অনেক আছে কিন্তু সেগুলি দ্বারা আমরা কোনো গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি না। ইমারতগুলির নির্মাণকৌশল এবং সেগুলিতে ব্যবহৃত মাল-মসলা দেখে সহজেই ধারণা করা যায় যে, এগুলি মোঘল আমলের কীর্তি।

সরাইলের সুপ্রসিদ্ধ দিওয়ান পরিবারের আবির্ভাব ঘটে খুব সম্ভব ঈসা খাঁ মসন্দ-ই-আলী (মৃত্যু ১৫৯৯ খ্রিঃ) যখন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ষোড়শশতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। দিওয়ান পরিবারের প্রথম ব্যক্তি ছিলেন খুব সম্ভব দিওয়ান মজলিশ গাজী। তাঁর পুত্র ছিলেন দিওয়ান মজলিশ শাহ্‌বাজ ও পৌত্র ছিলেন দিওয়ান নূর মোহাম্মদ।

শেষোক্ত ব্যক্তির পুত্র ছিলেন দিওয়ান নাসির মোহাম্মদ। তিনি হরষপুরে প্রাসাদ, দুর্গ ও হাম্মামখানা নির্মাণ করেছিলেন (হরষপুর দ্রঃ)। তাঁর পিতাও ছিলেন একজন বড় ধরনের নির্মাতা। তিনি ভাদুঘর মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। (ভাদুঘর দ্রঃ)।

আরিফাইলের কীর্তিগুলির পিছনে প্রচুর অর্থব্যয় করা হয়েছিল এবং কোনো রাজা বা বড় ধরনের জমিদার ছাড়া এসব কীর্তি কোনো সাধারণ লোকদ্বারা নির্মিত হওয়ার সম্ভাবনা যে ছিল না তা বলাই বাহুল্য। কোনো মোঘল সুবাদার যে সরাইলের আধাস্বাধীন দিওয়ানের রাজধানীতে কোনো ইমারত নির্মাণ করেন নি তা সহজেই বোধগম্য। সেক্ষেত্রে কোনো দিওয়ানই এগুলি নির্মাণ করেছিলেন বলে ধারণা হয় এবং দিওয়ান নূর মোহাম্মদ, তার পুত্র নাসির মোহাম্মদকে অথবা তাদের পূর্বসূরিদেরকে এ তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়ত যায় না। থুক সম্ভবত দিওয়ান পরিবারেরই কোনো দিওয়ান এ কীর্তি স্থাপন করেছিলেন।

সরাইল হাটকুল মসজিদ

অন্তত ষোড়শ শতাব্দী থেকে একটি প্রসিদ্ধ প্রশাসনিককেন্দ্র হিসাবে সরাইলের পরিচিতি। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার একটি উল্লেখযোগ্য উপজেলা হিসাবে সরাইল পরিচিত এবং জেলা সদর থেকে প্রায় ১১ কিলোমিটার উত্তরে তা অবস্থিত। ষোড়শ শতাব্দী থেকেই এ স্থান সরাইলের বিখ্যাত দিওয়ান পরিবারের ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত। এখানে সপ্তদশ শতাব্দীর একটি মনোরম মসজিদ আছে। এবং তা সরাইল বাজারের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত অবস্থিত বলে পূর্বে আটকুল এবং বর্তমান কালে হাটকুল মসজিদ নামে পরিচিত।

উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এই আয়তাকারে নির্মিত মসজিদের ভিতরের দিকের আয়তন ১৩.৬৩ মি ×৪.৩৯ মি (৪৫´ × ১৫$\frac{১}{২}$´) এবং দেয়ালগুলি ১.৩৬ মি (৪´-৬´) প্রশস্ত। চারকোণের অষ্টকোণাকৃতির মিনার (টারেট) ছাদের অনেক উপরে উঠে ক্ষুদ্র গম্বুজে শেষ হয়েছে। টারেটগুলির দু'পাশে আছে সরু মিনার এবং সেগুলিও ছাদের অনেক উপরে উঠে গেছে।

মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ৩ টি বাঁকানোভাবে নির্মিত (arched) প্রবেশপথ আছে এবং কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি অন্য দুটির চেয়ে অধিক উঁচু ও প্রশস্ত। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালেও একটি করে প্রবেশপথ আছে। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের দু'পাশে সরু মিনার আছে। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে তিনটি মিহরাব, কেন্দ্রয়ি মিহরাবটি অন্য দুটির চেয়ে অধিক বৃহৎ। মসজিদের উঁচু প্যারাপেট সরলভাবে নির্মিত এবং তাতে ব্যাটল সেটের অলঙ্করণ আছে। মসজিদের ছাদের উপরে আছে ৩ টি মনোরম গম্বুজ। গম্বুজগুলি কন্দাকারে নির্মিত (bulbous)।

মসজিদের সম্মুখবাগ (facade) বৃহৎ প্যানেলিং দ্বারা অলঙ্কৃত এবং তাতে কুলঙ্গি আছে। দু'পাশের দেয়াল ও কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উপরে অনেক কুলঙ্গির অলঙ্করণ দেখা যায়। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের বাইরের দিকেও যথেষ্ট অলঙ্করণ দেখা যায়।

মসজিদের গায়ে কোনো শিলালিপি নেই। সরাইলের তৃতীয় দিওয়ান নূর মোহাম্মদের স্মৃতিকে রক্ষা করার জন্য তাঁর স্ত্রী বেগম আরফনিন্নিসা ১০৭৩ হিজরী (১৫৬২ -৬৩ খ্রিঃ) সনে এ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু ত্রিপুরা জেলার প্রথম গেনেটিয়ারে মিঃ ওয়েবস্টার বলেন যে, মসজিদটি ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল দিওয়ান নূরমোহাম্মদের স্মরণে।[১] দিওয়ান নূর মোহাম্মদ ছিলেন সরাইলে দ্বিতীয় দিওয়াল মজলিশ শাহবাজের পুত্র এবং দিওয়ান মজলিশ গাযীর পৌত্র।

মসজিদে হাল আমলে অনেক সংস্কারকার্য করা হলেও এর আদি রূপটি অনেকাংশে এখনও টিকে আছে।

ভাদুঘর মসজিদ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কোতোয়ালি উপজেলার অন্তর্গত ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া টাউনহল থেকে মাত্র দেড় কিলোমিটার দক্ষিণ-পুবে ও রেললাইনের সামান্য পুবদিকে ভাদুঘর মসজিদ অবস্থিত। মোটামুটি একটি বড় ধরনের মাঠের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এবং একটি মাঝারি আকারের পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে মসজিদটি অবস্থিত। ময়দানের পুব ও উত্তর পাশে আছে বেশ বড় ধরনের একটি মাদ্রাসা এবং তা মসজিদ প্রতিষ্ঠানের অঙ্গ বলেই মনে হয়।

বর্গাকারে নির্মিত এক গম্বুজের এই প্রাচীন মসজিদের দেয়ালের বাইরের দিকের দৈর্ঘ্য ছিল ৭.২৭ মি. (২৪)। মসজিদের চারকোণে ৪ টি অষ্ট কোনাকারে নির্মিত মিনার বা টারেট ছিল এবং এগুলি ছিল বৃহদাকারের। মসজিদের পুব দেয়ালে তিনটি প্রবেশপথ আছে এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে আছে একটি করে প্রবেশপথ। মসজিদের ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে তিনটি মিহরাব। মিহরাবগুলি এক সময়ে মনোরম ভাবে অলঙ্কৃত ছিল কিন্তু অত্যধিক সংস্কারকার্য ও পলেস্তারা প্রয়োগের ফলে অলঙ্করণ অনেকটা স্তিমিত হয়ে গেছে। মসজিদের সামনের দিকে একটি বারান্দার সংযোজন করার ফলে মসজিদের আদি সৌন্দর্য অনেকটা ব্যাহত হয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মসজিদের ছাদের উপরে একটি মাত্র গম্বুজ আছে। বিরাট আকারের গম্বুজটি অনেকটা কন্দাকারের হলেও সুলতানি আমলের অর্ধবতৃত্তাকারের গম্বুজের কিছুটা প্রভাব এর মধ্যে পড়েছে।

মসজিদে সাদাসিধাও আনাড়ি হাতে করা একটি শিলালিপি আছে। আমরা সেই শিলালিপি ফটোগ্রাফ অথবা কোনো প্রতিলিপি গ্রহণ করতে পারিনি। বেশ উপরে স্থাপিত ফারসি ভাষায় লিপিবদ্ধ শিলালিপিটির কিছু অংশের পাঠোদ্ধার করতে আমরা সমর্থ হই অতি কষ্টে এবং তা থেকে আমরা পরিষ্কারভাবে আমরা জানতে পারি যে, মজলিশ শাহবাজের পুত্র [জনৈক] নূর মোহাম্মদ ১০৬৮ হিজরী (১৬৫৭-৫৮ খ্রিঃ) সনে সম্রাট আলমগীরের রাজত্বকালে এ মসজিদ নির্মাণ করেন। এ তথ্য থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যাচ্ছে যে, সরাইলের সুবিখ্যাত জমিদার পরিবার তখন (১৬৫৭-৫৮ খ্রিঃ) পর্যন্ত দিওয়ান উপাধি ব্যবহার করতেন না।

---

১. MR. G. E Webster : Eastearn Bengal District gazetteer : Tippera. P. 115.

এদেশের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, বর্তমানে (২০০০ খ্রিঃ) ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার শাসনাধীনস্থ এ স্থান তখন ৩০৬ বর্গমাইল আয়তনের বিরাট সরাইলের পরগনার অধীনে ছিল এবং পাঠান আমল থেকে সরাইলের সুপ্রসিদ্ধ দিওয়ান পরিবার প্রায় অর্ধস্বাধীনভাবে এ পরগনার অধিকারী ছিলেন এবং সেই অধিকার ব্রিটিশ আমলের মাঝামাঝি সময় পর্যন্তটিকে ছিল। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র সিংহ রচিত 'রাজমালা' গ্রন্থ ও আ. কা. মো যাকারিয়া (বর্তমান গ্রন্থকার) কর্তৃক রচিত 'কুমিল্লা জেলার ইতিহাস' গ্রন্থ ও অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, দিওয়ান মজলিশ গাযী ছিলেন এই দিওয়ান বংশের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর পুত্র দিওয়ান মজলিশ শাহ্‌বাজ ছিলেন দ্বিতীয় দিওয়ান এবং তাঁর পুত্র দিওয়ান নূর মোহাম্মদ ছিলেন সরাইলের তৃতীয় দিওয়ান। বিশ্বস্ত সূত্রে আরও জানা যায় যে, দিওয়ান নূরমোহাম্মদের স্ত্রী বেগম আরফানিন্নিসা সপ্তদশ শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষদিকে সরাইলের সুবিখ্যাত হাটকুল মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন (সরাইল হাটকুল মসজিদ দ্রঃ) তাঁর স্বামী মৃত্যুর পর।

ভাদুঘর ছিল প্রখ্যাত ও প্রবল প্রতাপান্বিত সরাইল দিওয়ান পরিবারের জমিদারির অন্তর্গত। যদিও শিলালিপিতে দিওয়ান উপাধির উল্লেখ নেই এই ভাদুঘর মসজিদ যে দিওয়ান নূর মোহাম্মদ কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এটি শাহী মসজিদ হিসাবে স্থানীয়ভাবে অধিক পরিচিত।

মেড্ডার কালভৈরবের মন্দির

ব্রাহ্মণ বাড়িয়া শহরের উত্তরাংশে মেড্ডার কালভৈরবী মন্দির ও বিরাটকায় কালভৈরাব মূর্তি একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি বলে পরিচিত ছিল। ১৯৭১ সালের হানাদার পাক বাহিনী মূর্তিটি ভেসে টুক্‌রা টুক্‌রা করে ফেলে এবং মন্দিরটির ধ্বংসসাধন করে। যুদ্ধের পরে স্থানীয় হিন্দুরা মন্দিরটির সংস্কার করে সেখানে মাটির তৈরি একটি নতুন মূর্তি স্থাপন করেন। অতি বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে যে, আদি মন্দির নির্মাণ কালে সরাইলের তৃতীয় দিওয়ান নূর মোহাম্মদ সাহেব মন্দির নির্মাণের জন্য প্রচুর ভূমি দান করেছিলেন।

হরষপুরের দুর্গ, প্রাসাদ ও হাম্মাম খানা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত ও জেলা সদর থেকে ১৬ কিলোমিটার পুবে ও সরাইল উপজেলার অধীনে এবং সেখান থেকে ১৫ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণে হরষপুর অবস্থিত।

দিওয়ান পরিবারের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, দিওয়ান নূর মোহাম্মদের একমাত্র পুত্র নাসির মোহাম্মদ ছিলেন পরিবারের চতুর্থ দিওয়ান। তিনি একটি ক্ষুদ্র নদীর তীরে ২৯ বিঘা ভূমির উপরে একটি দুর্গ, একটি প্রাসাদ ও এটি হাম্মামখানা নির্মাণ করেন। স্থানটি ছিল স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানার বেশ নিকটবর্তী। দিওয়ান নাসির মোহাম্মদের নামানুসারে এ স্থানের নাম রাখা হয় নাসিরাবাদ। পরবর্তীকালে এ স্থানের নাম হয় নিদারাবাদ এবং স্থানীয় রেলস্টেশনটিও নিদারাবাদ নামে পরিচিত। কিন্তু এ স্থান হরষপুর নামেই অধিক পরিচিত।

দিওয়ান নাসির মোহাম্মদ এ স্থানের নির্মাতা হলেও পরিবারের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, তিনি সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেননি যদিও এটিকে তিনি তাঁর শিকারের ক্যাম্প হিসাবে হয়ত ব্যবহার করতেন। দিওয়ান নাসির মোহাম্মদের প্রপৌত্র দিওয়ান বখ্‌শ আলীর সময় থেকে হরষপুর দিওয়ান পরিবারের স্থায়ী বাসভবনে পরিণত হয়।

'চল্লিশ কোষা' জমিদারি নামে পরিচিত সরাইল জমিদারি তখন দু'ভাগে বিভক্ত হয়। জমিদারির হরষপুর শাখা 'সতের কোষা' অংশের অধিকারী হয় এবং অবশিষ্ট 'তেইশ কোষা' জমিদারির অধিকারী হয় সরাইলে বসবাসকারী শাখা। ব্রিটিশ আমলে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কাসিমবাজারের এক হিন্দু পরিবার ছলচাতুরির মাধ্যমে সরাইল পরগনার সমগ্র জমিদারির অধিকারী হন এবং জমিদারি হারিয়ে সরাইলের জমিদারগণ অকথ্য দুর্দশায় পতিত হন। যদিও হরষপুর শাখার দিওয়ানগণ ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে তাঁদের অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি সাধনে সমর্থ হয়েচেন সরাইল শাখার দিওয়ানদের অবস্থা এখনও খুবই শোচনীয়।

হরষপুর শাখার একটি অংশ বর্তমান কালে হরষপুরেই বসবাসরত। দিওয়ান নাসির মোহাম্মদ কর্তন ২৯ বিঘা ভূমিতে নির্মিত দুর্গের চারদিকে বেষ্টক প্রাচীর ও প্রাচীরের বাইরের জলভর্তি পরিখা ছিল। দুর্গের এক পাশ দিয়েই বয়ে যেত একটি ছোট নদী। দূর্গের প্রাচীর এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত, জলতরা পরিখাগুলি এখন মজে গেছে। প্রাসাদ ও হাম্মামখানা অনেকটা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও প্রাসাদের কয়েকটি জীর্ণ কক্ষ ও হাম্মামখানার কয়েকটি কক্ষ ও কূপটি অতীত গৌরবের সাক্ষ্য নীরবে বহন করছে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মুসলিম (মোঘল) আমলে সমগ্র বাংলাদেশে যে সাতটি হাম্মামখানা (রাজসিক গোসল খানা যেখানে গরম ও ঠাণ্ডাখানি গোসলের সময় পাইপের সাহায্যে সরবরাহ করার ব্যবস্থা ছিল) ছিল, সেগুলির মধ্যে হরষপুরের হাম্মামখানা ছিল অন্যতম। বাকিগুলি ছিল (১) লালবাগ দুর্গের হাম্মামখানা, (২) জিঞ্জিরা দুর্গের হাম্মামখানা, (৩) যশোহর জেলার কেশবপুর থানার মীর্যানগরের হাম্মামখানা, (৪) সাতক্ষীরা জেলার জাহাজঘাটা হাম্মামখানা, (৫) একই জেলার ধূমঘাটের হাম্মাম খানা ও (৬) চাঁপাই-নবাবগঞ্জ জেলার তাহখানার হাম্মামখানা।

খৈলাসচন্দ্র সিংহ রচিত 'রাজমালা' গ্রন্থে একটি কাল্পনিক ও অবিশ্বাস্য কাহিনী আছে যে, ত্রিপুরার রাজা দ্বিতীয় ধর্ম্মমাণিক্য নাকি দিওয়ান নাসির মাহমুদকে হরষপুরের প্রাসাদ, হাম্মামখানা ইত্যাদি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। দিওয়ান নাসির মোহাম্মদ ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর ষাটের দশকের লোক আর ত্রিপুরার রাজা দ্বিতীয় ধর্ম্মমানিক্য সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে। অতএব একাহিনী আদৌ বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না।

হাতির পুল

কুমিল্লা-শ্রীহট্ট (সিলেট) রাজপথের দক্ষিণ সরাইল উপজেলার অধীনস্থ বারিউরা বাজার থেকে আনুমানিক ১০০ মিটার দূরে ইষ্টক নির্মিত একটি প্রাচীন পাকা সেতু বিদ্যমান।

সরাইলের প্রখ্যাত দিওয়ান পরিবারের দ্বিতীয় দিওয়ান মজলিস শাহবাজ বর্তমান শাহবাজপুর নামক একটি গ্রাম নিজ নামে প্রতিষ্ঠা করে সেখানে একটি কাচারি স্থাপন করেন এবং সরাইল থেকে শাহবাজপুর পর্যন্ত একটি সড়ক নির্মাণ করেন। সরাইল শহরের নিকটবর্তী কুট্টাপাড়ার মোড় থেকে শাহ্‌বাজপুর পর্যন্ত রাস্তাটি পরিত্যক্ত অবস্থায় এখনও টিকে আছে। স্থানীয় ভাষায় এটি জাঙ্গাল নামে পরিচিত।

পরবর্তীকালে দিওয়ান মজলিস শাহ্‌বাজের পৌত্র ও দিওয়ান নূর মোহাম্মদের পুত্র এবং সরাইলের চতুর্থ দিওয়ান নাসির মোহাম্মদ হরষপুরে প্রাসাদ, দূর্গ, হাম্মামখানা ইত্যাদি নির্মাণ করেন। শাাহবাজপুর থেকে হরষপুর থেকে হরষপুর যাওয়ার পথে পড়ত একটি ছোট নদী। সেই নদীর উপর একটি পুল নির্মাণ করেছিলেন দিওয়ানরা। সেটিই হাতির পুল নামে পরিচিত। কেউ কেউ বলেন, সেতুটি ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে নির্মিত হয়েছিল।

কিন্তু দিওয়ান নূর মোহাম্মদের পুত্র দিওয়ান নাসির মোহাম্মদ ছিলেন আরও কিছু কাল পরের লোক। এই সেতু নির্মাণের সঙ্গে দিওয়ান নাসির মোহাম্মদের যদি কোনো সম্পর্ক থাকে তবে হাতির পুরটি ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দের বেশ কিছু কাল পরে নির্মিত হয়েছিল।

বেশ মজবুতভাবে নির্মিত সেতুর গায়ে বেশ কারুকার্য ছিল বলে জানা যায়। সংস্কারের অভাবে সেতুটি বেশ জীর্ণ হয়ে পড়েছিল। হাল আমলে বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর সেতুটির দায়িত্বগ্রহণ করে সেটিকে তাদের হেফাযতে নিয়ে এটিকে রক্ষণাবেক্ষণ করছে।

উলচাপাড়া মসজিদ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানার অধীনে ও জেলা সদর থেকে কয়েক কিলোমিটার দক্ষিণে উলচাপাড়া গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিল দেখা যায়। মসজিদটি একখন্ড উঁচু ভূমিতে নির্মিত। মসজিদের সামনে আছে একটি প্রাঙ্গণ। উন্মুক প্রাঙ্গনের চারদিকে আছে নিচু বেষ্টক প্রাচীর ও বেষ্টক প্রাচীরের পুব দিকে একটি ছোট তোরণ। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের দক্ষিণে অবস্থিত মাঝারি আয়তনের সুন্দর পুকুর সৃষ্টি করেছে মনোরম পরিবেশ।

উত্তর-দক্ষিণে লম্বা মসজিদের বাইরের দিকের আয়তন ১২.৭২ মি. × ৬.৬৬ মি (৪২´ × ২২´) এবং দেয়ালগুলি প্রায় ১.২১ (প্রায় ৪´) প্রশস্ত। মসজিদের পূব দেয়ালে আছে তিনটি প্রবেশপথ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে আছে একটি করে প্রবেশপথ। মসজিদের চারকোণে চারটি টারেট আছে এবং অষ্টকোণাকারের এসব টারেট প্যারাপেটের উপরে উঠে ছোট গম্বুজে শেষ হয়েছে। মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি বাইরের দিক প্রসারিত এবং এর দু'দিকে আছে একটি করে সরু মিনার। মসজিদের ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে তিনটি মিহরাব, কেন্দ্রীয় মিহরাব অন্য দুটির চেয়ে আকারে বড়।

মসজিদের ভিতরের অংশ তিন ভাগে (bays) বিভক্ত এবং প্রত্যেক অংশের উপরে আছে একটি করে মোট তিনটি গম্বুজ। গম্বুজগুলি মোঘল আমলের গম্বুজের মতো

কন্দাকারে নির্মিত। মসজিদের সামনের (পুব দিকের) দেয়াল মনোরম প্যানেলিং দ্বারা অলঙ্কৃত।

মসজিদে একটি শিলালিপি আছে। মসজিদের নির্মাণ কৌশল এবং মসজিদ ব্যবহৃত ইট দেখে মনে হয় যে, মসজিদটি খুব সম্ভব সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল।

শিলালিপির পাঠ থেকে জানা যায় যে, ১১৪০ হিজরী (১৭২৭-২৮ খ্রিঃ) সনে জনৈক পশ্চিম দেশীয় বণিক কর্তৃক মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল।

কেল্লা শহীদ বা গেসুদরাজের মাযার

অনেক অনেক দিন আগের কথা। শেষরাতে জেলেরা জাল ফেলেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়ার নিকটবর্তী এক নদীতে। জাল নাকি অসম্ভব ভারী ঠেকছে বলে তারা জাল টেনে তুলতে পারছেন না। অনেক চেষ্টার পর তারা যখন জাল টেনে তুলতে সমর্থ হয়েছেন তখন ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। সেই আলোতে হতবাক জেলেরা নাকি দেখছেন, মাছ নয়, জালে উঠছে এক দেহহীন কাটা মুন্ডু (আর সেই কাটা মুন্ডু নাকি পরিস্কার ভাষায় তাদেরকে বলছেন, ওরে তোরা ভয় পাসনে, কাছেই তোরা আমাকে সমাহিত কর আর তোরা আমার কাছে ইসলাম গ্রহণ কর)।

হতবাক জেলেরা নাকি তা-ই করলেন। কালক্রমে সেখানে গড়ে উঠল এক দরগা। আর নব ধর্ম গ্রহণকারী জেলেদের উপাধি হল 'খাদিম'। সেই খাদিমদের বংশধরেরা আজও আছেন। তাঁরা এখনও সে কাজে নিযুক্ত থাকলেও তাঁদের অনেকেই সমাজের অতি উঁচু স্তরেও প্রতিষ্ঠিত আছেন।

সেখানে একটি দরগা এখনও বিদ্যমান এবং প্রতি বছর শ্রাবণ মাসের কোনো এক নির্দিষ্ট দিনে সেখানে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয় তাদের মানত হাসিলের অভিলাষ নিয়ে। শুধু বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার নয়, আশে পাশের অন্যান্য জেলা থেকেও বহু ভক্তের সমাগম হয় সেখানে।

যে দরগাটি এখন সেখানে আছে সংস্কারের নব নব প্রলেপ পরার কারণে তা এখন একটি সম্পূর্ণ নতুন ইমারতের রূপ লাভ করেছে। আদি দরগার রূপটি কি ছিল তা বলার সাধ্য আমাদের নেই।

এখানে যান যে কাটামুন্ড শায়িত আছেন তাঁর নাম নাকি হজরত গেসু দরাজ। কিন্তু তিনি কেল্লা শহীদ নামেই অধিক পরিচিত। তাঁর প্রকৃত নাম ও পরিচয় কী এবং কবে ও কী কারণে তাঁর আগমণ এখানে ঘটেছিল সে সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে পারেন না। তবে পণ্ডিতদের অনুমান এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে কোনো এক ধর্মযুদ্ধে তিনি হয়ত শহীদ হয়েছিলেন এবং তাঁরা কাটা মুন্ডের আবির্ভাব এখানে ঘটেছিল জলের স্রোতে ভেসে আসার কারণে। তবে সে ঘটনা কবে ঘটেছিল সে কথা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারেন না।

কুমিল্লা জেলা

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ

লালমাই-ময়নামতির কীর্তি

কুমিল্লা শহর থেকে প্রায় ৭ কিলোমিটার পশ্চিমে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা যে সরু ও অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণী আছে, তাকে লালমাই-ময়নামতি পাহাড় বলা হয়ে থাকে। এই পাহাড় শ্রেণীর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৭.৬০ কিলোমিটার এবং আধ কিলোমিটার থেকে প্রায় আড়াই কিলোমিটার পর্যন্ত এর প্রশস্ততা। উত্তরদিকের শেষ সীমানা রানীর বাঙলার পাহাড় আর দক্ষিণ দিকে এটি চণ্ডীমুড়াতে শেষ হয়েছে। কুমিল্লা-ঢাকা মহাসড়ক এই পাহাড়কে কেটে বের হয়ে গেছে। সড়কের দক্ষিণদিকের কিছু অংশ ও উত্তর দিকের সমুদয় অংশ নিয়ে ময়নামতি পাহাড় এবং ময়নামতি পাহাড়ের দক্ষিণ সীমানা থেকে চণ্ডীমুড়া পর্যন্ত বাকি অংশের নাম লালমাই।

লালমাটিতে গঠিত এই পাহাড় শ্রেণীর প্রাকৃতিক শোভা অত্যন্ত মনোরম। পাহাড়ের সর্বত্র অসংখ্য ছোটবড় বৃক্ষরাজির অবস্থান স্নিগ্ধ শ্যামল শোভার সৃষ্টি করেছে। প্রায় ১৫.১৫ মিটার উঁচু এই পাহাড় শ্রেণীর উপরিভাগ প্রায় সমতল। মাঝে মাঝে কয়েকটি টিলা প্রায় ৩০.৩০ মিটার উঁচুতে উঠে গেছে। সম্প্রতি ময়নামতি পাহাড় ও লালমাই পাহাড়ের কিছু অংশ নিয়ে একটি সেনানিবাস গড়ে উঠেছে।

এই পাহাড়শ্রেণীর সৃষ্টি নিয়ে একটি মুখরোচক কাহিনী কুমিল্লা অঞ্চলে শোনা যায়। বহুকাল আগের কথা। লঙ্কার রাজা রাবণ সীতাকে হরণ করে নিলে রাম-রাবণে যুদ্ধ বাঁধে। যুদ্ধে রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ শক্তিশেলের আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হলেন। কবিরাজের নির্দেশ, যদি পরদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে ক্ষতস্থানে বিশল্যকরণী পাতার রস প্রয়োগ না করা যায়, তবে লক্ষ্মণকে বাঁচিয়ে রাখা যাবেনা। বিশল্যকরণীগাছ আছে একমাত্র হিমালয় পর্বতে এবং সেস্থান লঙ্কাদ্বীপ থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

রামভক্ত পবননন্দন হনুমান তাতে দমলেন না। তিনি বায়ুভরে উড়ে চললেন হিমালয় পর্বতে। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হয়ে সে গাছ তিনি চিনতে পারলেন না। অগত্যা যে-গন্ধমাদন পর্বতে বিশল্যকরণী গাছ ছিল, সেই গোটা পর্বতটাকে মাথায় করে নিয়ে হনুমান ফিরে এলেন লঙ্কাদ্বীপে। ঔষধ পেয়ে লক্ষ্মণ নিরাময় হলেন।

এবার গন্ধমাদন পর্বতকে যথাস্থানে রেখে আসার পালা। হনুমান পর্বত মাথায় করে আবার চললেন হিমালয় পর্বতে। কুমিল্লা শহরের কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত লম্‌লম্ সাগরের উপর দিয়ে চলার সময় সাগরের মনোরম শোভা দেখতে দেখতে তিনি কিছুটা

আনমনা হয়ে পড়লেন। আর যায় কোথায়! পর্বতের ছোট একটি অংশ বিচ্যুত হয়ে গেল এবং আবর্তিত হতে হতে তা পড়ে গেল লমলম সাগরের একপ্রান্তে। নাম হল লালমাই পাহাড়। এই গল্পের সমর্থনে স্থানীয় লোকেরা পাহাড়ের নিচে যে মরা নদীর খাত আছে, তাকে লম্‌লম্‌ সাগর বলে অভিহিত করে থাকেন।

লালমাই-ময়নামতি পাহাড় নিয়ে আরও অনেক মুখরোচক গল্প আছে। এগুলির মধ্যে আর একটি হল নিম্নরূপ : অনেক কাল আগে এখানে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ছিলেন দুই কন্যা। একজনের নাম লালমতি ও অপর জনের নাম ময়নামতি। লালমতির নামানুসারে একটি পাহাড়ের নাম হয় লালমাই এবং ময়নামতির নামে অপর পাহাড়ের নাম হয় ময়নামতি পাহাড়।

ময়নামতি সাধন-ভজনে লিপ্ত হয়ে চিরকুমারী থাকবেন বলে মনস্থির করেন। কিন্তু এক 'দেও' (দৈত্য) এসে তাঁকে বলপূর্বক বিয়ে করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে সুচতুরা ময়না দেওয়ের সঙ্গে এক চাতুরি করেন। তিনি দেওকে বললেন যে, সে নিজে যদি একরাতের মধ্যে মোরগ ডাকার আগে 'একমাইল' লম্বা ও চওড়া একটি দিঘি খনন করে দিতে পারে তবে তিনি দেওকে বিয়ে করবেন। আর দেও যদি তা না করতে পারে তবে তাকে চিরদিনের জন্য এস্থান ত্যাগ করে চলে যেতে হবে এবং ময়নার সঙ্গে তার বিয়ের কথাও আর মুখে আনতে পারবে না। দেও হাসিমুখে এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে দিঘি খনন করতে লাগল। আড়াই প্রহর রাতের মধ্যে সে দিঘি খনন প্রায় শেষ করে তিন পাড় বেঁধে ফেলল। আর একপাড় বাঁধার কাজ মাত্র বাকি। ময়না ভীতা হয়ে পড়লেন। যোগসাধনের ফলে তিনি মোরগের রূপ ধারণ করে ছলনা করে মোরগের ডাক ডাকতে শুরু করলেন। বোকা দৈত্য বুঝল, সত্যই সত্যই বুঝি মোরগ ডেকেছে। শর্তভঙ্গ হয়েছে দেখে সে কাজ অসমাপ্ত রেখে চিরদিনের মতো এস্থান ত্যাগ করে চলে গেল। কিন্তু ছলনা করে দৈত্যকে ঠকাবার ফলে অসমাপ্ত দিঘির বাকি পাড়টি আর কেউ নাকি বাঁধতে পারেননি। এ দিঘির নাম দেবদিঘি। খুব সম্ভব দেববংশীয় কোনো নৃপতি এ দিঘি খনন করেছিলেন। দিঘির যে-পাড়টি নেই, তা খুব সম্ভব নদীর ভাঙ্গনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

এ সব কাহিনী ও এ ধরনের অন্যান্য কাহিনী যে নিছক গাঁজাখুরী গল্প, তাতে সন্দেহ নেই। ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, লালমাই-ময়নামতি পাহাড় শ্রেণীর বয়স লক্ষ লক্ষ বছর। লক্ষ লক্ষ বছরের অশ্মীভূত কাঠ পাওয়া গেছে এই পাহাড়ের মধ্যে, আর পাওয়া গেছে নব্যপ্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্র (implements of Neolithic age)। খুব সম্ভব লালমাটিতে গঠিত বলে এ স্থানের নাম লালমাই হয়েছে। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর সমতটের রাজা শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ (শ্রীহট্ট জেলার) তাম্রলিপিতে যে 'লালিম্ব' পাহাড়ের কথা বলা হয়েছে, সেটিই খুব সম্ভব আলোচ্য লালমাই পাহাড়। ময়নামতি পাহাড়ের নামকরণ নিয়ে নানারকম গল্প আছে। কিন্তু নির্ভরযোগ্য কোনো ইতিহাস নেই। সেগুলির মধ্যে গোপীচন্দ্র-ময়নামতির কাহিনী একটি। এর পিছনেও কোনো নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক উপাদান নেই। ময়নামতি নামকরণ খুব সম্ভব অনেক অনেক পরবর্তীকালের।

লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ ও ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন আছে। স্থানীয় অধিবাসীদের মতে এ স্থানে ঊনশত (অর্থাৎ ৯৯ জন) রাজার

রাজধানী ছিল। ঊনশত রাজার কথা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে এ পর্যন্ত এ স্থানের যে-ইতিহাস উদ্ধার করা হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, কমপক্ষে ৬টি রাজবংশের প্রায় ৩০ জন নৃপতি এখানে রাজত্ব করে গেছেন। ব্যাপক উৎখনন কার্য চালানোর পর আরও নতুন তথ্যাদি পাওয়া গেলে জনপ্রবাদ সত্য হয়েও যেতে পারে।

লালমাই-ময়নামতির সমগ্র পাহাড়ী অঞ্চল অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ ছিল। রানীর বাঙলার পাহাড়, সেনানিবাসের হাসপাতালের পাহাড়, আনন্দ রাজার বাড়ির পাহাড়, চারপত্র মুড়া, বৈরাগীমুড়া, কোটিলা মুড়া, অদুনা-পদুনা মুড়া, খিলামুড়া, পাক্কা মুড়া, রূপবান কন্যার মুড়া, আনন্দ বিহার, ভোজরাজার বিহার, রূপবান কন্যার বিহার, শালবন বিহার, কোটবাড়ি, উজিরপুরা মুড়া, বলাগাজী মুড়া, চণ্ডীমুড়া প্রভৃতি স্থানে বহু প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন আছে। আর আছে সমুদয় এলাকা জুড়ে অসংখ্য প্রাচীন দিঘি-পুষ্করিণী। দ্বিতীয়ার দিঘি, সঙ্গু দিঘি, মহীর দিঘি, জয়ঠমের দিঘি, হবলুয়া দিঘি, লালদিঘি, ভোজরাজার দিঘি, আনন্দ রাজার দিঘি, শালবান রাজার দিঘি, পদুয়ার দিঘি ও ধৈন্যাখোলার দিঘি এ অঞ্চলের প্রাচীন জলাশয়গুলির মধ্যে কয়েকটি। সঙ্গুদিঘি কুমিল্লা শহরের বিখ্যাত ধর্মসাগরের চেয়েও আয়তনে বড়। আর ধৈন্যাখোলার দিঘি সঙ্গুদিঘির চেয়েও বড়।

সমগ্র পাহাড়ী অঞ্চল জুড়ে যে সমস্ত ইমারতাদি ছিল কালক্রমে সেগুলি ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়। তখন থাকে শুধু এলোমেলোভাবে পড়ে থাকা প্রাচীন ইটপাথর আর ভিত্তিপ্রাচীরের অংশ। সমগ্র অঞ্চল পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে হিংস্র জন্তুর আবাসস্থলে পরিণত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে (১৯৩৯-৪৫ খ্রিঃ) কুমিল্লা বিমানবন্দর নির্মাণ ও যুদ্ধসংক্রান্ত অন্যান্য কাজ করার সময় ঠিকাদারেরা এখানকার ধ্বংসাবশেষগুলির সন্ধান পান। তারা নিজেদের স্বার্থে প্রাচীন কীর্তিগুলিকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করেএখান থেকে নির্বিচারে ইট সংগ্রহ করেন। ইটের সঙ্গে অসংখ্য প্রাচীন মুদ্রা, প্রস্তরমূর্তি ও পোড়ামাটির চিত্রফলক ইত্যাদিও তাদের হস্তগত হয়।

দৈবক্রমে ব্যাপারটা তদানীন্তন সরকারের গোচরীভূত হলে তদানীন্তন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের টনক নড়ে। কিন্তু এরি মধ্যে সর্বনাশ যা হবার, তা হয়ে গেছে।

লালমাই-ময়নামতির প্রাচীন ইটের সাহায্যে গোটা কুমিল্লা বিমানবন্দর নির্মিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে করা হয়েছে আরও অনেক কাজ। ফলে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির চিহ্ন পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে মুছে গেছে। মুদ্রা, মূর্তি ইত্যাদি ঠিকাদারদের হাতে পড়ে কোথায় যে উধাও হয়ে গেছে, তার পাত্তাও পাওয়া যায়নি। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কোনো রকমে ২০ টি ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন সংরক্ষণ করতে সমর্থ হয়। সেগুলির মাটির নিচের কিছু কিছু অংশই তখন পর্যন্ত টিকে ছিল। কিন্তু উপরের ইট প্রায় সব সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

১৯৫৫-৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর এখানে জরিপ কাজ চালিয়ে প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ বহনকারী ৫৪ টি স্থান সংরক্ষণ করার জন্য নির্দিষ্ট করে। নিম্নের তালিকায় উল্লেখযোগ্য স্থানগুলি তুলে ধরা হল। এগুলির ডান দিকে বন্ধনীতে প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর কর্তৃক প্রদত্ত ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হল। এর আগে এ স্থানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা আবশ্যক।

ইতিহাস

লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ ও ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন আছে। স্থানীয় অধিবাসীদের মতে এ স্থানে উনশত (অর্থাৎ ৯৯) রাজার রাজধানী ছিল। উনশত রাজার কথা সঠিকভাবে কিছু বলা না গেলেও প্রামাণ্য ইতিহাসে দেখা যায় যে, কমপক্ষে ৬টি রাজবংশে প্রায় ৩৪ জন নৃপতি এখানে রাজত্ব করে গেছেন। ব্যাপক অনুসন্ধান ও উৎখননকার্য চালালে আরও অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যেতে পারে এবং তাতে জনপ্রবাদ সত্য হয়েও যেতে পারে।

এ স্থানের ইতিহাস আরও আগের না হলেও অন্তত গুপ্ত যুগে টেনে নেওয়া যেতে পারে প্রামাণ্য দলিলাদি মতেই। এ প্রসঙ্গে মহারাজ বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর তাম্রলিপির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে (পরে গুণাইঘর দ্র:)। উল্লেখ করা যেতে পারে একই নৃপতির (পরে শালবন বিহারের লিপি দ্র:) অন্য একটি তাম্রলিপির কথাও-বৈন্যগুপ্তের পরে এস্থান খুব সম্ভবত গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও নরেন্দ্রাদিত্য সমাচারদেব নামক অন্তত তিনজন নৃপতির শাসনাধীনে ছিল। এঁদের পরে খুব সম্ভবত ভদ্রনামক একটি ব্রাহ্মণ্যরাজবংশের আবির্ভাব এখানে ঘাটছিল।

ভদ্ররাজবংশের পরে খুব সম্ভবত এখানে খড়্গ বংশীয় নৃপতিরা রাজত্ব করেছিলেন এবং প্রামাণ্য ইতিহাসে দেখা যায় যে, এ বংশের অন্তত পাঁচজন নৃপতি এখানে রাজত্ব করেছিলেন। প্রামাণ্য ইতিহাসে আরও দেখা যায় যে, রাতবংশের অন্তত তিনজন এবং নাথ বংশের বেশ কয়েকজন নৃপতি এ অঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন। শেষোক্ত দুই রাজবংশের নৃপতিরা অবশ্য সামন্ত নৃপতি হিসাবেই পরিচিত ছিলেন।

খড়্গ রাজবংশের রাজত্ব খুব সম্ভবত সপ্তম শতাব্দীর শেষদিকে অথবা অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে শেষ হয়। এঁদের পরে এখানে রাজত্ব করেন দেব বংশ নামক একটি রাজবংশ। লিপি প্রমাণে দেখা যায় যে, এ বংশের অন্তত ৪ জন নৃপতি রাজত্ব করেছিলেন এবং তাঁদের রাজত্ব খুব সম্ভবত অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে শেষ হয়।

খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে এ স্থান তথা সমগ্র সমতটের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। অবশ্য নবম শতাব্দীতে কান্তিদেব নামক একজন একক নৃপতির কথায় জানা যায় যে, তিনি হরিকেল নামক রাজ্যের নৃপতি ছিলেন এবং সমতটের কিয়দংশ হরিকেল রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল বলে পণ্ডিতেরা বলেন।

কান্তিদেবের পরে চন্দ্ররাজবংশের রাজত্ব করার কথা জানা যায় এবং এ রাজবংশের অন্তত পাঁচজন নৃপতি এখানে রাজত্ব করেছিলেন বলে ইতিহাস প্রমাণ করে এবং তাঁদের রাজত্বকাল অন্তত দেড়শ বছর ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। চন্দ্রদের পরে খুব সম্ভব বর্মণ ও সেনদের রাজত্ব এখানে কায়েম হয়েছিল যদিও এদের কোনো লিপি প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

বর্মণ-সেনদের পরে এখানে বেশ কয়েকজন ছোটখাট নৃপতি রাজত্ব করেছিলেন বলে দেখা যায়। এঁরা ছিলেন, রণবঙ্কমল্ল হরিকেলদেব, রাজা দামোদরদেবসহ পুরুষোত্তম বংশীয় চারজন নৃপতি, চারপত্র মুড়ার রাজা বীরধরদেব এবং খুব সম্ভব ত্রয়োদশ শতাব্দীর রাজা দশরথদেব। খুব সম্ভব এ স্থানে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রত্নকীর্তির স্থান সমূহ : দৈবক্রমে ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে এখানে একটি তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয় এবং তাতে দেখা যায় যে, রণবঙ্কমল্ল হরিকেলদের নামক একজন নৃপতি পট্টিকেরাতে নির্মিত একটি বৌদ্ধ বিহারের জন্য ভূমিদান করেছিলেন। বিহার ও দুর্গ সমন্বিত পট্টিকেরা নগরীর প্রাধান্য ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে উপলব্ধি করা গেলেও এ স্থানটি তখনও চিহ্নিত করা যায়নি। অবশ্য লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ের প্রায় লাগোয়া পশ্চিমে পাটিকারা নামক একটি পরগনার অস্তিত্ব অনেক আগে থেকেই জানাছিল।

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে কুমিল্লা-কালীরবাজার রাস্তা নির্মাণ করার সময় একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ (পরে তা একটি বিহারের ধ্বংসাবশেষ বলে চিহ্নিত হয়) আবিষ্কৃত হয়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা (পরবর্তীকালে জাতীয়) যাদুঘর থেকে ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী এ স্থান পরিদর্শন করে এখানে অসংখ্য প্রত্নকীর্তির ধ্বংসাবশেষ আছে বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু এসব প্রত্নকীর্তির স্থানগুলিকে রক্ষা করার কোনো ব্যবস্থা কেউ গ্রহণ করা হয়নি। প্রত্নকীর্তিসমূহের অসংখ্য ইট ও প্রাচীন ইমারতের অন্যান্য মালমসলা জঙ্গলে আবৃত হয়ে সমগ্র লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ে স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকে।

১৯৪৩-৪৪ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লায় অবস্থিত ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনীর চতুর্দশ ডিভিশনের সদর দফতর এ পাহাড়ে স্থাপিত হয় এবং পাহাড়ের বিভিন্ন স্থানে অনেক ইমরতাদি নির্মিত হয়। কুমিল্লা বিমানবন্দর ও অন্যান্য সামরিক ইমারতাদি নির্মাণের জন্য নিযুক্ত মিলিটারি কন্ট্রকরা সমগ্র লালমাই-ময়নামতি পাহাড় থেকে লক্ষ লক্ষ প্রাচীন ইট ও অন্যান্য দ্রব্যাদি নিয়ে যান। ফলে বহু প্রাচীন কীর্তি সমূহ বিলুপ্ত হয়ে যায়। তারা সেই সঙ্গে নিয়ে যান প্রাচীন মুদ্রা পাথরের মূর্তি, পোড়ামাটির চিত্রফলক ও অন্যান্য প্রত্নবস্তু। প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে এগুলি ছিল অমূল্য সম্পদ।

দৈবক্রাম ব্যাপারটা তদানীন্তন প্রত্নতত্ত্ব দফতরের নজরে আসে। এ দফতরের মি: টি.এন. রামচন্দ্রন এখানে আসেন এবং অনুসন্ধানের পর ১৫টি স্থান চিহ্নিত করেন। কিন্তু ইতোমধ্যে ক্ষতি যা হবার তা হলে গেছে এবং অসংখ্য প্রত্নকীর্তি ও প্রত্নবস্তু চিরতরে হারিয়ে গেছে।

যুদ্ধের (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ) অনেক পরে ১৯৫৫ সালে প্রত্নতত্ত্ব দফতর কর্তৃক একটি সার্ভে করা হয় এবং মোট ৫৪ স্থান নির্বাচিত করে সেগুলি থেকে মাত্র ২০টি স্থানকে 'প্রটেক্‌টেড্ মনুমেন্ট' (protected Monument) হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এর পরে ১৯৬৩-৬৬ সালে প্রত্নতত্ত্ব দফতর তিনটি স্থানে পূর্ণ উৎখনন কার্য করে এবং সেগুলি ছিল (১) শালবন বিহার, (২) কোটিলা মুড়া ও (৩) চারপত্র মুড়া। সেই সঙ্গে ময়নামতি পাহাড়ের রানীর বাংলাতে পরীক্ষামূলক উৎখনন কার্য করা হয়। অনেক পরবর্তীকালে ১৯৭৪-৭৬ সালে আনন্দ বিহারে উৎখনন কার্য করা হয়; সার্ভে করার ফলে যে সমস্ত স্থান চিহ্নিত করা গিয়েছিল সেগুলির একটি তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হল।

১.	ময়নামতি মাউন্ড	৪.	আনন্দ বিহার
১ক.	"	৫.	শালবন বিহার
১খ.	"	৭.	ভোজ বিহার

১১. ধান মুড়া
১২. পাক্কা মুড়া
১৩. আনন্দ বিহারের দক্ষিণ
১৪. হোগনি মুড়া
১৬. ভেলি সাইট
১৭. মদিনা/আদিনা মুড়া
১৮. সবুরা মুড়া
১৯. রূপবানি মুড়া
২০. বড় গাছ মুড়ার দক্ষিণের মুড়া
২১. বড়গাছ মুড়া
২২. নিরুঞ্জন মুড়া
২৩. খাচার মুড়া
২৪. হাতিগাড়া মুড়া
২৫. কোটবাড়ি বিহার
২৬. রূপবান মুড়া
২৭. রূপবান মুড়া হল
২৮. রূপবান কন্যার বিহার
২৯. ইটাখোলা মুড়া
৩০. অর্জুনখোলা মুড়া
৩১. চণ্ডিমুড়া
৩২. কালিদাসের মুড়া
৩৩. আর্মি বাংলা মুড়া
৩৪. চারপত্র মুড়া
৩৫. চুল্লা মুড়া
৩৬. ফকিরা মুড়া
৩৭. আববাস আলী মুড়া
৩৮. সিঙ্গারা মুড়া
৩৯. এক্সিকিউটিভ অফিসার বাংলা মুড়া
৪০. ময়নামতি ন্যাশনেল সিমেট্রি মুড়া
৪১. গাবগাছ মুড়া
৪২. বটগাছ মুড়া
৪৩. মিনারখিল পাহাড়ের পশ্চিম পাদদেশের মুড়া
৪৪. বৈরাগি মুড়া
৪৫. টাক্কা মুড়া
৪৬. বলগাযি মুড়া
৪৭. কোটিলা মুড়া
৪৮. বৈরাগি মুড়া
৪৯. আনন্দ রাজার দিঘি
৫০. ভোজবিহার দিঘি
৫১. বড় ইটাখোলা মুড়া
৫২. বড় ইটাখোলা মুড়ার পূর্ব পাদদেশ
৫৩. ভোজবিহারের পশ্চিম
৫৪. বি,এ,আর,ডি (বাংলাদেশ একাডেমি অব রুরেল ডেভেলাপম্যান্ট)

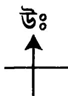
পরবর্তীকালে এগুলির মধ্য থেকে মাত্র ২০ স্থানকে সংরক্ষিত স্থান হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং এগুলির নতুন করে নম্বরও দেওয়া হয়েছিল বলে দেখা যাচ্ছে।

১. ময়নামতি মাউন্ড
১ক. ময়নামতি মাউন্ড
১খ. ময়নামতি মাউন্ড
২. ময়নামতি মাউন্ড
২ক. ময়নামতি মাউন্ড
৩. বৈরাগির মুড়া
১০. রূপবান মুড়া
১১. শালবন বিহার
১২. হাতিগাড়া মুড়া
১৩. উজিরপুর মাউন্ড
১৪. পাক্কা মুড়া
১৫. চিল্লা মুড়া
৪. কোটিলা মুড়া
৫. আনন্দ রাজার বাড়ি
৬. রূপবান কন্যার বাড়ি
৭. ভোজ বাজার বাড়ি
৮. ইটাখোলা মুড়া
৯. কোটবাড়ি মুড়া
১৬. রূপবান মুড়া
১৭. বলাগাযি মুড়া
১৮. চণ্ডিমুড়া
১৯. চারপত্র মুড়া
২০. রানীর বাংলো

লালমাই-ময়নামতির প্রাচীন কীর্তি

সঙ্কেত

- বিহার
- বড় স্তূপ বা মন্দির
- স্তূপ
- অজানাকীর্তি
- প্রাসাদ বা দুর্গ
- জলাশয়
- পাকা সড়ক
- ০'-৫০' উঁচু
- ৫০'-১০০' উঁচু



(স্কেল মতো নয়)

৩৬ ৩৭ ১৪ ৪৮ ৪৭ ২১ ২০ ৪৯ ২২ ১৩ ২৩ ৫০ ২৪ ২৭ ৫২ ৫৪ ১১ ১২ ৫ ১৪ ১৭ ১৬ ১৮ ২৯ ১৯ ৪৬ ৩০ ৪৫ ৩২ ৪৪ ৪৩ ৩১

২১

দ্বিতীয়ার দিঘি

উৎখনন ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ে যে সব প্রত্নকীর্তির স্থান আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলির মধ্যে প্রায় সবই ধর্মসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান এবং অতি সীমিত সংখ্যক কয়েকটি স্থান বসবাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং সেগুলিকে আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাধারণভাবে যে চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায় সেগুলি হচ্ছে (ক) বিহার, (খ) সংলগ্ন বিহারসহ বড় ধরনের মন্দির, (গ) বড় স্তূপ অথবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং (ঘ) ছোট ও অচিহ্নিত স্তূপ বা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।

(ক) লালমাই-ময়নামতিতে আবিষ্কৃত ধর্মীয়, প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিহারের স্থান খুবই উল্লেখযোগ্য। বড় ধরনের মন্দির সংলগ্ন বিহার ছাড়া এখানে সর্বমোট ৭টি বিহার মোটামুটিভাবে চিহ্নিত হয়েছে এবং সেগুলি হচ্ছে, (১) শালবন বিহার, (২) আনন্দ বিহার, (৩) রূপবান কন্যার বিহার, (৪) ভোজবিহার, (৫) আর্মি বাংলার বিহার, (৬) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিহত সৈনিকদের সমাধিস্থানের বিহার ও (৭) কোটবাড়ি বিহার। নিম্নে বিহারগুলির বর্ণনা তুলে ধরা হল।

১. শালবন বিহার

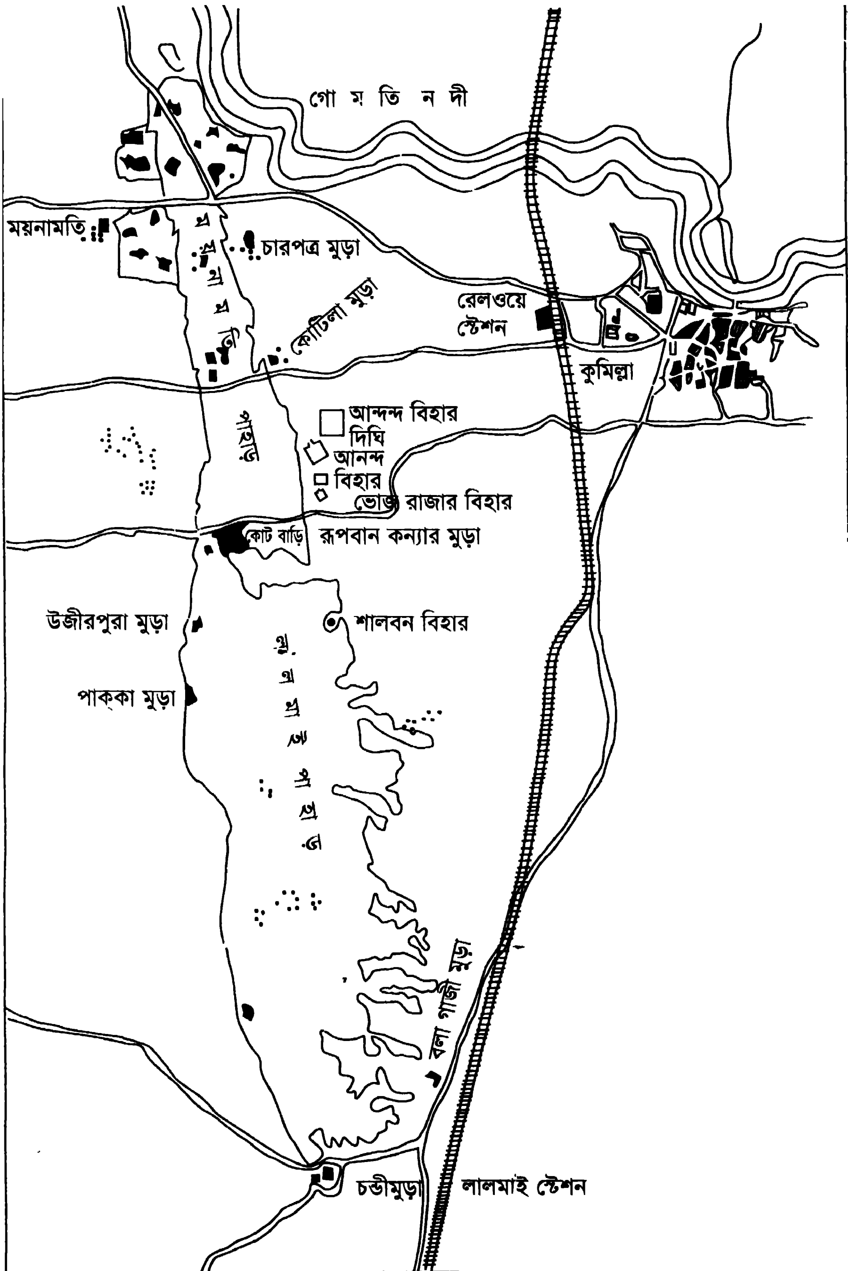
বিহার : কুমিল্লা শহর থেকে প্রায় ৯ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ও লালমাই-ময়নামতি পাহাড় শ্রেণীর প্রায় মাঝামাঝি স্থানে পাহাড়ের পূর্বকোল ঘেঁষে অবস্থিত যে বিরাট বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে, তাকে শালবন বিহার বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এককালে বিহার ও বিহারের আশেপাশের উঁচু ভূমিতে অজস্র শালগাছের অস্তিত্ব ছিল। এখনও অনেক শালগাছ বিহারের ধারেকাছে বিশেষ করে বিহারের পশ্চিম ও পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে আছে। শালগাছের অবস্থিতির জন্য পরবর্তীকালে এস্থানের নাম হয়েছিল শালবন গ্রাম। এই শালবন থেকেই আলোচ্য বিহারের নামকরণ করা হয়েছে শালবন বিহার। এর প্রকৃত নাম ছিল কী ছিল, তা আজও জানা যায়নি।

শালবন বিহার এক বিরাট কীর্তি। দুর্গাকারে নির্মিত এই চতুষ্কোণ বিহারের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ১৬৯ মিটার। আকারে পাহাড়পুর বিহারের চেয়ে বেশ ছোট কিন্তু একই ধরনের নির্মিতি। অথবা এ বিহারের অনুকরণে পাহাড়পুর বিহার নির্মিত হয়েছিল বলা যেতে পারে। সমগ্র বিহারে একটি মাত্র প্রবেশপথ ছিল এবং তা হচ্ছে উত্তর ব্লকের কেন্দ্রস্থলে। বিহার অঙ্গনের প্রায় কেন্দ্রস্থলে কেন্দ্রীয় বা প্রধান মন্দির অবস্থিত।

বিহারের চারদিকে যে বেষ্টক প্রাচীর আছে তা প্রায় ৫ মিটার প্রশস্ত। এই বেষ্টক প্রাচীরকে পিছনের দেয়াল হিসাবে ব্যবহার করে বিহারের ১১৫ টি কক্ষ নির্মিত হয়েছিল। ভিক্ষুদের বসবাসের জন্য নির্মিত এই কক্ষগুলির আয়তন প্রায় ৩.৬৩ মিটার × প্রায় ৩.৬৩ মিটার। কক্ষগুলিকে ১.৫১ মিটার প্রশস্ত দেয়াল (partition-wall) দ্বারা একে অন্য থেকে পৃথক করা হয়েছে। প্রত্যেক কক্ষের ভিতরে ছিল ৩টি করে কুলঙ্গি। এগুলি দেবদেবীর মূর্তি, তৈলের প্রদীপ, পুঁথি-পুস্তক ইত্যাদি রাখার জন্য ব্যবহার করা হত বলে মনে হয়। কক্ষগুলির সামনের প্রশস্ত প্রাচীরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে ছিল একটি সরু প্রবেশপথ। কোনো জানালার অস্তিত্ব কোনো কক্ষে ছিল না। কক্ষগুলির সামনে ছিল ২.৫৪ মিটার প্রশস্ত টানা বারান্দা। এরপরেই ছিল বিহার অঙ্গন। কক্ষগুলি প্রথমে শুধু ভিক্ষুদের বসবাসের জন্যই নির্মিত হয়েছিল। পরে কতগুলি কামরায় ইটের তৈরি বেদী নির্মিত হয়েছিল দেখে ধারণা হয় যে, এগুলি তখন পূজার জন্য ব্যবহার করা হত।

শালবন বিহার ও ভূমিচিত্র

(স্কেল মতো নয়)



এ বিহারে পর্যায়ক্রমে ৬টি নির্মাণযুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে। উপরের ৪টি নির্মাণযুগের চিহ্ন মোটামুটি পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে। নিচের দুটি নির্মাণযুগের চিহ্ন অস্পষ্ট। কোনো নির্মাণযুগেই বিহারের বিরাট কোনো আঙ্গিক পরিবর্তন করা হয়নি। কেবলমাত্র সর্বোচ্চ পর্যায়ে কক্ষগুলি নতুন করে নির্মাণ করার সময় পিছনের দেয়ালের প্রশস্ততা কমিয়ে ৩.০৩ মিটার করা হয়েছিল এবং তার ফলে কক্ষগুলি ও সামনের টানাবারান্দা পিছনে সরে যায় এবং উন্মুক্ত অঙ্গনের আয়তন কিছুটা বৃদ্ধি পায়।

কেন্দ্রীয় উপাসনালয়

কেন্দ্রীয় উপাসনালয় যে বিহার অঙ্গনের প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ক্রুশাকারে নির্মিত এ মন্দিরে বিহারের মতোই পর্যায়ক্রমে ৬টি নির্মাণযুগের সন্ধান পাওয়া গেছে। অর্থাৎ সর্ব প্রথমে নির্মাণ করার পরে আরও পাঁচবার মন্দিরটিকে প্রায় নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছিল। প্রত্যেক নির্মাণযুগেই মন্দিরের কিছু না কিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল এবং বিহারে এখন যে উপরের মাটির স্তর আছে, তা থেকে প্রায় ৭.৫৪ মিটার নিচে অকর্ষিত ভূমি (virgin soil) পাওয়া গেছে। প্রথম দুটি নির্মাণ-যুগে মন্দিরের প্রকৃত রূপটি কী ছিল, তা সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয়নি। কারণ, এর উপরে পরিবর্তী নির্মাণযুগের ইমারত গড়ে উঠেছিল এবং সেগুলির অংশবিশেষ এখনও বিদ্যমান। তবে সেই দুই যুগে মন্দিরটি যে বিরাট ও ক্রুশের আকারে গঠিত ছিল, তা ধরা পড়েছে।



▲ শালবন বিহারের এরিয়াল ভিউ, ময়নামতি

তৃতীয় নির্মাণযুগে মন্দিরের ভূমিপরিকল্পনা পরিবর্তন করে ক্রুশাকার মন্দিরের পরিবর্তে একটি আয়তাকার মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এ মন্দিরের আয়তন ছিল ৫০.৯ মিটার × ৩৩.৩৩ মিটার। আগের মতোই এর প্রবেশপথ ছিল উত্তর দিকে।

চতুর্থ নির্মাণযুগের ভিত্তিভূমি সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কৃত হয়েছে। ভূমি-পরিকল্পনায় এ মন্দির ছিল ক্রুশের মত এবং বাহুগুলিতে উদগত অংশ (offset) ছিল। বাহুগুলির মিলনস্থলে একটি মণ্ডপ ছিল। আগের মতোই উত্তর দিকে ছিল প্রবেশদ্বার। নকশা করা ইট ও পোড়ামাটির চিত্রফলক দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল মন্দিরের দেয়াল। মন্দিরের প্রত্যেক বাহু ছিল ৫১.৫১ মিটার দীর্ঘ। মন্দিরের চারদিকে ছিল ২.১২ মিটার প্রশস্ত প্রদক্ষিণপথ। উত্তর দিকের প্রবেশপথ দিয়ে প্রদক্ষিণপথে ঢুকতে হত। এ প্রবেশপথে ধাপে ধাপে সিঁড়ি ছিল।

এরপরে অর্থাৎ পঞ্চম নির্মাণযুগে মন্দিরে যে কাজ করা হয়েছিল, তাতে তৃতীয় নির্মাণ যুগের মতো মন্দিরের আয়তাকার ও চতুষ্কোণ কাঠামোকে ঠিক রেখে মন্দিরটিকে আয়তনে বেশ ছোট করা হয়েছিল। এতে উত্তর দিকে বরাবরের মতই সিঁড়িপথ ছিল এবং সেই সিঁড়িপথের সাহায্যে মন্দিরের হলঘরে প্রবেশ করার ব্যবস্থা ছিল। "একটি আচ্ছাদিত পথ এই হলঘর ও প্রধান চৈত্য বা অভ্যন্তরীণ হলঘরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে। এই চৈত্যহলের ছাদ বহনকারী বারটি ইটনির্মিত স্তম্ভের নিদর্শন আজও রয়েছে।" এই হলঘরের কিছু দক্ষিণে কেন্দ্রীয় মান্দরের প্রধান কক্ষটি অবস্থিত। এই কক্ষের ভিতরে বেদীর উপরে মূর্তি স্থাপিত ছিল। এই কক্ষের চারদিকে ছিল প্রদক্ষিণপথ। হলঘরের পার্শ্বে আরও কয়েকটি কক্ষ ছিল। এগুলি ভজনালয় হিসাবে ব্যবহৃত হত। এগুলিতে বসার ব্যবস্থা এবং কুলঙ্গি ছিল। মন্দিরের বাইরের প্রাচীরের একঘেঁয়ে সরলতা দূর করার জন্য মাঝে মাঝে উদগত অংশ (offset) সংযোজিত ছিল।

বর্তমানে মন্দিরটি যে অবস্থায় আছে, তা পঞ্চম নির্মাণযুগেরই নিদর্শন। এর পরের অর্থাৎ ষষ্ঠ ও শেষ নির্মাণযুগে যে কাজ করা হয়েছিল, তা এমনভাবে বিনষ্ট হয়েছে যে, এর সঠিক স্বরূপ উদঘাটন করা কিছুতেই সম্ভব হয়নি। সেকারণে এ যুগের সামান্য কাজ যা পাওয়া গিয়েছিল, তা বিলুপ্ত করে পঞ্চম নির্মাণযুগের মন্দিরটিকেই রক্ষা করা হয়েছে।

বিহার অঙ্গনের অন্যান্য কীর্তি

কেন্দ্রীয় মন্দির ছাড়া আরও কয়েকটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ বিহার অঙ্গনে পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে অঙ্গনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত একটি হলঘর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্গাকারে নির্মিত এই ইমারতটি আয়তনে মোটামুটি বড় ছিল। এই ইমারতের ভিতরে ৪টি স্তম্ভ ছিল। এই চারটি স্তম্ভ ও চারপাশের দেয়ালের উপর নির্মিত ছিল এর ছাদ (খুব সম্ভব সমতল ছাদ)। এক কক্ষবিশিষ্ট এই ইমারতের দক্ষিণ দিকে ২টি ছোট আকারের সংলগ্ন কক্ষ ছিল। এই ইমারতের চারদিকে অসংখ্য ভগ্ন মৃৎপাত্র, বাসন-কোসন, পোড়া কাঠ-কয়লা ও ছাই পাওয়া গেছে। এতে ধারণা করা হয় যে,

প্রধান কক্ষটি খাবার ঘর ও সংলগ্ন ছোট কক্ষ দুটি রান্নাঘর হিসাবে ব্যবহৃত হত। এবং এগুলি ছিল ভিক্ষুদের দলগতভাবে ব্যবহার করার জন্য। এটি খুব সম্ভব বিহারের শেষ নির্মাণযুগের ব্যাপার। কারণ, প্রথম দিকে বিহারের কক্ষগুলিতে ভিক্ষুদের ব্যক্তিগতভাবে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

কেন্দ্রীয় মন্দিরের পশ্চিমদিকে ২টি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এ দুটির মধ্যে একটি ছিল আয়তাকারে নির্মিত একটি মন্দির। পূর্বমুখী এই মন্দিরে ২টি কক্ষ ছিল। আয়তাকারে নির্মিত হলকামরাটি ছিল বেশ বড় এবং এর পশ্চিমদিকেই ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট আয়তনের প্রধান পূজাকক্ষটি। এই দুটি কামরার চারদিকে ছিল প্রশস্ত প্রদক্ষিণপথ।

অপর ইমারতটি ছিল এই মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। বর্গাকারে নির্মিত এই মন্দিরটি ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট আয়তনের। এর প্রত্যেক কোণের দিকে ৩টি করে গোলাকার স্তম্ভ ছিল এবং প্রতিটি কোণ ছোট ছোট খোপ রেখে অলঙ্কৃত করা হয়েছিল। এই ইমারতের উৎখনন কাজ শেষ করা হয়নি বলে এ ব্যাপারে আর কিছুই বলা সম্ভব নয়।

বিহারঅঙ্গনে আরও কয়েকটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আছে। কিন্তু সেগুলিতে এখনও উৎখনন কার্য হয়নি বলে এগুলি সম্পর্কে কিছুই বলা যাচ্ছে না।

বিহারের বাইরের মন্দির

বিহারের উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে প্রায় ২৪.২৯ মিটার উত্তরে এবং বিহারের বাইরে বর্গাকারে নির্মিত একটি বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। পূর্বমুখী এই মন্দিরের সামনে ছিল একটি পাকা রাস্তা এবং তা বিহারের প্রধান প্রবেশতোরণ থেকে উত্তর দিকে যে পাকা রাস্তাটি প্রসারিত ছিল, তার সঙ্গে মিলিত ছিল।

এই পথ ধরে এগিয়ে গেলে প্রথমেই পড়ে মন্দিরের সিঁড়িপথ। এর পরেই ছিল স্তম্ভের সাহায্যে নির্মিত একটি চত্বর। কেন্দ্রস্থলে ছিল আয়তাকারে নির্মিত একটি পূজাকক্ষ (cella)। এই কক্ষের চারদিকে ছিল ১.১ মিটার প্রশস্ত প্রদক্ষিণপথ। প্রদক্ষিণপথের সঙ্গে গোলাকার ভিত্তিবিশিষ্ট কতগুলি স্তম্ভ ছিল। মন্দিরের দেয়ালগুলি ছিল অত্যন্ত প্রশস্ত।

হিন্দুমন্দির পরিকল্পনার অনুকরণে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত এবং খ্রিস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতেই এই প্রথা প্রচলিত হয়েছিল বলে তাঁরা বলেন। এই মন্দিরটিরবিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল বলে ধারণা করা হয়।

প্রত্নবস্তু

শালবন বিহারে উৎখনন করে অসংখ্য মূল্যবান প্রত্নবস্তু আবিষ্কার করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে আছে, তাম্রলিপি, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, স্বর্ণালঙ্কার, নানা ধরনের মূর্তি, পোড়ামাটির চিত্রফলক, সীল, নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য, স্তূপপ্রতিকৃতি ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাম্রলিপি

এখানে খননের পর ৮টি তাম্রলিপি পাওয়া গেছে। এগুলি হচ্ছে :

১. বৈন্যগুপ্তের তাম্রলিপি : বিহার ধ্বংসাবশেষের নিম্নতম স্থান থেকে এই লিপি আবিষ্কৃত হয়েছিল। পায় .১৬ × .২৭ মিটার আয়তনের এ লিপির পাঠোদ্ধার এখনও হয়নি। এর উপরের অংশে .০১ মিটার × .১০ মিটার আয়তনের একটি 'সীল' (seal) আছে। তাতে একটি উপবিষ্ট ষাঁড়ের মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। মূর্তির নিচে এক পঙক্তির একটি লিপি আছে। তাতে 'মহারাজা শ্রীবৈন্য গুপ্তস্য' পাঠ আছে। পাঠোদ্ধারের অভাবে তাম্রলিপির বাকি পাঠ সম্পর্কে এখন আর কিছুই বলার উপায় নেই।

২. দেবখড়্গের তাম্রলিপি : তৃতীয় নির্মাণযুগের ৭৫ নম্বর কক্ষ থেকে এই তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। .২০ × .২৫ মিটার আয়তনের এই লিপির উভয় পার্শ্বে মোট ৪৫ পঙ্ক্তি পাঠ আছে। মূখ্য দিকের উপরাংশের মধ্যভাগে একটি সীল আছে। তাতে একটি উপবিষ্ট ষাঁড়ের মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। সীলের নিচে যে লিপি আছে, তা মরিচা পড়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও 'শ্রীমৎদেবখড়্গা' পাঠ বোঝা যায়। এই তাম্রলিপির ২৭তম পঙ্ক্তিতে 'রাজপুত্র বলভট্ট' পাঠ আছে বলে বোঝা যায়। পূর্ণ পাঠোদ্ধারের অভাবে এই তাম্রলিপির বাকি পাঠ সম্বন্ধে এখন আর কিছুই বলা সম্ভব নয়।

৩. খড়্গা তাম্রলিপি : উপরে উল্লিখিত দ্বিতীয় লিপির সঙ্গে এটিও আবিষ্কৃত হযেছে। এর আয়তন .১৫ মিটার × .১৯ মিটার। এর উপরের দিকে মধ্যভাগে একটি সীল আছে। সীলটি দ্বিতীয় লিপির সীলের মতো হলেও অবিকল এক নয়। সীলের পাঠ এমনভাবে নষ্ট হয়েছে যে, পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। তবে অক্ষর ও সীল দেখে এটিকে খড়্গা তাম্রলিপি বলেই পণ্ডিতেরা ধারণা করেন।

৪. বলভট্ট তাম্রলিপি : তৃতীয় নির্মাণযুগের ৫১ নম্বর কক্ষ থেকে এই লিপি উদ্ধার করা হয়েছে। .২৫ মিটার × .৩৪ মিটার আয়তনের এই লিপিতে প্রথম পৃষ্ঠায় ৩৫ ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১১ পঙ্ক্তি পাঠ আছে। প্রথম পৃষ্ঠার উপরের অংশের মধ্যভাগে যে সীলটি আছে, তাতে একটি উপবিষ্ট ষাঁড়ের মূর্তি উৎকীর্ণ আছে, কিন্তু মরিচা পড়ে নষ্ট হয়ে যাবার ফলে সীলের পাঠোদ্ধার করা যায়নি।

তাম্রলিপির যে সংক্ষিপ্ত পাঠ পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায় যে, 'পরমেশ্বর রাজপুত্র বলভট্ট' পবিত্র ক্ষীরোদ নদীপরিবেষ্টিত তাঁর 'দেবপর্বত জয়স্কন্ধাবারে' অবস্থিত 'কটকশিলা' রাজপ্রাসাদ থেকে ভগবান বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘের উদ্দেশ্যে বিহার, স্তূপ, আশ্রমের সংস্কার, 'নবকর্ম' ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন ও সুস্পষ্ট সীমারেখা বেষ্টিত ২৮ পাটকেরও বেশি ভূমি দান করেছিলেন। এই তাম্রশাসনের পাঠ থেকে আরও জানা যায় যে, রাজপুত্র বলভট্ট খড়্গারাজবংশীয় ছিলেন। লিপিতে 'স্বামী দেবখড়্গা', 'খড়্গা', 'জাত খড়্গা' প্রমুখের উল্লেখ আছে। বলভট্টের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে জ্যৈষ্ঠ মাসের চতুর্থ শুক্লা তিথিতে এই তাম্রশাসন প্রদত্ত হয়েছিল।[১]

---

১. Bangladesh Archaeolagy 1979, p. 141-43. Two Mainamati Copperplate Inscriptions of the Khadga and Early Deva Times—Mr. Kamalakanta Gupa.

৫. আনন্দদেবের তাম্রশাসন : পঞ্চম নির্মাণযুগের ১১৪ নম্বর কক্ষ (বিহারের প্রবেশদ্বারের সামান্য পশ্চিম দিকে অবস্থিত) থেকে এই লিপি উদ্ধার করা হয়েছে। .২৭ মিটার × .২২ মিটার আয়তন বিশিষ্ট এই লিপির প্রথম পৃষ্ঠায় ৩৮ ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ৬ পঙ্ক্তি পাঠ আছে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠার এই ৬ পঙ্ক্তি পাঠের নিচে আরও ৯ পঙ্ক্তি পাঠ [রাজা ভবদেবের] আছে।

প্রথম পৃষ্ঠার উপরের দিকের মধ্যভাগে ধর্মচক্রমুদ্রার একটি সীল আছে। এর দু'পাশে আছে ১টি করে হরিণের প্রতিকৃতি। সীলের নিচে 'শ্রীবঙ্গাল মৃগঙ্কস্য' পাঠ লিপিকৃত আছে। এর অর্থ 'বঙ্গালার সৌভাগ্য শশী' হতে পারে বলে কোনো কোনো পণ্ডিতের অভিমত।

রাজা শান্তিদেবের পৌত্র ও রাজা বীরদেবের পুত্র রাজা আনন্দদেব তাঁর ৩৯ রাজাঙ্কে ১২ ভাদ্রদিনে রত্নভূতির পুত্র জয়ভূতি কর্তৃক একটি মন্দির নির্মাণের জন্য বিশ্ববিখ্যাত সমতটে অবস্থিত 'পেরনাটন বিষয়ে' বিভিন্ন আয়তনের (৩ পাটক, ৪ পাটক, আধা পাটক) ভূমি দান করেছিলেন এবং তাঁর জয়স্কন্ধাবার 'বসন্তপুর' থেকে এই লিপি প্রদত্ত হয়েছিল। এতে মনে হয় যে দেববংশীয় নৃপতিদের রাজধানী 'দেবপর্বতে' আনন্দদেবের অবস্থান তখন ছিল না।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় রাজা আনন্দদেবের পুত্র রাজা ভবদেবের যে ৯ পঙ্ক্তি লিপি আছে, তা থেকে জানা যায় রাজা ভবদেব তাঁর দেবপর্বতস্থিত জয়স্কন্ধাবার থেকে তাঁর দ্বিতীয় রাজ্যাঙ্কে ১৩ ভাদ্রদিনে ' পেরনাটন বিষয়ে' অবস্থিত ৩ পাটক ভূমি উপরে উল্লিখিত জয়ভূতি কর্তৃক ত্রিরত্নের (বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ) নামে একটি বিহারিকা প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমিদান বা দানকৃত ভূমির অনুমোদন করেছিলেন।

তাম্রশাসনে উল্লিখিত শান্তিদেব, বীরদেব, আনন্দদেব ও ভবদেবের প্রত্যেকের 'পরমসৌগত', 'পরমেশ্বর', 'পরমভট্টারক' 'মহারাজাধিরাজ' প্রভৃতি অভিধা দেখে ধারণা করা যায় যে, তাঁরা ছিলেন স্বাধীন, সার্বভৌম ও পরাক্রান্ত বৌদ্ধ নৃপতি।

আনন্দদেবের তাম্রশাসন বসন্তপুর ও তাঁর পুত্র ভবদেবের তাম্রশাসন সাবেক রাজধানী দেবপর্বত থেকে প্রদত্ত হয়েছিল দেখে ধারণা হয় যে, আনন্দদেবের পরে পরেই ভবদেব দেবপর্বতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। কী কারণে এমনটি ঘটেছিল, তা জানা যায়নি। এই তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হবার পূর্বে দেব রাজবংশের কথা অজ্ঞাত ছিল।

৬. ভবদেবের তাম্রলিপি : বিহারের সদর তোরণের সামান্য পূর্বদিকে অবস্থিত তৃতীয় নির্মাণযুগের ৫নং কক্ষ থেকে এই তাম্রলিপিটি উদ্ধার করা হয়েছে। এর প্রথম পৃষ্ঠায় ৩৪ ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১৯ পঙ্ক্তি লিপি আছে। উপরে উল্লিখিত আনন্দদেবের তাম্রশাসনের মত এতেও ধর্মচক্রবিশিষ্ট সীল আছে। এ লিপির পাঠ উদ্ধার করা হয়নি। তবে এটি যে আনন্দদেবের পুত্র ভবদেবের তাম্রলিপি তা জানা গেছে।

৭. দেববংশীয় তাম্রলিপি (ক) : তৃতীয় নির্মাণযুগের ৮৫ নং কক্ষ (পশ্চিম ব্লক) থেকে আবিষ্কৃত এই ক্ষুদ্র তাম্রলিপির আয়তন .০৭১ মিটার × .১০ মিটার। এর প্রথম পৃষ্ঠায় ২২ ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ৬ পঙ্ক্তি লিপি আছে। আনন্দদেবের তাম্রশাসনের মতো এতেও ধর্মচক্রবিশিষ্ট সীল আছে। এর পাঠ উদ্ধার না হলেও এটি যে বৌদ্ধ দেববংশীয় কোনো এক নৃপতির তাম্রলিপি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

৮. দেববংশীয় তাম্রলিপি (খ) : চতুর্থ নির্মাণযুগের ২৯ নং কক্ষ (পূর্ব ব্লক) থেকে উদ্ধারকৃত এই তাম্রলিপির আয়তন .২২ মিটার × .৩০ মিটার। আনন্দদেবের তাম্রশাসনের মতো এতেও ধর্মচক্রবিশিষ্ট সীল আছে। এটি যে দেববংশীয় কোনো নৃপতির তাম্রলিপি, তাতে সন্দেহ নেই।

মুদ্রা

লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ী অঞ্চলে উৎখননকালে ৪০০ টিরও অধিক মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির মধ্যে কেবল ১টি ছাড়া বাকি সবগুলিই পাওয়া গেছে শালবন বিহারে। এগুলির মধ্যে আছে ১৮ টি স্বর্ণমুদ্রা, ৩৫০ টিরও অধিক রৌপ্যমুদ্রা এবং কিছু তাম্রমুদ্রা।

স্বর্ণমুদ্রা

স্বর্ণমুদ্রাগুলির মধ্যে ২টি গুপ্তসম্রাটদের। এগুলির মধ্যে আছে সমুদ্রগুপ্তের (৩৩৫-৭৫ খ্রিঃ) একটি অশ্বমেধ পরাক্রম মুদ্রা এবং তা পাওয়া গেছে বিহারের দক্ষিণ ব্লকের ৭০ নং কক্ষ থেকে। দ্বিতীয় মুদ্রাটি সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের (৩৭৫-৪১৫ খ্রিঃ) এবং তা পাওয়া গেছে বিহারের তৃতীয় নির্মাণযুগের ১৩ নং কক্ষে। এর এক পৃষ্ঠে ধনুক হাতে রাজার প্রতিকৃতি এবং অন্য পৃষ্ঠে লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি আছে।

গুপ্ত অনুকৃত স্বর্ণমুদ্রা

১. অষ্টম শতাব্দে বৌদ্ধ-দেববংশীয় নৃপতিদের রাজত্বকালে প্রচলিত এবং উপরে উল্লিখিত দ্বিতীয় স্বর্ণমুদ্রাটির অনুকরণে নির্মিত এই মুদ্রাটি দ্বিতীয় গুপ্ত মুদ্রার সঙ্গেই পাওয়া গেছে। এর উপরে 'শ্রীবঙ্গাল মৃগাঙ্ক' কথা ক'টি উৎকীর্ণ আছে। আনন্দদেবের শালবন বিহার তাম্রশাসনেও (উপরে উল্লিখিত) প্রায় অনুরূপ কথাবিশিষ্ট সীল দেখে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, এটি কোনো দেববংশীয় নৃপতির মুদ্রা।

২. তৃতীয় নির্মাণযুগের ৭৯ নং কক্ষ থেকে এ মুদ্রাটি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর এক পৃষ্ঠে অষ্ঠভুজা লক্ষ্মীমূর্তি এবং অপর পৃষ্ঠে রাজার মূর্তি আছে। এতে রাজার মূর্তির সামনে 'শ্রী' কথাটি উৎকীর্ণ আছে। এটি সপ্তম শতাব্দীর মুদ্রা বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন।

৩. দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মূদ্রার সঙ্গে প্রাপ্ত এই মুদ্রাটি সেই মুদ্রার প্রায় অন্ধ অনুকরণে নির্মিত। এতে 'শ্রীকুমার' (?) নাম লিখিত আছে বলে অনুমিত হয়।

৪. চতুর্থ নির্মাণযুগের ৯১ নং কক্ষ থেকে আবিষ্কৃত এই স্বর্ণমুদ্রা উপরে ৩ ক্রমিকে উল্লেখিত মুদ্রার প্রায় অনুরূপ।

৫. তৃতীয় নির্মাণযুগের ৯১ কক্ষ থেকে আবিষ্কৃত এই স্বর্ণমুদ্রা ৩য় ও ৪র্থ মুদ্রার প্রায় অনুরূপ। তবে এতে ধাতুর অবনতি ঘটেছে বলে দেখা যায়। রাজার মূর্তির সামনে 'সুধন্য' অথবা 'শ্রী' ও 'ফণ' কথা লিখিত আছে। রাজার মূর্তির বাম বাহুর নিচে 'জঅ' (জ-য়া?) লিখিত আছে। এই মুদ্রা সপ্তম শতাব্দীর বলে অনুমিত।

৬. তৃতীয় নির্মাণযুগের ২নং কক্ষ থেকে এটি আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি পঞ্চম মুদ্রার প্রায় অনুরূপ।

৭. তৃতীয় নির্মাণযুগের ৯১ নং কক্ষ থেকে আবিষ্কৃত এ মুদ্রা ৬ ক্রমিকে উল্লিখিত মুদ্রার অনুরূপ।

৮. তৃতীয় নির্মাণযুগের ৩৬ নং কক্ষ থেকে আবিষ্কৃত অতি ক্ষুদ্রাকারের এই মুদ্রার (প্রায় সিকির আয়তনের) ধাতুমান অতি নীচু। এটি সপ্তম ক্রমিকে উল্লিখিত মুদ্রার প্রায় অনুরূপ।

৯. তৃতীয় নির্মাণযুগের ৯১ নং কক্ষ থেকে আবিষ্কৃত এই মুদ্রার সঙ্গে ৭ম ক্রমিকে উল্লিখিত মুদ্রার যথেষ্ট মিল আছে।

১০. তৃতীয় নির্মাণযুগের ৯১ নং কক্ষ থেকে আবিষ্কৃত এই মুদ্রা সপ্তম শতাব্দীর তৃতীয় পাদের বলে অনুমিত হয়।

১১-১৩. তৃতীয় নির্মাণ যুগের ৯১ নং কক্ষ থেকে আবিষ্কৃত এই মুদ্রাগুলির মধ্যে ১টি মিশ্রিত ধাতু ও অপর ২টি স্বর্ণনির্মিত। গুপ্ত অনুকরণে নির্মিত মুদ্রাগুলির মধ্যে 'শ্রীবলভট্ট' নামক এক নৃপতির নাম উৎকীর্ণ আছে এবং অক্ষরগুলি খড়্গা তাম্রশাসনে লিপিবদ্ধ অক্ষরের মতো। এগুলিতে ষাঁড়ের প্রতিকৃতি আছে।

১৪. তৃতীয় নির্মাণযুগের ৯৮ নং কক্ষ থেকে আবিষ্কৃত ও মিশ্র ধাতুতে নির্মিত এমুদ্রা দেখতে অনেকটা ১১-১৩ ক্রমিকে উল্লিখিত বলভট্টের মুদ্রার মতোই। তবে এতে 'সবর্ণর' (?) পাঠ আছে বলে ধারণা করা হয়। এটি খুব সম্ভব কোনো এক নতুন রাজবংশের মুদ্রা। তিনি খড়্গাদের সঙ্গে সম্পৃক্তও হতে পারেন।

১৫-১৬. তৃতীয় নির্মাণযুগের ৫২ নং কক্ষ থেকে আবিষ্কৃত এই ২টি মুদ্রা হারিয়ে গেছে।

রৌপ্যমুদ্রা

বিহারে প্রবেশপথের পূর্বদিকে অবস্থিত পূর্ব ব্লকের ২টি কক্ষ থেকে ২২৪ টি রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গেছে। সবগুলি মুদ্রার উপরেই ষাঁড় ও ত্রিরত্ন বা ত্রিশূলের প্রতিকৃতি আছে। বেশিরভাগ মুদ্রার মুখ্যদিকে একটি উপবিষ্ট ষাঁড় ও ষাঁড়ের উপরে 'পট্টিকেরা' কথাটি লিখিত আছে। তবে কোনো কোনো মুদ্রার মুখ্যদিকে 'পট্টিকেরার' পরিবর্তে 'ললিতাকর ধর্ম বিজয়', "য়্যারিক্রিয়' 'আরিক্রিয়', 'হরিকেল' ইত্যাদি শব্দ আছে বলে মুদ্রার পাঠ থেকে কোনো কোনো পণ্ডিত ধারণা করে থাকেন। এসব মুদ্রার প্রত্যেকটির গৌণদিকে আছে একটি ত্রিশুল বা ত্রিরত্ন এবং এর উপরে আছে গোলাকার সূর্য ও প্রায় পঞ্চমীর চন্দ্রের প্রতিকৃতি।

এগুলিকে প্রথমে আরাকানী মুদ্রা বলে পরিচিত করা হত। পরে এগুলিকে সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর বৌদ্ধ দেববংশীয় নৃপতিদের মুদ্রা বলে পরিচিত করার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু শৈব হিন্দুধর্মের প্রতীক ষাঁড় ও ত্রিশূলযুক্ত এসব মুদ্রা 'পরমসৌগত' দেববংশীয় নৃপতিদের হতে পারেনা বলে অনেক পণ্ডিতের ধারণা। কিন্তু এগুলি কোন্

রাজা বা রাজবংশের, তা আজও সঠিকভাবে নির্ধারিত হয়নি। তবে এসব মুদ্রা যে বাঙ্লার কোনো স্থানীয় রাজবংশের, তাতে এখন আর কোনো সন্দেহ কেউই পোষণ করেন না। সেই রাজবংশ খুবই পরাক্রমশালী ছিল বলে পণ্ডিতদের অভিমত। এদেশে স্থানীয়ভাবে প্রচলিত মুদ্রার মধ্যে এগুলিই সবচেয়ে প্রাচীন বলেও ধারণা করা হয়।

এখানে প্রাপ্ত রৌপ্যমুদ্রার মধ্যে গৌড়রাজ শশাংকের ১টি মুদ্রা, পূর্ব বাংলার 'আকারা' নামক এক অজানা রাজবংশের কয়েকটি মুদ্রা এবং গুপ্ত অনুকৃত মুদ্রাও আছে।

আরব দেশীয় মুদ্রা

শালবন বিহারে আরব দেশীয় একটি মুদ্রা পাওয়া গেছে। এটি প্রথম দিকের কোনো আব্বাসীয় খলিফার মুদ্রা বলে পণ্ডিতদের ধারণা। কুফিক লিপিযুক্ত এই মুদ্রাটি অতি জীর্ণ অবস্থায় পাওয়া গেছে বলে এর পাঠ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

তাম্রমুদ্রা

অতি সামান্য কয়েকটি তাম্রমুদ্রা এখানে পাওয়া গেছে। গুপ্তমুদ্রার অনুকরণে নির্মিত এসব মুদ্রার পাঠোদ্ধার এখনও হয়নি বলে এগুলি সম্পর্কে সঠিকভাবে এখন আর কিছুই বলা সম্ভব নয়।

নিবেদনস্তূপ ও সীল (seal)

কিছু নিবেদনস্তূপ পাওয়া গেছে·বিহারে উৎখনন করার পরে। নলের আকারে তৈরি ড্রাম, চারকোণাকার হার্মিকা ও সূচালো চূড়া ইত্যাদি স্তূপস্থাপত্যের সব গতানুগতিক কায়দা-কানুনই এগুলিতে দেখা যায়। এগুলির ভিতরে বৌদ্ধধর্মীয় মন্ত্রযুক্ত সীল ও বৌদ্ধগুরুদের অস্থিধাতু থাকত।

এগুলি থেকে সেকালের বৌদ্ধদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের কিছু নিদর্শন পাওয়া গেলেও ঐতিহাসিক উপাদান তেমন কিছুই পাওয়া যায়নি। মাটির পাত্রে রক্ষিত কিছু কিছু লিপিও পাওয়া গেছে। অক্ষর বিচারে লিপিগুলি খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর বলে বিবেচিত হয়। তবে এগুলি থেকে আর কোনো ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যায়নি।

তবে শালবন বিহারে প্রাপ্ত কয়েকটি পোড়ামাটির সীলে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উপাদানের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই সীলগুলির ঊর্ধ্বাংশে আছে একটি উপবিষ্ট মৃগ, মৃগের নিচে আছে ধর্মচক্র। এটি বৌদ্ধ দেববংশীয় নৃপতিদের রাজকীয় প্রতীকচিহ্ন। এই প্রতীকচিহ্নের নিচে তিন পঙ্ক্তির একটি ক্ষুদ্র লিপিতে আছে, 'শ্রীভবদেব মহাবিহারার্য ভিক্ষু সঙ্ঘস্য'। এর অর্থ হচ্ছে, 'শ্রী-ভবদেব নির্মিত মহাবিহারের ভিক্ষু সঙেঘর'। এই লিপি থেকে নিঃসংশয়ে জানা যায় যে, শ্রীভবদেব এই মহাবিহার নির্মাণ করেছিলেন। উপরে উল্লিখিত শ্রী আনন্দদেবের তাম্রশাসন ও ভবদেবের তাম্রশাসনগুলির সঙ্গে এই সীলের পাঠ মিলিয়ে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, দেববংশের তৃতীয় নৃপতি শ্রীআনন্দদেব ও তাঁর পুত্র শ্রীভবদেব শালবন বিহার নির্মাণ করেছিলেন।

ব্রোঞ্জনির্মিত স্মারকাধার

শালবন বিহারে ব্রোঞ্জনির্মিত একটি স্মারকাধার (relic-casket) আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি প্রায় .১৩ মিটার উঁচু এবং এর মুখ ছিপি দ্বারা বন্ধ ছিল। কিন্তু এর ভিতরে কিছুই পাওয়া যায়নি। এর কিনারা খাঁজকাটা এবং ঝুলিয়ে রাখা ও বহন করার সুবিধার জন্য এর কাঁধের নিচে ৩টি গোলাকার 'রিং' ছিল।

ব্রোঞ্জমূর্তি

এখানে বিভিন্ন বৌদ্ধ দেবদেবীর ১৫০ টিরও অধিক ব্রোঞ্জ মূর্তি পাওয়া গেছে। এগুলির প্রায় সব ক'টাই বুদ্ধ, বোধিসত্ব, তারা, সর্বাণী, মঞ্জুশ্রী, জম্ভল, প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি বৌদ্ধ দেবদেবীর ছোট ছোট মূর্তি। প্রায় ০.০৭ মিটার × ০.০৬ মিটার আয়তনের এসব ব্রোঞ্জমূর্তির প্রায়ই উচ্চাবচ প্রণালীতে পৃষ্ঠদেশে ফলক বিশিষ্ট (back slate) খাড়াভাবে নির্মিত। নিম্নাংশে পদ্মাসনের নিচে আছে বেদীর আকারে গঠিত স্তম্ভমূল ও উপরে আছে ছত্রাকারে নির্মিত চূড়া।

অনেক মূর্তিতে অতি সূক্ষ্ম শিল্পানুভূতি ও অসাধারণ গঠন-বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পদ্মাসনে ধ্যানমুদ্রা বা ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধ মূর্তিগুলি অতি সূক্ষ্ম নির্মাণকৌশলের পরিচয় প্রদান করে। "পদ্মের উপর বজ্রাসনে উপবিষ্ট ও অলঙ্করণসমৃদ্ধ একটি বোধিসত্ব পদ্মপানি মূর্তিকে অতি উঁচু দরের শিল্পনিদর্শন বলা যায়।" এ ধরনের আরও একটি মূর্তি আছে বোধিসত্বের। লীলায়িত ভঙ্গিতে নির্মিত এই মূর্তিতে বোধিসত্ব ডান পা ঝুলিয়ে বাম পা ভাঁজ করে পদ্মের উপরে উপবিষ্ট। তারা, সর্বাণী প্রভৃতি বৌদ্ধ দেবীর কয়েকটি মূর্তিও অপূর্ব শিল্পচাতুর্যের পরিচয় বহন করে। এ রকম আরও বহু মূর্তি ছিল। কিন্তু ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে ময়নামতি জাদুঘর থেকে ৩৬ টি অতি মূল্যবান ব্রোঞ্জমূর্তি হারিয়ে গেছে।

এসব ছোট মূর্তি ছাড়া খুব বড় ধরনের কোনো ব্রোঞ্জমূর্তি এখানে পাওয়া যায়নি। এ ধরনের মূর্তির কিছু কিছু ভগ্নাংশ অবশ্য পাওয়া গেছে।

এসব সূক্ষ্ম গঠন বৈচিত্র্য ও উঁচু মানের শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক মূর্তিগুলির পাশাপাশি রয়েছে বহু ব্রোঞ্জমূর্তি যেগুলিকে স্থূল ও বৈচিত্র্যহীন বলা যেতে পারে।

শালবন বিহারে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জমূর্তিগুলিতে এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের ক্রম বিবর্তনের ইতিহাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মহাযান-হীনযান বৌদ্ধধর্ম কেমন করে ক্রমে ক্রমে তান্ত্রিকধর্ম ও পরে হিন্দুধর্মে বিলীন হয়েছিল, তার ইঙ্গিত এসব মূর্তির মধ্যে দেখা যায়।

ব্রোঞ্জের স্তূপপ্রতিকৃতি

এখানে একটি অতি সুন্দর ব্রোঞ্জনির্মিত স্তূপপ্রতিকৃতি পাওয়া গেছে। চতুষ্কোণ ভিত্তিবেদীর উপর নির্মিত ও নলাকার 'ড্রাম' ও অর্ধগোলাকার গম্বুজবিশিষ্ট এই প্রতিকৃতিতে গম্বুজের উপরে আছে ক্রমহ্রাস্বমান একটি 'হার্মিকা' এবং হার্মিকার উপরে আছে গোলাকার স্তূপশীর্ষ। এই স্তূপপ্রতিকৃতির চারদিকে আছে পিরামিড আকারে

নির্মিত ৪টি মন্দিরের প্রতিকৃতি। এই চারটি মন্দিরের প্রত্যেকটিতে একটি করে বৌদ্ধমূর্তি আছে। এগুলির মধ্যে দুটি পদ্মপাণি, একটি বজ্রপাণি ও অপরটি ৪ হাত বিশিষ্ট একজন বৌদ্ধ দেবীমূর্তি। মূর্তিগুলির দু'পাশে আছে অলঙ্কৃত স্তম্ভ। [বৌদ্ধ স্তূপের প্রতিকৃতির রঙিন ছবি-২৬]

এই প্রতিকৃতি থেকে তখনকার দিনের বৌদ্ধ স্তূপগুলির আকার, অবয়ব ও গঠনপ্রণালী সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

পোড়ামাটির চিত্রফলক

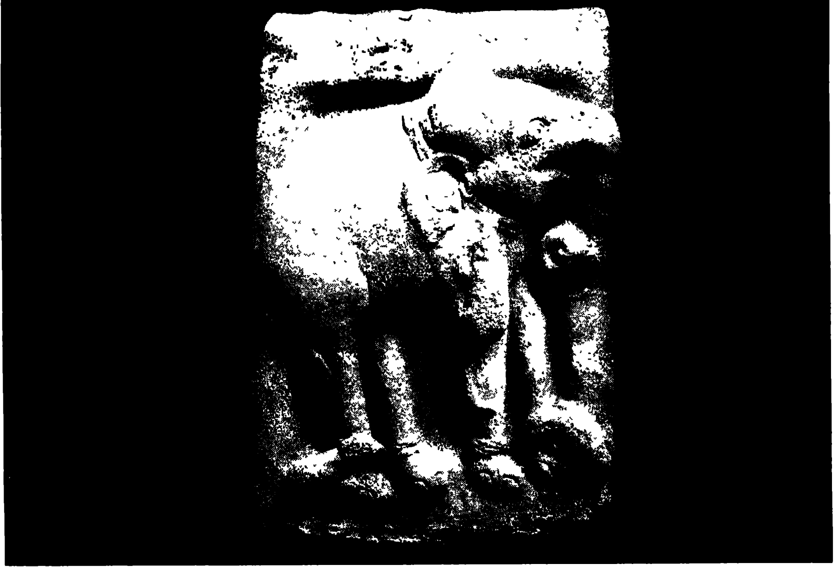
তৃতীয় নির্মাণযুগে (সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী) বৌদ্ধ দেববংশীয় নৃপতিদের রাজত্বকালে নির্মিত শালবন বিহারের ক্রুশাকার কেন্দ্রীয় মন্দিরের পূর্ব ও পশ্চিম ভিত্তিদেয়ালে ও ধারে কাছে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকা অসংখ্য পোড়ামাটির চিত্রফলক (terra-cotta plaques) পাওয়া গেছে। এর আগে বা পরে নির্মিত মন্দিরটিতে কোনো পোড়ামাটির চিত্রফলক পাওয়া যায়নি। এগুলির গুণাগুণ, বৈশিষ্ট্য ও উল্লেখযোগ্য একরূপত্ব দেখেও ধারণা হয় যে এগুলি সব একই নির্মাণযুগে অর্থাৎ বৌদ্ধ দেববংশীয় নৃপতিদের রাজত্বকালেই নির্মিত হয়েছিল।

পাহাড়পুর বিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরে প্রাপ্ত চিত্রফলকের তুলনায় এগুলির সংখ্যা অনেক কম হলেও এগুলি সংখ্যায় খুব নগণ্য নয়। গুণগত দিক থেকেও এগুলির বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। এগুলির শৈল্পিক উৎকর্ষ খুব উঁচু মানের নয়। সহজলভ্য কাদামাটি ও স্থানীয় শিল্পীদ্বারা তৈরি এসব চিত্রফলকে ভাস্কর্যশিল্পের গতানুগতিক তুলাদণ্ডের বিচারে হয়ত অনেক ত্রুটি ধরা পড়বে। কিন্তু তৎকালীন সমাজ-জীবন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায় এসব চিত্রফলকে এবং সেদিক থেকে এগুলির মূল্য অপরিসীম বলা যেতে পারে। বৈচিত্র্য ও বর্ণনাসৌষ্ঠবে এক অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় ফলকগুলিতে। এগুলির মধ্যে নিয়ম-কানুনের দৈন্য থাকতে পারে, ত্রুটি থাকতে পারে সঠিক কলাকৌশল প্রয়োগে কিন্তু জীবনাবেগের প্রাচুর্য ও সহজ প্রকাশভঙ্গির সাবলীলতায় চিত্রফলকগুলির মধ্যে যে প্রাণ-প্রাচুর্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা সত্যিই অতুলনীয়। তদানীন্তন গ্রাম-বাঙলার মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, দেবতা ও অপদেবতার প্রতি তাদের বিশ্বাস এবং পাশাপাশি অবস্থানরত প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের একটি প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বল রূপ পাওয়া যায় এ সব চিত্রে।

এসব চিত্রফলকে যে কত বিচিত্র ছবি তুলে ধরা হয়েছে, তা বলে শেষ করা যায় না। সেকালের গ্রাম-বাঙলার মানুষের জীবনে যা কিছু উল্লেখযোগ্য ছিল, সবই যেন এগুলিতে স্থান পেয়েছে। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, জীবজন্তু, পাখি, দেবতা, অর্ধদেবতা, ফুল, তলাপাতা ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছুই চিত্র ফলকগুলিতে স্থান পেয়েছে।

মানুষের ছবির মধ্যে আছে বালক-বালিকা, যোদ্ধা, গায়ক, নর্তক, মল্ল, বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত অথবা অবসররত স্ত্রী-পুরুষের চিত্র। অর্ধদেবতাদের মধ্যে আছে, গন্ধর্ব,

অপ্সরা, মকর, কীর্তিমুখ, কিন্নর-কিন্নরী প্রভৃতি। কিন্নরীদের দেহের উর্ধ্বাংশ স্ত্রীলোকের মত, নিম্নাংশ জন্তুর মত কিন্তু পাখীর মত এদের পাখা আছে



▲ পোড়ামাটির ফলকচিত্র, পাহাড়পুর

প্রাণীজগতে আছে, সিংহ, হস্তী, হরিণ, বন্যবরাহ, বানর, অশ্ব, মহিষ ইত্যাদি পশু, রাজহংস, ময়ূর ইত্যাদি পাখি, সর্প, নেউল ইত্যাদি সরিসৃপ এবং মৎস্য, কচ্ছপ ইত্যাদি জলচর প্রাণী। উদ্ভিদজগতে আছে নানা রকম গাছ, পদ্ম ফুল ইত্যাদি।

সিংহের মূর্তিগুলিতে রাজকীয় মর্যাদার অভিব্যক্তি লক্ষণীয়। কেন্দ্রীয় মন্দিরের প্রতিকোণে এক মস্তক ও দুই দেহবিশিষ্ট সিংহমূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হস্তী ও বন্যশূকর রূপায়ণে এক আশ্চর্যজনক স্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়। অশ্ব ও মহিষ অঙ্কনেও সেই দক্ষতা লক্ষণীয়। বানরমূর্তিগুলির প্রতি শিল্পীর বিশেষ সহানুভূতি ছিল বলে মনে হয়। এক অপূর্ব মাধুর্যের পরিচয় পাওয়া যায় রাজহংসের মূর্তিগুলিতে। নেউল ও ফণাবিশিষ্ট সর্পের যুদ্ধচিত্রটি এক অপরূপ বাস্তবতার স্বাক্ষর বহন করে।

মোটকথা, এসব চিত্রফলকে সেকালের গ্রাম-বাঙ্লার লোকশিল্পের এক বাস্তব পরিচয় ফুটে উঠেছে। সেই সঙ্গে আছে সেকালের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের একটি আলেখ্যও।

নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য

শালবন বিহারে খননের ফলে যে সব নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য পাওয়া গেছে, সেগুলিও কম উল্লেখযোগ্য নয়। এগুলির মধ্যে আছে বিভিন্ন ধরন, আকার ও গঠনের মৃৎপাত্র।

মৃৎপাত্রগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটিতে অষ্টম শতাব্দীর অক্ষরের ধরনের কিছু লিপি দেখা গেছে। তবে সেগুলির মধ্যে কোনো ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়নি। মাটির তৈরি দ্রব্যের মধ্যে দোয়াত, তেলের প্রদীপ ইত্যাদিও পাওয়া গেছে।

আর পাওয়া গেছে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ নির্মিত নানাবিধ অলঙ্কার। এগুলির মধ্যে আছে, আঙ্টি, কানের দুল, হাতের চুড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই সঙ্গে পাওয়া গেছে রৌপ্যখণ্ড, লৌহনির্মিত কড়ি, পেরেক, বড়শি, দা, ছুরি, কাঁচি, কোদাল, খন্তা ইত্যাদি যন্ত্র। প্রস্তরনির্মিত দ্রব্যের মধ্যে শিল-নোড়া ও জাঁতাকল উল্লেখযোগ্য।

এখানে বিপুল সংখ্যক মূল্যবান পাথরের গুটিকা (beads of semi-precious stones) পাওয়া গেছে। এগুলি খুবই প্রাচীন। এগুলি মৌর্যযুগে প্রচলিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতদের অভিমত।

ইতিহাস

লালমাই-ময়নামতি অঞ্চলে বিশেষ করে শালবন বিহারে প্রাপ্ত বৌদ্ধ দেববংশীয় নৃপতিদের বিভিন্ন তাম্রশাসন ও সীল থেকে জানা যায় যে, বৌদ্ধ দেববংশীয় মহারাজ শ্রী শান্তিদেবের পৌত্র ও মহারাজ শ্রীবীরদেবের পুত্র পরমসৌগত পরমভট্টারক পরমেশ্বর মহারাজাধিরাজ শ্রী আনন্দদেব এই মহাবিহারের জন্য ভূমিদান করেছিলেন এবং তাঁর পুত্র পরমসৌগত পরমভট্টারক পরমেশ্বর মহারাজাধিরাজ শ্রী ভবদেব এই মহাবিহার নির্মাণ করেছিলেন। পণ্ডিতদের ধারণা এই রাজবংশ অষ্টম শতাব্দীতে এ অঞ্চলের অধিকারী ছিল। এর আগে এখানে একটি প্রাচীনতর বিহার ছিল কিনা এবং সেই প্রাচীন বিহারের ধ্বংসাবশেষের উপর শালবন বিহার নূতন করে নির্মিত হয়েছিল কিনা, তা সঠিকভাবে বলা যায় না।

অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত বিহারটি আরও প্রায় পাঁচশ' বছর টিকে ছিল এবং প্রথম বিহার নির্মাণের পরে এতে আরও পাঁচবার নির্মাণকার্য করা হয়েছিল। দেববংশের অব্যবহিত পরে এ বিহার কোন্ রাজবংশের পৃষ্ঠাপোষকতা লাভ করেছিল, তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। নবম শতাব্দীতে কুমিল্লা অঞ্চলের প্রশাসনিক ইতিহাস প্রায় অজ্ঞাত বলা যায়।

দশম থেকে একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বৌদ্ধ চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণ এ অঞ্চলে রাজত্ব করেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এসব নৃপতি যে শালবন বিহার রক্ষণাবেক্ষণে যথেষ্ট সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন, তা অনুমান করা যায় যদিও এ সম্পর্কে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। চন্দ্রদের পরেও শালবন বিহার অনেককাল ধরে টিকে ছিল। খুব সম্ভব চতুর্দশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলে মুসলিম অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত এই বিহারটি কোনো রকমে টিকে ছিল এই অঞ্চলের বৌদ্ধ নরপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায়। তার পরে এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম এবং বৌদ্ধ রাজবংশের অবলুপ্তির ফলে বিহারটি ধ্বংস হয়ে যায়।

২. আনন্দ বিহার

লালমাই-ময়নামতির কীর্তিগুলির মধ্যে আনন্দ বিহারের প্রথম ক্রমিক নম্বর ছিল সি.এম. ৫ এবং পরে এর নম্বর হয় সি.এম ৪। এস্থান শালবন বিহার থেকে ৩.২ কিলোমিটার উত্তরে এবং কোটিলামুড়া থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণপুবে অবস্থিত। লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ের পূর্বভাগে অবস্থিত এ বিহার অপেক্ষাকৃত নিচু ও সমতল ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। আনন্দরাজার বাড়ি নামে অধিক পরিচিত এ বিহার থেকে লক্ষ লক্ষ প্রাচীন ইট ও অন্যান্য সামগ্রী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল কুমিল্লা বিমানবন্দর ও অন্যান্য ইমারত নির্মাণের জন্য। ১৯৪২ সালে অবিভক্ত ভারতের প্রত্নতত্ত্ব দফতরের তদানীন্তন কর্মকর্তা এ স্থান পরিদর্শন করেন এবং প্রায় ১ ফার্লং দীর্ঘ বাহুবিশিষ্ট একটি বৌদ্ধ বিহার ও বিহারের মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি সুবৃহৎ কেন্দ্রীয় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব দেখতে পান। কিন্তু তার দেখার পরও এ স্থান থেকে ইট হরণ করার পক্রিয়া থেমে যায়নি এবং এর ফলে বিহার ইমারত ও কেন্দ্রীয় মন্দিরের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়।

১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতরের তদানীন্তন সুপারিনটেনডেন্ট ডক্টর হারুন-উর-রশিদের তত্ত্বাবধানে এখানে উৎখনন কার্য আরম্ভ হয় এবং পর পর কয়েক বছর ধরে শীতকালে এখানে উৎখনন কার্য চলে। এর ফলে এখানে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ও লালমাই-ময়নামতি অঞ্চলের সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। বর্গাকারে নির্মিত এ বিহারের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য বাইরের দিকে ছিল ১৮৯.৯ মিটার (৬২৪ ফুট)। বিহারের উত্তর বাহুর মধ্যস্থলে ছিল বিহারের প্রবেশ পথ এবং তা ছিল ৩৩.১৫ মিটার লম্বা ও ১৩.০৯ মিটার (৯৯´ – ৬´´ × ৪৫´) চওড়া। এই সুদৃশ্য প্রধান তোরণটি তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রবেশপথের সামনের দিকে ছিল একটি হলরুম এবং এর আয়তন ছিল ৯.০৯ মিটার × ৪.৬ মিটার (৩০´ × ১৫´)। এর পরেই ছিল আর একটি হলরুম এবং এর আয়তন ছিল ৭.২৭ মিটার × ২.৫৭ মিটার (২৪´ × ৮´ – ৬´)। প্রবেশপথের উভয়দিকে ৬টি কক্ষ উৎখননের পর আংশিকভাবে উন্মোচিত হয়েছে। প্রবেশপথটি একাধিকবার নির্মিত হয়েছিল বলে উৎখননের পরে প্রমাণিত হয়েছে। মাটির উপরে বিহার ইমারতের বিশেষ কিছুই টিকে ছিল না বলে বিহারের সীমারেখা অতীব কষ্টের ফলে নির্ধারিত হয়েছে এবং প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্যের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

বিহারের ভিতরে একটি উন্মুক্ত আঙ্গিনা ছিল এবং সেই আঙ্গিনাতেই ছিল ডক্টর টি,এন, রামচন্দ্রন কর্তৃক উল্লিখিত কেন্দ্রীয় মন্দির। তিনি তাঁর প্রতিবেদনে বলেন যে, পাহাড়পুর বিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরের মতো আনন্দ বিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরটিও বিরাট আকারের ছিল। কিন্তু ইট হরণকারীদের দৌরাত্ম্যে সেই মন্দিরের কিছুই টিকে ছিল না বলে উৎখননের পরে এ সম্বন্ধে কোনো বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্দিরের স্থানে অসংখ্য পোড়ামাটির চিত্রফলকও অলঙ্কৃত ইটের অস্তিত্বের যে বর্ণনা ডক্টর রামচন্দ্রন দেখিয়েছিলে তাতে মনে হয় যে, মন্দিরটি খুবই অলঙ্কৃত ছিল।

উৎখননের সময় মন্দিরের উন্মুক্ত আঙ্গিনায় বেশ কয়েকটি ছোটখাট ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছিল। এগুলি ছিল খুব সম্ভবত সহায়ক ইমারত। তবে এগুলি এমনভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে যে, এগুলির স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি এবং আরও উৎখনন কার্য করেও কোনো লাভ হবে না বলে জানা যায়।

প্রত্নবস্তু : অনুসন্ধান, উৎখনন ইত্যাদির মাধ্যমে এবং অন্যদের আহরিত হওয়ার কারণে আনন্দ বিহারে অনেক মূল্যবান প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, (১) নিউলিথিক যুগের অস্ত্রশস্ত্র, (২) মূল্যবান পাথরের গুটিকা, (৩) মুদ্রা, (৪) তাম্রলিপি, (৫) ব্রোঞ্জনির্মিত ভোটিত স্তূপ, (৬) পোড়ামাটির চিত্রফলক, (৭) অলঙ্কৃত ইট, (৮) টেরাকোটা সিল, (৯) ভোটিভ স্তূপ, (১০) লোহার পেরেক ইত্যাদি, (১১) হাঁড়িপাতিল ও হাঁড়িপাতিলের টুকরা ইত্যাদি ইত্যাদি।

আনন্দ বিহারে যখন প্রথম সার্ভে করা হয়, তখন কেন্দ্রীয় মন্দিরের স্থানে (site) অসংখ্য পোড়ামাটির চিত্রফলক, অলঙ্কৃত ইট ইত্যাদি দেখা গিয়েছিল। কিন্তু উৎখননের সময়ে এগুলির কিছুই আর দেখা যায়নি। প্রকৃতপক্ষে এগুলি ছিল কেন্দ্রীয় মন্দিরের ভিত্তিদেশের মধ্যে। কিন্তু উৎখননের সময়ে কোনো ভিত্তিদেশই পাওয়া যায়নি বিধায় এগুলি দেখা যায়নি। অবশ্য মিলিটারি ঠিকাদারগণ কর্তৃক ইট হরণকারীদের নিকট থেকে যে সব প্রত্নবস্তু সংগৃহীত হয়েছিল এবং ভূমিতে পড়ে থাকা অবস্থায় যেগুলি পাওয়া গিয়েছিল সেগুলির বেশির ভাগ কলকাতাতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল এবং খুবসম্ভব সেগুলি এখন ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম কলকাতাতে আছে।

নিউলিথিক যুগের অস্ত্রশস্ত্র : আনন্দ বিহারে উৎখননের সময়ে কয়েকটি প্রস্তর নির্মিত হস্তফুট এবং সেগুলির কিছু অসমাপ্ত নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছিল। সেগুলি এখন যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

মূল্যবান পাথরের গুটিকা : আনন্দ বিহারে উৎখননের পরে সীমিত সংখ্যক মূল্যবান পাথরের গুটিকা আবিষ্কৃত হয়েছিল। সাধারণত এগুলিকে প্রাক-মৌর্যও মৌর্য যুগের বলে ধরা হয়।

মুদ্রা : আনন্দ বিহারে ষাঁড় ও ত্রিশূল ('bull and triglyph') প্রতীক বহনকারী ৬৩টি মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল মিলিটারি ঠিকাদারদের কর্তৃক। এগুলির মধ্যে একটি মাত্র মুদ্রা কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে বলে জানা গেছে। উপরে উল্লিখিত মুদ্রা ছাড়া গুপ্ত-পরবর্তী যুগের গুপ্তঅনুকৃত একটি মুদ্রা ও ষাঁড় ও ত্রিশূল প্রতীক বহনকারী একটি (রৌপ্য) মুদ্রা উৎখননের পর প্যাওয়া গেছে।

তাম্রলিপি : দেববংশের মহারাজা ভবদেবের একটি তাম্রশাসন কলকাতার *এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকায়* ডক্টর ডি.সি. সরকার কর্তৃক ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয়েছে এবং এর নাম দেওয়া হয়েছে 'ক্যালকাটা কপার প্ল্যাট অব কিং ভবদেব' (Calcutta Copperplate of king Bhavadeva)।

এ সম্পর্কে ডক্টর হারুন-অর-রশিদ নিম্নলিখিত যে বক্তব্য দিয়েছেন তার সারমর্ম নিচে তুলে ধরা হল।[১] ১৯৪৩-৪৪ সালে কুমিল্লা শহরের এক ব্যক্তি তাঁর তরুণ

Bangladesh Archaiology (Published by the Deptt of Archaeology & Museum), 1979 A.D. P.93.

ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে করে আনন্দ বিহারে এই তাম্রফলকটি আবিষ্কার করে কিছুটা হতাশ হন এর প্রকৃত মর্ম অবগত না হওয়ার কারণে। প্রথমে তিনি এটিকে তাঁর হাঁস-মুরগির খোওয়াড়ের দরজা হিসাবে ব্যবহার করেন এবং পরে তা অতি স্বল্পমূল্যে কুমিল্লা শহরের একজন হিন্দু ব্যবসায়ী ও সিনেমা হলের মালিকের নিকট বিক্রি করেন। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময় সেই ভদ্রলোক তা কলকাতায় নিয়ে যান। ডক্টর রশিদ কুমিল্লাতে অনুসন্ধান করে জানতে পারেন যে, ডক্টর ডি,সি, সরকার কর্তৃক প্রকাশিত তাম্রলিপি ও আলোচ্য তাম্রলিপি এক ও অভিন্ন।

ব্রোঞ্জ ভোটিভ মূর্তি : উৎখননের পরে আনন্দ বিহারে বুদ্ধ, ধানী বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, চার থেকে আট হাতবিশিষ্ট বৌদ্ধ দেবী তারা বা চুণ্ডার ব্রোঞ্জমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।

পোড়ামাটির চিত্রফলক : আনন্দ বিহারে উৎখননের পরে প্রাপ্ত পোড়ামাটির চিত্রফলক তুলনামূলকভাবে শালবন বিহারে প্রাপ্ত পোড়ামিটর চিত্র ফলকের চেয়ে উন্নতমানের। সংগৃহীত চিত্রফলকের মধ্যে আছে নর ও নারী, যক্ষ, সুন্দর পাখাসহ রাজহংস, মকর, বন্য শূকর ইত্যাদি ইত্যাদি'।

অলঙ্কৃত ইট : নানা ধরনের অনেক অলঙ্কৃত ইট এখানে পাওয়া গেছে।

টেরাকোটা সিল : উৎখননের পরে এখানে লিপিসহ অনেক সিল পাওয়া গেছে।

ভোটিভ স্তূপ : কাদামাটি ও পোড়ান কাদামাটির অনেক ভোটিভস্তূপ এখানে পাওয়া গেছে।

লোহার পেরেক ইত্যাদি:লৌহ নির্মিতঅনেক পেরেক এবং লৌহ নির্মিত আরও অনেক বস্তু এখানে উৎখননের পরে পাওয়া গেছে।

মৃৎপাত্র : উৎখননের পরে এখানে অসংখ্য মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে আছে রান্না করার মৃৎপাত্র, বিভিন্ন ধরনের থালাবাটি, প্রদীপ ইত্যাদি।

ব্রোঞ্জনির্মিত মূতি : উৎখননের পরে এখানে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জমূর্তির সংখ্যা অনেক। এগুলির মধ্যে আট হাতবিশিষ্ট তারা মূর্তির যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। এখানকার তারামূর্তি খুব সম্ভবত লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ে প্রাপ্ত তারামূর্তিগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ধ্যানীবুদ্ধের দুটি মূর্তি শালবন বিহারে প্রাপ্ত মূর্তির চেয়ে উন্নত মানের।

আনন্দরাজার দিঘি : আনন্দ রাজার দিঘি নামে পরিচিত এ জলাশয়ের অবস্থান আনন্দ বিহার থেকে প্রায় ৯০ মিটার পুবে। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এ জলাশয়ের আয়তন ৪৫৪.৫৪ মিটার × ১৮১.৮১ মিটার এবং এটি ২১ একর ভূমির উপরে অবস্থিত। এখনও (১৯৭৫ খ্রিঃ) এর গভীরতা প্রায় ৭.৫৭ মিটার এবং পাড়গুলি প্রায় ৬ মিটার উঁচু। এ জলাশয় খুব সম্ভব আনন্দ বিহারের জন্য খনিত হয়েছিল।

আনন্দ বিহারের ইতিহাস : আনন্দ বাজার বাড়ি নামে পরিচিত এ বিহার খুব সম্ভব মহারাজা আনন্দদেব কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল তাঁর ও তাঁর পুত্র মহারাজা ভবদেবের রাজত্বকালে। খুব সম্ভবত অষ্টম শতাব্দীতে এ বিহার নির্মিত হয়েছিল এবং একই শতাব্দীতে সুবিক্যাত শালবন বিহারও নির্মিত হয়েছিল। এটি শালবন বিহারের আগেই নির্মিত হয়ে ছিল বলে ধারণা হয়।

৩. রূপবান কন্যার বিহার

লালমাই-ময়নামতিপাহাড় সংলগ্ন অপেক্ষাকৃত একটি নিচু ও সমতল ভূমিতে অবস্থিত ছিল রূপবান কন্যার বিহার নামে পরিচিত এ বৌদ্ধ বিহার। আনন্দ বিহার থেকে প্রায় ৩০০ মিটার দক্ষিণে এর অবস্থান। পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ এ বিহারের আয়তন ছিল ৯০ মিটার × ৭৫ মিটার (৩০০´ × ২৫০´) এবং এই বিহারের বেষ্টক প্রাচীরের অস্তিত্ব ১৯৩৯ -৪০ সালেও পরিদৃষ্ট হত। কিন্তু ব্রিটিশ আমলের শেষ দিকে এ বিহারের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয় এবং এখানে আধাপাকা কিছু ইমারত নির্মিত হয়। এখানে যে কেন্দ্রীয় মন্দিরসহ একটি ছোট বিহার ছিল তা বোঝা যায় এ স্থানের মাঝখানে একটি অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানের অস্তিত্ব দেখে। খুব সম্ভব সেখানেই ছিল বিহারের কেন্দ্রীয় মন্দির।

এ স্থানে বর্তমানে সেনাবাহিনীর একটি গ্যারাজ নির্মিত হয়েছে। কিন্তু সমগ্র স্থানে অসংখ্য প্রাচীন ইটের ভগ্নাংশ এখনও দেখা যায়।

বছর কয়েক আগে এখানে একটি তাম্রলিপি পাওয়া গিয়েছিল বলে জানা গেছে। কিন্তু তাম্রলিপির পাঠোদ্ধার বা প্রকাশ হয়নি বলে এ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছুই বলা সম্ভব নয়। ব্রোঞ্জ নির্মিত একটি বিরাট আকারের ঘণ্টা এখানে পাওয়া গিয়েছিল এবং তা এখন (১৯৯৬) ময়নামতি যাদুঘরে রক্ষিত আছে। সাধারণত বৌদ্ধ বিহারে এ ধরনের ঘণ্টা ব্যবহৃত হত।

৪. ভোজ বিহার

আনন্দ বিহার থেকে প্রায়-৫০০ মিটার ও রূপবান কন্যার বিহার থেকে প্রায় ২০০ মিটার দক্ষিণে এই বড় ধরনের বিহারটি অবস্থিত। বর্গাকারে নির্মিত এই বিহারের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ছিল ১৩৭.২ মিটার (৪৫২-৭´´)। 'ভোজরাজার বাড়ি' নামে পরিচিত এই টিবিতে উৎখননের পরে দেখা গেছে যে, এখানে একটি বড় ধরনের বৌদ্ধ বিহার ছিল। বর্গাকারে নির্মিত বিহারের প্রত্যেক বাহুতে ভিক্ষুদের বসবাস ও অন্যান্য উদ্দেশে শালবন বিহার বা আনন্দ বিহারের মতো কক্ষাদি নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু এখানকার উৎখনন কার্য এখন (২০০০ সাল) পর্যন্ত বেশ প্রাথমিক পর্যায়েই আছে এবং উৎখননের বেশির ভাগ কাজ করার বাকি আছে।

কেন্দ্রীয় মন্দির : কেন্দ্রীয় মন্দিরটি ৯ মিটার উঁচু একটি টিবিতে অবস্থিত ছিল। পরবর্তীকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এখানে বাঙ্কার নির্মাণ ও ট্রেঞ্চ খনন করে মন্দিরটির ক্ষতিসাধন করেছিল। সেই সঙ্গে পরে ইট হরণকারীরা এর আরও ক্ষতি করে। ডক্টর ডি.এন. রামচন্দ্র ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে এ স্থান পরিদর্শন করে বলেন যে, এখানে কেন্দ্রীয় টিবির উপর ইষ্টকনির্মিত একটি প্রকাণ্ড ইমারত ছিল এবং সেই মন্দিরের প্রাচীরগুলি ছিল সুগঠিত, সেই মন্দিরের নিম্নদেশ (basement) অলঙ্কৃত ইট, পোড়ামাটির চিত্রফলক ইত্যাদি দ্বারা সুশোভিত ছিল।[১] এখানে পরবর্তীকালে যে প্রায় ১০টি অতি সুন্দর

১. Dr. T.N. Ramchandran : 'Recent Archaeological Discoveries along the Mainamati Ranges' (D.R. Bhanderker (ed.), B.C. Law Volume, Part 2, Pocna, 1946, p. 244, pl. II, ab.

পোড়ামাটির চিত্রফলক পাওয়া গিয়েছিল তাতে ডক্টর রামচন্দ্রনের উক্তির নির্ভুল সমর্থন মিলে। অবশ্য মন্দিরের বেইজমেন্ট প্রাচীরে এখনও (২০০০ খ্রিঃ) উৎখননকার্য করা হয়নি যাতে সেখানকার প্রাচীরে অলঙ্করণের দৃশ্য সরেযমিনে দেখা যায়।

এখানকার উৎখনন কার্য প্রধানত কেন্দ্রীয় ঢিবিতে অবস্থিত বৃহৎ ও ক্রুশাকারে নির্মিত কেন্দ্রীয় মন্দিরের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং সেই মন্দিরের মাত্র একাংশ উন্মোচিত হয়েছে এবং মন্দিরটির সম্পূর্ণ অবয়ব বের করার অপেক্ষায় আছে। তবে উৎখননের পরে যেটুকু জানা গেছে তাতে দেখা যায় যে, মন্দিরের উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম বাহুর দৈর্ঘ্য ছিল ৩৪ মিটার করে। মন্দিরের গর্ভগৃহের আয়তন ছিল ৩.১ মিটার × ১.৯ মিটার এবং এর চারদিকে যে প্রদক্ষিণ পথ ছিল তার প্রশস্ততা ছিল ২.২ মিটার এবং এর বাইরের দেয়াল ছিল ১-২ মিটার প্রশস্ত।

শালবন বিহার, আনন্দ বিহার ও ভোজবিহারে উৎখননের পরে লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ের এই অঞ্চলে নির্মিত এই বিহার তিনটির মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখা যায় তা বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। এই তিনটি বিহারই বর্গাকারে নির্মিত এবং ভিতরের প্রকাণ্ড উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে তিনটিতেই বিরাট আকারের কেন্দ্রীয় মন্দির ছিল। রাজশাহী জেলার বিহারৈল-বিহার (খুব সম্ভব পঞ্চম শতাব্দীর), দিনাজপুর জেলার সীতাকোট বিহারে (খুব সম্ভব পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীর) ও বগুড়া জেলার শালবন রাজার বাড়ি নামক রৌদ্ধ বিহার (খুব সম্ভব সপ্তম শতাব্দীর) কোনো কেন্দ্রীয় মন্দিরের অস্তিত্ব দেখা যায় না। অথচ লালমাই-ময়নামতি অঞ্চলে নির্মিত বিহারগুলিতে অতি সুন্দর ও সুপ্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্দিরের অস্তিত্ব দেখা যায়। আনন্দ বিহার ও শালবন বিহার অষ্টম শতাব্দীতে দেববংশীয় নৃপতিদ্বের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল বলে দেখা যায়। ভোজবিহার কবে নির্মি হয়েছিল সে সম্বন্ধে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য এখন (২০০০ সাল) পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে ভূমি পরিকল্পনায় এ বিহার যে শালবন ও আনন্দ বিহারের অনুরূপ তা সহজেই অনুধাবন করা যায় এবং সেই বিচারে এটিকে অন্য দুটি বিহারের সমসাময়িক বলা খুব অসঙ্গত নাও হতে পারে। তবে এ ব্যাপারে শেষ কথাই বলার জন্য উৎখনন কার্য সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে।

বিহার ইমারত : বিহার ইমারতের উৎখননকার্য এখন পর্যন্ত খুবই সীমাবদ্ধ। এ পর্যন্ত উত্তর ব্লকের প্রবেশপথসহ সামান্য অংশেই উৎখনন কার্য করা হয়েছে এবং তাতে মাত্র ১০ টি কক্ষ বের করা হয়েছে। কক্ষগুলির আয়তন ৩.৫ মিটার × ৩.৩ মিটার এবং ৩.১ মিটার × ৩.২ মিটার ছিল বলে দেখা যায়। পিছনের দেয়ালের প্রশস্ততা ছিল ৪.২৪ মিটার। তবে পরবর্তীকালে মেরামতের সময় এ দেয়ালের প্রশস্ততা কিছুটা কমিয়ে ফেলা হয়েছিল বলে দেখা যায়। যদিও বিহারের চারদিকের সীমানা নির্দিষ্ট হয়েছে এখন পর্যন্ত বিহার সম্বন্ধে অন্যকোনো বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়নি।

প্রত্নবস্তু : বিহার ইমারতে কোনো গভীর উৎখনন কার্যকরা হয়নি বলে তেমন কোনো বিশেষ প্রত্নবস্তু এখানে পাওয়া যায়নি। অবশ্য কেন্দ্রীয় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রায় একশ' অতীব সুন্দর পোড়ামাটির চিত্রফলক পাওয়া গেছে। এগুলি ইটহরণকারীদের কর্তৃক পরিত্যক্ত বস্তু ছিল বলে সহজেই ধারণা করা যায়।

ব্রোঞ্জনির্মিত একটি সুবৃহৎ বৌদ্ধ বজ্রসত্ত্ব মূর্তি কেন্দ্রীয় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। মুর্তিটি মন্দিরের উত্তর বাহুতে একটি কক্ষের মধ্যে ইটও ধ্বংসস্তুপ দ্বারা অতি সাবধানে গোপন করে রাখা হয়েছিল এবং এটি খুবই সুন্দর অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। [ভোজবিহারে প্রাপ্ত বজ্র সত্ত্ববুদ্ধ মূর্তির রঙিন ছবি-২৫]

এটি গোপন করে রাখার প্রয়োজন ছিল বলেই এমনভাবে রাখা হয়েছিল। এ মূর্তিটির বয়স সম্পর্কে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। আমেরিকার ওহাইও (Ohio) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও 'বুদ্ধিস্ট আইকনোগ্রাফির এনসাইক্লোপয়োডিয়া'-র প্রধান গ্রন্থকার (Prof. of Hisrory of Art and Principal Author of the Encychlopoedia of Buddhist Iconography) মিসেস জন সি হানটিংটন (Mrs. John C. Huntington) ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকাতে একটি লিখিত বক্তৃতায় বলেন যে, এ মূর্তি অষ্টম শতাব্দীর। তিনি মূর্তির যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তিনি অন্যান্য বুদ্ধ যথা বৈরচনা (ধর্মচক্র মুদ্রা), অমিতাভ (ধ্যানমুদ্রা), রত্নসম্ভবা (বরদমুদ্রা), অক্ষব্যা (ভূমিস্পর্শ মুদ্রা) অমোঘসিদ্ধি (অভয়মুদ্রা) প্রভৃতি সম্বন্ধে যা বলেছেন তাতেও আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এ মূর্তিকে অষ্টম শতাব্দীর বলে মেনে নিতে আমাদের আপত্তির অবধি নেই।

এটি স্বীকৃত সত্য যে, মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে তান্ত্রিকবাদ গড়ে উঠেছিল এবং তার ফলে বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে মন্দ্রযান, বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি মতবাদ গড়ে উঠে এবং বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে বাঙলায় এসব গড়ে উঠে খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর আগে নয়। অতএব এই মূর্তি (বজ্রযান) অষ্টম শতাব্দীর কিছুতেই হতে পারে না।

এই বৌদ্ধ বিহার অষ্টম শতাব্দীতে অথবা এর আগে সপ্তম শতাব্দীতে খড়্গদের সময়েও নির্মিত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু বজ্রসত্ত্বের এ মূর্তি দশম শতাব্দীর পূর্বে এবং অষ্টম শতাব্দীতে কিছুতেই নির্মিত হতে পারে না।

৫. সেনানিবাসের পাহাড়ের বাংলার বিহার

ঢাকা-কুমিল্লা সড়ক ও কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়কের মিলনস্থানের (junction) এক কিলোমিটারেরও কম উত্তরে এবং কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়কের পশ্চিমদিকে একীর্তিটি অবস্থিত। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এ ঢিবির আয়তন ১২৮ মিটার × ১১৩ মিটার (৪২৫´ × ৩৭৫´) এবং এটি একটি উঁচু ভূমিতে অবস্থিত থেকে এর মধ্যে যে একটি অতি মূল্যবান প্রত্নকীর্তি লুক্কায়িত আছে তা প্রমাণ করে।

ব্রিটিশ আমলে ও পরিবর্তীকালে পাকিস্তান আমলে এ ঢিবির যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে এটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অধিকারে আছে। আমেরিকান প্রত্নতত্ত্ববিদ মিস্টার বেরি মরিসন (Berric M. Morison) এ স্থান সম্পর্কে বলেন,

"In the center of the site are a series of cement slabs where the British Army had built barracks (which are now removed). The general level of the top of the site is about 15 feet above the ground level on the east and about 6 to 8 fet above the level on the west.

Old broken bricks and fragments of walls are intermixed with modern brick and cement from the British period. Pottery is found sparcely over the surface of the site and on the slopes where the road approches the site. Several trenches had recently been cut by the military authorities, revealing old brick walls and pottery in situ to a depth of about $4\frac{1}{2}$ feet, which was as deep as the digging went. The general configuration of the perimeter and the size of the site suggest a monastic site resembling Salban Vihara.'"

৬. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নিহত সৈনিকদের সমাধিস্থানের বিহার

ঢাকা-কুমিল্লা মহাসড়ক ও কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়কের সংযোগস্থল থেকে প্রায় ১৫০০ মিটার উত্তরে এবং রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত একটি অনুচ্চ পাহাড় জুড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত সৈনিকদের সমাধিস্থল অবস্থিত।

এখানে একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ছিল। সৈনিকদের সমাধি নির্মাণের জন্য এখানকার প্রাচীন কীর্তিটি এমনভাবে বিপর্যস্ত করা হয়েছে যে, এর সঠিক আয়তন এখন নির্ণয় করা খুব সহজসাধ্য নয়। তবে যতটুকু ধারণা করা যায় বর্গাকারে নির্মিত এই বিহারের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ১১০ মিটার। মাঝখানে ছিল এর প্রধান মন্দির। সেখানে যে ঢিবিটির উপর বর্তমান কালের স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে, সেই ঢিবিটি প্রায় ৪ মিটার উঁচু। এটি শালবন বিহারের সমসাময়িক ছিল ধারণা করা হয়।

৭. কোটবাড়ি বিহার

কুমিল্লা 'বারড়' (B.A.R.D) অফিসের প্রধান তোরণ থেকে প্রায় এক কিলোমিটার পশ্চিমে এবং কুমিল্লা-কালিরবাজার রাস্তার উপরে পাহাড়ের উপত্যকার প্রায় সমতল ভূমিতে এই বিহার অবস্থিত ছিল। আমেরিকান পণ্ডিত মি. বেবি মরিসন বিংশ শতাব্দির ষাটের দশকে এ স্থান দর্শন করে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন তার বাংলা অনুবাদ নিম্নে তুলে ধরা হল।

"কোটবাড়ি বিহার ছিল একটি বড় ধরনের বৌদ্ধ বিহার। [উত্তর দিকে] এর প্রবেশ পথের উভয় পার্শ্বে ও প্রবেশপথকে ঘিরে ছিল দুটি ছোট ইমারত। বাইরের দেয়ালের ভিতরে আছে ৮৫ গজ বাহু বিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্র। এ স্থানকে ইট সরাবার ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল বলে এখানে দণ্ডায়মান কোনো ইমারত নেই। তা সত্ত্বেও এর বাইরের দেয়াল দ্বারা এক সময়ে পরিবেষ্টিত ছিল শালবন বিহারের ভিক্ষুদের কক্ষের মতো কক্ষসমূহ। স্থানে স্থানে এখনও আছে ছয় কি সাত ফুট উঁচু ইটের প্রাচীর। বিহারের মধ্যস্থানে পার্শ্ববর্তী ভূমি থেকে প্রায় ৮ ফুট উঁচু অবস্থায় একখণ্ড ভূমি দেখে মনে হয় যে, এখানেই ছিল বিহারের কেন্দ্রীয় মন্দির। কেন্দ্রীয় মন্দির থেকে বিহারের প্রবেশপথের অস্তিত্ব অনুধাবন করা যায়। বাইরের দুটি ইমারতের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে উত্তরের প্রাচীর ভেদ করে একটি উঁচু পথ বিহারের মধ্যস্থলে অবস্থিত কেন্দ্রীয় মন্দির

পর্যন্ত প্রসারিত আছে। প্রবেশপথকে পরিবেষ্টন করে যে দুটি ইমারতের [ধ্বংসাবশেষ] আছে তা পাশ্ববর্তী ভূমি থেকে তিন বা চার ফুট উঁচু যদিও অতি কাছ দিয়ে সড়ক চক্ষে যাওয়া এই ইমারতের সঠিক উচ্চতা নির্ধারণ করা কঠিন। এই ইমারত দুটির প্রত্যেকটি ব্যাস ছিল দশ থেকে পনের তাজ।"

এই বিহার সম্বন্ধে মি. বেরি এম. মরিসন যা বলেছেন বর্তমানে (১৯৯৫ খ্রিঃ) তার বিশেষ কিছুই টিকে নেই। উত্তর দিকের প্রবেশপথের দু'পাশে যে দুটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষের কথা বলা হয়েছে সেগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং সমুদয় স্থানকে সমতল ভূমিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ইটের দেয়ালের কোনো অস্তিত্ব বিহার এলাকায় নেই। মাঝখানের উঁচু ভূমির কিছু অস্তিত্ব অবশ্য এখনও (১৯৯৫ খ্রিঃ) দেখা যায়। তবে সমগ্র বিহার এলাকা মোটামুটি সমতল ভূমিতে রূপান্তরিত করে সেখানে ফলবাগান (orchard) করার চেষ্টা চলছে এবং অসংখ্য চারা গাছ লাগান হয়েছে সমগ্র বিহার ভূমিতে। বিহার ভূমির একেবারে পশ্চিম উত্তর ধারে একটি পাকা মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে এবং এর পুব দিকের ভূমিকে মুসলমানের কবরস্থান হিসাবে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে এত সব কিছু সত্ত্বেও এখানে যে একটি বড় ধরনের বৌদ্ধবিহার ছিল তা সহজেই বোঝা যায়।

কুমিল্ল কালিরবাজার রাস্তা এই বিহারের উত্তর পাশ দিয়ে চলে গেছে। এখানে ১২২০ সালে রণবঙ্কমল্ল হরিকেল দেবের যে তাম্রলিটিটি ১৮০৩ সালে আবিষ্কৃত হয়েছিল তা বিহারের উত্তর-পূর্ব-কোণে পাওয়া গিয়েছিল বলে এখানে প্রবল জনশ্রুতি আছে।

(খ) সংযুক্ত বিহারসহ বড় প্রার্থনাস্থান

এ বিভাগে মোট ২ টি কীর্তি আছে এবং সে দুটি হচ্ছে (১) রূপবানমুড়া মন্দির ও সংযুক্ত বিহার এবং (২) বড় ইটাখোলা স্তূপ মন্দির ও বিহার

(১) রূপবান মুড়া মন্দির ও সংযুক্ত বিহার

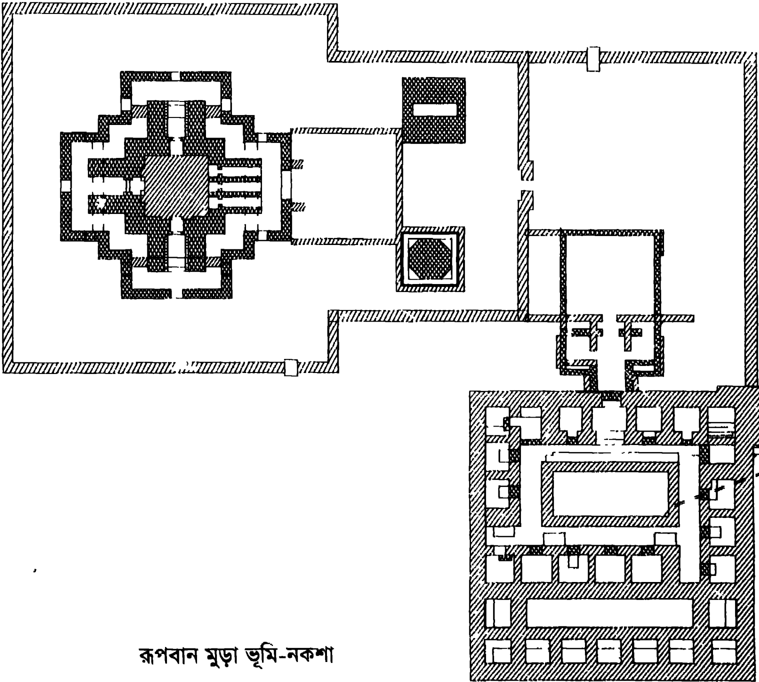
কাল্পনিক রূপবান অথবা রূপবানি নাম কোনো প্রমাণাদি ছাড়াই লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ে অন্তত তিনটি প্রত্নকীর্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত। সেগুলি হচ্ছে আলোচ্য প্রত্নকীর্তি, রূপবান কন্যার বিহার (পূর্বে দ্রঃ) ও রূপবানি মুড়া (পরে দ্রঃ) নামক আলোচ্য কীর্তিটি বার্ড (BARD) ও বি. ডি. আর. অফিস-এর মধ্যবর্তী স্থানে কুমিল্লা-কালিরবাজার রাস্তার লাগোয়া দক্ষিণে একটি ছোট পাহাড়ের উপর অবস্থিত। বড় ইটাখোলা মুড়া (পরে দ্রঃ) ঠিক এর বিপরীতে রাস্তার উত্তর দিকে অবস্থিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এ কীর্তিটি মিলিটারি কন্ট্রাকটার ও ইট হরণকারীদের দ্বারা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ডক্টর টি. এন. রামচন্দ্রন ১৯৪২-৪৩ সালে এ স্থান পরিদর্শন করেন এবং তাঁর প্রতিবেদনের মাধ্যমে জানান যে, পাহাড়পুর বিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরের মতো এটি ছিল ক্রুশাকারে নির্মিত একটি মন্দির। তিনি আরও জানতে পারেন যে, এখানে ৭ টি পাত্রপূর্ণ ভোটিভ বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল। এখানে যে ১৩

টি মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল সেগুলি নাকি ছিল বৌদ্ধ মতবাদ (creed) উৎকীর্ণসহ বজ্রাসনে বুদ্ধ ভট্টারক মূর্তি এবং সেগুলি চট্টগ্রামের ঝিয়রি নামক স্থানে প্রাপ্ত নবম থেকে একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত ব্রোঞ্জমূর্তির মতো ছিল। এখানকার প্রধান ঢিবি থেকে প্রায় দক্ষিণ-পূর্বে, ২০ থেকে ৩০ মিটার দূরে ছিল ইষ্টকনির্মিত একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ।

১৯৮৪ সাল থেকে একানে প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর কর্তৃক উৎখনন কার্য করা হয়। তার ফলে এখানে ক্রুশাকারে নির্মিত বড় মন্দির ও একটি সংলগ্ন বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কৃত হয় এবং সেই সঙ্গে আবিষ্কৃত হয় একটি অষ্টকোণাকারে ও অন্যটি বর্গাকারে নির্মিত দুটি ক্ষুদ্র বৌদ্ধ স্তূপ। গভীর উৎখননের পরে জানা যায় যে, এখানে তিন পর্যায়ে নির্মাণ কার্য চলেছিল।

ক্রুশাকারে নির্মিত বড় মন্দির ঃ উৎখননের পরে দেখা গেছে যে, প্রথম পর্যায়ের নির্মাণকার্য দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্মাণকার্যদ্বারা সম্পূর্ণরূপে ঢাকা পড়েছিল এবং ধ্বংসাবশেষ দেখে ধারণা হয় যে, মন্দিরের মধ্যে ছিল বর্গাকারে নির্মিত একটি ইমারত এবং এর চারদিকে ছিল একটি করে নির্গত 'সেলা' (projecting cella) এবং মন্দিরটি তখন ক্রুশাকারে নির্মিত ছিল না।



রূপবান মুড়া ভূমি-নকশা

দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মিত মন্দিরটি ছিল স্পষ্টতই ক্রুশাকারে নির্মিত একটি ইমারত। কেন্দ্রীয় অংশটি ছিল বর্গাকারে নির্মিত এবং তা থেকে চারদিকে চারটি 'প্রজেকশন' (projection) নির্মিত হয়েছিল। বর্ধিত কেন্দ্রীয় অংশ ও চারদিকের প্রজেকশনের মধ্যে

ছিল কক্ষ (cell) ও হলকামরা (hall) এবং হলকামরাগুলি মন্ডপ হিসাবে ব্যবহৃত হত। উত্তর ও দক্ষিণের প্রত্যেক দিকে ছিল একটিমাত্র 'সেলা' ও সংযুক্ত 'বেস্টিবিউল' (vestibule) কিন্তু পূর্বদিকে ছিল ছিল মন্ডপ হিসাবে ব্যবহৃত তিনটি কক্ষ।

পুনর্গঠনের পরে দেখা গেছে যে, পশ্চিম দিকের সেলার উপরে করবেল্‌ড্ (corbelled) পদ্ধতিতে নির্মিত ছাদ ছিল। তবে এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা না গেলেও অন্য তিন দিকেও অনুরূপ ছাদ ছিল বলে ধারণা করা যায়। মূর্তিস্থাপনের জন্য প্রত্যেক সেলাতে ছিল একটি করে ইষ্টকনির্মিত ভিত্তি (pedestal)। পূর্বদিকের কেন্দ্রীয় সেলাতে একটি প্রস্তরনির্মিত ভিত্তি ছিল (এখন সেটি নিশ্চিহ্ন)। এর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বেলে পাথরে নির্মিত বিরাট (colossal) আকারের বুদ্ধমূর্তিটি। সেটি বর্তমানে (১৯৯৫ খ্রিঃ) ময়নামতি মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। ব্রোঞ্জ মূর্তির কিছু কিছু ভগ্নাংশ উত্তর ও দক্ষিণ-দিকের সেলার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আবিষ্কৃত হওয়ার কারণে ধারণা করা হয় যে, মূর্তিগুলি আদিতে উত্তর ও দক্ষিণ দিকের সেলাতেই রক্ষিত ছিল।

ক্রুশাকারে নির্মিত মন্দিরের চারদিকে ২ মিটার প্রশস্ত একটি প্রদক্ষিণপথ ছিলএবং এর বাইরের দেয়াল ছিল ১.৩ মিটার প্রশস্ত। এই মন্দিরের উত্তর-দক্ষিণে সরাসরি দৈর্ঘ্য ছিল ২৮ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমেও ২৮.২ মিটার সরাসরি দৈর্ঘ্য ছিল। পূর্বদিকে ছিল এই মন্দিরের প্রবেশপথ। দ্বিতীয় নির্মাণযুগে এই মন্দিরের বেইজমেন্ট (basement) দেয়ালের একটি অফসেট কার্নিশ দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল এবং স্পষ্টতই এটি নির্মিত হয়েছিল দর্শককে দেয়ালের সাদাসিধা একঘেয়েমির হাত থেকে রক্ষা করার অভিপ্রায়ে।

সম্পূরক (subsidiary) স্তূপ ঃ মন্দিরের সীমারেখার (boundary wall) মধ্যে দুটি সম্পূরক স্তূপ ছিল। মন্দিরের পূর্ব দেয়ালের কেন্দ্রস্থলে মন্দিরের যে প্রবেশপথ ছিল তার পশ্চিমে ছিল এ দুটি স্তূপ। উভয় স্তূপই বর্তমানে (১৯৯৫ খ্রিঃ) ধ্বংসপ্রাপ্ত। অষ্টকোণাকৃতির স্তূপটি ছিল দক্ষিণ দিকে এবং তা মন্দিরের দ্বিতীয় নির্মাণ যুগের বলে ধারণা হয়। এটি ৫.১ মি × ৫.১ মি আয়তনের একটি বেইজমেন্টের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তা ০.৯ মিঃ উঁচু পর্যন্ত টিকে ছিল। এর চারদিকে ছিল প্রদক্ষিণপথ।

বর্গাকারে নির্মিত স্তূপ ঃ অষ্টকোণাকৃতির স্তূপের উত্তর দিকে ছিল এর অবস্থান। এটি এমনভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত যে, এর বিশেষ কিছুই টিকে নেই। উপরে বর্ণিত অষ্টকোণাকারে নির্মিত স্তূপ ও আলোচ্য বর্গাকারের স্তূপ একই সময়ে নির্মিত হয়েছিল পণ্ডিতদের ধারণা।

প্রবেশপথ ঃ মন্দিরের পূর্বদিকের সীমানা নির্দেশক দেয়ালের (boundary wall) ঠিক মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত ছিল প্রবেশপথ। উপরে উল্লিখিত অষ্টাকোণাকৃতির উত্তর-পূর্বদিকে এবং বর্গাকৃতির স্তূপের দক্ষিণ-পূর্বদিকে ছিল এই প্রবেশপথের অবস্থান। প্রবেশপথটি ছিল ১.৫ মিটার প্রশস্ত। এটি বাইরে দিকে প্রসারিত ছিল এবং তাতে ৪ টি সিঁড়ি ছিল। নিম্নতম সিঁড়ির প্রশস্ততা ০.৮ মিটার এবং তা দ্বিতীয় নির্মাণ যুগের বলে অনুমিত হয় এবং অবশিষ্ট ৩ টি সিঁড়ি তৃতীয় ও শেষ নির্মাণ যুগের বলে ধারণা করা হয়।

বৌদ্ধবিহার ঃ এই ক্ষুদ্র অথচ কৌতূহলোদ্দীপক বৌদ্ধবিহার উপরে উল্লিখিত বৌদ্ধ মন্দির থেকে ৩১ মিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রবেশপথের অস্তিত্ব অত্যন্ত কাছাকাছি স্থানে হলেও এবং উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক থাকলেও উভয় প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল।

বর্গাকারে নির্মিত এই বিহার ইমারতের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ছিল ৩৪.১ মিঃ। ১২.৫ মি × ৬.৯ মি আয়তনের একটি প্রসারিত তোরণ ছিল বিহারের উত্তর দেয়ালের মধ্যস্থলে। উপরে বর্ণিত মন্দিরের মতো এই বিহারও তিন পর্যায়ে নির্মিত হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে নির্মিত বিহারের ধ্বংসাবশেষ দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মিত বিহার দ্বারা ঢাকা পড়েছিল। তৃতীয় নির্মাণযুগের বিহারটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

এ বিহারের পরিকল্পনা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, এটি অনন্য (unique) ধরনের বিহার না হলেও এটিকে ভিন্নধরনের (unussual) একটি বিহার বলা যেতে পারে। এতে যে ২৪ টি কক্ষ (cell) আছে সেগুলির মধ্যে ২০ টি কক্ষ চারদিকের দেয়ালের সঙ্গে নির্মিত হলেও বাকি ৪ টি কক্ষ দক্ষিণভাগে অবস্থিত পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ একটি আলাদা ব্লকের মধ্যে নির্মিত। বর্ণনার সুবিধার জন্য প্রবেশপথের অংশ ছাড়া বিহারটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রবেশপথের নিকটে নির্মিত বিহারের অংশটিকে প্রধান এবং এর দক্ষিণে নির্মিত অংশকে দ্বিতীয় ভাগ বলা যেতে পারে। প্রথম অংশের আয়তন ৩৪.১ মি × ২৪.৮ মি এবং দ্বিতীয় অংশে আয়তন হচ্ছে ২৪.১ মি × ১১.৭ মি।

বিহারের প্রধান অংশ চার ব্লকে ১৫ টি কক্ষ ছাড়াও মোটামুটি ২.১ মি থেকে ২.৪ মিটার প্রশস্ত একটি বারান্দা ছিল এবং ১৪.৪ মিটার × ৫.২ মি আয়তন বিশিষ্ট একটি উন্মুক্ত আঙ্গিনাও ছিল। এই আঙ্গিনাকে প্রথম কোর্ট বলা যেতে পারে। বিহারের দ্বিতীয় ভাগে তিন ব্লকে ৯ টি কক্ষ ছিল এবং সেখানে কোনো বারান্দা ছিল না। তবে সেখানে ২১.৭৫ মি × ৩.৫২ মিটার আয়তন বিশিষ্ট একটি শূন্যস্থান ছিল। এটিকে দ্বিতীয় কোর্ট বলা যেতে পারে।

উৎখননের পরে দেখা গেছে যে, বিহারের দ্বিতীয় অংশ দ্বিতীয় ও তৃতীয় নির্মাণ যুগে পরিত্যক্ত হয়েছিল। কিন্তু পঞ্চম বাহুটি (wing) ছিল। এগুলি একটি প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে যে, বিহারটি আদিতে একটি মাত্র আঙ্গিনা (single courtyard) বিশিষ্ট ও কক্ষগুলি চারটি ব্লকে বিস্তৃত ছিল কিনা এবং দ্বিতীয় নির্মাণযুগে এবং দ্বিতীয় অংশটি (second part) পরিত্যক্ত হওয়ার পর পঞ্চম অর্থাৎ মধ্যের ব্লকটি দ্বিতীয় নির্মাণযুগে সংযুক্ত হয়েছিল কিনা। পঞ্চম ব্লক (fifth wing)-এর মত কক্ষবিশিষ্ট (cell) কোনো ব্লক (wing) বাঙলার অন্য কোন বিহারে নেই। প্রবেশপথসহ এই বিহারের প্রধান ইমারতের সঙ্গে দ্বিতীয় অংশের (second part) সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া কঠিন।

৩.৬ মি. × ২.৯৫ মি. থেকে ২.৯ মি. × ২.৬ মি. পর্যন্ত বিহারের বিভিন্ন কক্ষের আয়তন দেখা যায়। শালবনও অন্যান্য বিহারের মতো এই বিহারের কক্ষগুলির পিছন ও পাশের দেয়ালে করবেল্ড্ (corbelled) পদ্ধতিতে নির্মিত কুলঙ্গি ছিল। কক্ষের প্রবেশপথগুলি ছিল বারান্দা থেকে। ঘুমাবার জন্য কক্ষগুলির ভিতরে ইষ্টকনির্মিত শয্যা (bed) ছিল। এ ধরনের ব্যবস্থা অন্যকোনো বিহারে প্রায়ই দেখা যায়না।

বিহারের পিছনের দিকের দেয়ালের প্রশস্ততা ছিল মোটামুটি ২.১ মি এবং বিভাজন ও বারান্দার দেয়ালের প্রশস্ততা আরও কম ছিল।

প্রবেশপথ ঃ উত্তর দেয়ালের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত প্রবেশপথটি ছিল ৪.৬ মিটার প্রশস্ত। প্রবেশপথের দু'পাশে ছিল প্রত্যেকটি ২.৭ মি × ২.৭ মিঃ আয়তনবিশিষ্ট দুটি প্রহরীকক্ষ ছিল। পূর্বদিকের প্রহরীকক্ষে একটি ইষ্টকনির্মিত শয্যা ছিল এবং এটি খুব সম্ভব তৃতীয় নির্মাণযুগে নির্মিত হয়েছিল। দ্বিতীয় নির্মাণযুগে পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ ও ১৪ মিঃ × ১২ মিঃ আয়তনবিশিষ্ট একটি আয়তক্ষেত্র প্রবেশপথের সামনে দেয়ালদ্বারা সুরক্ষিত ছিল এবং এটি মন্দিরের প্রবেশপথের কাছাকাটি স্থান পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। (ভূমি-কনশা) কিন্তু তৃতীয় ও শেষ নির্মাণ যুগে এটি পরিত্যক্ত হয়েছিল বলে দেখা যায়।

প্রত্নবস্তু ঃ এখানে প্রাপ্ত বিশালকায় বুদ্ধ মুর্তিটি (পূর্বে উল্লিখিত) বর্তমানে ময়নামতি মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। ১৩ টি পাত্রপূর্ণ ব্রোঞ্জমূর্তির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলি ছাড়াও অনুসন্ধান ও উৎখননের মাধ্যমে এ স্থানে আরও অনেক মূল্যবান প্রত্নবস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে খড়্গ বংশীয় নৃপতি বলভট্টের আমলের ৫টি অপকর্ষিত (debased) গুপ্ত অনুকৃত মুদ্রা, হরিকেল ধরনের ৩ টি রৌপ্য মুদ্রা, ২টি ব্রোঞ্জমূর্তি, বেশ কিছু সংখ্যক পোড়ামাটির চিত্রফলক, অসংখ্য অলঙ্কৃত ইট এবং অন্যান্য বিবিধ প্রত্নবস্তু।

উপসংহার ঃ এখানে যে বিশাল আকারের বুদ্ধমূর্তিটি আবিষ্কৃত হয়েছে তা খড়্গ নৃপতিদের রাজত্বকালের, আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর বলে ধারণা করা যায়। রাজা বলভট্টের স্বর্ণমুদ্রা এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। তিনি ছিলেন খুব সম্ভবত রাজা রাজ ভট্টের পুত্র। চিনা পরিব্রাজকদের সূত্র থেকে জানা যায় যে, এই রাজা রাজভট্ট এখানে (সমতটে) ৬৭১ খ্রিস্টাব্দে রাজত্ব করেছিলেন। অতএব এ তথ্য অনুসারে রাজা বলভট্ট এখানে সপ্তম শতাব্দীর শেষ পাদে রাজত্ব করেছিলেন বলে ধরা যায়। এখানে তাঁর সময়ের মুদ্রাপ্রাপ্তি আমাদেরকে এই অপ্রতিরোধ্য সিদ্ধান্ত যেতে বাধ্য করে যে, এখানকার প্রত্নকীর্তিগুলি তাঁর সময়ে নির্মিত হয়েছিল অথবা এগুলি তাঁর সময়ে অস্তিত্বশীল ছিল। বিশাল আকারের বুদ্ধ মূর্তিটির আবিষ্কার আরও একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সাহায্য করে যে, এখানকার কীর্তিগুলি রাজা বলভট্টের পূর্ব পুরুষদের রাজত্বকালেও নির্মিত হয়ে থাকতে পারে। এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় আশরাফপুর তাম্রলিপিতে। সেখানে বলা হয়েছে যে, খড়্গবংশীয় নৃপতিরা বিহাব ও বিহারিকা নির্মাণ করেছিলেন (আশরাপুর দ্র:)।

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, রূপবান মুড়ার মন্দির ও বিহার খড়্গনৃপতিদের রাজত্বকালে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে খুব সম্ভব নির্মিত হয়েছিল।

২. বড় ইটাখোলা মুড়ার প্রত্নকীর্তিসমূহ

সুবৃহৎ বড় ইটাখোলা মুড়ার ক্রমিক সংখ্যা প্রথমে ছিল ৫১ এবং পরবর্তীকালে এ সংখ্যা হয় ৮ এবং এর 'বড়' নাম বর্জিত হয় বলে দেখা যায়। কিন্তু লালমাই-ময়নামতি

পাহাড়ে এ নামের (ইটাখোলা) আরও একটি স্থান আছে বিধায় 'বড় ইটাখোলা' নামটি রক্ষিত হওয়া আবশ্যক এবং এখানে তা রক্ষিত হয়েছে।

এ টিবি রূপবান মুড়ার বিপরীতে কুমিল্লা-কালির বাজার সড়কের উত্তরে, ভোজবিহার থেকে প্রায় ৪০০ মিটার পশ্চিম ও বার্ড (BARD)-এর প্রবেশপথ থেকে কয়েক মিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। তিন স্তরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ে এর অস্তিত্ব। সমগ্র স্থানটি এমনভাবে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল যে, বেবি. এম. মরিসন (Berie M. Morison) সহ পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষকদের কেউই জঙ্গল ও ইট হরণকারীদের সৃষ্ট ভূতুরে দেয়ালের (ghost-wall) কারণে এখানকার কীর্তিগুলিকে উদ্ঘাটন করতে সমর্থ হননি। এখানে ১৯৮৬ খিস্টাব্দ থেকে শুরু করে পাঁচ বছর ধরে যে উৎখনন কার্য করা হয় তার ফলে প্রত্নকীর্তিগুলি স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতরের তদানীন্তন আঞ্চলিক (কুমিল্লা অঞ্চলে) কর্মকর্তা জনাব হাবিবুর রহমান একটি প্রশংসনীয় কাজ করেছেন এ ব্যাপারে।

দক্ষিণের টিবির মন্দির : মন্দিরের বেশ কয়েকটি স্থানে উৎখননের পরে দেখা গেছে যে, এখানে অন্তত পাঁচটি পর্যায়ে মন্দিরের নির্মাণ, মেরামত ও নতুন করে নির্মাণের কাজ চলেছিল। পূর্ববর্তী তিন পর্যায়ে নির্মিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পরবর্তী দুই বিশেষ করে চতুর্থ পর্যায়ের কাজের নিচে চাপা পড়ে গেছে। শেষ অর্থাৎ পঞ্চম পর্যায়ে নির্মিত কাজের নিদর্শন সমূহ কার্যত ইট হরণকারীরা সরিয়ে ফেলেছে।

মন্দির : মোটামুটি পূর্ব-পশ্চিমে আয়তাকারে নির্মিত প্রথম পর্যায়ের মন্দিরটি পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ ৭৯ মিটার × ৫৬ মিটার আয়তনের মধ্যে অবস্থিত ছিল এবং প্রাচীরটি ছিল ১.২ মিটার পুরু। পূর্বমুখী সেই মন্দিরের প্রবেশপথ ছিল পূর্ব প্রাচীরে এবং সেখানে ২২টি সিঁড়ি ছিল। পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ মন্দিরের আয়তন ছিল ৪১.৪ মিটার × ২৪ মিটার। কিন্তু মন্দিরের পশ্চিমাংশে ১১.৬ মিটার স্থানে মন্দিরের প্রশস্ততা ছিল ২৪.৯৮ মিটারের স্থলে ২০.৭ মিটার। আঙ্গিনা থেকে মন্দিরের প্রবেশপথ ছিল পূর্বদিকে এবং সেদিকে অবস্থিত ৪টি সিঁড়িবিশিষ্ট দ্বিতীয় স্তর থেকে এবং সেই সিঁড়িপথ ছিল বাইরের দিকে কেন্দ্রস্থলে প্রসারিত (projection)। হাল আমলের উৎখননের পরে দেখা গেছে যে, পূর্ববর্তী সময়ের নির্মাণ কাজের উপরে চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায়ের নির্মাণ কার্য এখানে করা হয়েছিল।

মন্দিরের পরিকল্পনায় দেখা যায় যে, এটি ছিল ১৩.১ মিটার × ১৩.১ মিটার আয়তনবিশিষ্ট বর্গাকারে নির্মিত একটি নিরেট ইমারত এবং এর মাঝখানে পূর্ব দিকে ছিল ২.৪ মিটার × ২.৯ মিটার আয়তনের একটি গর্ভগৃহ। সেই দিকে (পূর্বদিকে) ছিল অতিরিক্ত ৩টি লম্বা হলরুম এবং সমগ্র স্থানটি ২.৬ মিটার প্রশস্ত একটি প্রদক্ষিণ পথ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল এবং ৩টি লম্বা হলরুমের চারদিকে ছিল ১.২ মিটার প্রশস্ত একটি তৃতীয় বেষ্টক প্রাচীর। উৎখননকারী জনাব হাবিবুর রহমানের মতে ১৮.৯ মিটার × ৩.৮ মিটার আয়তন বিশিষ্ট মধ্যবর্তী হল রুম দৃষ্টি, তাঁর মতে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্মাণকালে ভিক্ষুদের বসবাসের জন্য নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু ময়নামতি-দেবপর্বত গ্রন্থে (১০৬-৭ পৃ.) যে ভূমি-পরিকল্পনা আছে তাতে পার্শ্ববর্তী হল দুটির কোনো উল্লেখ নেই

যদিও জনাব হাবিবুর রহমান কর্তৃক বাংলা ভাষায় রচিত 'ইটাখোলা বিহার' গ্রন্থে (৩ ও ৪ নং মানচিত্র দ্র:) এ দুটি বেশ স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। অবশ্য জনাব হাবিবুর রহমানের গ্রন্থের ভূমি-পরিকল্পনায় ভিক্ষুদের জন্য নির্মিত কক্ষ প্রদর্শিত হয়নি এবং তাঁর রচিত গ্রন্থে উল্লিখিত শেষ তিনটি মানচিত্রে (২১, ২৬ ও ২৭ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত ৫, ৬ ও ৭ মানচিত্রে) সেগুলি পরিষ্কাররূপেই দেখান হয়েছে। অবশ্য ময়নামতি-দেবপর্বত গ্রন্থে নিরেট বর্গাকারে মন্দিরের চারদিকে যে প্রদক্ষিণ পথ যথাযথভাবেই দেখান হয়েছে বাংলাভাষায় রচিত 'ইটাখোলা' গ্রন্থে দেখান হয়নি। পার্শ্ববর্তী দুটি মণ্ডপে ভিক্ষুদের কক্ষ থাকার ব্যাপারে প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতরের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের মধ্যে মতভেদ আছে।

একটি বিরাট আকারের বেদী নির্মাণের ব্যাপারে কোনো মতভেদ অবশ্য নেই। নিরেট বর্গাকারে পূর্বদিকের মন্দিরের পূর্ব প্রান্তদেশে একটি ভিত্তি বেদীর উপরে ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষব্যর একটি বিশাল আকারের 'স্টাকো' মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মধ্যবর্তী হল কক্ষের ভিতরদিয়ে পূর্বদিক থেকে সেই মূর্তির কাছে যাওয়া যেত। সেই সময়ে ও পরবর্তীকালে সেই হলকক্ষটির প্রশস্ততা কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। চতুর্থ নির্মাণ যুগে এটি করা হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।

উৎখননের সময়ে বিশাল আকারের স্টাকো (Stucco) মূর্তিটি মস্তকবিহীন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। পশ্চিম দিকের বর্গাকৃতির নিরেট মন্দিরের মাঝখানে একটি বিশেষ প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করে মূর্তিটি এখন (১৯৯২ খ্রিঃ) রক্ষিত হয়েছে। মূর্তিটি যাতে উপর থেকে দেখা যেতে পারে সেই উদ্দেশে সেই বিশেষ কক্ষের ছাদ নির্মাণ করা হয়েছে লোহার রড দিয়ে।

উৎখননকারী জনাব হাবিবুর রহমান উত্তরদিকের হলকক্ষে ভিক্ষুদের বসবাসের জন্য যে সব কক্ষের অস্তিত্বের কথা বলেছেন তা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। এই মন্দির নির্মাণের তৃতীয় নির্মাণ যুগে মন্দিরের কিছু উত্তরে যে ছোট বিহারটি আবিষ্কৃত হয়েছে তা নির্মিত হয়েছিল এবং সেই (তৃতীয়) নির্মাণ যুগে ভিক্ষুদের বসবাসের কক্ষগুলি বিহার ইমারতে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং ভিক্ষুদের জন্য নির্মিত আদি কক্ষগুলি মূর্তি রক্ষার জন্য আয়তনে ছোট করা হয়েছিল। মণ্ডপের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে কাঁধ সমান উঁচু কিছু কিছু করবেল্‌ড্ কুলঙ্গি দেখা যায়। এগুলি খুব সম্ভব চতুর্থ ও পঞ্চম নির্মাণ যুগের সৃষ্টি এবং সেগুলি প্রধানত প্রদীপ স্থাপনের জন্য নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয় এবং সেগুলি ক্ষুদ্রাকারে বোঞ্জ মূর্তি ও বোধহয় রক্ষিত হত।

১৭.৪ মিটার × ১৫.৮ মিটার আয়তনের পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ একটি আযতক্ষেত্র নির্মিত হয়েছিল প্রধান মন্দিরের লাগোয়া পশ্চিমে। প্রধান মন্দিরের পশ্চিম দেয়াল ও নবনির্মিত আয়তক্ষেত্রে পশ্চিম দেয়াল ছিল অভিন্ন। প্রাচীন বেষ্টিত এ স্থানে উত্তর ও দিক্ষণ দিক থেকে প্রবেশ পথ ছিল। এ প্রাচীরে বেষ্টিত স্থানের কেন্দ্রস্থলে ক্রুশাকারে নির্মিত একটি ভোটিভ স্তূপ ছিল। এটি খুব সম্ভবত চতুর্থ নির্মাণ যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। খুব সম্ভব পঞ্চম নির্মাণ যুগে এই স্তূপের পূর্বদিকে দুটি সিঁড়ি নির্মাণ করা হয়েছিল।

মন্দিরের সহায়ক ইমারতাদি : মন্দিরের পূর্বদিকের সীমারেখার কাছে (ভিতরে) এবং উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বকোণ বর্গাকারে নির্মিত দুটি ক্ষুদ্রস্তূপের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। একই মাপের ক্ষুদ্র স্তূপ দুটির প্রত্যেকটির প্রত্যেক বাহু ছিল .২৭ মিটার। এ দুটির কেন্দ্রস্থলে ছিল একটি করে ক্ষুদ্র গর্ত। এই ক্ষুদ্র ইমারত দুটির পশ্চিমদিকে এবং উত্তরেরটির দক্ষিণদিকে এবং দক্ষিণের উত্তরদিকে নিচু বেষ্টক প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ দেখা গেছে। আর দেখা গেছে উত্তরেরটির দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণেরটির উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রবেশপথের ভিত। প্রত্যেকটি স্তূপের আয়তন ছিল .৯ মিটার × .৯ মিটার করে। এ দুটি ইমারত ছিল না পায়খানা ছিল এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠলেও পণ্ডিতেরা এ দুটিকে স্তূপ বলেই মনে করেন।

বাইরের প্রবেশপথ : মন্দিরের বাইরের প্রবেশপথ ছিল পূর্বাদিকের বেষ্টক প্রাচীর থেকে ৪.৯৪ মিটার পুবে। প্রবেশপথে ২২ টি সিঁড়ি ছিল ' উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ ও ১৯.৮২ মিটার × ৮.৭২ মিটার আয়তন বিশিষ্ট প্রাচীর বেষ্টিত একটি স্থান ছিল প্রবেশপথে। এর বাইরের (পূর্ব) দেয়ালে ছিল ৪ সিঁড়ি বিশিষ্ট একটি প্রবেশপথ। এই প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে ৩টি স্তূপের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। প্রধান সিঁড়িপথের উভয় পাশে এবং প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের পশ্চিম দেয়াল ও প্রধান মন্দিরের পূর্বদিকের বেষ্টক প্রাচীরের মধ্যবর্তীস্থানে একটি করে ক্ষুদ্র স্তূপের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এগুলি মন্দির নির্মাণের চতুর্থ পঞ্চমযুগের বলে পণ্ডিতদের ধারণা।

বেষ্টক প্রাচীর : আয়তাকারে নির্মিত ও পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ এই মন্দিরের আয়তন ছিল ৭৯ মিটার × ৫৬ মিটার এবং এর চারদিকের বেষ্টক প্রাচীরের প্রশস্ততা ছিল ১.২ মিটার। জনাব হাবিবুর রহমানের মতে প্রথম নির্মাণ যুগে বেষ্টক প্রাচীরের প্রশস্ততা ছিল ১.৮১ মিটার এবং পরবর্তীকালে এই বেষ্টক প্রাচীরের প্রশস্ততা ভিতরের দিকে কমান হয়েছিল এবং এর ফলে এর প্রশস্ততা ১.৫১ মিটারে দাঁড়িয়েছিল। তিনি আরও বলেন যে, প্রাচীরের উপরে একটি আচ্ছাদন ছিল এবং তা ছিল খুব সম্ভব তৃণের তৈরি। তিনি আরও বলেন যে, বেষ্টক প্রাচীরের বাইরের দিকে প্যানেলিং ইত্যাদির অলঙ্করণ ছিল এবং এ ছাড়া প্রাচীরের মধ্যে আর কোনো অলঙ্করণ ছিল না এবং মন্দিরের বাইরের দেয়ালেও কোনো অলঙ্করণ ছিল না।

বড় ইটাখোলা বিহার : বড় ইটাখোলা বৌদ্ধবিহার বড় ইটাখোলা মন্দির থেকে সোজা ৪৮.৪৮ মিটার উত্তরে আর একটি স্বতন্ত্র পাহাড়ে অবস্থিত ছিল এবং তা মন্দিরের পাহাড় থেকে প্রায় ২.১২/২.৪২ মিটার উঁচুতে অবস্থিত। একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গনের চারদিকে বর্গাকারে নির্মিত বিহার অবস্থিত। এই উন্মুক্ত প্রাঙ্গনের আয়তন হল ১৬.২ মিটার × ১৬.২ মিটার। পূর্বদিকের ব্লকে একটি কক্ষকে প্রবেশপথ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। এ ছাড়া বিহার ইমারতে মোট ১৯ কি কক্ষ (cell) ছিল। কক্ষগুলির সামনে ২.৫ মিটার প্রশস্ততাবিশিষ্ট একটি অভ্যন্তরীণ বারান্দা ছিল। পিছনদিকের দেয়াল, সামনের দেয়াল, বিভাজন দেয়াল ও বারান্দার সামনের দেয়ালে প্রশস্ততা ছিল যথাক্রমে ২.৫ মিটার, ২ মিটার, ১.৫ মিটার ও ১ মিটার। কোনো কোনো বিভাজন দেয়ালের প্রশস্ততা ১.৫ মিটারের অধিক ছিল।

পূর্বমুখী এই বিহারের প্রবেশপথ ছিল বেশ জাঁকযমকপূর্ণ এবং উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এর আয়তন ছিল ১৭.৬ মিটার × ৮.৫ মিটার এবং তা পূর্বদিকে প্রসারিত (projecting) ছিল। প্রধান বিহার ইমারতের মতো প্রবেশপথেও দুটি নির্মাণ যুগের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রবেশপথে অনেক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে এর সঠিক বর্ণনা দেওয়া সুকঠিন। আদিতে এতে বেশ বড় ধরনের প্রবেশকক্ষ (৬ মিটার × ৩.৮ মিটার) ছিল এবং এর দু'পাশে ছিল দুটি প্রহরীকক্ষ, প্রত্যেকটির আয়তন ছিল ২.৭ মিটার × ২.৩ মিটার। পরবর্তীকালে এর উত্তর-দক্ষিণ প্রকৃতি রক্ষিত হলেও প্রবেশপথটি পূর্বদিকে ৫.৪ মিটার থেকে ৮.৪ মিটার প্রসারিত হয়েছিল। কিন্তু ধ্বংসাবশেষ এতই অপ্রতুল যে, প্রবেশকক্ষ ও প্রহরী কক্ষের সীমারেখা নির্ণয় করা দুষ্কর। প্রবেশ কক্ষ পর্যন্ত প্রসারিত সিঁড়িগুলির অতি অল্পই এখন টিকে আছে।

প্রত্নবস্তু : বিহারের পশ্চিম ব্লকের একটি কক্ষ গুদামঘর হিসাবে ব্যবহৃত হত এবং সেখানে ৩টি ছোট সোনার বল (মোট ১০ তোলা ওজন) পাওয়া গেছে। একটি বল থেকে কিছু সোনা কেটে নেওয়া হয়েছিল বলে দেখা যায়। খুব সম্ভব বিহারের ব্যয় নির্বাহের জন্য এ সোনা নেওয়া হয়েছিল। সোনার ৩টি বল এখন কুমিল্লা ট্রেজারিতে রক্ষিত আছে। ৬টি ব্রোঞ্জমূর্তি এখানে পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে ২টি ব্রোঞ্জ মূর্তি হচ্ছে ধ্যানী বুদ্ধ অক্ষব্যার, ৩টি ব্রোঞ্জমূর্তি ধ্যানীবুদ্ধ, (?)। একটি পোড়ামাটির চিত্র ফলকের অংশবিশেষ, অলঙ্কৃত ইটের অংশবিশেষ ইত্যাদিও এ বিহারে পাওয়া গেছে। বিশালাকারের ধ্যানী বুদ্ধ অক্ষব্যার মূর্তি যে মন্দিরে পাওয়া গেছে সে কথা পূর্বে উল্লেখ করা গেছে। এটি এখন মন্দিরেই রক্ষিত আছে।

উপসংহার : খুব সম্ভবত বড় ইটাখোলা মুড়ার কীর্তিগুলি কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতি অঞ্চলে নির্মিত কীর্তিগুলির মতো খুবই প্রাচীন এবং এগুলি খুব সম্ভব প্রথমদিকেই নির্মিত হয়েছিল। খুব সম্ভব এখানকার স্তূপটি গতানুগতিক (traditional) ভাবে নির্মিত একটি কীর্তি ছিল। এ কীর্তিটির নিচের অংশ মাত্র বর্তমানে টিকে আছে। ড্রাম, ডোম (dome), চূড়া, (finial) ইত্যাদি সংবলিত উপরের অংশ বহু আগেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পরবর্তীকালে মহাযানী বৌদ্ধ মতের প্রভাবে এটি যখন একটি চৈত্যে রূপান্তরিত হয়েছিল তখন এই স্তূপ-মন্দিরে খুব সম্ভব বুদ্ধ, ধ্যানীবুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব তারা প্রমুখদের মূর্তি রক্ষিত হত।

উৎখননকারী জনাব হাবিবুর রহমানের অভিমত এই যে, প্রথম ও দ্বিতীয় নির্মাণ যুগে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য কক্ষগুলি এই স্তূপ মন্দিরে নির্মিত হয়েছিল। এই অভিমত গ্রহণযোগ্য তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়। বড় ইটাখোলা বিহারের সৃষ্টি হয়েছিল একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে। এখানকার কীর্তিগুলির যে তৃতীয় নির্মাণ যুগের তাতে সন্দেহ আছে বলে মনে হয় না। একারণেই বোধ হয় স্তূপ-মন্দির ও নব নির্মিত বিহারের মধ্যে কোনো সরাসরি সম্পর্ক ছিল না।

(গ) বৃহৎ মন্দির-স্তূপ

সূচনা : লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ে যে সব প্রত্নকীর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলির মধ্যে মাত্র ৪টি প্রাচীন কীর্তি এ বিভাগে পড়ে এবং সেগুলি হচ্ছে (১) কোটিলা মুড়া, (২)

চারপত্র মুড়া, (৩) আব্বাস আলী মুড়া ও (৪) রানী ময়নামতির প্রাসাদ সেগুলির বর্ণনা নিম্নে তুলে ধরা হল।

১. কোটিলামুড়া

ঢাকা-কুমিল্লা পাকা সড়ক থেকে প্রায় ৩.২ কিলোমিটার দক্ষিণে ও শালবন বিহার থেকে প্রায় ৪.৮ কিলোমিটার উত্তরে ময়নামতি সেনানিবাস এলাকায় কোটিলা মুড়া অবস্থিত। এর পাশ দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে একটি পাকা সড়ক চলে গেছে।

উৎখননকার্যের ফলে এখানে ৩টি স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। পাশাপাশি অবস্থানরত এই স্তূপ তিনটি খুব সম্ভব বৌদ্ধ 'ত্রিরত্ন' যথা, বুদ্ধ (জ্ঞান), ধর্ম (ন্যায়) ও সংঘ (শৃঙ্খলা) এই তিনের প্রতীক। এই তিনের একত্র সমাবেশ উপমহাদেশের এই অঞ্চলে এই প্রথম বলে পণ্ডিদের ধারণা এবং সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে এগুলিকে এ অঞ্চলে অনন্য বলা যেতে পারে।



কোটিলামুড়া, লালমাই-ময়নামতি, কুমিল্লা

ভূমি-পরিকল্পনায় এই স্তূপগুলি শালবন বিহারে আবিষ্কৃত কেন্দ্রীয় মন্দির, বাইরের মন্দির বা স্তূপগুলি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে নির্মিত। এগুলির অলঙ্কৃত ভিত্তিবেদিগুলি ছিল বর্গাকারে নির্মিত। চতুষ্কোণ ভিত্তিবেদীর উপর নির্মিত হয়েছিল গোলাকার 'ড্রাম'। ড্রামের উপর নির্মিত ছিল অর্ধগোলাকার গম্বুজ। এই অর্ধগোলাকার গম্বুজের উপরে নির্মিত হয়েছিল হার্মিকা ও চূড়া। সেগুলি সব ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে শালবন বিহারে উৎখননকালে প্রাপ্ত এবং বর্তমানে ময়নামতি যাদুঘরে রক্ষিত ব্রোঞ্জনির্মিত যে স্তূপ-প্রতিকৃতি আছে, তা থেকে স্তূপগুলির শীর্ষদেশে অবস্থিত হার্মিকা ও চূড়ার আকৃতি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা যেতে পারে।

ভূমি-পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় স্তূপটি ছিল ধর্মচক্রের মতো। এর মধ্যস্থলে ছিল একটি গোলাকার ক্ষুদ্র কক্ষ। এই কক্ষের চারদিকে ইটের তৈরি ঘোরান দেয়াল সৃষ্টি করে ৮টি ছোট অথচ গভীর কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছিল। ফলে স্তূপের এই অংশকে দেখতে একটি চক্রের মতো মনে হয়।

কেন্দ্রীয় স্তূপের দু'পাশে অবস্থিত স্তূপ দুটি নিরেটভাবে ইটের তৈরি। কিন্তু দুটি স্তূপের কেন্দ্রস্থলেই আছে একটি করে গভীর গর্ত। সেই গর্ত দুটি থেকে মাটির তৈরি অসংখ্য নিবেদনস্তূপ ও মাটির তৈরি সীল পাওয়া গেছে।

এই স্তূপ তিনটির সামনে অর্থাৎ পূর্বদিকে ছিল আয়তাকারে নির্মিত ও পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ ১টি করে হলকামরা। কেন্দ্রীয় হলকামরাটির আয়তন ছিল ১৩.৭৪ মিটার × ১৩.১৮ মিটার; দক্ষিণ দিকের হল কামরাটির আয়তন ছিল প্রায় ১৫.৬৩ মিটার × ১১.৫১ মিটার। উত্তর পাশের হলকামরাটির আয়তন পাওয়া যায়নি। তবে এটিও প্রায় অনুরূপ আয়তনবিশিষ্ট ছিল বলে ধারণা করা হয়। এই হলকামরাগুলির চারদিকে ছিল প্রদক্ষিণপথ। হলকামরাগুলিতে প্রবেশ করার জন্য পূর্ব দিকে ছিল প্রকাণ্ড সিঁড়ি।

এই স্তূপ তিনটির পশ্চিম দিকে আরও অসংখ্য স্তূপ ছিল। এগুলির মধ্যে ৯টি স্তূপের ভিত্তিভাগ আবিষ্কৃত হয়েছে। বাকিঅংশ ইট হরণকারীদের দৌরাত্ম্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এসব স্তূপের মধ্যভাগেও গোলাকার গর্ত আছে। সেসব গর্ত থেকে মাটির তৈরি অসংখ্য নিবেদনস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে।

কোটিলা মুড়ার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আছে বলেও ধারণা করা হয়। তবে সেই বিহারের আকার ও আয়তন সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

প্রাচীর বেষ্টিত একটি বিরাট এলাকার মধ্যে কোটিলামুড়ার প্রাচীন কীর্তিগুলি অবস্থিত ছিল। উত্তর-দক্ষিণে এই স্থান ছিল ১৭৬.৪ মিটার প্রশস্ত। পূর্ব-পশ্চিমে এর দৈর্ঘ্য ১৮৪.৭ মিটার পর্যন্ত পাওয়া গেছে। এর পরে প্রাচীরের অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বিধায় এর সঠিক দৈর্ঘ্য জানা যায়নি। বেষ্টক প্রাচীরে সুন্দর খোপযুক্ত প্যানেলের কারুকার্য ছিল। পূর্বদিকের প্রাচীরে ৩টি প্রবেশপথ ছিল। এগুলিতে ছিল ধাপে ধাপে নির্মিত বিরাট আকারের সিঁড়ি, এই প্রবেশপথগুলি ছিল উপরে উল্লিখিত হলকামরাগুলিতে প্রবেশ করার জন্য।

এখানে তিনটি নির্মাণযুগের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রথম নির্মাণ-কাল সপ্তম শতাব্দীর খড়্গ নৃপতিদের সময়ে বা তাঁদেরও আগের বলে ধারণা করা হয়। এর পরে যে দুটি নির্মাণযুগের সন্ধান পাওয়া যায়, সেগুলির সঠিক কাল জানা যায়নি। তবে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই কীর্তিগুলি ব্যবহারযোগ্য ছিল বলে ধারণা হয়।

প্রত্নবস্তু

কেন্দ্রীয় স্তূপের কেন্দ্রীয় ও পার্শ্ববর্তী কক্ষগুলি থেকে মাটির তৈরি অসংখ্য নিবেদনস্তূপ এবং বৌদ্ধ ধর্মসংক্রান্ত মাটির তৈরি কতগুলি সীল পাওয়া গেছে। তাছাড়া, কেন্দ্রীয় স্তূপের ভিতরে নরম পাথরে তৈরি কিছু মূর্তিও পাওয়া গেছে। ত্রিপুরা রাজ্য (ভারত) বা

চট্টগ্রাম-পার্বত্যচট্টগ্রাম অঞ্চলের পাথরে নির্মিত এ সব মূর্তির মধ্যে আছে বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও অন্যান্য বৌদ্ধ দেবদেবী এবং আরাধনারত সাধারণ মানুষের প্রতিকৃতি। পাশের দুটি স্তূপে কোনো পাথরের মূর্তি পাওয়া যায়নি। সে দুটি স্তূপ থেকে শুধু নিবেদন স্তূপ ও সীল পাওয়া গেছে।

এখানকার সর্বোচ্চ স্তর থেকে বাগদাদের আব্বাসিয় বংশের শেষ খলিফা আবু আহমেদ আবদুল্লাহ আল মুস্তাসিম বিল্লাহ্‌র (১২৪২-৫৮ খ্রিঃ) একটি স্বর্ণমুদ্রা অটুট অবস্থায় পাওয়া গেছে। খুব সম্ভব বাণিজ্য উপলক্ষে এই মুদ্রাটির আগমন এ অঞ্চলে ঘটেছিল।

২. চারপত্র মুড়া

কোটিলা মুড়া থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে সেনানিবাস এলাকায় প্রায় ১০.৬ মিটার উঁচু একটি ছোট ও সমতল পাহাড়ের চূড়ায় চারপত্র মুড়ার কীর্তিটি অবস্থিত। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে সেনানিবাস নির্মাণের কাজে বুলডোজার ব্যবহার কালে এখানকার কীর্তিটির অস্তিত্ব ধরা পড়ে এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর কর্তৃক এটি সংরক্ষিত হয়।



▲ চারপত্র মুড়া, ময়নামতি

পরে এখানে উৎখনন কাজ করার ফলে একটি অতি মূল্যবান প্রত্নকীর্তির সন্ধান পাওয়া যায়। এটি ছিল একটি প্রাচীন মন্দির এবং পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ এই মন্দিরের আয়তন ছিল ৩১.৮১ মিটার × ১৬.৬৬ মিটার। পূর্বমুখী এই মন্দিরের ভিতরে যে হলঘর ছিল, তার ছাদ ইটের তৈরি ৪টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই হলঘরের পশ্চিম দিকে

ছিল প্রধান পূজাকক্ষ। হলঘর থেকে একটি আচ্ছাদিত পথ ধরে সেই কক্ষে প্রবেশ করতে হত। এই পূজাকক্ষের বাইরের প্রাচীরে বিভিন্নভাবে উদগত (offset) অংশ সৃষ্টি করে এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এখানে ৩টি নির্মাণযুগের সন্ধান পাওয়া গেছে।

এই কীর্তিটির সঠিক নাম জানা যায়নি। এখানে ৪টি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে বলে এটিকে চারপত্র মুড়া বলে অভিহিত করা হয়েছে।

প্রত্নবস্তু

চারপত্র মুড়াতে ৪ খানা অতি মূল্যবান তাম্রশাসন ও ১টি ব্রোঞ্জনির্মিত স্মারকাধার (relic-casket) পাওয়া গেছে। দুটি তাম্রলিপি ছিল চন্দ্রবংশীয় নৃপতি পরম সৌগত পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ কল্যাণচন্দ্রের পুত্র পরম সৌগত পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমান লড়হচন্দ্রের এবং তৃতীয় তাম্রলিপিটি ছিল তাঁর পুত্র পরম সৌগত পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমান গোবিন্দচন্দ্রের। চতুর্থ তাম্রলিপিটি ছিল দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর একজন স্থানীয় হিন্দু নৃপতি মহারাজ বীরধর দেবের। শেষোক্ত তাম্রলিপির পূর্ণ পাঠ এখনও উদ্ধার হয়নি।

৩. আব্বাস আলী মুড়া

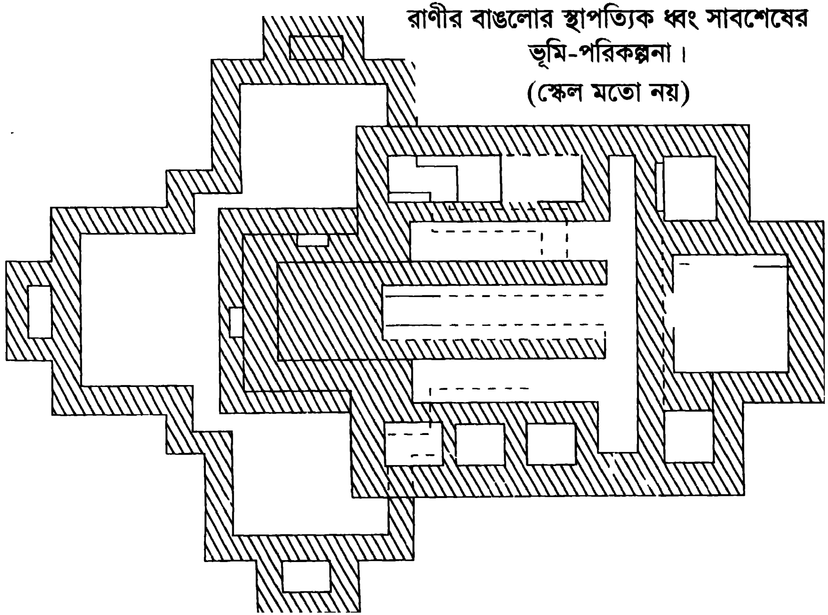
ঢাকা-কুমিল্লা মহাসড়ক ও কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়কের সংযোগস্থল থেকে প্রায় ১কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এবং চারপত্র মুড়া থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে এই প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। প্রায় ২৪ মিটার × ২১ মিটার আয়তনবিশিষ্ট এই ঢিবির উচ্চতা ৩ থেকে ৫ মিটার। চারপত্র মুড়ার মন্দিরের মতো পূর্ব মুখী একটি মন্দিরের অস্তিত্ব এখানে ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এখন (২০০০ খ্রিঃ) পর্যন্ত এখানে কোনো উৎখনন কার্য হয়নি।

৪. রানী ময়নামতির প্রাসাদ (তথাকথিত ইহলৌকিক কীর্তি)

লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ি এলাকায় বিভিন্ন প্রত্নকীর্তি আবিষ্কার ও সেখানে প্রাথমিক উৎখননের পর থেকেই প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর বারবারই বলে আসছে যে, এখানকার কীর্তিগুলি প্রায় সবই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হলেও ময়নামতি রানীর বাংলা পাহাড়ে যে কীর্তিটি আছে তাতে একটি ইহলৌকিক অর্থাৎ সিকিউলার (secular) অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ লুক্কায়িত আছে। সে সব প্রতিবেদন ও সরে-যমিনে স্থানটি পরিদর্শন করে আমরা আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে এখানকার কীর্তিটিকে একটি ইহলৌকিক ইমারতের ধ্বংসাবশেষ বলে আখ্যায়িত করেছিলাম। কিন্তু ১৯৯৬ -৯৭ খ্রিস্টাব্দে এখানে যে উৎখনন কার্য চালান হয়েছে তাতে দেখা গেছে যে, এখানকার কীর্তিটিও ছিল একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এ সম্পর্কে প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতরের উপপরিচালক জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন যে প্রতিবেদন দিয়েছেন তা নিম্নে তুলে ধরা হল। তিনি বলেন[১],

১. মো: মোশাররফ হোসেন : প্রত্নতত্ত্ব উদ্ভব ও বিকাশ, ২১১-১২ পৃ:

"সদ্য অনাবৃত স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি মূল নির্মাণ ও তিনটি পুন;নির্মাণের চিহ্নাদি বিদ্যমান। প্রথম নির্মাণ সময়কালের ইমারতটির ভিত্তি ক্রশাকার ছিল। এটি ৪৪.৪ মিটার বর্গাকার পরিমাপে নির্মিত। দ্বিতীয় পুনঃনির্মাণ সময়কালে এলাকার ইমারতের ধ্বংসাবশেষের উপর ১৪.৬ মিটার × ১৪.৪ মিটার পরিমাপের নিরেট কাঠামোর পূর্বপ্রান্তে ২.২ মিটার বর্গাকার প্রকোষ্ঠ নির্মিত হয়েছিল। তৃতীয় পুননির্মাণের সময়কালে দ্বিতীয় পুননির্মাণ সময়কালের স্থাপিত্যক কাঠামোটির উপর ১২.৬ মিটার × ১১.৭ মিটার পরিমাপের আর একটি ইমারত নির্মিত হয়েছিল। এ ছাড়া এ সময়কালের পূর্বকালের বেষ্টনী প্রাচীরের বিপরীতে ʼকয়েকটি আনুসঙ্গিক কক্ষ নির্মিত হয়েছিল। চতুর্থ সময়কালের ইমারতিটি এত বেশি পরিমাণে ধ্বংসপ্রাপ্ত যে এর সম্পর্কে কোনো বক্তব্য প্রদান সম্ভব নয়। এসব স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষের সাথে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কিছু পোড়ামাটির ফলক ও কিছু অলঙ্কৃত ইটও পাওয়া গেছে।


রাণীর বাঙলোর স্থাপত্যিক ধ্বং সাবশেষের ভূমি-পরিকল্পনা। (স্কেল মতো নয়)

"রাণীর বাঙলো ঢিবিতে পাওয়া পোড়ামাটির ফলকগুলিতে বেশকিছু চিত্র বিধৃত ছিল। এদের মধ্যে কয়েকটি চিত্রে চারহাত বিশিষ্ট নরসিংহী, রাজহাঁস, ময়ূর, কিন্নরী, হাল কর্ষনরত কৃষক, শৃঙ্গারবত ষাঁড় ও গাভী, মহিষের পিঠে নারী আরোহী ইত্যাদি অন্যতম। শিল্পশৈলী বিস্তারে এরা খ্রিস্টীয় আট-নয় শতকে প্রচলিত বৈশিষ্ট্যের ধারক। অলঙ্কৃত ইটগুলোর মোটিফে রয়েছে পদ্মপা পড়ি, ধাপময় পিরামিড ইত্যাদি। সুতরাং এটা এক প্রকার নিশ্চিত যে, রাণীর বাঙলো ইমারতটি একটি সুশোভিত ধর্মীয় ইমারত ছিল।

"এ যাবৎ মাত্র ৪.৫ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খনন পরিচালনা সম্ভব হয়েছে। ফলে পাঁচটি স্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে। স্তর (৫) সম্পূর্ণরূপে সাংস্কৃতিক জঞ্জাল বিবর্জিত। তাই এস্তরটিকে আদিম অকর্ষিত স্তর হিসাবে ধার নেওয়া যায়। তবে সম্পূর্ণ প্রত্নস্থলের একটি পূর্ণাঙ্গ স্তর বিন্যাস দাঁর করাতে হলে খনন এলাকা আরও সম্প্রসারিত করতে হবে।

"ময়নামতি টিলাশ্রেণীতে অবস্থিত অপরাপর খননকৃত টিবির মধ্যে ময়নামতি মাউণ্ড-' এ অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু এ টিবিতে খননের ফলে কিছু বিচ্ছিন্ন ইটের দেয়ালের চিহ্ন ব্যতীত অন্যকোনো নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়নি। ফলে এ প্রত্নস্থলের বিলুপ্ত ইমারতের স্থাপত্য বা স্তর বিন্যাস সম্পর্কে বিশদ কিছু বলার অবকাশ নেই।"

(ঘ) ছোট ও অচিহ্নিত স্তূপ বা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ

এগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে তুলে ধরা হল।

১. বটগাছ মুড়া

ঢাকা-কুমিল্লা মহাসড়ক ও কুমিল্লা-কোম্পানীগঞ্জ সড়কের সংযোগস্থল থেকে প্রায় ২.৫ কিলোমিটার উত্তরে কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়কের পশ্চিম পার্শ্বে এবং ৪০ ক্রমিকের প্রায় ১৯০ মিটার উত্তরে একটি প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আছে। আনুমানিক ২২.৭২ মিটার x ২২.৭২ মিটার আয়তনের এই টিবিটিতে যে মন্দির জাতীয় একটি ইমারত ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

২. চুল্লা মুড়া

চারপত্র মুড়া থেকে প্রায় ১৪০ মিটার উত্তর দিকে একটি ছোট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। তবে টিবিটি এমনভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে যে, ইমারতটির স্বরূপ নির্ধারণ করা বোধ হয় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

৩. ফকিরা মুড়া

চারপত্র মুড়া থেকে প্রায় ১৪০ মিটার পশ্চিম দিকে একটি ছোট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছিল। এখন এর বিশেষ কিছুই আর টিকে নেই।

৪. বৈরাগী মুড়া

লালমাই পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তদেশে এবং কোটিলামুড়ার সোজা পশ্চিম দিকে একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। মন্দিরের আয়তন ২২.৭২ x ২২.৭২ মিটার ছিল বলে ধারণা হয়।

৫. বড়গাছ মুড়া

বৈরাগীমুড়া থেকে প্রায় ১৬০০ মিটার দক্ষিণে লালমাই পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তদেশে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। যে ঢিবিটিতে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে, তার ব্যাস প্রায় ১৮-১৯ মিটার।

৬. নিরঞ্জনের মুড়া

বড়গাছ মুড়া থেকে প্রায় ১৫০০ মিটার এবং লালমাই পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত এই প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষও বড়গাছ মুড়ার ধ্বংসাবশেষের মতোই। এখানে একটি বৌদ্ধমন্দির ছিল বলে ধারণা হয়।

৭. হাতিগাড়া মুড়া

নিরঞ্জনের মুড়া থেকে প্রায় ২.৫ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং কোটবাড়ি বিহার থেকে সামান্য দূরে (পশ্চিম দিকে) একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেকা যায়। বর্গাকারে নির্মিত এই ঢিবির আয়তন প্রায় ১৮.১৯ × ১৮.১৯ মিটার। এটি একটি বৌদ্ধ মন্দির বা স্তূপ ছিল বলে মনে হয়।

৮. চণ্ডীমুড়া

লালমাই পাহাড়ের সর্ব দক্ষিণ প্রান্তদেশে অবস্থিত চণ্ডীমুড়া পাহাড়ে পাশাপাশি অবস্থানরত ইটের তৈরি ২টি ছোট মন্দিরের অস্তিত্ব দেখা যায়। মন্দির দুটি একই ধরনের এবং একই মাপের। প্রত্যেকটির আয়তন ৩.৬৩ মিটার × ৩.৬৩ মিটার এবং উচ্চতা ৪.৫৪ মিটার। পশ্চিমমুখী এই মন্দির দুটির পাকা ছাদ অনেকটা চৌচালা ঘরের চালের মত এবং এগুলি সপ্তদশ শতাব্দীর আগের নয়, পরেরও হতে পারে।

মন্দির দুটির একটিতে শিব ও অন্যটিতে চণ্ডীর পূজা হত। চণ্ডীমন্দিরে স্থানীয় জলাশয় থেকে উদ্ধারকৃত একটি মঞ্জুবর (মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্বেরই এক রূপ) ও একটি সূর্যমূর্তি রাখা হয়েছিল। এগুলি পালযুগের বলে পণ্ডিতদের অভিমত।

আনুমানিক ১২.৫ মিটার × ১৩.৫ মিটার আয়তন বিশিষ্ট একটি প্রাচীর ঘেরা স্থানে মন্দির দুটি অবস্থিত। প্রাচীর এখন ভেঙ্গে পড়েছে এবং মন্দির দুটিও বেশ জীর্ণ অবস্থায় পতিত হয়েছে। উত্তর দিকের মন্দির থেকে প্রায় ১৮.১৮ মিটার উত্তর দিকে একটি ঢিবি আছে। প্রায় ৯.৩৯ মিটার × ৪.৫৪ মিটার আয়তনের এই ঢিবিটি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা। এখানে একটি ছোট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লুক্কায়িত আছে।

এই ঢিবি থেকে প্রায় ৩৪.৮ মিটার উত্তর-পূর্ব দিকে আর একটি ঢিবি দেখা যায়। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এই ঢিবির আয়তন প্রায় ১৩.৬৩ মিটার × ৯.০৯ মিটার। এখানেও মন্দির জাতীয় একটি প্রাচীন ইমারত ছিল। এই দুটি ঢিবিতে প্রাপ্ত ইটের নমুনা দেখে মনে হয় যে, এখানকার ইমারতগুলি শালবন বিহার-আনন্দ বিহারের সমসাময়িক ছিল। শিব ও চণ্ডীর মন্দির দুটি যে পরবর্তীকালে একটি বা একাধিক প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ের অন্যান্য কীর্তি

উপরে উল্লিখিত কীর্তিগুলি ছাড়া আরও অসংখ্য কীর্তির ধ্বংসাবশেষ এই পাহাড়ে ছিল। এককথায় প্রায় সমগ্র পাহাড়ী এলাকা জুড়েই ছিল অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির অস্তিত্ব। সেগুলির বেশির ভাগ বর্তমানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর কর্তৃক সংরক্ষিত (protected) মাত্র কয়েকটি কীর্তির ধ্বংসাবশেষ এখনও কোনো রকমে টিকে আছে। সেগুলির মধ্যে আছে, খাছার মুড়া (২৩), ধানমুড়া (১১), পাক্কা মুড়া (১২) হাগনি মুড়া (১৪), আদিনা মুড়া (১৭), সবরা মুড়া (১৮), ছোট ইটখোলা মুড়া (২৯) রূপবানী মুড়া (১৯), অর্জুনখোলা মুড়া (৩০), কালীদাসের মুড়া (৩২), ও বৈরাগীর মুড়া (৪৪)। এগুলির প্রত্যেকটিতে কোনো বৌদ্ধ স্তূপ বা মন্দির ছিল বলে ধারণা হয়। এ গুলির সবই লালমাই পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তভাগ ঘেঁষে ছিল।

লালমাই পাহাড়ের পূর্বভাগে ছিল বেশ কয়েকটি বৌদ্ধ স্তূপ বা মন্দিরের অস্তিত্ব। এগুলির মধ্যে বলাগাজীর মুড়া (৪৬) বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এই প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ চণ্ডীমুড়া থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার উত্তরে লালমাই পাহাড়ের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। এখানে একটি বিরাট আকারের ইমারত ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু খনন না করে এ কীর্তিটির স্বরূপ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছুই বলা যায় না।

বলাগাজী মুড়ার প্রায় ১৬০০ মিটার দক্ষিণে টাক্কা মুড়া (৪৫) নামক স্থানে আর একটি বিরাট কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আছে। ছোটখাট আরও বহু কীর্তির ধ্বংসাবশেষ এগুলির ধারে কাছে আছে।

জেলার অন্যান্য স্থানের প্রাচীন কীর্তি

গুণাইঘর

কুমিল্লা শহর থেকে প্রায় ২৮.৮ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে দেবীদ্বার উপজেলার অন্তর্গত এবং উপজেলা সদর থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত গুণাইঘর (তাম্রলিপির 'গুণেকাগ্রহার') একটি অতি প্রাচীন স্থান। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের একদম শুরুতে এক ব্যক্তি এ গ্রামের প্রায় মজে যাওয়া একটি প্রাচীন জলাশয় থেকে মাটি তুলতে গিয়ে একটি তাম্রলিপি পান। এই তাম্রশাসনের পাঠ থেকে জানা যায় যে, শৈবধর্মাবলম্বী ['ভগবান মহাদেবের পাদানুধ্যায়ী কুশলী'] মহারাজ বৈন্যগুপ্ত ১৮৮ গুপ্তাব্দে 'ক্রীপুরেস্থিত.. জয়স্কন্ধাবার' থেকে ১১ পাটক ভূমি 'আশ্রম বিহারের' জন্য দান করেছিলেন। তাম্রলিপির কিছু অংশের পাঠ নিম্নরূপ :

"আপনাদিগের অবগতি হউক যে,

"আমার পিতামাতার এবং নিজের পুণ্যবৃদ্ধির জন্য আমাদের চরণের দাস মহারাজ রুদ্রদত্তের বিজ্ঞাপনাক্রমে, উক্ত [রুদ্রদত্ত] কর্তৃক মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধভিক্ষু আচার্য শান্তিদেবের উদ্দেশ্যে (দিকে) আর্য অবলোকিতেশ্বরের নামে যে আশ্রমবিহার নির্মিত হইতেছে, সেখানে উক্ত আচার্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মহাযানী 'বৈবর্তিক' সংজ্ঞক ভিক্ষুসংঘের আবাস গৃহে [স্থাপিত] ভগবান বুদ্ধের গন্ধ-পুষ্প-ধুপ-দীপাদি দ্বারা সর্বদা প্রত্যহ

তিনবেলা [পূজা প্রবর্তনের জন্য], ভিক্ষু সংঘের বস্ত্র, আহার, শয্যা, আসন, পীড়িতের ঔষধ প্রভৃতি ভোগের ব্যবস্থার জন্য এবং বিহারের ভাঙ্গা কিম্বা ফাটার সংস্কার সাধনের জন্য উত্তরমণ্ডলে অবস্থিত কান্তেডদক নামক গ্রামে পাঁচখণ্ডে বিভক্ত ১১ পাটক পরিমিত খিলভূমি সর্বপ্রকার ভোগসত্বে অগ্রহাররূপে তাম্রশাসন দ্বারা মৎ কর্তৃক প্রদত্ত হইল।"[১]

এই তাম্রশাসন থেকে আরও জানা যায় যে, "মহাপ্রতিহার, মহাপীলুগতি, পঞ্চাধিকরোণোপরিক পাট্যুপরিক এবং পুরপালোপরিক পদাধিকারী মহাসামন্ত মহারাজ বিজয়সেন দূতক হইয়া ... ভূমিদানের আদেশ জানাইয়াছেন।" দানকৃত ভূমির "প্রথম খণ্ডের পরিমাণ সাত পাটক নয় দ্রোণব্যাপ এবং সীমাচিহ্নপূর্বদিকে গুণেকাগ্রহার নামক গ্রামের সীমানা ও বিষ্ণু নামক বর্ধকির (সূত্রধারের) ক্ষেত্র, দক্ষিণে সিদ্ধ বিলাল (?) ক্ষেত্র ও রাজবিহারের ক্ষেত্র।" "দ্বিতীয় খণ্ডের পরিমাণ আটাইশ দ্রোণব্যাপ এবং সীমা—পূর্বে গুণিকাগ্রহার গ্রামের সীমা, দক্ষিণে পক্কবিলাল ক্ষেত্র পশ্চিমে রাজবিহার ক্ষেত্র।" "বিহারের তলভূমিরও সীমাচিহ্ন এই—পূর্বে চূড়ামণি ও নগরশ্রী নামক স্থানের নৌযোগদ্বয়ের মধ্যস্থিত জোলা অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলবর্ত্ম, দক্ষিণে গণেশ্বরের বিলাল পুষ্করিণীতে নৌকা চলার জন্য খাড়ি, পশ্চিমে প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের ক্ষেত্রের সীমানা, দক্ষিণে বৌদ্ধ ভিক্ষু আচার্য জিতসেনের বিহারের ক্ষেত্র সীমা, পশ্চিমে হচাত গঙ্গা (নদী) এবং উত্তরে দণ্ড পুষ্করিণী। সং ১০০৮০৮ (১৮৮) পৌষ (তারিখ] ২০৪ (২৪)।"

এতে দেখা যাচ্ছে যে, দানকৃত ৭ পাটক ৩৭ দ্রোণবাপ (৪০ দ্রোণে ১ পাটক) অর্থাৎ প্রথম ও ২য় খণ্ডের ভূমির পূর্ব সীমানা ছিল গুণেকাগ্রহার অর্থাৎ বর্তমান গুণাইঘর গ্রাম এবং প্রথম খণ্ডের দক্ষিণ সীমানা ও দ্বিতীয় খণ্ডের পশ্চিম সীমানা ছিল রাজবিহার ক্ষেত্র। বিহারের 'তলভূমির' অর্থাৎ নিম্নভূমির পশ্চিমে ছিল 'প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের ক্ষেত্রের শেষ সীমা' এবং বিহারের জলমগ্ন (হাজা) খিলভূমির সীমানা ছিল 'পূর্বে প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের ক্ষেত্রের সীমানা' এবং দক্ষিণে 'জিতেসেনের বিহারের ক্ষেত্র সীমা'। এতে আরও দেখা যাচ্ছে যে, এখানে রাজবিহার ও জিতেসেনের বিহার নামক আরও ২টি বৌদ্ধ বিহার এবং প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দির নামক একটি শিবমন্দিরে অস্তিত্ব ছিল। নির্মীয়মাণ আলোচ্য আশ্রম বিহারটি ঠিক কোথায় ছিল, তা জানা যায়নি লিপির সেই অংশটির অক্ষরগুলি মুছে যাওয়ার ফলে। তবে বিহারটি সে কাছাকাছি স্থানেই ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। বাকি দুটি বিহার যে গুনাইঘর গ্রামের বেশ কাছাকাছি স্থানে ছিল এবং সেই সঙ্গে শিবমন্দিরটিও, তা লিপির পাঠ থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

এসব কীর্তির কোনো চিহ্নই আজ আর টিকে নেই। 'কান্তেডদক' নামক যে গ্রামে (গুণেকাগ্রহারের লাগোয়া পশ্চিম দিকের গ্রাম) ভূমি দান করা হয়েছিল সেই গ্রামের নামটিও হারিয়ে গেছে। তবে গুনাইঘর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে যে প্রাচীনকালে অসংখ্য ইমারতের অস্তিত্ব ছিল, সে প্রমাণের অভাব নেই। এসব স্থানে মাটির নিচে পাওয়া যায় প্রচুর প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ। আগে গ্রামের যে-কোন স্থানে মাটি খুঁড়লেই প্রাচীন কালের ইট বা মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ পাওয়া যেত বলে স্থানীয় বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে জানা গেছে। ক্রমবর্ধমান মানুষের চাপে এসমস্ত বস্তু এখন যথেষ্ট বিরল হয়ে

১. আবিষ্কৃত তাম্রশাসন, প্রবাসী ভাদ্র ১৩৩৮ বাং, ৬৭৮ পৃ.। শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য।

পড়েছে। প্রাচীন জলাশয়গুলির মধ্যে কিছু কিছু প্রায় মজে যাওয়া অবস্থায় এখনও টিকে আছে। এই এলাকা দেখে সহজেই ধারণা করা যায় যে, এখানে প্রাচীনকালে একটি অতি সমৃদ্ধিশালী জনপদের অস্তিত্ব ছিল।

এ গ্রামে অসংখ্য প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গেছে। এসম্পর্কে শ্রী দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন, "ইতিপূর্বে এই গ্রামেই একটি কষ্টিপাথরের বিষ্ণুমূর্তি বহু বৎসর পূর্বে আবিষ্কৃত হয়। প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে একটি দ্বাদশহস্ত অবলোকিতেশ্বর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার পাদপীঠে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমন্ত্র 'যে ধর্মা' ইত্যাদি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। সম্প্রতি আর একটি বিষ্ণুমূর্তিও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শোনা যায়। তদ্ভিন্ন গ্রামমধ্যে একটি প্রাচীন বিষ্ণু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান রহিয়াছে। সুতরাং প্রত্নসম্পদে এই গ্রাম ত্রিপুরা জেলায় শীর্ষস্থান অধিকার করিবে।"

দানকৃত ভূমি ছিল 'উত্তরমণ্ডলে'। নিকটবর্তী 'গঙ্গামণ্ডল' পরগনার নামকরণ থেকে উত্তরমণ্ডল নামের রেশ পাওয়া যাচ্ছে।

মন্দুক

বরুড়া উপজেলার অন্তর্গত এবং সদর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং কুমিল্লা শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণে অবস্থিত মন্দুক একটি প্রাচীন স্থান। কুমিল্লা-চাঁদপুর পাকা সড়ক থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত এই প্রাচীন গ্রামে একটি বিরাট প্রাচীন জলাশয় ছিল। এখন ঐ জলাশয় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এই দিঘির আয়তন ছিল প্রায় ৭৪০ মিটার × ৩০৮ মিটার। জলাশয়টি বর্তমানে মজে গেছে এবং এর ভিতরে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট পুকুর খনন করা হয়েছে।

জলাশয়ের পাড়ে ৩টি ঢিবি ছিল। বড় ঢিবিটির আয়তন প্রায় ১৫০ মিটার × ১২৫ মিটার এবং উচ্চতা প্রায় ৪.২ মিটার। বাকি ২টি ঢিবি এর চেয়ে কিছু ছোট। এগুলির ধারে কাছে আরও অনেক ঢিবি ছিল। ক্রমবর্ধমান মানুষের চাপে সেগুলি এখন (১৯৭৪ খ্রিঃ) নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এবং সে সব স্থান এখন কৃষিভূমি অথবা বাসভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে এস্থানকে কেন্দ্র করে প্রায় ৩ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে এখানে-সেখানে প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ দেখা যায়। তাতে মনে হয়, এককালে এখানে একটি সমৃদ্ধ জনপদের অস্তিত্ব ছিল। মন্দুক গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে আরও অনেক প্রাচীন দিঘি-পুষ্করিণী আছে। এগুলির মধ্যে উপরে উল্লিখিত দিঘি থেকে প্রায় ১৬০০ মিটার দূরে আর একটি বিরাট দিঘি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এদিঘির আয়তন প্রায় ৫৫০ মিটার × ৩৭২ মিটার।

উপরে উল্লিখিত ঢিবিগুলির একটি থেকে বহু বছর আগে একটি বিরাট গণেশ বা বিনায়ক মূর্তি আবিষ্কৃত হয়। মূর্তির পাদমূলে উৎকীর্ণ লিপির পাঠ নিম্নরূপ :[১]

---

১. এ লিপির পাঠ ও অনুবাদ শ্রীরণজিত কুমার শর্মা রচিত দক্ষিণ বঙ্গের পাল শাসক কে' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত।

"সিদ্ধম। শ্রীগোপাল দেব প্রথম রাজে মাতাপিতৃ পূর্বংগম (ং) কৃত্বা
সকল সত্বরাসে (শেঃ) [অনুত্তর] জ্ঞান লাভৌ
দেব ধর্মোয় (ং) বৃ (দ্ধ)
সার্থ জন্তল মিত্রেন (ণ) কৃয়ত (া) নিমি—"

অর্থাৎ "শ্রীগোপালদেবের রাজত্বের প্রথম বৎসরে বৃদ্ধ বণিক জন্তল মিত্র কর্তৃক মাতাপিতাসহ পূর্বগামী সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভের জন্য মূর্তিটি নির্মিত।"

লিপিতে উল্লিখিত 'শ্রীগোপালদেব' পালবংশীয় নৃপতি দ্বিতীয় গোপাল (৯৪০-৬০ খ্রিঃ) ছিলেন বলে অনেকেই ধারণা করেন। তখন সমতটে অর্থাৎ কুমিল্লা জেলাসহ বাঙলার পূর্বাঞ্চলে মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রের রাজত্বকালে (৯২৯-৯৭৫ খ্রিঃ) এবং কম্বুজদের অভ্যুদয়হেতু রাজ্যহারা গোপালকে (খুব সম্ভব দ্বিতীয় গোপাল) তিনি সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন বলে শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ (শ্রীহট্ট) তাম্রশাসনে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। তাঁর জয়স্কন্ধাবার ছিল শ্রীবিক্রমপুরে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় গোপালের প্রথম রাজ্যাঙ্কে বিক্রমপুরের মাত্র মাইল ত্রিশেক পূর্বদিকে অবস্থিত মন্দুকে গোপালের পক্ষে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করা সম্ভবপর ছিল না। তিনি এ-নামের অন্য কোনো নৃপতি হতে পারেন। অথবা পিতৃ সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে তাঁর শ্রীচন্দ্রের আশ্রয় থাকাকালীন তাঁর প্রথম রাজ্যাঙ্কে নির্মিত এ মূর্তি অন্য কোনো স্থান থেকে মন্দুকে আনীত ও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকতে পারে।

বড়কামতা-চান্দিনা

ঢাকা-কুমিল্লা মহাসড়কের পাশে এবং কুমিল্লা থেকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার পশ্চিমে চান্দিনা অবস্থিত এবং চান্দিনার লাগোয়া পূর্বদিকের গ্রামই বড়কামতা। বর্তমানে চান্দিনা একটি উল্লেখযোগ্য এবং বড়কামতা একটি অতি প্রাচীন গ্রাম। উভয় গ্রামেই প্রাচীন যুগের অসংখ্য দিঘি-পুষ্করিণী দেখা যায়। চান্দিনা শহরের কিছু উত্তরে প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ একটি ঢিবি আছে। এ ঢিবি এবং চারদিকে অবস্থিত প্রাচীন জলাশয়গুলি ছাড়া চান্দিনাতে বর্তমানে (১৯৭০ খ্রিঃ) বিশেষ আর কোনো প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় না। তবে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে যে, চান্দিনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বেশ কয়েকটি প্রাচীন বৌদ্ধবিহার ছিল। গ্রামের লোকেরা সে সব কীর্তির কথা বলে থাকেন। কিন্তু বিহারগুলির কোনো চিহ্ন এখন আর টিকে নেই।

বড়কামতা এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতেও অনেক বৌদ্ধ বিহার ছিল বলে স্থানীয় প্রবল জনশ্রুতি থেকে জানা যায়। কিন্তু সে সব বিহারের কোনো অস্তিত্বও বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যায় না। আশরাফপুরে (ঢাকা জেলার আশরাফপুর দ্র.) সমতটের নৃপতি দেবখড়্গের যে দুটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে, সেগুলি থেকে জানা গেছে যে, ৪টি বিহার ও বিহারিকার জন্য ভূমিদান করা হয়েছিল এবং 'জয় কর্মান্তা' নামক স্থান থেকে তাম্রশাসন দুটি প্রদান করা হয়েছিল। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী এবং আরও অনেক পণ্ডিতের মতে বর্তমান বড়কামতাই হল সেই জয়কামার্ন্তা। এ-মত অনেকের কাছে

বর্তমানে গ্রহণযোগ্য না হলেও চান্দিনা-বড়কামতা অঞ্চলে অসংখ্য বৌদ্ধবিহার ইত্যাদি সহ একটি প্রাচীন জনপদের অস্তিত্ব যে ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

নোয়াপাড়া

কুমিল্লা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পার্শ্বে অবস্থিত এবং কুমিল্লা শহর থেকে প্রায় ২৩ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত নোয়াপাড়া একটি অতি প্রাচীন স্থান। এখানে একটি সুউচ্চ বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ এখনও টিকে আছে। এখনও প্রায় ৬ মিটার উঁচু এ কীর্তির উপর অনেক গাছপালা গজিয়েছে। কিন্তু এটি যে একটি বিরাট বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ, তা সহজেই বোঝা যায়। এখানে প্রাপ্ত পোড়ামাটির সীল (seal) ও অন্যান্য প্রত্নবস্তু থেকে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, সপ্তম শতাব্দীর খড়্গবংশীয় কোনো নৃপতি কর্তৃক এ বৌদ্ধ স্তূপটি নির্মিত হয়েছিল।

নোয়াপাড়া ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। সে সব কীর্তির কোনটিই মাটির উপরে টিকে নেই। কিন্তু মাটির নিচে পাওয়া যায় অসংখ্য ইমারতের ভিত্তিদেয়াল এবং মাটির উপরে পাওয়া যায় প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের অজস্র ভগ্নাংশ। সেই সঙ্গে দেখা যায় অসংখ্য প্রাচীন জলাশয়ের অস্তিত্ব। এখানে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র সহ একটি সমৃদ্ধ জনপদের অস্তিত্ব ছিল বলে ধারণা হয়।

এখানকার বৌদ্ধ স্তূপ ও নোয়াপাড়া-রাজেন্দ্রপুর প্রভৃতি গ্রামকে কেন্দ্র করে প্রায় ছয় বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে যে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আছে তা দেখে প্রশ্ন জাগে এখানেই খড়্গ নৃপতিদের রাজধানী 'জয়কর্মান্তা' ছিল কিনা।

পাঁচথুবী

কুমিল্লা শহরের উপকণ্ঠে এবং মাত্র কয়েক কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বদিকে পাঁচথুবী নামক একটি প্রাচীন গ্রামে কিছু কাল আগে পর্যন্ত ৫টি ঢিবি বা স্তূপের অস্তিত্ব ছিল। কাছাকাছি অবস্থানরত ঢিবিগুলিতে প্রচুর প্রাচীন ইট ছিল। এই ৫টি ঢিবি বা স্তূপের অস্তিত্ব থেকেই এ গ্রামের নাম হয়েছিল পরবর্তীকালে পাঁচথুবী (<পাঁচ স্তূপী <পাঁচস্তূপ <পঞ্চস্তূপ)। খুব সম্ভব এগুলি ছিল বৌদ্ধস্তূপ। বর্তমান কালে স্তূপগুলির কোনো অস্তিত্ব নেই।

এ স্থানে আরও অনেক প্রাচীন ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষ ছিল। সেগুলির মধ্যে একটি চকমিলান ইমারতকে এক মহারাজার বাড়ি বলে চিহ্নিত করা হয়। খুব সম্ভব এটি ছিল দুর্গাকারে নির্মিত একটি বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ। এটিসহ এস্থানের আরও অনেক কীর্তি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু মাটির নিচে প্রচুর প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ পাওয়া যায়। খুব সম্ভব এখানে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল।

মুসলিম আমল

শাহ্‌শুজা' মসজিদ, কুমিল্লা

কুমিল্লা শহরের শুজাগঞ্জ এলাকায় মোঘল আমলের যে মসজিদটি আছে, তা শুজা মসজিদ নামে পরিচিত। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এই মসজিদের বাইরের দিকের আদি

আয়তন ছিল ১৭.৫৪ মিটার × ৭.৮১ মিটার। দেয়ালগুলি ছিল ১.৭৭ মিটার প্রশস্ত। মসজিদের সামনে ছিল ৭.২৭ মিটার প্রশস্ত খোলা বারান্দা। মজজিদের চারকোণে ৪টি অষ্টকোণাকার মিনার (turret) ছিল। পূর্ব দেয়ালে ছিল খিলানযুক্ত ৩টি প্রবেশপথ। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ অপেক্ষাকৃত বড় এবং বাইরের দিকে তা উদগত এবং এর দু'পাশে আছে ২টি সরু ও গোলাকার মিনার। উত্তর ও দক্ষিণ প্রাচীরে একটি করে প্রবেশপথ ছিল। অভ্যন্তরে পশ্চিম দেয়ালে ছিল ৩টি মিহরাব। পাশের দুটি মিহরাব তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু অর্ধবৃত্তাকারে নির্মিত কেন্দ্রীয় মিহরাবটিতে সুন্দর অলঙ্করণ ছিল। সামনের দেয়ালে ছিল অতি সুন্দর প্যানেলিং-এর অলঙ্করণ। উপরে ছিল ৩টি সুন্দর গম্বুজ। কেন্দ্রীয় গম্বুজটি অন্য দুটির চেয়ে আকারে অনেক বড়।



শাহ্ শুজা মসজিদ, কুমিল্লা

সাম্প্রতিক কালে মসজিদের দুই প্রান্তে ৬.৬ মিটার লম্বা করে ২টি কক্ষ এবং সম্মুখভাগে ৭.২৪ মিটার প্রশস্ত একটি বারান্দা নির্মাণ করে মসজিদের আদি রূপটি বিনষ্ট করা হয়েছে। মসজিদের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি সুউচ্চ মিনারও নির্মাণ করা হয়েছে।

মসজিদে বর্তমানে কোনো শিলালিপি নেই। ছিল বলে ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র সিংহ বলেছেন (রাজমালা, ৯৩-৯৪ পৃ.)। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য শুজার নিমচা তরবারি বিক্রয় করিয়া সেই অর্থ সৎকার্যে ব্যয় করিয়াছিলেন। গোমতী নদীর তীরে 'শুজা মসজিদ' নামক একটি ইষ্টকনির্মিত বৃহৎ মসজিদ অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই মসজিদ সম্পর্কে দুই প্রকার প্রবাদ শ্রুত হওয়া যায় : (১) শুজা ত্রিপুরা জয় করিয়া বিজয় বৃত্তান্ত চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই মসজিদ নির্মান করিয়াছিলেন। (২) মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য শুজার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য নিমচা তরবারি ও

হিরকাঙ্গুরীয়ের বিনিময়ে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় প্রবাদ অপেক্ষা প্রথমোক্ত প্রবাদ সত্য বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হইতেছে। এই মন্দিরের দ্বারদেশে একখণ্ড প্রস্তরফলক সংযুক্ত ছিল। জনৈক প্রবীণ মুসলমানের নিকট আমরা এরূপ শ্রুত হইয়াছি যে, অর্ধশতাব্দী কিংবা ততোধিক কালপূর্বে জনৈক ত্রিপুরা রাজ সরকারি দেওয়ান 'ওয়াক্‌ফ্' সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য গোপনে এই প্রস্তরফলকখানা উৎপাটন করিয়া গোমতীর জলে বিসর্জন করিয়াছিলেন। কুমিল্লার অন্তর্গত 'শুজানগর' নামক পল্লী সেই মসজিদের 'ওয়াক্‌ফ্' বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়।"

এই মসজিদ ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল বলে প্রবল জনশ্রুতি আছে, কিন্তু কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। শাহ্ শুজা' যখন বাঙলার সুবাদার (১৬৩৯-৬০ খ্রিঃ) তখন এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল বলে ধারণা হয়। তবে তিনি নিজে এ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ, তিনি কোনোদিন কুমিল্লা বা ত্রিপুরা অঞ্চলে এসেছিলেন বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁর সুদীর্ঘ সুবাদারির কালে তিনি কাছাড় প্রভৃতি স্থানে অভিযান চালিয়েছিলেন, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে অভিযান চালিয়েছিলেন বলে সমসাময়িক ইতিহাসে প্রমাণ নেই। ত্রিপুরা রাজ্যে অভিযান চালানর কোনো প্রয়োজনও ছিল না। কারণ, মহারাজ 'কল্যাণ মাণিক্য কিয়ত পরিমাণে মোঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন' বলে কৈলাসচন্দ্র সিংহও বলেছেন (রাজমালা, ৮৪ পৃ.)।

ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য এ মসজিদ তৈরি করেছিলেন বলে যে কাহিনী প্রচলিত আছে, তাতে বলা হয় যে, সম্রাট অওরঙযেবের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শাহ্ শুজা তাঁর বন্ধু গোবিন্দমাণিক্যের নিকট আশ্রয় চান। সম্রাটের ভয়ে গোবিন্দমাণিক্য তাঁকে আশ্রয় দানে অক্ষম হয়ে শাহ্‌শুজাকে আরাকানের পথে পার করে দেন এবং বন্ধুর স্মৃতি রক্ষার্থে নিজ ব্যয়ে এই মসজিদ নির্মাণ করেন। অন্য মতে, শাহ্‌শুজা গোবিন্দমাণিক্যকে একটি রত্নখচিত তরবারি ও একটি হীরকনির্মিত অঙ্গুরি দান করেন। বিনিময়ে এদুটি বস্তু বিক্রি করে রাজা এ মসজিদ নির্মাণ করেন এবং এর নাম রাখেন শুজা' মসজিদ।

শাহ্‌শুজা' ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের ৬ই মে তারিখে চিরতরে বাঙলা ছেড়ে চলে যান। এর আগে দেড় বছর ধরে তিনি অওরঙযেবের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। সে সময়ে কল্যাণমাণিক্য ত্রিপুরার রাজা। তিনি ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হলে যুবরাজ গোবিন্দমাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা নক্ষত্ররায়ের চক্রান্তে সিংহাসন হারিয়ে নির্বাসিত হন। শুজার পলায়নের সময় নাকি পথিমধ্যে তাঁদের দুজনের সাক্ষাৎ ঘটে এবং তখনই নাকি তরবারি ও অঙ্গুরি দানের ঘটনাটি ঘটে। কিছুকাল পরেই গোবিন্দমাণিক্য রাজ্য ফিরে পান এবং ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দেই আবার তাঁকে রাজা হিসাবে দেখা যায়।

এটি যে একটি কল্পিত গল্প, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শাহ্‌শুজা গোবিন্দমাণিক্যের বন্ধু ছিলেন, তা সম্ভাব্য ঘটনা বলে মনে হয় না। শুজা ছিলেন প্রবল

প্রতাপান্বিত ভারতসম্রাট শাহ্জাহানের দ্বিতীয় পুত্র এবং প্রায় বিশ বছর ধরে সুবে বাঙলার প্রায় একচ্ছত্র অধিকারী। ত্রিপুরার মতো একটি অতি ক্ষুদ্র পার্বত্য ও করদ রাজ্যের যুবরাজ গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল, তা নিরপেক্ষ বিচারে মোটেই সম্ভাব্য ঘটনা বলে মনে হয় না। সেই তথাকথিত বন্ধুত্বের কোনো সুযোগ ছিল বলেও মনে হয় না। শুজা থাকতেন রাজমহলে। তিনি কোনোদিন কুমিল্লা বা ত্রিপুরা অঞ্চলে এসেছিলেন বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব তাঁদের মধ্যে তথাকথিত বন্ধুত্বের কোনো সুযোগও ছিল না। বাঙলার সুবাদারের প্রতি গোবিন্দমাণিক্যের আনুগত্য হয়ত ছিল, কিন্তু দু'জনের বন্ধুত্বের কথা চিন্তাও করা যায় না।

এমন একটা বন্ধুত্বের কথা তর্কের খাতিরে মেনে নিলেও গোবিন্দমাণিক্য সে দুটি বস্তু বিক্রি করে মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন, তা অবিশ্বাস্য ঘটনা বলে মনে হয়। ক্ষুদ্র এবং সাময়িকভাবে করদ হলেও একটি স্বাধীন রাজ্যের অধিপতি ছিলেন গোবিন্দমাণিক্য এবং বহু শতাব্দী ধরে একটি গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী ছিল সেই রাজ্য ও রাজবংশ। শুজা মসজিদের মত একটি ইমারত নির্মাণ করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন কাজ ছিল না। তা না করে, বন্ধুর শেষ স্মৃতিচিহ্ন বিক্রি করে তিনি ইমারতটি নির্মাণ করবেন, তা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা বলে মনে হয় না।

সে সময়ে মেহেরকুলে (কুমিল্লা) মোঘল ফৌজদারের ঘাঁটি ছিল। খুব সম্ভব সেখানকার মুসলিম সৈন্য ও অধিবাসীদের সুবিধার্থে মোঘল ফৌজদার একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন এবং সুবাদারের নামানুসারে এটির নামকরণ করা হয়েছিল শুজা' মসজিদ।

বড়গোয়ালী মসজিদ

দাউদকান্দি থানা থেকে প্রায় ৫ মাইল দূরে অবস্থিত বড়গোয়ালী নামক একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। সেখানে সওদাগরের দিঘি নামে পরিচিত একটি প্রাচীন জলাশয় আছে। এই দিঘির পাড়ে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ কিছু দিন আগে পর্যন্ত টিকে ছিল। নাম সওদাগরের মসজিদ।

আজ (১৯৮৩ খ্রিঃ) থেকে মাত্র কয়েক বছর আগে একটি নূতন মসজিদ নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে পুরাতন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ সমূলে উৎপাটিত করা হয়েছে বলে এই প্রাচীন মসজিদের সঠিক বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত ও আগেকার যে সব বর্ণনা এ সম্পর্কে পাওয়া যায়, তাতে জানা গেছে যে, বর্গাকারে নির্মিত একটি এক গম্বুজের মসজিদ ছিল এটি। খুব সম্ভব সোনারগাঁয়ের গোয়ালদিহি (গোয়ালদিহি মসজিদ দ্র.) মসজিদের মতই ছিল এই মসজিদ।

মসজিদের গায়ে যে শিলালিপি ছিল, তা থেকে জানা যায় যে, ৯০৬ হিজরী (১৫০০-১৫০১ খ্রিঃ) সনে সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ্‌র আমলে এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। খুব সম্ভব এটিই ছিল কুমিল্লা জেলার প্রাচীনতম মসজিদ।

বড়শরীফপুর মসজিদ

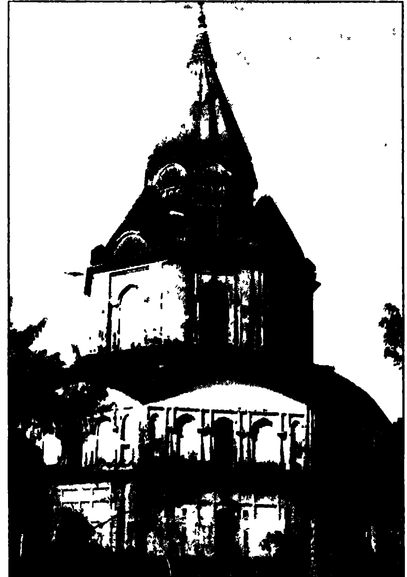
লাকসাম উপজেলার অধীনে বাইশগাঁও ইউনিয়নের অন্তর্গত বড়শরীফপুর গ্রামে নটেশ্বর দিঘি নামক একটি বিরাট আকারের প্রাচীন জলাশয় আছে। এই দিঘির পাড়ে মোঘল আমলে নির্মিত একটি মসজিদ এখনও বেশ ভাল অবস্থায় টিকে আছে।

উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এ মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশপথ আছে। উত্তর পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি মিহরাব। উপরে আছে ৩টি গম্বুজ। দেয়ালগুলি বেশ প্রশস্ত। সাদাসিধাভাবে নির্মিত এই মসজিদগাত্রে বর্তমানে বিশেষ কোনো অলংকরণ দেখা যায় না।

কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উপরে একটি ও কেন্দ্রীয় মিহরাবের উপরে আর একটি শিলালিপি আছে। ফারসী ও পদ্যে রচিত লিপি দুটিতে মসজিদ নির্মাণের তারিখ সাংকেতিক ভাষায় দেওয়া হয়েছে। ফলে এর তারিখ সম্পর্কে মতভেদ দেখা দিয়েছে। একমতে ১০৬৮ হিজরী (১৬৫৭-৫৮ খ্রিঃ) সনে এবং অন্যমতে ১৭০৬ খ্রিস্টাব্দে এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। শেষোক্ত মত ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত কুমিল্লা জেলা গেজেটিয়ারে দেখা যায়। গেজেটিয়ারের বর্ণনা মতে দেখা যায় যে, মোহাম্মদ হায়াত নামক একজন কোতোয়াল এ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন এবং সেজন্য এ মসজিদকে কোতোয়ালী মসজিদ বলা হয়ে থাকে। স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় যে, শাহ্ সৈয়দ বাগদাদী নামক একজন দরবেশ এখানে আস্তানা গেড়েছিলেন। তাঁরই শিষ্য আবদুল করিম ১০৬৮ হিরজী (১৬৫৭-৫৮ খ্রিঃ) সনে এ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন সুলতান শাহ্ শুজা'র সুবাদারি কালে।

সতেররত্ন মন্দির

কুমিল্লা শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এবং কুমিল্লা-চট্টগ্রাম সাবেক পাকা সড়ক থেকে প্রায় ৭৫০ মিটার পূর্বদিকে জগন্নাথপুরে এই মন্দির অবস্থিত। এইমন্দির অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় এখনও টিকে আছে এবং এর কেন্দ্রীয় চূড়াটি (রত্ন) ছাড়া অন্যান্য রত্নের এবং সেসব রত্নের সঙ্গে ইমারতের অংশও ধ্বংস হয়ে পড়েছে। প্রায় ১৫.১৫ মিটার উঁচু কেন্দ্রীয় চূড়াটি এখনও টিকে আছে।



▲ সতেররত্ন মন্দির, কুমিল্লা সংস্কারের পরে

ভূমি-পরিকল্পনায় এ মন্দির ছিল অষ্টকোণাকৃতির। কেন্দ্রীয় কক্ষের চারপাশে ছিল অন্যান্য কক্ষ। কেন্দ্রীয় কক্ষটিকে কেন্দ্র করে এই তিনতলবিশিষ্ট

মন্দির নির্মিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় কক্ষটি সোজা উপরে উঠে তিনতলেরও উপরে গিয়ে মঠের আকারে সরু হয়ে কলসাকৃতির চূড়া দ্বারা শোভিত ছিল। মন্দিরের দ্বিতলের ছাদে ছিল ৮টি চূড়া বা রত্ন এবং ত্রিতলে ছিল ৮টি চূড়া বা রত্ন। এর পরে মন্দিরের কেন্দ্রীয় কক্ষ ক্রমশ সরু হয়ে অনেক উঁচুতে একটি চূড়ার সৃষ্টি করেছিল। এটিই ছিল মন্দিরের আকর্ষণীয় বস্তু।

ত্রিপুরার মহারাজা দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য (১৬৮৫-১৭১২ খ্রিঃ) এই মন্দিরের নির্মাণকার্য শুরু করেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু তিনি এ কাজ সমাপ্ত করেননি। অনেক পরবর্তীকালে মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দির নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করেন।

জাঙ্গাল

ত্রিপুরা রাজ্যের (ভারত) পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে আরম্ভ করে নূর-নগর ও বলদাখাল (বরদাখাত) পরগনা দুটির ভিতর দিয়ে পশ্চিম মুখে অগ্রসর হয়ে মুরাদনগর থানার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত পিপুড়িয়াকান্দা পর্যন্ত একটি অতি উঁচু ও প্রশস্ত রাজপথের অস্তিত্ব ছিল। বর্তমান কালেও (১৯৮৩ খ্রিঃ) এই রাজপথের কিছু কিছু চিহ্ন দেখা যায়। এটি কুটিবাজার হয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে আন্দিকোট, আহমদপুর, জাড্ডা, হাজীপুর, গাযীপুর, জাঙ্গাল, রাজাবাড়ি, বলিবাড়ি, বলিঘর, ভূতাইল, বাওয়াচাইল, শাহ্‌গোদা প্রভৃতি গ্রামের ভিতর ও পাশ দিয়ে প্রসারিত হয়ে পিপুড়িয়াকান্দায় এসে শেষ হয়েছে। শেষোক্ত গ্রাম তিতাস নদীর বর্তমানে একটি মৃতপ্রায় প্রবাহের বাম তীরে অবস্থিত।

এই রাজপথের পাশ দিয়ে 'অদ' বা 'হ্রদ' নামক একটি খাল প্রবাহিত আছে। এই খালে শুষ্ক মৌসুমে পানি থাকেনা। কিন্তু বর্ষাকালে এ খাল দিয়েই জলপথে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত নৌ-চলাচল সম্ভব হয়। খালটি কত প্রাচীন তা সঠিকভাবে বলা যায় না। কারণ, ব্রিটিশ আমলে খালটিকে খনন করে নাব্য করা হয়েছিল বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়।

কিন্তু 'জাঙ্গাল' নামে পরিচিত এই রাজপথটি বেশ প্রাচীন। মোটামুটি নিম্নভূমির উপরে নির্মিত এই জাঙ্গাল পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে প্রায় ৪.৫ মিটার উঁচু এবং খুবই প্রশস্ত ছিল। বর্তমানে এই রাজপথ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। স্থানে স্থানে বিশেষ করে যেখানে জাঙ্গালের উপর বাড়িঘর ও মুসলমানের কবরস্থান আছে, সেখানেই জাঙ্গালের অস্তিত্ব টিকে আছে। অন্যত্র তা কেটে সমতল করে কৃষিভূমিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। খুব সম্ভব বহুকাল আগে, মুসলিম আমলেই রাজপথ হিসাবে এটি পরিত্যক্ত হয়েছিল।

স্থানীয় জনপ্রবাদমতে জানা যায় যে, ত্রিপুরার এক মহারাজা মাতৃস্তন্যের ঋণ পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে মায়ের আদেশে এক রাতের মধ্যে এই 'অদ' কাটিয়েছিলেন। এবং সেই সঙ্গে অদের মাটি দিয়ে জাঙ্গালটিও নির্মাণ করেছিলেন। এই মতে রাজপথের নাম 'পোড়া' বা 'পুরা রাজার জাঙ্গাল' এবং খালটির নাম 'অদ' বা হ্রদ।

'রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস' গ্রন্থের রচয়িতা কৈলাস চন্দ্র সিংহের মতে এই রাজপথ পাঠান সম্রাট শেরশাহ্ (১৫৩৮-৪৫ খ্রিঃ) কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি রাজমালা গ্রন্থে (৫৫ পৃ.) বলেন :

"প্রবলবিক্রম সম্রাট শেরশাহের শাসনামলে ত্রিপুরার অন্তর্গত অনেকগুলি পরগণা তাঁর শাসনদণ্ডের অধীনে ছিল। শেরশাহ সুবর্ণগ্রাম হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত এক প্রশস্ত রাজপথ নির্মাণ করেছিলেন। মেঘনার পূর্বতীর হইতে বলদাখাল (বর্তমান বরদাখাত পরগনা) ও নূরনগর পরগণার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা পর্বতের পাদমূল পর্যন্ত যে রাজপথ নির্মিত হয়েছিল তাহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সর্বসাধারণে অদ্যাপি সেই রাজপথকে 'পুরা রাজার জাঙ্গাল' বলিয়া থাকে।"

কৈলাসচন্দ্র সিংহ তাঁর মতের সমর্থনে কোনো প্রমাণ দেননি। খুব সম্ভব এই অতি প্রশস্ত রাজপথ শেরশাহ্র অনেক আগে নির্মিত হয়েছিল। হোসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) ত্রিপুরা রাজ্যে চারটি অভিযান চালিয়েছিলেন এবং এ পথের প্রায় শেষ প্রান্তে অবস্থিত কসবার নিকটে কৈলারগড় নামক একটি দুর্গও নির্মাণ করেছিলেন। খুব সম্ভব অভিযানের সুবিধার জন্য হোসেন শাহ্ এই রাজপথ নির্মাণ করেছিলেন। অথবা এমনও হতে পারে যে, প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ত্রিপুরার কোনো রাজা হোসেন শাহ্রও অনেক আগে এ পথটি নির্মাণ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে হোসেন শাহ্ ও শেরশাহ্ এটি সংস্কার করে ব্যবহারযোগ্য করেছিলেন মাত্র।

চাঁদপুর জেলা

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ

মেহের

শাহ্‌রাস্তী উপজেলার অধীনে মেহের একটি প্রাচীন স্থান। সর্বানন্দ ঠাকুরের লীলাভূমি মেহের-কালীবাড়ি হিন্দুদের তীর্থভূমি। আবার পার্শ্ববর্তী শ্রীপুরে অবস্থিত বিখ্যাত দরবেশ শাহ্‌রাস্তীর মাযার মুসলমানের কাছে পুণ্যস্থান। এঁরা দুজনেই সমসাময়িক ছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে।

'সকল ভূপতি চক্রবর্তী' মহারাজ দামোদর দেব ১২৩৪ খ্রিস্টাব্দে সমতট মণ্ডলের 'রৈশগ্রাম বিষয়ে' মেহার গ্রামের পার্শ্ববর্তী স্থানে ২৫ জন ব্রাহ্মণকে ৪$\frac{১১}{১৬}$ দ্রোণ ভূমি দান করেছিলেন এখান থেকে প্রদত্ত একটি তাম্রশাসনের মাধ্যমে। তাতে মনে হয় যে, মেহার ছিল একটি উল্লেখযোগ্য প্রশাসনকেন্দ্র। সে যুগের কোনো কীর্তির ধ্বংসাবশেষ এখন আর টিকে নেই। তবে এস্থানে মাটির নিচে প্রচুর ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ পাওয়া যায়। শাহ্‌রাস্তীর মাযার সংলগ্ন উত্তর-দক্ষিণে লম্বা বিরাট জলাশয়টি খুব সম্ভব হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের। এখানে অনেক প্রস্তরমূর্তিও পাওয়া যায়।

মুসলিম আমল

শাহ্‌রাস্তির মাযার

উপরে উল্লিখিত দিঘিরপ্রশস্ত ও উঁচু দক্ষিণপাড়ে খোলা আকাশের নিচে আছে বেশ কয়েকটি পাকা কবর। পাশাপাশি অবস্থানরত সর্বপুবের কবরটিকে শাহ্ রাস্তির, এর পরেরটিকে তাঁর ভাইয়ের এবং অন্য দুটিকে তাঁর ভাইয়ের পরিবারের সদস্যদের কবর বলে চিহ্নিত করা হয়। চিরকুমার শাহ্ রাস্তির ভাইয়ের বংশধরগণ এখন মাযারের খাদিম।

ফিরোজপুর মসজিদ

হাজীগঞ্জ উপজেলার ফালচোঁ ইউনিয়নে ফিরোজপুর গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। ফিরোজশাহ্ লশ্‌করের দিঘি নামক একটি প্রাচীন জলাশয়ের পশ্চিম পাড়ে মসজিদটি অবস্থিত। বর্গাকারে নির্মিত মসজিদের প্রত্যেক বাহু ৬.৭ মিটার দীর্ঘ। দেয়ালগুলি ১.৩ মিটার প্রশস্ত। পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে আছে ১টি করে প্রবেশপথ। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ১টি মাত্র মিহরাব। মসজিদের উপরে আছে একটি মাত্র গম্বুজ।

স্থানীয় জনপ্রবাদ মতে জানা যায় যে, সম্রাট আকবরের দিওয়ান ফিরোজ শাহ্ লশকর ১০০০ হিজরীতে (১৫৯১-৯২ খ্রিঃ) সনে এ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। দিঘিটিও তাঁর সময়ে খনিত হয়েছিল বলে জানা যায়। এই কাহিনী কতখানি সত্য, তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। খুব সম্ভব মোঘল আমলের শেষ দিকে মসজিদটি নির্মিত হয়।

আকবরের রাজত্বকালে কুমিল্লা জেলার এই অঞ্চলে মোঘল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ফলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অলিপুর শাহ্শুজা' মসজিদ ও আলমগীর মসজিদ

হাজীগঞ্জ উপজেলার ৯ কিলোমিটার পশ্চিমে ডাকাতিয়া নদীর তীরে অলিপুর গ্রাম। এ গ্রামের চৌধুরীবাড়িতে (নামান্তরে ঠাকুরবাড়ি) একটি দিঘি আছে। দিঘির উত্তরপাড়ে একটি ও দক্ষিণ পাড়ে আর একটি মসজিদ আছে। উত্তরপাড়ের মসজিদটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। শাহ্শুজা'র মসজিদ নামে কথিত এই ইমারত তাঁরই সময়ে ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল বলে কথিত হয়। এ সম্পর্কে কোনো প্রমাণ নেই। খুব সম্ভব মোঘল আমলের একদম শেষ দিকে এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।

উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এই মসজিদের আয়তন ১৪.৫৪ মিটার × ৭.২৭ মিটার। দেয়ালগুলি ১.৮ মিটার প্রশস্ত। পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে দরজা আছে। পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি মিহরাব। উপরে আছে ৩টি গম্বুজ। কেন্দ্রীয় গম্বুজ অপেক্ষাকৃত বড়। মসজিদটি এখনও ভালভাবে টিকে আছে বলে জানা যায়।

দিঘির দক্ষিণ পাড়ে অবস্থিত মসজিদটিকে আলমগিরী মসজিদ বলা হয়ে থাকে। সম্রাট অওরঙযেবের রাজত্বকালে ১১০৪ হিজরী (১৬৯২-৯৩ খ্রিঃ) সনে এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল বলে দাবি করা হয়। এ মসজিদ গাত্রে কালপাথরে উৎকীর্ণ যে শিলালিপিটি আছে, তাতে নাকি এই তারিখ আছে। কিন্তু শিলালিপির পাঠ উদ্ধার হয়নি।

উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এ মসজিদের আয়তন ১৪.৫ মিটার × ৭.২৭ মিটার। দেয়ালগুলি ১.৮ মিটার প্রশস্ত। উপরে ৫টি গম্বুজ। অষ্টগ্রাম কুতুব শাহ্ মসজিদের মতো (কুতুবশাহ্ মসজিদ দ্র.) কেন্দ্রীয় গম্বুজটি বেশ বড়। এর পাশে মসজিদের চারকোণে বাকি ৪টি গম্বুজ।

দিঘির পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে একটি দরগা আছে। দরগাটি বেশ প্রাচীন।

নেওড়া মঠ

হাজীগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার পূর্ব-পূর্ব-দক্ষিণ দিকে এবং লাকসাম-চাঁদপুর রেল লাইন থেকে কিছু দক্ষিণে নেওড়া গ্রামে এ মঠটি অবস্থিত। এই অষ্টকোণাকৃতির মঠ প্রায় ২৭.২৭ মিটার উঁচু। এবং ভূমিসংলগ্ন স্থানে এর পরিধি ১৪.৫৪ মিটার। ভিত্তিভূমি থেকে ১২.১২ মিটার পর্যন্ত এর পরিধি ও ব্যাসে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ১২.১২ মিটার পরে মঠটি ক্রমশ সরু হয়ে উপরে উঠে গিয়ে কলসাকারের

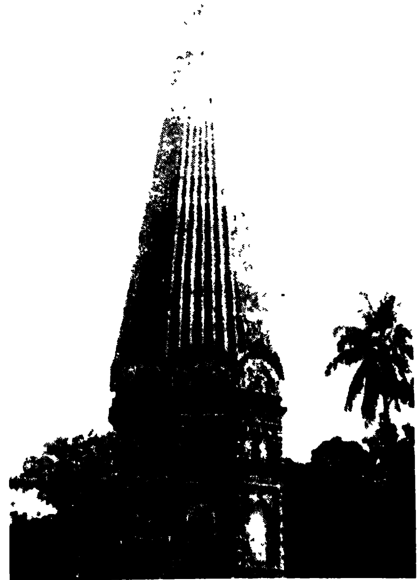
নকশা দ্বারা শোভিত চূড়ায় শেষ হয়েছে। ৬.০৬ মিটার উঁচু গোলাকার 'প্লিন্থের' উপরে এটি নির্মিত এবং প্লিন্থের উপরে ওঠার জন্য একটি সিঁড়ি ছিল। তা এখনও টিকে আছে। এর কেন্দ্রস্থলে ২.৭২ মিটার পরিধিবিশিষ্ট একটি কক্ষ আছে। উপরদিকে প্রায় ১২.১২ মিটার পর্যন্ত মঠের বাইরের দিক পোড়ামাটির চিত্রফলক দ্বারা সুশোভিত।

মঠে যে খোদিত লিপি আছে, তা থেকে জানা যায় যে, ১১৯৯ বঙ্গাব্দে (১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে) সত্যরাম মজুমদার নামক জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি এ মঠ নির্মাণ করেছিলেন। মঠটি বর্তমানে পশ্চিম দিকে কিছু হেলে গেছে।

তুলাতুলি যাত্রামণির মঠ

কচুয়া উপজেলার অধীনে তুল তলী গ্রামে একটি ছোট খালের পার্শ্বে এবং কাঁচা রাস্তার ধারে এই মঠটি অবস্থিত। তলদেশে এই অষ্টকোণাকৃতির মঠের পরিধি ২৬.৫৪ মিটার এবং ক্রমশ সরু হয়ে ৩০.৩১ মিটার উপরে উঠে একক সূক্ষ্মাগ্র চূড়ায় শেষ হয়েছে। দক্ষিণ দিকে ১.৯৭ মিটার × ১.৯৭ মিটার আয়তনের প্রবেশদ্বার। ভিতরে আছে ৪.২৪ মিটার ব্যাস বিশিষ্ট একটি গোলাকার কক্ষ। ভিতরের দেয়ালে ২টি সারিতে ১৬টি প্যানেল আছে। মঠের বাইরের অংশ ব্যাণ্ড ও মোল্ডিং দ্বারা শোভিত এবং শৃগাল, ব্যাঘ্র, ময়ূর, ফণাবিশিষ্ট সাপ ইত্যাদির নকশা, ফুল ও লতাপাতার প্রতিকৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত।

মঠে কোনো শিলালিপি নেই। মোঘল আমলের সরু ইটের গাঁথুনি, গঠনপ্রণালী ইত্যাদি দেখে মনে হয় যে, এটি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নির্মিত হয়েছিল। যাত্রামণি মজুমদার নামক জনৈক ধনীব্যক্তি এই অতি জাঁকজমকপূর্ণ মঠ নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়।



যাত্রামনির মঠ, চাঁদপুর

ফেনী জেলা

প্রাচীন যুগ

সিলওয়ার প্রাচীনমূর্তি

ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানার অধীনে এবং থানা থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং ফেনী শহর থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার দক্ষিণে সিলওয়া নামক একটি অতি প্রাচীন স্থান আছে। এ গ্রামে একটি অনুচ্চ, সমতল টিবি আছে। টিবিটিতে কোনো প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লুক্কায়িত আছে কিনা, তা উৎখনন না করে নিশ্চয় করে বলার মতো কোনো উপায় নেই। তবে টিবির উপরে যে, একটি মূর্তির ভগ্নাবশেষ আছে, তা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

মূর্তিটির একটি স্তম্ভমূল (pedastal) আছে। প্রস্তরনির্মিত এই প্যাডেস্টেলের উপরে মূর্তিটির পাদদেশের অতি সামান্য অংশই বর্তমানে টিকে আছে। বাকি অংশের কোনো সন্ধান বহুকাল আগে থেকেই পাওয়া যায় না। মূর্তির পাদদেশের এই অংশটুকু থেকে অতি সহজেই ধারণা করা যায় যে, এটি ছিল এক বিরাট আকারের (Colossal type) মূর্তি।

মূর্তির স্তম্ভমূলে দুর্বোধ্য ভাষায় একটি ক্ষুদ্র লিপি খোদিত ছিল। সেই লিপির পাঠ কেউ উদ্ধার করতে পারেননি। বর্তমানকালে (১৯৫২ খ্রিঃ) কিছু অস্পষ্ট আঁচড় ছাড়া লিপির সব কিছু মুছে গেছে বলে সেই লিপির পাঠোদ্ধার করা আর কিছুতেই সম্ভব নয়।

পণ্ডিতেরা ধারণা করেন যে, এ মূর্তি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পরের নয়। এ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলা না গেলেও বেলেপাথরে নির্মিত এমূর্তি যে অত্যন্ত প্রাচীন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রত্নপ্রস্তর যুগের হস্তকুঠার

ছাগলনাইয়া উপজেলার সীমান্তবর্তী পাহাড়ী অঞ্চলে বহুকাল আগে একটি হস্ত কুঠার (hand-axe) আবিষ্কৃত হয়েছিল (উপক্রমণিকায় প্রত্নপ্রস্তরযুগ দ্র.)। এই অস্ত্রটির বয়স এখনও সঠিকভাবে নিরূপিত হয়নি। তবে এটি যে দশ হাজার থেকে এক লক্ষ বছর আগেকার, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

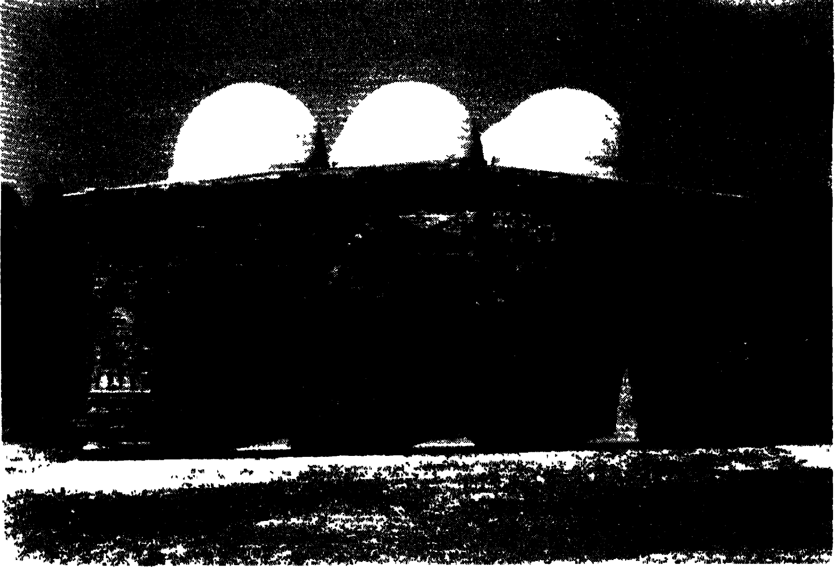
মুসলিম আমল

শর্শাদি গ্রামের প্রাচীন মসজিদ

ফেনী জেলার শর্শাদি একটি প্রাচীন গ্রাম। এ গ্রামে সুলতানি আমলের একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। ৩ দরজা ও ৩ মিহরাব বিশিষ্ট মসজিদের বাঁকানো প্যারাপেটের নিচে

আছে জোড়া কার্নিশ এবং তাও বাঁকানোভাবে নির্মিত। ভিতরের দুটি স্তম্ভ এবং চারপাশের দেয়ালের উপর নির্মিত হয়েছে ৬টি ছোট গম্বুজ। গম্বুজগুলি সুলতানি আমলের গম্বুজের মতো। চারকোণে আছে ৪টি মিনার।

মসজিদটি অতিশয় জীর্ণ অবস্থায় পড়েছিল। আমূল সংস্কারের পরে এটিকে আবাদ করা হয়েছে হাল আমলে।



শর্শাদী মসজিদ, শর্শাদী, ফেনী

নোয়াখালী জেলা

প্রাচীন যুগ

নোয়াখালী জেলা বিশেষ করে জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষাকৃত নবীন ভূমি নিয়ে গঠিত। জেলার নামকরণও সেই নবীনতার ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু জেলার উত্তর এবং বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চল খুবই প্রাচীন। তবে প্রাচীন যুগের বিশেষ কোনো প্রত্নকীর্তির ধ্বংসাবশেষ এ জেলায় দেখা যায় না। অবশ্য বৃহত্তর নোয়াখালী জেলায় যে দুটি প্রত্নবস্তুর সন্ধান মিলেছে তা খুবই মূল্যবান। এ দুটি বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ফেনী জেলায় তুলে ধরা হয়েছে।

মুসলিম আমল

প্রাচীন যুগের মতো মুসলিম আমলেরও বিশেষ কোনো প্রত্নকীর্তি বা সেগুলির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন নোয়াখালীতে দেখা যায় না। অথচ আগের কথা সঠিকভাবে বলা না গেলেও অন্তত চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ থেকে মোঘল আমলের সমাপ্তি পর্যন্ত এ জেলা যে মুসলমানের শাসনধীনে ছিল, সে প্রমাণের অভাব নেই।

বাঙলার স্বাধীন সুলতান ফখর-উদ্-দীন মোবারক শাহ্‌র অধীনে (১৩৩৮-৫০ খ্রিঃ) এ জেলা যে ছিল, সে প্রমাণ পাওয়া গেছে। তিনি চাঁদপুর থেকে এ জেলার ভিতর দিয়ে চট্টগ্রাম পর্যন্ত একটি সড়ক নির্মাণ করেছিলেন। ফখর উদ্-দীনের পথ (স্থানীয় ভাষায় 'হদ্দীনের হথ্') নামে পরিচিত এই প্রাচীন সড়কের অস্তিত্ব (alignment) আজও টিকে আছে। এর পরে বিভিন্ন সুলতানের অধীনে এ জেলা ছিল। কিন্তু সুলতানী আমলের কোনো কীর্তি বা কোনো কীর্তির ধ্বংসাবশেষ এ জেলায় খুঁজে পাওয়া যায় না।

মোঘল আমলে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে এ জেলায় মোঘল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। মোঘল সেনাপতি শেখ আবদুল ওয়াহিদ ভুলুয়ার জমিদার রাজা অনন্তমাণিক্যকে পরাজিত করে এ জেলা অধিকার করেন এবং মাঝে মাঝে আরাকানের রাজা এ জেলায় অভিযান চালিয়ে লুটতরাজ করলেও মোঘল অধিকার এখানে টিকেই থাকে অনন্তমাণিক্যের পিতা নক্ষত্রমাণিক্য এবং তাঁর পূর্বসূরি দুর্লভনারায়ণ মোঘলদের পূর্বে এ জেলায় অধিপতি ছিলেন।

মোঘল আমলে ভুলুয়া ও জগদীয়া উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। এবং একের পর এক অনেক মোঘল ফৌজদার এখানে বসবাসরত ছিলেন এবং তাঁরা এদুটি স্থানে দুর্গও নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু মেঘনা নদীর ভাঙ্গনে দুটি স্থানই বিলুপ্ত

হয়ে গেছে। বর্তমান ভবানীপুরের কিছু দক্ষিণে ছিল প্রাচীন ভুলুয়া। সে কালের কোনো কীর্তির চিহ্নই এখন আর টিকে নেই। নদীর ভাঙ্গনে জগদীয়াও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

মোঘল আমলের বিশেষ কোনো কীর্তির চিহ্ন বর্তমান নোয়াখালী জেলায় আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

কাঞ্চনপুরের মাযার

রামগঞ্জ উপজেলার অধীনে এবং উপজেলা সদর থেকে কয়েক কিলোমিটার পুব-উত্তরে কাঞ্চনপুর (সোনাপুর-কাঞ্চনপুর) নামক একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। এ গ্রামে সৈয়দ মওলানা হাফেজ আহমদ তনুরী তারাক্‌কুলি ওরফে সৈয়দ মীরন শাহ্ নামক একজন দরবেশের মাযার আছে। তিনি হযরত আবদুল কাদির জিলানীর বংশধর (পৌত্র?) ছিলেন এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নোয়াখালী এবং কুমিল্লা জেলায় মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলে এসময়ে এখানে ইসলাম প্রচার খুব সম্ভাব্য ঘটনা বলে মনে হয় না। খুব সম্ভব এই দরবেশ আরও অনেক পরের, চতুর্দশ শতাব্দীর একজন ধর্মপ্রচারক ছিলেন।

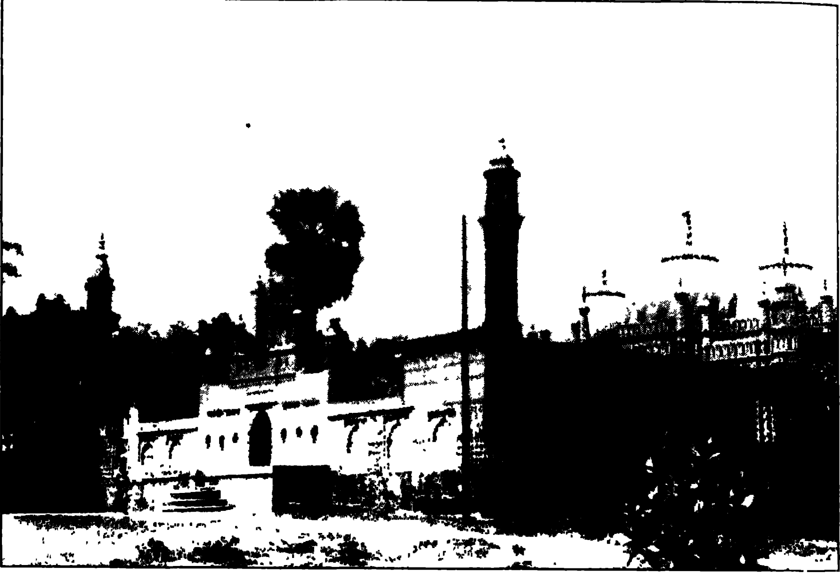
তাঁর পাকা মাযারটি বেশ প্রাচীন যদিও হাল আমলের অনেক ছাপ এর মধ্যে পড়েছে। মাযার ইমারতটি হাল আমলের।

বজরা শাহীমসজিদ ও মাযার

চৌমোহনী থেকে প্রায় ৯ কিলোমিটার উত্তরে ও বজরা রেলস্টেশন থেকে সামান্য উত্তর-পশ্চিমে বজরা গ্রামে একটি উল্লেখযোগ্য মসজিদ আছে। নাম বজরা শাহী মসজিদ।

একটি অনুচ্চ ভিত্তিবেদীর উপরে আয়তাকারে নির্মিত এ মসজিদ উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। মসজিদের চারকোণে ৪টি মিনার বা টারেট (turret) আছে। অষ্টকোণাকৃতির এই মিনারগুলি প্যারাপেটের অনেক উপরে উঠে ক্ষুদ্র গম্বুজে শেষ হয়েছে। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশপথ আছে। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি অলংকৃত মিহরাব। মসজিদের দেয়ালগুলি বেশ প্রশস্ত। উপরে আছে ৩টি মনোরম গম্বুজ। এগুলির শীর্ষদেশ পদ্ম ডাঁটার মত 'ফিনিয়েল' (finial) দ্বারা অলংকৃত। মসজিদের চারদিকেই সরু ও গোলাকার মিনার আছে। মসজিদের কার্নিশ ও প্যারাপেট সরলরেখায় নির্মিত। উঁচু প্যারাপেটের উপরিভাগ মনোরম 'ব্যাটলম্যান্ট' দ্বারা সুশোভিত।

মসজিদের সামনে আছে একটি ক্ষুদ্র আঙ্গিনা। আঙ্গিনার পূর্ব সীমানায় আছে সুদৃশ্য তোরণ। উঁচু ভিত্তিবেদী ও প্রশস্ত দেয়ালের সাহায্যে নির্মিত তোরণের দুই অন্তে আছে ২টি মিনার। তোরণকে কেন্দ্র করে যে ছোট ইমারতটি নির্মিত হয়েছে তার কেন্দ্রস্থলে বেশ উপরে নির্মিত হয়েছে আজান দিবার জন্য মিনারটি। এই মিনারের উপরিভাগ একটি অতি মনোরম গম্বুজ দ্বারা সুশোভিত। এই গম্বুজের চারদিকে আছে সরু ও গোলাকার মিনার। গম্বুজসহ এগুলির শীর্ষদেশ 'ফিনিয়েল' দ্বারা শোভিত।



▲ বজরা শাহী মসজিদ, নোয়াখালী

দিল্লীতে মোঘল আমলে নির্মিত মসজিদের স্থাপত্য নিদর্শন এ মসজিদে দেখা যায় এবং জনশ্রুতিমূলে জানা যায় যে, মসজিদ নির্মাতা দিল্লী থেকে স্থপতি ও কুশলী আনিয়ে বহু অর্থব্যয়ে এ মসজিদ-নির্মাণ করেছিলেন। হাল আমলে চীনামাটির ভগ্নাংশ দ্বারা মসজিদ, গম্বুজ ও তোরণের উপরে অলঙ্করণের কাজ করা হয়েছে। ফলে মসজিদের গঠনপ্রণালীতে দিল্লীর স্থাপত্যনিদর্শন দেখা গেলেও সে আমলের সূক্ষ্ম কারুকার্যের বহু চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে মসজিদটি দেখতে এখনও বেশ সুন্দর।

মসজিদের গায়ে যে শিলালিপি আছে, তা থেকে জানা যায় যে সম্রাট মোহাম্মদ শাহ্‌র রাজত্বকালে ১৭৪১ খ্রিস্টাব্দে আমানউল্লাহ্ নামক এক ব্যক্তি মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন।

মসজিদের কাছেই বেশ কয়েকটি পাকা কবর আছে। এ সম্পর্কে নোয়াখালীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর আবদুল্ কাদির বলেন যে, আমানউল্লাহ্, তাঁর ভাই সানাউল্লাহ্ ও তাঁদের মাতার কবর মসজিদ আঙ্গিনার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আছে।[১]

---

১. এ সম্পর্কে তিনি বলেন, Two brothers Aman Allah and Shana Allah and their mother were stated to have been buried in the south-east corner within the mosque enclosure and the remains of a brick structure (18-6″ × 8-6″ internal measurements) built over their graves are still extant. The structure had three multi-cusped arched openings on the north and three pointed arched openings on the south. The latter openings were later on closed by brick jali works. The east wall also shows indications of an opening which is now completely closed by fillings of ancient bricks."
—Ancient monuments of East Pakistan, p. 203, Dr. S.M. Hasan.

মটবী মসজিদ

উপরে উল্লিখিত বজরা শাহী মসজিদ থেকে আনুমানিক ৭৫০ মিটার উত্তর-পশ্চিম দিকে মটবী গ্রামে একটি উল্লেখযোগ্য মসজিদ আছে। এটিকে স্থানীয়ভাবে মন্দ্রাজ পাটারীর (পাটওয়ারী) মসজিদ বলা হয়ে থাকে। পাটারী (পাট ওয়ারী) দিঘি নামক একটি বড় জলাশয়ের পাড়ে মসজিদটি অবস্থিত।

উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এই মসজিদের ভিতরের মাপ ৯.৪ × ৪.৩ মিটার। মসজিদের দেয়ালগুলি বেশ প্রশস্ত। চারকোণে আছে ৪টি অষ্টকোণাকৃতির মিনার বা টারেট। উপরে আছে ৩টি সুন্দর গম্বুজ। পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং দক্ষিণ ও উত্তর দেয়ালে ১টি করে প্রবেশপথ আছে। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি মিহরাব।

মসজিদের গায়ে যে শিলালিপি আছে, তা থেকে জানা যায় যে, ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। পরে ১৯০১-০২ খ্রিস্টাব্দে মসজিদটি আমূল সংস্কার করা হয়।

চট্টগ্রাম জেলা

ঝিয়রী

আনোয়ারা থানার অধীনে এই ঝিয়রী গ্রাম কর্ণফুলীর বামতীরে পাহাড়ী অঞ্চলে অবস্থিত। দীয়াং বা দেয়াং-এর পাহাড় নামে পরিচিত এই অনুচ্চ পাহাড় শ্রেণীর এক দিকে ছিল সমুদ্র ও কর্ণফুলীর মোহনা এবং অন্যদিকে ছিল নিম্নভূমি। এখানে প্রাচীনকাল থেকে বহু ইমারতাদি গড়ে উঠেছিল। অষ্টম-নবম শতাব্দীতে আরব বণিকেরা এখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন বলে জানা যায়। এরপরে এ স্থানে পর্তুগীজদের আড্ডা হয়। মোঘল আমলে চট্টগ্রামের শাসনকর্তারা এখানে বাগানবাটি ইত্যাদি নির্মাণ করেন। দিয়াং-এর পাহাড়ের উপরে অনেক প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন আজও দেখা যায়।

দেশ বিভাগের অনেক আগে এখানকার ঝিয়রী নামক স্থানে মাটির নিচে অসংখ্য ব্রোঞ্জ মূর্তি পাওয়া যায়। অষ্টম-নবম-দশম শতাব্দীতে এসমস্ত মূর্তি নির্মিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতদের অভিমত। এগুলি সবই বুদ্ধ ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি। মূর্তিগুলি বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এগুলির মধ্যে একটি ব্রোঞ্জ নির্মিত চৈত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন বাঙলার বৌদ্ধ সংস্কৃতির ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, চট্টগ্রাম অঞ্চলে 'পণ্ডিত বিহার' নামে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। এ বিহারের স্থান এখনও নির্ণয় করা যায়নি। কেউ কেউ মনে করেন যে, পণ্ডিত বিহার এই ঝিয়রীতেই অবস্থিত ছিল। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, এটি পটিয়া থানার চক্রশালাতে ছিল। মীরসরাই থানার অন্তর্গত ছোটে খাঁর মসজিদের নিকটেও কেউ কেউ এর স্থান নির্দেশ করেন। তবে অসংখ্য ব্রোঞ্জ মূর্তির প্রাপ্তিস্থান ঝিয়রীর দাবি খুব উপেক্ষণীয় বলে মনে হয় না। এখানে প্রাচীন ইমারতের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষও দেখা যায়।

রাঙ্গুনিয়ার ধ্বংসাবশেষ

রাঙ্গুনিয়া কলেজের পিছনে একটি টিলাতে একটি প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ইমারতটি সম্পর্কে বিশেষ কিছুই বলা যায় না। তবে পাথরের তৈরি অসংখ্য স্তম্ভ দেখে মনে হয় যে এটি ছিল একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা। খুব সম্ভব এখানে একটি বৌদ্ধমন্দির ছিল।

মুসলিম আমল

ছোটেখাঁর মসজিদ

মীরসরাই থানার উত্তরভাগে ঢাকা-চট্টগ্রাম পাকা সড়কের লাগোয়া পশ্চিম দিকে অবস্থিত একটি বড় দিঘির পূর্বপাড়ের দক্ষিণভাগে একটি অপেক্ষাকৃত উঁচুস্থানে শত শত প্রস্তর খণ্ড পড়ে আছে। জলাশয়ের নাম ছোটেখাঁর দিঘি, স্থানীয় ভাষায় ছোট্‌কার দিঘি। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ জলাশয়ের আয়তন প্রায় ২১৫.৪১ মিটার × ১২৩ মিটার। পাড়গুলি এখনও প্রায় ৪.৫৪ মিটার উঁচু ও বেশ প্রশস্ত। দিঘিতে সারা বছর পানি থাকে। তবে কাকচর ও সংলগ্ন চরা এলাকায় বোরো ধানের চাষ হয়। এ দিঘির পশ্চিম-উত্তর দিকে প্রায় সংলগ্ন অবস্থায় অনুরূপ আকারের আরও একটি দিঘি আছে। লোকে বলে মুসাখাঁর দিঘি। এ দুটি ছাড়া আরও কয়েকটি বড় বড় জলাশয় ধারেকাছে আছে। গ্রামের নাম পরাগলপুর। হোসেন শাহ্‌র সেনাপতি পরাগল খাঁ ও পরে তাঁর পুত্র ছোট খাঁ এ অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন বলে জানা যায়। তখন পরাগলপুরে একটি সমৃদ্ধশালী জনপদের অস্তিত্ব ছিল।

যে-স্থানে পাথরগুলি পড়ে আছে, সেখানে হাল আমলে নির্মিত ঢেউটিনের চাল বিশিষ্ট একটি মসজিদ আছে। একটি প্রাচীন মসজিদের ভগ্নাবশেষের উপরে হাল আমলের জুম্মাঘরটি নির্মিত। প্রাচীন মসজিদটির নাম ছোট খাঁর মসজিদ, স্থানীয় ভাষায় ছোটকার মসজিদ।

প্রাচীন মসজিদের কোনো কোনো দেয়াল এখনও মাটি থেকে প্রায় ১.০৩/১.৩ মিটার উপরে দণ্ডায়মান আছে। তবে সব ক'টা দেয়াল টিকে নেই। পশ্চিম দেয়ালের অনেকাংশ এখন খাড়া আছে। পূর্বদিকের দেয়াল বিলুপ্তপ্রায়। সেখানে পুরাতন ইটের সাহায্যে নতুন করে দেয়াল তৈরি করা হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দেয়াল সম্পর্কে একই মন্তব্য প্রযোজ্য।

প্রাচীন মসজিদের আয়তন সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা কঠিন। তবে এটি যে খুব বড় আকারের মসজিদ ছিল না তা বলা যায়। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ মসজিদ খুব সম্ভব ১২.১৬ মিটার × ৭.৫৭ মিটার আয়তনবিশিষ্ট ছিল বলে ধারণা হয়। দেয়ালগুলি ছিল প্রায় ১.৬৬ মিটার প্রশস্ত। মসজিদে ক'টি গম্বুজ ছিল তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও পূর্ব দেয়ালে ৩টি দরজা ও পশ্চিম দেয়ালে ৩টি মিহরাবের অস্তিত্ব দেখে ধারণা হয় যে, এতে ৩টি গম্বুজ ছিল।

মসজিদের একটি বিশেষত্ব হল এই যে, এতে অসংখ্য পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল। মসজিদের চারদিকের খোলা ময়দানে অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে জানা যায় যে, এসমস্ত পাথর মসজিদে ব্যবহৃত ছিল। রাজশাহী কুসুম্বা মসজিদের মতো পাথর দিয়ে মসজিদের ইষ্টক নির্মিত দেয়াল আবৃত ছিল বলে মনে হয় না। খুব সম্ভব দিনাজপুরের সুরা মসজিদের মতো মসজিদের চারকোণের টারেট বা মিনার, দেয়াল সংলগ্ন স্তম্ভ, দরজার চৌকাঠ, মিহরাব ইত্যাদি পাথরের তৈরি ছিল।

এই প্রাচীন মসজিদ খুব সম্ভব হোসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) অথবা তাঁর পুত্র নুসরত শাহ্‌র রাজত্বকালে (১৫১৯-৩১ খ্রিঃ) সেনাপতি ছোট খাঁ কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল।

মসজিদে ব্যবহৃত পাথরগুলি চট্টগ্রাম-পার্বত্যচট্টগ্রাম অঞ্চলের স্থানীয় পাথর নয়। এগুলির মধ্যে আছে বেলেপাথর ও রাজমহলের কালপাথর। এগুলি দেখে ধারণা হয় যে, মসজিদে ব্যবহৃত হবার আগে পাথরগুলি খুব সম্ভব অন্য কোনো ইমারতে ব্যবহৃত হয়েছিল। ধারেকাছের কোনো বৌদ্ধ বা হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে এ পাথরগুলি সংগ্রহ করে মসজিদে লাগান হয়েছিল বলে ধারণা হয়। তেমন কোনো কীর্তির ধ্বংসাবশেষের সন্ধান অবশ্য ধারেকাছে কোথাও পাওয়া যায়নি।

কুমিরা হাম্মাদ মসজিদ

একটু অসাধারণ ধরনের এই এক গম্বুজ মসজিদ দিঘি নামক একটি প্রাচীন জলাশয়ের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের প্রায় লাগোয়া পুব ধারে মসজিদা গ্রামে (মসজিদের নামানুসারে) ও সীতাকুণ্ড উপজেলার অধীনে মসজিদটি অবস্থিত। কুমিরা রেলস্টেশন থেকে এ স্থান প্রায় এক কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত।



কুমিরা মসজিদ, চট্টগ্রাম

বর্গাকারে নির্মিত এ মসজিদের প্রত্যেক বাহু বাইরের দিকে ৬.৩৬ মিটার ও ভিতরের দিকে ৪.২৪ মিটার দীর্ঘ। অবশ্য চারকোণে যে ৪টি বিরাট মিনার (টারেট) আছে সেগুলি এই পরিমাপের মধ্যে অন্তর্গত নয়। কেন্দ্রীয় মিহরাবের পিছনে পশ্চিম দেয়ালেও অনুরূপ একটি বিরাট আকারের মিনার আছে। কোণের মিনারগুলির

প্রত্যেকটির ব্যাস ২.৭৭ মিটার (৯´-২´´) এবং কেন্দ্রীয় মিনারের মিনারটির ব্যাস ৩.২৫ মিটার (১০´-৯´´)। গোলাকৃতির এসব মিনারের গায়ে স্ফীতকায় ব্যান্ড আছে এবং সেগুলি মিনারগুলিকে ৩ ভাগে বিভক্ত করেছে প্যারাপেট পর্যন্ত। প্যারাপেটের উপরে মিনারগুলির শীর্ষদেশে আছে ছোট গম্বুজ। এই মসজিদের কার্নিশ ও প্যারাপেট বাঁকানোভাবে নির্মিত।

মসজিদের পুব দেয়ালে আছে বাঁকানোভাবে (arched) নির্মিত ৩টি প্রবেশপথ—কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি অন্য দুটি থেকে কিছুটা বড়। কিন্তু প্রবেশপথগুলি অপেক্ষাকৃত নিচুভাবে নির্মিত। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের কেন্দ্রস্থলে একটি করে বড় আকারের কুলঙ্গি (nich) আছে। এই কুলঙ্গিগুলির আয়তন পুব দেয়ালে অবস্থিত পাশের দুটির প্রায় সম-আয়তনের। এই বৃহৎ কুলঙ্গিগুলির দুধারে আছে একটি করে ক্ষুদ্রাকারের কুলুস ছিল এবং সেগুলি নির্মিত হয়েছিল খুব সম্ভব মসজিদের ভিতরে আলোবাতাস সরবরাহের জন্য।

মসজিদের ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে তিনটি মিহ্‌রাব—কেন্দ্রীয় মিহ্‌রাবটি অন্য দুটি থেকে অপেক্ষাকৃত বড়। কেন্দ্রীয় মিহ্‌রাব ও এর ডানদিকের মিহ্‌রাবের ফ্রেম আয়তাকারে এক খণ্ড নিরেট পাথর দ্বারা নির্মিত এবং সেই পথরের ফ্রেমে শিকল ও ঘন্টার অলঙ্করণ আছে। কেন্দ্রীয় মিহ্‌রাবের ফ্রেমে কোরানের বাণী উৎকীর্ণ আছে। বামদিকে মিহ্‌রাবটি সাদাসিধাভাবে ইষ্টকনির্মিত।

মসজিদের উপরে আছে একটি মাত্র গম্বুজ এবং তা বেশ বড় ও অর্ধবৃত্তাকারে স্কুইকের সাহায্যে নির্মিত। গম্বুজের শীর্ষদেশে আছে পদ্মের ফিনিয়েল।

মসজিদটি একটি প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে নির্মিত হয়েছিল এবং এর প্রবেশপথ ছিল একটি নিচু দোচালা ঘরজাতীয় তোরণের ভিতর দিয়ে। এই দোচালা ঘরের আকৃতির তোরণটি মসজিদ নির্মাণ কালেই নির্মিত হয়েছিল কিনা তা জানা নেই। কারণ এ ধরনের দোচালা ঘরের অস্তিত্ব সুলতানি আমলে আর কোথাও পাওয়া গেছে বলে জানা নেই। সেই তোরণটি বর্তমান কালে বিনষ্ট করে সেখানে একটি 'মাজিনা' নির্মাণ করা হয়েছে।

মসজিদে আরবী তোঘরা অক্ষরে কালপাথরের দুই পঙ্ক্তির একটি শিলালিপি ছিল। প্রথম পঙক্তিটি কালের অমোঘ বিধানে অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে পাঠ করা যায় না। ডক্টর আবদুল করিম দ্বিতীয় পঙ্ক্তির যে পাঠ অতি কষ্টে উদ্ধার করেছেন তা নিম্নরূপ :

অনুবাদ : আল দুনিয়া ওয়াল দীন আবুল মোযাফ্‌ফর মাহমুদ আল সুলতান ইবনে আল সুতা'ন—মসজিদ নির্মাণের তারিখ ও সন না পাওয়া গেলেও মসজিদটি যে সুরতানি আমলের। তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সুলতানের নাম 'মাহমুদ' থেকে সহজেই ধারণা করা যায় যে, তিনি ছিলেন সুলতান হোসেন শাহ্‌র পুত্র সুলতান ঘিয়াস-উদ্‌-দীন মাহমুদ শাহ্ (১৫৩৩-৩৮ খ্রিঃ)।

আন্দরকিল্লা মসজিদ

নবাব শায়েস্তাখানের পুত্র চট্টগ্রামের শাসনকর্তা বুজুর্‌গ উমেদখান এ মসজিদ নির্মাণ করেন (১৬৬৬-৬৭ খ্রিঃ)। শায়েস্তাখানী পদ্ধতিতে নির্মিত উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ

মসজিদের অভ্যন্তর ভাগ তিন অংশে বিভক্ত ছিল। কিন্তু উপরের কেন্দ্রীয় অংশে ছিল একটি মাত্র গম্বুজ এবং দু'পাশে ছিল 'ক্রস্ভল্ট' দ্বারা গঠিত ছাত্র। ৩ দরজা ৩ মিহরাব বিশিষ্ট এ মসজিদ চট্টগ্রাম শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। বর্তমানে এ মসজিদের এত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে যে পুরাতন মসজিদের কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

বাগ-ই-হামজা মসজিদ

পাঁচলাইশ থানা থেকে কয়েক কিলোমিটার উত্তরে চট্টগ্রাম-হাটহাজারি সড়কের উপরে বাগ-ই-হামজা নামক মোঘল আমলের প্রাচীন মহল্লাতে এই মসজিদ অবস্থিত। এই প্রাচীন মসজিদের নিকট একটি কবরস্থান ও একটি প্রাচীন পুকুরও আছে।

মসজিদটি সুবৃহৎ জলাশয়ের দক্ষিণপাড়ে অবস্থিত এবং কবরস্থানটি মসজিদ সংলগ্ন। এখানে একটি উদ্যানও ছিল এবং তা ছিল খুব সম্ভব মসজিদ সংলগ্ন উন্মুক্ত ভূমিতে। বর্তমানে উদ্যানের অস্তিত্ব নেই।

মসজিদে একটি শিলালিপি ছিল এবং তার পাঠ থেকে জানা যায় যে, ১০৯৩ হিজরী (১৬৮২-৮৩ খ্রিঃ) সনে শমশির খানের পুত্র সৈয়দ হামজা খান এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। খুব সম্ভবত তিনি ছিলেন এ স্থানের শাসনকর্তা।

এই মসজিদের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ বহুকাল পূর্বে মসজিদের ছাদ ধসে পড়েছিল এবং মসজিদটি ভগ্নপ্রাপ্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। সেখানে পরবর্তীকালে নতুন করে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে অনেক বর্ধিত আকারে। মসজিদের উত্তর দিকে প্রায় তিনগুণ বর্ধিত করা হয়েছে এবং পূর্বদিকে একটি বারান্দা সংযোজন করা হয়েছে। বর্তমানে এটি একটি আধুনিক মসজিদ। যদিও লিপিটি এখনও সেখানে আছে।[১]

কদম মোবারক মসজিদ

চট্টগ্রাম শহরের প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কদম মোবারক মসজিদ চট্টগ্রামের তদানীন্তন মোঘল শাসনকর্তা ইয়াসীন খান কর্তৃক ১৭১৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এ মসজিদের মূল অংশের সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে কক্ষ সংযোজিত আছে। উত্তর দিকের কক্ষে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-র পদচিহ্ন (কদম মোবারক) ও দক্ষিণ দিকের কক্ষে গাউসল আযম বড়পীর সাহেবের পদচিহ্ন রক্ষিত আছে বলে বলা হয়ে থাকে।

মোঘল স্থাপত্য শিল্পের শেষের দিকের নিদর্শন বহনকারী এ মসজিদের চারকোণে ৪টি অষ্টকোণাকৃতির টারেট বা মিনার আছে। এগুলি ছাদের অনেক উপরে উঠে গেছে।

---

১. হামজাবাগ মসজিদ—পাঁচলাইশ থানাথেকে মাইল দুই উত্তরে একটা প্রাচীন পুকুরের দক্ষিণ তীরে প্রাচীন মসজিদ (মোঘল আমলের) বর্তমানে নতুন করে বর্ধিত আকারে নির্মিত। সাথে কবরস্থান ও পিছনে খোলা স্থান খুব সম্ভব বাগান (হামজাবাগ) ছিল। শিলালিপি।
সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ১০৯৩ হিজরী (১৬৮২-৮৩ খ্রিঃ) সনে শমশেরের পুত্র সৈয়দ হামজা এ মসজিদ নির্মাণ করেন।

পূর্ব দেয়ালে আছে ৩টি প্রবেশপথ। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ অপেক্ষাকৃত বড়। অর্ধবৃত্তকারের খিলানের সাহায্যে নির্মিত প্রবেশপথগুলির দু'পাশে প্যানেলিং ছিল। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের দু'পাশে গোলাকার ছোট মিনার আছে। এ মিনার দুটিও ছাদের অনেক উপরে উঠে গেছে। উপরের প্যারাপেট ব্যাট্‌ল্‌মেন্ট দ্বারা শোভিত। পশ্চিম দেয়ালে ৩টি মিহরাব আছে। মসজিদের দেয়াল বেশ পুরু। উপরে ৩টি গম্বুজ। কেন্দ্রীয় গম্বুজটি বেশ বড়। পাশের দুটি গম্বুজ বেশ ছোট

পাশের দুটি কক্ষের ছাদে গম্বুজ নেই। উত্তর ভারতীয় পদ্ধতিতে নির্মিত চারকোণওয়ালা গম্বুজাকৃতির ছাদের উপরিভাগ 'ফিনিয়েল' (finial) দ্বারা অলঙ্কৃত। উত্তর দিকের প্রকোষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) পদচিহ্ন বহনকারী বলে প্রচারিত একখণ্ড কাল পাথর অতীব যত্নসহকারে রক্ষিত আছে। আনুমানিক .৩১ মিটার × .১৫ মিটার ইঞ্চি পরিমিত এই প্রস্তরখণ্ডকে সর্বসময়ে পানিতে ডুবিয়ে রাখা হয় এবং সেই পানি প্রতিদিন রোগ নিরাময়ের অমোঘ ঔষধ হিসাবে এখান থেকে নিয়ে বহুলোকে ব্যবহার করে থাকেন। এ পাথরের হেফাজতের জন্য একজন বিশেষ খাদিম আছেন এবং এর পবিত্রতা ও অমোঘতা প্রকাশের জন্য বক্তৃতাসহ যে সমস্ত আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন, তার অভাব মোটেই পরিলক্ষিত হয় না। পায়ের ছাপ বলে যে চিহ্নগুলিকে দেখান হয়, অনবরত ধোওয়া-মোছার ফলে সেগুলি প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। এখনও যে অস্পষ্ট ছাপ আছে তা দেখে মনে হয় যে, এগুলি যাঁর পায়ের ছাপ, তিনি এক বিরাট আকারের মানুষ ছিলেন।

ওয়ালী খাঁর মসজিদ

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের পূর্বদিকে অবস্থিত চৌমোহনীতে ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে ওয়ালী খান কর্তৃক এ মসজিদ নির্মিত হয়। অলিখানের মসজিদ নামে সুপরিচিত এ মসজিদের এত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে যে এটি যে একটি প্রাচীন মসজিদ ছিল, তা [illegible] করা কঠিন।

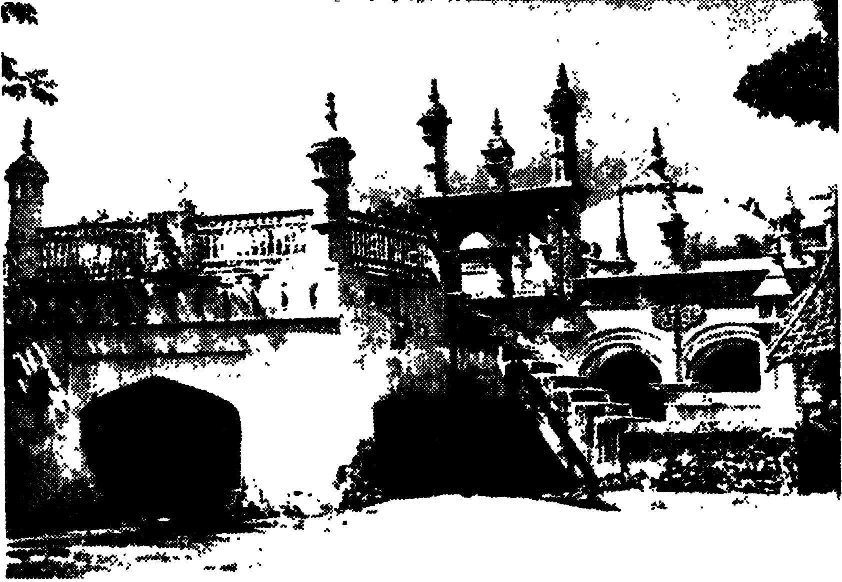
চেরাগী পাহাড়

আন্দরকিল্লার কিছু উত্তরে একটি অনুচ্চ টিলাকে 'চেরাগী পাহাড়' বলা হয়ে থাকে। জনপ্রবাদ মতে এখানে নাকি শাহ্ বদর ' চেরাগ' (প্রদীপ) জ্বালিয়ে চট্টগ্রাম থেকে ভূত-প্রেত তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এ পাহাড়ের চূড়ায় কিছু কিছু ইট দেখা গেছে কিন্তু কোনো প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি চট্টগ্রাম উন্নয়ন সংস্থা (সি, ডি, এ) পাহাড়টিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য চারদিকে প্রাচীর তুলে দিয়েছে।

বায়েজীদ বোস্তামীর দরগা ও মসজিদ

দরগা : চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার উত্তরে শিল্প এলাকার পশ্চিম দিকে একটি অনুচ্চ পাহাড়ের উপরে একটি দরগা অবস্থিত। সুলতান বায়েজীদ বোস্তামীর

দরগা বলে কথিত এইস্থানে যে কোনো কবর নেই, তা দরগাহর প্রচার ও বাক্‌পটু খাদিমগণও স্বীকার করেন। তাঁদের মতে দরবেশ নাকি এখানে পাঁচ বছর ধরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে বসে আরাধনা করেছিলেন এবং তিনি যেখানে আগুন জ্বালাতেন সেই ছাইগুলিও দরগার একটু পশ্চিমে দেখান হয়ে থাকে। তাঁদের মতে এখানে তাঁর একটি আঙ্গুল নাকি শহীদ হয়েছিল এবং তারই উপর নাকি বর্তমান দরগাটি নির্মিত হয়েছে। এ দরগার ভিতরে ও বাইরে জৌলুসের সীমা নেই।



বায়েজিদ বোস্তামীর দরগা মসজিদ, চট্টগ্রাম

মসজিদ : দরগার পূর্বদিকে সমতলভূমিতে অওরঙযেবের রাজত্বকালে নির্মিত একটি সুন্দর মসজিদ আছে। উত্তর-দক্ষিণ লম্বা এ মসজিদের চারকোণে ৪টি অষ্টকোণাকৃতির মিনার বা টারেট আছে। এগুলির উপরিভাগ ছোট গম্বুজ দ্বারা সুশোভিত। মিনারগুলির গায়ে সুন্দর প্যানেলিং আছে। পূর্ব দেয়ালে আছে ৩টি প্রবেশপথ। পূর্বদিকের কেন্দ্রীয় দরজা অপেক্ষাকৃত বড় এবং দরজার অংশ বাইরের দিকে উদগত; দরজার দু'পাশের অংশ প্যানেলিং দ্বারা অলঙ্কৃত। তার পরেই দু'দিকে দুটি বড় আকারের মিনার আছে। মিনারের পাশে দেয়ালের গায়েও প্যানেলিং আছে। উপরের উঁচু প্যারাপেট ব্যাট্‌লমেন্ট দ্বারা সুশোভিত। এ মসজিদটিতে ক্রমাগত সংস্কারকার্য করা হলেও এর প্রাচীনত্ব চোখে পড়ে।

মুসলিম আমল

ফকীরা মসজিদ, হাট হাজারী

চট্টগ্রাম-হাটহাজারী পাকা সড়ক ধরে হাটহাজারী বাজারে প্রবেশ করার পথে সড়কের পশ্চিম পার্শ্বে একটি প্রাচীন মসজিদ বহুকাল ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে

পড়েছিল। বহুকাল আগে এক ফকীর মসজিদের সংস্কার করে এটিকে ব্যবহারযোগ্য করেন বলে এর নাম হয় ফকীরা মসজিদ।

আয়তাকারে নির্মিত এ মসজিদের আয়তন বাইরের দিকে ১৩.৬৩ মিটার × ১০.৬ মিটার এবং ভিতরের দিকে ৯.৬ মিটার × ৭.৬ মিটার। প্রধানত ইষ্টক নির্মিত এ মসজিদের ভিতরের ও মিহরাবের স্তম্ভগুলি পাথরের তৈরি। মসজিদের বাইরের দিকে চারকোণে ৪টি মিনার বা টারেট আছে। এগুলি নিচের দিকে গোলাকার কিন্তু ছাদের উপরে অষ্টকোণাকৃতির এবং শীর্ষদেশ ছোট গম্বুজ দ্বারা শোভিত ছিল।

মসজিদের দেয়ালগুলি বেশ প্রশস্ত। পূর্ব দেয়াল ছিল খিলানের সাহায্যে নির্মিত ৩টি প্রবেশপথ। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ অপেক্ষাকৃত বড়। এর দু'পাশে ২টি গোলাকার মিনার আছে। মিনার দুটি ছাদের উপরে গিয়ে ছোট গম্বুজে শেষ হয়েছে। মসজিদের প্যারাপেট মারলন দ্বারা সুশোভিত ছিল। মসজিদের কার্নিশে দোচালা ঘরের মারুলের ন্যায় যে সুন্দর বাঁক (curve) ছিল পরবর্তী কালে মসজিদ সংস্কারের সময় তা সোজা করা হয়েছে।

মসজিদের দরজা বরাবর পশ্চিম দেয়ালে ছিল ৩টি কারুকার্য খচিত মিহরাব। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড়। মিহরাবের অর্ধচন্দ্রাকৃতির গঠন বাইরের দিকে খাঁজকাটা। সমুদয় মিহরাবের ফ্রেম (frame) আয়তাকারে কালপাথরে নির্মিত। উপরে আরবী ভাষায় কোরানের বাণী উৎকীর্ণ আছে। পার্শ্বদেশে ঝুলন্ত শিকল ও ঘন্টার প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে।

মসজিদের অভ্যন্তরে প্রস্তর নির্মিত দুটি স্তম্ভ ও চারপাশের দেয়ালের উপর মসজিদের ৬টি গম্বুজ প্রতিষ্ঠিত। গম্বুজগুলি উল্টানো পেয়ালাকৃতির ও নিচু।

পূর্ব দেয়ালের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উপরে বাইরের দিকে ১.১৯ মিটার × .৪৫ মিটার আয়তনের একখণ্ড কাল পাথরের উপর ২ ছত্রের একটি শিলালিপি আছে। আরবী তোঘরা অক্ষরে উৎকীর্ণ এ শিলালিপির নিম্নাংশ মুছে যাওয়াতে এর সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধার করা সম্ভব নয়। প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতরের প্রাক্তন সুপারিনটেনডেন্ট ডক্টর আবদুল গফুর-এর মতে শিলালিপির সামান্য একটু অংশের পাঠ নিশ্চয় করে পড়া যায় এবং তা হচ্ছে,

'আল সুলতান শামস-আল-আবুল মোযাফ্ফর বারবক শাহ্'

শিলালিপির খণ্ডিত পাঠ অনুসারে দেখা যায় যে, এতে আবুল মোযাফফর বারবক শাহ্র নাম আছে। বারবক শাহ নামে দু'জন সুলতান খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে এদেশে রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় জন হচ্ছেন বারবক শাহ্ নামে একজন হাবসী সুলতান। তিনি ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৬ মাস রাজত্ব করেছিলেন বলে জানা যায়। এ মসজিদ তাঁর সময়ে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। এ নামের প্রথম নৃপতি ছিলেন রুকন-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ্-দীন আবুল মোযাফ্ফর বারবক শাহ্ ইবনে নাসির-উদ্-দীন মাহ্মুদ শাহ্। কোনো কোনো শিলালিপিতে তাঁর আবুল মোজাহেদ নামও দেখা যায়। তিনি ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। আলোচ্য মসজিদ তাঁর রাজত্বকালেই নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয়। তিনি বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে অনেক মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীহট্ট জেলার জকিগঞ্জেও তিনি একটি মসজিদ

নির্মাণ করেছিলেন। চট্টগ্রাম জেলায় তাঁর রাজত্বকালের এই একটি মাত্র মসজিদই আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস, এই উভয় দিক থেকেই এ মসজিদ একটি মূল্যবান সম্পদ। বাংলাদেশের এই অঞ্চলে তাঁর সময়ের একটি মাত্র মসজিদই টিকে আছে। এখান থেকে প্রায় মাইল তিনেক দক্ষিণে জোবরা গ্রামে আলাউলের দিঘির পাড়ে তাঁর সময়ে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। সেটি বর্তমানে টিকে নেই।

এ মসজিদে মোঘল আমলে অনেক সংস্কার করা হয়েছিল। হাল আমলে এতে বহু নূতন কাজ করা হয়েছে। ফলে মসজিদের বাইরের দিকে ও ভিতরে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এবং এটিকে কোন প্রাচীন মসজিদ বলে চিহ্নিত করা এখন সহজ নয়।

বখশীহামিদ মসজিদ, ইলিশা

বাঁশখালী উপজেলার অন্তর্গত ইলিশা গ্রাম একটি প্রাচীন মসজিদ আছে বলে চট্টগ্রাম জেলা গেজেটিয়ারে উল্লেখ আছে।[১] আয়তাকারে নির্মিত এ মসজিদ উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ। মসজিদের চারকোণে ৪টি মিনার (turret) আছে। পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে প্রবেশপথ। অর্ধবৃত্তাকারের খিলানের সাহায্যে নির্মিত পূর্ব দেয়ালের প্রবেশপথগুলি খাঁজকাটা। কেন্দ্রীয় দরজা ও পার্শ্ববর্তী অংশ বাইরের দিকে উদগত এবং দু'পাশে দুটি গোলাকার সরু মিনার আছে। প্যারাপেটের উপরিভাগ মারলন (marlon) দ্বারা অলঙ্কৃত। মসজিদের ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে ৩টি মিহরাব। মিহরাবগুলি অলঙ্কৃত নয়।

উপরে আছে ৩টি গম্বুজ। কেন্দ্রীয় গম্বুজ অপেক্ষাকৃত বড় এবং পাশের দুটি গম্বুজ ছোট করে নির্মিত। গম্বুজের উপরিভাগ পদ্মডাঁটা ও কলসাকৃতির 'ফিনিয়েল' দ্বারা অলঙ্কৃত।

মসজিদের সম্মুখ দেয়াল প্যানেল দ্বারা শোভিত। পলেস্তারার উপরে ফুলের প্রতিকৃতি দ্বারা মসজিদের সম্মুখের দেয়াল অলঙ্কৃত ছিল। দরজার উপরে যে শিলালিপি আছে, তা থেকে জানা যায় যে ৯৭৫ হিজরী (১৫৬৮ খ্রিঃ) সনে সুলতান-আল-মোয়ায্যম সোলায়মানের রাজত্বকালে এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। পরে ১১০৪ হিজরী (১৬৯২ খ্রিঃ) সনে বখশী হামিদ এ মসজিদ নূতন করে নির্মাণ করেন। ফলে মসজিদে মোঘল স্থাপত্যকৌশল প্রধান্য লাভ করে।

প্রথম শিলালিপিতে উল্লিখিত সুলতান-উল-মোয়ায্যম সোলায়মান যে বাঙলার পাঠান নৃপতি সোলায়মান কররানী (১৫৬৪-৭২ খ্রিঃ) তাতে বোধ হয় কোনো সন্দেহ নেই।

১. Chittagong District Gazetter, 1970.

কক্সবাজার জেলা

বৌদ্ধ-হিন্দু যুগ

রামকোট বিহার

রামু উপজেলার অন্তর্গত ও উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দক্ষিণে রাজারকূল মৌজায় অবস্থিত 'রামকোট বিহার ও বনাশ্রম' নামক একটি প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র আজও দেখা যায়। রামু-টেকনাফ রাস্তা ধরে বাঁকখালী নদী অতিক্রম করে একটি ছোট খাল পরে হয়ে কিছুদূর গেলেই রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে ২/৩ টি ও রাস্তার পূর্বপার্শ্বে বেশ কয়েকটি অনুচ্চ পাহাড়ী টিলা দেখা যায়। এ সমস্ত টিলার প্রত্যেকটিতেই কিছু না কিছু প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ বা ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন দেখা যায়। এগুলির বর্ণনা নিচে দেওয়া হল :

১. খাল পার হয়ে রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে প্রথম যে টিলাটি পড়ে, তাতে বনবিভাগের একটি স্থানীয় অফিস ও দু'একটি আবাসিক ভবনের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রায় ২বিঘা স্থান জুড়ে টিলার উপরে যে সমতল ভূমি আছে, তার প্রায় এক তৃতীয়াংশ স্থানের (দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে) মধ্যে একটি প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। বর্তমান ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় এবং উৎখনন না করে এর পরিচিতি সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা কঠিন। স্থানীয় ভিক্ষু মহোদয়ের মতে এখানে একটি বৌদ্ধস্তূপ ছিল। থাকা বিচিত্র নয়। কারণ, এখানে পাথরে তৈরি বেশ বড় আকারের একটি বৌদ্ধ মূর্তির একাংশ জঙ্গালাকীর্ণ ধ্বংসাবশেষের উপর পড়ে আছে। এটি এখানকার ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারতের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল বলে ধারণা হয়। তবে এটি বৌদ্ধস্তূপ ছিল, না মন্দির ছিল, তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। কীর্তিটি যে বেশ বড় ধরনের ছিল, ধ্বংসাবশেষ দেখেই তা বোঝা যায়।
২. এই ধ্বংসাবশেষের প্রায় ৩০০ মিটার দক্ষিণ-পূর্বদিকে বড় রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে একটি ছোট টিলা আছে। পার্শ্বের সমতল ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন এ টিলার মধ্যে প্রচুর প্রাচীন ইট ও দু'একটি বুদ্ধ মূর্তির ভগ্নাবশেষ দেখে ধারণা করা যায় যে, এখানে একটি বৌদ্ধ স্তূপ বা মন্দির ছিল।
৩. এ টিলা থেকে কিছু দক্ষিণ দিকে একটি ছোট নেড়াটিলা আছে। এখানেও প্রচুর প্রাচীন ইট এবং ইটের ভগ্নাংশ দেখা যায়। এখানে কোনো বৌদ্ধ মন্দির বা স্থানীয় 'জাদুঘর' জাতীয় কোনো ইমারত ছিল বলে মনে হয়।

৪. এ টিলার পূর্বদিকে অবস্থিত যে-টিলাটি আছে প্রধানত তাকে কেন্দ্র করেই বর্তমান 'রামকোট বিহার ও বনাশ্রম' নামে পরিচিত প্রতিষ্ঠানটি গঠিত। নিচে থেকে পাকা সিঁড়ি বেয়ে টিলার উপরে উঠতে হয়। সিঁড়িটি প্রাচীন বলে মনে হয়। কিন্তু হাল আমলে এটিতে আমূল সংস্কার করা হয়েছে। সিঁড়ির নিচে দক্ষিণ দিকে টিলার পাদদেশে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কয়েকটি পাকা কবর দেখা যায়। ভিক্ষু মহাশয়ের মতে এগুলি স্থানীয় বৌদ্ধদের কবর। হতে পারে। তবে কবরগুলি উত্তর-দক্ষিণ লম্বা মুসলমানের কবরের মতো।

এ টিলার উপরে বর্তমান বনাশ্রমের যে-মন্দির আছে, তা হাল আমলের। কিন্তু এর দেয়ালের গঠনপ্রণালী ও ইটের নমুনা দেখে ধারণা হয় যে, একটি প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষের উপর এবং তাকে কেন্দ্র করে বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। পূর্বমুখী ও ৩ কক্ষবিশিষ্ট এ মন্দিরে বহু বুদ্ধমূর্তি সংগৃহীত আছে। বেশ বড় আকারের একটি বুদ্ধমূর্তিকে হিন্দু দেবদেবীর পূজার অনুকরণে চাল-কলা, ফল-মূল ইত্যাদির নৈবেদ্য দিয়ে নিত্য পূজা করা হয়। মন্দিরের চারপাশে সমগ্র টিলা জুড়ে অনেক বুদ্ধমূর্তির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। আর দেখা যায় প্রাচীন ইট ও প্রাচীন ইমারতের ভিত্তির কিছু কিছু নিদর্শন। এখানে যে একটি প্রাচীন ইমারত ছিল, তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

৫. আলোচ্য মন্দিরের প্রায় ১৫০ মিটার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে নিম্নভূমিতে প্রায় এক একর ভূমি জুড়ে একটি প্রাচীন জলাশয় আছে। পুকুরের পূর্বদিকে একটি টিলা আছে। প্রায় ২২ মিটার উঁচু ও অপেক্ষাকৃত বড় আয়তনের এই টিলাকে রামসীতার পাহাড় বলা হয়ে থাকে। এতে ওঠার জন্য পশ্চিম দিকে পাকা ও মজবুত সিঁড়ি আছে। সিঁড়িগুলি প্রাচীন হলেও হাল আমলে সংস্কার করা হয়েছে।

প্রায় ১ একর পরিমিত এ টিলার উপরিভাগ একটি সুরম্য স্থান। সমগ্র টিলা জুড়ে প্রাচীন ইমারতের ভিত্তি দেখা যায়। এতে মনে হয় যে, এককালে সমগ্র স্থান জুড়ে অনেক ক'টা ইমারত অথবা অতি বড় ধরনের একটি ইমারত ছিল।

বর্তমান কালে এখানে ছোট ছোট ৩টি ইমারত আছে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই টিলার প্রায় পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত পূর্বমুখী যে ইমারতটি পড়ে, তা হচ্ছে দশকোণবিশিষ্ট একটি বৌদ্ধমন্দির। ভিতরের ব্যাস প্রায় ২.২ মিটার। দেয়ালগুলি প্রায় ১.১ মিটার প্রশস্ত। উপরে কক্সবাজার অঞ্চলের 'জাদী ঘর' বা ব্রহ্মদেশীয় 'প্যাগোডা' টাইপের যে চূড়া আছে তা প্রায় ৯ মিটার উঁচু। তবে চূড়াটি মোটেই প্রাচীন নয়। বিগত মহাযুদ্ধের সামান্য কয়েক বছর আগে মন্দিরটির যখন আমূল সংস্কার করা হয়, তখন আগেকার মন্দিরের ধ্বংসপ্রাপ্ত চূড়াটি নূতনভাবে নির্মিত হয়। তবে আদি মন্দির যে বেশ প্রাচীন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মন্দিরের ভিতরে ভূমিস্পর্শ মুদ্রার ০.৯ মিটার উঁচু একটি পাথরের তৈরি বুদ্ধমূর্তি আছে। স্থানীয় অর্থাৎ চট্টগ্রাম-পার্বত্যচট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাপ্ত পাথরে তৈরি এ মূর্তির উপরে মায়ানমার ও শ্যামদেশের বুদ্ধমূর্তির অনুকরণে এত কাজ করা ও রংচং লাগান হয়েছে যে, এ মূর্তির আদিরূপ সম্পর্কে কোনো ধারণা করাই কঠিন। মূর্তিটিকে হিন্দু দেবদেবীর পূজার রীতি অনুসারে চাল-কলা ইত্যাদির নৈবেদ্য দিয়ে প্রত্যহ পূজা করা হয়।

এ মন্দিরের লাগোয়া পুর্বদিকে প্রায় ১.১ মিটার ব্যবধানে আছে আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট মন্দির। এটি একটি প্যাগোডা টাইপের চূড়াবিশিষ্ট মন্দির। এ মন্দির প্রথমোক্ত মন্দিরের সংস্কার কালে অতিথিশালা হিসাবে নির্মিত হয়েছিল বলে ভিক্ষু মহাশয় বলেন। এর পশ্চিম দেয়ালে একটি দরজা ছিল। সেটি এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন এটি পুরাপুরি একটি হিন্দুমন্দির। এখানে একটি শিবলিঙ্গ আছে। স্থানীয় হিন্দুরা এর পূজা করে। শিবলিঙ্গের পশ্চিম পার্শ্বে একখণ্ড কাল পাথর (black basalt) আছে। পাথরের উপরের ভাগ অর্ধবৃত্তাকার। .৯০ × .৪০ × .২৩ মিটার আয়তনের এ প্রস্তর খণ্ড সমগ্র অঞ্চলে যত পাথর ও পাথরের মূর্তি আছে, সেগুলির মধ্যে একমাত্র কালপাথর। বাকি সবই স্থানীয় পাথর।

স্থানীয় হিন্দুদের মতে এ পাথরে নাকি সীতা দেবী বনবাসকালে মরিচ-মসলা পিষতেন। প্রস্তরখণ্ডের উভয় দিক ইচ্ছাকৃতভাবে ঘষে ঘষে এমন মসৃণ করা হয়েছে যে, প্রথম দৃষ্টিতে এটিকে শিল (শিলপাটা) বলেই ভ্রম হয়। কিন্তু একটু মনোযোগ সহকারে পাথরটিকে পরীক্ষা করলেই বোঝা যায় যে, পাথরের উপরে এক বা একাধিক মূর্তি উৎকীর্ণ ছিল। স্থানীয় ভিক্ষু প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাদয়ের মতে পাথরের উপরে একটি শিলালিপি ছিল। প্রস্তর খন্ডের নিচের দিকে ডানকোণে প্রায় '১৬ বর্গ ইঞ্চি' স্থান জুড়ে একটি গর্ত (depresion) আছে। এতে অতি সহজেই বোঝা যায় যে, পার্শ্ববর্তী উঁচুস্থানে কোনো মূর্তি উৎকীর্ণ ছিল। প্রস্তরখণ্ডে যদি কোনো লিপি উৎকীর্ণ বা খোদিত থাকত তবে এ গর্ত থাকার কোনো আবশ্যকতা ছিল না। পাথরখানা খুব ভাল করে আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি। এতে যে এক বা একাধিক মূর্তি উৎকীর্ণ ছিল, তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

এই মন্দিরের সামনে (পূর্বদিকে) আছে আনুমানিক ৮ মিটার × ৬ মিটার আয়তনের একটি চত্বর। প্রায় .৩ মিটার উঁচু এ চত্বরের চারপাশে ইটের ভিত্তিদেয়ালের অস্তিত্ব দেখা যায়। এটি কি কোন প্রাচীন ইমারতের ভিত্তিবেদী না শুধুমাত্র একটি বাঁধান চত্ত্বর ছিল, তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। তবে ধ্বংসাবশেষটি বেশ প্রাচীন। চত্বরের কিছু উত্তরে আছে আধুনিক কালে নির্মিত একটি অতি ক্ষুদ্র মন্দির। সেখানে আধুনিকখালের পুতুলাকারে নির্মিত রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার মূর্তি আছে। স্থানীয় হিন্দুরা এ পাহাড়ে তাদের দাবি প্রতিষ্ঠার অভিব্যক্তি স্বরূপ মূর্তিগুলির পূজা করেন।

এই পাহাড়ের পরিচয় ও অধিকার নিয়ে স্থানীয় হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে বেশ কিছুকাল যাবত মতানৈক্য চলছে। হিন্দুদের মতে এখানে রাম-সীতার মন্দির ছিল। এজন্য এ স্থানের নাম রামকোট। সে দাবিতে তারা রাম, লক্ষণ ও সীতার মূর্তি তৈরি করে পূজা করছেন এবং কালপাথরের মূর্তিটিকে ঘষে ঘষে সীতার শিলে পরিণত করেছে এবং একটি শিবলিঙ্গও প্রতিষ্ঠা করেছেন। বৌদ্ধদের মতে এখানে একটি প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ বা মন্দির ছিল। হিন্দুরা জোর করে এটিকে হিন্দু মন্দির বলে পরিচয় দিচ্ছেন। এটি যে আদিতে একটি বৌদ্ধপ্রতিষ্ঠান ছিল, তাতে বোধ হয় কোনো সন্দেহ নেই।

৬. পূর্ববর্ণিত আধুনিক বনাশ্রমের (৪নং) পূর্বদিকে একটি টিলা আছে। এটিকে বর্তমান কালের বৌদ্ধ সাধনকেন্দ্র বলে অভিহিত করা হয়। মাটির দেয়াল ও টিনের চালবিশিষ্ট একটি ঘর একটি গুহা আছে। এটি তপস্যা-গৃহ। এ স্থানে প্রাচীন কালেও তপস্যাকেন্দ্র ছিল বলে ভিক্ষু মহোদয় অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেন। এ সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু না বলা গেলেও টিলার চারদিকে প্রাচীন ইটের ভগ্নাংশের ছড়াছড়ি দেখে ধারণা হয় যে এককালে এখানে একটি ইমারত ছিল।

৭ ও ৮. বৌদ্ধ সাধনকেন্দ্রের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সমতল ভূমিতে দুটি স্থানে কিছু কিছু প্রাচীন কীর্তি ছিল। একটি স্থানে ছিল শ্মশান। সেটি এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অন্য স্থানটিতে একটি ইমারত ও একটি বুদ্ধমূর্তি ছিল। সেগুলিও এখন নেই।

৯. উপরোক্ত স্থানের দক্ষিণ দিকে একটি বেশ বড় আয়তনের অনুচ্চ টিলা আছে। টিলার উত্তর-পূর্ব দিকের ঢালুতে একটি স্থানীয় মুসলমান পরিবার বসবাস করে। এ টিলার উপরিভাগের আয়তন প্রায় ১ একর এবং সমস্ত স্থানটিই সমতল। এখানে মাঝারি ধরনের একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আছে। এ ইমারত বট ও অন্যান্য বৃক্ষদ্বারা পরিবৃত হয়ে এমন অবস্থায় এসে পড়েছে যে, এর সঠিক পরিচয় নির্ধারণ করা কঠিন। ভিক্ষু মহোদয়ের মতে এটি একটি বৌদ্ধ মন্দির। প্রায় ক্রুশাকারে নির্মিত এই ইমারতের প্রত্যেক বাহু প্রায় ৬.৩ মিটার দীর্ঘ। এর উপরিভাগ বেশ উঁচু ছিল। বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েও এর উচ্চতা ৪.৭ মিটার কম নয়। এর মধ্যে কোনো প্রবেশপথ ছিল কিনা, থাকলে কোন-দিকে এবং ক'টি ছিল স্তূপীকৃত ইটের মধ্যে, তা বের করা কঠিন। তবে এর গঠনপ্রণালীর নমুনা দেখে মনে হয় যে, কক্সবাজার অঞ্চলে নির্মিত 'কিয়াং' বা বৌদ্ধমন্দির জাতীয় কোন ইমারত ছিল এটি। এ মন্দিরকে কেন্দ্র করে টিলার চারকোণে আরও ৪টি একই ধরনের ছোট ছোট মন্দির ছিল বলে ভিক্ষু মহাশয় বলেন। মন্দিরগুলি সেখানে বর্তমান নেই। আছে শুধু স্তূপীকৃত ইট।

১০. বর্তমান বনাশ্রমের টিলার উত্তরে সমতল ভূমিতে যে ধ্বংসাবশেষগুলি দেখা যায়, সেগুলিই যে সমগ্র এলাকার প্রাণকেন্দ্র ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখানে একটি বড় ধরনের বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ইট

হরণকারীদের দৌরাত্ম্যে ও অন্যান্য কারণে মাটির উপরে এই প্রাচীন বিহারের বিশেষ কোনো চিহ্ন বর্তমানে নেই। তবে ভিত্তির সন্ধান এখানে-ওখানে পাওয়া যায়। ভিত্তি দেখে অনুমান করা হয় যে বর্গাকারে নির্মিত এ বিহারের আয়তন ছিল প্রায় ১২২ মিটার × ১২২ মিটার।

এ বিহারের কেন্দ্রস্থলে একটি স্তূপের চিহ্ন দেখা যায়। বাঙলাদেশে আজ পর্যন্ত যে যে সব বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে আনন্দ বিহার, শালবন ও পাহাড়পুর বিহারে কেন্দ্রীয় মন্দির (central shrine) পাওয়া গেছে। সীতাকোট ও ভাসুবিহারে কোনো কেন্দ্রীয় মন্দির নেই। রামকোট বিহারের কেন্দ্রস্থলে একটি স্তূপ ছিল বলে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন সুপারিনটেনডেন্ট ডক্টর আবদুল গফুর অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর মতে এটি অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্দির থেকে ভিন্ন জাতীয় ইমারত এবং প্রাচীনতর।

উপরে বর্ণিত ধ্বংসাবশেষগুলি ছাড়া আরও অনেক প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন রামকোট এলাকায় আছে। প্রকৃতপক্ষে প্রায় দুই বর্গ কিলোমিটার স্থান জুড়ে পাহাড়ঘেরা এ বনাঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই কিছু না কিছু প্রাচীন কীর্তির চিহ্ন, প্রাচীন ইট-পাথর, ভগ্নমূর্তি ও ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারতাদির চিহ্ন পাওয়া যায়। বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে এ স্থানের অতি কাছেই মিত্রপক্ষের ঘাঁটি ছিল। তখন এ স্থানের বহু ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

উপসংহার

রামকোট বিহার ও বনাশ্রমের বর্তমান (১৯৭২ খ্রিঃ) পরিচালক বিদর্শক ভিক্ষু প্রজ্ঞাজ্যোতির মতে এই বিহার সম্রাট অশোকের যুগের এবং সে সময়ের একটি শিলালিপি ছিল বলে তিনি দাবি করেন। একটি কাসকেট (casket)-এর উভয় পার্শ্বে নাকি ব্রাহ্মী অক্ষরের লিপিটি খোদিত ছিল। কিছুকাল আগে কাসকেটের ভিতরে স্বর্ণ আছে এ লোভে কাসকেটটি ডাকাতে নিয়ে গেছে বলে তিনি জানান।

ব্রাহ্মীলিপি সম্পর্কে ভিক্ষু মহাশয়ের এ দাবি সম্পর্কে অধিক আলোচনা নিষ্প্রোয়জন। চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণ প্রত্যন্ত অঞ্চলের এই জঙ্গলঘেরা স্থানে অশোকের রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করেছিল এবং সেখানে তিনি একটি অনুশাসন প্রদান করেছিলেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ অঞ্চল মোঘলদের আগে পর্যন্ত বরাবর আরাকান রাজ্য ও সভ্যতার আওতাভুক্ত ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

রামকোটে যে-সমস্ত ইমারতের অস্তিত্ব বর্তমানে আছে এবং যে-গুলির ধ্বংসাবশেষ এখনও টিকে আছে, সেগুলি খুব প্রাচীন বলে মনে হয় না। যে সমস্ত ইমারত সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, সেগুলি সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছুই বলা যায় না। বিশেষ করে এখানে যে বৌদ্ধ বিহার ও বিহার অঙ্গনে যে স্তূপটি ছিল, তা ছিল খুব সম্ভব বেশ প্রাচীন। কিন্তু উৎখনন না করে এ সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছু বলা কঠিন।

তবে যে সমস্ত ইমারতের ধ্বংসাবশেষ এখনও টিকে আছে সেগুলি যে স্থানীয় কিয়াং অর্থাৎ বৌদ্ধমন্দিরের স্থাপত্য নিদর্শন বহন করে, তাতে সন্দেহ নেই। কোনো

কোনোটি স্থানীয় জাদিঘর অর্থাৎ বৌদ্ধ সমাধিসৌধের আকারে নির্মিত ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এই কিয়াং, জাদী ইত্যাদির নির্মাণপদ্ধতি ও স্থাপত্য কৌশল সম্পূর্ণরূপে আরাকান, মায়ানমার, শ্যাম, খেমের প্রভৃতি দেশের স্থাপত্যকৌশল দ্বারা প্রভাবিত।

রামকোটে ব্যবহৃত ইটগুলিরও একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রায় সর্বত্রই একই সাইজের (০.২২ × ০.১৫ × ০.০৩ মিটার) ইট ব্যবহৃত হয়েছে। এতে মনে হয় যে, ইমারতগুলি একই সময়ে নির্মিত না হলেও একই সংস্কৃতির প্রভাব এগুলির মধ্যে ছিল।

রামকোট বনাশ্রমে রক্ষিত মূর্তিগুলির সংখ্যা বর্তমানে ২৫। তা ছাড়া অসংখ্য ভগ্নমূর্তি এখানে-ওখানে পড়ে আছে। সবগুলি মূর্তি একই রকমের পাথর অর্থাৎ চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাপ্ত 'ক্লে স্টোন' (clay stone) দ্বারা তৈরি। বেলে পাথর (sand-stone), কাল পাথর (black basalt) বা গ্রানাইট (granite) পাথরে গড়া মূর্তি এখানে নেই। সাদা মারবেল (white marble) পাথরে গড়া দু'একটি মূর্তি আছে, সেগুলি যে হাল আমলের আমদানি, তা ভিক্ষু মহাশয় নিজেই স্বীকার করেন। মূর্তিগুলি স্থানীয় পাথরে নির্মিত দেখে ধারণা করা যেতে পারে যে এগুলি স্থানীয় প্রভাবেই নির্মিত হয়েছিল এবং বাঙলা দেশের আর দশটা মূর্তির মত অন্য কোন পাথর ব্যবহার করার কোন সুযোগ সেখানে ছিল না।

স্বয়ং বুদ্ধদেবের মূর্তি ছাড়া অন্য কোনো বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি সেখানে নেই। অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী, লোকেশ্বর পদ্মপাণি, মারিচী, তারা, হেরুক, জম্ভল বা অন্য কোনো দেবদেবীর কোনো মূর্তি এখানে নেই। বর্তমানকালে সমগ্র চট্টগ্রাম অঞ্চলে যে সমস্ত বৌদ্ধপ্রতিষ্ঠান আছে সেগুলিতেও একই অবস্থা। বুদ্ধদেব ছাড়া অন্য কোনো বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি সেখানে নেই। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে দু' একটি বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি অবশ্য চোখে পড়ে। কিন্তু সেগুলির কোনো প্রাধান্য নেই। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে এগুলি এক কোণে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ একটি মতবাদকে কেন্দ্র করে এ ধর্ম প্রচলিত। সেখানে অন্যান্য বৌদ্ধ দেবদেবীর তেমন কোনো অস্তিত্ব দেখা যায় না। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও এই ভাবধারা দেখা যায়। রামকোট বিহারেও এর কোনো ব্যতিক্রম চোখে পড়ে না। শুধু বুদ্ধদেবকে কেন্দ্র করেই এখানকার বৌদ্ধ ধর্ম।

রামকোটে যে সব বুদ্ধমূর্তি ভগ্ন ও অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে, সেগুলির সবই বিভিন্ন মুদ্রায় ধ্যানীবুদ্ধের এক একটি রূপ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, খেমের, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে ধ্যানীবুদ্ধের মূর্তিগুলির মধ্যে যে একটি ভাবগম্ভীর রূপ আছে, রামকোটের মূর্তিগুলির মধ্যে তা পুরাপুরি বিদ্যমান। ভাস্কর্যশিল্পের এই অসাধারণ মিল যে কোনো দর্শকেরই চোখে পড়বে। হাল আমলের চট্টগ্রামের বুদ্ধমূর্তিগুলির মধ্যেও একই প্রভাব দেখা যায়।

এসমস্ত কারণে সহজেই ধারণা হয় যে, প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে মুসলিম আমল পর্যন্ত গোটা বাংলাদেশে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও কৃষ্টির যে রূপটি দেখা যায়, চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিশেষ করে দক্ষিণ চট্টগ্রামে তার প্রভাব মোটেই পড়েনি। যদি পড়ত তবে

দক্ষিণ চট্টগ্রামের বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের যে সমস্ত নিদর্শন পাওয়া যায়, সেগুলির মধ্যে এর ছাপ পুরাপুরি না হলেও আংশিকভাবে পাওয়া যেত। যে প্রভাবটা চোখে পড়ে তা হচ্ছে আরাকান, সায়ানমার, শ্যাম, প্রভৃতি দেশের সংস্কৃতি ও শিল্পের প্রভাব, বাংলাদেশের নয়। এই প্রভাব প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে দক্ষিণ চট্টগ্রামে হাল আমল পর্যন্ত চলে আসছে।

রামকোট বিহার কবে নির্মিত হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। তবে যখনই নির্মিত হয়ে থাক, এ প্রতিষ্ঠানটি যে আরাকানী প্রভাবে গড়ে উঠেছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

রাজারকূল দুর্গ ও রাজবাড়ি

রামকোট বিহার থেকে ২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ী এলাকার একটি বিরাট অংশ জুড়ে অসংখ্য ইট-পাটকেল দেখা যায়। এগুলি ছাড়া এখানে বর্তমানে কোন ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়েনা। লোকে বলে এখানে একটি রাজবাড়ি ও দুর্গ ছিল এবং তা নাকি ছিল আরাকানের রাজার। মোঘলদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হবার পর নাকি এই দুর্গ ও রাজবাড়ি পরিত্যক্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে নিশ্চিহ্ন গেছে।

মোঘল আমল পর্যন্ত দক্ষিণ চট্টগ্রামাঞ্চল যে আরাকান রাজের অধীনে ছিল, তা ঐতিহাসিক সত্য। খুব সম্ভব বহুকাল ধরে আরাকান রাজার একটি দুর্গ এখানে ছিল। রাজারকূল নামে পরিচিত এ স্থানে রাজবাড়ি থাকাও বিচিত্র নয়। তবে বর্তমানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ইট ছাড়া আর কিছুই এখানে নেই।

মুসলিম আমল

রামুর বৌদ্ধ মন্দির সমূহ : কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলা সদরে বেশ 'কয়েকটি বৌদ্ধ মন্দির আছে। মন্দিরগুলি সবই উনবিংশ শতাব্দীর এবং কাঠ ও টিনের সাহায্যে নির্মিত। এগুলিতে পাথরে তৈরি বুদ্ধ মূর্তি আছে। বৌদ্ধরা এসব মূর্তিকে পূজা করেন।

কক্সবাজার বৌদ্ধ মন্দির : কক্সবাজার মহকুমা প্রশাসকের আদি হাসস্থান ও অফিস বিল্ডিং-এর প্রায় লাগোয়া পশ্চিমে একটি পাকা ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আছে। এটি ছিল একটি বৌদ্ধ মন্দির। বর্তমানে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত।

কক্সবাজারের হাল আমলের বৌদ্ধবিহার

কক্সবাজার ও রামু উপজেলা শহরে হাল আমলে নির্মিত বেশ কয়েকটি বৌদ্ধ বিহার দেখা যায়। প্রধানত কাঠ, টিন ইত্যাদির সাহায্যে নির্মিত বিহারগুলির মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য কিছু না থাকলেও প্রাচীন স্তূপশিল্পের কিছু প্রভাব এগুলির মধ্যে দেকা যায়। খিয়াং নামে সাধারণভাবে পরিচিত তেমন একটি আধুনিক বৌদ্ধ বিহারের (রামু শহরের) চিত্র উপরে তুলে ধরা হল।



আধুনিক বৌদ্ধবিহার খিয়াং, রামু

গ্রন্থপঞ্জি

বাঙলা

১. বাঙালির ইতিহাস—ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
২. বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৩. বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড—ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার
৪. বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর—শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়
৫. কোচবিহারের ইতিহাস, ১ম খণ্ড—খান চৌধুরী আমানত উল্লা আহমদ
৬. বগুড়ার ইতিহাস—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন
৭ বগুড়ার ইতিকথা—কাজী মোহাম্মদ মেছের
৮. রাজশাহীর ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড—, কাজী মোহাম্মদ মেছের
৯. দিনাজপুরের ইতিহাস—ছৈয়দ মোশাররফ হোসেন
১০. দিনাজপুর রাজবংশের ইতিহসা—মেহরাব আলী
১১. বিস্মৃত ইতিহাসের তিন অধ্যায়--অধ্যাপক আবু তালিব
১২. যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড—অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র
১৩. সুন্দরবনের ইতিহাস, ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড—এ, এফ, এম, আবদুল জলিল
১৪. যশোরাদ্য দেশ—হোসেন উদ্দিন হোসেন
১৫. কুষ্টিয়ার ইতিহাস—শ, ম, শওকত আলী
১৬. চলনবিলের ইতিকথা—এম, এ, হামিদ
১৭. মহাস্থান—ডক্টর নাজিমুদ্দীন আহমদ
১৮. পাহাড়পুর—ডক্টর নাজিমুদ্দিন আহমদ
১৯. ময়নামতী—ডক্টর নাজিমুদ্দিন আহমদ
২০. তবকাত-ই-নাসিরী—মূল রচনা মীনহাজ-ই-সিরাজ অনুবাদ ও সম্পাদনা আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া
২১. তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী—মূল রচনা জিয়া-উদ-দীন বারনী অনুবাদ গোলাম সামদানী কোরায়শী
২২. বাহারিস্তান-ই-গায়েবী—মূল রচনা মীর্জা নথন অনুবাদ খালেকদাদ চৌধুরী
২৩. রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস—কৈলাস চন্দ্রসিংহ
২৪. গৌড়লেখমালা—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
২৫. নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন (প্রবন্ধ)—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৬. মোমেন শাহীর নতুন ইতিহাস—খান সাহেব এম, আবদুল্লাহ্
২৭. কোম্পানী আমলে ঢাকা—মূল রচনা, ডক্টর জেমস টেলর (Topogaphy of Dacca) অনুবাদ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান

ENGLISH

1. Iconography of Buddhist And Brahmanical Sculptures In The Dacca Museum—*Dr. N. K. Bhattasali.*
2. Inscriptions of Bengal, vol. 111—*Nani Gopal Majumdar.*
3. Inscriptions of Bengal Vol. IV—*Mvi Shamsuddin ahmad.*
4. Copper Plates of Sylhet—*Kamala Kanta Gupta.*
5. Prehistory And Protohistory of Eastern India—*Dr. A. H. Dani.*
6. Muslim Architecture In Bengal--*Dr. A. H. Dani.*
7. Dacca—*Dr. A. H. Dani.*
8. Lalmai A cuttural Center of Early Bengal—*Barrie M. Morrison.*
9. Glimpses Of Old Dhaka—*S. M. Taifoor.*
10. Ancient Monuments In East Pakistan---*Dr. S. M. Hassam.*
11. History Of Bengal, Vol. I. & 11—*Dacca University.*
12. Dynastic History of Bengal—*Dr. A. M. Chaudhury.*
13. Social History of Bengal—*Dr. A. Karim.*
14. Mainamati—*Dr. F. A. Khan.*
15. Mahasthan—*Dr. Nazimuddin ahamed.*
16. Paharpur—*Dr. Harunur-Rashid.*
17. Eastern Bengal District Gagelteers—DINAJPUR—F. W. Stong.
18. Eastern Bengal District Gagelteers TIPPERA—J. E. Webster.
19. Eastern Bengal District Gagelteers BAKERGANJ—J. C. JacK.
20. Eastern Bengal District Gagelteers KHULNA—O' Mally
21. Eastern Bengal District Gagelteers MYMENSING—
22. Bengal District Records—Rangpur (1770-77)—E.G. Glazier C. S.
24. Ramcharitam by Sandhyakaranandi—*Translated by Dr. R. C. Majumder. Dr. R.G. Basak and N. G. Banerji.*
25. A. History of Assam—*Sir Edward Gait, Dr. B. K. Barua and H. V. S. Murthy.*
26. Mahasthan And Its Environs—*Prabhas Chandra Sen.*
27. *Archaeological Survey of India Report. Vol. XV.—Sir Alexander Cuningham*
28. Records of The Geologiacal Survey of Bangladesh, Vol I. Part 2—M Abu Bakr.

JOURNAL

1. Pakistan Archaeology, Number 3—1966.
2. Bangladesh " vol. 1--1979.
3. Journal of the Varendra Research Museum vol. IV, 1975-76.
4. Do vol. IV—1970-81.
5. Appendix—*Journal of the Asiatic Society of Pakistan (vol. 11)* Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal—*Dr. A. H. Dani.*
6. Bangladesh Lalitkala—*Journal of the Dacca Musleum.* Vol. I. No. I January 1975
7. Do. Vol. I, No 2, July 1975

নির্ঘণ্ট

নাম-সূচী

(প্রত্নকীর্তি ছাড়া)

অ

আ

ই

ঈ

উ

এ-ঐ

ও

খ

গ

ঘ

চ

ছ

জ

ঝ

ট

ঠ

ড

ধ

ন

প

ফ

ব

ভ

য

র

স